মহাকবি সোমদেব ভট্ট বিরচিত

কথাসরিৎসাগর

পুনঃকথন

অদ্রীশ বর্ধন

মহাকবি সোমদেব ভট্ট বিরচিত

কথাসরিৎসাগর

পুনঃকথন

অদ্রীশ বর্ধন

মহাকবি সোমদেব ভট্ট বিরচিত

ক থা স রি ৎ সা গ র

মহাকবি সোমদেব ভট্ট বিরচিত

কথাসরিৎসাগর

পৈশাচিকী ভাষায় রচিত *বৃহৎকথা* গ্রন্থের সারসংগ্রহ

পুনঃকথন

অদ্রীশ বর্ধন

পা রু ল

গৃহী বাঙালি পাঠককে

ভূমিকা

কথাসরিৎসাগর-এর উৎস অবশ্যই গুণাঢ্য বিরচিত *বৃহৎকথা।* পৈশাচিকী ভাষায় বিরচিত এই মহাগ্রন্থের আবির্ভাব দাক্ষিণাত্যে, খ্রিস্টীয় প্রথম (মতান্তরে তৃতীয়) শতাব্দীতে—সাতবাহন রাজাদের রাজত্বকালে। সাত লক্ষ (?) শ্লোকে লেখা এই অমরকাব্যই কি আরব দেশে গিয়ে *আরব্য রজনী* লেখার প্রেরণা জুগিয়েছে? চুনি-র মধ্য দিয়ে বহুদূরের দৃশ্য দেখার উদ্ভট গল্প তো *বৃহৎকথা*-তেই আছে। কোন গ্রন্থ বেশি প্রাচীন? সংস্কৃত গ্রন্থ, না আরব্য গ্রন্থ? ভারতীয় 'আরব্য রজনী', না আরবীয় 'বৃহৎকথা'? প্রসঙ্গত, আরব সাহিত্যে রোমান্টিক গদ্যসাহিত্যের আবির্ভাব অষ্টম নবম শতাব্দীর পরে। যেমন, *আরব্য রজনী।* সুতরাং, *বৃহৎকথা* অবশ্যই প্রেরণা জুগিয়েছে আরবি সাহিত্যে।

এ যেন চমৎকার চন্দ্রিকা। ডাকিনী, যোগিনী, বিদ্যাধরী, মোহিনীদের নিয়ে রস-রচনার আতস-কাচের মধ্য দিয়ে সমাজ-দর্পণ। এতে যেমন রয়েছে পঞ্চতন্ত্রের নীতিমূলক গল্প, তেমনই রয়েছে বীভৎসরসে ভরপুর *বেতাল পঞ্চবিংশতি*-র তাজ্জব সব কাহিনি। এছাড়াও রোমান্স, জটিল নারী-প্রকৃতি *বৃহৎকথা*-র বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে। সেখানে রয়েছে ন-টি প্রাচীন দ্বীপের নাম, সাত সমুদ্রের (?) কথা, জৈন ধর্মের কাহিনি। পালি ভাষা তো প্রাচীন মাগধী-প্রাকৃত ভাষা বিশেষ, বুদ্ধদেবের উপদেশের ভাষা। *আরব্য রজনী* নিশ্চয় তার আগে কল্পিত হয়নি। পরে হয়েছে।

বৃহৎকথা-য় অতিশয় আদি-রসাত্মক গল্পই সিঞ্চিত (অবশ্য স্বামী তো স্ত্রী-কে সেরকম গল্প বলবেই)। *আরব্য রজনী* যেন তার অনুকরণে উল্লাসী। আরবীয় ধ্যানধারণায় মনোমত হওয়ায় গল্পের মধ্য থেকে গল্প বের করে নেওয়ার অভিনব কৌশল তাহলে *আরব্য রজনী*-র মৌলিক নয়, *বৃহৎকথা*-য় রয়েছে এই প্রয়োগ কৌশল। এ যেন গল্পের তরঙ্গ। এক গল্পের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে আর এক গল্প। সরিৎ মানে, নদী-প্রবাহিনী। *কথাসরিৎসাগর* তাই বুঝি কথারূপ সরিৎসমূহের সাগর।

কথাসরিৎসাগর-এ রয়েছে প্রতি গল্পের নির্যাসস্বরূপ হিতকথা, নীতিবাক্য, শাস্ত্রীয় উপদেশ—*আরব্য রজনী*-তে তা নেই। এখানকার কাহিনি-নিচয় পৌরাণিক ইতিহাসের আভায় উদ্দীপ্ত, ওখানে তা নয়। *কথাসরিৎসাগর* নিছক বিনোদন নয়, *আরব্য রজনী* নির্বিশেষে আমোদদায়িনী। প্রথমটিতে নৈতিক অনুশাসন আছে, দ্বিতীয়টিতে তা নেই।

তবে, *আরব্য রজনী* স্যার রিচার্ড বার্টনের ইংরেজি অনুবাদের দৌলতে বিশ্ববিখ্যাত—*কথাসরিৎসাগর* নয়; ভারতবিখ্যাত হয়ে রয়েছে আজও, যদিও তারও পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে। অনুবাদক সি এইচ টনি।

উদয়ন যে পারস্যরাজ্য জয় করেছিল, সে কাহিনি আছে ঊনবিংশ তরঙ্গে।

সোমদেব ভট্ট বিরচিত এই আজব সৃষ্টির আবির্ভাব কাশ্মীররাজ অনন্তরাজের রাজত্বকালে। বিদুষী মহিষী সূর্যবতীর উৎসাহে সোমদেব গুণাঢ্য বিরচিত *বৃহৎকথা* থেকে অতি সরল সংস্কৃতে একুশ হাজার শ্লোকে (এর অতিরিক্ত গদ্যাংশও রয়েছে) নাতিসংক্ষিপ্ত নাতিবিস্তীর্ণ এই গ্রন্থ রচনা করেন। এর উল্লেখ পাওয়া যায় *বঙ্গীয় শব্দকোশ*-এর প্রথম খণ্ডে 531 পৃষ্ঠায়।

সরল বাঙালা অভিধান-এর 1390 পৃষ্ঠায় দেখা যাচ্ছে :

> অতি-অদ্ভুত উপন্যাস মালায় পূর্ণ বৃহৎ কথা। কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষদেবের মহিষীর চিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত মহাকবি সোমদেব ভট্ট রাজাদেশে *বৃহৎকথা*-র সার সংকলন পূর্বক এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

কৌশাম্বীর অধিপতি বৎসরাজ উদয়নের পুত্র চক্রবর্তী নরবাহন দত্তের জন্মবৃত্তান্ত ও চরিত বর্ণনাই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। উমেশচন্দ্র গুপ্ত কবিরত্ন কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত।

সূর্যবতী তাহলে কোন রাজার মহিষী ছিলেন? অনন্তরাজের, না, শ্রীহর্ষদেবের? আরও কৌতূহল, *বৃহৎকথা* লেখা হয়েছিল প্রাকৃত ভাষায় (পৈশাচিক ভাষায়)। কোন সময়ে? বিজ্ঞ পাঠকের কাছে আলোকপ্রাপ্তির আশায় রইলাম। এই মহাগ্রন্থের এক চরিত্র বলেছে, পৈশাচিক ভাষা পিশাচদের ভাষা। পিশাচ বলতে কি অনার্য বোঝানো হয়েছে?

বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত *কথাসরিৎসাগর*-এর অনুবাদক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ। সম্পাদনা করেছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কিন্তু মূল কাহিনির আঠারোটি লম্বক-এর অনুক্রম উনি রাখেননি। ছ-টি লম্বকের শিরোনাম নেই। কোথায় আগের লম্বক শেষ হল, কোথায় পরের লম্বক শুরু হল—তা বোঝা যায় না।

আঠারোটি লম্বকে মোট 64টি তরঙ্গ আছে, প্রতিটি তরঙ্গে আছে এক বা একাধিক গল্প। যেন, এক নদী থেকে বহু শাখানদী বেরিয়েছে। প্রকৃতই, গল্পসাগর!

আজকের বাংলায় লেখা এই মহাগ্রন্থে 64টি তরঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে। আঠারোটি লম্বকের নাম কৌতূহলী পাঠকের জন্যে এই ভূমিকায় দেওয়া হল—কথাপীঠ, কথামুখ, লাবানক, নরবাহন দত্তের জন্ম, চতুর্দারিকা, মদনমঞ্জুকা, রত্নপ্রভা, সূর্যপ্রভা, অলঙ্কারবতী, শক্তিযশা, বেলা, শশাঙ্কবতী, মদিরাবতী, মহাভিষেক, পঞ্চলম্বক, সুরতমঞ্জরী, পদ্মাবতী ও বিষমশীল।

একদা মনের আনন্দে এই কাজ নিয়ে মেতে ছিলাম, 'সপ্তপর্ণী'র চোদ্দোতলায় বসে। আজ তা পৌঁছে যাক ঘরে ঘরে। কৃতজ্ঞ রইলাম প্রকাশকের কাছে।

অদ্রীশ বর্ধন

সূচি

বেতালপঞ্চবিংশতি : পঁচিশ বেতালের কাহিনি

মঙ্গলাচরণ

পার্বতীর মনে আনন্দ দেওয়ার জন্যে প্রাকৃত ভাষাভেদ পৈশাচী ভাষায় অত্যাশ্চর্য এই গল্পগুলি বলে গেছিলেন মহাদেব। প্রাকৃত ভাষা প্রকৃতি (সংস্কৃত) থেকে আগত ভাষা; সংস্কৃত জগত কথ্য ভাষা।

কথারম্ভ

সিদ্ধ, গন্ধর্ব, যক্ষ আর বিদ্যাধররা থাকে হিমালয়ে। ভগবতী এই হিমালয়ের মেয়ে। হিমালয়ের উত্তরের শিখরের নাম কৈলাস পর্বত। এখানেই আছে কৈলাসাচল, মহাদেব আর পার্বতীর নিবাস। পার্বতী একদিন নতুন ধরনের গল্প শুনতে চাইলেন মহাদেবের কাছে। মহাদেব বললেন—'ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সবই তুমি জান। কোনো গল্পই তোমার কাছে নতুন নয়। যাই হোক, শুনতে যখন চেয়েছ, তাহলে শোন।'

পার্বতীর দাক্ষায়ণী জন্মের পরিচয়

দেবী, আগেও তুমি আমার স্ত্রী ছিলে। তখন তুমি ছিলে দক্ষ প্রজাপতির মেয়ে। স্বামী নিন্দে সইতে না পেরে দেহ রেখেছিলে। আমি দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করেছিলাম। সেই তুমি হিমালয়ের মেয়ে হয়ে জন্মে এলে আমার তপস্যার সময়ে অতিথিসেবা করবার জন্যে। উগ্র তপস্যা করে আমার বউ হয়ে গেলে। এই তো গল্প! চটে গেলেন পার্বতী। বললেন, এর নাম গল্প! আপনি তো দেখছি মহাধুরন্ধর! মাথায় গঙ্গাকে নিয়ে থাকেন, আর প্রণাম করেন সন্ধ্যাদেবীকে। দুদিকে দুই রমণী! আপনাকে আমার চিনতে বাকি নেই!

অবতরণিকা : পার্বতীর অভিশাপ

বউকে ঠান্ডা করার জন্যে তাঁর মনের মতো গল্প শুরু করলেন মহাদেব। তার আগে নন্দীকে ডেকে হুকুম দিলেন, গল্প বলবার সময়ে কেউ যেন কাছে না থাকে। কিন্তু যোগবলে সেই গল্প শুনে নিলেন পুষ্পদন্ত নামে এক গণাধিপ। নিজের স্ত্রী জয়াকে সেই গল্প না শুনিয়ে পারলেন না। জয়া অবাক হলেন। একই গল্প ঘুরিয়ে শোনালেন পার্বতীকে। সব স্বামীই বউদের কাছে পেট আলগা করে। আবার সব রমণীই সখীদের কাছে স্বামীর কথা ফাঁস করে দেয়।
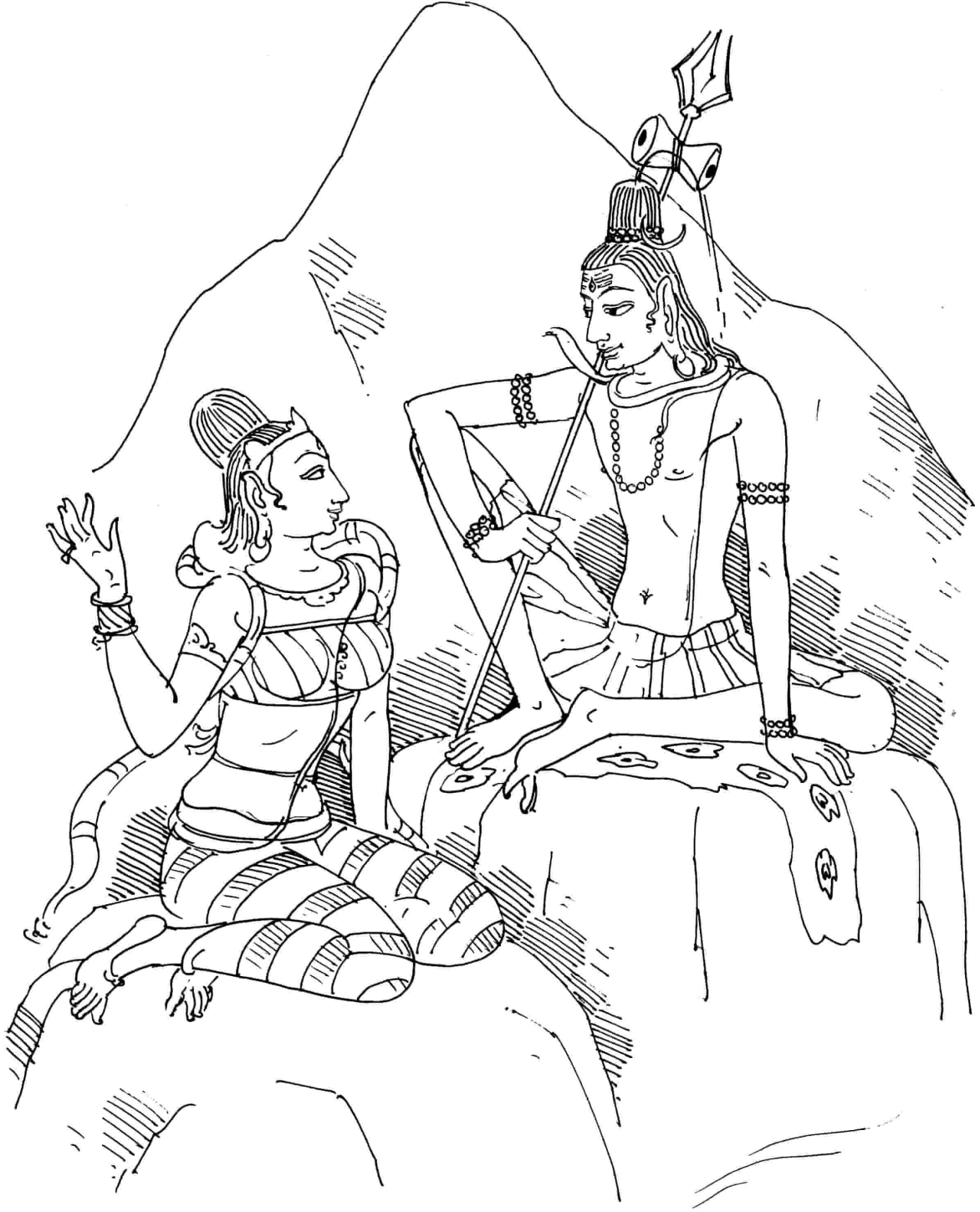
পার্বতীর মনে আনন্দ দেওয়ার জন্যে প্রাকৃত ভাষাভেদ পৈশাচী ভাষায়
অত্যাশ্চর্য এই গল্পগুলি বলে গেছিলেন মহাদেব।

কিন্তু রেগে আগুন হলেন পার্বতী। একহাত নিলেন মহাদেবকে, নতুন গল্প শুনতে চেয়েছিলাম, শোনালেন বাসি গল্প। যে গল্প জয়া জানে, তা আমাকে শোনালেন? ছি-ছি! মহাদেব তৎক্ষণাৎ যোগবলে জানতে পারলেন আসল ব্যাপার। আড়ি পেতে ছিল পুষ্পদন্ত। নতুন ধরনের মজার মজার গল্প শুনে নিজের পেট ফুলেছে, বউয়ের মনে রং লাগিয়েছে, নিজে কৃতিত্ব নিয়ে।

অর্থাৎ, গল্প চুরি!

শুনে, তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন পার্বতী। এত বড়ো স্পর্ধা! স্বামী-স্ত্রী'র কথায় আড়ি পাতা! জঘন্য অপরাধ! পুষ্পদন্তের হয়ে ওকালতি করতে এসেছিল মাল্যবান। পার্বতী অভিশাপ দিলেন দুজনকেই, যাও, মানুষ হয়ে জন্মাও!

তারপর অবশ্য মন নরম হয়েছিল কাকুতিমিনতি শুনে। পুষ্পদন্তের স্ত্রী জয়াও কান্নাকাটি করছে দেখে বলেছিলেন, সুপ্রতীক নামে এক যক্ষ আছে। যক্ষপতি কুবেরের শাপে সে পিশাচ হয়ে গেছে। এখন তার নাম হয়েছে কাণভূতি, আছে বিন্ধ্য জঙ্গলে। তোমার সঙ্গে তার দেখা হবে। দেখা হলেই তুমি জাতিস্মর হয়ে যাবে, আগের জন্মের কথা মনে পড়ে যাবে। এইসব কথা তখন তুমি তাকে বলবে। তুমি মুক্তি পাবে, কাণভূতিও মুক্তি পাবে। সেইসঙ্গে, মাল্যবান।

পার্বতীর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই আচমকা যেন বিদ্যুৎ-ঝলকিত হয়েছিল পুষ্পদন্ত আর মাল্যবানকে ঘিরে। যেন, একজোড়া বিদ্যুৎপুঞ্জ।

অদৃশ্য হয়ে গেছিল পরক্ষণেই!

অনেক বছর পরে...

শঙ্করী একদিন জিজ্ঞেস করলেন শঙ্করকে, মাল্যবান আর পুষ্পদন্ত কোথায় গিয়ে জন্মেছে? ভূতলের কৌশম্বী নগরে রয়েছে পুষ্পদন্ত, এখন তার নাম বররুচি। মাল্যবান রয়েছে সুপ্রতিষ্ঠিত নগরে, নতুন নাম গুণাঢ্য।

১. কাণভূতির বৃত্তান্ত

মর্ত্যে এসে পুষ্পদন্ত হল বররুচি। বিখ্যাত হয়ে রইল আরও একটা নামে, কাত্যায়ন। পৃথিবীর অনেক জায়গায় ঘুরে যথেষ্ট বিদ্যা অর্জন করেছিল বররুচি। মগধের রাজা নন্দরাজা তার পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হলেন। নিজের সচিব করলেন।

অনেকদিন রাজার কাজ করবার পর ক্লান্ত হয়েছিল বররুচি। বিন্ধ্যাচলে গেছিল বিন্ধ্যবাসিনী দর্শনের ইচ্ছে নিয়ে।

দেবী তার আরাধনায় খুশি হয়েছিলেন। স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, যাও, বিন্ধ্যের জঙ্গলে কাণভূতির সঙ্গে দেখা করো।

তৎক্ষণাৎ রওনা হয়েছিল বররুচি। গভীর জঙ্গলে দেখেছিল, একটা বটগাছের তলায় রয়েছে কাণভূতি; কিন্তু তাকে ঘিরে রয়েছে কয়েকশো পিশাচ। কাণভূতি নিজেও তো পিশাচ হয়ে রয়েছে।

একী কাণ্ড! কাণভূতিকে ঘিরে এত পিশাচ লম্ফঝম্প করছে কেন? বুঝিয়ে দিল কাণভূতি, আমার যে কোনো জ্ঞান ছিল না। আমি কে, কেন এমন হলাম, সে বোধশক্তি ছিল না। আগে ছিলাম উজ্জয়িনীর শ্মশানে, পিশাচ হয়ে। একদিন ভগবান শঙ্করের কথা শুনে আমার পূর্বস্মৃতি ফিরে পেলাম। শুনলাম, শঙ্করী জিজ্ঞেস করছেন শঙ্করকে, আমি যাকে অভিশাপ দিয়েছিলাম সেই পুষ্পদন্তের সঙ্গে ফের কবে আমার দেখা হবে?

শঙ্কর আমাকে দেখিয়ে বললেন, ওই যে পিশাচকে দেখছ, ও ছিল কুবেরের অনুচর। স্থলশিরা নামে এক নিশাচরের সঙ্গে এর বন্ধুত্ব হয়। কুবের ওকে অভিশাপ দিলেন, 'যা, বিন্ধ্যের জঙ্গলে গিয়ে পিশাচ হয়ে থাক।' সেই সময়ে আমার ভাই দীর্ঘজঘঞ্চ ছিল সেখানে। তার কাকুটি মিনতি শুনে কুবের বললেন, 'পুষ্পদন্তের কাছে সব কথা বলে যেদিন মাল্যবানের কাছে তা প্রকাশ করবে, সেই দিনই ঘটবে শাপ মুক্তি। এই খবর

শঙ্কর জানালেন পার্বতীকে। আমি তা শুনেই তক্ষুনি চলে এলাম এই বিন্ধ্যের জঙ্গলে। আপনার দেখা পেলাম।

কাণভূতির কথা শুনতে শুনতে যেন ঘুম ভেঙে গেল বররুচির। মনে পড়ে গেল আগের জন্মের কথা।

আমিই সেই পুষ্পদন্ত! বলেই, গড় গড় করে শুনিয়ে দিল সাত লক্ষ শ্লোকে গাঁথা সাতটা মহাকথা, এতদিন যা মনে ছিল না।

শুনে তো নেচে উঠেছিল কাণভূতি, সত্যিই আপনি সাক্ষাৎ রুদ্রের অবতার! এত জ্ঞান আপনার ছাড়া আর কারও নেই। আপনার প্রভাবে শাপ থেকে তো মুক্তি পেলাম, এবার বলুন আপনার কথা। জন্মের পর কী কী ঘটেছে, সব বলুন।

২. বররুচির বৃত্তান্ত

কৌশম্বী নগরে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর নাম অগ্নিশিখা। স্ত্রীর নাম, বসুদত্তা। বসুদত্তা এক মুনির মেয়ে। অভিশাপের ফলে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছিলেন। আমি তাঁদেরই একমাত্র সন্তান। বাবা আমার ছেলেবেলায় মারা যান। মা আমাকে অনেক কষ্টে মানুষ করলেন। একদিন একটা ঘটনা ঘটল। বাড়িতে এলেন দুজন অতিথি ব্রাহ্মণ। ঠিক সেই সময়ে একটু দূরে শোনা গেছিল সুরজ বাজনার আওয়াজ। মা বললেন, নিশ্চয় তোমার বাবার বন্ধু ভবানন্দ নট নাচছেন।

আমি বললাম, যে-ই নাচুক না কেন, আমি একবার দেখেই অবিকল তোমাকে দেখাতে পারব। কথা শুনে অবাক হয়েছিলেন দুই অতিথি, মা বলেছিলেন, আমার এই ছেলে একবার যা শোনে, হুবহু তা মনে রাখে।

যাচাই করতে চেয়েছিলেন দুই অতিথি। একটা বৈদিক সূত্র আবৃত্তি করলেন। আমি হুবহু পুনরাবৃত্তি করে গেলাম। তখন তাঁরা আমাকে নিয়ে নাটক দেখতে গেলেন। ফিরে এসে মা'কে পুরো নাটকটাই দেখিয়ে দিলাম। আমি যে শ্রুতিধর, সে বিষয়ে আর তিলমাত্র সন্দেহ রইল না দুই অতিথির।

একজন বললেন মা'কে, বেতসনগরে দেবস্বামী আর করন্তক নামে দুই ভাই ছিলেন। আমরা তাঁদেরই ছেলে। আমার নাম ব্যাড়ি, এর নাম ইন্দ্রদত্ত। কিছুদিন আগে আমাদের বাবা-মা সব মারা গেছেন। আমরা গেলাম দক্ষিণাপথের দিকে বিদ্যা অর্জনের জন্যে। একদিন স্বপ্নে নির্দেশ পেলাম, পাটলিপুত্র নগরে বর্ষ নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছেন। তাঁর শিষ্য হলে আমরাও পণ্ডিত হতে পারব। কিন্তু পাটলিপুত্রে গিয়ে শুনলাম, সেখানে বর্ষ নামে এক মূর্খ ব্রাহ্মণ আছেন। গেলাম তাঁর বাড়ি। তিনি তখন সমাধিমগ্ন। পাশে তাঁর স্ত্রী যেন মূর্তিমতী সতী। আমরা আমাদের কথা বললাম। ব্রাহ্মণ কোনো কথা বললেন না।

তাঁর স্ত্রী বললেন, এই নগরে শঙ্কর স্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর দুই ছেলে। আমার স্বামী বর্ষ আর ভাই উপবর্ষ। আমার স্বামী মূর্খ। কিন্তু উপবর্ষের বিদ্যাবৈভব আছে। আমার স্বামীর সমস্ত খরচ তিনি বহন করতেন। তাতে আমি রেগে যাই। পরের অন্নদাস হয়ে থাকবেন কেন? বকুনি শুনে উনি কার্তিকের তপস্যা করতে বেরলেন। তাঁর কাছ থেকে সব বিদ্যে পেলেন। সেইসঙ্গে পেলেন কার্তিকের আদেশ, বাড়ি ফিরে গিয়ে কোনো শ্রুতিধর ব্রাহ্মণ শিষ্যকে এই সব বিদ্যে শেখাতে হবে। তাহলেই ওঁর অর্থকষ্ট ঘুচবে। আজও সে রকম শিষ্য পাইনি। তোমাদের সন্ধানে আছে?

কাহিনি শেষ হতেই দুই অতিথি বললেন, অনেক ঘুরেছি। আজ পেলাম শ্রুতিধর। ছেলেটিকে দিন আমাদের সঙ্গে।

ব্রাহ্মণী রাজি হয়ে গেলেন তক্ষুনি। বললেন, এই ছেলে যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন দৈববাণী হয়েছিল, পুত্র হবে শ্রুতিধর, সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করে বররুচি নামে বিখ্যাত হবে, নতুন এক ব্যাকরণের প্রতিষ্ঠা করে যাবে। যাও, আমার ছেলেকে নিয়ে যাও।

অতিথি দুজনের সঙ্গে গেলাম বর্ষের বাড়ি। আমি একবার শুনেই সমস্ত বেদ বুঝে নিলাম। ইন্দ্রদত্তকে শুনতে হল দুবার, ব্যাড়ি কে তিনবার।

সেইদিন থেকে বর্ষকে আর কেউ মূর্খ বলেনি। তাঁর টাকা পয়সার অভাবও থাকেনি।

৩. পাটলিপুত্র নগরের উৎপত্তির বিবরণ

বররুচি বললেন কাণভূতিকে, গুরুদেবকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, পাটলিপুত্র নগরে লক্ষ্মী সরস্বতীর নিবাস হল কী করে?

গুরুদেব বললেন, মন্দাকিনী যেখানে পাহাড় থেকে নামছে, সেখানে কনখল নামে একটা পবিত্র তীর্থ আছে। দক্ষিণাপথের এক ব্রাহ্মণ সেখানে সস্ত্রীক তপস্যা করতেন। তাঁর তিন ছেলে। মা আর বাবা মারা গেলে এই তিন ছেলে গেছিল রাজগৃহে, পড়াশুনোর জন্যে। পাঠ সমাপ্ত হলে তিন ভাই গেছিল দক্ষিণা পথে জন্মভূমি দেখবার জন্যে। আশ্রয় নিয়েছিল সমুদ্রের ধারে ভোজক নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে। ভোজকের তিন মেয়ে, টাকা অনেক। ভোগ করবে কে? তিন ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন তিন মেয়ের। সম্পত্তি দিলেন জামাইদের। নিজে চলে গেলেন গঙ্গার তীরে তপস্যা করার জন্যে।

সুখেই ছিল তিন ভাই তিন বউকে নিয়ে। কিন্তু সুখকে কেউ কখনও চিরকাল বেঁধে রাখতে পারে না। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ। সংসারের নিয়ম।

এল দুর্ভিক্ষ। টাকা থাকলেও অন্ন মিলছে না। তিন ভাই যে কত বেইমান আর নৃশংস, বোঝা গেল তখনই। টাকাপয়সা নিয়ে, তিন বউকে ফেলে, চম্পট দিল দেশ ছেড়ে।

কিন্তু সতীর সহায় ভগবান। অনাথের নাথ ঈশ্বর। করুণাময়ের করুণা বিরাজ করছে সর্বত্র। খিদের জ্বালায় বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল তিন বোন, কাছে নেই কানাকড়ি। অনেক হেঁটে, অনেকদূরে গিয়ে দেখতে পেল এক লোকালয়। আশ্রয় নিল এক ভদ্র গেরস্তের বাড়িতে। তাঁর নাম যজ্ঞদত্ত। তিন বোনকে নিজের মেয়ের মতো যত্ন করলেন। কারণ পরিচয় নিয়ে জেনেছিলেন, ওরা তিনজন তাঁর পুরোনো বন্ধু ভোজক ব্রাহ্মণের মেয়ে।

তিন বোনের একজন ছিল গর্ভবতী। একটি ছেলে হল যথাসময়ে।

একদিন গভীর রাতে আকাশে হরপার্বতী বেড়াতে বেরিয়েছেন, তিন বোনের মাঝে কচি ছেলেটাকে দেখে পার্বতী বললেন মহাদেবকে, 'আহা, ওদের কষ্ট দূর করে দিন। ছেলেটাকে বড়োলোক করে দিন।

মহাদেব বললেন, আগের জন্মে এই ছেলে যার স্বামী ছিল, সেই মেয়েটা এখন রাজা মহেন্দ্রবর্মার মেয়ে হয়ে জন্মেছে। নাম হয়েছে, পাটলী। এই জন্মেও ওরা স্বামী-স্ত্রী হবে।

এই বলে, তিন বোনের স্বপ্নে এসে দাঁড়ালেন মহাদেব। গায়ে বাঘের ছাল, মাথায় জটা, সারা গায়ে ছাই, অঙ্গ ঘিরে জ্যোতি, কপালে জ্বলজ্বলে বেঁকা চাঁদ, গালে লম্বা দাড়ি। গায়ের রং বরফের মতো সাদা। চাহনি প্রশান্ত।

বললেন গুরুগম্ভীর গলায়, এই ছেলে রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই পাশে দেখতে পাবে এক লক্ষ সোনার টাকা। এর নাম হবে পুত্রক। তোমাদের অর্থের অভাব আর থাকবে না। এই বলেই, স্বপ্নের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন মহাদেব। ধড়মড় করে ঘুম থেকে উঠে বসেছিল তিন বোন।

রাতভোর হল। ঘুম ভাঙল ছেলের। বিছানার পাশে দেখা গেল এক লক্ষ সোনার টাকা।

ছেলে বড়ো হল। রোজই বিছানার পাশে দেখা যাচ্ছে এক লক্ষ মোহর। তার রাজত্ব হল। ঐশ্বর্য হল। রাজার মা আর মাসি হল তিন বোনে।

আশ্রয়দাতা যজ্ঞদত্ত একদিন বললেন পুত্রককে, সব তো হল, কিন্তু তোমার তিন বাবা-কাকারা যে পালিয়ে গেলেন দুর্ভিক্ষের সময়ে, তাঁদের খোঁজ নাও। তুমি খুঁজছো শুনলেই, ওঁরা ঠিক এসে পড়বেন। একটা গল্প বলি, শোনো।

অনেক আগে বারাণসী ধামে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। একদিন গভীর রাতে দেখলেন আশ্চর্য এক দৃশ্য। আকাশে উড়ে যাচ্ছে কয়েকশো রাজহাঁস, তাদের মাঝে রয়েছে দুটো সোনার হাঁস।

বুদ্ধি খাটিয়ে একটা সুন্দর সরোবর বানালেন। নানাজাতের পাখি এল সেই সরোবরে। তাদের সঙ্গে সেই দুটি সোনার হাঁস।

খুব খুশি হলেন ব্রহ্মদত্ত। হাঁসেদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন।

অবিকল মানুষের গলায় জবাব দিল দুই সোনার হাঁস, মহারাজ, আমরা আগের জন্মে কাক ছিলাম। একটা পবিত্র দেবালয়ের নৈবেদ্য নিয়ে মারামারি করে মারা যাই। ফলে, এ জন্মে হয়েছি জাতিস্মর হাঁস।

গল্প শেষ করে বললেন যজ্ঞদত্ত, তোমরাও তাই করো। টাকা দেবে, এই বলে, বাবা-কাকাদের খোঁজ নাও। দেখবে, ওঁরা এসে গেছেন।

দূতের মুখে খবরটা দেশে দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিল রাজা পুত্রক। দলে দলে ব্রাহ্মণ এসে নিয়ে গেল রাশি রাশি দানসামগ্রী, টাকাপয়সা, দিন কয়েকের মধ্যেই এসে হাজির রাজা পুত্রকের তিন বাবা-কাকা।

মা আর মাসিরা খুব খুশি।

কিন্তু মানুষের স্বভাব পালটায় না। যে যেরকম স্বভাব নিয়ে জন্মায়, হাজার চেষ্টা করলেও সেই স্বভাব সে পালটাতে পারে না।

পুত্রকের বাবা আর কাকা খারাপ স্বভাব নিয়েই জন্মেছিল। পরের ভালো দেখে তাদের বুক হিংসের জ্বলে গেছে চিরকাল। পরের টাকায় লোভ তখনও যায়নি। ছেলের এত ধনদৌলত দেখে বুক তো টাটিয়েই গেল, উপরন্ত ভাবতে লাগল কীভাবে এই বিশাল সাম্রাজ্য হাতানো যায়।
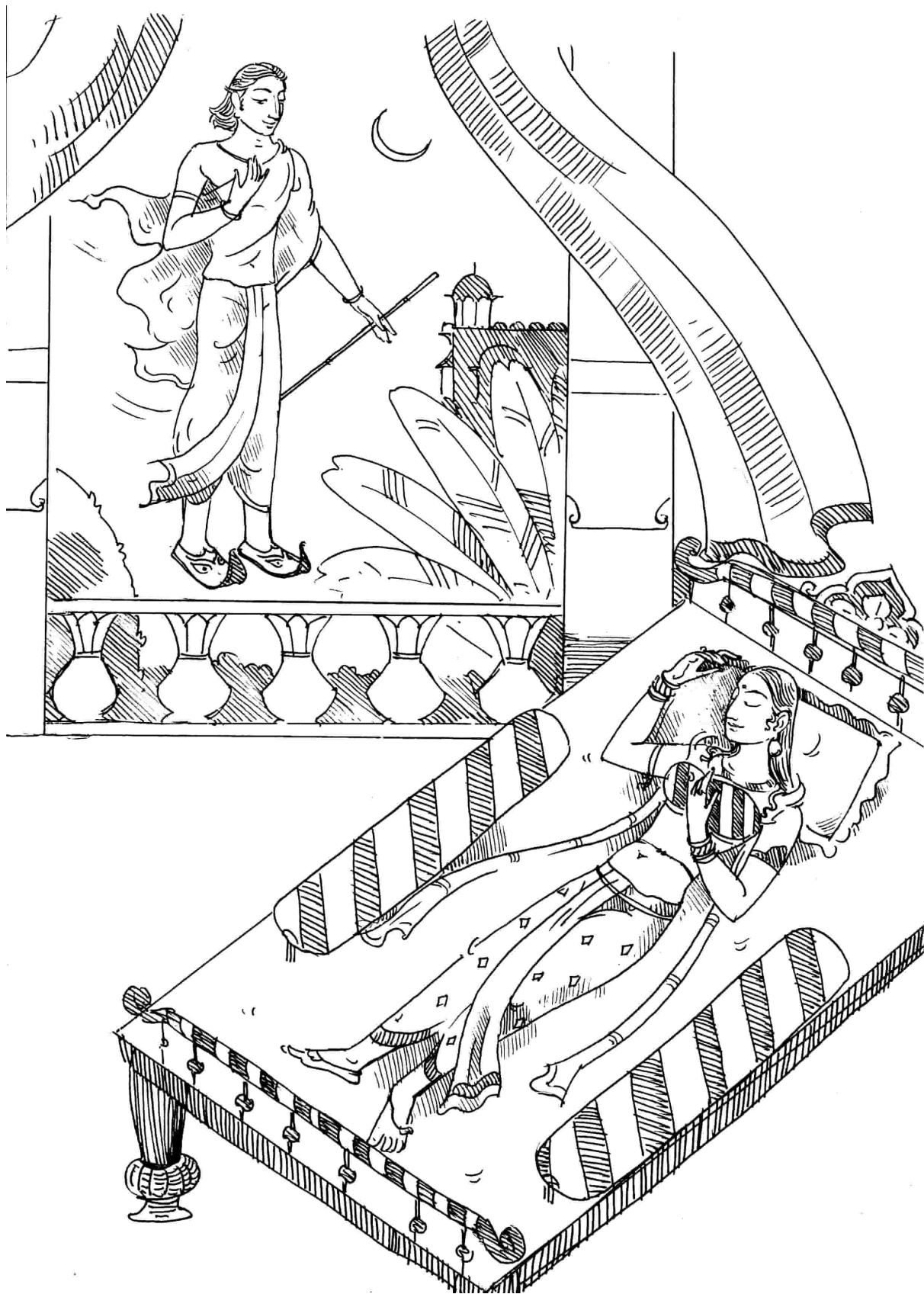
কে যেন শুয়ে রয়েছে সেই ঘরে। রূপের প্রভায় ঘর আলো হয়ে রয়েছে।

একটা পরিকল্পনা স্থির হয়ে রইল। গুপ্তঘাতক লাগিয়ে পুত্রককে খতম করে দেওয়া যাক। দুর্বৃত্তের সুযোগের অভাব হয় না, এরা নিল এক পুণ্যতিথির সুযোগ। পুত্রককে ডেকে বললে, আজকে দিনটা ভালো। চলো, দেবী বিন্ধ্যবাসিনীকে দেখে আসা যাক।

মন্দিরে গেল পুত্রক, সঙ্গে বাবা আর দুই কাকা, অন্য লোকজন অথবা সেপাই শান্ত্রী কাউকে নিল না। নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। মন্দিরে কেউ সৈন্যসামন্ত নিয়ে যায় না।

দূরে দেখা যাচ্ছে মন্দির। চারদিকে ঘন জঙ্গল। বড়ো বড়ো গাছের নিচে অন্ধকার, রোদ্দুর ঢুকছে না বলে। আশেপাশে কোনো মানুষ নেই।

নির্জন নিস্তব্ধ সেই জায়গায় হঠাৎ গা ছমছম করে উঠেছিল পুত্রকের। অথচ, সে ভয়কাতুরে নয়। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করেনি। সোজা ঢুকে গেছিল মন্দিরে, একা। বাবা আর কাকারা বলেছিল, আগে তুমি দেবীদর্শন করে এসো, তারপর আমরা যাব।

তার কারণও ছিল। গুপ্তঘাতকরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘাপটি মেরেছিল মন্দিরের মধ্যে।

পুত্রক ঢুকল মন্দিরে। তৎক্ষণাৎ রে-রে করে অস্ত্র নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল পুত্রকের ওপর।

নির্ভীক পুত্রক বললে, কে তোমরা? অট্টহেসে গুপ্তঘাতকরা বললে, আমরা মানুষের মুণ্ড গড়িয়ে দিই। আমরা ঘাতক। আপনার বাবা আর কাকা আমাদের পাঠিয়েছে।

পুত্রক বললে, খুব ভালো। কিন্তু তোমরা তো এসেছ টাকা পেয়েছ বলে। আরও পাবে আমাকে না খুন করলে।

শুনে তো মহাখুশি মানুষখুনি ডাকাতরা। তাদের দরকার আরও টাকা। সুতরাং...

পুত্রক গা থেকে খুলে দিল দামি দামি অলঙ্কার। খুশিতে ডগমগ হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করল ডাকাতদল। যাবার সময়ে পুত্রকের বাবা আর কাকাদের বলে গেল, কাজ হাসিল।

অর্থাৎ, পুত্রক খতম। আনন্দে নেচে উঠেছিল পুত্রকের পিতা আর দুই পিতৃব্য। এত আনন্দ যে মন্দিরে ঢুকে কাটামুণ্ড দেখবারও সময় দিল না। দৌড়োল রাজধানীর দিকে।

পুত্রক কিন্তু ফিরেছিল তাদের আগেই। মন্দিরের ঘটনা জানিয়ে দিয়েছিল মন্ত্রীদের।

ফলে, পুত্রকের বাবা আর দুই কাকার কাটা মুণ্ডু গড়িয়ে গেল রাস্তাতেই!

রাজদ্রোহের শাস্তি, দেখুক সবাই!

রাজ্য নিষ্কন্টক। কিন্তু এইসব দেখেশুনে সংসার আর ভালো লাগল না পুত্রকের। এরই নাম বৈরাগ্য। একা চলে গেল বিন্ধ্যাচলে। রইল একটা নির্জন জায়গায়।

সেখানেও ঘটল রোমাঞ্চকর এক ঘটনা। হঠাৎ একদিন ভীম-চেহারার দুটো দানব হাতাহাতি করতে করতে হাজির সেই নির্জন অঞ্চলে।

পুত্রক তো অবাক। জিজ্ঞেস করেছিল, কে তোমরা মারামারি করছ কেন?

আমরা ময়দানবের ছেলে। আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তির মধ্যে আছে শুধু তিনটে জিনিস। একটা খাবার থালা, একটা লাঠি আর এই একজোড়া জুতো। লড়াইতে যে ভাই জিতবে, সে পাবে এই সম্পত্তি।

দুই দানবের এই কথা শুনে হাসতে হাসতে বললে পুত্রক, কী আশ্চর্য! সামান্য এই জিনিসের জন্যে এমন বাহুযুদ্ধ?

সামান্য জিনিস? মোটেই নয়। অনেক গুণ আছে এই তিনটে জিনিসের।

কী গুণ?

এই যে জুতো জোড়া, পায়ে গলিয়ে শূন্যপথে যেখানে খুশি যাওয়া যায়। আর এই লাঠি দিয়ে একবার যা লেখা হয়, সঙ্গে সঙ্গে তা সত্যি হয়ে যায়। আর এই খাবার থালা হাতে নিয়ে যে খাবার চাওয়া হবে, সঙ্গে সঙ্গে তা থালায় চলে আসবে!

পুত্রক তো অবাক। ময়দানবের থালা লাঠি আর জুতোর এত গুণ! অদ্ভুত!

তিনটে গুণ যাচাই করা দরকার। কিন্তু দুই দানবের সামনে তা সম্ভব নয়।

তাই মিষ্টি করে বললে দানব দু'জনকে, তোমরা এক কাজ করো। দু'জনে টেনে দৌড়োও। যে জিতবে, সে পাবে এই ময়দানবের থালা, জুতো আর লাঠি।

বোকা দানব দু'জন রফার চুক্তি শুনে মহা খুশি। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়োল উর্ধ্বশ্বাসে। দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল দূর হতে দূরে।

সুবর্ণ সুযোগ। পায়ে জুতো গলিয়ে নিল পুত্রক। হাতে নিল লাঠি আর থালা।

জুতোর দৌলতে নিমেষে উঠে গেল শূন্যে, উড়ে গেল দেশ-দেশান্তরের ওপর দিয়ে।

হঠাৎ চোখ আটকে গেল পায়ের নীচে একটা ভারী সুন্দর শহর দেখে। অতি মনোরম পুরী।

সাঁ করে আকাশ থেকে নেমে এল সেখানে। মাথায় চিন্তাঘনিয়ে এল তার পরেই। কার বাড়িতে এখন ওঠা যায়?

বারবনিতাদের বাড়িতে অবশ্যই নয়। তারা তো পুত্রকের বাবা-কাকার মতো ঠগবাজ! ছলনা-কলায় পটীয়সী!

বণিকদের বাড়িতে? কক্ষনো নয়। জাতটাই টাকার লোভী। টাকার জন্যে সব করতে পারে।

তাহলে যাওয়া যায় কোথায়?

কিছু দূরে দেখা যাচ্ছিল একটা জীর্ণ কুঁড়েঘর। পায়ে পায়ে পুত্রক পৌঁছলো সেখানে। বেরিয়ে এল এক বুড়ি। এই কুঁড়ে তার।

পুত্রক ঠিক করল টাকাপয়সা দিয়ে এই বুড়ির আশ্রয়ে গোপনে কিছুদিন থাকা যাক।

হলও তাই। টাকা পেয়ে খুব খুশি বুড়ি। পুত্রক লুকিয়ে রইল তার ঘরে।

বেশ কয়েকদিন পর বুড়ি বললে, হ্যাঁগো বাছা, তোমাকে দেখে তো রাজার ছেলে অথবা খোদ রাজা বলেই মনে হয়। কী রূপ! কী রূপ! বিয়ে-টিয়েও করেছ বলে মনে হয় না। এক কাজ করো না। আমাদের রাজার মেয়েটি পরমাসুন্দরী। তার নাম পাটলী। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। তোমার সঙ্গে মানাবে ভালো।

বিয়ের কথায় কার মন না চঞ্চল হয়। পুত্রকের তো হবেই। সে-ও তো কন্দর্পের মতো সুপুরুষ। রাজকন্যার রূপ দেখবার জন্যে মন কেমন-কেমন করায় ঠিক করল, দেরি কেন? আজ রাতেই যাওয়া যাক। রূপবতীকে দেখা যাক।

রাত্রে জুতো পায়ে চক্ষের নিমেষে পুত্রক হাজির হল এক্কেবারে রাজ অন্তঃপুরে।

তখন রাত বেশ গভীর। ঘুমোচ্ছে সব্বাই। এমনকি পাখিরাও সাড়াশব্দ করছে না রাজার বাগানে। রাজভবন নিস্তব্ধ। পুত্রকের ভয়ডর নেই। জানলা গলে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। চোখ গেল পাশের ঘরে। কে যেন শুয়ে রয়েছে সেই ঘরে। রূপের প্রভায় ঘর আলো হয়ে রয়েছে।

নিশ্চয় সেই অপরূপা রাজকুমারী।

পা টিপে টিপে ঢুকল সেই ঘরে।

তারপর? রাজকন্যার ঘুম ভাঙাবে কী করে? আলাপ-সালাপই বা হবে কী করে?

ঠিক এই সময়ে শোনা গেল অন্তঃপুরের প্রহরীদের গান। একটু দূরেই তারা যে-গান গাইছে, তার মানে অতি সরল।

এই দুনিয়ায় সেই যুবকই প্রকৃত সুখী, যে ঘুমে অসাড় যুবতীর ঘুম ভাঙিয়ে দেয় নিবিড় আলিঙ্গন করে!

পুত্রক যখন গল্প করার পথ খুঁজে পাচ্ছে না, ঠিক তখনই স্বয়ং বিধাতা যেন উপায় বাতলে দিলেন প্রহরীদের সঙ্গীতের কথায়!

আর কি ধৈর্য রাখা যায়?

রাজকন্যাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করল পুত্রক।

ঘুম ভেঙে গেল রাজনন্দিনীর।

শুরু হল আলাপ-পরিচয়। প্রেমের দেবতা অলক্ষ্যে ছিলেন। তিনি গভীর অনুরাগের সঞ্চার ঘটালেন সুন্দর আর সুন্দরীর মনের মধ্যে।

মদনের সম্মোহন বান কখনও বৃথা যায় না। আর এক মুহূর্তও বিলম্ব সইল না। সেই মুহূর্তেই গান্ধর্ব মতে মালাবদল করে বিয়ে হয়ে গেল দুজনের।

উথলে উঠল প্রেম-প্রীতি, আদর-সোহাগ, পরিশেষে দেহ মিলন। বিয়ের পরে যা হয়।

কিন্তু রাতকে তো আর টেনে বাড়ানো যায় না। ভোরের আলো ফুটতেই অতিকষ্টে রাজনন্দিনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, পায়ে আজব জুতো গলিয়ে শূন্য পথে বুড়ির ঘরে ফিরে এল পুত্রক।

অঘটন ঘটাতে মোহ খুব পটু। মোহের মহিমায় মানুষ অসম্ভব কাজ করতে পিছপা হয় না। পুত্রক যুবতী স্ত্রীর আকর্ষণে আর জুতো-রত্নের দৌলতে প্রতি রাতে অন্তঃপুরে হানা দিয়ে গেল এরপর থেকেই। রজনীর একটা মাদকতা আছে। রমণী সান্নিধ্য তখনই মনোরম। পুত্রক সম্ভোগসুখে মেতে রইল রাতের পর রাত। ঊষার আগমনেই ফিরে আসত বুড়ির কুঁড়ে ঘরে।

এইভাবে গেল অনেকগুলো দিন। রাতের অন্ধকারে কামের নিবারণ ঘটিয়ে গেলেও বেশিদিন তা গোপনে রাখা গেল না। কাপড় দিয়ে কি আগুন চাপা দিয়ে রাখা যায়? গুপ্ত প্রণয়লীলাও গুপ্ত থাকে না বেশিদিন।

রাজকুমারীর অঙ্গক্ষত আর রতিক্লান্তি দেখে সন্দেহ হয়েছিল রাজরক্ষীদের। এ যে পুরুষসংসর্গের সুস্পষ্ট চিহ্ন!

নিশুতি রাতে অন্দরমহলে পুরুষ আসছে কী করে?

ভ্যাবাচাকা খেয়ে ব্যাপারটা রাজার গোচরে আনল প্রহরীরা। যুবতী কন্যার অঙ্গে রমণ-চিহ্ন দেখে রাজা নিজেও খুব বিরক্ত হলেন।

অনেক ভেবেচিন্তে একজন বিশ্বাসী স্ত্রীলোককে পাহারায় রাখলেন অন্তঃপুরে।

সূর্য ডুবল। সন্ধ্যা এল। রাতের অন্ধকারে দিগবিদিক ঢেকে গেল। আশ্চর্য জুতো পায়ে গলিয়ে পুত্রক উড়ে এল অন্তঃপুরে।

দেখল সেই স্ত্রীলোক, যে ছিল লুকিয়ে, রাজকন্যার শোবার ঘরে, রাজকন্যা তা জানত না।

শুরু হল প্রেমালাপ। চরমানন্দ। ক্লান্তি। ঘুম। একই শয্যায় পরস্পরকে জড়িয়ে।

তখন পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এল সেই স্ত্রীলোক। সঙ্গে এনেছিল লাল লাক্ষারস। পুত্রকের বস্ত্রের এক প্রান্ত রাঙিয়ে দিল আলতায়, অতঃপর প্রস্থান।

ভোর হতেই পাদুকা-বিমানের দৌলতে বুড়ির কুটিরে ফিরে গেল পুত্রক।

এদিকে হুলুস্থুল শুরু হয়েছে রাজপ্রাসাদে। রাজার লোকজন ছুটেছে দিকে দিকে। চোর ধরার সূত্র একটাই, যার কাপড়ের কোণ রাঙিয়ে আছে আলতায়।

কাজেই ধরা পড়ল পুত্রক। টেনে আনা হল তাকে রাজার সামনে। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন রাজামশায়। মেয়েকে যে নষ্ট করেছে, কঠোর সাজা দেবেন তাকে।

পুত্রক কিন্তু নির্ভীক।

আচমকা রাজার সামনে থেকেই উঠে পড়ল শূন্যে, জুতোর জাদুবিদ্যায়, চম্পট দিল শূন্যপথেই!

একী অদ্ভুত কাণ্ড! শুধু রাজা কেন, রাজসভার প্রত্যেকেরই চোখ কপালে উঠে গেল আশ্চর্য সেই ব্যাপার দেখে! পুতুলের মতো রইলেন বসে।

সেই ফাঁকে পুত্রক চলে এল রাজকন্যার কাছে, অন্তঃপুরে। গুপ্তপ্রণয় যখন ফাঁস হয়ে গেছে, আর তো এখানে থাকা চলবে না।

সুতরাং পাটলীকে কোলে নিয়ে উঠে পড়ল আকাশে, পায়ে জাদু-জুতো তো রয়েছে! সাঁ-সাঁ করে চলে এল গঙ্গার তীরে। জাদু-থালাকে হুকুম দিয়ে ভালোভালো খাবার আনিয়ে পেট ঠেসে খেয়ে নিয়ে, কী করল?

জাদু-লাঠি দিয়ে গঙ্গার মাটিতে হুকুমনামা লেখা শুরু হল। লিখনের মর্ম খুব সোজা এবং সিধে :

আজ থেকে এই দেশ আসুক আমার অধীনে। সৈন্যসামন্ত, ধনরত্ন সমেত। বিশাল এই প্রদেশের নাম হোক পাটলীপুত্র।

সেই থেকে সেই দেশের নাম হল পাটলীপুত্র, নিজের আর ভার্যার নামে লক্ষ্মী-সরস্বতীর নিবাস। কাহিনি শেষ করলেন বররুচি। বললেন, আমরা অবাক হয়ে সেই ইতিহাস শুনলাম গুরুদেব বর্ষের মুখে।

৪. যোগানন্দের উপাখ্যান

এরপরেই আসল কথা বলতে শুরু করলেন বররুচি, শ্রোতা কাণভূতিকে।

গুরুর কাছে থেকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সব বিদ্যে শিখে নিলাম। একদিন পথে বেরিয়ে দেখলাম এক ভুবনমোহিনী কামিনীকে, ওরকম রূপ আর লাবণ্য কখনও দেখিনি।

আমার সঙ্গে ছিল ইন্দ্রদত্ত। আমার কৌতূহল দেখে বললে, ও হচ্ছে উপবর্ষের মেয়ে, উপকোশা।

উপকোশা সুন্দরী সখীদের নিয়ে যেতে যেতে আমাকে দেখেছিল। উপর্যুপরি প্রেম-কটাক্ষ বর্ষণ করে যাচ্ছিল আমাকে নিশানা করে।

আমি স্থির থাকতে পারিনি। সেই দণ্ডেই আমার মন চুরি গেছিল। মনচোর মোহিনী হেলেদুলে রূপের বিদ্যুতের রাস্তা আলো করে ফিরে গেছিল স্বগৃহে।

আমার হল বিপদ। রাত্রে আর ঘুমোতে পারি না। অসামান্য রূপলাবণ্যবতী সেই বিদ্যুৎবরণী ফিরে ফিরে আসতে লাগল আমার মনের চোখে। সংক্ষেপে, আমি চোখ বুঁজে আর চোখ চেয়েও তার ধ্যান করে গেলাম।

ভোরের দিকে কাকঘুমে দেখলাম এক স্বপ্ন। শ্বেতবসনা এক নারী আমাকে বলেছেন, যার ধ্যান করছ, সে তো তোমারই আগের জন্মের স্ত্রী। তোমাকে দেখে তারও ঘুম ছুটে গেছে, অন্য কোনো পুরুষকে ভাবতে পারছে না, মন জুড়ে রয়েছ তুমি। সুতরাং উদ্বেগ পরিহার করো। তোমার ছটফটানি দেখে এই কথা বলে গেলাম। আমি সরস্বতী তোমার শরীরেই থাকি, তোমার মা।

ঘুম ভাঙতেই স্বপ্নকথা ভাবতে ভাবতে শান্ত হলাম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা গাছতলায় বসে রইলাম। এমন সময়ে উপকোশার এক সখী এসে বললে, মদন জ্বরে পড়েছে আমার সখী উপকোশা, আপনাকে দেখার পর থেকেই। অনঙ্গতাপে গা গরম অষ্টপ্রহর, মনে নেই শান্তি।

শুনেই অনঙ্গতাপে আক্রান্ত হলাম আমি নিজেও। দ্বিগুণ হল প্রেমানল।

বললাম, কিন্তু গুরুজনদের না জানিয়ে মিলিত হই কী করে? সেটা অন্যায়। সুনাম যাবে, দুর্নাম হবে। যাতে সব দিক বজায় থাকে, এ রকম একটা ব্যবস্থা করো।

উপকোশার দূতী সোজা চলে গেল উপকোশার মায়ের কাছে। সব শুনে, তিনি চলে গেলেন তাঁর স্বামীর কাছে। কন্যার বাসনা শুনে পিতা তা জানালেন ভাই বর্ষকে। তিনি মত দিলেন বিয়েতে।

আমার মাকে আনা হল কৌশম্বী নগর থেকে। বিয়ে হয়ে গেল উপকোশার সঙ্গে। মাকে নিয়ে রইলাম সেখানে।

গুরুদেব বর্ষের কাছে অনেক শিষ্য আসতেন। একদিন এলেন পাণিনি নামে এক ডাহাবোকা। বিদ্যে তাঁর কপালে নেই, শত চেষ্টাতেও। তাই মন দিলেন গুরুপত্নীর সেবায়।

খুশি হয়ে গুরুপত্নী একদিন তাকে বললেন বৎস, তুমি হিমাচলে যাও। শঙ্করের আরাধনা করো। সব বিদ্যা পাবে।

তাই করেছিলেন পাণিনি। কঠোর তপস্যায় মহাদেবের মন নরম করে নতুন ব্যাকরণ শিখেছিলেন, যা কিনা সব বিদ্যার দরজা।

ফিরে এসেই আমার সঙ্গে বিদ্যা-যুদ্ধে নামলেন। আট দিনের দিন তাঁকে হারিয়ে দিলাম। হারিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে শোনা গেল ভগবান শঙ্করের হুঙ্কার। পাণিনির পরাজয়ে ক্ষিপ্ত হয়েছেন। মহাদেবের রোষ

যে কি বস্তু, তা আমার অজানা নয়। ফলে, ভয়ের চোটে আমার সব গুলিয়ে গেল। মুখস্থ ঐন্দ্রব্যাকরণ তালগোল পাকিয়ে গেল, কিছুই আর মনে করতে পারলাম না। হেরে গেলাম পাণিনির কাছে।

খুব ব্যথা পেলাম মনে। ঠিক করলাম শঙ্করের আরাধনা করব, সংসার চালানোর উপযুক্ত কিছু টাকাপয়সা রাখলাম এক বণিকের কাছে। তার নাম হিরণ্য গুপ্ত। উপকোশাকে সব খুলে বললাম। চলে গেলাম হিমাচলে।

বসন্ত ঋতু যত অঘটনের ঘটক। এই ঋতু আসতেই একদিন গঙ্গায় স্নান করতে গেছিল উপকোশা। একটু দেরি করে ফেলেছিল। সন্ধ্যে নাগাদ যখন বাড়ি ফিরছে, তখন ওর সদ্যস্নাতা রূপ দেখে কামার্ত হয়ে পড়ে রাজমন্ত্রী, রাজপুরোহিত আর প্রধান বিচারপতি।

সৌন্দর্য এমনই জিনিস। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। সুন্দর মুখের বিপদও অনিবার্য।

প্রথমে এলেন রাজমন্ত্রী। রাস্তাতেই বলে বসলেন উপকোশাকে, হে সুন্দরী, আমি মুগ্ধ। আমার তাপ নিবারণ করো।

উপকোশা প্রকৃতই পতিব্রতা। সে রোজ গঙ্গায় যেত আমার মঙ্গলের জন্যে, নানান ব্রত অনুষ্ঠানের জন্যে। কিন্তু এরকম বিপদে পড়তে হবে, ভাবেনি।
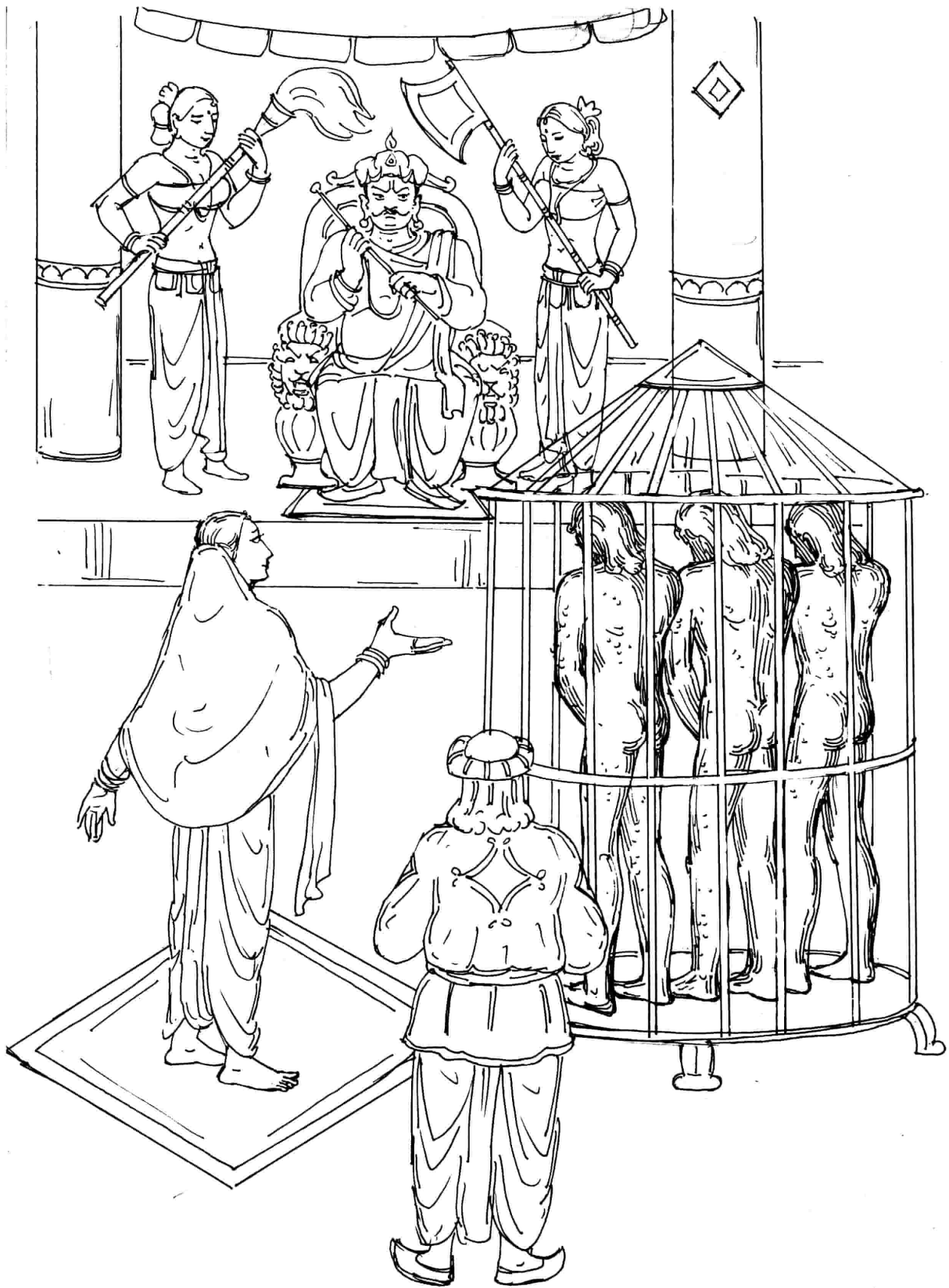
উপকোশা উচ্চৈস্বরে বললে, আপনারা যা জানেন, তা বলুন।

ঘাবড়েও যায়নি, মিষ্টি হেসে বলেছিল, আমি রাজি। কিন্তু আমি যে সধবা। স্বামী আছেন বিদেশে। রাস্তায় কি এসব কথা সম্ভব? কেলেঙ্কারি ছড়াবে। দুজনেরই। আপনি এক কাজ করুন। বসন্ত উৎসব সামনেই। প্রথম রাতের প্রথম প্রহরে চলে আসুন আমার বাড়ি। উৎসবে মত্ত থাকবে সকলেই, কারও চোখে পড়বে না।

কাজ হাসিল হতে চলেছে জেনে সরে পড়লেন রাজমন্ত্রী।

কিন্তু একটু যেতে না যেতেই পথ আটকালেন রাজপুরোহিত। তাঁরও বাসনা একই। উপকোশা তাঁকেও নিবৃত্ত করল কৌশলে। ইসারায় জানিয়ে দিল, রাতের দ্বিতীয় প্রহরে আসা হোক।

তারপরেই পড়ল প্রধান বিচারপতির খপ্পরে। তাকে বললে, রজনীর তৃতীয় প্রহবে আসতে। তিন-তিনটে চরিত্রহীনের খপ্পর এড়িয়ে, আত্মসম্মান বাঁচিয়ে বাড়ি এল উপকোশা। মনের কষ্ট চেপে না রাখতে পেরে খুলে বললে সখীদের। সতীর কাছে পতির চেয়ে কাম্য কেউ নয়। না ঘুমিয়ে কাটাল সেই রাত।

পরের দিন বণিক হিরণ্য গুপ্তের কাছে দাসী পাঠিয়ে কিছু টাকাপয়সা চেয়েছিল উপকোশা, দান করার জন্যে।

বণিক সটান চলে এল উপকোশার কাছে সন্ধ্যে ঘনাতেই।

উপকোশা তখন একা রয়েছে। সোজাসুজি বললে বণিক, হে অপরূপা, তোমার স্বামীর টাকা নিশ্চয় তোমাকে দেব, কিন্তু তার আগে আমার অভিলাষ পূর্ণ করতে হবে। তোমাকে আমার চাই।

উপকোশা ভয়ানক আঘাত পেয়েছিল মনে। কিন্তু বুদ্ধিমতী বলেই বাইরে তা প্রকাশ করেনি।

শুধু হেসেছিল। সংকেতে জানিয়েছিল, আসা হোক রাতের চতুর্থ প্রহরে।

চার প্রহরে আসবে চার পরপুরুষ, উপকোশারই সাদর আমন্ত্রণে।

উপকোশা কিন্তু বিচলিত হয়নি। সখীদের হুকুম দিয়ে চারটে কাপড়ে বেশ করে সুগন্ধি তেল মাখিয়ে, কালো কাজল দিয়ে কালো করে রেখেছিল। আর বানিয়েছিল একটা মজবুত খাঁচা। লোহার খাঁচা। এমন খাঁচা যার বাইরে আগল পড়লে ভেতর থেকে খোলা যাবে না।

রাতের প্রথম প্রহরে সেজেগুজে এলেন রাজমন্ত্রী। তাঁকে দেখেই হেসে গড়িয়ে পড়ে উপকোশা বললে, আমাকে ছুঁতে হলে কিন্তু আগে আপনার শরীর শুদ্ধ করতে হবে। যান সখীদের সঙ্গে, ওরা আপনাকে পরিষ্কার করে দেবে।

মেয়েদের হাতে গা পরিষ্কার করতে কে না চায়। আনন্দে ডগমগ হয়ে রাজমন্ত্রী গেলেন সখীদের সঙ্গে, অন্তঃপুরের এক অন্ধকার ঘরে। সেখানে আগে তাঁকে দিগম্বর করা হল। তারপর কাজল দিয়ে কালো করা কাপড় ঘষা হল সারা গায়ে। সবশেষে খুব যত্ন করে সখীরা তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সুগন্ধি তেল মিশানো কাজল ঘষে ঘষে মাখিয়ে দিল।

এ সবই হল উপকোশার উপস্থিতিতে, কিন্তু নিকষ অন্ধকারে। তেল মাখাতে মাখাতেই কেটে গেল রাতের প্রথম প্রহর। দ্বিতীয় প্রহরে হাজির হলেন কামনাজর্জর রাজপুরোহিত। উপকোশাকে সে খবর এনে দিল এক সখী। শুনেই মহাব্যস্ত হয়ে সে বললে রাজমন্ত্রীকে, কি মুশকিল! রাজপুরোহিত যে আমার স্বামীর বন্ধু! এমন রাতে হঠাৎ কেন এলেন, জেনে আসি। আপনি ততক্ষণ লুকিয়ে থাকুন এই পেটিকার মধ্যে।

এই বলে, উলঙ্গ রাজমন্ত্রীকে লোহার খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে, বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল।

একই ঘটনা ঘটানো হল রাজপুরোহিতের ক্ষেত্রে। তৃতীয় প্রহরে প্রধান বিচারপতি আসতেই হুটোপাটি করে একই অছিলায় একই অবস্থায় তাঁকেও ঢোকানো হল খাঁচায়। তিনজনেই নিশ্চুপ হয়ে রইলেন গাঢ় অন্ধকারে। লজ্জায় কোনো কথা বলতে পারলেন না।

চতুর্থ প্রহরে এল বণিক মহাশয়। খুব খাতির করে তাকে অন্ধকার ঘরে নিয়ে এসে একটা প্রদীপ জ্বেলে দিল উপকোশা।

বললে মধুর হেসে, আমার স্বামী আপনার কাছে যে টাকাপয়সা রেখে গেছে, এবার তা দিন।

ধূর্ত বণিক দেখতে পায়নি ঘরের এককোণের অন্ধকারে লোহার খাঁচায় বন্দি রয়েছে তিন-তিনটে কালো ভূতের মতো উলঙ্গ মানুষ। দেখলেও তাদের চিনতে পারত না।

উপকোশার কথার জবাবটা দিল তাই তেড়েমেড়ে, কী আশ্চর্য! আগেই তো বলেছি, তোমাকে ভোগ করতে দাও, তারপর তোমার টাকাপয়সা নাও।

তৎক্ষণাৎ অন্ধকার কোণে রাখা লৌহ-পেটিকার দিকে মুখ ফিরিয়ে উপকোশা বললে, দেবগণ, বণিক হিরণ্য গুপ্তের কথার সাক্ষী রইলেন আপনারা।

সেই তিন দেব যে রাজার মন্ত্রী, পুরোহিত আর বিচারপতি, তা চিনতে পারল না বণিক। তিনজনেই মাথা হেঁট করে রয়েছে। মুখে কথা নেই। লজ্জায় জড়োসড়ো। কালো কুচকুচে।

মহাসমাদরে বণিককে নিয়ে যাওয়া হল অন্তঃপুরে। সেখানে রইল না কোনো দীপ। অন্ধকারে বেশ করে কাজল আর সুগন্ধি কাজলা তেল ঘষা হল গায়ে। বলা বাহুল্য উলঙ্গ অবস্থায়। চতুর্থ প্রহর শেষ হল এইভাবেই। ভোর হতেই তাকে গলাধাক্কা দিয়ে মেয়েরা বের করে দিলে রাস্তায়।

লজ্জায় মুখ লুকিয়ে কোনো রকমে বাড়ি ফিরল বণিক।

সকালে উপকোশা গেল মহারাজ নন্দের কাছে, সখীদের নিয়ে।

বললে, আমার স্বামী বিদেশ যাওয়ার সময়ে বেশকিছু অর্থ বণিক হিরণ্য গুপ্তের কাছে গচ্ছিত রেখে গেছিলেন। সেই টাকা এখন আমার দরকার। উনি দিচ্ছেন না।

রাজার হুকুমে বণিক এল রাজসভায়। বললে, কাঁচা মিথ্যে, সেকী! ওঁর স্বামী তো আমার কাছে কিচ্ছু রেখে যাননি!

উপকোশা বললে, মহারাজ, টাকা যে ওঁর কাছে আছে, তার সাক্ষী রয়েছেন আমার তিন গৃহদেবতা, বিদেশ যাওয়ার সময়ে আমার স্বামী তাঁদেরকে লোহার পেটিকায় রেখে গেছেন বাড়িতে। আপনি হুকুম দিন পেটিকা আনা হোক রাজসভায়, সত্য প্রকাশ পাবে।

বাহকরা নিয়ে এল লৌহ-মঞ্জুষা। ভেতরে কালো কুচকুচে তিন মানব, অধোবদন।

উপকোশা উচ্চৈস্বরে বললে, আপনারা যা জানেন, তা বলুন। মিথ্যে বললে, মঞ্জুষা সমেত জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব, অথবা, জ্যান্ত টেনে বের করব।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে তিন দুরাচার, মহারাজ, উপকোশার কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি। ধন গচ্ছিত আছে বণিকের কাছে, স্বীকার করেছে আমাদের সামনে।

বণিক সমস্ত টাকা ফিরিয়ে দিল উপকোশাকে।

তারপরেই রাজা হুকুম দিলেন, এবার খোলা হোক খাঁচার দরজা। দেখতে চাই ভেতরের তিন মূর্তিকে।

দরজা ভেঙে বের করা হল প্রেতমূর্তির মতো তিন মান্যবরকে।

হাসির হররা ছুটল রাজসভায়। উপকোশা খুলে বলল সব কথা। তার বুদ্ধি দেখে অবাক হলেন রাজা। বললেন, আজ থেকে তুমি আমার বোন। কোষাগার থেকে যতখুশি ধনরত্ন নিয়ে যাও। নির্বিঘ্নে বাড়িতে থাক।

প্রহরীদের হুকুম দিলেন, পরের বউয়ের ওপর লোভ দেখিয়েছে যে চার নরাধম, তাদের সব টাকা পয়সা কেড়ে নিয়ে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দাও।

শেষ হল অত্যাশ্চর্য সতী-কাহিনি। খুশি হলেন বর্ষ, উপবর্ষ আর শহরের মানুষ।

বররুচি বললেন, ইতিমধ্যে আমার আরাধনায় খুশি হলেন মহাদেব। বর দিলেন, পাণিনি যে নতুন ব্যাকরণ পেয়েছে, তুমি সেই ব্যাকরণেরই প্রচার করো।

আমি রাজি হলাম। বাড়ি ফিরলাম। উপকোশার কাহিনি শুনলাম।

গুরুদেব বর্ষকে গুরুদক্ষিণা দিতে চেয়েছিলাম। উনি নিতে চাননি। পীড়াপীড়ি করায় রেগে গেলেন। বললেন, তাহলে দাও এক কোটি সোনার টাকা।

ব্যাড়ি আর ইন্দ্রদত্ত বুদ্ধি দিল আমাকে, তোমার বউকে রাজা যখন বোন বলেছেন, তখন তুমি তাঁর শ্যালক। কোটি মুদ্রা চাও তার কাছে।

গেলাম অযোধ্যা নগরে মহারাজ নন্দের শিবিরে। শুনলাম, তিনি মারা গেছেন।

ইন্দ্রদত্ত যোগবলে অন্যের শরীরে প্রবেশ করার বিদ্যে জানত। ও বললে, এক কাজ করা যাক। একটা ফাঁকা মন্দিরে যাই। আমার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে রাজবাড়িতে রাজার দেহে ঢুকে যাব। যেই উনি উঠে বসবেন, বররুচি চাইবে এক কোটি সোনার টাকা, আমিই ওঁর শরীরের ভেতরে থেকে হুকুম দেব। দেওয়া হোক সেই টাকা। ব্যাড়ি থাকুক মন্দিরে, আমার শূন্য শরীর আগলাক।

তাই হয়েছিল। আগে ইন্দ্রদত্ত গিয়ে রাজার শরীরে ঢুকে উঠে বসল। তারপরেই আমি গিয়ে কোটি মোহর চাইলাম। রাজার মুখদিয়ে ইন্দ্রদত্ত মন্ত্রীকে হুকুম দিল, এখুনি দেওয়া হোক।

কিন্তু সন্দেহ হয়েছিল মন্ত্রীর। মড়া উঠে বসতে না বসতেই প্রার্থী এসে চাইছে কোটি মোহর!

নিশ্চয়ই কেউ ঢুকেছে মড়ায়!

কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান পুরুষ। চকিতে ভেবে নিলেন, রাজপুত্র এখন নেহাতই ছেলেমানুষ। রাজা মারা গেছেন শুনলে ভেঙে পড়বে। তার চাইতে বরং নকল রাজাকে ধরে রাখা যাক। লোক পাঠালেন দিকে দিকে। যেখানে দেখবে প্রাণহীন পুরুষ দেহ, সঙ্গে সঙ্গে তা পুড়িয়ে ফেলো। ফলে ব্যাড়ি বাধা দিয়েও আমার শবদাহ বন্ধ করতে পারল না। যদিও তা শব নয়, সাময়িক ভাবে প্রাণহীন দেহ। কিন্তু অত কে বোঝে? ছাই হয়ে গেল আসল দেহ।

এদিকে ব্যাড়ি হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে এসেছে রাজসভায়।

তার কথায় কান না দিয়ে মন্ত্রী এককোটি সোনার টাকা দিয়ে দিল আমাকে।

একদিন রাজারূপী ইন্দ্রদত্ত গোপনে ব্যাড়িকে ডেকে বললেন, এ তো মহা মুশকিলে পড়লাম। ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মে শূদ্র হয়ে থাকতে হবে!

ব্যাড়ি বললে, তুমি সাবধান। মন্ত্রী যখন জেনে ফেলেছে তুমি আসল রাজা নও, তখন তোমাকে মেরে ফেলে যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে বসাবেন। তুমি তার আগেই ওকে তাড়িয়ে বররুচিকে মন্ত্রী করে নাও।

ব্যাড়ি তো কোটি মোহর নিয়ে চলে গেল গুরুকে দক্ষিণা দিতে। রাজারূপী ইন্দ্রদত্তও আমাকে মন্ত্রী করে নিল। আমি তখন জবর বুদ্ধি দিলাম। আগের মন্ত্রী বেশি জেনে ফেলেছে। তার মুখ বন্ধ করা হোক। ছেলেদের নিয়ে জেলখানায় থাকুক। রোজ এক গেলাস ছাতু আর জল পাবে। দুদিনেই সব পটল তুলবে।

তাই হল। শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

জেলখানায় গিয়ে কিন্তু মন্ত্রীর ছেলেরা নিজেরা ছাতু-জল না খেয়ে বাপকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখল বদলা নেওয়ার জন্যে। না খেয়ে মারা গেল নিজেরা। ব্যাড়ি কিন্তু গুরুদক্ষিণা দিয়েই ফিরে এল রাজারূপী ইন্দ্রদত্তর কাছে। বললে, আমি চললাম। বাকি জীবনটা নির্জনে তপস্যা করব। শরীর, সংসার আর ঐশ্বর্য চিরকাল থাকে না।

সে চলে গেল। সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাজারূপী ইন্দ্রদত্ত চলে এল পাটলীপুত্রে। আমিও গেলাম সেখানে, গৃহিণী উপকোশার কাছে।

৫. যোগানন্দরূপী ইন্দ্রদত্ত-র নিধন কাহিনি

হঠাৎ বড়োলোক হয়ে গেলে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না।

রাজা যোগানন্দরূপী ইন্দ্রদত্ত-র হল সেই অবস্থা, সুন্দরী সাহচর্য আর ঐশ্বর্যমদ, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি।

আমি ভেবে দেখলাম, মন্ত্রী শকটারকে জেলখানা থেকে মুক্তি দেওয়া যাক। দুজনে মিলে রাজকাজ ভালোভাবে দেখতে পারব। রাজার দুর্বুদ্ধি আর বিলাসমত্ততা বন্ধ করা যাবে।

শকটার রাজার অনিষ্ট করতে পারবে না, আমি যদি হাজির থাকি।

কায়দা করে রাজার অনুমতি নিয়ে মন্ত্রী শকটার-কে বের করে আনলাম শ্রীঘর থেকে।

যোগানন্দরূপী ইন্দ্রদত্ত-র মন তো নরম। মন্ত্রী শকটারের মুমূর্ষু আকৃতি দেখে গলে গেল। আবার আগের কর্তৃত্বে নিয়ে গেল তাকে। শকটার কিন্তু মনে মনে জিঘাংসাকে জিইয়ে রাখল। প্রতিহিংসা সে নেবেই, ছলে বলে কৌশলে। বাইরে কিন্তু মিনমিনে ভিজে বেড়াল হয়ে থাকায় কেউ বুঝতেও পারল না ভেতরে ভেতরে সে কি প্যাঁচ আঁটছে।

এই সময়ে একদিন রাজা যোগানন্দরূপী ইন্দ্রদত্ত গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখল একটা অদ্ভূত দৃশ্য।

জল থেকে উঠে রয়েছে পাঁচ আঙুল ওয়ালা একটা হাত!

আমাকে ডেকে হাতটা দেখিয়ে জানতে চাইল কী এর অর্থ?

আমি নিজের দুটো আঙুল তুলে ধরলাম জলের পাঁচ আঙুলের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে হাত হল উধাও।

রাজা অবাক, চেপে ধরল আমাকে, মানে কী এ সবের?

বুঝিয়ে দিলাম মানে। পাঁচ আঙুল দেখিয়ে হাত জানতে চেয়েছে, পাঁচজনে মিলে কেউ কোনো কাজ করতে পারে কি এই দুনিয়ায়?

আমি দু-আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলাম দুই মাথা যদি এক হয়, তাহলে অসাধ্য সাধনও করা যায়।

রাজা খুব খুশি। কিন্তু মুষড়ে গেল শকটার মন্ত্রী আমার বুদ্ধিমত্তা দেখে।

এর কিছুদিন পরে রাজা দেখল জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এক ভিখিরি ব্রাহ্মণের সঙ্গে কথা বলছে রাজরাণি।

রেগে লাল রাজা তক্ষুনি ভিখিরির প্রাণ নেওয়ার হুকুমজারি করে বসল।

ঘাতক তাকে টেনে নিয়ে গেল বধ্যভূমিতে।

রাজা নিজেও গেল ভিখিরি নিধন দেখতে। যেতে যেতে দেখল এক আশ্চর্য দৃশ্য। মাছের দোকানে হাসছে একটা মরা মাছ!

এই দৃশ্য দেখবার পর ভিখিরি বধ করার ইচ্ছে মাথায় উঠেছিল রাজার। ফিরে এসেই ডেকে পাঠিয়েছিল আমাকে। জিজ্ঞেস করেছিল, মরা মাছ হাসে কেন?

আমি বলেছিলাম, জবাবটা দেব একটু ভেবেচিন্তে।

বলেই, চলে গেলাম এক নির্জন জায়গায়। সরস্বতীকে স্মরণ করলাম। তিনি এসে বললেন, মাছের হাসির কারণ যদি জানতে চাও, আজ রাতে এই তালগাছের পেছনে লুকিয়ে থেকো।

তাই করেছিলাম। গভীর রাতে দেখলাম, বিকট-দর্শন এক রাক্ষসী জনাকয়েক ব্রাহ্মণের ছেলেকে নিয়ে এল সেখানে। খিদের জ্বালায় তারা কাঁদছিল। রাক্ষসী বললে, ভোর হোক, বামুনের মাংস খেতে দেব। আজ তো তাকে মারা হল না।

কেন মারা হল না? ছেলেদের প্রশ্ন।

তাকে দেখে একটা মরা মাছ হেসেছিল বলে।

মরা মাছ কেন হাসল?

বিনা অপরাধে ব্রাহ্মণ বধ হচ্ছিল বলে। সে নাকি অন্তঃপুরের মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল। বোকা রাজা জানে না, অন্তঃপুরে মেয়েই নেই। পুরুষরা মেয়ে সেজে আছে।

বাড়ি ফিরলাম। সকাল হতেই রাজাকে বললাম, মরা মাছেরও হাসি পায় কেন।

রাজা তো রেগে টং। সঙ্গে সঙ্গে নিজে গিয়ে দেখেছিল, সত্যিই অন্তঃপুরে মেয়ে নেই, পুরুষরা মেয়ে সেজে আছে!

চৈতন্য হল রাজার। রেহাই দিল ভিখিরি ব্রাহ্মণকে।

এরপর ঘটল আর একটা ঘটনা। একজন নতুন ছবি-আঁকিয়ে রাজা আর রানির এমন একখানা ছবি এঁকে আনল যে দেখলেই মনে হবে জীবন্ত মানুষ। খুশি হয়ে রাজা সেই ছবি বাঁধিয়ে রাখল প্রাসাদের দেওয়ালে।

সেই ছবি আমার নজরে আসতেই মনে হল, রানির ছবি হুবহু রানির মতো হয়নি। কোথায় যেন একটা খুঁত রয়েছে।

খুঁতটা কোথায় তা ধরবার প্রতিভা আমার আছে। দেহ-লক্ষণ বিচার করলাম। ধরে ফেললাম।

রানির কোমরে একটা তিল-চিহ্ন এঁকে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেলাম।

রাজা প্রাসাদে ফিরে ছবির দিকে তাকাতেই দেখেছিল সেই তিল-চিহ্ন। ঠিক যেখানে থাকার কথা, সেখানেই আছে।

কে এঁকেছে এই তিল?

অন্তঃপুরের প্রহরীরা বললে আমার নাম।

শুনে যেন আকাশ ভেঙে পড়েছিল রাজার মাথায়। রানির গোপন অঞ্চলের এই তিলের খবর তো রাজা ছাড়া আর কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়!

নিশ্চয় আমি লুকিয়ে অন্তঃপুরে ঢুকি। মেয়েদের নষ্ট করি। তা নাহলে, জানলাম কী করে, অন্তঃপুরে পুরুষরা নারী সেজে আছে?

মন্ত্রী শকটারকে তলব করেছিল রাজা। হুকুম দিয়েছিল একটুও দেরি না করে যেন আমাকে প্রাণে মেরে দেওয়া হয়।

শকটার নির্বোধ নয়। সে জানত বররুচির দিব্য ক্ষমতা আছে। তাকে এত সহজে বধ করা যায় না। আমাকে ডেকে বললে, আপাতত আমার বাড়িতে লুকিয়ে থাকুন। আমি অন্য একজনকে কোতল করে রাজাকে ঠান্ডা করি।

তাই করেছিল মন্ত্রী শকটার।

আমি তখন তাকে বলেছিলাম, আপনার বুদ্ধির তারিফ করার সঙ্গে সঙ্গে বলে রাখি, ইচ্ছে করলেও আমার প্রাণ নিতে পারতেন না। কেউই তা পারবে না। আমি স্মরণ করলেই হাজির হবে এক রাক্ষস। সে আমার বন্ধু। ইচ্ছে করলে সে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত গিলে ফেলতে পারে। রাজা যোগানন্দ তো আসলে আমার বন্ধু। ওর নাম ইন্দ্রদত্ত। বন্ধুকে কি হত্যা করতে পারি?

মন্ত্রীর ইচ্ছে হয়েছিল রাক্ষস-দর্শনের। স্মরণ করতেই সে এসে এমন হাইমাউ চিৎকার জুড়েছিল যে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিদেয় করেছিলাম।

মন্ত্রী তখন জিজ্ঞেস করেছিল, এমন একটা ভয়ংকর নিশাচরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালেন কী করে?

আমি বললাম, আগে প্রতিরাতে এই নগরের একজন রক্ষী খুন হত। খুনি কে, তা জানবার ভার পড়েছিল আমার ওপর। আমি নিজেকে আড়ালে রেখে পাহারা দিতে দিতে একরাতে দেখলাম এক রাক্ষসকে। সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, বলতে পারো এই নগরে রূপসী মেয়ে কে? আমি হেসে বলেছিলাম, তুমি তো আচ্ছা বোকা। যার চোখে যে ভালো, কিবা সাদা কিবা কালো। যে মেয়েকে ভালোবাসা যায়, সেই তো সবচেয়ে সুন্দরী! ভালোবাসা কিছুর ধার ধারে না।

জবাবটা শুনে খুব খুশি হয়েছিল রাক্ষস। বলেছিল, হেরে গেলাম বটে, কিন্তু সত্যিকারের জ্ঞানী এক বন্ধু পেয়ে গেলাম। আজ থেকে তোমার মন চাইলেই আমি হাজির হব, যা বলবে তাই করে দেব।

শকটার ছাড়বার পাত্র নয়। বললে, এ ছাড়াও আপনার অন্য ক্ষমতা আছে। দিব্যক্ষমতা। দেখাবেন? নাছোড়বান্দা মন্ত্রীর নির্বন্ধে মা গঙ্গাকে স্মরণ করেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে উনি দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সেই থেকে শকটার আমার আজ্ঞাবহ হয়ে গেল। একদিন আমাকে বিষণ্ণবদনে একটা নিরালা জায়াগায় বসে থাকতে দেখে শকটার বললে, কেন মন খারাপ করছেন? রাজা একদিন নিজের ভুল বুঝতে পারবেন, অনুতপ্ত হবেন। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প বলি, শুনুন।

আগে এই নগরে আদিত্যবর্মা নামে এক রাজা ছিলেন। শিববর্মা ছিলেন তাঁর মন্ত্রী। খুব বুদ্ধিমান মন্ত্রী। একদিন রাজা দেখলেন, তাঁর এক রানি গর্ভবতী হয়েছে। খটকা লাগল মনে। এই অন্তঃপুরে তো দু'বছর

ঢোকেননি। তাহলে রানির গর্ভে সন্তান এল কী করে?
সেই অন্তঃপুরে নারী-প্রহরীদের ডেকে মনের সন্দেহটা ব্যক্ত করলেন রাজা।
তারা বললে, মন্ত্রী শিববর্মা ছাড়া আর কেউ তো এ অন্তঃপুরে ঢোকেন না।
সর্বনাশ! কুকর্মটা তাহলে খোদ মন্ত্রীর!
এ মন্ত্রীকে তো আর বাঁচিয়ে রাখা যায় না, কাজের অছিলায় মন্ত্রীকে পাঠালেন সীমন্তরাজ ভোগবর্মার কাছে। গোপন চিঠি গেল রাজার কাছে তার আগেই। মন্ত্রী শিববর্মা হাজির হলেই যেন তার প্রাণবধ করা হয়।
সাতদিন পরে সেই গর্ভবতী রানি নিজেই ধরা পড়ল রক্ষীদের হাতে। নারীরূপধারী এক পুরুষের সঙ্গে গভীর রাতে বেরিয়ে যাচ্ছিল অভিসারে।
রাজার তো মাথায় হাত! পাপিষ্ঠা রানির দোষে মন্ত্রী হত্যা হয়ে গেল!
মন্ত্রী কিন্তু নিহত হয়নি। তার উর্বর মস্তিষ্কই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আদিত্যবর্মার গোপন চিঠি ভোগবর্মার হস্তগত হয় যে সময়ে, ঠিক সেই সময়ে মন্ত্রী শিববর্মাও পৌঁছোয় ভোগবর্মার সামনে। আদিত্যবর্মার অভিলাষ ভোগবর্মার মুখে শুনেই উসকে দিয়েছিল ভোগবর্মাকে, করুন, করুন, এখুনি বধ করুন আমাকে!
ভোগবর্মা তো অবাক। যেচে মরতে চায় শিববর্মা! কিন্তু কেন?
কারণ, বললে শিববর্মা, আমি যেখানে খুন হব, সেখানে বারো বছর একটানা বৃষ্টি হবে না। আদিত্যবর্মা তাকালেন। তাই আমাকে খুন করাতে চান আপনার দেশে, যাতে অনাবৃষ্টিটা হয় আপনার দেশে। আপনার সর্বনাশ হয়।
আদিত্য বর্মা তো মহা ধড়িবাজ। রেগেমেগে ভোগবর্মা তক্ষুনি লোকজন দিয়ে শিববর্মাকে দেশের বাইরে পাঠালেন।
বুদ্ধির জয় সর্বত্র। ধর্ম রক্ষে করে সবাইকে। সুতরাং আপনি মনের বিষাদ দূর করুন।
শুনে, মনের মেঘ কেটে গেল। শকটারের বাড়িতেই লুকিয়ে রইলাম।
ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। রাজা যোগানন্দের ছেলে একদিন ঘোড়ায় চেপে, বন্ধুবান্ধব নিয়ে, জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে, বন্ধুদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। রাত হতেই উঠে পড়ল একটা গাছে। সিংহের ভয়ে একটা ভালুকও আশ্রয় নিল গাছের ডালে।
ভয়ে কাঠ হয়ে গেছিল রাজপুত্র। তাই দেখে, মানুষের ভাষায় ভালুক বললে, তুমি তো আমার বন্ধু। তোমাকে মারবো না, ভয় পেও না।
নির্ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ল রাজপুত্র। গাছের তলায় এল এক সিংহ। বললে ভালুককে, মানুষটাকে ফেলে দাও। আমি নিয়ে যাই। তোমাকে তাহলে মারব না।
ভালুক বললে, কক্ষনো না। ও আমার বন্ধু।
চুপ করে রইল সিংহ।
একটু পরে পালাবদল হল। ভালুক ঘুমোল, রাজপুত্র জেগে রইল।
সিংহ বললে, ও ছেলে, ভালুকটা ফেলে দাও, ওকে খাই। তোমাকে তাহলে খাবো না। ভয়ের চোটে তাই করেছিল রাজপুত্র। ডাল থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল ভালুককে।
কিন্তু নীচে ফেলতে পারেনি। ঘুম ভেঙে যেতেই থাবার নখ দিয়ে ডাল আঁকড়ে ধরে প্রাণ বাঁচিয়েছিল ভালুক।
রাজপুত্রকে অভিশাপ দিয়েছিল তৎক্ষণাৎ।
বিশ্বাসঘাতক! তুই পাগল হয়ে যা!
ভোর হল। সৈন্যসামন্ত এসে রাজপুত্রকে গাছ থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায়।
রাজবৈদ্যরাও সেই উৎকট পাগলামি সারাতে না পারায় চৈতন্য হয়েছিল রাজার। আজ যদি বররুচি থাকত, রোগ সারিয়ে দিত।

এই আক্ষেপ শুনে ফেলেছিল মন্ত্রী শকটার।

বিনীতভাবে বলেছিল রাজাকে, বররুচি বেঁছে আছেন।

লাফিয়ে উঠেছিল রাজা যোগানন্দ। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার সামনে। আমি রোগের লক্ষণ বিচার করে বলে দিয়েছিলাম পাগলামির মূল কারণ ভালুক বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা।

রাজা তো চুপ। তারপর মিনমিন করে জানতে চেয়েছিল, এত খবর আমি জানলাম কী করে?

দেবী সরস্বতীর প্রসাদে। ঠিক যেভাবে জেনেছিলাম রানির তিল-চিহ্ন থাকা উচিত কোথায়।

রাজার মুখ চুন।

যোগবলে সারিয়ে দিলাম রাজপুত্রের পাগলামি।

তারপর বললাম রাজাকে, বুদ্ধিমানদের অগোচর কিছুই থাকে না।

বলে, রাজার অনুরোধ-উপরোধ পায়ে ঠেলে ফিরে এলাম নিজের বাড়িতে। কারণ স্বভবন আর স্বভাবই তো পণ্ডিতদের পরম ঐশ্বর্য।

তারপর কান্নাকাটি আরম্ভ হয়েছিল। কারণটাও শুনলাম। আমি নিহত হয়েছি শুনে উপকোশা জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ দিয়েছে।

সংসার ত্যাগ করলাম। গেলাম এক তপোবনে। সেখানে এসেছিল এক ব্রাহ্মণ, অযোধ্যা থেকে। তার কাছে রাজা যোগনন্দের খবর জানতে চেয়েছিলাম।

ব্রাহ্মণ আমাকে চিনতে পেরেছিল। বললে, খবর খুব খারাপ। আপনি চলে আসবার পর থেকেই মন্ত্রী শকটার প্রতিশোধ নেওয়ার ফিকিরে ছিল। যোগনন্দকে সে ধ্বংস করবেই। একদিন এক ব্রাহ্মণকে দেখেছিল। তার নাম চাণক্য। ভীষণ রাগী আর কুটিল ক্রুর স্বভাবের। একদিন হাঁটতে গিয়ে পায়ে ঘাসের খোঁচা লেগেছিল। রেগে গিয়ে ঘাস উপরোচ্ছিল। মন যার এই রকম প্রতিহিংসাপরায়ণ, প্রতিজ্ঞা যার এই রকম অটল, এমন মানুষকে দিয়েই তো রাজা যোগানন্দকে ইহজগৎ থেকে সরানো যাবে। কুশলী শকটার তাই চাণক্যকে বললে, আসুন আমার সঙ্গে। সামনের ত্রয়োদশী তিথিতে রাজার বাড়িতে শ্রাদ্ধ কাজ আছে। ব্রাহ্মণ ভোজন হবে। অনেক জিনিস দান করা হবে, সেই সঙ্গে প্রত্যেককে দেওয়া হবে এক লক্ষ সোনার টাকা।

চাণক্য এল শকটারের বাড়িতে অতিথি হয়ে। নির্দিষ্ট দিনে তাকে নিয়ে যাওয়া হল রাজবাড়িতে। ব্রাহ্মণভোজনে যখন চাণক্যকে বসানো হয়েছে, ঠিক সেই সময়ে সুবন্ধু নামে আর এক শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণ এসে হাজির। রাজা বললে, অন্য ব্রাহ্মণের দরকার নেই, শ্রাদ্ধভোজনে বসুক সুবন্ধু।

শকটার তো তাই চায়। চাণক্যকে বিনীতভাবে বললে, কী করি বলুন, রাজার আদেশ। আপনি উঠে পড়ুন।

আর যায় কোথা! চাণক্যের ব্রহ্মতেজ যেন আকাশ ছুঁয়ে ফেলল তৎক্ষণাৎ। রাগে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে টিকির গিঁট খুলে শপথ করল, আজ থেকে সাতদিনের দিন রাজা যোগনন্দর প্রাণ হরণ করবে, তারপর টিকিতে ফের গিঁট বাঁধবে।

রাজা তাই শুনে অগ্নিশর্মা হতেই সরে পড়েছিল চাণক্য। কিন্তু শকটার তাকে ঠাঁই দিয়েছিল নিজের বাড়িতে।

সেইখানে বসেই অনিষ্ট সাধনের ক্রিয়া শুরু করেছিল চাণক্য। ফলে, বিষম জ্বর হল রাজার। পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হল সপ্তম দিবসে।

শকটার সিংহাসনে বসাল রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্তকে। তার মন্ত্রী নিয়োগ করল চাণক্যকে।

শত্রু নিধন করে শকটার কিন্তু চলে গেল অরণ্যে, তপস্যার জন্যে, ছেলেদের শোক ভোলবার জন্যে।

কাণভূতি! এইসব শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। এসেছিলাম বিন্ধ্যবাসিনীকে দেখতে। আপনাকে দেখে আমার আগের জন্মের সব কথা মনে পড়ে গেল। সেই দিব্যজ্ঞানের বলেই এত দিব্য কথা বলতে পারলাম। এখন আমার শাপমুক্তি ঘটেছে। এই দেহ এবার ত্যাগ করব। গুণাঢ্য ব্রাহ্মণ না আসা পর্যন্ত থাকুন এখানে। যখন গন্ধর্ব ছিল, তখন তার নাম ছিল মাল্যবান।

এই বলে বদরিকাশ্রমে চলে গেল বররুচি।

পথে ঘটল একটা ঘটনা। দেখা হয়েছিল এক মুনির সঙ্গে। তার নাম শাকামন। ঘাসের খোঁচায় তার হাত থেকে রক্ত বেরচ্ছিল। মজা করবার জন্যে নিজের শক্তি দিয়ে রক্তকে শাকের রস বানিয়ে দিয়েছিল। মুনি ভাবল বুঝি, এহেন অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে নিজের তপস্যার জোরে। অহংকারও করেছিল। হেসেছিল বররুচি। বলেছিল, দেখছি এখনও আপনার অহংকার যায়নি। অহংকার ত্যাগ করুন, নইলে জ্ঞান পাবেন না। মুক্তিও হবে না।

দেবী ভবানী দর্শন দিলেন বররুচিকে। তাঁর আদেশে নিজেই নিজের মর্ত্যদেহ দাহ করল। দিব্যদেহ ফিরে পেল।

কাণভূতি রইল বিন্ধ্যাচলে গুণাঢ্যের পথ চেয়ে।

৬. মাল্যবানের উপাখ্যান

গুণাঢ্য নাম নিয়ে মর্ত্যে জন্মেছিল মাল্যবান। কিছুদিন সেবা করেছিল এক রাজার। তাঁর নাম সাতবাহনাখ্য। এই সময়ে প্রতিজ্ঞা রাখার জন্যে ত্যাগ করেছিল তিনটে ভাষা : সংস্কৃত, প্রাকৃত আর দেশভাষা।

মন খারাপ হয়ে গেছিল তারপর। গেছিল বিন্ধ্যপাহাড়ে দেবীদর্শনে। বিন্ধ্যবাসিনীর আদেশে দেখা করল কাণভূতির সঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল আগের জন্মের সব কথা। পৈশাচী ভাষায় বললে, আমার নাম মাল্যবান। এ জন্মে গুণাঢ্য। পুষ্পদন্তের কাছে যা-যা শুনেছিলে সব বল। তাহলে দুজনেই মুক্ত হবে শাপ থেকে।

কাণভূতি বললে, নিশ্চয় বলব। তার আগে বল তোমার জন্মের ব্যাপার।

গুণাঢ্য যা বললে, তা এই :

সোমশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ থাকত সুপ্রতিষ্ঠিত নামের একটা নগরে। তার দুই ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলেদের নাম বৎস আর গুল্মক। মেয়ের নাম শ্রুতার্থা।

মা আর বাবা মারা গেলে বোনকে বড়ো করে তুলল দুই ভাই। একদিন অবাক হয়ে গেল, বোন গর্ভবতী হয়েছে দেখে।

কী আশ্চর্য! অন্য পুরুষ তো বাড়িতে আসে না! তাহলে?

শ্রুতার্থা বললে, আমি একদিন গঙ্গায় স্নান করতে গেছিলাম। নাগরাজ বাসুকির ভাইপো কুমার কীর্তিসেন আমাকে দেখেই ভালোবেসে ফেলে। বিয়ে করতে চায়। বিয়ে হয় গান্ধর্ব মতে। আমার গর্ভে এসেছে তারই সন্তান।

কথা বিশ্বাস হয়নি দুই দাদার।

তখন নাগকুমারকে মনে মনে ডেকেছিল শ্রুতার্থা। তৎক্ষণাৎ হাজির হয়েছিল সে। দুই ভাইকে বলেছিল, তোমরা আর তোমাদের এই বোন, তিনজনেই দিব্যলোকের বাসিন্দা, শাপভ্রষ্ট হয়ে জন্মেছ মর্ত্যে। শাপ কেটে যাবে গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই।

সেই সন্তানই আমি, গুণাঢ্য। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী হয়েছিল। আমার গুণাঢ্য নামকরণ হয়েছিল সেই অনুসারে। কারণ, আমি হব সব গুণের অবতার।

জন্মের পরেই কিন্তু হারালাম মা আর মামাদের। তাঁরা শাপমুক্ত হয়ে দিব্যলোকে চলে গেলেন।

বড়ো অসহায় হয়ে গেলাম দক্ষিণাপথে বিদ্যা অর্জন করতে। সব বিদ্যা শিখলাম। নামযশ হল। শিষ্যদের নিয়ে জন্মভূমিতে ফিরলাম। দেখলাম অনেকদৃশ্য। ব্রাহ্মণদের সাম্যগান, জ্ঞানীদের বিতর্ক, ধড়িবাজদের জুয়াখেলার প্রশংসা, বণিকদের বাণিজ্য কৌশলের বর্ণনা।

অদ্ভুত বাণিজ্য

একজন বণিক বলল, অল্প পুঁজি নিয়ে মাথা খাটালে অনেক টাকা রোজগার করা যায় জানি। আমি কিন্তু বিনা পুঁজিতে অনেক রোজগার করেছি। শুনুন সেই কাহিনি।

আমি যখন মায়ের গর্ভে, বাবা মারা গেল। জ্ঞাতি শত্রুরা মা'কে পথে বসাল। মা আশ্রয় নিল বাবার এক বন্ধুর বাড়িতে। আমি জন্মালাম। ঝি-গিরি করে আমাকে মানুষ করল মা। বর্ণপরিচয় আর হিসেব জ্ঞান হল এক উপধ্যায়ের কাছে, বিনা দক্ষিণায়।

তারপর মা বললে, তুমি বণিকের ছেলে। বড়ো হয়েছ, এবার বাণিজ্য শুরু করো। বিশাখিল বণিক ভালো বংশের ছেলেদের মূলধন দেন ব্যবসা করার জন্যে। তুমি সেখানে যাও।

সেখানে গিয়ে দেখলাম, এক বণিকের ছেলেকে খুব ধমকাচ্ছে বিশাখিল বণিক। বলছেন, বুদ্ধি যদি থাকে তো ওই মরা ইঁদুরটাকে নিয়েই অনেক টাকার মালিক হওয়া যায়। তোমার মাথায় কিছু নেই। তাই আমার কাছ থেকে অত সোনার টাকা নিয়েও কিছু করতে পারলে না।

শুনে আমার জেদ চেপে গেল। বিশাখিলকে বললাম, দিন, আমাকেই দিন মরা ইঁদুর। এই হোক আমার পুঁজি।

অট্টহেসে মরা ইঁদুর আমাকে দিলেন বিশাখিল।
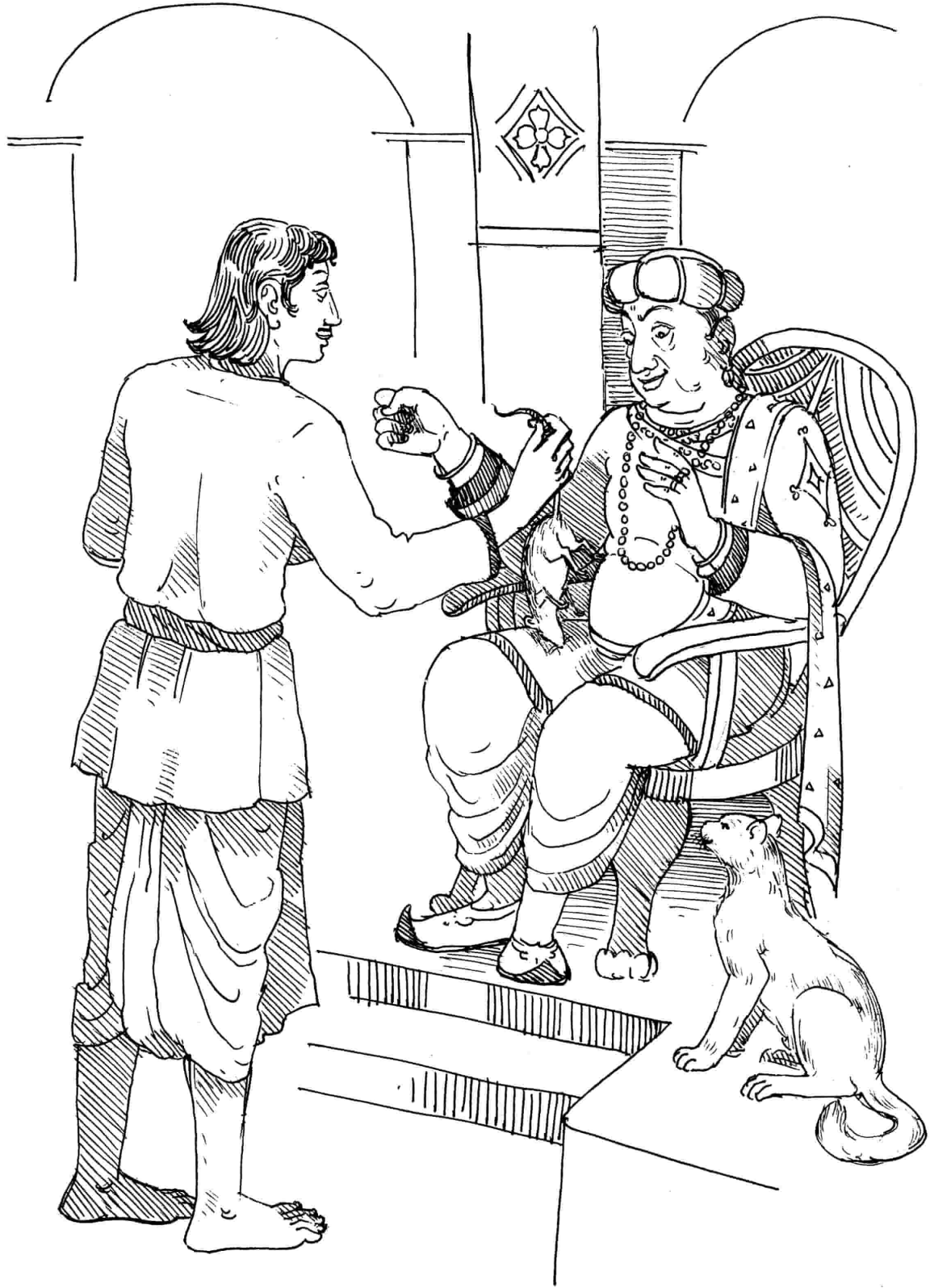
বেড়ালকে খাওয়ানোর জন্যে তিনি মরা ইঁদুর কিনলেনএক মুঠো ছোলার বিনিময়ে।

মরা ইঁদুর নিয়ে গেলাম অন্য এক বণিকের বাড়ি। বেড়ালকে খাওয়ানোর জন্যে তিনি মরা ইঁদুর কিনলেন এক মুঠো ছোলার বিনিময়ে। আমি সেই ছোলা গুঁড়িয়ে ছাতু বানালাম। এক কলসি জল আর ছাতু নিয়ে নগরের বাইরে গিয়ে বসলাম। তেষ্টায় কাহিল হয়ে কয়েকজন কাঠুরে এল সেখানে। আমি তাদের যত্ন করে ছাতু-মিশানো ঠাণ্ডা জল খাওয়ালাম। তারা খুশি হয়ে দুটো করে কাঠ দিয়ে গেল আমাকে। সেই কাঠ দোকানে বেচে দিয়ে, সেই টাকায় ছোলা কিনে, গুঁড়িয়ে নিয়ে, পরের দিন আবার সেই জায়গায় গিয়ে বসে রইলাম, সঙ্গে রইল ঠাণ্ডা জলের কলসী। সেদিনও এল কাঠুরেরা। ছাতু আর জল খেয়ে খুব খুশি হয়ে বেশি করে কাঠ দিয়ে গেল আমাকে। এইভাবে তিনদিন পরে দাম দিয়ে কিনে নিলাম তাদের সমস্ত কাঠ।

দৈব সহায় হল তারপরেই। অতিবৃষ্টি হল। শুকনো কাঠের দাম বেড়ে গেল। আমি চড়া দামে সমস্ত কাঠ বেচে দিলাম।

একটু একটু করে অনেক টাকা সঞ্চয় করে দোকান দিলাম। ব্যবসা বড়ো হল, অনেক টাকার মালিক হলাম। একটা সোনার ইঁদুর বানালাম। যাঁর কাছে মরা ইঁদুর পুঁজি নিয়েছিলাম, তাঁকে সোনার ইঁদুর দিয়ে এলাম।

তিনি খুশি হলেন আমার ব্যবসা-কাহিনি শুনে। বিয়ে দিলেন নিজের মেয়ের সঙ্গে।

মূষক নামে বিখ্যাত হলাম তারপর থেকেই।

বোকা বামুনের গল্প

এবার হোক সেই নগরেরই এক নির্বোধ ব্রাহ্মণের গল্প। সে ছিল বেদজ্ঞ। কিন্তু বাস্তববুদ্ধিশূন্য।

একদিন বেশকিছু সোনা পেয়েছিল দান হিসেবে। একটা সেয়ানা লোক তা জানতে পারে। সে এসে বললে, আপনার তো খাওয়ার অভাব নেই। লোকে আপনাকে ডেকে খাওয়ায়। সোনা নিয়ে কী করবেন? সোনার বিনিময়ে বরং কিছু সংসারের ব্যাপার-ট্যাপার শিখে আসুন। যে অভিজ্ঞতা আপনার একদম নেই। এটাও তো জ্ঞান।

ব্রাহ্মণ বললে, তা বটে। কিন্তু সাংসারিক জ্ঞান আমাকে দেবে কে?

ধূর্ত বললে, চতুরিকা দেবে। সে এই নগরের বারবনিতা। তার কাছে যান।

সেখানে গিয়ে আমাকে কি করতে হবে?

এইসব সোনা তাকে দেবেন। সামবাদ শোনাবেন চতুরিকার

মনে রং ধরবে। আপনাকে সাংসারিক জ্ঞান দেবে।

ব্রাহ্মণ গেল চতুরিকার বাড়ি। সোনার বিনিময়ে বারবনিতার কাছে সংসারের জ্ঞান নিতে এসেছে শুনে সেখানে যত কামিনীকাঞ্চন লোভীরা বসেছিলেন তারা হেসে গড়িয়ে পড়ল।

হাসির মর্ম ঢুকল না নিরেট ব্রাহ্মণের মাথায়, সে ভাবল, তৃতীয় বেদের মন্ত্র সুর করে শোনাই, তাহলেই এরা খুশি হবে। সামবাদ মানে, তার কাছে তৃতীয় বেদ, গেয় বেদ।

শুরু হল সামগান। অর্থাৎ তৃতীয় বেদের সুরেলা মন্ত্রপাঠ।

আসর কাঁপতে লাগল গলাবাজিতে। শুনে জড়ো হল আরও ধূর্ত, প্রত্যেকেই এসেছে বেশ্যা নিয়ে ফুর্তি করতে।

কান ঝালাপালা হয়ে যেতেই তারা চেঁচিয়ে উঠেছিল, অর্ধচন্দ্র দিয়ে তাড়াও এই শেয়ালটাকে।

অর্ধচন্দ্র মানে প্রহার। ব্রাহ্মণের মাথায় ঘুরছে কিন্তু খটমট শব্দ। অর্ধচন্দ্র তো একরকম বাণ। নিশ্চয় সেই বাণ ছুঁড়ে মাথা কাটতে চায় এই মূর্খের দল। এই ভেবে আসর ছেড়ে চম্পট দিল ব্রাহ্মণ।

গেল সেই উপদেষ্টা ধড়িবাজের কাছে, যে তাকে পাঠিয়েছিল চতুরিকার কাছে। সব শুনে সে বললে কী আশ্চর্য! আমি তো আপনাকে বলেছিলাম সামবাদ শোনাতে। অর্থাৎ মিষ্টি কথায় তাকে তুষ্ট করতে, বেদের গান গাইতে তো বলিনি।

ঠিক সেই সময়ে চতুরিকাও এসে হাজির সেখানে। সে আর হাসি চাপতে পারছে না।

বললে, এই দু-পেয়ে জানোয়ারটার সোনা আমি চাই না।

ফিরিয়ে দিল সব সোনা। কৃতার্থ হয়ে গেল ব্রাহ্মণ। সোনা তুলে নিয়ে যেন প্রাণ ফিরে পেয়ে গেল নিজের বাড়ি।

কাণভূতে! এই রকম অনেক মজার ব্যাপার দেখলাম। শিষ্যদের নিয়ে পৌঁছোলাম রাজবাড়িতে। সাতবাহন সিংহাসনে বসেছিলেন। আমার সমাদর করলেন। মন্ত্রীরা আমার জ্ঞানের খুব সুখ্যাতি করলেন। তাই শুনে রাজা আমাকেই মন্ত্রী করে দিলেন। আমি বিয়ে করলাম।

একদিন গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে গিয়ে দেখলাম ইন্দ্রের নন্দনকাননের মতো ভারি সুন্দর একটা বাগান। খোঁজখবর নিয়ে জানলাম, অনেক আগে এক মৌনীব্রাহ্মণ এখানে থাকতেন অনাহারে। অনেক সাধুব্রাহ্মণ তাঁকে দেখতে আসতেন। একটু একটু করে তাঁরই চেষ্টায় গড়ে ওঠে এই বাগান আর সংলগ্ন দেবমন্দির।

আগে যেখানে কিছুই ছিল না, সেখানে এইসব ব্যাপার দেখে আশপাশের ব্রাহ্মণরা এসে জানতে চেয়েছিল, এসব হল কী করে?

মৌনীব্রাহ্মণ মৌনতা ভেঙে যা বললেন, তা এই :

মন্দির আর বাগান হল কী করে?

নর্মদা নদীর তীরে বককচ্ছ লোকালয়ে আমার জন্ম। ছিলাম গরিব আর কুঁড়ে। কেউ ভিক্ষেও দিত না।

তখন আমি বাড়ি ছেড়ে পথে নামলাম। অনেক তীর্থ ঘুরে বিন্ধ্যবাসিনী দর্শন করলাম। দেবীর সামনে নিজেকে বলি দিতে গেছিলাম। দেবী নিরস্ত করলেন। বর দিলেন।

সেইদিন থেকে আমি হয়ে গেলাম সিদ্ধপুরুষ। খিদেতেষ্টা আর রইল না। দেবীর কাছেই থেকে গেলাম, দেবীর আদেশে।

একদিন দেবী আমাকে একটা বীজমন্ত্র দিলেন। বললেন, যাও। প্রতিষ্ঠান নগরে একটা সুন্দর বাগান তৈরি করো।

সেই মন্ত্রের দৌলতেই নির্মিত হয়েছে এই বাগান আর এই মন্দির। দেখাশুনোর ভার দিলাম আপনাদের।

বলেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন ব্রাহ্মণ।

সাতবাহন নাম হল কী করে?

গুণাঢ্যের এই গল্প শেষ হতেই, কাণভূতি বললে, এখন বল রাজা সাতবাহনের ওরকম নাম হল কেন? তাঁর বাহন কি সাত রকমের?

গুণাঢ্য বললে, দ্বীপীকর্ণি নামে এক রাজা ছিলেন। শুক্তিমতী তাঁর রানির নাম। একদিন রাজা-রানি শুয়ে আছেন, এমন সময়ে একটা সাপ এসে ছোবল মারে রানিকে।

ফলে, মারা গেলেন রানি। ছেলেপুলে না থাকায় আর স্ত্রীর হঠাৎ মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে পড়লেন রাজা।

একদিন স্বপ্নে দেখা দিলেন মহাদেব। বললেন, জঙ্গলে যাও। একদিন একটা সিংহ দেখবে। সিংহের পিঠে থাকবে খুব সুন্দর একটা ছেলে। সিংহের কাঁধ থেকে তাকে নামিয়ে কোলে নেবে। সেই হবে তোমার ছেলে। রক্ষা পাবে তোমার রাজত্ব।

ভোর হতেই শিকার করবার অছিলায় জঙ্গলে গেলেন রাজা। দুপুর নগাদ একটা দীঘি দেখতে পেলেন। ফুটফুটে একটা ছেলেকে পিঠে চাপিয়ে এক সিংহ এল সেখানে। ছেলেটাকে পিঠ থেকে মাটিতে নামিয়ে যেই জল খেতে মুখ নামিয়েছে দীঘিতে, অমনি আড়াল থেকে তির ছুঁড়ে সিংহ বধ করলেন রাজা।

আশ্চর্য কাণ্ডটা ঘটল চোখের সামনে। মরা সিংহ হয়ে গেল একটা মানুষ! জীবন্ত। এল রাজার সামনে। রাজা তো হতভম্ব! মরা সিংহ জ্যান্ত মানুষ হয় কী করে?

রহস্যের ব্যাখ্যা শোনা গেল সেই মানুষের মুখে। সে মানুষ নয়, যক্ষ। কুবেরের বন্ধু। তার নাম সাত। একদিন স্বর্গগঙ্গায় স্নানরতা এক মুনিকন্যাকে দেখে সে মদলশরে বিদ্ধ হয়। ঋষিকন্যারও অবস্থা হয় একই। গান্ধর্বমতে বিয়ে হয় তৎক্ষণাৎ।

কিছুদিন পরেই গোপন বিয়ের ব্যাপারটা পাঁচকান হতেই বিষম রেগে যায় কন্যার বান্ধবীরা। অভিশাপ দেয় দুজনকেই, যাও, সিংহ-সিংহিনী হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াও। যেদিন বাচ্ছা হবে সিংহীর, সেইদিন সে হবে শাপমুক্ত। সিংহকে কিন্তু সিংহ হয়েই থাকতে হবে যদ্দিন না রাজা দ্বীপীকর্ণ তির মেরে তার প্রাণ বিয়োগ ঘটাচ্ছে। তখনই ফিরে পাবে আগের শরীর।

সেই থেকে স্বামী-স্ত্রী সিংহ-সিংহী হয়ে ঘুরেছে বনে বনে। ছেলে প্রসব করেই মারা গেল সিংহী, শাপমুক্ত হয়ে চলে গেল আগের শরীরে।

সিংহ বেচারা কিন্তু ছেলেকে পিঠে নিয়ে সিংহীদের কাছে গিয়ে, তাদের বুকের দুধ খাইয়ে, ছেলেকে বড়ো করেছে।

আজ সে শাপমুক্ত।

সাত নামধারী যক্ষ অদৃশ্য হল তৎক্ষণাৎ।

তাকে বাহন বানিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছিল বলে ছেলের নাম দেওয়া হল সাতবাহন।

ছেলে বড়ো হলে, তাকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজা চলে গেলেন জঙ্গলে, তপস্যা করতে।

ছেলে রাজা হয়ে একদিন সুন্দরীদের নিয়ে এল সেই নন্দনকাননের মতো বাগানে, যার কথা একটু আগেই বলা হয়েছে।

একপাল মেয়ে নিয়ে বাগানে খেলা করবার পর জলে নেমেছিল সাতবাহন জলক্রীড়া করার জন্যে। দীঘি ছিল বাগানের মধ্যেই।

রাজার প্রমত্ত আচরণে আর অনেকক্ষণ ধরে একটানা জল-খেলা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল মেয়েরা।

সাতবাহনের এক রানি অনেক ভাষা জানত। প্রকৃতই বিদুষী। বারবার জল ছুঁড়ে তাকে মারছিল রাজা। সহ্য করতে না পেরে সংস্কৃত ভাষায় সেই রানি ধমক দিয়েছিল রাজাকে, 'মোদকৈঃ পরিতাড়য়ে'। কথাটার মানে আমার দিকে আর জল ছুঁড়বেন না।

ছুঁড়বেন না!

সংস্কৃত ভাষাটা রাজার তেমন রপ্ত ছিল না। রানি মোদক অর্থাৎ মিষ্টি খেতে বলছে, এই ভেবে, তক্ষুণি পরিচারিকাকে হুকুম দিয়ে আনিয়েছিল এক ঝুড়ি মোদক অর্থাৎ নাড়ু।

হেসে গাড়িয়ে পড়েছিল রানি। তার পরেই এক ধমক রাজাকে, এত মূর্খ আপনি! সংস্কৃত একদম জানেন না, আমার জানা ছিল না। আপনাকে জল ছুঁড়তে বারণ করেছিলাম। আপনি আনলেন মোদক। জলকেলি করার সময়ে কি কেউ মিষ্টি খায়?

খিলখিল করে হেসে উঠেছিল মেয়ের দল। সুন্দরীদের সামনে এহেন অপমানে মর্মাহত হয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে গুম হয়ে বসে রইল রাজা দিনের পর দিন।

গুণাঢ্য বললে, রাজত্ব যখন যায়, তখন আসল ব্যাপার জানবার জন্যে একদিন ভোরের দিকে সটান চলে গেলাম রাজপ্রাসাদে। দেখলাম একটা নির্জন ঘরে গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছে রাজা একা।

আমার সঙ্গে গেছিল পণ্ডিত শর্ববর্মাচার্য। আমাদের দুজনকেই দেখল রাজা, কিন্তু কোনও কথা বলল না, শুভ সম্ভাষণ তো দূরের কথা।

তখন বললে শর্ববর্মাচার্য, রাজা, শ্রুতিধর হওয়ার ইচ্ছে আপনার অনেকদিনের। বহুবার সেই ক্ষমতা চেয়েছেন আমার কাছে। একবার যা শুনবেন, তা যেন আমরণ মনে থাকে। সম্প্রতি একটা ভালো স্বপ্ন দেখেছি। তাই এসেছি আপনার কাছে।

স্বপ্নের কথা

স্বপ্নে দেখলাম যেন পড়াচ্ছি আমরা এক শিষ্যকে। এমন সময়ে আকাশ থেকে মাটিতে পড়ল একটা পদ্মফুল। ফুল ফুটল আপনা থেকেই। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল পরমাসুন্দরী। তার পরনে শ্বেতশুভ্র বসন। দিব্য আকৃতি। সেই মেয়েরূপী পদ্ম আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে গেল আপনার মুখ-পদ্মের মধ্যে।

ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্নে মানে বুঝলাম। দেবী সরস্বতী আপনার শরীর আশ্রয় করলেন।

শর্ববর্মাচার্যের স্বপ্ন-কাহিনি শুনে রাজা সাতবাহন যেন অনেকটা স্বাভাবিক হলেন। দুশ্চিন্তার অবসান ঘটল। আর গুম হয়ে থাকতে পারল না। জিজ্ঞেস করেছিল গুণাঢ্যকে, খুব মন দিয়ে পড়াশুনো করে গেলে কদ্দিনে পণ্ডিত হওয়া যায়?

বারো বছরে। সব বিদ্যার মূল ব্যাকরণশাস্ত্র জেনে ফেলা যায়। আমি কিন্তু দু-বছরে সেই জ্ঞান দিতে পারি।

শুনে ঈর্ষা হয়েছিল শর্ববর্মাচার্যর। বলেছিল, আমি পারি ছ'মাসে। সব বিদ্যায় পণ্ডিত করে দেব। রেগে গেছিল গুণাঢ্য, অসম্ভব। যদি তা পার, তাহলে সংস্কৃত, প্রাকৃত, দেশভাষা, এই তিনটে ভাষার চর্চা ছেড়ে দেব।

শর্ববর্মাচার্যও সমান তেজে বললে, তাহলে আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, ছ'মাসের মধ্যে রাজাকে যদি সব বিদ্যায় সুপণ্ডিত করতে না পারি, তোমার পায়ের জুতো মাথায় করে রাখব বারো বছর।

গুণাঢ্য গেল নিজের বাড়ি। শর্ববর্মাচার্যও বাড়ি ফিরে উদ্বেগ পড়ল। ঝোঁকের মাথায় মস্ত প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে। ছ'মাসের মধ্যে রাজা যদি সব বিদ্যায় পাণ্ডিত্য অর্জন করতে না পারে, তাহলে...

দুশ্চিন্তায় অধীর হয়ে গিন্নির কাছে মন হাল্কা করেছিল শর্ববর্মাচার্য। তিনি বুদ্ধিমতী। বললেন, বড়ো প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছেন। দৈবশক্তি সহায় না হলে একাজ সম্ভব নয়।

রাত ভোর হওয়ার আগেই শর্ববর্মাচার্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে, একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে, গূঢ় সাধনায় মগ্ন হল।

গুপ্তচর সেই খবর এনে দিল গুণাঢ্যকে। গুণাঢ্য জানাল রাজাকে। রাজা বিষাদমগ্ন হয়ে গেল আগের মতো।

রাজপুত্র সিংহগুপ্ত এসে বললে, আমি যাই দেবী চণ্ডিকার কাছে। তাঁর আরাধনা করি। নিশ্চয় আপনার মন ভালো হবে।

চণ্ডিকার মন্দির নগরের বাইরে। রাজপুত্র তাঁর আরাধনা করে গেল একটানা। দেবী প্রসন্ন হচ্ছেন না দেখে, নিজের গলা নিজে কাটতে গেছিল।

অমনি শোনা গেছিল দৈববাণী। মন্দির গমগম করে উঠল দেবী চণ্ডিকার অভয়-বাণীতে। ভয় নেই। রাজার ইচ্ছে পূর্ণ হবে।

রাজপুত্র ফিরে এসে রাজাকে যখন এই আনন্দ-সংবাদ দিচ্ছে, তখন গুণাঢ্য হাজির ছিল সেখানে।

রাজপুত্র বড়ো বুদ্ধিমান। তৎক্ষণাৎ দুজন গুপ্তচর পাঠিয়ে দিল, শর্ববর্মাচার্য কী করছে, তা জানাবার জন্যে।

খবর এল এই : ভগবান কার্তিকের পুজো করেছেন শর্ববর্মাচার্য। কার্তিক প্রসন্ন হয়েছেন। বর দিয়েছেন। শর্ববর্মাচার্যের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

শুনে, গুণাঢ্য হল বিষণ্ণ, রাজা হলেন উৎফুল্ল।

শর্ববর্মাচার্য যথাসময়ে এসে সব বিদ্যা শিখিয়ে দিল রাজাকে, ছ'মাসেই।

জলকেলির সময়ে যে রানির গঞ্জনায় এই অসম্ভব সম্ভব হল, তাকে পাটরানি করে নিল রাজা।

মাল্যবানের শেষ উপাখ্যান

গুণাঢ্য বললে, রাজা যে সত্যিই শ্রুতিধর হয়েছে, তার প্রমাণ পেলাম এরপর একদিন।

এক ব্রাহ্মণ রাজসভায় এসে মুখেমুখে একটা শ্লোক রচনা করে শোনালো রাজাকে। একবার মাত্র শুনেই রাজা সেই সংস্কৃত শ্লোক সুন্দর উচ্চারণে শুনিয়ে দিল ব্রাহ্মণকে।

সবাই যখন হতবাক, তখন রাজা বললেন শর্ববর্মাচার্যকে, আপনি দিব্যশক্তির অধিকারী হয়েছিলেন বলেই এত কম সময়ে আমাকে এত বিদ্যা দান করতে পেরেছেন। কিন্তু সেই দিব্য ক্ষমতা আপনি পেলেন কী করে, তা বলেননি, আজ বলবেন?

শর্ববর্মাচার্য বললে, আমি এখান থেকে বেরিয়ে না খেয়ে না কথা বলে ক্রমাগত হেঁটে যেতে যেতে এক সময়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাই। একটু পরেই দেখলাম, এক সুন্দরকান্তি পুরুষ হাতে ক্ষেপনীয় অস্ত্র নিয়ে আমাকে বলছেন, ওঠো। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

দৈববাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীর জুড়িয়ে গেল, খিদে-তেষ্টা চলে গেল, ক্লান্তি আর রইল না।

নিরুদবেগ পৌঁছোলাম এক দেবমন্দিরের সামনে। সংলগ্ন সরোবরে স্নান করলাম, মন্দিরে ঢুকে দেখলাম সেই সুন্দর পুরুষকে, যাকে দেখেছি ঘোরের মাথায়। হাতে রয়েছে সেই শক্তি অস্ত্র।

আশ্চর্য এই যে দেবতা কার্তিককে দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে যেন দেবী সরস্বতীর অধিষ্ঠান ঘটে গেল আমার জিভের ডগায়।

কেননা, আমি যখন মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে আছি, ভগবান কার্তিক তখন একটা ব্যাকরণ সূত্র উচ্চারণ করেছিলেন।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমিও একটা সূত্র বলেছিলাম।

অর্থাৎ, বাগড়া দিয়েছিলাম। ক্ষুব্ধ দেবতা কার্তিক আর কোনও সূত্র বললেন না।

শুধু বললেন, তুমি যদি পাণ্ডিত্য দেখাতে না যেতে, তাহলে আমার মুখ থেকে পরের পর সূত্র বেরিয়ে আসত। একটা বিশাল ব্যাকরণ তৈরি হয়ে যেত। যাই হোক, এই যে শাস্ত্রের সূচনা করলাম, যেহেতু তা দ্বন্দ্বতন্ত্র, তাই কাতন্ত্র নামে খ্যাত হবে। পানিনিকে টপকে যাবে। আমার বাহনের নাম অনুসারে এর আরও একটা নাম থাকবে, কলাপ।

সংস্কৃত কলাপ ব্যাকরণ আজও অদ্বিতীয়। কলাপ মানে যদিও ময়ূরপুচ্ছ।
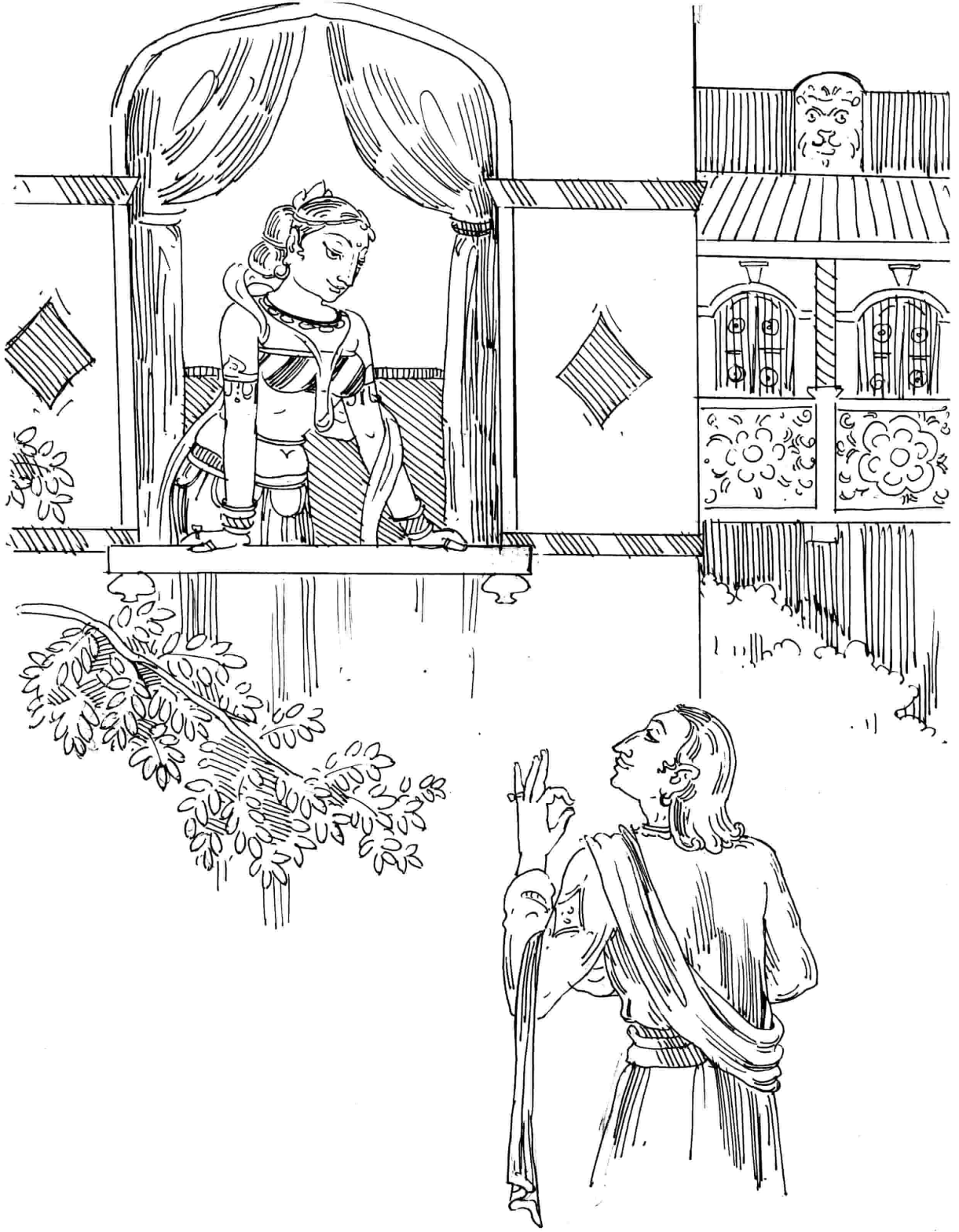
দুজনেই দুজনকে দেখে পরস্পরের রূপপানে এমনই মত্ত হয়ে গেল যে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল যে-যার জায়গায়। রাস্তায় আর জানলায়।

যাই হোক, নতুন ধরনের সেই শব্দশাস্ত্র প্রণয়ন করার পর কার্তিক বললেন, তোমাদের রাজা সাতবাহন আগের জন্মে ছিল এক ঋষি। তখন তার নাম ছিল কৃষ্ণ। একদিন এক ঋষিকন্যাকে দেখে কামানলে জ্বলে গেছিল। ঋষিকন্যাও তাকে কামাতুরা হয়ে পড়ে। কন্যার সখীরা চটে গিয়ে অভিশাপ দিয়েছিল। যে ঋষিকন্যার প্রেমে এই পরিণাম। সেই মেয়েই এ জন্মে তার বিয়ে করা বউ। ছিল ঋষি আর ঋষির মেয়ে, এখন রাজা সাতবাহন আর তার রানি। তুমি তার সামনে গিয়ে, দাঁড়ালেই আগের জন্মের সব কথা মনে পড়ে যাবে। সমস্ত বিদ্যার পুনরাবির্ভাব ঘটবে। যারা মহামানুষ, বড় ঋষি, তাদের এক জন্মের সাধনা আর এক জন্মে সিদ্ধি এনে দেয়।

কার্তিক অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি মন্দির থেকে বেরিয়ে এলাম। কিছু চাল এনেছিলাম সঙ্গে। দিয়েছিল মন্দির-সেবা যারা করে, তারা। আমি সেই চাল রোজ খেয়েছি। আজও সেই পরিমাণই আছে। একটুও কমেনি।

গুণাঢ্য বলে চলেছে, সভা ভেঙে গেল। আমিও বেরিয়ে এলাম। তপস্যার জন্যে মন ব্যাকুল হয়েছিল। সোজা আসছি রাজবাড়ি থেকে। বিন্ধ্যের জঙ্গলে জনা কয়েক অসভ্য ম্লেচ্ছার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কিছুদূর গিয়ে দেখলাম, কয়েকজন পিশাচ কথা বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে। শোনামাত্র পৈশাচিত ভাষা মনে পড়ে গেল। এলাম উজ্জয়িনীতে, তোমার দেখা পাবো বলে। আজ দেখা পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল আমার আগের জন্মের কথা।

শেষ হল গুণাঢ্যের কথা।

তখন বলল কাণভূতি, তোমার খবর তো পেলাম গত রাতে। রাক্ষস ভূতিবর্মা থাকে একটা বাগানে। আমি সেখানে গেছিলাম। আমি শাপমুক্ত হবো কী করে, তা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ভূতিবর্মা আমার বন্ধু। সে বললে, দিনের আলোয় আমি ক্ষমতাহীন। রাত নামুক, সব বলব।

রাত নামতেই, কতকগুলো ভূত ভীষণ হৈ-হল্লা শুরু করেছিল। ভূতিবর্মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এত ফুর্তি কেন?

সে বললে, যক্ষ-পিশাচ-রাক্ষসরা সূর্যের আলোয় ক্ষমতাহীন। তাই রাতের অন্ধকারে মনে এত আনন্দ হয়। যেখানে সতীসাধ্বী স্ত্রীলোক থাকে, অথবা যেখানে কেউ মাছ-মাংস খায় না, সেখানে ভূতেরা উপদ্রব করতে পারে না। যেখানে জ্ঞানীজন, শক্তিমান মানুষ থাকে, যেখানকার পরিবেশ শুচিস্নিগ্ধ, যক্ষ, রাক্ষস আর পিশাচরা সেসব জায়গা মাড়াতে পারে না। এখন রাত হয়েছে তো, তাই এত ফূর্তি। যাই হোক, রাতের অন্ধকারে আমারও ক্ষমতা চলে এসেছে। তোমার বন্ধু গুণাঢ্য কোথায় রয়েছে, জেনে গেছি। চলে যাও উজ্জয়িনীতে, সে রয়েছে সেখানে। তোমার শাপমোচনও ঘটবে সেখানে।

পুষ্পদন্তের কাহিনি এখুনি বলব। তার আগে শুনতে চাই, পুষ্পদন্ত আর মাল্যবান, এই দুটো নামকরণ কাহিনি।

কাণভূতির কৌতূহল মেটাল গুণাঢ্য এইভাবে, গঙ্গার তীরে ছিল বহুসুবর্ণক নামে একটা গ্রাম। সেখানে থাকতেন এক ব্রাহ্মণ। তাঁর নাম গোবিন্দদত্ত। বহুশাস্ত্রে পণ্ডিত। তাঁর স্ত্রী-র নাম অগ্নিদত্তা। পাঁচ ছেলে। পাঁচ জনেই গোমূর্খ, কিন্তু কন্দর্পকান্তি।

একদিন এক ব্রাহ্মণ অতিথি এলেন বাড়িতে। গৃহস্বামী বড়িতে ছিলেন না।

এই ব্রাহ্মণের নাম বৈশ্বানর। ভয়ানক রাগী মানুষ। গোবিন্দদত্তের পাঁচ ছেলেকে সামনেই বসে থাকতে দেখে, তাদের মধ্যে যাকে বয়েসে বড়ো বলে মনে হয়েছিল, তাকে প্রণাম করেছিলেন। সৌজন্য প্রণামের বিনিময়ে পাল্টা প্রণাম না করে অট্টহেসে গড়িয়ে পড়েছিল পাঁচজনেই।

মাথায় রক্ত উঠে গেছিল বৈশ্বানরের। বেরিয়ে যখন যাচ্ছেন, পথে দেখলেন গোবিন্দদত্তকে।

গোবিন্দদত্ত সব শুনলেন, কিন্তু ফেরাতে পারলেন না বৈশ্বানরকে। তার বদলে শুনলেন অভিশাপ, মূর্খদের সঙ্গে তুমিও একটা মূর্খ। সবাই জানে, সমাজে মূর্খরা জাতচ্যুত। পতিত। তুমিও পতিত ব্রাহ্মণ। তোমার অন্ন

খেয়ে জাত যাবে, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

গোবিন্দদত্তের ধর্মপরায়ণা স্ত্রী অপমানিত অতিথির পেছন পেছন দৌড়ে এসেছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর নির্বন্ধে ফিরে এলেন বৈশ্বানর।

ঘটনাটা কিন্তু অনুতাপ জাগিয়েছিল ছেলেদের মনে। সবচেয়ে আঘাত পেয়েছিল যে, তার নাম দেবদত্ত।

সে বৈরাগ্য নিয়ে, বদরিকাশ্রমে গিয়ে, তপস্যায়, তুষ্ট করল মহাদেবকে। বর চেয়েছিল একটাই, আমাকে আপনার অনুচর করে নিন।

মহাদেব বলেছিলেন, সেটা পরে হবে। এখন সব বিদ্যে শিখে ভোগের মধ্যে থাকো।

বিদ্যাশিক্ষ্যর জন্যে পাটলীপুত্রে গেল দেবদত্ত। যে গুরুর বাড়িতে উঠল, তাঁর নাম বেদকুম্ভ।

বেদকুম্ভের যুবতী স্ত্রী ছিল নষ্ট স্বভাবের মেয়ে। দেবদত্তকে সে নষ্ট করতে চেয়েছিল। পারেনি।

দেবদত্ত এল প্রতিষ্ঠান নগরে। সেখানকার উপাধ্যায় আর উপাধ্যায়-পত্নী দুজনেরই বার্ধক্য এসছে। নিরাপদ গুরুগৃহে সব বিদ্যায় পারঙ্গম হয়েছিল দেবদত্ত।

বিদ্বান হওয়ার পরের ঘটনা। সেই দেশের রাজা সুশর্মার অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল দেবদত্ত। দেবদত্ত নিজেও তো সুন্দর যুবক। রাজকন্যাও তার প্রেমে পড়েছিল প্রথম দর্শনেই।

কন্যার নাম শ্রী। সে ছিল জানলায়, দেবদত্ত ছিল রাস্তায়। দুজনেই দুজনকে দেখে পরস্পরের রূপপানে এমনই মত্ত হয়ে গেল যে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল যে-যার জায়গায়। রাস্তায় আর জানলায়। দেহজ কামনায় অবশ।

তারপরেই নড়ে উঠল কন্যে। আঙুল নেড়ে কাছে আসতে বলল দেবদত্তকে। দেবদত্ত এল জানলার নিচে। একটা ফুলের তোড়া দাঁতে কেটে দেবদত্তের দিকে ছুঁড়ে দিল কন্যে। কুড়িয়ে নিল দেবদত্ত। ফিক করে হেসে সরে গেল শ্রী।

ফুলের তোড়া নিয়ে দেবদত্ত তো চম্পট দিল সেখান থেকে, কিন্তু তোড়া উপহারের অর্থটা মাথায় ঢুকল না।

গুরুগৃহে ফিরে মনমরা হয়ে রইল। জিজ্ঞাসাবাদ করে সব শুনলেন বৃদ্ধ গুরু। তিনি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান। মাথার চুল পেকেছে. কথার একটা বীজ থেকে পুরো কাহিনি ধরে ফেলতে পারেন।

হেসে বললেন দেবদত্তকে, খুব সোজা ব্যাপার। নগরের বাইরে একটা মন্দির আছে। নাম, পুষ্পদন্ত। চারদিকে ফুলের বন। লোকজন নেই। রাজকন্যা দাঁত দিয়ে ফুল কেটে তোমাকে দিয়েছে। ইঙ্গিতে বলেছে, পুষ্পদন্ত মন্দিরে যেতে। সেখানে সে থাকবে তোমার অপেক্ষায়। তাই হেসেছে মুচকি হাসি।

ভারী বুদ্ধিমতী মেয়ে তো। ছোট্ট সংকেত, এত কথা!

তক্ষুনি রওনা হয়েছিল দেবদত্ত। লুকিয়েছিল মন্দির সংলগ্ন ফুলবনে।

সেই রাত ছিল অষ্টমী তিথির রাত। বড় পুণ্য তিথি। এমন তিথিকে অন্ধকারে গা ঢেকে মন্দিরে দেবদর্শনে আসা রাজকন্যার পক্ষে স্বাভাবিক। ক্ষুরধার বুদ্ধি বলেই নিমেষে এতটা ভেবে নিয়েছে।

এল-ও সে নিশার আঁধারে গা ঢেকে। অভিসার এমনই জিনিস! চুম্বকেরও বেশি টান।

পেছন থেকে পা টিপে টিপে এসে দেবদত্ত তাকে বাহুবন্দি করেছিল।

অপার আনন্দের মধ্যেই শ্রী জিজ্ঞেস করেছিল, আমার এই চকিত সংকেত তুমি বুঝলে কী করে?

আমি তো বুঝিনি। সরল জবাব দিয়েছিল দেবদত্ত, আমার বৃদ্ধ গুরু বুঝেছেন, আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তৎক্ষণাৎ ধাক্কা দিয়ে দেবদত্তকে সরিয়ে দিয়েছিল শ্রী, ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা, বঁধূ, থাকো তুমি দূরে। তোমার মতো মূর্খের সঙ্গে আমার মতো বিদূষীর প্রেম হয় না। দূর হও।

বলেই অন্ধকারে গা ঢেকে কালো বিদ্যুতের মতো কাম-কাঙলিনী ফিরে গেছিল স্বগৃহে।

বজ্রাহতের মতো বসে রইল দেবদত্ত। বিরহ দাউ দাউ করে জ্বলছে তার বুকে।

কিন্তু দেব-উপাসনা কখনো বৃথা যায় না। বদরিকাশ্রমে মহাদেবের আরাধনা করে যে শক্তি অর্জন করেছিল, তারই দৌলতে ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে শিবের এক অনুচর চলে এল তার সামনে। তার নাম পঞ্চশিখ।

সে বড়ো ধুরন্ধর। নিজে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধরে, দেবদত্তকে হুবহু মেয়ে সাজিয়ে গেল রাজার সামনে।

বললে, একটা অনুরোধ। আমার ছেলে নিরুদ্দেশ। তাকে খুঁজতে যাব। ছেলের বউকে অন্তঃপুরে ঠাঁই দেবেন?

এ আর এমন কী ব্যাপার! ছেলেকে ফিরিয়ে এনে ছেলের বউকে নিয়ে যাবে বুড়ো বামুন। রাজি হয়ে গেলেন রাজা।

ছদ্মবেশী দেবদত্তকে শ্রী-র কাছে পাঠিয়ে দিয়ে উধাও হল পঞ্চশিখ।

সময় আর সুযোগ বুঝে একরাতে শ্রী-র সামনে আত্মপ্রকাশ করল দেবদত্ত।

চমকে উঠেও মুগ্ধ হয়েছিল শ্রী, দেবদত্তর গভীর প্রেম আর নিপুণ কৌশল দেখে।

ফলে, তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। বিয়ে করে নিয়েছিল গান্ধর্ব মতে। গর্ভঞ্চারও হয়েছিল যথাসময়ে।

এতো মহাবিপদ। পঞ্চশিখকে মনে মনে ডেকেছিল দেবদত্ত। পঞ্চশিখ এসে, সব শুনে, নিমেষ মধ্যে অন্তঃপুরের ভেতর থেকে উধাও করে দিল দেবদত্তকে। শূন্যপথে।

ভোর হতেই বুড়ো বামুনের রূপধরে পঞ্চশিখ এল রাজার সামনে, পাশে দেবদত্ত, এখন আর নারীরূপে নয়, স্বরূপে।

পুত্রবধূকে ফেরত চাইল পঞ্চশিখ। দেবদত্তকে দেখিয়ে বললে, এই আমার ছেলে। ফিরে পেয়েছি।

কিন্তু ছেলের বউকে পাওয়া গেল না অন্তঃপুরে।

রাজার মাথায় হাত। পঞ্চশিখের এক গোঁ, তাহলে আপনার মেয়েকে আমার ছেলের বউ করে দিন।

বাঁচা যায় তাহলে, ভাবলেন রাজা। অন্তঃপুর থেকে পরের বউ নিখোঁজ হয়েছে, জানাজানি হয়ে গেলে মাথা কাটা যাবে যে।

দেবদত্ত-শ্রী-র শুভবিবাহ সাঙ্গ হল খুব ধুমধাম করে। যথাসময়ে ওদের হলো একটি ছেলে। তার নাম রাখা হলো মহীধর। জামাইকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজা গেলেন বনে। মহীধর বড়ো হলে তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দেবদত্তও সস্ত্রীক গেল বনে। তারপর এক সময়ে মরদেহ ছেড়ে সে হয়ে গেল শিবের অনুচর। পুষ্পমন্দিরে গিয়ে বউ পেয়েছিল বলে তার নাম হল শিবানুচর পুষ্পদন্ত। শ্রীর নাম হল জয়া, দুর্গার সখী।

এই কাহিনি শেষ করে বললে গুণাঢ্য, কাণভূতি, এই তো গেল পুষ্পদন্ত আর তস্য ভার্যার গল্প। এবার শোনো আমার গল্প। আমি ছিলাম পাঁচ মূর্খের একজন, দেবদত্তের ভাই, গোবিন্দদত্তের ছেলে। বাবার তাড়নায় আমিও বৈরাগী হয়ে হিমালয়ে গিয়ে শিবের তপস্যা করে তাঁকে তুষ্ট করেছিলাম। তাঁর অনুচর হতে চেয়েছিলাম। তাই হয়েছিলাম। হিমালয়ের বাগান থেকে রোজ ফুল তুলে মালা গেঁথে শিবকে দিতাম বলে আমার নাম রাখা হয় মাল্যবান। পার্বতীর অভিশাপে এখন মানুষ গুণাঢ্য। এবার মহাদেব তোমাকে কি কি বলেছেন, সব বল। তাহলে দুজনেই মুক্তি পাবো শাপ থেকে।

৭. কাণভূতি আর মাল্যবান শাপ থেকে মুক্তি পেল

শেষ হল গুণাঢ্য বৃত্তান্ত।

তখন শুরু হল কাণভুতির কাহিনি। পৈশাচিক ভাষায় বলে গেল সাতটা সুবিশাল কথা কাহিনি। সে-সবের মধ্যে রয়েছে অনেক গল্প।

গুণাঢ্য শ্লোকে গেঁথে নিল সেই কথা-সপ্তক। সময় লাগল সাত বছর। সাত লক্ষ শ্লোকে সম্পূর্ণ হল অনবদ্য সেই কথা-সপ্তক।

হুঁশিয়ার গুণাঢ্যকে এজন্যে ঘোর জঙ্গলে যেতে হয়েছিল, যেখানে মানুষ যেতে ভয় পায়।

গেছিল বিদ্যাধরদের ভয়ে। অদ্ভুত কাহিনী-সপ্তক তারা লোপাট করে দিতে পারে, এই ভয়ে।

তাই প্রতিটি অক্ষর লিখেছিল নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে। সাত-সাতটা বছর ধরে! অতি গোপনে! যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে গেছিল প্রতিটা শ্লোকে।

রুধির রঞ্জিত সেই লিখন, অশ্রুতপূর্ব সেই কাহিনি-সপ্তক। জানবার প্রয়াসে চেষ্টার ত্রুটি করেনি সিদ্ধক্ষমতায় বলীয়ান বিদ্যাধররা। তারা লুকিয়ে থেকেছে আকাশে।

বিরাট গল্পধারা অবশেষে শ্লোকাকারে লিপিবদ্ধ হতেই শাপমুক্ত হয়েছিল কাণভূতি, ফিরে পেয়েছিল দিব্যদেহ। তখন ভেবেছিল গুণাঢ্য, এত কষ্ট করে এই যে অপূর্ব অশ্রুতপূর্ব কথা-সপ্তক লিখলাম, এর প্রচার হওয়া দরকার। এই পৃথিবীর সর্বসাধারণের জানা দরকার। কিন্তু কার জিম্মায় রাখব এই অমূল্য সম্পদ?

ঠিক সেই সময়ে চিন্তাক্লিষ্ট গুণাঢ্যের সামনে এল তার দুই শিষ্য। তাদের নাম গুণদেব আর নন্দিদেব।

তারাই বললে, এমন রত্ন-গ্রন্থ দেওয়া যায় শুধু রাজা সাতবাহনকে। পণ্ডিত মানুষ।

শিষ্যদের হাতেই মস্ত বইটা সাতবাহনের কাছে পাঠিয়ে দিল গুণাঢ্য।

কিন্তু কপাল মন্দ! রক্ত দিয়ে পৈশাচিক ভাষায় লেখা গ্রন্থ স্পর্শ করল না রাজা। উল্টে বললে, বিস্তর ত্রুটি রয়েছে পাণ্ডুলিপিতে।

বই নিয়ে গুণাঢ্যের কাছে ফিরে এল দুই শিষ্য।

খুবই কষ্ট পেয়েছিল গুণাঢ্য। পণ্ডিতের কাছে যে গ্রন্থের এত অনাদর, সমাদর তো দূরের কথা, সে গ্রন্থ রেখে লাভ কী?

পাহাড়ের পাশে শিষ্যদের দিয়ে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে একটা-একটা বই ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল আগুনের মধ্যে।

শিষ্যরা পুড়ে ছাই হতে দিল না শুধু একটা উপাখ্যান। নরবাহন দত্তের উপাখ্যান, এক লক্ষ শ্লোকে লেখা।

ঠিক এই সময়ে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল রাজা সাতবাহনের। চিকিৎসকরা লক্ষণ যাচাই করে বললে, অতিরিক্ত শুকনো মাংস খাওয়ার পরিণাম। রাজা রাঁধুনিকে অচ্ছা করে ধমকে দিল। রাঁধুনি দোষ চাপিয়ে দিল মাংস যারা বেচেছে, তাদের ঘাড়ে। রাজা তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন শুকনো মাংস খেতে দেওয়া হয়েছে রাজাকে। তাদের সাফাই হল আর এক রকমের। যেখান থেকে হরিণ মেরে এনে রাজবাড়িতে হরিণের মাংস বেচে, সেখানে একটা লোক পাহাড়ের ধারে বিড় বিড় করে বকছে আর আগুনের মধ্যে কী যেন ফেলে দিচ্ছে। অদ্ভুত এই কাণ্ড দেখবার জন্যে হরিণ, পাখি সব্বাই সেখানে জড়ো হয়ে রগড় দেখছে। খিদেতেষ্টা মাথায় উঠেছে। শরীরে জল না গেলে মাংস তো শুকিয়ে যাবেই! কৌতূহলে ফেটে পড়ল রাজা সাতবাহন। পশুপাখিরা যা দেখতে ভিড় করে খিদেতেষ্টা ভুলেছে, এমন মজা তো না দেখলেই নয়!

সেখানে গিয়ে দেখল জটাধারী ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা এক সন্ন্যাসীকে। ছলছল চোখে একটার পর একটা বই আগুনে ছুঁড়ে দিচ্ছে। সবই নিজের লেখা বই।

সম্বিৎ ফিরল রাজার। কাছে গিয়ে প্রণাম করে বই পোড়ানোর কারণ জানতে চাইল।

তখন গুণাঢ্য শুনিয়ে দিল পুষ্পদন্তের আশ্চর্য উপাখ্যান।

রাজা ভাবল, এই সাধু নিশ্চয় ছদ্মবেশী গণেশ। এঁর কাছে শোনা যাক মহাদেবের কথাসরিৎ।

গুণাঢ্য বললে, ছ'লক্ষ শ্লোক তো পুড়িয়ে দিলাম। বাকি রয়েছে এই এক লক্ষ শ্লোক, একটা মাত্র কথাসরিৎ। ইচ্ছে হয়, নিয়ে যান। বুঝিয়ে দেবে আমার শিষ্যরা।

এই কথা মুখ দিয়ে বের করার সঙ্গে সঙ্গে শাপমুক্ত হয়ে গেল গুণাঢ্য। ফিরে পেল দিব্যদেহ।

এক লক্ষ শ্লোকের কথাসাগর নিয়ে প্রাসাদে ফিরল রাজা, শিষ্যদের দিয়ে তা থেকে সৃষ্টি করল একটা কথাপীঠ। বহু বিচিত্র রসের আধান কালক্রমে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে উদ্বেলিত করেছিল জনমানস। সমাদর পেয়েছিল। খ্যাত হয়েছিল।

কথাপীঠ নামক লম্বক শেষ হল এইখানেই।

এই গেল মুখবন্ধ। মহাদেব গল্প শুনিয়েছিলেন পার্বতীকে। আড়ি পেতে তা শুনেছিল বলে অভিশাপ পেয়েছিল পুষ্পদন্ত, মাল্যবান, আর জয়া। অভিশাপের মেয়াদ কাটিয়ে তারা যখন ফিরেই গেল মহাদেবের কাছে, তাহলে এখন শোনা যাক সেই বিরাটকাহিনী পরম্পরা, কথাসরিৎসাগর নামে যা জগৎপ্রসিদ্ধ।

কথাকাহিনির শুরু

মৃগাবতীর কাহিনি

সুবিখ্যাত সেই লোকালয়ের নাম ছিল বৎস। কৌশম্বী নামে একটা নগর ছিল সেই জনপদে। সেখানকার রাজার নাম শতানীক।

এই রাজবংশের নাম পাণ্ডব। শতানীক-এর পিতামহের নাম পরীক্ষিত।

পরীক্ষিতের রানি বিষ্ণুমতীর কোনও ছেলে ছিল না। অরণ্যনিবাসী মহর্ষি শাণ্ডিল্য, সে দুঃখ ঘুচিয়ে দেন। তিনি একটা যজ্ঞ করেন। যজ্ঞের পায়েস রানিকে খেতে দেন। যথাসময়ে রানির একটি ছেলে হয়। তার নাম রাখা হয় সহস্রানীক।

এই ছেলে বড়ো হলে, তার হাতে রাজ্যভার দিয়ে, অবসর নেয় রাজা শতানীক।

এই সময়ে ভয়ানক লড়াই শুরু হল দেবতা আর অসুরদের মধ্যে। দূত পাঠিয়ে ইন্দ্র রাজা শতানীককে নিয়ে গেল অসুর ধ্বংস করার জন্যে। কিন্তু প্রাণ গেল শতানীকের।

শতানীকের মৃতদেহ রাজধানীতে এসে পৌঁছলে জ্বলন্ত চিতায় উঠে প্রাণ দিল রানি বিষ্ণুমতী।

সহস্রানীক হল রাজা।

আবার লড়াই লাগাল দেবাসুরে। এবার ইন্দ্র ডেকে পাঠাল সহস্রানীক-কে।

যুদ্ধের জন্যে অমরপুরে গেল বটে সহস্রানীক, কিন্তু তার মন চঞ্চল হয়ে রইল চারদিকের অপূর্ব শোভা আর সুন্দরীদের দেখে। নন্দনকাননে দলে দলে ঘুরছে দেবতারা তাদের দেবীদের নিয়ে। কত রঙ্গ কত কেলি চলছে সেখানে। বিলাসবৈভব আর যৌবনানন্দ যেন শত কলাপে বিকশিত হয়ে রয়েছে।

যুবক সহস্রানীকের মন খারাপ তো হবেই। তারও কি ইচ্ছে যায় না এত কামিনীকাঞ্চনের একজনকে পাশে পেতে? যৌবনানন্দে মত্ত হতে? সুখ দিয়ে মন আর শরীরকে ভরিয়ে দিতে?

ইন্দ্র যে অন্তর্যামী। সে নিজেও তো কম নারী-রমণ করেনি। নারীদের ইচ্ছে না থাকলেও ইন্দ্রের চাহিদা মিটাতে হয়েছে।

সুতরাং সহস্রানীককে ডেকে বললে চিন্তা কী? কীসের বিষাদ? মনের মতো, রমণী তো মর্ত্যেই জন্মে গেছে। তার আগের কাহিনিটা শোনাই শোনো।

অনেকদিন আগের কথা। ব্রহ্মাকে দেখতে গেছিলাম। দেখলাম অষ্ট গণদেবতার একজন সেখানে বসে রয়েছে। অর্থাৎ, একজন বসু।

হঠাৎ এক অপ্সরী এল সেখানে, এমন বেগে এল যে হাওয়ায় উড়ে গেল পরনের কাপড়। তখন সে দিগ্বসনা।

দেখেই কাহিল হয়েছিল বসুর অবস্থা। সমস্ত শরীর আর মন দিয়ে কামনা করেছিল সেই অপরূপা অপ্সরীকে। একে তো স্বর্গের পরী। তার ওপর........

কামদেবের শরনিক্ষেপ শুধু বসুর দিকেই হয়নি সেই অপ্সরাকেও কামাতুরা করে তুলেছিল। বসু নিথর, অপ্সরাও নিথর। দুজনের মদির চোখ, নিবদ্ধ দুজনের ওপর।

ব্রহ্ম খুব বিরক্ত হলেন এই কাণ্ড দেখে। মুখে কিছু বললেন না। ইশারা করলেন আমাকে।

ইঙ্গিতে সংকেতের অর্থ বুঝলাম। কামের আগুনে ঝলসানো দুজনকে অভিশাপ দিলাম, যাও, মানুষ হয়ে জন্মাও, মদনানন্দ ভোগ করো সেখানে।

অভিশাপ ফলে গেল নিমেষে। দুজনেই জন্ম নিল মর্ত্যে।

রাজা সহস্রানীক, আপনিই সেই, অভিশপ্ত বসু। স্বর্গের সেই পরীর নাম হয়েছে এখন মৃগাবতী। অযোধ্যার রাজা কৃতবর্মার মেয়ে। স্বর্গে তার নাম ছিল অলম্বুষা। সুরসুন্দরী অলম্বুষা।

খোদ ইন্দ্রের মুখে নিজের পূর্বজন্মের কাহিনি শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল সহস্রানীক। স্বর্গের কাজ শেষ হতেই ইন্দ্রের সারথিকে সঙ্গে নিয়ে ঝড়ের বেগে রওনা হয়েছিল স্বদেশের দিকে।

সেই সময়ে তার পথ আটকেছিল তিলোত্তমা। স্বর্গের বারাঙ্গনা। তার নাকি কিছু কথা আছে রাজার সঙ্গে। রথ দাঁড়াক।

সুরসুন্দরীর কটাক্ষ আর হুকুমে বিচলিত হয়নি রাজা। মাতলি সারথিকে বলেছিল— চালাও রথ!

আগের জন্মের দিগবসনা তখন তাকে টানছে, তিলোত্তমা হোক অমরাপুরীর নামজাদা বেশ্যা, তাতে বয়ে গেল রাজার।

রেগে আগুন হয়েছিল তিলোত্তমা। বারাঙ্গনা হলেও সে যে স্বর্গের বহুবল্লভা। তাকে তাচ্ছিল্য!

রাগে ফেটে পড়ে তৎক্ষণাৎ ঝেড়েছিল এক শাপ, যার চিন্তায় বিভোর হয়ে আমার দিকে ফিরেও তাকালে না, তার সঙ্গে তোমার মিলন ঘটবে বারো বছর পরে। বারো বছরের বিরহ যন্ত্রণা হাড়ে হাড়ে বুঝবে। কামানলে দগ্ধে দগ্ধে মরবে!

মেয়েদের ঈর্ষা এই রকমই হয়। যাকে পাওয়া যায় না, তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিতে চায়। রূপ একটা সম্পদ, রূপ একটা অভিশাপও বটে।

সহস্রানীক কিন্তু বায়ুবেগে চালিত রথে বসে মহা-বারাঙ্গনা তিলোত্তমার অভিশাপ শুনতে পায়নি। তার মনের নয়নে তখন ভাসছে আর এক সুরসুন্দরীর বসনচ্যুত রূপ!

নিজের প্রাসাদে ফিরেই বিয়ের প্রস্তাব পাঠাল মৃগাবতীর বাবার কাছে।

মৃগাবতীর মা কলাবতী তা শুনে বললে, এতো আমি আগেই জানতাম। স্বপ্নে বলে গেছিল এক ব্রাহ্মণ। মহস্রানীক হবে আমার জামাই।

যথাসময়ে সহস্রানীক এল অযোধ্যায়। শুভলগ্নে বিয়ে হয়ে গেল মৃগাবতীর সঙ্গে।

পূর্বজন্মের রঙ্গিনী এ জন্মের সঙ্গিনী হয়ে গর্ভে নিয়ে এল সহস্রানীকের সন্তান।

রাজার সেকি আনন্দ। গর্ভবতীর মনের সাধ মিটানোর সেকি আকুল প্রয়াস। যা চাচ্ছে বধূ, তাই পাচ্ছে। শয়নে স্বপনে নয়নে মননে একাকার হয়ে গেল দুটি সত্তা।

আর এই সময়েই ঘটল একটা অঘটন।

দাঁড়িয়ে উঠল সাপ। ঠিক যেন একটা মানুষ। দুহাতে ধরে রয়েছে একটা বীণা।

একদিন একটা অসম্ভব আবদার করে বসল মৃগনয়নী মৃগাবতী। রক্তের পুকুরে সে স্নান করবে!

যেন আকাশ ভেঙে পড়ল রাজার মাথায়। এও কি সম্ভব! এত রক্তের জোগান দেবে কারা?

মৃগাবতীর সেই এক গোঁ। রাঙাবতী হবে সে রক্ত-পুকুরে নেয়ে উঠে! অতি বীভৎস আবদার!

ললনাদের ছলনা দেবতারাই বোঝে না, মানুষ কোন ছাড়! পরনারী, ঘরনারী, বারনারী, কখন যে কী চেয়ে বসে, তা ঈশ্বরও আগেভাগে জানতে পারেন না।

আর এ হল মৃগাবতী। আগের জন্মের রসবতী, পবনে বসন উড়িয়ে দিয়ে যে হরণ করেছিল রাজার চিত্ত।

অগত্যা কলাবতী ঘরণীর মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য ছলাকলার আশ্রয় নিল রাজা।

পুকুর একটা কাটালো বটে। লাল তরল দিয়ে তা কানায় কানায় ভরেও দিল.......

কিন্তু তা রুধির নয়। রক্তলাল আলতা!

খুশিতে ফেটে পড়ে ফের দিগবসনা হয়ে মৃগবতী নেয়ে উঠেছিল সেই পুকুরে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত রক্তলাল হয়ে!

সেই রক্ত-রমণীকে আকাশ পথে দেখেই প্রলুব্ধ হয়েছিল কে?

একটা বিশাল পক্ষী।

ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেছিল লাল মেয়েকে, কাঁচা মাংস মনে করে। বহুদূরে গিয়ে জঙ্গলে নেমে সেই মাংস ঠোকরাতে গিয়ে আঁৎকে উঠেছিল।

সর্বনাশ! এ যে মেয়েছেলে! তাও উদোম!

অতএব, তাকে জঙ্গলে ফেলেই সাঁ-সাঁ করে চম্পট দিয়েছিল মহাকায় বিহঙ্গ।

জায়গাটার নাম উদয় পাহাড়। সেখানকার জঙ্গল এত নিবিড় যে মানুষ ঢুকতে ভয় পায়। তার ওপর রাত গভীর হয়েছে।

দিক হারিয়েছে দিগ্বসনা। কাঁদছে। আর ঠিক সেই সময়ে প্রকাণ্ড এক অজগর সাপ মুখ ব্যাদান করে তাকে তাকে আস্ত গিলতে এল।

লোহিতাঙ্গ বিবসনা রইল না আর স্ববশে, আসাড় সর্বাঙ্গ। অজগর চাহনিতে সম্মোহিত।

কিন্তু রাখে হরি মারে কে! আচম্বিতে শূন্যের মধ্যে কায়া ধারণ করল এক দিব্য পুরুষ। নিমেষে সর্পবধ করেই বিলীন হল শূন্যে।

এর পরেই ধেয়ে এল এক মস্ত হাতি। রক্তরঙিন মৃগাবতীর বাঁচার সাধও ফুরোল। এই হাতিই নিক তার প্রাণ।

কিন্তু সময় না ফুরোলে হাজার চেষ্টাতেও মানুষ মরতে পারে না। সময় ফুরোলে হাজার চেষ্টাতেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না।

লাল টুকটুকে মেয়েটাকে দেখে হাতির নিশ্চয় ভালো লাগেনি। তাই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে মাটি কাঁপিয়ে চলে গেছিল অন্যত্র।

বনের বিভীষিকাও বিমুখ। কেঁদে ফেলেছিল লাল সুন্দরী।

রাতের অন্ধকার এক সময়ে মিলিয়ে গেল ভোরের আলোয়। বৃহৎ বনস্পতিরা যেন বড়ো বড়ো ছাতা দিয়ে আড়াল করে রাখল মৃগাবতীকে।

এমন সময়ে বহুদূরে শোনা গেল পায়ের আওয়াজ। শুকনো ঘাস মাড়িয়ে কে যেন আসছে।

কোথায় লুকোবে ভাবছে মৃগাবতী, এমন সময়ে সে এসে গেল সামনে।

এক ঋষিপুত্র। ফলমূল জোগাড়ে বেরিয়েছে।

রোরুদ্যমানা মৃগাবতীকে সে মা বলে সম্বোধন করেছিল। তাকে নিয়ে গিয়ে আশ্রমে রেখেছিল। সেই আশ্রম ঋষি জামদগ্নির আশ্রম।

পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছিল সেই খানেই। ঋষিপুত্রদের সঙ্গে মিলেমিশে যখন একটু একটু করে বড়ো হচ্ছে রাজপুত্র, তখন একদিন শোনা গেছিল এক আকাশবাণী :

এই ছেলে বেদবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা শিখবে, বহুগুণের অধিকারী হবে। তারপর হবে সম্রাট। ছেলের নাম হোক উদয়ন।

শুনে কেঁদে ফেলেছিল মৃগাবতী।

কালক্রমে ঋষি জামদগ্নিই সব বিদ্যা তাকে শেখালেন। এই সময়ে একদিন মৃগাবতী নিজের হাত থেকে সোনার বালা খুলে পরিয়ে দিল উদয়নের হাতে।

বালায় লেখা ছিল তার বাবা রাজা সহস্রানীক-এর নাম।

একদিন শিকার করতে একা গভীর বনে গেছিল উদয়ন। দেখল, একটা সাপকে নিষ্ঠুরভাবে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে এক ব্যাধ।

উদয়ন হুকুম দিয়েছিল, ছেড়ে দাও বেচারাকে।

কাতর গলায় ব্যাধ বলেছিল, তাহলে খাবো কী? সাপের খেলা দেখিয়েই তো আমার রোজগার।

উদয়ন হাত থেকে সোনার বালা খুলে ব্যাধকে দিয়েছিল। সাপের বাঁধন খুলে ছেড়ে দিয়েছিল জঙ্গলে।

ব্যাধ চোখের আড়াল হতেই ঘটে গেল একটা অদ্ভুত ব্যাপার।

দাঁড়িয়ে উঠল সাপ। ঠিক যেন একটা মানুষ। দুহাতে ধরে রয়েছে একটা বীণা।

সে বললে, আমি নাগরাজ বাসুকির বড়ো ছেলে। আমার নাম বসুনেমি। তুমি আমাকে মুক্তি দিয়েছ, আমি তোমাকে দিচ্ছি এই বীণা।

বীণা হাতে নিয়ে আশ্রমে ফিরে এল উদয়ন, পথ দেখাল সেই সাপ।

এদিকে ব্যাধ সেই সোনার বালা নিয়ে গেছে সোনার দোকানে, বিক্রি করে সংসার চালাবে বলে।

বালা হাতে নিয়ে চক্ষুস্থির করে ফেলেছে স্যাকরা।

বালায় খোদাই করা রয়েছে রাজার নাম।

ব্যাধকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হল রাজার সামনে। রাজার চোখে জল এসে গেল সোনার বালা দেখে। নিজে সেই বালা পরিয়ে দিয়েছিল মৃগাবতীকে।

কিন্তু সে কোথায়? বেঁচে আছে কী?

ব্যাধ বললে, তাতো জানি না। এই বালা তো পেয়েছি ফুটফুটে একটি ছেলের কাছে। নিজের হাত থেকে খুলে দিয়েছিল আমাকে।

মৃগাবতীর বালা ফুটফুটে একটি ছেলের হাতে? সে তাহলে কে?

সোজা হয়ে বসেছিল রাজা। দৈববাণী শোনা গেছিল ঠিক সেই সময়ে, তিলোত্তমার শাপ এতদিনে কাটল। তোমার সতীসাধ্বী স্ত্রী রয়েছে উদয় পাহাড়ে, ঋষি জামদগ্নির আশ্রমে। সেখানেই রয়েছে তোমার ছেলে।

পরের দিনই ব্যাধকে নিয়ে সসৈন্যে উদয় পাহাড়ের দিকে রওনা হয়েছিল রাজা সহস্রানীক।

৯. শ্রীদত্ত আর মৃগাঙ্কবতীর গল্প

সন্ধ্যে নাগাদ এক জঙ্গলে এল রাজা। তাঁবু খাটাল এক দীঘির পাড়ে। ঘুমিয়ে পড়ল সকলেই। কিন্তু রাজার চোখে ঘুম নেই।

নিজের তাঁবুর মধ্যে আনল প্রিয় বন্ধুকে। তার নাম সঙ্গতক।

বললে, চোখে ঘুম আসছে না। একটা গল্প বলো।

সঙ্গতক বললে, এইবার তো প্রিয়ামিলন ঘটবে। বিরহের অবসান হবে। বিরহ আর মিলন, জগতের নিয়ম। শোনো একটা গল্প।

অনেক আগে মালবদেশে ছিলেন এক ব্রাহ্মণ, তাঁর নাম যজ্ঞসোম। দুই ছেলের একজনের নাম কালনেমি, আর একজনের নাম বিগতভয়।

যজ্ঞসেনের মৃত্যুর পর দু-ভাই এল পাটলিপুত্রে, বিদ্যা আহরণের জন্যে। গুরু দেবশর্মার কাছে গেল। সব বিদ্যা শেখানোর পর নিজের দুই মেয়ের সঙ্গে দু-ভাইয়ের বিয়ে দিলেন দেবশর্মা।

বড়োভাই কালনেমি লোকের ভালো দেখতে পারত না। ঈর্ষায় জ্বলে যেত। লক্ষ্মীপুজো করত এইজন্যেই। নিজের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাকে।

লক্ষ্মী তার একনিষ্ঠ সাধনায় খুশি হয়ে বর দিলেন এই রকম : তোমার একটি ছেলে হবে। তার নাম হবে শ্রীদত্ত। তোমার অনেক সম্পত্তিও হবে। কিন্ত যেহেতু অন্যের বৈভব দেখে চোখ টাটিয়েছে বলে আমার আরাধনা করেছ, তাই শেষ জীবনটা খুব কষ্টে কাটবে। চুরির অপরাধে সাজা পাবে। মারা যাবে।

লক্ষ্মী তো চলে গেলেন, তাঁর বরে একটা ছেলে হল কালনেমির। তার নাম রাখা হল শ্রীদত্ত, কারণ স্বয়ং শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী তাকে দিয়েছেন। তার নামকরণ করেছেন। বিষয়-আশয় হলো প্রচুর।

বড়ো হয়ে বিস্তর অস্ত্রযুদ্ধ শিখে নিল শ্রীদত্ত, তার মধ্যে ছিল বাহুযুদ্ধ। এই ব্যাপারে সে হল অপরাজেয়। কারণ তার বাহুযুদ্ধে ছিল অনেক সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ।

কালনেমির ছোটো ভাইয়ের নাম বিগতভয়। সাপের কামড়ে তার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সে সংসার ছেড়ে তীর্থ ভ্রমণে চলে যায়।

যে রাজ্যে কালনেমির নিবাস, সে দেশের রাজা ছিলেন বল্লভশক্তি। তাঁর ছেলের নাম বিক্রমশক্তি। সর্ব গুণের আধার শ্রীদত্তকে ডেকে এনে বিক্রম শক্তির বন্ধু করে দিলেন রাজা।

কিন্তু বিক্রমশক্তির মনটা ছিল বড়ো ঈর্ষাকুটিল। শ্রীদত্ত যে তাকে সব ব্যাপারে টেক্কা মেরে যেতে পারে, তা জেনে বিদ্বেষ পুষে রেখেছিল মনের মধ্যে গোড়া থেকেই।

এই সময়ে দুজনে ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় শ্রীদত্তের। তাদের নাম বজ্রমুষ্টি আর বাহুশালী। নিবাস, অবন্তীদেশ।

বন্ধু সংখ্যা আরও বাড়িয়ে নেয় দাক্ষিণাত্যের কয়েকজন মন্ত্রীপুত্রকে বাহুযুদ্ধে হারিয়ে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে।

এরা ছাড়াও, আরও কয়েকজন বীরপুরুষকে বন্ধু করে নেয় শ্রীদত্ত। এদের নাম উপেন্দ্রবল, নিষ্ঠুরক, ব্যাঘ্রভট্ট। বিদেশি, কিন্তু বীরের বন্ধু বীর।

তারপর একদিন টক্কর লাগলো রাজার ছেলে বিক্রমশক্তির সঙ্গে, গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে। শ্রীদত্ত সঙ্গে নিয়ে গেছিল নিজের বীর বন্ধুদের।

এই বীরপুরুষরা রাজা বলে ডেকেছিল শ্রীদত্তকে, পাত্তা দেয়নি বিক্রমশক্তিকে।

রেগে টং বিক্রমশক্তি লড়তে চেয়েছিল শ্রীদত্তের সঙ্গে। শুরু হয়েছিল বাহুযুদ্ধ।

হেরে গেছিল রাজপুত্র।

শ্রীদত্ত তার চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন থেকেই। এরকম বন্ধুকে খতম করে দেওয়াই ভালো।

এই যখন তার গোপন পরিকল্পনা, তখন তা টের পেয়ে শ্রীদত্ত পালিয়ে গেছিল বীর বন্ধুদের নিয়ে।

সবাই মিলে গঙ্গার তীর ধরে বহুদূরে চলে গেছিল। এমন সময়ে শ্রীদত্তের চোখে পড়ল এক আশ্চর্য দৃশ্য।

বিদ্যুৎরূপিনী এক কামিনী ভেসে যাচ্ছে গঙ্গার স্রোতে ঠিক যেন এক দেবী প্রতিমা। রূপপুঞ্জ।

দূর থেকে দেখেই একা শ্রীদত্ত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জলে। সাঁতরে গেছিল পেছন পেছন। কাছাকাছি গিয়ে হাত বাড়িয়ে যেই ধরতে যাবে, অমনি সেই অপরূপা তলিয়ে গেল জলে।

শ্রীদত্তও ডুব দিয়েছিল। ডুব সাঁতার কেটে একদম নিচে চলে এসেছিল। মায়ারাজ্যে।

সেখানে দেখেছিল একটা শিবমন্দির। শিবপ্রণাম সেরে রাত্রে থেকে গেল মন্দিরের সামনের বাগানে। প্রণাম করেছিল শিবঠাকুরকে। রাত কাটিয়েছিল মন্দিরের সামনের বাগানে।

ভোর হল। শিবপুজোর সময়ে দেখা গেল সেই ভুবনমোহিনীকে, মন্দিরে ঢুকল পুজোর উপকরণ নিয়ে। পুজো সেরে মন্দির থেকে বেরিয়ে গেল এক প্রামাদপুরীতে। কারও সঙ্গে কথা না বলে গিয়ে বসল একটা মস্ত ঘরে। সে ঘরে বসে রয়েছে অনেক সুরূপা মেয়ে।

শ্রীদত্ত সেই ঘরে ঢুকতেই হু হু করে কেঁদে উঠেছিল ভুবনমোহিনী।

শ্রীদত্ত তো অবাক। হঠাৎ কান্নার কারণ জানতে চেয়েছিল, ঘরভর্তি এই রূপসীরাই বা কারা তাও জানতে চেয়েছিল।

অনেক কষ্টে কান্না সামলে বলেছিল সেই ভুবনমোহিনী, আমরা দৈত্যরাজ বলির দশ হাজার নাতনি।

দশ হাজার! শ্রীদত্ত তো থ!

দৃকপাত না করে বলে গেল সেই পরমাসুন্দরী নাতনি, আমিই বড়ো নাতনি। আমার নাম বিদুৎপ্রভা।

সার্থক নাম বটে! মনে মনে বলেছিল শ্রীদত্ত।

বিদ্যুৎপ্রভা কিন্তু গড় গড় করে আত্মকথা বলেই যাচ্ছে, ঠাকুর্দাকে বেঁধে রেখেছেন ভগবান বিষ্ণু, মেরে ফেলেছেন বাবাকে, আমাদের নির্বাসন দিয়েছেন এইখানে, বাপের বাড়িতে থাকতে দেননি। সেই বাড়ির সামনে ভয়ংকর এক সিংহতে পাহারার রেখেছেন, যাতে আমরা ঢুকতে না পারি, তাই আমরা কাঁদছি।

সিংহের ভয়ে এত কান্না? শ্রীদত্ত তো অবাক।

কিন্তু সেই সিংহ যে আগের জন্মে যক্ষ ছিল। কুবেরের শাপে এ জন্মে হয়েছে সিংহ। শাপমুক্তি ঘটবে যদি কোনও মানুষ তাকে যুদ্ধে হারাতে পারে। তাহলেই আমরা বাপের বাড়িতে ঢুকতে পারব।
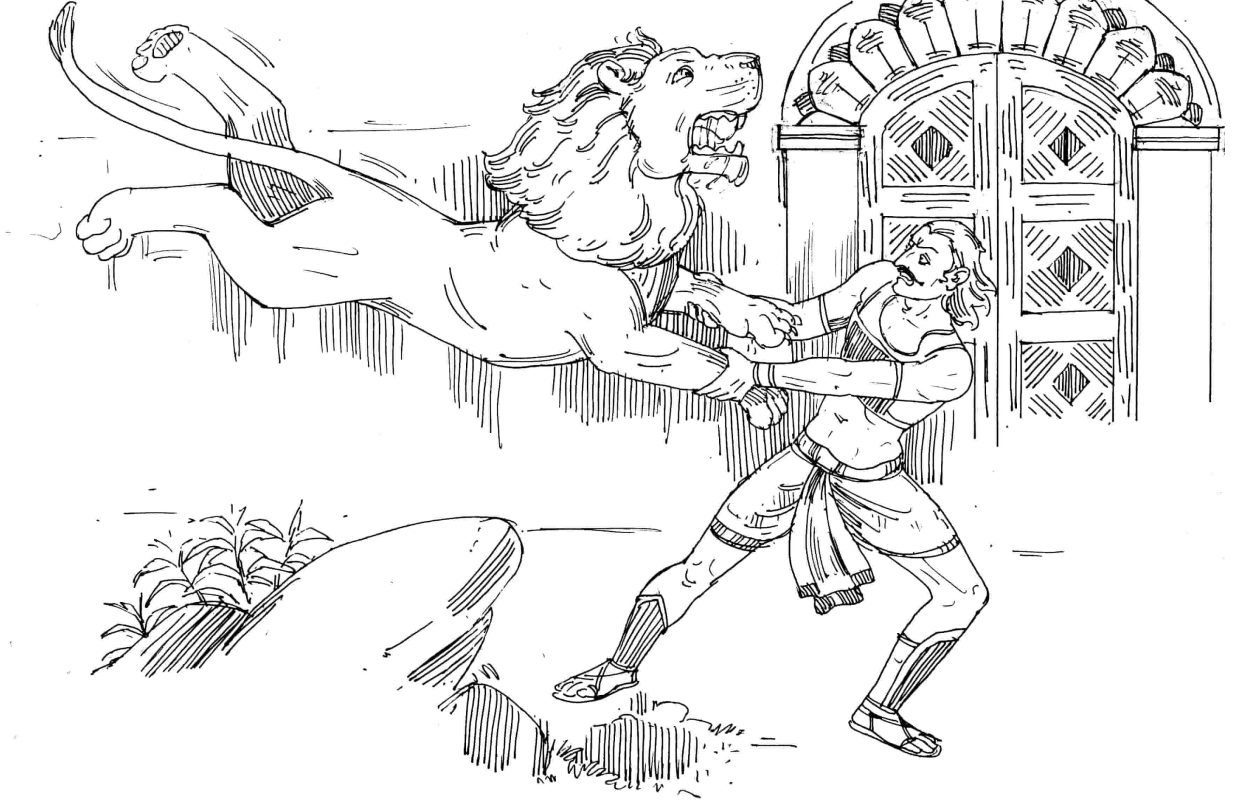
নির্ভীক শ্রীদত্ত তার সামনের দুটো ঠ্যাং ধরে ফেলে মাথার ওপর ঘুরিয়ে আছাড়ের পর আছাড় মেরেছিল। অক্কা পেয়েছিল পশুরাজ।

বড়ো নাতনির মতলবটা এতক্ষণে পরিষ্কার হল শ্রীদত্তের কাছে, এইজন্যেই সেই জলকেলি? ভুলিয়ে নিয়ে এলেন আমাকে?

কটাক্ষ হেনে বললে বিদ্যুৎবরণী, আজ্ঞে পুরস্কারও পাবেন সিংহকে যদি হারাতে পারেন।

কী পুরস্কার?

শ্রীদত্ত ভেবেছিল বুঝি দশ হাজার কন্যা তার বউ হতে চাইবে। ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়েছিল।

বিদ্যুৎবরণী কিন্তু নয়নবাণে তাকে বিঁধে রেখে মিষ্টি করে বললে, একটা তলোয়ার।

শুধু একটা তলোয়ার?

যে সে তলোয়ার নয়। এর নাম মৃগাঙ্ক। 'মৃগাঙ্ক' সবাইকে হারায়। নিজে হারে না। 'মৃগাঙ্ক' ঘুরিয়ে আপনি পৃথিবীর রাজা হতে পারবেন।

রাজি হয়ে গেল শ্রীদত্ত। দশ হাজার মেয়ে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল বাপের বাড়ির সামনে। দূর থেকে দেখিয়ে দিল সিংহকে, দরজা আগলে রয়েছে। দেখিয়ে দিয়েই নিজেরা সরে পড়ল। শ্রীদত্ত এগিয়ে যেতেই গর্জন ছেড়ে লম্ফ দিয়ে এগিয়ে এসেছিল পশুরাজ। নির্ভীক শ্রীদত্ত তার সামনের দুটো ঠ্যাং ধরে ফেলে মাথার ওপর ঘুরিয়ে আছাড়ের পর আছাড় মেরেছিল। অক্কা পেয়েছিল পশুরাজ।

শাপমুক্তিও ঘটেছিল তৎক্ষণাৎ। সিংহের জায়গায় আবির্ভূত হয়েছিল এক দিব্যকান্তি পুরুষ। মহাশক্তিধর অসি 'মৃগাঙ্ক' উপহার দিয়েছিল শ্রীদত্তকে। শূন্যে বিলীন হয়েছিল পরক্ষণেই।

দশ হাজার কন্যা ফিরে এসেছিল তৎক্ষণাৎ। হৈ-হৈ করে শ্রীদত্তকে নিয়ে ঢুকেছিল বাপের বাড়ি।

মানে, দৈত্য প্রাসাদে। এই দশ হাজার মেয়েও তো দৈত্যকন্যা। বিদ্যুৎপ্রভা মহাখুশি হয়ে একটা আংটি পুরস্কার দিল শ্রীদত্তকে। বড়ো ক্ষমতাবান আংটি। বিষনাশক। সাপের বিষও জল হয়ে যায় এই আংটির গুণে।

তা না হয় হল। কিন্তু শুধু আংটি আর অসি নিয়েই তো খুশি নয় শ্রীদত্ত। সে চায় দৈত্যকন্যা বিদ্যুৎপ্রভা বর হতে।

সে ইচ্ছে বুঝেছিল বিদ্যুৎপ্রভা। বড়ো বুদ্ধিমতী মেয়ে। তার ওপর মায়াবতী তো বটেই।

দুই চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়ে বলেছিল, এই যে সরোবর দেখছেন, এর মধ্যে কুমির খুকখুক করছে। আপনি 'মৃগাঙ্ক' তলোয়ার চালিয়ে তাদের কচুকাটা করে উঠে আসুন। তারপর একসঙ্গে জলে নামা যাবে। জলকেলির পর শয়ন আর রমণ। কেমন?

তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল শ্রীদত্ত।

মায়ারাজ্যও মিলিয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ।

এক ডুব দিয়েই মাথা তুলে দেখেছিল, গঙ্গার যেখান থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিল, দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠিক সেই জায়গায়।

কিন্তু হাতে রয়েছ মৃগাঙ্ক অসি, আঙুলে রয়েছে বিষহর আংটি।

ভোজবাজি!

গঙ্গাতীর ফাঁকা। বন্ধুরা কেউ নেই!

এরই নাম ললনার ছলনা। ভিজে গায়ে সারাশরীরে হিল্লোল তুলে জলে ভেসে গেছে, যেন বঁড়শিতে গেঁথে শ্রীদত্তকে টেনে নিয়ে গেছিল পেছন পেছন, কার্যসিদ্ধির জন্য।

এখন সব নিপাত্তা!

অথচ ঘটনাটা অলীক কল্পনা নয়। বেশ সময় গেছে মায়ারাজ্যে। বন্ধুরা প্রস্থান করেছে যে-যার আলয়ে।

অগত্যা শ্রীদত্তও পা বাড়িয়েছিল বাড়ির দিকে। পথে দেখা হল বন্ধুবর নিষ্ঠুরক-এর সঙ্গে।

নিষ্ঠুরক বললে, তুমি তো গঙ্গায় ডুবে গেলে। বহুদিন খুঁজলাম তোমাকে। পেলাম না। তখন সবাই মিলে বন্ধুশোকে যে-যার গলা কাটতে গেছিলাম। দৈববাণী শুনে তাও পারলাম না। আকাশ থেকেই বলা হল আমাদের, আত্মহত্যা যেন না করি।

তখন রওনা হলাম তোমার বাড়ির দিকে। পথ আটকাল একটা লোক।

সে দিল ভয়ানক সংবাদ। আগের রাজা মারা গেছে। তার ছেলে বিক্রমশক্তি রাজসিংহাসনে বসেই কালনেমির কাছে শ্রীদত্তের খবর জানতে চেয়েছিল। কালনেমি নিজেই জানে না ছেলে কোথায়। তাই বলতে পারেনি। রাজার কিন্তু বিশ্বাস হয়নি। পরের দিনই কালনেমি আর তার স্ত্রীকে শূলে চাপিয়ে মেরে ফেলেছে।

নিষ্ঠুরক বললে, এই শুনে রওনা হয়েছিলাম উজ্জয়িনীর দিকে। পথে দেখা অন্য বন্ধুদের সঙ্গে। তারা বললে, আমি যেন এখানে গা-ঢাকা দিয়ে তোমার প্রতীক্ষায় থাকি।

তাইতো দেখা পেলাম তোমার। এখন চলা উজ্জয়িনী, সব বন্ধু আছে সেখানে।

হাতের মুঠো পাকিয়ে মনে মনে শপথ করেছিল শ্রীদত্ত, বদলা সে নেবেই।

সেই সঙ্গে ভেবেছিল, আশ্চর্য একটা কাকতালীয়। বিদ্যুৎপ্রভার মদির আকর্ষণে সে যদি নিরুদ্দেশনা হত, তাহলে তো নির্ঘাৎ শূলে চাপতে হত তাকেও!

ললাট লিখন বড়ো রহস্যময়!

পথে যেতে যেতে ঘটল আবার একটা অদ্ভুত ব্যাপার। দেখা হয়েছিল এক মেয়েছেলের সঙ্গে। কেঁদে কেঁদে সে বলেছিল, আমার কেউ নেই। মালব দেশে যাব। সঙ্গে নিয়ে যাবেন?

রাজি হয়েছিল শ্রীদত্ত আর নিষ্ঠুরক। রাত নামতেই ঠাঁই নিয়েছিল রাস্তার পাশের একটা খালি ঘরে। মেয়েটি শুয়েছিল এক পাশে, অন্যপাশে শ্রীদত্ত আর নিষ্ঠুরক।

রাত গভীর হতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল দুই বন্ধু। মেয়েটি কিন্তু চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল। এখন উঠে ঘুমন্ত নিষ্ঠুরককে নির্মমভাবে মেরে ফেলে। তার মাংস চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে লাগলো বেশ আওয়াজ করে করে।

সেই আওয়াজেই খুম ভেঙে গেছিল শ্রীদত্তের।

তৎক্ষণাৎ কোশমুক্ত করেছিল তরবারি। এককোপে পিশাচিনীর মুণ্ড ধড় থেকে নামিয়ে দিতে গেছিল।

তার আগেই পাল্টে গেল মেয়েটার চেহারা। সে এখন এক ভয়ংকরী রাক্ষসী।

ধুন্ধুমার লড়াই লেগে গেছিল মানুষ আর রাক্ষসীতে।

খপ করে রাক্ষসীর চুলের গোছা খামচে ধরেই যেই তার গলা কাটতে গেছে শ্রীদত্ত, অমনি....

রাক্ষসী হয়ে গেল এক পরমাসুন্দরী। অঙ্গ ঘিরে প্রভা। এককথায়, দেবদ্যুতি। মর্ত্যকন্যা নয়।

শ্রীদত্ত যখন থতমত, তখন সবিনয়ে বললে সেই প্রভাময়ী, আমাকে মারবেন না, আমি রাক্ষসী নই। মহাঋষি কৌশিক-এর অভিসম্পাতে আমার এই অবস্থা হয়েছে। তাঁর ধ্যান ভাঙানোর জন্যে যক্ষপতি কুবের আমাকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন। যখন রূপযৌবন দিয়ে ওঁকে টলানো গেল না। তখন ভৈরবী রূপে জয় করতে গেছিলাম। ফল হল উল্টো। ভীষণ রেগে গিয়ে শাপ দিলেন মহর্ষি, যা, গর্তে গিয়ে থাক। খিদে পেলে মানুষের মাংস খাবি। চেহারাটা থাকবে মেয়েছেলের, খিদের সময়ে রাক্ষসী। আমার কান্নাকাটি শুনে একটু নরম হয়ে মহর্ষি বললেন, যেদিন কেউ তোর চুলের গোছা মুঠোয় ধরে গলা কাটতে যাবে, শাপমুক্তি হবে সেইদিন। সেই থেকে আছি এই নগরের বাইরের এক গর্তে। অনেক মানুষ মেরেছি, তাদের রক্ত আর মাংস খেয়েছি, আজ আপনি আমার মস্ত উপকার করলেন। বলুন কি চান, তাই পাবেন।

শ্রীদত্ত বললে, নিষ্ঠুরককে বাঁচিয়ে দিন।

তাই হোক, বলেই বাতাসে মিলিয়ে গেল সেই দিব্যরমণী। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল নিষ্ঠুরক, শরীরের কোথাও নেই কোনও ক্ষত। এক্কেবারে আস্ত।

ভোর হল। দুই বন্ধু রওনা হল উজ্জয়িনীর দিকে। পৌঁছল দিনের শেষে।

দেখা হয়ে গেল বন্ধুদের সঙ্গে।

ওরাই শ্রীদত্তকে নিয়ে গেল উজ্জয়িনীর মস্ত পালোয়ান বাহুশালীর কাছে। সে এখন এদের বন্ধু।

তার বাড়িতেই রইল সবাই।

এই সময়ে শুরু হল বসন্তকালের মহাউৎসব। যুবক যুবতীদের যৌবনোৎসব। বন্ধুদের নিয়ে শ্রীদত্ত গেল সেই মদনোৎসব দেখতে।

গিয়ে দেখল বটে একটা দৃশ্য। উৎসব-প্রাঙ্গণে তিল ধারণের জায়গা নেই। দুর্বার যৌবন দেশের সমস্ত সেরা সুন্দর আর সুন্দরীদের টেনে এনেছে বিশাল প্রাঙ্গনে। যৌবন তাদের মাতিয়ে দিয়েছে। যৌবন বিলাসে প্রমত্ত সব্বাই।

একটু পরেই এল মৃগাঙ্কবতী, উজ্জয়িনীর রাজকন্যা।

নয়ন জুড়িয়ে গেছিল শ্রীদত্তের। উত্তাল হয়েছিল হৃদয়। দুর্বার হয়েছিল শোণিত ধারা শিরায় উপশিরায়। কামনার আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল অণুপরমাণুতে।

আকাশ থেকে বুঝি একটা বিদ্যুৎ নারী অবয়ব নিয়ে দেখা দিয়েছে উৎসব প্রাঙ্গণে। তনুবরের কোথাও কোনও খুঁত নেই। সবচেয়ে আকর্ষণীয় তার দুই চোখ। আড়চোখে চাওয়া। চাহনির মধ্যে লক্ষ বিদ্যুতের ইঙ্গিতময় সঞ্চরণ।

মজে গেছিল শ্রীদত্ত। তন্বী ওই কন্যাকে তার চাই, রাত স্বয়ং বুঝি মূর্তি ধারণ করে এসেছিল শ্রীদত্তের সামনে। বঙ্কিম কটাক্ষে তার চিত্ত ঝলসে দিয়ে নিজেও মরেছিল। ওই সুঠাম সুন্দর বীরপুরুষকে তারও চাই।

কামশরে জর্জর হয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে গেল মৃগাঙ্কবতী। শ্রীদত্তের মনে হল যেন আকাশের চাঁদ চলে গেল প্রাঙ্গণ থেকে।

সেই অবস্থা দেখে বললে এক বন্ধু চলো, রাজকন্যা যেখানে, সেখানে যাওয়া যাক।

তৎক্ষণাৎ দুজনে হাজির হল রাজপ্রাসাদের সামনে। ঠিক সেই সময়ে হাহাকার শোনা গেল অন্তঃপুরে, সাপে কামড়েছে....সাপে কামড়েছে.... রাজকন্যাকে সাপে কামড়েছে।

কান্নায় ভেঙে পড়ল রাজবাড়ির সব্বাই।

শ্রীদত্তের বন্ধু দৌড়ে গেল অন্তঃপুরের এক বৃদ্ধব্যক্তির সামনে। বললে, আমার বন্ধুর কাছে আছে বিষ নামানোর আংটি, তাকে ডাকব?

নিশ্চয়, নিশ্চয়। শ্রীদত্তকে নিয়ে একদৌড়ে মুমূর্ষু মৃগাঙ্কবতীর পাশে হাজির হয়েছিল বৃদ্ধ। সাপের দাঁতের দাগ যেখানে, সেই জায়গায় আংটির পাথর চেপে ধরেছিল শ্রীদত্ত।

চোখ মেলেছিল মৃগাঙ্কবতী। বিষ নেই শরীরে। হই হই পড়ে গেল রাজপ্রাসাদে। রাজা ছুটে এলেন শ্রীদত্তকে দেখতে। দিলেন অনেক ধনরত্ন। সে সব নিয়ে শ্রীদত্ত করবে কী? বাড়ি ফিরে এসে দিয়ে দিল বাহুশালীর বাবাকে—যার বাড়িতে সে এখন রয়েছে।

তার দরকার মৃগাঙ্কবতীকে। প্রেমজ্বরে কাহিল হয়ে পড়ল বেচারা এই ঘটনার পর থেকেই। বন্ধুরা হল চিন্তিত।

হঠাৎ একদিন রাজবাড়ি থেকে একটি মেয়ে এল শ্রীদত্তের কাছে। সে মৃগাঙ্ক দত্তের সখী। তার নাম ভাবনিকা। সুখবরটা শোনা গেল তার মুখে।

রাজকন্যা বলে পাঠিয়েছে, যে আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে, তাকেই সে বিয়ে করবে। নইলে আত্মহত্যা করবে।

কিন্তু বিয়েটা হবে কী করে?

বন্ধুরা বললে, কৌশলে। রাজকন্যা লুকিয়ে চলে যাক মথুরায়। বিয়ে হোক সেখানে।

অর্থাৎ বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করা।

মতলবটা চমৎকার। সখী ভাবনিকা তৎক্ষণাৎ তা পাচার করে দিয়েছিল মৃগাঙ্কবতীকে।

কিন্তু রাজকন্যা চুপিসাড়ে বেরবে কী করে রাজবাড়ি থেকে?

পরিকল্পনাটা হল এই রকম :

বাহুশালী ব্যবসার অছিলায় চলে গেল মথুরায়। যাবার পথে জায়গায় জায়গায় লুকিয়ে রাখল ঘোড়া আর লোকজন।

শ্রীদত্ত সন্ধ্যার সময় একটা মেয়েছেলেকে আর তার মেয়েকে মদে বেহুঁশ করে পাঠিয়ে দিল রাজকন্যার কাছে।

সেয়ানা মৃগাঙ্কবতী বুঝে ফেলল, এরপর কী করতে হবে? প্রদীপ জ্বালানোর অছিলায় আগুন লাগিয়ে দিল, অন্তঃপুরে। সখী ভাবনিকাকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

সবাই তখন আগুন নিভোতে ব্যস্ত ছুটছে অন্তঃপুরের দিকে। দরজা তো বন্ধ করে এসেছিল মৃগাঙ্কবতী চম্পট দেওয়ার সময়ে।

শ্রীদত্ত বন্ধুবান্ধব নিয়ে দাঁড়িয়েছিল বাইরে। মৃগাঙ্কবতী আর ভাবনিকাকে নিয়ে রওনা হল মথুরার দিকে তৎক্ষণাৎ।

একটু গিয়েই শ্রীদত্ত ফিরে এসেছিল অগ্নিকাণ্ডের পরের খবর নিতে। একা। বন্ধুদের দিয়ে মৃগাঙ্কবতীকে পাঠিয়ে দিয়েছিল মথুরার পথে।

এসে দেখল, আগুনে পুড়ে মরেছে মাতাল সেই মেয়ে দুটি। সবাই ভেবেছে, রাজকন্যা সখীসহ পুড়ে মরেছে। রাজপুরী পুড়ে ছাই।

ভোর হতেই রাস্তার কয়েকটা লোক শ্রীদত্তকে দেখে কানাঘুসো করছে দেখে সরে পড়েছিল শ্রীদত্ত। গভীর রাতে পালিয়েছিল উজ্জয়িনী থেকে, হাতে সেই 'মৃগাঙ্ক' তরবারি।

পরের দিন সকালে পৌঁছেছিল বিন্ধ্য-জঙ্গলে। একটু গিয়েই দেখেছিল তার বন্ধুদের। প্রচণ্ড মার খেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে জঙ্গলের মধ্যে।

রাজকন্যা নেই! কোথায় সে?

ধুঁকতে ধুঁকতে বলেছিল আধমরা সঙ্গীরা, রাজকন্যাকে নিয়ে এই পর্যন্ত আসতেই ঝড়ের বেগে একদল ঘোড়সওয়ার আমাদের ওপর লাফিয়ে পড়ে, ছিনিয়ে নিয়ে গেছে রাজকন্যাকে।

পবনবেগে সে দিকে ছুটেছিল শ্রীদত্ত। দেখতে পেয়েছিল ঘোড়সওয়ারদের। এক জোয়ান নিজের ঘোড়ায় রাজকন্যাকে বসিয়ে ঘোড়া চালাচ্ছে।

এত বড়ো স্পর্ধা! দৌড়ে গিয়ে সেই স্পধিত যুবককে এক হ্যাঁচকায় টেনে মাটিতে আছড়ে ফেলেছিল শ্রীদত্ত। এমনিতেই সে ভয়ানক পালোয়ান, তার ওপর রেগেছে। ফলে, স্রেফ আছাড় মেরে শেষ করে দিয়েছিল সেই যুবককে। মার মার করে তেড়ে এসেছিল অন্যান্য ঘোড়সওয়াররা তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে। তখন 'মৃগাঙ্ক' অসি ঘুরিয়েছিল শ্রীদত্ত শ্রীকৃষ্ণের 'সুদর্শন' চক্রের মতো। পরের পর জনাকয়েকের মুণ্ড উড়ে যেতেই বাকি ক'জন রনে ভঙ্গ দিয়েছিল। ঘোড়ায় উঠে উধাও হয়ে গেছিল চক্ষের নিমেষে।

পরিত্যক্ত একটা ঘোড়ায় মৃগাঙ্কবতীকে চাপিয়ে একটু যেতে না যেতেই প্রকাণ্ড একটা পাথর খসে পড়েছিল ঘোড়ার মাথায়। মারা গেছিল তৎক্ষণাৎ।

অতএব শুরু হয়েছিল পায়ে হাঁটা। পাহাড়ি পথ। জল নেই। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে মৃগাঙ্কবতীর। একটা গাছের তলায় জলের খোঁজে গেল শ্রীদত্ত। ইতিমধ্যে সন্ধ্যে নামল। জল নিয়ে ফেরার পথে রাস্তা হারাল শ্রীদত্ত। সেই গাছ আর মৃগাঙ্কবতীকে খুঁজে পেল না। অগত্যা উঠে বসল অন্য একটা গাছে।

ভোর হতেই খুঁজে খুঁজে হারিয়ে যাওয়া গাছ পেল বটে শ্রীদত্ত, মৃগাঙ্কবতীকে পেল না!

উঠল একটা পেল্লায় মহীরুহর মগডালে। বহুদূর পর্যন্ত চোখ চালিয়েও দেখতে পেল না মৃগাঙ্কবতীকে।

গাছে ওঠবার সময় 'মৃগাঙ্ক' তরবারি মাটিতে রেখে গেছিল শ্রীদত্ত। একজন ব্যাধ সেটা কুড়িয়ে নিতেই হন্তদন্ত হয়ে নেমে এসেছিল গাছ থেকে।

আগে জানতে চেয়েছিল মৃগাঙ্কবতীর খবর, 'মৃগাঙ্ক' অসি চেয়েছিল তারপরে।

ব্যাধ বলেছিল, আমাদের পাড়ায় চলুন। যাকে খুঁজছেন, তার খবর ওখানে পাবেন। এই তলোয়ার ফেরত দেব তখন।

তক্ষুনি ব্যাধপল্লীতে গেছিলা শ্রীদত্ত। মৃগাঙ্কবতীর খবর পায়নি। শ্রান্ত ছিল বলে ব্যাধেরা খাবারদাবার এনে দিয়েছিল। খেতে না খেতেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল শ্রীদত্ত।

ঘুম ভাঙতেই দেখেছিল, দু'পায়ে লোহার শেকল আর বেড়ি।

দুর্দৈব আর বলে কাকে! দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল শ্রীদত্ত। কিন্তু সে যে ভাগ্যের হাতের পুতুল, তাও বুঝেছিল একটু পরে।

পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকেছিল এক ব্যাধ-রমণী। শ্রীদত্তের কানে কানে বলেছিল, এখানে কি মরতে এসেছ? ব্যাধ সর্দার এখন নেই। সে ফিরলেই তোমাকে বলি দেওয়া হবে চণ্ডিকা দেবীর সামনে।

শেকল ঝনঝনিয়ে শ্রীদত্ত বলেছিল, কিন্তু তুমি কে? এত রাতে এই গোপন খবর কেন দিতে এসেছ?

আমি ব্যাধ-সর্দারের বউ। আমার একটিই মেয়ে। সে তোমাকে দেখে মজেছে। তুমি তাকে বিয়ে করো। তারপর পালাও। আমার স্বামী রাগলে চণ্ডাল। এখন সে নেই। ফিরবে কালকে। তোমাকে মেরেই ফেলবে। পরে এসে আমার মেয়েকে নিয়ে যেও।

মুক্তিপণ একটাই, বিবাহ। শ্রীদত্ত রাজি তৎক্ষণাৎ। অরণ্যবালা ব্যাধকন্যাও নজর কাড়ার মতো রূপসী। কালো মাণিক। গান্ধর্ব মতে বিয়ে হয়ে গেল চুপিসাড়ে।

শ্রীদত্ত চম্পট দিল তারপরেই। 'মৃগাঙ্ক' তরবারির সন্ধান নিতে বলে গেল ব্যাধ শাশুড়িকে।

ভয়ংকর বিন্ধ্য-জঙ্গলে নিমেষে মিলিয়ে গেল পলাতক শ্রীদত্ত। কিন্তু মৃগাঙ্কবতীকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারল না কিছুতেই, ব্যাধকন্যাকে বউ হিসেবে পেয়েও।

পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরলা অনেক। নেই...নেই...কোথাও নেই মৃগাঙ্কবতী।

হঠাৎ দেখা এক বন-ভবঘুরের সঙ্গে। মৃগাঙ্কবতীর কথা তাকে জিজ্ঞেস করতেই পাল্টা প্রশ্ন করে বসল যে, মহাশয়ের নাম কি শ্রীদত্ত?

চমকে উঠেছিল শ্রীদত্ত। অচেনা এ-লোক তার নাম জানল কী করে?

হ্যাঁ। আমারই নাম শ্রীদত্ত। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?

জেনেছি তার মুখে, যাকে আপনি হন্যে হয়ে খুঁজছেন।

কোথায়....কোথায় সে?

এই মুহূর্তে আছে মথুরার কাছে নাগাস্থলি গ্রামে বিশ্বদত্তর কাছে।

আপনি জানলেন কী করে?

আমিই তো তাকে এই বন থেকে নিয়ে গেছি, কেঁদে কেঁদে ঘুরছিল, একা। প্রথমে নিয়ে গেলাম ব্যাধপাড়ায়। সেখানে কয়েকটা জোয়ান ছেলের নজর ভালো নয় দেখে ওখানে থাকতে চাইল না। নিয়ে গেলাম বিশ্বদত্তর কাছে। বুড়ো মানুষ। মেয়ের মতো রেখেছে। তারপর ফিরে এলাম আপনার খোঁজে।

শুভ খবর শুনে আর কী দাঁড়ায় শ্রীদত্ত? ছুট ... ছুট ... ছুট! সেদিন গেল, তার পরের দিন সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছোল নাগাস্থলি গ্রামে।

বৃদ্ধ বললে, কিন্তু সে মেয়ে তো এখন এখানে নেই। মথুরা রাজার মন্ত্রীর কাছে রেখে এসেছি। আজ এখানে থাকুন, কাল সকালে রওনা হবেন।

তাই করেছিল শ্রীদত্ত। কিন্তু কপালের দুর্ভোগ তখনও বাকি ছিল তো, তাই মথুরার এক পুকুরে স্নান করতে নেমে পেয়েছিল দুটো চোরাই জিনিস। একটা সোনার হার, আর একটা দামি কাপড়।

নেয়ে উঠে সেই দুটো জিনিস নিয়ে রাস্তায় পা দিতেই ধরেছে রাজার লোক। বিচার হয়েছে তৎক্ষণাৎ। হুকুম হয়েছে প্রাণদণ্ডের। বধ্যভূমিতেও নিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দেরি না করে।

শ্রীদত্ত ভেঙে পড়লেও নিয়তি কিন্তু হেসেছিলেন। কেননা, সোরগোল করে কাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মাথা নেওয়ার জন্যে, তা দেখতে বেরিয়ে এসেছিল মৃগাঙ্কবতী।

দেখেছিল শ্রীদত্তকে!

তৎক্ষণাৎ আর্জি জানিয়েছিল রাজমন্ত্রীকে, যার বাড়িতে তার ঠাঁই হয়েছে। শ্রীদত্তকে সে চেনে, ভালোবাসে। অমন মানুষ হয় না। সে কেন চোর হতে যাবে? ভুল.... ভুল....ভুল করেছে রাজার লোক। আসল চোরকে ধরতে না পেরে চোর সাজিয়েছে নিরপরাধ এক মহাবীরকে।

কাহিনির চমক এল এর পরেই। মুক্ত শ্রীদত্তকে রাজমন্ত্রীর সামনে আনার পর।

ইনিই সেই বিগতভয়, শ্রীদত্তের আপন কাকা, যিনি স্ত্রীর মৃত্যুর পর সংসারত্যাগী হয়েছিলেন। অনেক তীর্থ ঘুরে অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করে, নিজের ক্ষমতায় রাজার মন্ত্রী হয়েছেন।

শ্রীদত্তের পরিচয় পেয়ে নিজের পরিচয় দিলেন, তারপর বললেন, আজই বিয়ে করো মৃগাঙ্কবতীকে। টাকা-পয়সার জন্য ভেবো না। আমার সব সম্পত্তি তোমার, এক যক্ষিণী আমাকে দিয়েছিল পাঁচ হাজার ঘোড়া, আর সাত কোটি সোনার টাকা। তাও তোমার। বিয়ে হোক এখনি।

হয়ে গেল বিয়ে। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে এতদিন অনেক ভোগান্তির পর হল মধুমিলন। সেই রাতে মৃগাঙ্কবতীর চোখে চোখ রেখে গাঢ় সুরে বলেছিল শ্রীদত্ত, চাঁদবদনি ধনি আমার মৃগনয়নী....

আরও অনেক কথা। থাক তা গোপনে।

পরের দিন থেকেই কিন্তু আদাজল খেয়ে বন্ধুদের খোঁজ নেওয়া শুরু করেছিল শ্রীদত্ত।

কিন্তু কপাল যার খোলে, তা এমনি করেই খোলে!

দিন কয়েক যেতে না যেতেই কাকা বললেন, বাবা শ্রীদত্ত, মথুরা রাজকন্যার বিয়ে ঠিক হয়েছে, উজ্জয়িনীর রাজকুমারের সঙ্গে। মেয়েকে নিয়ে আমারই যাওয়ার কথা উজ্জয়িনীতে। কিন্তু আমার মন চাইছে। বিয়েটা হোক তোমার সঙ্গে। কৌশলে!

তিন নম্বর বউ!

কিন্তু কাকার ইচ্ছে মাথা পেতে নিয়েছিল শ্রীদত্ত। খুশি মনে।

পরিকল্পনা মাফিক কাকামশায় আগে বেরিয়ে গেলেন রাজকন্যাকে নিয়ে। শ্রীদত্ত বেরলো পরে, অনেক সৈন্য নিয়ে।

রাজধানী থেকে অনেক দূরে দেখা হল কাকা-ভাইপো-তে। রাজকন্যাকে নিয়েই শ্রীদত্ত চলে গেল বিন্ধ্যের জঙ্গলে। মৃগাঙ্কবতীও রইল সঙ্গে।

এখানেই ঘটল বিপদ। আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল একদল শবর-সেনানী। তারা অরণ্যের বাসিন্দা, বনযুদ্ধে পটু। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল শ্রীদত্তের সৈন্যবাহিনী। শবরসেনারা শ্রীদত্ত আর নতুন বউকে এনে রাখল চণ্ডিকা দেবীর মন্দিরে।

এই সেই মন্দির, যেখানে বলি দেওয়ার জন্যে শ্রীদত্তকে আটকে রাখা হয়েছিল ব্যাধপাড়ায়!

ব্যাধপাড়া খুব দূরে নয়। শ্রীদত্তের ব্যাধ-বউ খবর পেয়েই দৌড়ে এসে শবরদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল শ্রীদত্ত আর তার ভাবী সতীনকে।

উঠল ব্যাধ-রাজবাড়িতে। ব্যাধসর্দারের মৃত্যু হওয়ায় তখন ব্যাধ-কন্যাই পাড়ার সর্দারনী।

সুতরাং ব্যাধ পাড়ার সর্বেসর্বা হয়ে গেল রাজবাড়ির জামাই। ব্যাধ-বউ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মথুরা-রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দিল শ্রীদত্তের। তিন বউকে নিয়ে সুখে রইল শ্রীদত্ত। যথাসময়ে ফিরে পেল 'মৃগাঙ্ক' তরবারি।

শ্রীদত্ত রয়ে গেল কিন্তু ব্যাধ-পাড়াতেই। খবর পাঠিয়ে দিল দুই রাজা-শ্বশুরকে। তাঁরা খুশি হয়ে ছুটে এলেন মেয়েদের দেখতে।

তারপর একদিন দুই শ্বশুরের সৈন্য আর ব্যাধ-বউয়ের সৈন্য নিয়ে শ্রীদত্ত হানা দিল পিতৃঘাতক বিক্রমশক্তির রাজ্যে। তাকে নিহত করবার পর খোঁজখবর নিয়ে জুটিয়ে নিল আগের সব বাহুবলবান বন্ধুদের।

উদ্বেগে নিদ্রাহীন রাজা সহস্পানীকে দীর্ঘ এই গল্পপর শুনিয়ে তারপর বললে তার বন্ধু সঙ্গতক, স্বভাব যাদের ধীরস্থির শান্ত, এইভাবেই তারা দীর্ঘ বিরহ মুখ বুজে সহ্য করে। পরিশেষে পায় পুরস্কার, একাধিক বধূ। সহ্য করো, বিরহ জ্বালা সহ্য করো, শেষটা ভালোই হবে।

এইভাবেই গল্পমালার মধ্যে শান্তির প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল সহস্রানীকের অস্থির অন্তরে।

দিন কয়েক পরেই ঋষি জামদগ্নির আশ্রমে গিয়ে রাজা ফিরে পেয়েছিল মৃগাবতী আর ছেলে উদয়নকে।

রাজ্যে ফিরে এসে উদয়নকে যুবরাজ করে দিয়েছিল সহস্রানীক। তারপরেই শুনেছিল এক আকাশবাণী, সময় হয়েছে। এখন থেকে কৌশাম্বীর রাজা হোক উদয়ন।

সংসার ত্যাগ করে সস্ত্রীক হিমাচলে চলে গেছিল সহস্রানীক, উদয়নকে সিংহাসনে বসিয়ে।

বাসবদত্তার কাহিনী

উদয়ন কিন্তু কিছুদিন পরেই রাজ্যশাসনে আর ততটা মন না দিয়ে শিকারের আনন্দ নিয়ে মেতে গেল। মাথায় চাপল আর একটা উৎকট খেয়াল। সাপের কাছে পাওয়া বীণা বাজাত জঙ্গলে গিয়ে। যেন সম্মোহিত হয়ে যেত বনের জানোয়াররা। কাছে এসে দাঁড়াত। উদয়ন তাদের ধরে এনে রেখে দিত অন্তঃপুরে।

যুবক হবার পর তার মন গেল রমণী সম্ভোগের দিকে। রূপেগুণে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। চাই এমন সঙ্গিনী।

অনেক ভেবে দেখল, সে রকম মেয়ে একজনই আছে। তার নাম বাসবদত্তা। কিন্তু বাসবদত্তার বাবা চণ্ডমহাসেন তো উদয়নের পয়লা নম্বর শত্রু। শত্রুকে কেউ জামাই করে।

অপরদিকে, একই ভাবনা ভেবে চলেছেন উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ডমহাসেন। জামাই করতে গেলে উদয়নকেই করতে হয়। কিন্তু সে যে আবার মহাশত্রু!

আমার মেয়েকে সে বিয়ে করতে রাজি হবে কেন?

একটা কৌশল করা যাক। উদয়ন বীণা বাজায় চমৎকার। বনের পশুও মুগ্ধ হয়ে যায়। উদয়নকে বন থেকে ধরে এনে মেয়ের গানের শিক্ষক করে দেওয়া যাক। রূপ দেখে ভুলবে। বিয়েটাও হয়ে যাবে।

এই ভেবে চণ্ডিকা মন্দিরে গিয়ে দেবীর আরাধনায় মন দিলেন চণ্ডামহাসেন।

শোনা গেল আকাশবাণী, তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হবে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে মন্ত্রী বুদ্ধদত্তের সঙ্গে কথা বললেন রাজা। মন্ত্রী বললে, ভাবছেন কেন? মিষ্টি কথায় সব হয়। শত্রুজয়ও হয়।

শুনে, বন থেকে উদয়নকে ধরে আনার পরিকল্পনা ত্যাগ করলেন রাজা, দূত পাঠালেন কৌশাম্বীতে।

উদয়নকে সে বললে, রাজকন্যা বাসবদত্তা আপনার কাছে গানবাজনা শিখতে চায়। আপনি দয়া করে আসুন উজ্জয়িনীতে।

এই বলেই সরে পড়েছিল দূত। কেননা, শিক্ষকতার আমন্ত্রণ মনে ধরেনি উদয়নের। এ যেন গায়ে পড়ে অপমান করা।

মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণের সঙ্গে পরামর্শে বসেছিল। মতলবটা কি রাজা চণ্ডমহাসেনের?

সৌগন্ধনারায়ণ সোজা কথা সোজাভাবেই বলে দিল, আপনি নিজেকে শোধরান। ভোগ বাসনা ত্যাগ করুন। আপনার মনে লোভ জেগেছে বলেই তো নিজের মেয়েকে দিয়ে আপনাকে জয় করতে চাইছেন উজ্জয়িনীর রাজা।

দূত চলে গেল উদয়নের তরফ থেকে চণ্ডমহাসেনের সামনে। বললে সবিনয়ে কৌশাম্বীরাজ উদয়ন অবশ্যই আপনার মেয়েকে গানবাজনা শিখিয়ে দেবেন, কিন্তু রাজকন্যাকে গিয়ে তাঁর শিষ্যা হতে হবে কৌশাম্বীতে।

এই বলেই সরে পড়েছিল দূত। চণ্ডমহাসেনের মুখেও কোনও জবাব আসেনি!

মানুষ যখন প্রেমে পড়ে, তখন সে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। উদয়নের অবস্থা হয়েছিল তাই। দূত পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে ফিকির আঁটছিল, দূর ছাই! এত কথার কী দরকার? সোজা যাই সৈন্যসামন্ত নিয়ে।

চণ্ডমহাসেনের রঙ্গ ঘুচিয়ে দিই রণক্ষেত্রে লুঠ করে নিয়ে আসি বাসবদত্তাকে।

মন্ত্রীর সঙ্গে সেই ব্যাপারে যুক্তি করতে গিয়েই পেল বাধা। পেল সুযুক্তি, খবরদার! অমন কাজটি করতে যাবেন না। চণ্ডমহাসেনের অমন নাম কেন হয়েছে জানেন? আগে ওঁর নাম ছিল শুধু মহাসেন। বাপ-পিতামহ ছিলেন মস্ত বীর, উনিও তাই। তা সত্ত্বেও দেবী চণ্ডিকার কাছে হত্যে দিয়েছিলেন। কী চেয়েছিলেন? পরমাসুন্দরী এক পত্নী আর সর্বজয়ী এক খড়্গ। নিজের গায়ের মাংস কেটে দেবীকে নিবেদন করতে গেছিলেন। দেবী তাতে বাধা দিয়ে নিজের খড়্গ ওঁকে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এই খড়্গ দিয়ে বধ করো অঙ্গারককে। সে বনের অসুর। তার মেয়ের নাম অঙ্গারবতী। অমন রূপসী ত্রিভুবনে নেই। বিয়ে কর তাকে। আজ থেকে তোমার নাম হোক চণ্ডমহাসেন। চণ্ডিকার প্রসাদ পেলে বলে।

তারপর?

বনে গিয়ে এক বিরাট শুওরকে দেখে তীর ছুঁড়েছিলেন চণ্ডমহাসেন। তীরবিদ্ধ শুওর ঢুকে গেছিল একটা ভয়ানক বিবরে। রাজাও ঢুকেছিলেন। দেখেছিলেন অপূর্ব সুন্দর একটা রাজপুরী। সামনে একটা মস্ত সরোবর। অসাধারণ এক সুন্দরী স্নান করতে নামছে, তাকে ঘিরে অনেক সুন্দরী। রাজাকে দেখেই সেই পরমাসুন্দরী তাঁর পরিচয় জানতে চেয়েছিল। এই গুহার মধ্যে ঢুকলেন কি করে, তাও জানতে চেয়েছিল।

তারপর?

চণ্ডমহাসেন বলেছিলেন তিনি কে, কীভাবে এসেছেন বরাহের পেছন পেছন। শুনেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল সেই অপরূপা। আশ্চর্য হয়ে গেছিলেন চণ্ডমহাসেন। এত কান্না কীসের? অলোকসামান্যা রূপসী বলেছিল, কাঁদছি আপনার পরিণাম ভেবে। ওই যে শুওরের পেছন পেছন এসেছেন, ও আসলে এক অসুর। ওর নাম, অঙ্গারক। আমি তারই মেয়ে, অঙ্গারবতী।

লাফিয়ে উঠেছিলেন চণ্ডমহাসেন, কী আশ্চর্য! আমি তো তোমার খোঁজেই এসেছি, দেবী চণ্ডিকার আদেশে।

কাঁদতে কাঁদতেই বলেছিল অঙ্গারবতী, কিন্তু রাজা কাজটা অত সোজা নয়। এই যে সহচরীদের দেখছেন, সংখ্যায় এরা একশো। প্রত্যেকেই এক-একজন রাজকন্যা। অঙ্গারক এদের ছিনিয়ে এনে আমার সেবাদাসী করে রেখেছে।

হুঙ্কার ছেড়েছিলেন চণ্ডমহাসেন, কোথায় সেই অঙ্গারক?

ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘুম ভাঙলেই আপনার প্রাণ নেবে। এরকম ভয়ংকর স্বভাব আগে ছিল না। অভিশাপের ফলে হয়েছে। সে এখন অবধ্য।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেছিল চণ্ডমহাসেনের মগজে। বলেছিলেন, অত কান্নাকাটি এখানে না করে অঙ্গারকের সামনে করলেই তো হয়।

কেন?

তাহলে তোমাকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে পারি।

কীভাবে?

বাপের সামনে হাউ-হাউ করে কাঁদলেই তার ঘুম ভেঙে যাবে। তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, অত কান্না কীসের? তুমি আরও জোরে কেঁদে উঠে বলবে, হঠাৎ তুমি মারা গেলে আমার কী দশা হবে ভেবে কাঁদছি।

এই নাটক করলেই আপনি আমার পতি হবেন?

হবো।

অঙ্গারবতী সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে বেশ আওয়াজ করে কাঁদতে বসেছিল ঘুমন্ত বাবার সামনে। চণ্ডমহাসেন সেই ঘরেই লুকিয়ে দেখছিলেন আর কানখাড়া করে শুনছিলেন।

ধড়মড় করে উঠে বসে মেয়ের মুখে কান্নার কারণ শুনে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল অঙ্গারক। বাঁ হাত উঁচু করে বলেছিল, এই যে এখানে একটা ছেঁদা দেখছিস, এই ছেঁদায় অস্ত্র ঢুকলে তবে আমি মরব, নইলে নয়। কিন্তু লড়াই যখন করি, বাঁহাতে ধরা ধনুক দিয়ে তা ঢেকে রাখি। কেউ দেখতে পায় না। শরীরের অন্য জায়গায় অস্ত্রাঘাত করে, কিছুতেই আমাকে মারা যাবে না। ফলে, আমার মরণ নেই বললেই চলে।

আড়াল থেকে সব শুনে তির-ধনুক নিয়ে তৈরি হয়ে রইলেন চণ্ডমহাসেন। স্নান করে এসে যেই শিবপূজায় বসেছে অঙ্গারক, অমনি চণ্ডমহাসেন তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাতে উদ্যত তির-ধনুক।

অবাক হয়েছিল অঙ্গারক। কিন্তু মুখে কথা বলতে পারেনি মৌন থেকে পুজো করছিল বলে। ডান হাত ছিল কোশাকুশিতে। তাই বাঁ হাত তুলে সংকেতে বলেছিল চণ্ডমহাসেনকে একটু সবুর করতে।

সেই হয়েছিল তার কাল। বাঁ হাতের ছেঁদায় তীর ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন চণ্ডমহাসেন।

মৃত্যু হল অঙ্গারকের। তার রূপসী আর কামুকী কন্যাকে নিয়ে উজ্জয়িনী ফিরে গেলেন চণ্ডমহাসেন।
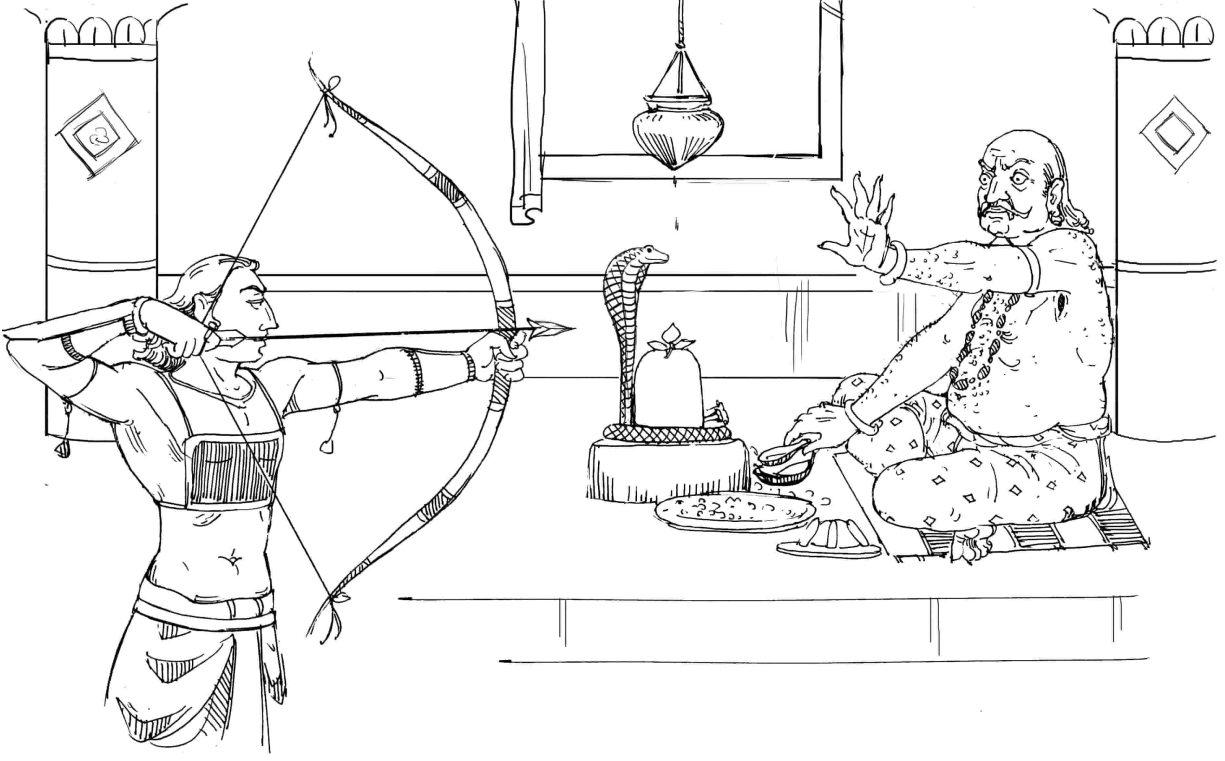
স্নান করে এসে যেই শিবপূজায় বসেছে অঙ্গারক, অমনি চণ্ডমহাসেন তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাতে উদ্যত তির-ধনুক।

সেই রূপবতী অসুর কন্যার গর্ভে পর পর এল দুটি ছেলে, তারপর ইন্দ্রোর বরে এল চোখ ধাঁধানো রূপসী এক কন্যা, এই বাসবদত্তা। ইন্দ্র অর্থাৎ বাসবের ইচ্ছায় ভূমিষ্ঠ সে, তাই তার নাম বাসবদত্তা। হয়তো ইন্দ্রেরই ঔরসজাত, তাই অমন সুন্দরী।

বাসবদত্তার জন্মমুহূর্তে শোনা গেছিল এক দৈববাণী। বাসবদত্তার গর্ভে আসবে কামদেবের এক অবতার, নাম বিদ্যাধর চক্রবর্তী।

সেই বাসবদত্তাই এখন বড়ো হয়েছে। যাকে তাকে দিয়ে তার গর্ভসঞ্চার করা যায় না বলেই সুলক্ষণ-যুক্ত জামাই হিসেবে আপনাকে বেছে রেখেছেন চণ্ডমহাসেন। সুতরাং তাঁর সঙ্গে যুদ্ধকরার অভিলাষ ত্যাগ করুন। তাঁর অভিলাষ যাতে পূর্ণ হয়, সেই কথা ভাবুন।

উদয়ন বন্দি হল কীভাবে

উদয়নের দূতের মুখে বার্তা শোনবার পর থেকেই চিন্তায় পড়েছিলেন চণ্ডমহাসেন, এ তো উভয়সঙ্কট। উদয়ন সম্মান খুইয়ে এখানে আসবে না, আমিও সম্মান খুইয়ে আমার মেয়েকে উদয়নের কাছে গান-বাজনা শেখার জন্যে পাঠাতে পারব না।

তাহলে কৌশলে উদয়নকে এখানে আটকে দিই।

ম্যাজিশিয়ানদের দিয়ে একটা বিরাট বুনোহাতি বানানো হল। রাজরক্ষীরা রইল তার পাহারায়। বুনোহাতি যত্রতত্র ঘুরতে ঘুরতে একদিন হাজির হল বিন্ধ্যের জঙ্গলে।

উদয়নের বনরক্ষীরা এসে খবর দিল, কী ভয়ানক! প্রকাণ্ড একটা হাতি জঙ্গল তোলপাড় করছে। যেন আর একটা বিন্ধ্য পাহাড়!

মৃগয়া-প্রিয় উদয়ন নেচে উঠেছিল খবরটা শুনে। তার মগজ জুড়ে তখন বাসবদত্তার চিন্তা। তাই ভাবল, এমন একটা ভয়ংকর হাতিকে যদি কব্জায় আনতে পারি, তাহলে তার পিঠে চেপে চণ্ডমহাসেনের চোখে

শর্ষেফুল দেখিয়ে বাসবদত্তাকে হরণ করে নিয়ে আসব।

পরের দিন সকালে মন্ত্রীবৈঠকে কিন্তু তার পরিকল্পনা নাকচ হয়ে গেল।

কর্ণপাত করল না উদয়ন। কামিনী-কাঞ্চনের আকর্ষণ পঙ্গুকেও গিরি লঙ্ঘন করিয়ে ছাড়ে। উদয়নের হাতে রয়েছে ঐন্দ্রজালিক বীণা। সুরের জাল পেতে বশ করবে বুনো হাতিকে।

লোকজন নিয়ে গেল জঙ্গলে। জাদুকরদের গড়া সেই কলের হাতিকে দেখেই সুরের জাল বিছিয়ে এগিয়ে গেল উদয়ন।

বনের অন্ধকারে উদয়ন আসলে বুঝতেই পারেনি, সুরমুগ্ধ সে হাতি তার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে, আসলে তা কলকব্জার হাতি। সঙ্গের লোকজন কে-কোথায় ছিটকে পড়েছে, তার নেই ঠিক। মহাকায় হাতি তালে তালে নেচে নেচে আসছে উদয়নের দিকে। উদয়ন ভাবছে বীণা তাকে বশ করেছে। খুব কাছাকাছি আসতেই ঘটাং করে খুলে গেল হাতির প্রকাণ্ড পেটের একটা দরজা। হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল চণ্ডমহাসেনের সশস্ত্র সৈনিক দল। বনের মধ্যেও আধারে গা ঢাকা দিয়ে ওঁৎ পেতেছিল তাঁর অস্ত্রধারী রক্ষীরা। দু-দিক থেকে সহসা আক্রান্ত হওয়াতে বীণা হাতে বন্দি হল কামিনী-কাতর উদয়ন।

চণ্ডমহাসেন কিন্তু সসম্মানে উদয়নকে রেখেছিলেন নিজের প্রাসাদে।

কিছুদিন পরে উদয়ন-হরণের কারণটা উদয়নকে নিবেদন করেছিলেন চণ্ডমহাসেন। রাজকন্যা গানবাজনা শিখুক এইখানে বসেই, এই তাঁর ইচ্ছা। সম্মান বজায় থাকুক দুই তরফেরই।

বাসবদত্তা বসেছিল দু-জনেরই সামনে। চণ্ডমহাসেনের কথা এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আর এক কান দিয়ে বের করে দিচ্ছিল উদয়ন। সে তখন একদৃষ্টে চেয়ে আছে, বাসবদত্তার দিকে। এত রূপ কোনও রমণীর অঙ্গে কখনও সে দেখেনি। বাসবদত্তাও চোখের পাতা ফেলতে ভুলে গেছিল উদয়নের দিকে চেয়ে থাকতে গিয়ে। এমন রূপবান পুরুষ মর্ত্যলোকে সে দেখল এই প্রথম।

প্রেম সর্বজয়ী। সুতরাং চণ্ডমহাসেনের কাজ হাসিল হয়ে গেল। ধরে আনার অপমান ভুলে গেল উদয়ন। ধন্য হয়ে গেল এমন একজন ছাত্রী পেয়ে।

শুরু হল সংগীত শিক্ষার আসর। মুখোমুখি দুজনে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।

এদিকে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে উদয়নের রাজ্যে। রাজা-হরণের বদলা নেবে দেশের সৈনসামন্ত।

কিন্তু উদয়নের প্রধান সেনাপতি বড়ো চতুর পুরুষ। হঠকারিতা করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। প্রথমত, চণ্ডমহাসেনের সৈন্যবল বেশি। দ্বিতীয়ত, উদয়ন তার খপ্পরে।

সুতরাং প্রয়োজন বুদ্ধির প্যাঁচ।

মন্ত্রী সায় দিল সেনাপতির পরামর্শে। অগ্রণী হল নিজে। একা নয়, সঙ্গে থাকবে উদয়নের প্রাণের বন্ধু বসন্তক।

যাবার সময়ে বলে গেল সেনাপতিকে, আমি কয়েকটা বিদ্যে জানি, পাঁচিল ফুটো করে ঢুকে যেতে পারি, পায়ের শেকল ভেঙে ফেলতে পারি, প্রয়োজনে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি। জানি আরও গুপ্তবিদ্যা। শত্রুব্যূহ ভেদ করে ঢুকে যাব, রাজা উদয়নকে নিয়ে বেরিয়েও আসব।

মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ বড়ো দূরদর্শী পুরুষ। তাই আগে গেল বিন্ধ্যের জঙ্গলে। সেখানকার পুলিন্দজাতের রাজা পুলিন্দকের সঙ্গে পরিকল্পনা ছকে নিল।

পুলিন্দক উদয়নের পুরোনো বন্ধু। চণ্ডমহাসেনের খপ্পর থেকে উদয়নকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে হবে তো এই বিন্ধ্য ; জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। তখন যদি চণ্ডমহাসেনের সৈন্যসামন্ত নিয়ে পিছু-ধাওয়া করে, পুলিন্দক যাতে তাদের ঠেকিয়ে দেয় গহন জঙ্গলে, সেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল দূরদর্শী মন্ত্রী।

তারপর গেল উজ্জয়িনীর ভয়ংকর শ্মশানে। সে শ্মশানের নাম মহাকাল। সেখানকার আঁধার-কালো বিকটাকার শবাধিষ্ঠিত বেতাল-ভূতেরা দিনের বেলাতেও টইল দেয় মহাশ্মশানে।

বুককাঁপানো এই শ্মশানে একজন ব্রহ্মরাক্ষস থাকতো, তার নাম যোগেশ্বর। মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণের সঙ্গে তার পূর্বপরিচয় ছিল।

নিশুতি রাতে এই যোগেশ্বরের বাড়িতেই গেল সৌগন্ধনারায়ণ।

কূটবুদ্ধি যোগেশ্বর সব শুনে বললে—ছদ্মবেশ নাও।

তৎক্ষণাৎ সৌগন্ধনারায়ণ অন্য লোক হয়ে গেল গুপ্তবিদ্যার জোরে। তখন বয়সের ভারে তার শিরদাঁড়া বেঁকে কুঁজো হয়ে গেছে, চুল দাড়ি পেকে শণের মতো সাদা হয়ে গেছে, চোখেমুখেও পাগল-পাগল চাহনি।

শুধু নিজের নয়, বসন্তকেরও ভোল পালটে দিল সৌগন্ধনারায়ণ। সুরূপ সেই যুবাপুরুষ এখন অতি-কদর্য চেহারার এমনই এক বৃদ্ধ যে দেখলেই ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়।

দিনের আলো ফুটতেই দুই ছদ্মবেশী বেরোলো উজ্জয়িনীর পথে। গন্তব্যস্থল রাজপ্রাসাদ। পথের লোকজন এই দুই সৃষ্টিছাড়া পুরুষকে দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। ভ্রূক্ষেপ না করে, রাজপুরীর সামনে গিয়ে আগে ছদ্মবেশী বসন্তককে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল সৌগন্ধনারায়ণ, নিজে ঢুকল তার পেছন পেছন।

প্রাসাদ-চত্বরে গিয়েই দুই বুড়ো অঙ্গভঙ্গী করে বেসুরোগলায় এমনই মজার নাচগান জুড়ে দিল যে হাসতে হাসতে পুরনারীরা খবর পাঠাল বাসবদত্তাকে। এমন রগড় না দেখলেই যে নয়।

বাসবদত্তা হুকুম দিল, নিয়ে এসো ওদের আমার গানের মজলিশে।

গানের মজলিশ তো রাজঅন্তঃপুরে। সেখানে ছদ্মবেশী সৌগন্ধনারায়ণ সঙ্গতকে রেখে গেল দরজায়, নিজে ঢুকল ভেতরে। ঢুকেই কী দেখল?

উদয়নকে হাতে-পায়ে শেকল বেঁধে রাখা হয়েছে!

ক্ষুরপ্রবুদ্ধি মন্ত্রী তিলমাত্র বিচলিত না হয়ে কৌতুক করার অছিলায় এমন একটা সংকেত করল যার অর্থ নিমেষে প্রাঞ্জল হয়ে গেল উদয়নের কাছে।

পলকে বুঝে নিল এই বিচ্ছিরি বুড়ো আসলে ছদ্মবেশী মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ!

কিন্তু কারও মুখে কথা নেই।

আচমকা বাতাসে মিলিয়ে গেল সৌগন্ধনারায়ণ, তিরস্করিণী বিদ্যার দৌলতে। তার জানা ছিল অদৃশ্য হওয়ার এই বিদ্যে।

বাসবদত্তা আর সখীদের চোখে সে অদৃশ্য হয়ে থাকলেও উদয়ন তো তাকে দেখতে পাচ্ছিল। সে অবাক হল না।

কিন্তু চোখের সামনে থেকে বিকট বুড়োর শূন্যে গলে যাওয়া নিয়ে যখন হইচই ফেলে দিয়েছে বাসবদত্তা আর সখীরা, তখন উদয়ন তাদের বুঝিয়ে বললে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? বুড়ো নিশ্চয় যোগবিদ্যা জানে।

অলৌকিক বলে কিছুই নেই, সবই অতীন্দ্রিয় শক্তির খেলা। সূক্ষ্ম দেহে নিজেকে লুকিয়ে রেখে ভয় দেখাচ্ছে তোমাদের। ভয় না পেয়ে, যাও, সরস্বতী পুজোয় বসে যাও, সুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আরাধনা করো, রোজ যা করো, তাই করো।

স্বরসপ্তকের সাধনায় তাকে পাঠিয়ে দিয়ে উদয়ন কিন্তু বিমূঢ় হয়ে রইল কামদেবের পঞ্চবানে : সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ তাপন, স্তম্ভন। তার তখন বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়ে দিয়েছিল, নইলে শেকলে বাঁধা অবস্থায় তাকে দিয়ে গীতকলা অধ্যয়ন করে যায় রাজকন্যা? রাজকুমারী নিজেও কৌচুমার যোগ জানে, স্বদেহে নানারকমের ব্যঞ্জনাসৃষ্টি করে, পরপুরুষকে মোহিত করে রাখতে পারে। চৌষট্টি কলার প্রথম চারটি কলা গীত, বাদ্য, নৃত্য, নাট্য মোটামুটি রপ্ত। উদয়নকে শেকল পরিয়ে চোখের বাণ মেরে কামপূরণের পথেই তো অগ্রসর হচ্ছিল।

মন্ত্রী এসে দিল বাগড়া।

কিন্তু উদয়ন মিষ্ট বচনে তাদের অনতিদূরের পুজোর ঘরে সরিয়ে দিতেই মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ রাজা উদয়নকে শিখিয়ে দিল কীভাবে ভাঙতে হবে হাত-পায়ের শেকল। শিখিয়ে দিল, এমন একটা মন্ত্র যা দিয়ে কামকাতর বাসবদত্তাকেও বশে আনা যাবে।

সবশেষে বললে, বসন্তককে বাইরে রেখে এসেছি, তাকে আপনি ভেতরে আনান। আর একটা কাজ করবেন, এই যে বশীকরণ মন্ত্র শিখিয়ে দিলাম, এর জোরে বাসবদত্তা আপনার হুকুমে চলবে। তখন আমি যা বলব তাই করবেন।

এই বলেই গীতমন্দির থেকে সরে পড়ল মন্ত্রী।

দেবী সরস্বতীর পুজো শেষ করে ফিরে এল বাসবদত্তা। উদয়ন তাকে বললে, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কে বুড়োবামুন। লোক ভালো। তাকে ভেতরে আনো। পুজোর দক্ষিণা তাকেই দাও। ভেতরে আনা হল বুড়োকে। মানে, ছদ্মবেশী বসন্তককে। উদয়নকে শেকল বাঁধা অবস্থায় দেখে সে কেঁদে ফেলেছিল।

বাসবদত্তা তো অবাক। বিটকেল বুড়োর এত কান্নাকাটি কেন?

পাছে সব ফাঁস হয়ে যায়, এই ভয়ে উদয়ন তাড়াতাড়ি বললে ছদ্মবেশী বন্ধুকে, উৎকট রোগে বিকট চেহারা হয়েছে বলে কাঁদছেন? এমন ওষুধ দেব, সব রোগ ভালো হয়ে যাবে।

বলে, গূঢ় হাসি হাসল উদয়ন।

নিমেষে হাসির অর্থ বুঝে নিল বন্ধু বসন্তক।

সুতরাং হাসি হাসতে হল তাকেও। শরীরকে দুমড়ে মুচড়ে অষ্টাবক্র আকারে সেই হাসি এমনই সংক্রামক যে হেসে গড়িয়ে পড়ল বাসবদত্তা আর তার সহচরীরা।

খিলখিল করে হাসতে হাসতে রাজতনয়া জিজ্ঞেস করেছিল ছদ্মবেশী বসন্তককে, আর, কী কী বিদ্যে জানা আছে আপনার?

বসন্তক বললে হাসির গল্প বলতে পারি।

তাই হোক।

শুরু হল হাস্যরসের গল্প।

এক বারবনিতা ছিল মথুরায়। তার নাম রূপিনিকা। প্রকৃতই রূপসী। তাই অমন নাম। তেমনি যৌবনবতী।

একদিন সে বুড়িমা'কে নিয়ে যাচ্ছে একটা মন্দিরের সামনে দিয়ে, দেখতে পেল আশ্চর্য রূপবান এক যুবাপুরুষকে। প্রেমে পড়ল তৎক্ষণাৎ।

সর্বনাশ। বহুবল্লভা যদি প্রেমে পড়ে, তাহলে যে তার দেহ-ব্যবসা লাটে উঠবে!

বুড়িমা অনেক বোঝাল মেয়েকে। কিন্তু একবগ্গা মেয়ে কামের প্রকোপে পড়ে সেসব সৎ উপদেশ গ্রাহ্য করল না।

যেভাবেই হোক এমন একটা কার্তিক ঠাকুরের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করতে হবে, দেহে এবং মনে। সে-ও নারী, নিছক দেহ-ব্যবসায়ে পেট ভরে, গায়ে গয়না ওঠে, কিন্তু মন ভরে না।

তাই বাড়ি ফিরেই কাজের মেয়েকে পাঠিয়ে আমন্ত্রণ জানাল সুন্দরকান্তি সেই যুবককে। একরাত কাটিয়ে যাওয়া হোক বারাঙ্গনা-অঙ্গনে। নিখরচায়।

শুনে তো অবাক সেই যুবক, সবিনয়ে বললে পরিচারিকাকে, দেখ বাপু, আমি বামুনের ছেলে, বেশ্যা-পাড়ায় যাই না। আমার টাকাও নেই। সুতরাং রূপিনিকা ঠকবে।

পরিচারিকা বললে, টাকা যার, বেশ্যা তার কথাটা ঠিকই। কিন্তু রূপিনিকা আপনার, টাকা ছাড়াই।

এমন কথা শুনলে মুনিরও মন টলে যায়। বামুনের ছেলেও রাজি হয়ে গেল বেশ্যা বাড়ি যেতে।

গিয়েই গেল আটকে। রূপিনিকা তাকে নিয়েই রইল দিনরাত। দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিল পয়সাওলা খদ্দেরদের।

মা-জননী বিপদ বুঝে একদিন মেয়েকে আড়ালে ডেকে বললে-দ্যাখো, মা, সাধু-পুরুষরা যেমন বদলোকের সংসর্গে থাকে না, বাজারের মেয়েরাও তেমনি যাদের পকেটে পয়সা নেই, তাদের পাত্তা দেয় না। বেশ্যা কখনও ভালোবাসে না। রোজগার করো মা, যাদের টাকা আছে, রূপযৌবন ছলাকলা দিয়ে তাদের মন ভোলাও নিংড়ে নাও। কপর্দকহীন এই ছোকরাকে বিদেয় করো।

শুনে তো রেগে টং রূপিনিকা, কী আশ্চর্য! বেশ্যা কি ভালোবাসতে পারে না? যাও, বিদেয় হও, এমন মানুষকে আমি ছাড়তে পারব না। আমি বারনারী হতে পারি, কিন্তু পতিতারও মন আছে। আমি অভিসারিকা রঙ্গ নটী হতে পারি, কিন্তু ভালোবাসার অধিকার আমারও আছে। ও আমার হৃদয় মন অধিকার করেছে, আর কাউকে আমি চাই না, এই দেহ তার, এই মন তার।

এ তো মহাজ্বালা! দেহটাই যার, পণ্যদ্রব্য, সেই দেহটা এক জায়গায় ধরিয়ে দিলে কারবার চলবে কী করে? বুড়ির পেটের ভাত জুটবে কোত্থেকে?

কিন্তু মেয়ের মুখের ওপর কথা বলতেও সাহস হল না। উন্মনা হয়ে ঘুরতে লাগল রাস্তায় রাস্তায়।

একদিন দেখল সেই দেশের-ই রাজপুত্রকে। সৈন্যরা পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে।

বুড়ি কেঁদে পড়ল তার পায়ে, বাঁচাও আমার মেয়েকে! সে পতিতা। কিন্তু একটা ছোকরা প্রেমের ফাঁদে তাকে ফেলে বাড়িতে বসে রয়েছে। পকেটে নেই পয়সা। আমার পেট চলবে কী করে? বেশ্যার মেয়ে বেশ্যাগিরি করুক। রাজপুত্র, তুমি এই ছোঁড়াকে মেরে তাড়াও। বিনিময়ে, আমার মেয়েটাকে ভোগ করে যাও!

বেশ্যার মায়ের আহ্বান! রাজপুত্র কি উপেক্ষা করতে পারে? বিশেষ করে রূপিনিকা তো লেলিহান আগুন। সুতরাং কামলালসায় জর্জরিত হয়ে রাজপুত্র সৈন্যসামন্ত নিয়ে তৎক্ষণাৎ হাজির হল রূপিনিকার বাড়ি। ঠেঙিয়ে বিদেয় করল ব্রাহ্মণ যুবককে।

রাজপুত্রকেও কিন্তু পাত্তা দিল না রূপিনিকা। বীরত্ব ফলিয়ে মুখ চুন করে বাড়ি ফিরল রাজপুত্র। হাজার হোক সে হল গিয়ে রাজপুত্র। বেশ্যার অমতে বেশ্যা-রমণ তো ধর্ষণের সামিল। রাজপুত্র হয়ে সে তা করতে পারে না।

সফল হল বুড়ি বেশ্যার চক্রান্ত। মেয়ে আবার রোজগারে মন দিল।

এদিকে মার খেয়ে সেই যুবক পথে বিপথে ঘুরে, এক তেপান্তরের মাঠ পেরতে গিয়ে পড়ল এক গর্তে। একে তো খিদে আর তেষ্টায় চোখে ধোঁয়া দেখছিল, তার ওপর আছাড়। বোর দেখল সর্ষেফুল!

ধাতস্থ হল একটু পরেই। হাঁচড়-পাঁচড় করে উঠল গর্তের গা বেয়ে। কিন্তু জিভ বেরিয়ে গেল জলহীন বৃক্ষহীন তেপান্তরের মাঠ পেরতে গিয়ে।

এমন সময়ে দেখল, একটা প্রকাণ্ড মরা হাতি পড়ে রয়েছে সামনে। চামড়া ঢাকা শুধু কঙ্কাল, পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি খেয়ে ফোঁপড়া করে দিয়ে গেছে শেয়াল-কুকুরেরা।

রোদ থেকে তো বাঁচা যাবে, এই ভেবে হাতির পেটে ঢুকে গেল যুবক। ছায়ায় ঘুম এসে গেল একটু পরেই।

দিন ফুরোল, সন্ধ্যে হল। আকাশে মেঘ ঘনাল, তুমুল বৃষ্টি নামল। যে ফুটো দিয়ে হাতির পেটে ঢুকেছিল ব্রাহ্মণ যুবক, ঠাণ্ডায় তা গুটিয়ে বন্ধ হয়ে গেল। জল জমে গেল মাঠে, কিন্তু এক ফোঁটাও জল ঢুকল না হাতির পেটে, ফুটো তো বন্ধ। মরা হাতি, তায় ফোঁপড়া, ভেসে উঠল জলের ওপর। ভাসতে ভাসতে গিয়ে পড়ল নদীতে। নদী থেকে সাগরে।

একটা প্রকাণ্ড পাখি ছোঁ মেরে মরা হাতি নিয়ে গিয়ে ফেলল ডাঙায়। ঠুকরে চামড়া ফাটাতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ব্রাহ্মণ যুবক। জ্যান্ত মানুষ দেখেই তৎক্ষণাৎ শূন্য পথে চমপট দিল মস্ত পাখি। ভোজবাজি নাকি? মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল ব্রাহ্মণ যুবক।

এমন সময়ে দুজন রাক্ষস সেখানে এসেই আঁৎকে উঠল জ্যান্ত মানুষ দেখে।

মানুষকে রাক্ষস ভয় পেল কেন?

রাম রাক্ষস বংশ ধ্বংস করেছিল বলে। প্রাণে এমন ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে মানুষ দেখলেই মাথার চুল খাড়া করে ফেলত রাক্ষসরা।

সেই লঙ্কাতেই মস্ত পাখি নিয়ে এসেছে বেচারা ব্রাহ্মণ যুবককে।

ভয়ের চোটে দুই রাক্ষস হাঁউমাউ করে তাদের রাজাকে বললে, কোত্থেকে একটা আপদ এসে জুটেছে লঙ্কায়। একটা মানুষ।

রাজা তো বিভীষণ। লঙ্কায় ফের মানুষ এসেছে শুনে তার তো চক্ষুস্থির। তৎক্ষণাৎ মানুষটাকে খাতির করে আনার জন্যে পাঠান দুই রাক্ষস-অনুচরকে।

সোনার লঙ্কার সব কিছুই তো সোনায় মোড়া। পথে যেতে যেতে সেই দেখে চক্ষু চড়কগাছ করে ফেলেছিল ব্রাহ্মণ-তনয়। সোনা....সোনা.... যেদিকে তাকাচ্ছে, সেই দিকেই সোনা। বাড়ি, রাস্তা, সব কিছু সোনা দিয়ে মোড়া!

সবচেয়ে সুন্দর রাক্ষসদের রাজপ্রাসাদ। ভেতরে ভয়ে কাঠ হয়ে বসেছিল বিভীষণ।

সবিনয়ে জিজ্ঞেস করেছিল ব্রাহ্মণ-তনয়কে, প্রভু, লঙ্কায় আগমন কীহেতু?

... মস্ত পাখির পিঠে উঠে বসেছিল লৌহজঙ্ঘ। দেখতে দেখতে সাগর পেরিয়ে,
নদীনালা মরুভূমি পেরিয়ে চলে এসেছিল মথুরায়।

ব্রাহ্মণ-যুবকের নাম লৌহজঙ্ঘ। বোকা মোটেই নয়, বিলক্ষণ চালাক। ধূর্ত বলেই বেশ্যার বাড়িতে বসে বেশ্যার অন্নধ্বংস করেছে এতদিন। বেশ্যাসম্ভোগ করেছে।

বিভীষণের মুখ চোখের অবস্থা দেখেই হামবড়া গলায় বলে গেল কাঁচা মিথ্যে, আমি গরিব বটে। কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর বরে শক্তিমান। আমার দারিদ্র্য ঘুচানোর জন্যে তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। আমাকে চোখ বন্ধ করতে বলেছিলেন, করেছিলাম। চোখ খুলতে বলেছিলেন, খুলেছিলাম। দেখি, সাগর পেরিয়ে চলে এসেছি আপনার রাজ্যে।

গালগল্প শুনে বিভীষণের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার উপক্রম। সবিনয়ে বললে, আজকের রাতটা ঘুমোন। কাল সকালেই পেয়ে যাবেন সোনাদানা মণি মুক্তো হিরে।

লৌহজঙ্ঘ টেনে ঘুম দিল সেই রাতে।

ঘুম নেই কিন্তু বিভীষণের চোখে। রাক্ষসদের পাঠিয়ে জঙ্গল থেকে ধরে আনল এক প্রকাণ্ড পাখিকে। পোষ মানানোও হল সেই রাতে। ভোর হতেই লৌহজঙ্ঘকে আনিয়ে, তাকে প্রচুর সোনাদানা রত্ন দিয়ে, পাখির পিঠে চাপিয়ে বিদেয় জানাল সোনার লঙ্কা থেকে।

বিদেয় নেওয়ার প্রাক্কালে একটু রগড় করে গেল লৌহজঙ্ঘ।

সোনার লঙ্কার দিকে আঙুল ঘুরিয়ে বললে, কী আশ্চর্য! সবই তো দেখছি কাঠ!

কাষ্ঠ হেসে, কৌতুকের মর্ম না বুঝে, বিভীষণ বললে : হেঁ, হেঁ! গড়ুরের জন্যেই সব কাঠ হয়ে গেছে!

সে কী! কীভাবে? লৌহজঙ্ঘ যেন ভীষণ অবাক।

আজ্ঞে, সেই যে সমুদ্র থেকে অমৃত-ভাণ্ড তুললেন গড়ুর। তারপর একটু জিরেন নেওয়ার জন্যে বসেছিলেন কল্পবৃক্ষের একটা ডালে। তাঁর ভারে মড়মড় করে ভেঙে পড়েছিল গাছের ডাল। পড়েছিল এই লঙ্কায়! সেই থেকে লঙ্কার সব কিছুই কাষ্ঠময়। হেঁ-হেঁ-হেঁ !

মনে মনে এক চোট হেসে নিয়ে মস্ত পাখির পিঠে উঠে বসেছিল লৌহজঙ্ঘ। দেখতে দেখতে সাগর পেরিয়ে, নদীনালা মরুভূমি পেরিয়ে চলে এসেছিল মথুরায়।

পাখির পিঠ থেকে নেমে সোনাদানা হিরে জহরত লুকিয়ে রাখল গোপন জায়গায়, পোষমানা পাখিকে কিন্তু ছাড়ল না। প্রকাণ্ড পাখি হয়ে গেল তার বাহন!

পতিতার প্রেমে, নকল হোক কী আসল হোক, আফিং থাকে। একবার স্বাদ পেলে আর ছাড়া যায় না। বেশ্যা সর্বনাশা এই কারণেই।

ধুরন্ধর লৌহজঙ্ঘও মরেছিল রূপিনিকার রূপ-যৌবনের মৌতাতে। কাম-উদ্দীপক লাল সিঁদুর মাথায় দিয়েও ঘরের বউ স্বামীকে তাতিয়ে রাখতে পারে না সারা জীবন। কিন্তু এক রূপোপজীবিনী পারে, স্বর্গের বারনারীদের জয়জয়কার এই কারণেই। মুনিদেরও মতিভ্রম ঘটায়।

এত লাঞ্ছনা পেয়েছিল রূপিনিকার বাড়িতে, তা সত্ত্বেও মথুরায় পা দিয়েই সেই রূপিনিকাই তাকে আকর্ষণ করেছিল চুম্বকের মতো। রতিক্রীড়ার মাদকতা, স্মৃতি তুফান তুলেছিল তার রক্তে।

কর্মফল! লৌহজঙ্ঘ পরের দিনই রওনা হয়েছিল রসবতী রূপিনিকার রস-মন্দিরে, সঙ্গে নিয়ে গেছিল কিছু টাকা। একটা সোনার টাকা ভাঙিয়ে কিছু রজতমুদ্রা রেখেছিল ট্যাঁকে, বাকি টাকা দিয়ে কিনেছিল একসেট বাহাড়ি পোশাক, গন্ধদ্রব্য, মাদকদ্রব্য ইত্যাদি।

কিনেছিল আরও চারটে জিনিস। একটা শাঁখ, একটা চাকা, একটা গদা, আর একটা পদ্ম।

রাত নামতেই জিনিস চারটে হাতে নিয়ে আর গলায় ঝুলিয়ে উঠে বসল পক্ষিবাহনে।

বাতাসে ঝড় তুলে বাহন তাকে নিয়ে গেল রূপিনিকার মদন-মন্দিরে। শূন্যে ভেসে রইল বৃহৎ পক্ষী, তার পিঠে আসীন লৌহজঙ্ঘ জলদগম্ভীর স্বরে ডাক দিল, রূপিনিকা! ও রূপিনিকা!

গম্ভীর সেই কণ্ঠস্বর আকাশবাণীর মতোই শূন্য থেকে আসছে শুনে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাড়ির বাইরে চলে এসেছিল বারবিলাসিনী রূপিনিকা।

চোখ কপালে উঠেছিল পরক্ষণই।

শূন্যে ভাসছে প্রকাণ্ড এক পাখি। তার পিঠে বসে ভগবান বিষ্ণু, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম সমেত।

রূপিনিকার চোখ ছানাবড়া হলেও সে বুদ্ধিমতী। খোদ বিষ্ণু যখন তার রতি-পরাক্রমের সংবাদ পেয়ে স্থির থাকতে পারেননি। তাহলে নিশ্চয় এঁকে বিভোর করতে পারলে স্বর্গের অপ্সরাদের পাশেই তার জায়গা নিশ্চিত।

তাই বিলোল কটাক্ষ হেনেছিল ছদ্মবেশী বিষ্ণুর দিকে চেয়ে।

দেখে, অতি কষ্টে হাসি চেপে বলেছিল লৌহজঙ্ঘ, প্রিয়তমা রূপিনিকে! কলাবতী রূপিনিকে! রতিরানী রূপিনিকে! তুমি নাকি প্রজাপতির লক্ষ অধ্যায়ের কামশাস্ত্র পাঠ করে ফেলেছ?

রূপিনিকা জীবনে তা পড়েনি। নন্দীর হাজার অধ্যায়ও পড়েনি, শ্বেতকেতুর পাঁচশো অধ্যায়ও পড়েনি, পাঞ্চাল বাভ্রবের পঞ্চাশ অধ্যায়ও পড়েনি। চোখ বুলিয়েছিল কেবল বাৎস্যায়নের সারসংকলনে। কামদশার দৌলতে সে তাইতেই মথুরার সেরা কামপত্নী।

সুতরাং সে দেহভঙ্গিমা করে অপাঙ্গে তাকিয়েছিল পক্ষিবাহনে আরূঢ় বিষ্ণুমূর্তির দিকে। সে চোখে ছিল কামের পঞ্চশর।

ভারি গলায় বিষ্ণু বলেছিল, আমি এসেছি তোমাকে কৃপা করতে। তুমি প্রকৃতই সেরা বেশ্যা কিনা, তার পরীক্ষা নেব।

সসম্ভ্রমে প্রণাম করেছিল রূপিনিকা, এই সুযোগ কেউ ছাড়ে? স্বয়ং বিষ্ণুর অঙ্কে ঠাঁই পাওয়া যাবে স্রেফ কামপত্নী হয়ে?

পাখির পিঠ থেকে নেমে এল নকল বিষ্ণু। ভারিক্কিচালে প্রবেশ করল মদন-মন্দিরে। কামপত্নীকে উপভোগ করল সর্বতোভাবে। টাকা ছড়িয়ে ফেলে বেরিয়ে গিয়ে প্রস্থান করল পক্ষিবাহনে চেপে।

পরের দিন।

অহংকারে রটমট করছে রূপের রানি রূপিনিকা। স্বয়ং বিষ্ণু যখন শরীরের আগুন নিভিয়ে গেছে তাকে দিয়ে, তাহলে তো গান্ধর্বমতে না হোক, রতি মাধ্যমে বিষ্ণুর বউ হয়ে গেছে সে। আর ক'টা দিন পরেই গোলকধামে অষ্টপ্রহর কামক্রীড়া করবে বিষ্ণুর সঙ্গে। সুতরাং মর্ত্যভূমিতে এই ক'টা দিন কোনও মানুষের সঙ্গে সুরতক্রিয়া করব না। পবিত্র দেহটাকে অপবিত্র করা সমীচীন নয়।

সুতরাং মৌনব্রত অবলম্বন করে শরীর-মনকে শুচি করে নেওয়া যাক।

ফলে আর কোনও কথা নেই মুখে। যে মেয়ের মুখে কথার খই ফোটে অষ্টপ্রহর (সবই খারাপ কথা), সেই মেয়ে হঠাৎ বোবা হয়ে গেল দেখে তার বুড়ি মা গেল হকচকিয়ে।

সন্ধ্যে নাগাদ জিজ্ঞেস করল—হ্যাঁ মেয়ে সারাদিন মুখে বোল ফুটল না কেন?

রূপিনিকার মুখে জবাব নেই।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই প্রশ্ন নানাভাবে করে গেল বারবনিতা জননী, কান ঝালাপালা হয়ে গেল রূপিনিকার। নিস্তার পাওয়ার জন্যে খুলে বললে গত রাতের পরমাশ্চর্য কাহিনি।

বুড়ি অনেক ঘাটে ঘুরেছে। পিলে চমকানো কোনও কাহিনি সুনেই বিশ্বাস করে না, বাজিয়ে নেয়। পোড় খাওয়া বুড়ি।

নগরবধূ রূপিনিকার আজব বৃত্তান্তও তার বিশ্বাস হলো না। যাচাই করা যাক।

দিন ফুরোল, রাত ঘনাল, বিস্তর প্রসাধন দ্রব্যের শ্রাদ্ধ করে স্বর্গের পরী সেজে পালঙ্কে বসে রইল বিষ্ণুর ভাবী বধূ, এখনকার নগরবধূ রূপিনিকা।

চতুরা বুড়ি ছায়ার সঙ্গে গা মিলিয়ে লুকিয়ে রইল মেয়ের ঘরেই, যে ঘরে রতিরঙ্গ শুরু হবে একটু পরেই!

নিশুতি রাতে সত্যিই ডানা ঝাপটে এল মহাকায় এক বিহঙ্গ। শঙ্খ-চক্রপদ্মধারী শ্রীগদা বিষ্ণু পক্ষিপিঠ থেকে অবতরণ করে, নগরবধূর সঙ্গে সঙ্গমাদি শেষ করে, প্রস্থান করল পক্ষিবাহনে।

নিলাজ বুড়ি বিষম অবাক হয়ে তখনি দৌড়ে গেছিল কন্যার কাছে। হাঁউমাউ করে বলেছিল, দেখেছি দেখেছি বিষ্ণুকে পাঠিয়েছিস ভালই। এবার আমার একটা হিল্লে করে দে। বিষ্ণুকে জপিয়ে আমাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দে।

চোখ কপালে তুলে রূপিনিকা বললে, কী আশ্চর্য! ইন্দ্রতো শুধু জোয়ানিদের নাচায়, নাছোড়বান্দা বুড়ি বললে, কন্তু আমার যে আর মর্ত্য ভাল্লাগছে না। তুই ধেই ধেই করে চলে গেলে...

আচ্ছা, আচ্ছা শ্রীবিআণু আজ রাতে আসুক। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বুড়ি মুখে চাবি দিয়ে রইল। স্বর্গে যাওয়ার আগে শরীরটাকে যতখানি সম্ভব শোধন করে নেওয়া যাক!

রজনী যখন নিবিড় হল, পক্ষিবাহনে চেপে এল নকল বিষ্ণু। নগরবধূর ঘরের বধূর মতোই তার গলা জড়িয়ে ধরে বললে, আমার একটা সাধ পূর্ণ করবেন?

কী সাধ? ....নকল ভগবানের চোখে স্বর্গীয় বরাভয়।

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি!

আমার মায়ের বড়ো ইচ্ছে স্বর্গে যাবে আমার সঙ্গে।

স্বর্গে তো বুড়িরা থাকে না।

আপনার অসাধ্য কিছু নেই। একটা বুড়ির পাশে ছুঁড়িদের রূপ আরও ফেটে পড়বে।

তা ঠিক। ...বলেই, মনে মনে ভেবে নিল লৌহজঙ্ঘ। এই বুড়ি শয়তানি তাকে নাকের জলে চোখের জলে করেছে। মওকা যখন পাওয়া গেছে, উচিত শিক্ষা দেওয়া যাক।

মুখে বললে রূপিনিকের চিবুক নেড়ে দিয়ে; বেশ, বেশ! তুমি তো প্রেমের পুণ্যে পুণ্যবতী বলে স্বর্গে যাবে আমার সঙ্গে। কিন্তু তোমার মা যে সারাজন্ম শুধু পাপ করে গেছে। স্বর্গে যেতে গেলে একটু পুণ্য সঞ্চয় করে নিতে হবে।

কী করে করবে বলে দিন।

একাদশীর দিন ছাড়া তো সাধারণ লোকের জন্যে স্বর্গে দরজা খোলা থাকে না।

কোদসীর দিনই যাবে।

তার আগে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

বলুন কী করতে হবে?

মাথা ন্যাড়া করবে। উলঙ্গ হবে। গোটা শরীরের বাঁদিকে সিঁদুর, আর ডানদিকে কালি মাখবে। উঠোনের ঠিক মাঝখানে বসে থাকবে। গলায় একগাছি হাড়ের মালাও ঝুলিয়ে নেবে।

শুনে, নকল বিষ্ণুকে আদরে সোহাগে ভরিয়ে দিল নগরবধূ। হাসি চেপে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভোগ করে নিয়ে সরে পড়লে লৌহজঙ্ঘ।

এল সেই একাদশীর দিন। স্বর্গে যাওয়ার দিন।

মহানন্দে সারাদিন উপোস করে কাটাল পাপিষ্ঠা বুড়ি, সন্ধ্যে হতেই মাথা ন্যাড়া করে, দিগম্বরী হয়ে, শরীরের একদিকে লাল সিঁদুর, আর একদিকে কালো কালি তেল দিয়ে ঘষে ঘষে মেখে, গলায় হাঁড়ের মালা ঝুলিয়ে বসে রইল উঠোনের ঠিক মধ্যিখানে, আকাশের দিকে চেয়ে।

মধ্যরাতে সাঁই সাঁই আওয়াজ উঠলো আকাশে, এসে গেল পক্ষিবাহন। অর্থাৎ, গড়ুর! নকল বিষ্ণু লাফিয়ে নেমে আগে গেল রূপিনিকার ঘরে। তার এবং নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে (নিখরচায়) বেরিয়ে এসে দেখল দিগম্বরী বুড়িকে।

এই সুযোগ। উচিত শিক্ষাদেওয়ার সময় এবার হয়েছে।

উঠিয়ে নিল পাপীয়সীকে পাখির পিঠে। বুড়ির সেকি আহ্লাদ! মেয়ের দৌলতে স্বর্গে যাচ্ছে জীবন্ত!

মহাকায় বিহঙ্গ বাতাস তোলপাড় করে উড়ে এল একটা খুব উঁচু বাড়ির ওপর। ভেঙে ধসে পড়ছে, এমন একটা বাড়ি। সিঁড়ি-টিঁড়ি কোনকালে ভেঙে পড়েছে। ছাদটা আছে আস্ত।

ভারিক্কি গলায় কপট বিষ্ণু বললে প্রাক্তন বারবধূকে, আর একজনকে স্বর্গে নিয়ে যেতে হবে। ভারি পুণ্যবান লোক, এই মথুরাতেই থাকে। তুমি এই ছাদে একটু বসো। তাকে নিয়ে আসি।

গদগদ হয়ে বুড়ি নেমে গেল সেই উঁচু বাড়ির ছাদে। শ্রীবিষ্ণু কিন্তু ততক্ষণে ফের ব্যোমবিহারী হয়ে গেছে, মেঘের আড়ালে গিয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে আকাশবাণী নিক্ষেপ করে যাচ্ছে মথুরাবাসীদের উদ্দেশ্যে, শোনো! শোনো! হুঁশিয়ার হও! আজ এক ন্যাংটা পিশাচিনী মথুরায় এসেছে, জ্বালিয়ে মারবে তোমাদের! সাবধান! সাবধান! সাবধান!

গগনে সেই গর্জন শুনে পিলে চমকে গেল মথুরার বাসিন্দাদের। ওরে বাবা! একে পিশাচিনী, তায় উলঙ্গিনী! হুঁশিয়ার! শহরবাসীরা, হুঁশিয়ার!

দলে দলে বেরিয়ে পড়ল শহরের মানুষ ডাইনির খোঁজে। কেউ ছুটল মন্দিরে খোদ ভগবানকে দিয়ে ডাইনিকে কব্জায় আনার জন্যে।

এদিকে উদ্বেগে ফেটে পড়ছে বুড়ি উঁচু ছাদে বসে। কতক্ষণে পৌঁছোবে স্বর্গে? শ্রীবিষ্ণুর ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন?

আঁধার এক্কেবারে বিদায় নিল। ভোর হল। তারপর একটু একটু করে রোদের তেজ বাড়তেই তেল-সিঁদুর-কালি ঘষটানো চামড়া জ্বলে গেল সেই আঁচে। গায়ে তো কিচ্ছু নেই। কাঁহাতক সওয়া যায়।

শুরু হল নাকিসুরে কান্না কখন যাবো স্বর্গে?

শরীর যে জ্বলে গেল? খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে!

কাতারে কাতারে লোক জড়ো হয়ে গেল ভাঙা অট্টালিকার নীচে। শুনল নাকি সুরের চিৎকার, খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে!

ওরে বাবা! ডাইনির খিদে পেয়েছে!

নিমেষে ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তাঘাট। প্রাণপণে দৌড়ে হাজির হল রাজবাড়িতে, রাজা, ডাইনির খিদে পেয়েছে। চেঁচাচ্ছে, বাঁচান আমাদের।

সেপাই শান্ত্রী দিয়ে তক্ষুণি ভাঙা বাড়ি ঘিরে ফেললেন রাজামশায় নাকি সুরের বিকট চিৎকার শুনলেন। ঠিক যেন মানুষ চেঁচাচ্ছে।

লোকজন উঠিরে দিলেন বাড়ির ছাদে। ন্যাংটা বুড়িকে তারা নিয়ে এল নীচে। আহ্বা, সেকি চেহারা! ন্যাড়ামাথা, গলায় হাড়ের মালা, শরীরের একদিক তেলজবজবে লাল সিঁদুর, আর, একদিকে তেলজবজবে কালো কালি।

তখনও পরিত্রাহি চেঁচিয়ে যাচ্ছে বুড়ি, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে আমাকে। গড়ুর ফিরে যাবে আমাকে না দেখলে, স্বর্গে যাওয়া আর হবে না!

মাথা খারাপ কেউ তো চিনতে পারছে না বুড়িকে খোলতাই ওই রংবাহারের জন্যে।

চিনেছিল শুধু রূপিনিকা। হইচই শুনে সেও যে বেরিয়ে এসেছিল বাড়ির বাইরে।

মাতা হেঁট হয়ে গেল মায়ের উন্নাসিক প্রলাপ শুনে। সঙ্গের লোকজন তখন চিনতে পারল, অদ্ভুতদর্শন বুড়ি আসলে কে!

এই শহরের পুরোন বেশ্যা!

হাসি-ঠাট্টা হররার মধ্যে হঠাৎ এসে হাজির লৌহজঙ্ঘ। এখন স্ববেশে, ছদ্মবেশ ছেড়ে। হেঁকে বললে জনগণকে আসল ব্যাপার। বড়ো ভুগিয়েছে এই বুড়ি। তাই একটু শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

এমন রগড়ের ব্যাপার কেউ কখনও দেখেনি। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল শহরের প্রত্যেকের।

তাদেরই ইচ্ছায়, সেই থেকে রূপিনিকার বাড়িতে গ্যাঁট হয়ে বসে গেল চতুর-চূড়ামণি লৌহজঙ্ঘ।

শেষ হল ছদ্মবেশী বসন্তকের হাসির গল্প। হাসতে হাসতে সখীদের নিয়ে রাজকুমারী বাসবদত্তা গড়িয়ে পড়লো মেঝেতে। কালো চোখে বিদ্যুৎ হিনে চেয়ে রইল শেকলে বাঁধা উদয়নের দিকে।

রূপিনিকা হতে পারলে যেন এখন বাঁচে!

বসন্তক কিন্তু সেই থেকে ভাঁড় হিসেবে থেকে গেল সেখানে। আসলে, উদয়নের বন্ধু রইল উদয়নের কাছে।

উদয়ন পালাল উজ্জয়িনী থেকে

প্রেম বড়ো বিচিত্র ব্যাপার। কত অঘটনই ঘটে যাচ্ছে এই প্রেম-শক্তির মহিমায়!

নইলে শেকলে বাঁধা অবস্থায় বাসবদত্তাকে গান বাজনা শিখিয়ে যায় উদয়ন? চাঁদ মুখ আর হরিণ চোখ দেখে ভুলে যায় শেকলের যন্ত্রণা? অপমানের জ্বালা?

উদয়নের এহেন অনুরাগ অবশ্য বিফলে যায়নি। তা লক্ষ্য করেই বাসবদত্তা আরও বেশি কামাসক্ত হয়ে পড়ছিল উদয়নের প্রতি। প্রেমের পরীক্ষায় এই ভাবে উত্তীর্ণ হয়ে যায় যে পুরুষ, তার প্রেম যে কতখানি নিখাদ, তাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না বাসবদত্তার।

এইভাবেই বাজিয়ে নেওয়া হচ্ছিল পরস্পরকে।

এই সময়ে একদিন মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ এল উদয়নের সঙ্গে দেখা করতে, অবশ্যই অদৃশ্য অবস্থায়।

বসন্তককে সামনে রেখে বললে উদয়নকে, আর এখানে নয়। রাজকন্যাকে নিয়ে চম্পট দিন।

চমকে উঠল উদয়ন, সে কী?

সৌগন্ধনারায়ণ বললে, চণ্ডমহাসেনের চক্রান্ত সফল হয়েছে। আপনাকে তুলে এনে, শেকলে বেঁধে, মেয়েকে গান বাজনা শিখিয়েছেন। আপনিও সেই মেয়ের চোখের মণি হয়ে উঠেছেন। খবর পেয়ে এখন তিনি আপনার সঙ্গে বিয়ে দেবেন বাসবদত্তার। কিন্তু তা হবে না।

—কেন? কেন? কেন?

—আপনার পক্ষে অপমানজনক বলে। চক্রান্তের জবাব দেব চক্রান্ত দিয়ে। অপহরণের জবাব দেব পাল্টা অপহরণ দিয়ে।

কাকে অপহরণ?

রাজকন্যা বাসবদত্তাকে। তিনি আপনাকে ছাড়া চোখে অন্ধকার দেখছেন। আপনার সঙ্গে পালিয়ে যেতে রাজি হবেন। পালাবেন আজ রাতেই, তাঁর মেয়ে-হাতির পিঠে। মাহুতকে ঘুষ দিয়ে বশ করেছি। আপনি তৈরি থাকবেন, আমি বসন্তককে নিয়ে যাচ্ছি।

কেন?

রাস্তায় যাতে আপনারা বিপদে না পড়েন, সেই ব্যবস্থা করতে। আপনি অবশ্যই সঙ্গে নেবেন আপনার তলোয়ার আর বীণা।

শেকল খুলব কী করে?

শেকল খোলার মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি?

অদৃশ্য হওয়ার মন্ত্রও শিখে নিন।

মন্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হতেই বসন্তককে নিয়ে সরে পড়ল সৌগন্ধনারায়ণ অবশ্যই অদৃশ্য অবস্থায়।

আর তারপরেই গীত-মন্দিরে হাজির প্রেম-পাগলিনী বাসবদত্তা নিজে। সঙ্গে সখী-টখী কেউ নেই। নিরালায় পেয়ে মন খুলে কথা বলল উদয়ন।

বাসবদত্তা রাজি এক কথাতেই। আরও তারও তো মন উচাটন হয়েছে। রক্তে নাচন জেগেছে। এখন হোক মিলন। হোক একত্র শয়ান। লীন হোক দুই দেহ। দেহাতীত প্রেম নেমে আসুক দেহজ প্রেমে।

আনন্দে ডগমগ হয়ে গীত-মন্দিরেই ডেকে পাঠিয়েছিল মাহুতকে। দুরন্ত কাজ হাসিল করার জন্যে আকণ্ঠ মদ গিলিয়েছিল তাকে। টলতে টলতে সে বেরিয়ে গিয়ে হস্তিনীকে সাজাতে আরম্ভ করে দিয়েছিল।

দিন ফুরোল, সন্ধ্যে নামল। যামিনী যখন নিবিড়তর, রাজপ্রাসাদের সবাই ঘুমিয়ে পড়ল যে-যার ঘরের দরজা বন্ধ করে।

আর ঠিক তখনই শেকল খসিয়ে দেওয়ার মন্ত্র পাঠ করেছিল উদয়ন। ঝনঝনাৎ করে খসে পড়েছিল হাত-পায়ের লৌহ-নিগড়। কাঁধে বীণা ঝুলিয়ে, একহাতে তরবারি ধরে, আর এক হাতে বাসবদত্তার হাত ধরে উচ্চারণ করেছিল শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ার মহামন্ত্র।

নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেছিল দুজনে।

ফলে, অন্তঃপুরের বাইরে এসে, দরজার পর দরজা পেরিয়ে, অগুন্তি নৈশ-প্রহরীদের চোখের সামনে দিয়ে হাওয়া হয়ে বেরিয়ে গেল দুজনে, যেন একটা ঝড় বয়ে গেল, কেউ তাদের দেখতে পেল না!

মূল তোরণের বাইরে বাসবদত্তার নিজস্ব হস্তিনীকে মণি-মুক্তো-সোনা দিয়ে সাজিয়ে বসেছিল মাহুত। দৃশ্যমান হওয়ার মন্ত্র পড়তেই মাহুত দেখতে পেয়েছিল দুজনকে। উঠিয়ে নিয়েছিল হস্তিনীর পিঠে।

ঠিক সেইসময়ে টনক নড়েছিল মূল তোরণের দুই শান্ত্রীর। অন্ধকারের মধ্যে কারা যেন নড়ছে, কথা বলছে চাপা গলায়, টুং টুং করে বাজছে হস্তীনার গলার ঘন্টা।

দৌড়ে এসেছিল দুজনে। তখন রণমূর্তি ধরেছিল উদয়ন। কালক্ষেপ না করে উড়িয়ে দিয়েছিল দুজনের মুণ্ড!

সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিয়েছিল মাহুতকে। যেন হাওয়ার বেগে দেখতে দেখতে শহর ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে গেছিল অতিশয় বেগবতী সেই হস্তিনী। বাসবদত্তার অতি-প্রিয় গজ-রানি।

দুই প্রহরীর মরণ-চিৎকার শুনে দৌড়ে এসেছিল অন্য প্রহরীরা। ছিন্নমুণ্ড দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছিল গলা ফাটিয়ে। দেখতে দেখতে খবর ছড়িয়ে গেছিল রাজপ্রাসাদে।

খবরটা চণ্ডমহাসেনের কানে যেতেই প্রথমেই তিনি দেখলেন গীত-মন্দিরে উদয়ন আছে কিনা। শুধু দেখলেন যেন অলৌকিক পন্থায় খসে গিয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে লোহার শেকল আর বেড়ি। দৌড়লেন অন্তঃপুরে। মেয়ে নেই সেখানে!

বুঝলেন, এক হাত নিয়ে গেল রাজা উদয়ন। চম্পট দিয়েছে মেয়েকে নিয়ে!

কন্যাহরণ! এত বড়ো স্পর্ধা! তক্ষুনি ছেলে-পালককে হুকম দিলেন, যাও, বেঁধে নিয়ে এস তোমার বোন আর ওই নচ্ছার উদয়নকে!

ছুটল পালক সৈন্যসামন্ত নিয়ে।

এদিকে সারারাত ঝড়ের বেগে ছুটে গিয়ে হেদিয়ে পড়েছিল হস্তিনী। একদম থামেনি। ভোরের দিকে গতি কমিয়ে যখন হেলেদুলে চলেছে, ঠিক তখন হৈচৈ শোনা গেল পেছনে।

দেখতে দেখতে পালক এসে সৈন্যসামন্ত নিয়ে ঘিরে ফেলল পলাতক আর পলাতকাকে।

কিন্তু বেনকে কি আর বেঁধে নিয়ে যাওয়া যায়? হাজার হোক সে তো রাজকন্যা।

শুরু হল বচসা। উদয়নের উগ্র মূর্তি দেখে থতমত খেয়ে গেছে পালক।

এমন সময়ে হৈহৈ করে এসে হাজির পালক-এর ভাই গোপালক। চণ্ডমহাসেনের মন ঘুরেছে। মেয়ে পালাচ্ছে পালাক, ফিরিয়ে এনে আর কেলেঙ্কারি বাড়াবেন না।

আসলে, তিনিও তো চান, উদয়ন হোক তাঁর জামাই। সুতরাং চণ্ডাল রাগকে তিনি সামলে নিয়েছেন।

ফিরে গেল পালক আর গোপালক হাসিমুখে। আর ঠিক তারপরেই ঘটল একটা তাজ্জব ব্যাপার।

বিন্ধ্যের জঙ্গলের কিনারায় পৌঁছেই হঠাৎ জোর করে আছড়ে পড়ল হস্তিনী। মৃত্যু হল তৎক্ষণাৎ। আর..............

নিষ্প্রাণ কলেবর থেকে বেরিয়ে এল এক জ্যোতির্ময়ী কন্যা। মানবী যে নয়, তা দেহের প্রভা থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

শূন্যে ভাসমান নেই অপরূপা দিব্যদেহী বললে ঝঙ্কৃত বচনে আমার নাম মায়াবতী। বিদ্যাধরী মায়াবতী। অভিশাপের ফলে হস্তিনী হয়ে জন্মেছিলাম। আজ আমি শাপমুক্ত। আমি যাচ্ছি বটে, কিন্তু আপনার আর বাসবদত্তার ছেলের উপকার করার জন্য আবার আসব। রাজা উদয়ন, আরও একটা ব্যাপার জেনে রাখুন।

আপনার বউ হতে যিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন, এই বাসবদত্তা, আগে ছিলেন দেবলোকের বাসিন্দা, মানুষ হয়ে জন্মেছেন শুধু আপনাকে বিয়ে করার জন্যে।

অদৃশ্য হয়ে গেল মায়াবতী বিদ্যাধরী। অত্যাশ্চর্য সেই ব্যাপার নিয়ে খোশগল্প করতে করতে হাত ধরাধরি করে প্রেমিক আর প্রেমিকা হেঁটে চলল পাহাড়ের নীচের দিকের ঢাল বেয়ে।
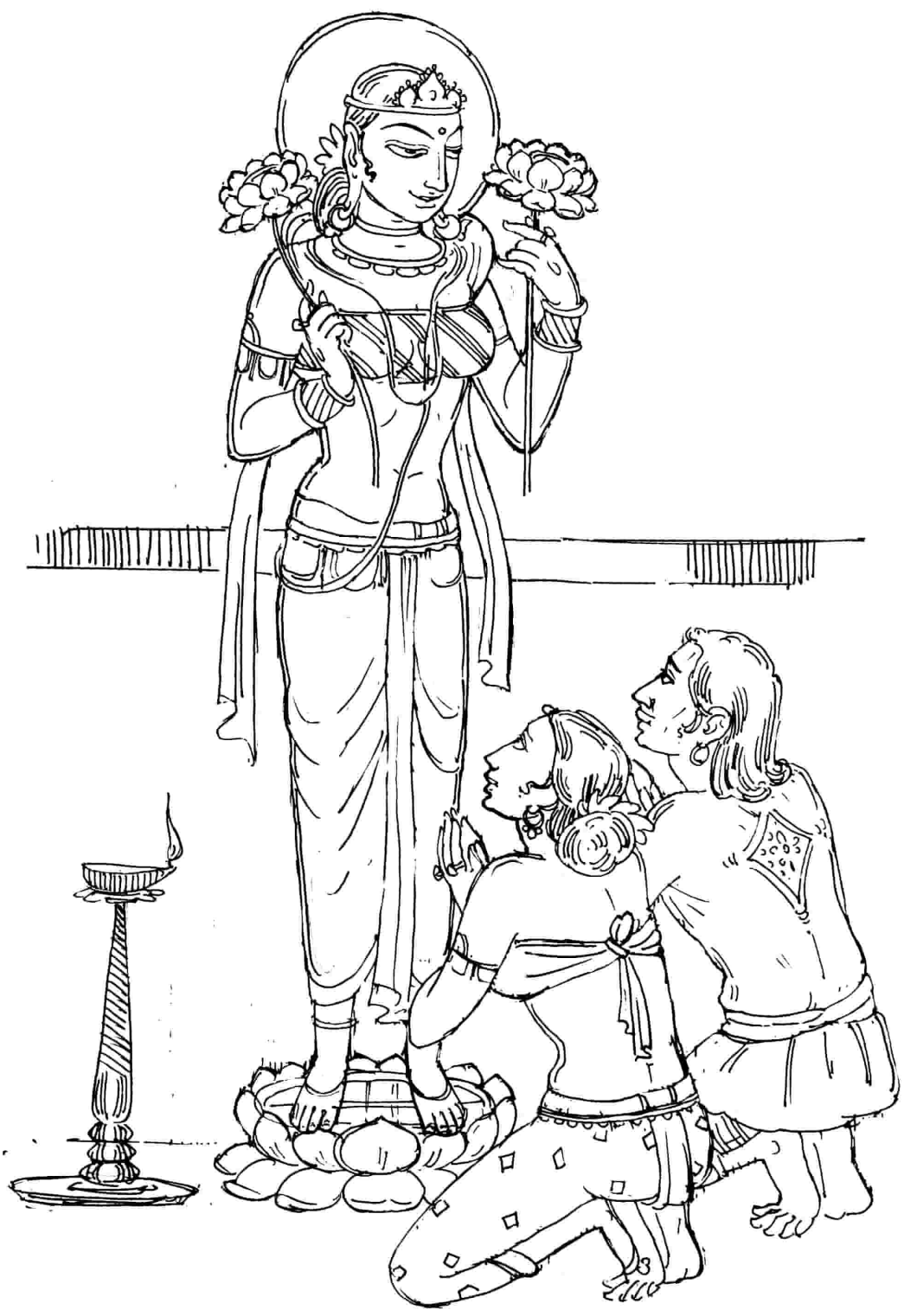
নিষ্প্রাণ কলেবর থেকে বেরিয়ে এল এক জ্যোতির্ময়ী কন্যা।

বড়ো ভয়ানক জায়গা, উদয়ন কিন্তু নিঃশঙ্ক। ভোর হয়ে গেছে ততক্ষণে। রজনীর নিরেট অন্ধকার পলায়ন করেছে।

এমন সময় এক রক্তজল-করা হুহুঙ্কার ঠিকরে এল পাশের গুহা থেকে।

পরক্ষণেই হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল একদল ডাকাত। অস্ত্রধারী প্রত্যেকেই। নিমেষে তারা ঘিরে ফেলেছিল উদয়ন আর বাসবদত্তাকে।

তখন দেখা গেছিল উদয়নের বিস্ময়কর তরবারি চালনা। কচুকাটা হয়ে গেল একশো পাঁচজন দস্যু চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে।

পথের এইসব উটকো বিপদের জন্যেই তো মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ আটঘাট বেঁধে রেখেছিল। জীবিত ডাকাতরা যখন রক্ত-পাগল হয়ে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঘূর্ণ্যমান উদয়ন। তরবারির সামনে, ঠিক সেই সময়ে অতর্কিতে আবির্ভাব ঘটেছিল সৌগন্ধনারায়ণের।

একা নয়। পূর্ব ব্যবস্থা মতো সঙ্গে এসেছে পুলিন্দার রাজা পুলিন্দক, তার জঙ্গলের সৈন্যবাহিনী নিয়ে। হাস্যরসের আধার বসন্তকও আছে সঙ্গে। বাকি ডাকাতদের প্রাণ উড়ে গেল তাই দেখে। উধাও হয়ে গেল চক্ষের নিমেষে।

সেইদিন বিশ্রাম নেওয়া হল পুলিন্দকের বাড়িতে।

পরের দিন সৌগন্ধনারায়ণের চিঠি পেয়েই সেনাপতি ঝাঁ করে চলে এল সৈন্যসামন্ত নিয়ে। সারি সারি তাঁবু পড়ে গেল বিন্ধ্য পাহাড়ের গায়ে।

উদ্দেশ্য, ঘুরে দাঁড়ানো, আর, চর মারফৎ চণ্ডমহাসেনের গতিবিধির সংবাদ সংগ্রহ করা।

দিনকয়েকের মধ্যেই সৌগন্ধনারায়ণের এক ব্যবসায়ী বন্ধু এল উজ্জয়িনী থেকে।

সে বললে, উদয়নের মতো জামাই পেয়ে চণ্ডমহাসেন এখন আনন্দে আটখানা। লোক পাঠিয়েছেন তাঁর সম্মতি জানিয়ে। সে আসছে আমার ঠিক পেছনে।

হাসির রোল পড়ে গেল তাঁবুতে। ভাবী শ্বশুড়ের কাণ্ড দেখে অট্টহেসে উদয়ন বললে বাসবদত্তাকে, আসল জোর হল বুদ্ধি। গায়ের জোর দেখাতে গিয়ে হেরে তো গেলেন তোমার বাবা? কোথায় গেল আমার হাত-পায়ের শেকল?

হাসতে হাসতে বাসবদত্তারও তখন দম আটকে আসছে। ভাঁড় বসন্তক মুখখানা পেঁচার মতো করে দাঁড়িয়েছিল সামনে। তাকে এক গুঁতো মেরে বললে, গোমরা মুখ কেন? এখনই তো পেটফাটানো হাসির গল্প শোনবার সময়। হোক একটা গল্প।

গল্প শোনাল বসন্তক। এমন একটা গল্প যার মধ্যে আছে পতিপ্রেম। আছে পতিভক্তি।

তাম্রলিপ্ত শহরে থাকতেন ধনদত্ত। বেজায় বড়োলোক। নামী সওদাগর। কিন্তু মনে ভারি দুঃখ। ছেলেপুলে তো নেই।

ব্রাহ্মণদের দ্বারস্থ হলেন, তাঁরা বললেন, বেদে কী নেই? বেদ সব দিতে পারে। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করা হোক।

হল সেই যজ্ঞ। অনেক ঘি পুড়ল, অনেক দক্ষিণা দেওয়া হল। মন্ত্রপাঠে আকাশবাতাস গুমগুম করতে লাগল। যথাসময়ে হল একটি ছেলে। তার নাম রাখা হল গুহসেন।

গুহসেন বড়ো হল। এবার তার জন্য দরকার টুকটুকে বউ। কিন্তু গোটা ভারতবর্ষে তেমন মেয়ে পাওয়া গেল না।

অগত্যা ধনদত্ত জাহাজ ভাসিয়ে দ্বীপান্তরে গেলেন বাণিজ্য করতে। ছেলেকে নিলেন সঙ্গে। একঢিলে দু-পাখি মারবেন। ব্যবসাও করবেন, পাত্রীও খুঁজবেন।

পছন্দসই পাত্রী পেয়ে গেলেন একটা দ্বীপে। সেই দ্বীপের খুব বড়োলোক এক ব্যবসায়ীর মেয়েটি যেন হিরের টুকরো।

বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন ধনদত্ত। খারিজ করলেন পাত্রীর পিতা। কারণ, তাম্রলিপ্ত তো ভারতবর্ষে। সে অনেক দূরে। অতদূরে মেয়ে পাঠানো যায় না।

এইবার শুরু হল প্রেমের খেলা। চিরন্তন খেলা।

দ্বীপের সুকন্যার নাম দেবস্মিতা। সে গুহসেনকে দেখেছিল। চোখের ভেতর দিয়ে মনচুরি হয়ে গেছিল।

দেবস্মিতা সখীকে দিয়ে খবর পাঠাল গুহসেনকে, দেখেই মজেছি। সুতরাং আজ রাতে যাচ্ছি আপনার জাহাজে।

সুপুত্র তৎক্ষণাৎ সুসংবাদটা দিল পিতাকে। পিতৃদেবও এমন বন্দোবস্ত করে রাখলেন যাতে কন্যে এলেই নোঙর তুলে জাহাজ সরে পড়ে দ্বীপ ছেড়ে। অর্থাৎ পাত্রী চুরি!

তাই হল। গভীর রাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে এল পাত্রী। তৎক্ষণাৎ জাহাজ ভেসে গেল গভীর সমুদ্রে।

অনেকদিন পরে পৌঁছোল তাম্রলিপ্ত নগরে।

বিয়ে হয়ে গেল গুহসেনের সঙ্গে দেবস্মিতার। বউমার বাপের বাড়ির আর কোনও খোঁজ খবর নিলেন না ধনদত্ত।

তাঁর মৃত্যু হল যথাসময়ে। এবার ছেলে বাণিজ্যে বেরবে। দেবস্মিতাকে এসে সেই কথা বলল গুহসেন।

দেবস্মিতা ভারি চালাক মেয়ে। নইলে বাপের অমতে বাড়ি থেকে পালায়? নিজের ভালেমান্দ বিচার-জ্ঞান তার আছে।

স্বামীকে একা ছেড়ে দেওয়া সে সঙ্গত মনে করল না। পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস নেই। বউ নিয়ে রাত কাটাতে যার অভ্যেস হয়ে গেছে, বউ ছাড়া ক-রাত সে নিজেকে ঠিক রাখবে? নিশ্চয় অন্য মেয়ে জুটিয়ে নেবে। সুতরাং স্বামীর বিদেশ যাওয়া চলবে না।

বউয়ের কড়া নিষেধ শুনে মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল গুহসেনের। একদিকে রক্তচক্ষু দেবস্মিতা, অতি একদিকে ইয়ার-বন্ধুর দ,—যারা কোমর বেঁধে রয়েছে জাহাজে চেপে ফূর্তি করতে যাবে বলে।

টানাপোড়েন সইতে না পেরে মন্দিরে গিয়ে হত্যে দিয়ে পড়ে রইল গুহসেন, অনাহারে। দেবতা সমাধান করে দিক এই সমস্যার।

দেবস্মিতা খবরটা শুনেই চলে গেল সেই মন্দিরেই। হত্যে দিয়ে পড়ে রইল দেবতার সামনে।

পতি-পত্নী দুজনেই হত্যে দিয়েছে-দুজনের মনোরথ দুরকমের।

দেবতা এখন কী করবেন?

তিনি এক বরে দুজনের অভিলাষ পূরণ করে দিলেন?

দেখা দিলেন দুহাতে দুটো লাল পদ্ম নিয়ে। একটা দিলেন গুহসেনকে, আর একটা দেবস্মিতাকে।

বললেন, দুজনের একজনও যদি খারাপ পথে যায়, তাহলে অন্যজন এই পদ্মের দিকে তাকিয়েই তা জানতে পারবে। পদ্মের এই লাল আভা তখন থাকবে না। ম্যাড়মেড়ে হয়ে যাবে।

বর দিয়ে দেবতা চলে গেলেন দেবলোকে। সেই থেকে কিন্তু অষ্টপ্রহর লালপদ্ম হাতে রেখে দিল গুহসেন আর দেবস্মিতা।

দিয়ে, দেবস্মিতা বললে, এবার যাও বাণিজ্যে।

রাগ করে গুহসেন বললে, যাবই তো। এবার দেখব তোমার সতীত্ব!

যেখানে ভালোবাসা, সেখানেই মনে ভয়। এবং তা মোটেই অন্যায় নয়। আত্মবিশ্বাসে অনেক ফাঁক থেকে যায়।

কটাহ দ্বীপে রওনা হল গুহসেন, দেবস্মিতা নিশ্চিন্ত মনে তাকে জাহাজে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে নানান কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে লাগল লালপদ্ম।

গুহসেনও তাই করে চলেছে। কটাহ দ্বীপে পৌঁছেও দামি দামি জিনিসপত্র কেনাবেচার ফাঁকে লালপদ্ম দেখতে ভুলছে না।

প্রকৃত প্রেম ভারি পাজি রোগ, মনে বড্ড সংশয় এনে দেয়। অবিশ্বাসের ঝড় বইয়ে দেয়। উদ্বেগের নাগরদোলায় মনকে অস্থির করে রাখে।

একদিন সেই দ্বীপের চারজন বড়োলোকের ছেলে এল গুহসেনের সঙ্গে কারবারের কথা বলতে। চারজনেই বড়ো ব্যবসাদারের ছেলে। বন্ধুত্ব জমে গেলে, রোজ আড্ডা না মারলে পেটের ভাত হজম হয় না। তারাও প্রতিদিন এসে সাতপাঁচ কথায় সময় কাটিয়ে গেল গুহসেনের সঙ্গে।

তখনই তারা লক্ষ্য করল, গুহসেন আড্ডায় পুরো মন দেয় না, ঘন ঘন তাকায় হাতে ধরা লাল টকটকে পদ্মফুলের দিকে। এমনই একটা পদ্ম যা সবসময় তাজা, রোজই তাজা। রঙ যেন ফেটে পড়ছে।

ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! পদ্ম-রহস্য জানবার জন্যে ব্যাকুল হল চার সওদাগর-বন্ধু। কিন্তু ফট করে তা জিজ্ঞেস করতেও পারল না গুহসেনকে। রইল সুযোগের প্রতীক্ষায়।

একদিন এল সেই সুযোগ। মানে, সুযোগকে তৈরি করা হল। গুহসেনকে কাজের ব্যাপারে নেমন্তন করল চার বন্ধু। সরল মনে সেখানে গেল গুহসেন। কঠিন ব্যবসার কথা বলার আগে মন তরল করার জন্যে মদের গেলাসেও চুমুক দিল। নানারকমের মদের বোতল দেখে সবগুলোই একটু একটু করে চাখতে চাখতে বেহেড মাতাল হয়ে গেল। মুখে আর কোনও আগল রইল না, হাতে রেখেছে কিন্তু লালপদ্ম।

এই তো সুযোগ। চার ধুরন্ধর দ্বীপবাসী বন্ধু হেসে হেসে বললে মদের চেয়ে লালপদ্ম দেখছি তোমার বেশি প্রিয়।

ঢুলু ঢুলু চোখে গুহসেন বললে, সাধে কী প্রিয়? ঘরের বউটা পরের বউ হয়ে গেল কি না, তা বলে দেবে এই পদ্ম।

সে কী!

ব্যস! হুড়হুড় করে সব কথা বলে ফেলল গুহসেন। অষ্টপ্রহর বউয়ের ওপর নজর রাখার জন্যে খোদ দেবতা দিয়েছেন এই পদ্ম। আজও ঘোর লাল, তার মানে, বউ এখনও সতী!

এই ব্যাপার! চার বজ্জাত বন্ধু তখন থেকেই ফিকিরে রইল, এমন একটা পতিভক্ত মেয়েকে নষ্ট করতেই হবে।

সুতরাং, গুহসেনকে কাজের অছিলায় বেশ কিছুদিন আটকে রাখা দরকার কটাহ দ্বীপে। ব্যবসা-পাগল গুহসেন পা দিল সেই ফাঁদে। ঠিক হয়ে গেল, অমুক অমুক কাজ শেষ না করে সে কটাহ দ্বীপ থেকে বেরবে না।

সেই ফাঁকে দ্বীপ থেকে হাওয়া হয়ে গেল চার পরনারী লোভী বন্ধু। তাম্রলিপ্ত অনেক দূরের নগর। কিন্তু পরস্ত্রীর প্রলোভনে দেখতে দেখতে দূরের পথ ছোটো করে এনে তাম্রলিপ্তে পৌঁছে গেল চার বদমাস।

কিন্তু দেবস্মিতার কাছেই তো যাওয়া যাচ্ছে না। কাছে না গেলে, আলাপ পরিচয় না হলে, সতীকে চারজনে মিলে উপভোগ করবে কী করে?

একদিন পাওয়া গেল ওকটা পথ, নির্জন একটা জায়গায় বসে চার চরিত্রহীন মতলব আঁটছিল এই ব্যাপারে। এমন সময়ে দেখল, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এক বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী। দেশে দেশে টহল দেওয়া সন্ন্যাসিনী। চোখে মুখে কাপট্য আর ধূর্ততা। ভণ্ড নিশ্চয়।

চার বন্ধু তাকে তোয়াজ করে বললে, আমাদের একটা উপকার করে দেবেন? এক বন্ধুর বউকে চেখে দেখতে চাই। টাকাপয়সা যা লাগবে দেব।

সংসার ছেড়ে যে পথে নেমেছে, পাঁচজনের মঙ্গল করাই তো তার সাধনা। সন্ন্যাসিনী বললে নিশ্চয় করব, তবে নিজে নয়। করিয়ে দেব। আমার এক শিষ্যা আছে। তার নাম সিদ্ধকরী। ভারি চালাক মেয়ে। অনেক টাকা সে পাইয়ে দিয়েছে আমাকে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে।

অদ্ভুত কথা তো! সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিনীকে টাকা পাইয়ে দিয়েছে তারই শিষ্যা! দুটোই তাহলে ভণ্ড!

বায়না ধরল চার বন্ধু। ব্যাপারটা কী, তা বলতে হবে।

সন্ন্যাসিনী শোনাল সেই কাহিনি।

এক ধনবান ব্যবসাদার থাকতো এই তাম্রলিপ্ত নগরে। তার আদি নিবাস ভারতবর্ষের উত্তর অঞ্চলে। তার ঝি-গিরি করত আমার এই শিষ্যা। তারপর একদিন অনেক সোনাদানা নিয়ে পালিয়ে যায়।

নগর থেকে বেরিয়ে দেখল এক ভিখিরিকে। মৃদঙ্গ বাজিয়ে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষে করাই তার কাজ। ভিক্ষে চেয়ে বসল সিদ্ধকরীর কাছে।

কান্না-কান্না চোখে সিদ্ধকরী বললে, ভিক্ষে দেওয়ার পয়সা কোথায়? এখন চাই মরতে।

ভিক্ষুক তো অবাক, মরণ চাইছো কেন?

সোয়ামির সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়েছি। এ জীবন আর রাখব না। তুমি বরং আমার একটা উপকার করো। ওই যে অশ্বত্থ গাছটা দেখছ, ওর ডাল থেকে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দাও। আমি গলায় দড়ি দেব।

বোকা ভিখিরি ভাবল, মরতে চায় মরুক। আমার উপকার করার কথা, উপকার করে দিই, বলে গাছে উঠে, ডাল থেকে একটা দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিল নীচে। দড়ির ডগায় রইল একটা ফাঁস।

নাকিসুরে সিদ্ধকরী বললে, গলায় দড়ি দিতে হয় কী করে, তাতো জানি না।

ভিখিরি তাও দেখিয়ে দিল। দড়ির ফাঁসের নীচে রাখল নিজের মৃদঙ্গ। দাঁড়াল তার ওপর। ফাঁস গলালো নিজের গলায়।

সিদ্ধকরী লাথি মেরে মৃদঙ্গ সরিয়ে দিল তার পায়ের তলা থেকে। ফাঁস এঁটে গেল গলায়। মারা গেল ভিখিরি।

নিছক মজা করার জন্যে এই কাণ্ডটা করেছিল সিদ্ধকরী কী? মোটেই না। ওর মধ্যেই ছিল বুদ্ধির আড়াই প্যাঁচ।

প্যাঁচ মেরে যখন সরে পড়ছে, তখন দেখল সেই ধনবান ব্যবসাদার লোকজন নিয়ে আসছে তার সন্ধানে।

ঘোড়েল সিদ্ধকরী তৎক্ষণাৎ সড়সড় করে উঠে গেল গাছে। লুকিয়ে রইল ডালপাতার মধ্যে।

গাছের ডাল থেকে লম্বমান মৃতদেহ দেখে ব্যবসায়ী ভদ্রলোক আর সেখানে দাঁড়াতে চায়নি। কিন্তু তার সঙ্গের চাকর ছিল ভারি চালাক। মড়া ঝুলিয়ে রেখে সিদ্ধকরী ভড়কি দিচ্ছে না তো?

আসলে, সিদ্ধকরী মনে মনে এই রকমই একটা প্যাঁচ এঁটে রেখেছিল। মড়াকে চোর মনে করে বণিক যেন তার খোঁজ নেওয়া ছেড়ে দেয়।

চালাক চাকরটা সটান উঠে গেল গাছে। ডালপাতার আড়ালে দেখতে পেল সিদ্ধকরীকে। অমনি কামমদির গাঢ় গলায় চোখে কটাক্ষ হেনে সিদ্ধকরী বললে, এতদিনে এলে? কতদিন ধরে তোমাকে আমি চেয়েছি। নাও, নাও, এইখানেই আমার সব নাও। বলেই, পাতার আড়ালে, চাকরের মুখে চুমু খেতে খেতে বললে, সব নাও। আমাকে নাও, আমার এই সোনাদানা নাও। শরীরের জ্বালাটা খালি জুড়িয়ে দিয়ে যাও। তোমার জন্যেই চোর হয়েছি, এখন তুমি আমাকে চুরি করো। এই সোনাদানা তো তোমারই।

মেয়েমানুষের চুমুর মতো মিষ্টি আর কিছু নেই। নেশা ধরিয়ে দেয়। চাকর বেচারি গাছে উঠেই পেয়ে গেল এক ডবকা ছুঁড়ি। সেই সঙ্গে চোরাই ধনরত্ন। সে কাণ্ডজ্ঞান হারাল। জাপটে ধরে চটকাতে লাগল ঝি-কে।

সেই সুযোগে চাকরের জিভ কামড়ে অর্ধেক কেটে দিল সিদ্ধকরী। সে এসব কাজে খুব ওস্তাদ। তার দাঁতেও ক্ষুরের মতো ধার।

যন্ত্রণায় ছিটকে যেতেই ডাল থেকে নীচে পড়ে ঘাড় ভেঙে মারা গেল জিভকাটা চাকর।

কী সর্বনাশ! গাছে ভূত-টুত আছে নাকি! নীচ থেকে এই দৃশ্য দেখে ভয়ের চোটে প্রাণ উড়ে গেল বণিকের। চম্পট দিল চটপট।

ধীরে সুস্থে নীচে নেমে কাপড়চোপড় সামলে নিয়ে, সোনাদানা পেটের কাছে বেঁধে। সিদ্ধকরী চলে এল নিজের বাড়ি।

ভণ্ড বুড়ি সন্ন্যাসিনী বললে, বাছা, এসব ব্যাপারে আমিও কম যাই না বলেই তো সিদ্ধকরীকে আমার শিষ্যা করে নিয়েছি। আমার সঙ্গেই থাকে। ভারি চালাক, গুণের অবতার।

ঠিক সেই সময়ে গুণের যার ঘাট নেই, সেই সিদ্ধকরী হাজির সেখানে।

পরিচয় করিয়ে দিল বুড়ি সন্ন্যাসিনী।

বললে, এবার বলো কার বউকে পটাতে হবে।

গুহসেনের বউ দেবস্মিতাকে। সস্বরে বললে চার চরিত্রহীন।

তাই হবে। এখন চলো আমার ঘরে। বেলা হয়েছে। খেয়েদেয়ে জিরোও। আমরা যাচ্ছি দেবস্মিতাকে পথে নামাতে।

তাই হল। চার চরিত্রহীন দুই চরিত্রহীনার বাড়িতে রইল। পাজি মেয়েছেলে দুটো গেল দেবস্মিতার সর্বনাশ করতে।

গিয়ে দেখল, বাড়ির সামনে বাঘের মতো একটা কুকুর বাঁধা রয়েছে। অচেনা লোক দেখলেই তেড়ে আসছে।

বাড়ির ভেতর থেকে দেবস্মিতা দেখল, দীনহীন এক বুড়ি আর এক যুবতীকে দেখেই দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে যাচ্ছে বাঘা কুকুর। তারা ঢুকতে পারছে না।

সরলমনা দেবস্মিতা বেরিয়ে গিয়ে তাদের নিয়ে এল বাড়ির মধ্যে। তখন সন্ধ্যে হয়েছে।

আলাপ পরিচয় ছিল না কস্মিনকালেও। কিন্তু যারা লোক ঠকিয়ে খায়, তারা অপরিচিতের মনের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে নিমেষে। এ একটা বিদ্যে।

বড়ো ঘরের মেয়ে দেবস্মিতা এসব কুচুটে ব্যাপার তো জানে না। এ দেশের হালচালও বোঝে না। সে অন্য দ্বীপের মেয়ে। বাপের বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে রয়েছে স্বামীর কাছে। স্বামী গেছে সমুদ্রে রোজগারের ধান্দায়।

সব শুনে চোখ মুখ করুণ করে দুই ভণ্ড বললে, বড় কষ্ট! বড় কষ্ট! যৌবনের জ্বালা যে কী জ্বালা, আমরা মেয়েরা তা বুঝি। পুরুষ ছাড়া কী জ্বালা জুড়োয়? কেন যৌবনটাকে নষ্ট করছে? চুটিয়ে ভোগ করে নাও। কে জানছে? স্বামী তো সাগরে। সে-ও নিশ্চয় পরনারী নিয়ে মেতে আছে। পুরুষ কী কখনও এক বউ নিয়ে থাকে? হাজার বউ না থাকলে পুরুষ কীসের? বোকা মেয়ে। তুমিও ভাসো এখানে আনন্দের সাগরে। চারটে বড়লোকের ছেলে তোমাকে দেখে মজেছে। কেউ জানবে না, তাদের দিয়ে শরীর ঠাণ্ডা করো। আনব তাদের?

দেবস্মিতা অপার বুদ্ধি ধরে। সে মুখে এক কথা বলছে, মনে আর এক কথা ভাবছে। এই বুড়ি আর ওর ওই শিষ্যা নিশ্চয় ঘরের মেয়েদের বেশ্যা বানায়। যে চারজনের কথা বলছে, নিশ্চয় তাদের বাড়ি কটাহ দ্বীপে। স্বামীর হাতে লাল পদ্মফুল দেখেছে। সরল মনে স্বামী নিশ্চয় পদ্ম-কাহিনী শুনিয়েছে। তাই এসেছে আমার সর্বনাশ করতে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।

মুখে বললে, সত্যিই তো, পুরুষরা তো মেয়ে চেখেই বেড়ায়। আমিও পুরুষ চেখে যাব আজ রাত থেকে। আনো চারজনের একজনকে। জুড়িয়ে যাক আমার জ্বালা।

খুশি হয়ে বিদায় নিল দুই দুশ্চরিত্রা। পতিতার চাইতেও অধম। তাদের মুখে মুখোশ থাকে না নষ্ট মেয়ে বলে চেনা যায়। এরা ধর্মের মুখোশ পরে নষ্ট মেয়ে বানায়।

চার ধনীপুত্রকে সুসংবাদটা দিল দুই পাপিষ্ঠা; তারা তো আনন্দে নেচে কাটিয়ে দিল সারা দিন। বন্ধুর বউ-এর মতো মিঠে কি আর কিছু হয়।

মিঠে কি তেঁতো, সেটা বোঝা গেছিল পরে!

রাত নামল। কুটনী বুড়ি দরদাম মিটিয়ে নিয়ে ঠিক করে দিল চার ইয়ারের মধ্যে আগে কে যাবে। সে সেজেগুজে রওনা হল বন্ধুর বউয়ের সর্বনাশ করার জন্যে।

দেবস্মিতার সর্বনাশ করা অত সোজা নয়। বাড়ি থেকে পালানো মেয়ে। সে জানে নিজেকে কী করে আগলে রাখতে হয়।

কুটনীকে মিষ্ট বচনে বিদেয় করেই সে নিজের খাস চাকরানিকে ডেকে এনে খুলে বলেছিলি সব কথা। কী করতে হবে পরনারীলাভী এলে, তাও বলে দিয়েছিল।

সে এক মজার নকশা!

খাস চাকরানি নিজেই দেবস্মিতা সেজেগুজে পান চিবোতে চিবোতে বসেছিল একটা ঘরে খাটে পা ছড়িয়ে দিয়ে। রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে চার দুশ্চরিত্রের প্রথম জন পা টিপে টিপে দরজার সামনে আসতেই জানলা থেকে তাকে দেখল সেই ঝি। তরতরিয়ে নেমে এসে ফিসফিস করে রতিরঙ্গের কথা বলতে বলতে ছোকরাকে নিয়ে গেল নিজের ঘরে। দেদার মদ আর আফিং আগে থেকেই পাঠিয়ে দিয়েছিল দেবস্মিতা। খাটে শুয়ে গায়ে গা দিয়ে কামশাস্ত্রের নানা পর্বের আলোচনায় ছোকরাকে মাতিয়ে দিয়ে গিলিয়ে গেছিল গেলাসের পর গেলাস আফিং মিশানো কড়া মদ। ছোকরা নেতিয়ে পড়ল অল্পক্ষণের মধ্যেই। হুঁস আর নেই। কাঠকয়লার আঁচে তাতিয়ে লাল করা লোহা দিয়ে কপালে এমন চিহ্ন দাগিয়ে দিল ঝি-সুন্দরী, যা সারাজীবন থেকে যাবে। দাগটা অদ্ভুত। একটা কুকুরের পায়ের ছাপ!

তারপর তার গা থেকে জামাকাপড় সব খুলে নিয়ে একদম উলঙ্গ করে রেখে এল একটা খাটো পায়খানার গর্তে।

ভোরের দিকে জ্ঞান ফিরল পরের বউ-লোভী ছোকরার। চোখ মেলে দেখতে পেল না আলতামুখী সেই সুন্দরীকে, যাকে সে দেবস্মিতা মনে করে কতই না কাম-কথা বলেছে।

এখন দেখল, পড়ে আছে একটা বিষ্ঠাভর্তি গামলায়, সারাগায়ে লেগে দুর্গন্ধময় বিষ্ঠা, কপালটাও জ্বলছে, হাত বুলিয়ে বুঝল, গরম লোহা দিয়ে তাকে সারাজীবনের মতো দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনও রমণীই এখন থেকে তার কাছে ঘেঁষবে না।

গর্ত থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে অতিকষ্টে পৌঁছোল সেই কুটনীর বাড়িতে। হইহই করে উঠল তিনবন্ধু, এ অবস্থা হল কী করে?

মিথ্যে জবাবটা আগে থেকেই তৈরি করা ছিল যাতে একই দশা হয় অন্য তিন বন্ধুর।

তাই বললে ইনিয়ে বিনিয়ে, কপাল! কপাল! দেবস্মিতাকে লুটেপুটে নিয়ে রাস্তায় বেরতেই পড়লাম ডাকাতদের খপ্পরে। একা আর কতক্ষণ লড়বো? উলঙ্গ করে দিয়েছিল যে। তাই পালিয়ে এলাম।

তিনবন্ধু মুখে আহা-আহা করলেও মনে মনে রাত হওয়ার প্রতীক্ষায় রইল। খাসা মেয়ে দেবস্মিতার গল্পও শুনল, যদিও সে গল্প সেই ঝি-এর, রতিরঙ্গে সে বিষম চোস্ত।

রাত হল। দেবস্মিতার বাড়িতে গেল আর এক বন্ধু।

দেবস্মিতার খাস চাকরানি তাকে নিয়েও আদিরসাত্মক রঙ্গতামাসার ফাঁকে ফাঁকে আফিং মিশোনো মদ গিলিয়ে, ফেলে দিল বিষ্ঠার গামলায়। কপালে ছ্যাঁকা দিতেও ভুলল না। পরের দিন সকালে কুটনীর বাড়ি ফিরে সে শোনাল একই গল্প, দেবস্মিতা-রমণের পরেই পাজি ডাকাতরা তার এই হাল করেছে। উসকে দিল তৃতীয় বন্ধুকে। যাও, যাও, চুটিয়ে মজা করে এসো।

তৃতীয় আর চতুর্থ বন্ধুকেও নাকের জলে চোখের জলে করে ছেড়ে দিল ছলনাময়ী সেই দাসী। চারজনের কেউই কিন্তু জানতেও পারল না, দেবস্মিতার ছায়াও তারা দেখতে পায়নি। সে পতিব্রতা মেয়ে, পরপুরুষের সামনে বেরয় না। বেরয়নি।

কিন্তু কপালে ছ্যাঁকা, উলঙ্গ হয়ে বিষ্ঠার গামলায় পড়ে থাকার জন্যে দায়ী তাহলে কে? দেবস্মিতা নিশ্চয় নয়। সে বড়ো ভালো মেয়ে। পরপুরুষ নিয়ে কত মজা করেছে!

দায়ী এই কুটনী হারামজাদি। আর ওই চোরনী শয়তানি, সিদ্ধকরী।

সুতরাং ওদের আর বকশিস দেওয়া হবে না। এই ফিকির এঁটে একদিন চুপি চুপি গা ঢাকা দিল চার জালিয়াত।

এ যে চোরের ওপর বাটপারি। ফুর্তি মেরে টাকাপয়সা না দিয়েই ভাগলবা!

রাগে গজ গজ করতে কুটনী আর চোরনী গেল দেবস্মিতার বাড়ি।

তাদের পথ চেয়েই কিন্তু বসেছিল দেবস্মিতা। কূটনীরা দুতরফ থেকেই নিংড়ে পয়সা বের করে, বেশি পয়সা দেয় মেয়েতরফ, কেলেঙ্কারি এড়োনোর জন্যে।

পাপের পথ বড়ো গড়ানে, একবার গড়ালে গড়িয়েই যেতে হয়, কুটনীদের ব্যবসা এত ফলাও সেই কারণেই।

চতুরা দেবস্মিতা তাই মহাখাতির করে দুই পাপীয়সীকে নিয়ে গেল বাড়ির মধ্যে, চমৎকার নাটক করে গেল দুজনের সঙ্গে, শুরু হল খানাপিনা। দেদার আফিং মিশোনো মদ গিলিয়ে দিল দুজনকেই—সরবৎ খাওয়ানোর অছিলায়।

বিলক্ষণ বেহুশ যখন দুই পাপিষ্ঠা, তখন তেতে লাল লোহা দিয়ে মজার মজার উলকি এঁকে দিল গোটা গায়ে। মুখ, বুক, পেট, পিঠ, উরু, পা বাদ দিল না কোনও জায়গা।

তাতেও গায়ের জ্বালা গেল না দেবস্মিতার। কচ কচ করে কাটল দুজনের নাক আর কান। পরনের কাপড় খুলে নিয়ে দুই দিগম্বরীকে ফেলে দিল গর্তভর্তি বিষ্ঠার গামলায়!

জয় হল সতীত্বের। পুণ্যবতীর অঙ্গস্পর্শ তো দূরের কথা, ছায়া মাড়াতেও পারলো না চার দুর্বৃত্ত। দাগী কপাল নিয়ে মুখ লুকিয়ে চম্পট দিল স্বদেশে।

আর সেই কুটনী আর চোরনীর অবস্থা হল আরও শোচনীয়। সারা গায়ে মুখে ছ্যাঁকা, নাক-কান কাটা, রাস্তায় বেরবে কী করে? বাকি জীবনটা দরজা জানলা বন্ধ করে কাটিয়ে দিল বাড়ির মধ্যে।

পাপীদের এইভাবে সাজা দিয়ে সতী দেবস্মিতা কিন্তু মন কুলে সব কথা বলেছিল শাশুড়িকে। শুনে দুশ্চিন্তায় রাতের ঘুম উড়ে গেল শাশুড়ির। চার হারামজাদা দেশে ফিরে গিয়ে যদি বদলা নেয় একা গুহসেনের ওপর? যদি প্রাণে মেরে দেয়?

কেঁদে ফেলেছিল বউমার কাছে, কী হবে তোমার সোয়ামির?

অভয় দিয়েছিল দেবস্মিতা। যারা ধর্মরক্ষা করে চলে, কর্মফল তাদের আগলে রেখে দেয়। শুক্তিমতী যেমন বুদ্ধির জোরে স্বামীকে রক্ষে করেছিল, আমিও তেমনি আমার স্বামীকে রক্ষে করব।

শুক্তিমতী কে গা? গল্পের গন্ধ পেয়ে চোখ মুছেছিল গুহসেনের মা।

জমিয়ে গল্প শুরু করে ছিল জমাটি মেয়ে দেবস্মিতা।

আমি যে দ্বীপের মেয়ে, সেই দ্বীপে একজন যক্ষ ছিল। তার নাম মণিভদ্র। মণিভদ্র খুব ডাকসাইটে যক্ষ। আর, পরোপকারী।

একদিন শহরের কেষ্টবিষ্টুরা হাজির তার বাড়িতে। রাতবিরেতে পরের বউ নিয়ে ফুর্তি করার হিড়িক উঠেছে শহরে। এই নোংরামি বন্ধ করতে হবে। যারা এই অপকর্ম করবে নিশুতি রাতে তাদের ধরে নিজের বাড়িতে আটকে রেখে দিতে হবে। সকালে রাজার লোক গিয়ে তাদের সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

সেই রাত থেকেই অতন্দ্রনয়ন মণিভদ্র নজর রাখল গোটা শহরে। যক্ষের চক্ষু এড়ানো বড়ো কঠিন।

ধরা পড়ল এক ব্যবসায়ী। তার নাম সমুদ্রদত্ত। পরের বাড়ির বউ নিয়ে বেলেল্লাপনা করছিল রাত্রে। মণিভদ্র তাকে আর সেই দুশ্চরিত্রা মেয়েটাকে ধরে আটকে রাখল নিজের বাড়িতে।

সমুদ্রদত্ত-র বউ ছিল কিন্তু ধর্মপরায়ণা। স্বামীঅন্ত প্রাণ। সেই রাতেই খবর পেল, লম্পট স্বামী অসতী সেই মেয়েটার সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় রয়েছে মণিভদ্রের বাড়িতে।

জনাকয়েক কাজের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। উদ্দেশ্য, মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছে। কারও তাতে আপত্তি রইল না।

কিন্তু সে গেল মণিভদ্রের বাড়িতে। নিজের চোখে দেখল নেই জঘন্য দৃশ্য : নিজের সাত পাকে বাঁধা স্বামীকে অন্য লোকের বিয়ে করা এক বউয়ের সঙ্গে একসঙ্গে বেঁধে রেখে দেওয়া হয়েছে একটা ঘরে। পিঠে পিঠ লাগিয়ে বাঁধা হয়েছে। কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না।

বুদ্ধিমতী শুক্তিমতী নিজের বাড়ি থেকে বেরনোর সময়ে পোশাক পালটে বেরিয়েছিল। স্বামীর কামপত্নীকে সেই পোশাক পরিয়ে দিয়ে বললে—পালাও। আমার এই মার্কামারা পোশাক তোমার গায়ে থাকলে কেউ তোমার পথ আটকাবে না। ভবিষ্যতে আর কক্ষনো পরের স্বামীকে ফুসলোতে যাবে না।

চটপট পোশাক পালটে নিয়ে মণিভদ্রের বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল সমুদ্রদত্তের কাম-কামিনী, যে কিনা অন্য এক পুরুষের ধর্মপত্নী।

সমুদ্রদত্তের পিঠে পিঠ দিয়ে একত্র বন্ধনাবস্থায় বসে রইল শুক্তিমতী, নিজের পোশাক পরে। এত কাণ্ড করে, দাসীরাও নিঃশব্দে সরে পড়ল মণিভদ্রের বাড়ি থেকে।

সকালবেলা খবর পেয়েই রাজার লোকজন এল মণিভদ্রের ভদ্রাসনে। এসে কী দেখল?

সমুদ্রদত্তকে তারই ধর্মপত্নী শুক্তিমতীর সঙ্গে পিঠোপিঠি বেঁধে রেখে দেওয়া হয়েছে একটা ঘরে!

মণিভদ্রের মুখ চুন। রাজপুরুষরা রেগে টং!

রাজার কানে খবরটা যেতেই তিনি আগে স্বামী-স্ত্রী'কে সসম্মানে পৌঁছে দিলেন তাদের বাড়িতে। তারপর মোটা টাকার জরিমানা করলেন মণিভদ্রকে।

বুদ্ধিবিদ্যার জোরে শুক্তিমতীর মতো আমিও রক্ষে করব আমার স্বামীকে, আপনার ছেলেকে, দুশ্চিন্তা করবেন না।

শাশুড়ির মুখে হাসি ফুটিয়ে দেবস্মিতা তৎক্ষণাৎ তলব করেছিল কয়েকজন দাসীকে. তাদেরকে পুরুষমানুষের পোশাক পরিয়ে পুরুষ সাজিয়ে দিয়েছিল। নিজেও পুরুষ সওদাগর সেজে সেইদিনই জাহাজে চেপে রওনা হয়েছিল কটাহ দ্বীপ অভিমুখে, সঙ্গে নিয়েছিল পুরুষবেশী দাসীদের।

সেই দ্বীপে পৌঁছে, নানান বন্দরে টহল দিয়ে, অবশেষে পৌঁছোল স্বামী যেখানে রয়েছে, সেইখানে, দেখাও করল।

কিন্তু আত্মপরিচয় দিল না। গুহসেনও নিজের বহুরূপী পুরুষবেশী পত্নীকে চিনতেই পারল না। নিছক পুরুষবেশ তো নয়, নিপুণ অভিনয় ক্ষমতাও তো ছিল দেবস্মিতার। তাই বরের চোখে ধুলো দিয়ে রইল অনায়াসেই। মজার নাটকটা করবার পরেই খবর পাঠাল দেশের রাজার কাছে। মানে, নালিশ ঠুকল। আপনার দেশ থেকে চারজন সওদাগর তনয় আমাদের দেশে গিয়ে বিস্তর নোংরামি করে এসেছে। সে সব কথা মুখে বলা যায় না। তারা আপনার প্রজা, দেশের কলঙ্ক, আমার চাকর হয়েছিল সেই চার ছোকরা। আপনি চার বদমাসকে আমার হাতে তুলে দিন। তারা তো আমারই চাকর।

দেশের সমস্ত সওদাগরকে রাজসভায় ডেকে আনলেন রাজা। বললেন দেবস্মিতাকে—চিনিয়ে দিতে পারেন সেই চারজনকে? চার লম্পটকে তৎক্ষণাৎ সনাক্ত করে দিল দেবস্মিতা। লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল চার বদমাসের বন্ধুর দল, প্রমাণ কী? পুরুষরূপী দেবস্মিতা বললে, প্রমাণ একটা করে কুকুরের পায়ের ছাপ। গরম লোহা দিয়ে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে চার বদমাসের কপালে। কিন্তু প্রত্যেকেই তো পাগড়ি পরে কপাল ঢেকে রেখেছে। কার কপালে আছে কুকুরের ছাপ?

দেবস্মিতা ইসারা করল সেই দাসীকে, যে দেবস্মিতা সেজে চার রাত ঠকিয়েছে চার বদমাসকে, নিজের হাতে দাগিয়ে দিয়েছে চারজনের কপাল।

সে এক-একজনের সামনে গিয়ে পাগড়ি টেনে খুলে দিল।

চারজনের কপালে কুকুর-পায়ের ছ্যাঁকার দাগ!

চারজনের মুখ থেকে যখন রক্ত নেমে গেছে। পুরুষবেশী সেই দাসী নাটকীয় ভাবে ছদ্মবেশ ত্যাগ করে স্ত্রীবেশে বিলোল কটাক্ষ হেনে বললে, চিনতে পারছ?

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল চার লম্পট সওদাগর-পুত্র।

তাদের চিবুক নেড়ে দিয়ে দাসী বললে, আমি কিন্তু দেবস্মিতা নয়। এত অপমানের মধ্যেও চেঁচিয়ে উঠেছিল চার পরনারী লোভী, দেবস্মিতা তাহলে কে?

পুরুষবেশ খসিয়ে নারীরূপে দেবস্মিতা বলেছিল, আমিই সেই পতিব্রতা। তোমরা আমার ছায়াও দেখতে পাওনি।

আর কোনও কথা নয়। চার লম্পটকে জেলে ঢুকিয়ে দিলেন রাজা। সতী দেবস্মিতার নাম ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। অক্ষত স্বামী গুহসেন আর বিস্তর ধনরত্ন নিয়ে তাম্রলিপ্ত ফিরল দেবস্মিতা। শাশুড়িকে বললে, এই নিন আপনার ছেলে।

শেষ হল বিদূষক বসন্তকের গল্পের পর গল্প। হাস্যরসের মধ্যে নীতিশিক্ষা।

তারপর বললে বাসবত্তাকে, কুবেরের ধনের বিনিময়েও সতী কখনও পতিকে ছাড়ে না।

তা ঠিক, মনে মনে বলেছিল বাসবদত্তা। এমন স্বামীর পায়ে মাথা রেখেই যেন সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রাখতে পারি।

১০. উদয়নের সঙ্গে বিয়ে হল বাসবদত্তার

বিন্ধ্যের জঙ্গলে তাঁবু খাটিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল উদয়ন। পাত্রীহরণ সমাপ্ত, পাত্রীর পিতা নত। এবার দেখা যাক, জল কোথায় গড়ায়।

একদিন এল চণ্ডমহাসেনের দূত। বললে সবিনয়ে, আপনাকে জামাই করবেন বলেই তো রাজা আপনাকে কায়দা করে আটকে রেখেছিলেন। অথচ বিয়েও দিতে পারছিলেন না, আপনার সম্মান থাকবে না বলে। পালিয়ে এসে আপনি ভালোই করেছেন। এইবার বিয়েটা হয়ে যাক সসম্মানে। যুবরাজ গোপালক এসে বিয়ে দেবেন।

খুশি হয়ে রাজধানী কৌশাম্বীতে ফিরে এল উদয়ন।

যথাসময়ে এল গোপালক। সঙ্গে বিস্তর বরপণ আর স্ত্রীধন। বোনকে সমপ্রদান করল উদয়নের হাতে। সাক্ষী রইল ভারতবর্ষের নিমন্ত্রিত রাজারা।

বিয়ের উৎসব সাঙ্গ হওয়ার পর একদিন মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ বললে সেনাপতি রুমন্বান কে, আমাদের দুজনেরই কাজ বড়ো কঠিন। প্রজারা যেন বাচ্চা ছেলে। একটুতেই ভুল বোঝে।

রুমন্বান হেসে বললে—সে কী!

তাহলে একটা গল্প বলি শোনো। এক ব্রাহ্মণ দুই বিয়ে করেছিল। এক বউ একটা ছেলে বিইয়ে মারা গেল, বাচ্ছা বড়ো হতে লাগল বিমাতার কাছে। ছেলে একটু বড়ো হতেই বিমাতা তার দিকে তেমন নজর দিতে পারত না, খাওয়াদাওয়ায় তেমন যত্ন না পেয়ে ছেলে শুকিয়ে যেতে লাগল দিনের পর দিন। ব্রাহ্মণ তা দেখে বউকে বকাঝকা করতেই বউ বললে, এত যত্নেও ছেলে যখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন ওর নাম রাখো বিনষ্টক। বিনষ্টকের বয়স যখন পাঁচ, তখন সে এক প্যাঁচ খেলল বিমাতার সঙ্গে। বাপকে বললে, আমার কি দুই বাবা? ব্রাহ্মণ ভাবল, কী সর্বনাশ! আমার এই বউ কি উপপতি-সংসর্গ করছে? ঘেন্নায় বউকে ছোঁয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিল। বিপদ বুঝে ছেলের খাওয়া-দাওয়ার দিকে মন দিল ব্রাহ্মণ-পত্নী। ধুরন্ধর ছেলে তখন বাপ-কে একটা আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে বললে, এই দ্যাখো বাবা, আমার দুই বাবা! . . . এই ব্যাপার! বালকের কথায় বউকে ভুল বোঝা হয়েছে অ্যাদ্দিন। শুরু হল বউয়ের আদর-যত্ন। ভয়ের চোটে আর কখনও ছেলের অযত্ন করেনি ব্রাহ্মণ-পত্নী। বুঝলে সেনাপতি, প্রজারাও এই বাচ্ছাছেলের মতো। তাদের মন জুগিয়ে চলা বড়ো কঠিন।

গল্পটা হাসির, কিন্তু শিক্ষণীয়। সেনাপতির কড়া নজর রইল চারদিকে। বিয়ের ধুমধাম কাটলেও অঘটন না ঘটে। নিমন্ত্রিতরা ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত হুঁশিয়ার থাকা দরকার।

বোনের বিয়ে দিয়ে হাসিমুখে গোপালক ফিরে গেল উজ্জয়িনীতে।

সুখে দিন কেটে গেল উদয়ন আর বাসবদত্তার। নতুন বিয়ের পর রাজ্যের কাজকর্মে ঢিলে দিয়েছিল উদয়ন। খুবই স্বাভাবিক। মন্ত্রী আর সেনাপতি নজর রাখল সবদিকে।

মেয়েরা সব পারে, কিন্তু যে পুরুষকে ভালোবাসে, তার বখরা অন্য মেয়েকে নিতে দেয় না।

এই রকমই একটা ঘটনা ঘটল একদিন, অন্তঃপুরের মধ্যেই। বাসবদত্তার ঈর্ষা প্রকট হয়ে পড়ল সেইদিন।

রাজার অন্তঃপুরে অ-সুন্দরী নিশ্চয় থাকে না, সবাই সেখানে সুন্দরী। এদের মধ্যে একটি মেয়ে যেন বড়ো বেশি সুন্দরী। আকাশের বিদ্যুৎ যেন মর্ত্যে নেমে এসেছে। চোখ ঝলসে গেছিল উদয়নের। হাজার হোক কাঁচা বয়স। রঙিন যৌবন। চোখে ঝলক তো লাগবেই।

কিন্তু তা নজর এড়ায়নি বাসবদত্তার। আচ্ছা করে কড়কে দিয়েছিল উদয়নকে। বউয়ের পা ধরে শেষকালে মাপ চাইতে হয়েছিল উদয়নকে।

এই হল বাসবদত্তা।

এর কিছুদিন পরে তারই ভাই গোপালক এক কাণ্ড করে বসল।

বসুন্ধরা নামে এক ভুবনমোহিনীকে ধরে নিয়ে এল। বসুন্ধরার বাবা এক দেশের রাজা। গোপালক সেই রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে তার রাজ্য দখল করেছিল।

রূপবতী রাজকন্যাকে নিয়ে এসেছিল বোন বাসবদত্তার সখী করে দেওয়ার জন্যে।

গোলমাল শুরু তারপর থেকেই।

মেয়েটির নাম বন্ধুমতী। বাসবদত্তা তাকে রেখে দিল অন্তঃপুরের এমন একটা বাগানে যেখানে আজেবাজে লোক যেতে পারে না। যেখানে শুধু মেয়েরা খেলে বেড়ায়। তারা সবাই বাসবদত্তার সহচরী।

বন্ধুমতী অসাধারণ রূপবতী বলে বাসবদত্তা সতর্ক হয়েছিল গোড়া থেকেই। যত বিপদ তো পরমাসুন্দরীদের নিয়েই। তাই এমন ব্যবস্থা করেছিল যাতে বন্ধুমতী কোনও পুরুষের নজরে না পড়ে। সে নিজে আর তার কয়েকজন বিশ্বাসী প্রাণের সখী ছাড়া বন্ধুমতীকে কেউ দেখতে পেত না। কিন্তু হঠাৎ একদিন বন্ধুমতীকে দেখে ফেলল উদয়ন।

ধরায় এমন রূপ, এমন লাবণ্য, এমন যৌবনবতী তো কখনও দেখেনি উদয়ন। বাসবদত্তাকেও যে টেক্কা মেরে যায়!

এই ভয়টাই করেছিল বলেই তো বাসবদত্তা এতদিন লুকিয়ে রেখেছিল বন্ধুমতীকে! তাকে নির্জনে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু ফুটন্ত ফুলের মতোই বন্ধুমতী নিজের যৌবনশ্রী একটু করে মেলে ধরছিল নিজেকে ঘিরে। যেন স্বর্গের ফুল। একা-একা যখন অন্তঃপুরের নিভৃত বাগানে বেড়াতো, অন্য ফুলেরা ম্লান হয়ে যেত তার রূপের আলোয়। যেন চলমান বিদ্যুৎ! ঝলমলে করে রাখত গোটা বাগানকে, ম্লান হয়ে যেত সুন্দর সুন্দর ফুলেরা তার অনুপম সৌন্দর্য-প্রভার বিকিরণে।

বলতে গেলে, একরকম বন্দিনী অবস্থাতেই থাকতে হয়েছে বন্ধুমতীকে। সে মহাসুন্দরী, এই তার অপরাধ।

দূর থেকে তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত বাসবদত্তা নিজেও। মনে হত, বন্ধুমতী যেন মানবী নয়, এক বিদ্যাধরী।

এহেন পরমাসুন্দরীর রূপের ঝলক একদিন উদ্ভ্রান্ত করে দিল উদয়নকে। বন্ধু বসন্তককে নিয়ে উদ্যান-বিহারে বেরিয়ে হঠাৎ দেখে ফেলেছিল প্রভাময়ী বন্ধুমতীকে। চোখ ধাঁধিয়ে গেছিল প্রথম দর্শনেই।

কে এই রূপসী? অন্তঃপুরের বাগানে এমন রূপের কণাকে তো আগে দেখেনি উদয়ন! মানবী, না, দেবী?

বসন্তক খবর এনে দিল তৎক্ষণাৎ। এর নাম বন্ধুমতী। অন্য রাজ্য থেকে লুঠ করে আনা রাজকন্যা। শ্যালক গোপালক রেখে গেছে বাসবদত্তার সখী বানিয়ে। যেখানে সৌন্দর্যের হাট, সেখানেই তো থাকবে এই সুন্দরী। রূপ-কাননেই তো থাকবে রূপের ফুল!

উদয়নের তো মাথা ঘুরে গেল সেই চাঁদের কণা আর বিদ্যুতের ঝিলিকে গড়া যুবতীকে দেখে!

গভীর প্রেম প্রথম দর্শনেই। উদয়নও তো কম সুন্দর নয়—যেন ময়ূর ছাড়া কার্তিক। বন্ধুমতীও মরলো উদয়নকে দেখে।

দেখা সাক্ষাৎ এবং প্রথম প্রেমালাপটা অবশ্য করিয়ে দিল বসন্তক?। বন্ধুর যা কাজ। বিয়েও হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ, গান্ধর্ব মতে।

কিন্তু মিলন-মেলা চলল বাসবদত্তাকে না জানিয়ে। তার ভয়ে চুপিচুপি এসে বন্ধুমতীকে ফুলের বিছানায় শুইয়ে।

ফুলশয্যা করে যেত উদয়ন রোজ, দিনে অথবা রাতে। অতবড়ো বাগানে অত গাছপালার মধ্যে বউয়ের বান্ধবীকে বউ বানিয়ে কন্দর্প-কাণ্ড করে গেলে দেখছে কে?

কিন্তু প্রেম আর পারা কখনও চাপা থাকে না। বাসবদত্তার অন্য সখীরাই প্রথমে খবরটা জানিয়েছিল বাসবদত্তাকে। তারপর আড়াল থেকে তাকে একদিন দেখিয়েছিল উদয়নের কামক্রীড়া।

রাজারাজরারা একাধিক বউ অথবা উপবউ নিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু বাসবদত্তা তা হতে দেবে না উদয়নের ক্ষেত্রে, কক্ষনো না।

তেলেবেগুনে জ্বলেউঠে আগে খোঁজ নিল অন্তঃপুরের গোপন বাগানে উদয়নকে ঢুকিয়েছে কে?

বন্ধুবর বসন্তক!

ফিচেল বুদ্ধিতে বাসবদত্তা অতুলনীয়া। প্রেমের ব্যাপারে বাঘিনী।

বসন্তককে ঢুকিয়ে দিল জেলখানায়!

উদয়নের মাথায় বজ্রাঘাত! একদিকে প্রাণের বন্ধু, আর একদিকে প্রাণের বউ (প্রথম)! শ্যাম রাখি কী কূল রাখি!

বাসবদত্তা তখন প্রকৃতই খাণ্ডারনি। ভয়ের চোটে রাজা হয়েও বন্ধুকে জেলখানা থেকে বের করতে পারল না।

অগত্যা খলিফা বসন্তক নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিল। হাত করল অন্তঃপুরের এক পৌঢ়াকে। তাকে দিয়ে দরবার জানাল খোদ বাসবদত্তার কাছে। মানুষের মন ভিজোনোর বিদ্যায় বসন্তক অদ্বিতীয়। কত হাসির গল্প শুনিয়ে বাসবদত্তার পেটের খিল খুলিয়ে দিয়েছে।

অবশেষে মুক্তি পেল বসন্তক।

তবে উদয়ন, বন্ধুমতীকে যাতে আর চোখের দেখাও না হয়, যে ব্যবস্থাও কড়াহাতে করে দিল বাসবদত্তা।

আগুন আর ঘি কি পাশাপাশি রাখতে আছে? কক্ষনো না। আরও এক কাঠি ওপরে গেল বাসবদত্তা। যেন চোখে চোখেও মিলন না হয়।

মন খুশি। সুযোগ বুঝে ভাঁড় বসন্তকে এল একদিন তার সামনে। সে রাজা-বিদূষক। মেয়ে-মহলে খাতির বিলক্ষণ। হন হন করে গিয়ে একগাল হেসে বললে বাসবদত্তাকে—একটা গল্প শোনাতে এলাম।

বসন্তকের গল্প মানেই মজার গল্প। মুচকি হেসে বাসবদত্তা বললে—সে কী ঠাকরপো! এখনও গল্প আসছে মাথায়?

আসছে বইকি! আপনি যদি সাপের ওপর ক্ষেপে গিয়ে ঢোঁড়া সাপ মারতে যান, তাহলে হাসি পায় না?

আমি! ঢোঁড়া মারতে গেছিলাম! খুলে বল, ঠাকুরপো। তখন সেই মজার গল্প রসিয়ে বলে গেল বসন্তক।

বসন্তক হাসাতে জানে। হাসিয়েই আঁতে ঘা দিয়ে যায়।

সেদিনও বাসবদত্তাকে নিল এক হাত। একই সঙ্গে ধূলিসাৎ করে দিল রাজদম্পতির ঝগড়া। মুখদেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ ছিল যে!

গল্পটা এই :

মেনকাকে তো জানেন? সে আপাদমস্তক বেশ্যা। স্বর্গলোকের বেশ্যা। এমনকি অন্ধ মানুষের কাছেও তাকে পাঠিয়ে দিলে। তার সারা গায়ে শুধু হাত বুলিয়ে সেই অন্ধ বলে দেবে, হ্যাঁ, এ মেয়ে খাঁটি বেশ্যা বটে!

নিখাদ বেশ্যা বলতে যে মেয়েকে বোঝায়, মেনকা তাই।

অনেক আগের কথা। মেনকার ফাঁদে পা দিয়ে, তাকে গর্ভবতী করে দিয়ে সরে পড়েছিল এক বিদ্যাধর। মেনকাও এক মুনির আশ্রমে ফুটফুটে একটি মেয়ের জন্ম দিয়ে সরে পড়েছিল নন্দনকাননে। মেয়ে মানুষ করা তো তার কাজ নয়। পুরুষ নাচিয়েই সময় পায় না!

ফলে, মিষ্টি মেয়েটাকে নিজের আশ্রমে রেখে বড়ো করে তুলল মুনি। সেই মুনির নাম, স্থূলকেশ।

মুনিদের কাণ্ডই আলাদা। মেয়েটি বড়ো হতেই তাকে দেখে আর এক মুনির ঈশ্বর-ধ্যান ছুটে গেল। কামজ্বর বড়ো ভয়ানক জ্বর। সম্ভোগেই তার নিবৃত্তি। আর কোনও দাওয়াই নেই। সেই মুনির নাম রুরু।

অগত্যা স্থূলকেশ মুনি কন্যা সম্প্রদান করল সেই কামতপ্ত মুনিকে। রুরু-কে।

কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তাই অঘটনটা ঘটল বিয়ের রাতেই।

এক বিষধর সাপ এসে ছোবল মারল বিয়ের কনেকে। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল দৈববাণী, ওহে মুনি, এ মেয়েকে যদি ভোগ করতে চাও, তবে দাও নিজের পরমায়ুর আধখানা। নইলে এই শেষ।

যে মুনি মেয়ে দেখলে তেতে ওঠে, তার কী আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে। যাক আধখানা পরমায়ু, রমণী ভোগ তো হবে বাকি আধখানায়!

তাই হল। যোগী হয়ে গেল ভোগী! নিজের অর্ধেক আয়ু বউকে দিয়ে। কিন্তু সেই থেকে রেগে টং হয়ে রইল সাপ জাতটার ওপর। সাপ দেখলেই আর রক্ষে নেই, তৎক্ষণাৎ যাক তার পরমায়ু।

কত সাপ যে নিহত হল এই সর্প-ক্রোধের ফলে, তার ইয়ত্তা নেই।

একদিন এক ঢোড়া সাপকে মারতে যেতেই সে এক ধমক দিল মানুষের ভাষায়, কী আশ্চর্য! যাদের বিষ নেই, তাদের ওপর ঝাল ঝাড়া হচ্ছে কেন? বউকে যে সাপ কামড়েছিল তার ছিল বিষ। আমার কি বিষ আছে?

রুরু তো হতভম্ব! সাপেরা বোবা হয়। কিন্তু এ সাপ তেড়ে কথা বলছে। তাও মানুষের ভাষায়।

সবিনয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, মহাশয়, আপনি কে?

ঢোঁড়া বললে, আমিও এক মুনি। পাপ করেছিলাম, তাই সাপ হয়েছি। আপনাকে জ্ঞান দিয়ে আমার শাপ কেটে গেল। চললাম। বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল ঢোঁড়া।

গল্প শেষ করে বিরস বদনে বসন্তক বললে, বুঝলেন? দোষ করল সবিষ সাপ, সাজা পেল নির্বিষ ঢোঁড়া। এই আমি। এক ঢিলে দু-পাখি মেরে দিল বসন্তক। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল বাসবদত্তা। সেইফাঁকে দড়াম করে তার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল উদয়ন। হয়ে গেল মিলন।

১১. রাজ্যবিস্তার-এর যুক্তি

মিলন তো হল। উদয়নের ভোগস্পৃহাও বেড়ে গেল এরপর থেকে। বউয়ের মুখে মুখ দিয়ে পড়ে রইল দিনরাত। বউ মানে বাসবদত্তা। বিয়ের আগে পরিয়েছিল লোহার শেকল, বিয়ের পরে পরাল শরীরের শেকল।

গোল্লায় গেল রাজ্য-শাসন।

চিন্তায় পড়ল কিন্তু মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ। রাজা যদি প্রমোদে গা ভাসিয়ে দেয়, রাজ্য বিস্তার তো দূরের কথা, যা আছে, তাও তো থাকবে না।

সুতরাং একদিন মন্ত্রণায় বসল সেনাপতি রুমন্বান-এর সঙ্গে।

বললে, দেখো সেনাপতি, আমাদের এই রাজা কিন্তু পাণ্ডব বংশের ছেলে। বিলক্ষণ নাম ডাক ছিল পূর্বপুরুষদের, রাজ্যও ছিল বড়ো, হস্তিনাপুর ছিল রাজধানী। সে তুলনায় রাজা উদয়নের রাজ্য নেহাৎই ছোটো। রাজ্য বিস্তার করা দরকার। কিন্তু রাজার সেদিকে মন নেই। মন শুধু ভোগের দিকে। তুমি আর আমি এই দুজনেই যখন সব দেখছি, তখন রাজ্যবিস্তারও করি দুজনে মিলে। পাণ্ডব বংশধর উদয়নের সুনাম আরও বাড়ুক।

সেনাপতি বললে, উত্তম প্রস্তাব।

খুশি হয়ে মন্ত্রী বললে, তাহলে শোনো একটা গল্প।

এক রাজা ছিল। তার নাম মহাসেন। অন্য এক রাজা এসে তাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে চলে যায়, রাজ্যদখল আর করেনি।

কিন্তু এটা তো অপমান। নিদারুণ অপমানবোধ মুখ বুঁজে সইতে সইতে একদিন তার জের পেঁছোল পেটের মধ্যে। বৃদ্ধি পেল প্লীহা। যাকে বলে, গুল্মরোগ।

চিকিৎসায় গলদ না ঘটলেও সুফল দেখা গেল না। মৃত্যুর মুখোমুখি হলেন রাজা মহাসেন।

রাজার বড়ো বড়ো বৈদ্যরা হাল ছেড়ে দিলেন। তখন হাল ধরলেন এক নতুন চিকিৎসক। এ রোগ কেন হয়েছে, আগে তা শুনে নিলেন। চিকিৎসা হবে কোন পন্থায়, তাও ভেবে নিলেন।

বলা বাহুল্য, পন্থাটা অভিনব। বলা উচিত, মনোচিকিৎসা।

মুমূর্ষু রাজাকে সটান বললেন, একটা খারাপ খবর না জানিয়ে পারছি না। ক'দিন আগে আপনার স্ত্রী মারা গেছেন।

আচমকা এই দুঃসংবাদে মাথা ঘুরে গেল রাজার। আছড়ে পড়ল মেঝেতে। ধাক্কার চোটে পিলে রোগও সেরে গেল তৎক্ষণাৎ।

চুটকি গল্প শেষ করে বললে মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ, বুদ্ধি যার, বল তার। রাজা উদয়নের রাজ্য বিস্তারে প্রধান অন্তরায় কে হবে জানো? মগধের রাজা প্রদ্যোৎসিংহ।

সেনাপতি বললে, খাঁটি কথা।

মন্ত্রী বললে, সুতরাং তার সঙ্গে পাঞ্জা না কষে হাতে হাত মিলিয়ে নেওয়া যাক।

সেনাপতি বললে, কীভাবে?

মন্ত্রী বললে, তাঁর মেয়ে পদ্মাবতীর সঙ্গে রাজা উদয়নের বিয়ে দিয়ে।

আঁৎকে উঠল সেনাপতি, ওরে সর্বনাশ! রানি বাসবদত্তা তা হতে দেবেন না।

মন্ত্রী বললে, তাঁকে রাজি করানোর ভার আমার। কারণ, তিনি বুদ্ধিমতী। আখের বোঝেন।

সেনাপতি বললে, বুদ্ধিমতী তো এখনও বাগানেই রয়ে গেল। মন্ত্রী বললে, থাক সে কথা। আসল বাধাটা দেবেন কে বলো তো?

কে?

পদ্মাবতীর বাবা। রাজা প্রদ্যোৎ সিংহ।

সেকী! রাজা উদয়নের মতো জামাই;

তা ঠিক। কিন্তু রাজা উদয়নের বিয়ে হয়ে গেছে আর ঘরে বউ আছে শুনলে একমাত্র মেয়েকে সতীন হতে দেবেন না।

তাহলে?

আমরা প্রচার করব, রাজা উদয়নের রানি বাসবদত্তা আগুনে পুড়ে মারা গেছেন। তার আগে রাজধানীর একটা বাড়ি পুড়িয়ে দেব। সবাইকে বলব, বাসবদত্তাও আগুনে পুড়ে মারা গেছেন। রাজা উদয়ন তাই ফের বিয়ে করবেন।

বুদ্ধিমতী?

তার খবর কেউ জানে না। ওটা লুকিয়ে বিয়ে। শোনো সেনাপতি, এখটু চালাকি দরকার। মগধেররাজা হাতে এসে গেলেই রাজা উদয়নের রাজ্যবিস্তার ঘটবে সহজেই। আমি যে এই মর্মে একটা দৈববাণী শুনেছি।

কিন্তু চালাকি ফাঁস হয়ে গেলে পরিণামটা কি হতে পারে ভেবেছেন? শুনবেন একটা গপ্পো?

বলো।

শুরু হল সেনাপতির সেই গল্প, যার অর্থ, চালাকি দিয়ে বড়ো কাজ হয় না।

গঙ্গাপাড়ে মাকন্দিকা নামে একটা গ্রাম ছিল। এক মৌনী সন্ন্যাসী থাকত সেই গ্রামের মন্দির-লাগোয়া মঠে। গ্রামে গ্রামে ভিক্ষে করে পেট চলে যেত।

একদিন মাথায় ভূত চাপল পরমাসুন্দরী একটি মেয়েকে দেখে। ভিক্ষে করতে গেছিল পাশের গ্রামে এক বড়োলোক সওদাগরের বাড়িতে। তার মেয়ে এসেছিল ভিক্ষে দিতে। দেখেই মাথা ঘুরে গেছিল মৌনীবাবার। রতিপতির পঞ্চশরে এক্কেবারে জখম! সন্ন্যাস মাথায় উঠল। মৌনতা গোল্লায় গেল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল নিদারুণ কামযন্ত্রণার উক্তি, বড় কষ্ট!

শুধু দুটো শব্দ। বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করে গেছিল শুধু ওই দুটো শব্দ। ফিরে গেছিল মঠে ভিক্ষে না নিয়েই।

তাই কি হয়? সওদাগর দৌড়েছিল পেছন পেছন। মঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, অবাক ব্যাপার! আপনি মৌনীবাবা, আজ হঠাৎ কথা বললেন কেন? কষ্টটা কীসের?

ধুরন্ধর সন্ন্যাসীর জিভের ডগায় তৎক্ষণাৎ চলে এল চমৎকার একটা চক্রান্ত!

কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছে তোমার মেয়ের সারা শরীরে অজস্র দুর্লক্ষণ দেখে।

বণিক তো থ, দুর্লক্ষণ?

ভীষণ দুর্লক্ষণ। এ মেয়ের বিয়ে যেদিন হবে, ঠিক সেই দিনই একসঙ্গে মারা যাবে স্বামী আর শ্বশুর, নিজের বাবা আর মা। কেউ বাঁচবে না... কেউ বাঁচবে না। সর্বনাশের সেই ছায়া দেখে ফেলেছিলাম বলেই কষ্টে বুক ফেটে গিয়ে মুখ দিয়ে তা বেরিয়ে গেছিল।

সন্ন্যাসীর পা জড়িয়ে ধরেছিল বণিক, সর্বনাশ আপনি কাটিয়ে দিন।

সন্ন্যাসী বলেছিল, একটাই উপায় আছে। এ মেয়ের বিয়ে না দেওয়া। আজই মেয়েকে একটা সিন্দুকে পুরে গঙ্গায় ভাসিয়ে দাও।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে ঠিক তাই করেছিল বোকা বণিক। গভীর রাতে একমাত্র মেয়েকে কাঠের সিন্দুকে ঢুকিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছিল গঙ্গার জলে।

কামুক সন্ন্যাসী কিন্তু আগেভাগে বলে দিয়েছিল মঠের শিষ্যদের, আজ রাতে গঙ্গায় একটা সিন্দুক ভেসে আসবে। তুলে নিয়ে সটান এখানে আনবি। ডালা খুলবি না, সাবধান?

যেমন গুরু, তার তেমন চ্যালা। তারা উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গঙ্গাতীরে।

কিন্তু নিয়তির লিখন খণ্ডাবে কে? ঠিক সেই সময়ে বজরা নিয়ে গঙ্গায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল এক রাজপুত্র।

সিন্দুক তার চোখে পড়েছিল। বজরায় তুলে নিয়েছিল। ডালা খুলতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেছিল রূপসী বণিক-কন্যাকে দেখে।

উপস্থিত বুদ্ধির অভাব ছিল না সেই রাজকুমারের। বজরা ঘুরিয়ে নিয়ে বাড়ি গিয়েই ঝটপট বিয়ে করে নিয়েছিল অপরূপাকে। তার পরেই একটা ভীষণ চেহারার বড়ো বাঁদরকে সিন্দুকে ঢুকিয়ে ফের ভাসিয়ে দিয়েছিল জলে।

চ্যালারা সেই সিন্দুকই জল থেকে তুলে নিয়ে গেল মঠে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তক্ষুনি ডালা খুলেছিল কামাতুর সাধু।
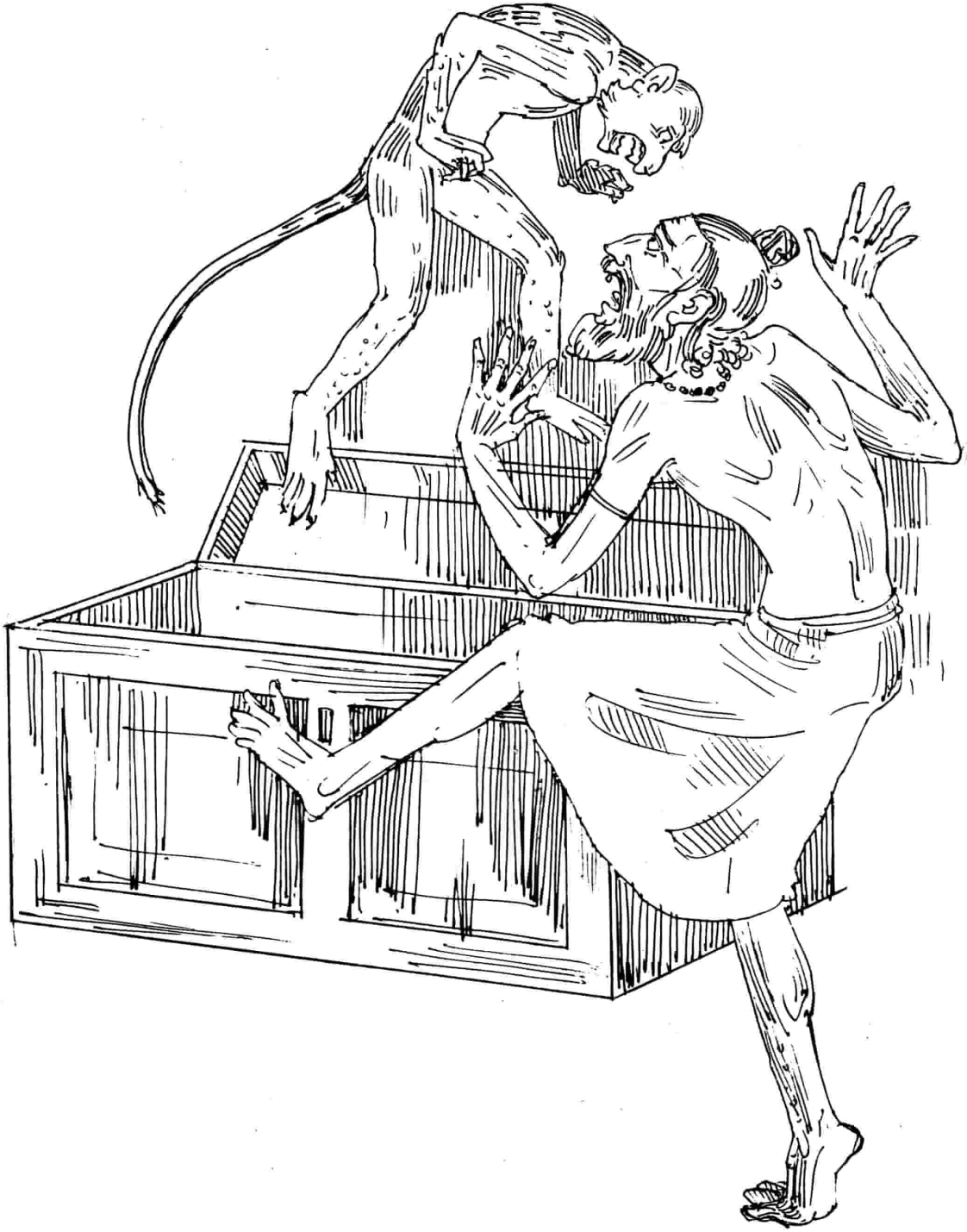
লাফিয়ে বেরিয়ে এসেছিল হিংস্র শাখামৃগ। খামচা মেরে ছিঁড়ে নিয়েছিল মৌনীবাবার নাক আর কান।

লাফিয়ে বেরিয়ে এসেছিল হিংস্র শাখামৃগ। খামচা মেরে ছিঁড়ে নিয়েছিল মৌনীবাবার নাক আর কান। লম্ফ দিয়ে চম্পট দিয়েছিল গাছে।

হেসে খুন হয়েছিল চ্যালারা আসল ব্যাপার জানবার পর।

গল্প শেষ করে বললে সেনাপতি, এইভাবে আমরাও তো নাকাল হতে পারি? যদি আসল ব্যাপার ফাঁস হয়ে যায়?

সৌগন্ধনারায়ণ বললে, ঝুঁকি তো নিতেই হবে? নইলে যে রাজ্যপাট লাটে উঠবে? রাজা যৌবনানন্দে মত্ত আছে বলে কি আমরা গা-ঢালা দেব? রাজা উদয়নের শ্বশুরমশায় ব্যাপারটা বুঝবেন। মিথ্যেরও দরকার আছে, কাজ হাসিল করার জন্যে। বাসবদত্তাও বুদ্ধি রাখেন, আমার বুদ্ধিও নেন। তিনি রেগে যাবেন না।

সেনাপতি বললে, প্রজ্ঞাবান মন্ত্রীর ফন্দিতে বাগড়া দেওয়ার মতো এলেম আমার নেই, তবে একটা গল্প ঘুর ঘুর করছে মাথার মধ্যে।

মন্ত্রী বললে, বলে ফেলো।

সেনাপতি তখন রসিয়ে রসিয়ে বলে গেল সেই কন্যার কাহিনি, যার নাম উন্মাদিনী।

গল্পের হিতোপদেশ এই, পরস্ত্রী গমন নৈব নৈব চ। তার চাইতে আত্মহনন শ্রেয়।

রাজা দেবসেনের রাজধানীর নাম ছিল শ্রাবস্তী। তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে তবে সিদ্ধান্ত নিতেন।

শ্রাবস্তীর সবচেয়ে ধনপতি বণিকের একমাত্র কন্যার নাম ছিল উন্মাদিনী। তার বিয়ের বয়স হয়েছিল, রূপযৌবনের আলোয় ভুবন ভরিয়ে রাখত, কিন্তু তার বিয়ে হচ্ছিল না। কারণ, সওদাগরের বড়ো ইচ্ছে, রাজা হোক তার জামাই। অসংখ্য পাত্রকে ভাগিয়ে দিয়েছে এই কারণে।

কিন্তু রাজার কানে তো প্রস্তাবটা আনা দরকার। উন্মাদিনী যে অনিন্দ্য সুন্দরী, একমাত্র রাজার পাশেই তাকে মানায়, এ খবরটা রাজাকে তো পৌঁছে দেওয়া দরকার।

তাই একদিন নিজেই গেল রাজা দেবসেনের সামনে। কন্যার রূপ-গুণের ফিরিস্তি শুনিয়ে বললে, এ মেয়ে জন্মেছে শুধু রাজারানি হবে বলে। রাজা যদি বিয়ের টোপরটা পরে নেন—

দেবসেন কিন্তু বড়ো বিবেচক রাজা। কাজে নামবার আগে চারদিক ভেবে নেন। হঠকারিতার মধ্যে তিনি নেই। সুন্দরী মেয়েকে অঙ্কশায়িনী করার স্বপ্নে মেতে যান না। আদর্শ রাজা একেই বলে।

তিনি চারজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ডেকে হুকুম দিলেন, সওদাগরের বাড়ি যান। তাঁর বিশ্বসুন্দরী কন্যা উন্মাদিনীর লক্ষণ বিচার করুন। কুলক্ষণা, না, সুলক্ষণা দেখে আসুন।

চার ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ পুঁথি-টুঁথি বগলে নিয়ে হাজির বণিক-ভবনে।

মাথা ঘুরে গেল কন্যার রূপরাশি দেখে। যেন স্বয়ং রতি। কামদেবতার অর্ধাঙ্গিনী। যেন একটা জীবন্ত চন্দ্র, কিরণ ঠিকরে যাচ্ছে প্রতিটি লোমরন্ধ্র থেকে। হাজার হাজার বিকশিত যৌবন-পদ্ম যেন হিল্লোলিত হচ্ছে সমস্ত শরীর ঘিরে।

সর্বনাশ! এ মেয়ের চোখে চোখ রাখলেও তো জগৎ বিস্মৃত হবেন রাজা। রাজকার্য মাথায় উঠবে। নিরবিচ্ছিন্ন সংসর্গ, স্রোতে ভেসে যাবেন। রাজা আর রাজা থাকবেন না।

অতএব, উন্মাদিনীকে রাজবধূ করা সঙ্গত নয়। রাজাকে মিথ্যে বলা যাক। কন্যা অতীব কুলক্ষণা শুনলেই উনি মুখ ঘুরিয়ে নেবেন।

সার্থক নামকরণ, উন্মাদিনী, মুনিবরকেও যে উন্মাদ করে দিতে পারে !

সব রাজারই একটা দুর্নাম আছে। রাজা কানে দেখে। অর্থাৎ, চোখে না দেখে, শোনা কথা বিশ্বাস করে।

রাজা দেবসেন তার ব্যতিক্রম ছিলেন না।

চার ব্রাহ্মণ ফিরে গিয়ে বিষ ঢেলে দিল রাজার কানে। উন্মাদিনী নাকি কুলক্ষণের ডিপো। রাশি রাশি কুলক্ষণ গিজ গিজ করছে তাকে ঘিরে। তার ছায়া মাড়ালেও সর্বনাশ!

চার-চারজন লক্ষণ-বিশারদের গপ্পো শুনে ঘাবড়ে গেলেন রাজা। অলক্ষ্মীকে বিয়ে করতে রাজি হলেন না।

নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো, এই ভেবে নিরুপায় বণিক রাজার সেনাপতির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দিলেন উন্মাদিনীর।

দিন যায়। হঠাৎ একদিন উন্মাদিনীকে দেখে ফেললেন রাজা।

মাথা ঘুরে গেল। এমন রূপবতীকে হেলায় পরিত্যাগ করেছেন! এ তো অতিশয় সুলক্ষণা মেয়ে। তনু ঘিরে দিব্য জ্যোতি। দুর্লক্ষণা কামিনীর কালো ছায়া তো নয়নে, নামায় অধরে, অবয়বে নেই।

ভুল করেছেন! কানে শোনা কথা বিশ্বাস করে রাজা ভুল করেছেন। দিবারাত্র এইসব ভাবতে ভাবতে, প্রেমানলে জ্বলতে জ্বলতে রাজা প্রায় পাগল হয়ে গেলেন। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেছেন। প্রথম রিপুর অনল ধারায় অহর্নিশি জ্বলতে লাগলেন। অতৃপ্ত কাম বড়ো ভয়ানক। উন্মাদিনীর অলৌকিক সৌন্দর্য সেই কামাগ্নি ছড়িয়ে দিল রাজার রুধিরে। তখন তা দাবানল!

রাজা বিছানা নিলেন।

কারণটা যথাসময়ে কর্ণগোচর হল সেনাপতির। সে কিন্তু যথার্থ সিদ্ধান্তে চলে এল চক্ষের নিমেষে। রাজার জন্যে প্রাণ দিতে যাই যুদ্ধক্ষেত্রে। রাজা বাঁচলে আমি বাঁচব। সুতরাং বউ যাক রাজার পালঙ্কে। বউ ভেট!

কী আশ্চর্য! উন্মাদিনীরও তাতে অমত দেখা গেল না। পতির জন্যে সতীত্ব দিতেও সে কুণ্ঠিত নয়!

বেঁকে বসলেন স্বয়ং রাজা। অধর্ম করবেন সিংহাসনে বসে? শরীরের জ্বালা জুড়োতে পরের বউকে অঙ্কসায়িনী করবেন? কক্ষনো না!

পরিনামটা কী হল?

কামচিন্তায় দেহাবসান!

গল্প শেষ করে রুমন্বান বললে, তাই তো বলি, আমাদের রাজা উদয়নও যে কামিনী-কাঞ্চনে বিভোর হয়ে আছেন। সুন্দরী মেয়েছেলে দেখলে লুকিয়ে তাকে বিয়েও করে ফেলছেন। বন্ধুমতীকে নিয়ে কি কাণ্ডটাই না করলেন। সুতরাং বাসবদত্তাকে ছেড়ে উনি থাকতে পারবেন না। শরীর-মন দুটোই খারাপ করে ফেলবেন। বিরহ সওয়া মোজা কথা নয়।

হেসে বললে সৌগন্ধনারায়ণ, হে বন্ধু, রাম কিন্তু সীতা-বিরহ সয়েছিলেন। অনেক রাজাই সয়। উদয়নও সইতে পারবেন।

প্রজামঙ্গলের জন্যে।

চটজলদি জবাব দিল সেনাপতি, রামচন্দ্র ছিলেন ভগবান। ওঁর উপমা এখানে খাটে না। বিরহ-বেদনায় প্রাণেও মারা যেতে পারেন আমাদের রাজা উদয়ন। যেমন ঘটেছিল মথুরায়।

উৎসুক হল সৌগন্ধনারায়ণ, কী ঘটেছিল?

সওদাগরের ছেলে ইল্লক বউকে না নিয়ে জাহাজ ভাসিয়েছিল সাগরে। অনেক কেঁদেছিল বউ, সঙ্গে নেয়নি ইল্লক, কেঁদে কেঁদেই মরে গেল বউ।

তাই শুনে ইল্লকেরও প্রাণপাখি উড়ে গেল দেহের খাঁচা ছেড়ে।

সেরকম যাতে না হয়, সে ব্যবস্থাই করব, রুমন্বান। আটঘাট বেঁধে কাজে নামব। বাড়ি পুড়িয়ে, মিথ্যে খবর রটিয়ে, স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবো, অথচ যাতে বিরহে পুড়ে না মারা যান রাজা, সেদিকেও নজর রাখব। বড়ো কাজ করতে গেলে বড়ো চক্রান্ত বানাতে হয়, চক্রান্তের গিঁট খোলবার কৌশল জানা থাকলে বিপদ ঘটবে কেন? এরই নাম রাজনৈতিক খেলা!

মন্ত্রীর বুদ্ধি-বিবেচনা-দূরদর্শিতায় যথেষ্ট আস্থা ছিল সেনাপতির। সত্যিই তো রাজকার্যে কূটনীতি প্রয়োজন। তাই একটু চুপ করে থেকে বললে, বেশ, তাই হোক। তবে এতবড়ো ষড়যন্ত্রে একজনের মাথা গলানো দরকার।

কার?

গোপালকের।

কথায় যুক্তি আছে। মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ দূত পাঠিয়ে রাজশ্যালক গোপালককে নিয়ে এল উজ্জয়িনী থেকে। বৈঠকে বসল তিন মাথা।

প্যাঁচ-পয়জারে গোপালক খুব চোস্ত। রাজ্য চালাতে গেলে অনেক ভড়কি দিতে হয়। শেষটায় মঙ্গল হলেই হল।

হঠাৎ বললে রুমন্বান, পুড়ে মারা গেছে স্ত্রী। শুনেই যদি রাজার হৃদযন্ত্র স্তব্ধ হয়ে যায়? সত্যিই মনের ওপর আচমকা চোট কজন সইতে পারে?

মন্ত্রী বললে, তা কেন হবে না জানো? বোনের মৃত্যুসংবাদে গোপালকের মুখের একটা রেখাও তো কাঁপবে না। তা দেখেই বুঝবেন, হয়তো উড়ো খবর কানে এসেছে। সুতরাং সামলে নেবেন।

মন্ত্রণা-বৈঠকের পরিশেষে ঠিক হল, উদয়ন আর বাসবদত্তাকে নিয়ে প্রথমে যাওয়া হবে লাবণক দেশে, মগধের খুব কাছেই, সেখানকার বনে জঙ্গলে মৃগয়া নিয়ে যখন আত্মহারা হবে রাজা, কাজ হাসিল করতে হবে সেই সুযোগে।

শলাপরামর্শ শেষ হল গভীর রাতে। পরের দিন সকালেই জামাইবাবুকে তাতিয়ে দিল শ্যালক। লাবণক একটা খাসা জায়গা। প্রচুর হরিণ ঘুরে বেড়ায় সেখানকার জঙ্গলে। মনের সুখে শিকার করা যাবে।

হাত নিশপিশ করে উঠেছিল উদয়নের। নেচে উঠেছিল বাসবদত্তাও। বাইরের হাওয়া খেয়ে আসা যাক কিছুদিন।

রাজবাড়ি প্রায় ফাঁকা করে দিয়ে মস্ত একটা দল বেরিয়ে পড়ল কয়েকদিন পরেই।

পথে জিরেন নেওয়া হয়েছিল একটা দিন।

আর সেইদিনই স্বয়ং নারদমুনি দর্শন দিলেন রাজা উদয়নকে। উপহার দিলেন একগাছি পারিজাত ফুলের মালা, যে ফুল ফোটে শুধু স্বর্গের নন্দনকাননে।

তারপর এলেন আসল কথায়, তুমি বিখ্যাত পাণ্ডব বংশের ছেলে। সে বংশের এখন কিছুই নেই, নেই সেই বিরাট রাজত্ব। সেই বংশের প্রদীপ জ্বলছে তোমার মধ্যে। একসময়ে আমি হস্তিনাপুরে যেতাম, যুধিষ্ঠির আমার পরামর্শ নিত। আজ এসেছি তোমাকে পরামর্শ দিতে। তুমি পূর্বপুরুষ যুধিষ্ঠিরের মতো সৎপথে থাকবে, নারীঘটিত কলঙ্ক যেন তোমাকে স্পর্শ না করে, যত অনর্থের সূত্রপাত রমণী থেকেই। ধর্মপথে থাকবে। কেউ তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। কিছুদিন একটু দুঃখভোগ আছে বটে, তাও কেটে যাবে কর্মফলের অবসান ঘটলে। বাসবদত্তার গর্ভে তোমার একটি ছেলে হবে শিগগিরই। সে কিন্তু কামদেবের অংশ, বিদ্যাধরদের রাজা, সম্রাট হবে যথাসময়ে। অদৃশ্য হয়ে গেলেন দেবসন্ন্যাসী নারদ।

১২. উদয়নের সঙ্গে মগধ-রাজকন্যার শুভবিবাহ

অথর্ববেদ পড়া ছিল উদয়নের। সে জানতো, কাম কিন্তু যৌনাকাঙ্ক্ষা নয়, সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা।

সেই কামদেবেরই অংশ তার ছেলে হয়ে জন্মাবে, বাসবদত্তার গর্ভে। এর চাইতে বড়ো আনন্দ-সংবাদ আর কী আছে?

নারদমুনি কিন্তু মনে মনে তৈরি করে গেলেন উদয়নকে ভবিষ্যৎবাণীর মাধ্যমে, স্পষ্ট করে কিছু না বলেই।

পুত্র প্রসব না করা পর্যন্ত বাসবদত্তার অকাল মৃত্যু তো হতে পারে না! যথাসময়ে এই ভবিষ্য-কথন নিশ্চয় শক্ত করে রেখেছিল উদয়নকে?

সে আরও জানতো, কামের বশীভূত নয় কে? ব্রহ্মার হৃদয় থেকে জন্ম কামের। একথা আছে মৎস্য পুরাণে। অথচ বাণ মেরে কুপোকাৎ করেছিল ব্রহ্মাকেই। ফলে, নিজের মেয়ে শতরূপাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল ব্রহ্মাকে! কাম বড়ো দুষ্টু দেবতা!

থাক সে কথা। এবার আসা যাক শিকার পর্বে।

লাবণক দেশে তো বিরাট শিকার-বাহিনি নিয়ে পৌঁছে গেল উদয়ন। কিন্তু চিন্তায় পড়লেন মগধের রাজা প্রদ্যোৎ সিংহ।

ব্যাপার কি? শিকারের অছিলায় মগধ দখলের চেষ্টা নাকি?

দূত এল সৌগন্ধনারায়ণের কাছে। সে ফিরে গিয়ে বললে মগধের রাজাকে, শুধু হরিণ-টরিণ মেরেই ফিরে যাবেন উদয়ন।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মগধ অধিপতি।

মৃগয়া নিয়েই মত্ত রইল উদয়ন। তাঁবু পড়ল লাবণকে, হরিণ-অন্বেষণে রোজন্ট বেরিয়ে গেল দূরের জঙ্গলে। মৃগয়া ছাড়া আর কিছুই রইল না মাথার মধ্যে।

সুযোগটা নিল সৌগন্ধনারায়ণ। একদিন উদয়ন যখন দূরের জঙ্গলে, সব খুলে বলল বাসবদত্তাকে।

বাসবদত্তা নারাজ হল না। সে সেয়ানা মেয়ে। ক'টা দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে, এই তো ব্যাপার? পতিবিরহ সইতে হবে।

ফলে তো রাজ্যবিস্তারের পথ প্রশস্ত হয়ে যাচ্ছে। আখেরে লাভ সেইখানেই। স্বামী-প্রেমের একটা ভাগীদার বাড়বে যদিও। তা বাড়ুক, লুকিয়ে-চুরিয়ে না হলেই হল।

এরপর শুরু হল নাটকের প্রথম পর্ব। ছদ্মবেশ ধারণ।

আগেই বলা হয়েছে, মন্ত্রীবর সৌগন্ধনারায়ণ এ ব্যাপারে গুণের আধার। সে জানে ভোল পালটানোর বিদ্যে, বাতসে মিশিয়ে যাওয়ার বিদ্যে, আরও অনেক ভোজবাজি।

সেই বিদ্যে খাটানোর সময় যখন হয়েছে। বাসবদত্তার মতো অসাধারণ রূপবতী যেখানেই থাকবে সেখানেই তার রূপের ছটায় সাধারণ লোকের চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। সন্দেহ হবে সে কে, তা জানতে চাইবে। বিশেষ করে যে মেয়ে রাজনন্দিনী আর রাজঘরণী, তার চালচলনই তো আলাদা।

সুতরাং মোক্ষম ছদ্মবেশ দরকার বাসবদত্তার। রূপপরিবর্তন, আমূল।

ফলে, বাসবদত্তা হয়ে গেল এক ব্রাহ্মণকন্যা। তার বুড়ো বাবা হল সৌগন্ধনারায়ণ নিজে। বসন্তক হয়ে গেল তার অন্ধ ভাই।

সেই রাতেই তিনজনে রওনা হল মগধের রাজধানীর দিকে।

উদয়ন তখন দূরের জঙ্গলে, ফিরতে রাত হবে।

গোপালক আর রুমন্বান আগুন লাগিয়ে দিল বাসবদত্তার তাঁবুতে। ছাই হয়ে গেল সবকিছু অল্পক্ষণের মধ্যে। লোকজন কেঁদে ভাসিয়ে দিল বটে, কিন্তু আসল ব্যাপার কেউ-ই জানতে পারল না।

তিন ছদ্মবেশী ততক্ষণে পৌঁছে গেছে মগধের রাজধানীতে। দেখতে পেয়েছে রাজকন্যা পদ্মাবতীকে, রাজবাড়ির লাগোয়া বাগানে।

তিন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী জুলজুল করে তার দিকে চেয়ে রয়েছে দেখে খটকা লেগেছিল পদ্মাবতীর, রাজকন্যে দেখলে সবাই ধন্য হয়ে যায়। কিন্তু এই তিনজনের চাহনি কৃতার্থ হয়ে যাওয়ার মতো নয়। বরং ব্রাহ্মণীর চেহারার মধ্যে এমন একটা চাপা জলুস আছে, একবার দেখে আর একবার তাকাতে ইচ্ছে যায়।

প্রহরীদের হটিয়ে দিয়ে তিন ছদ্মবেশীকে বাগানের মধ্যে নিয়ে এল পদ্মাবতী। তিনজনের পরিচয় জিজ্ঞেস করল।

ব্রাহ্মণী-রূপিনী বাসবত্তাকে দেখিয়ে বললে সৌগন্ধনারায়ণ, আমার মেয়ে, অবন্তিকা। বিয়ে দিয়েছিলাম এক বাজে ছোকবার সঙ্গে। সে পালিয়েছে। নতুন জামাইয়ের সন্ধানে বেরিয়েছি।

অন্ধরূপী বসন্তককে দেখিয়ে বললে, আমার ছেলে।

সবশেষে সবিনয়ে বললে পদ্মাবতীকে, আপনার কাছে এসেছি একটা প্রার্থনা নিয়ে।

কৌতূহলী হয়ে বললে পদ্মাবতী, বলুন কী চান।

অর্থ নয়, আশ্রয়। অভাগিনী এই মেয়েটার। সঙ্গে এই অন্ধ ভাইটার। আপনার কাছে ওরা নিশ্চিন্ত থাকবে। আমিও।

মঞ্জুর হল প্রার্থনা। সৌগন্ধনারায়ণ ফিরে না আসা পর্যন্ত পদ্মাবতীর কাছে নিরাপদে থাকবে স্বামী পরিত্যক্তা ব্রাহ্মণ কন্যা আর তার অন্ধ ভাই। সযত্নে। তবে, অন্ধ ভাই থাকবে অন্তঃপুরের বাইরে।

সৌগন্ধনারায়ণ রওনা হল লাবণক অভিমুখে। আসল কাজ হাসিলের মতলবে।

পদ্মাবতী বড়ো ভাল মেয়ে। শোবার ঘরে ঝুলিয়ে রাখে সতীসাধ্বীদের ছবি। পতি যাদের কাছে চোখের মণি, তাদের ছবি। সীতার ছবিও ছিল সেখানে। বিরহ বেদনায় সজলচক্ষু সীতা। ম্লানমুখী সীতা।

ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে চোখে জল এনে ফেলেছিল বাসবদত্তা। দীর্ঘশ্বাস চাপতে পারেনি। ছদ্মবেশ ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিল আসল মানুষটার ভেতরের যন্ত্রণা।

দেখেই সন্দেহ হয়েছিল পদ্মাবতীর।

প্রথম দর্শনেই যাকে সাধারণ মেয়ে বলে মনে হয়নি, তার এখনকার ম্লান মুখশ্রী মনে ঘটকা জাগায় বইকি, এ মেয়ে যেন রাজার ঘরেই মানায়। রাজবউ নাকি? বিরহের ছবি দেখেই টলে যাচ্ছে কেন?

পরীক্ষা করা যাক।

অবন্তিকাকে কাছে ডাকল পদ্মাবতী। বললে, সখী, একটা মালা গেঁথে দেবে?

তৎক্ষণাৎ ফুল তুলে মালা গেঁথে পদ্মাবতীকে নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছিল ছদ্ম ব্রাহ্মণ-কন্যা।

তাক লেগে গেছিল পদ্মাবতীর। এমন অপূর্ব মাল্য-রচনা কক্ষনো দেখেনি।

দেখাতে গেছিল নিজের জননীকে। তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এ মালা কে গেঁথেছে?

অবন্তিকা, ব্রাহ্মণের মেয়ে। স্বামী পালিয়েছে। তাই দিন কয়েকের জন্যে ঠাঁই নিয়েছে আমার অন্তপুরে।

ব্রাহ্মণকন্যা! আশ্চর্য! এমন মালা তো মানুষে গাঁথতে পারে না! বোধ হয় কোনও দেবী। যত্নে রেখো। শোনো একটা গল্প।

দুর্বাসা বড়ো বদরাগী মুনি। হঠাৎ একদিন হাজির রাজা কুন্তিভোজের বাড়িতে। শশব্যস্ত রাজা তাঁর সেবাযত্নের ভার দিলেন মেয়ের ওপর। মেয়েকে বললেন দুর্বাসা, আমি পায়েস খাব। তুমি রেঁধে রাখো। আমি স্নান সেরে আসি।

খেতে বসে পায়েসের বাটিতে হাত দিয়েই দুর্বাসা বললেন, ভীষণ গরম। কন্যে, বাটি তোমার পিঠে রাখো আমি অল্প অল্প করে খাবো।

রাজকন্যে হামাগুড়ি দিয়ে বসে গরম পায়েসের বাটি রাখল নিজের নরম পিঠে। ফলে, ঝলসে ফোসকা পড়ে গেল পিঠে। কিন্তু নিশ্চল রইল হাসিমুখে।

তুষ্ট হলেন ঋষি, বর দিলেন।

গল্পটা শুনিয়ে বলেছিলেন পদ্মাবতীর মা, মনে হচ্ছে তোমার আশ্রয় নিয়েছে কোনও ছদ্মরূপিনী দেবকন্যে। আদর-যত্নের ত্রুটি না হয়।

তা হয়নি। সেদিকে পদ্মাবতীর নজর প্রখরতর হয়েছিল।

কিন্তু শুকিয়ে যাচ্ছিল বাসবদত্তা, বিরহে।

উদয়নের অবস্থাও তথৈবচ। মৃগয়া থেকে ফিরে দেখেছিল, তাঁবু পুড়ে ছাই। কাঁদছে লোকজন।

তার আগেই সেখানে পৌঁছে গেছিল সৌগন্ধনারায়ণ। ছদ্মবেশী বাসবদত্তা আর বসন্তককে পদ্মাবতীর আশ্রয়ে রেখেই সেই রাতে চলে এসেছিল তাঁবুর কাছে।

তাঁবু তখন পুড়ে ছাই। থ হয়ে বসে আছে উদয়ন।

বাসবদত্তা কই?

সৌগন্ধনারায়ণ, রুমন্বান আর গোপালক দিল সেই দুঃসংবাদ।

বাসবদত্তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

মাথা ঘুরে গেছিল উদয়নের। ধরাশায়ী হয়েছিল তৎক্ষণাৎ। এবং মূর্চ্ছা।

কিন্তু এসবের জন্যে তৈরি ছিল তো তিন চক্রী। চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিল তৎক্ষণাৎ।

চোখ মেলেই তিন চক্রীর মুখের চেহারা দেখে ঘটকা লেগেছিল উদয়নের।

শান্ত মুখচ্ছবি। শোকের ছায়ামাত্র নেই।

মনে পড়েছিল নারদ মুনির ভবিষ্যৎ বাণী। বাসবদত্তার গর্ভে আসবে পুত্র, কামদেবের অংশ নিয়ে।

বুঝলে তিন শুভানুধ্যায়ী বাসবদত্তাকে লুকিয়ে রেখেছে, রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে।

শান্ত হয়েছিল মন। মুখে কিন্তু প্রকাশ করেনি কিছু।

ধুরন্ধর সৌগন্ধনারায়ণ যেই দেখল, সামলে নিয়েছে উদয়ন, আর দেরি না করে দূত পাঠিয়েছিল মগধের রাজার কাছে। বিপত্নীক উদয়নের অবিলম্বে বিয়ে হোক পদ্মাবতীর সঙ্গে।

মন নরম হয়ে গেছিল মগধের রাজার। উদয়ন সুপাত্র। তায় সদ্য বিপত্নীক। সুতরাং ...

উদয়নকে নিয়ে, মগধে গিয়ে তিন চক্রী পদ্মাবতীর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে সেই রাতেই পালিয়ে এল মগধ ছেড়ে।

যদি চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যায়, এই ভয়ে। ছদ্মবেশী বাসবদত্তা যদি স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের আসরে ভেঙে পড়ে, এই ভয়ে।

মগধরাজ অবশ্য অত না বুঝে মেয়ে-জামাইকে ছেড়ে দিলেন সেই রাতেই। মধুচন্দ্রিমা হোক শিকারের তাঁবুতে।

নতুন বউকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে রওনা হল উদয়ন, একদম পেছনে দুটি ঘোড়া চালিয়ে এল বাসবদত্তা আর বসন্তক। পদ্মাবতীর ইচ্ছায়। অবন্তিকা যে তার প্রাণপ্রিয় সখী।

এরপর আসছে অভিনব এবং মধুরতম এই চক্রান্তের শেষ পর্ব।

তাঁবু পড়েছিল সারি সারি। রাজার আর রানির তাঁবু আলাদা। উদয়ন আর পদ্মাবতী গেল অন্তঃপুরের তাঁবুতে।

অবন্তিকা কিন্তু সেখানে না গিয়ে সোজা চলে গেল গোপালকের তাঁবুতে। অন্তঃপুরের তাঁবুতে গেলে তো হাটে হাঁড়ি ভাঙবে।

পদ্মাবতী অত কি জানে? সে ডেকে পাঠাল অবন্তিকাকে, বাসর ঘরেই তো থাকবে প্রাণপ্রিয় সখী।

কিন্তু এল না অবন্তিকা।

কষ্ট পেয়েছিল পদ্মাবতী। মুখ নামিয়ে নিয়েছিল।

উদয়ন চেয়েছিল নতুন বউয়ের আনত মুখের দিকে। কপালে আঁকা তিলকটা চোখে পড়েছিল তখনই।

প্রশ্ন করেছিল তৎক্ষণাৎ, এ তিলক কে এঁকেছে?

ব্রীড়া-বিনম্র গলায় বলেছিল পদ্মাবতী, অবন্তিকা।

সে কে?

কেউ না, ব্রাহ্মণের মেয়ে। আমার কাছে থাকে।

কোথায় সে?

আমার সঙ্গেই এসেছে। কিন্তু এখানে আসছে না।

তিলক দেখেই চিনেছিল উদয়ন। এমন কারুকাজ একজনেই ফোটাতে পারে। এমন নিপুন অঙ্কনশৈলী একজনের দ্বারাই হয়। অবিকল এই তিলক একজনের ললাটেই দেখেছে উদয়ন।

সে ললাট বধূ বাসবদত্তার!

তীক্ষ্ণস্বরে উদয়ন জানতে চেয়েছিল, কোথায় সেই অবন্তিকা?

একটু আগেই গোপালকের শিবিরে যে গেছিল, সে বললে, আসুন আমার সঙ্গে।

বিষণ্ণ মুখে গোপালকের শিবিরে বসেছিল বাসবদত্তা। মহীয়সী বাসবদত্তা। যে স্বামীর মঙ্গলের জন্যে, দেশের মঙ্গলের জন্যে, সপত্নী আগমনের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে।

শিবিরের বাইরে সোরগোল শুনে চোখ তুলেই দেখেছিল, প্রাণের রাজা ঢুকছে হনহনিয়ে।

এরপর কোন স্ত্রী অভিনয় করতে পারে স্বামীর সঙ্গে? দু-চোখ কি জলে ভরে ওঠে না?

সেই অবস্থাই হয়েছিল অবন্তিকা নাম্নী বাসবদত্তার।

স্ত্রীর প্রতি অঙ্গের সঙ্গে পরিচয় থাকে স্বামীর। সেখানে ছদ্মবেশ চোখে ধুলো দিতে পারে না।

গাঢ় স্বরে বলেছিল উদয়ন, তুমি অবন্তিকা?

হ্যাঁ।

তুমি বাসবদত্তা?

হ্যাঁ....হ্যাঁ....হ্যাঁ!

এরপর কি বাঁধ দিয়ে অশ্রু-নদী রোখা যায়? দুজনেরই গাল বেয়ে নেমে এসেছিল মিলনাশ্রু!

চোখের জল আটকাতে পারেনি মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণও। কিন্তু সবার আগে নিজেকে সামলাতে হয়েছিল তাকেই। সে-ই যে নাটের গুরু!

বলেছিল নম্রগলায়, দায়ী আমি। নাটকের পর নাটক আমি সাজিয়েছি। মগধের রাজা আপনার পাশে থাকলে রাজ্যবিস্তার করা সহজতর হবে বলেই এত কাণ্ড করেছি। রানি বাসবদত্তার মত নিয়ে তাঁকে মগধের অন্তঃপুরে রেখে এসেছি। তার আগেই তাঁবু পোড়ানো হয়েছে, পদ্মাবতীর সঙ্গে বিয়ের ঘটকালিও আমি করেছি। নাটকের শেষ দৃশ্যে নিশ্চয় আপনি নিশ্চিত হতে চাইবেন একটা ব্যাপারে। রানি বাসবদত্তার চরিত্রে কোনও দাগ পড়েছে কিনা? অন্যের বাড়িতে থেকেছেন আপনার অনুমতি না নিয়ে। কিন্তু সবই তো দেখেছেন অদৃশ্য লোকপালেরা। তাঁরাই বলবেন, আপনার ভার্যা সতী, না, অসতী!

ঊর্ধ্বমুখী হয়ে অদৃশ্য সহায়কদের আবাহন করেছিল মন্ত্রী। বহু দিব্যজ্ঞানের অধিকারী বলেই এহেন অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছিল।

আকাশবাণী হয়েছিল তৎক্ষণাৎ, বাসবদত্তা নিষ্কলঙ্ক। রাজা উদয়ন, তুমি ভাগ্যবান, তাই এমন মন্ত্রী আর এমন স্ত্রী পেয়েছ।

সুখের সাগরে ভেসে গেছিল রাজা উদয়ন এর পর থেকেই। দুই পাশে দুই স্ত্রী। একজন যেন শৃঙ্গারযোনি রতি, বাসবদত্তা; অপরজন যেন মূর্তিময়ী শান্তি, পদ্মাবতী।

উদয়নের শিবিরে বিবিধ গল্প

আনন্দের হাট বসেছে উদয়নের তাঁবুতে। একটা ঘরে বসে এক স্বামী, দুই স্ত্রী, একই আসনে, পাশাপাশি। একটু দূরে জাঁকিয়ে বসেছে উদয়নের শ্যালক, মন্ত্রী, সেনাপতি আর প্রিয় বন্ধু বসন্তক। এখন এখানে মধুপান চলছে। সেই সঙ্গে মজার মজার গল্প।

উদয়ন মুচকি হেসে বলেছিল, আমার দুরবস্থার সঙ্গে রাজা পুরূরবা আর স্বর্গের বেশ্যা উর্বশীর দুর্ভোগের বেশ মিল আছে। ভোগান্তি প্রায় একই। পুরূরবার মতো ভুগেছি আমি, উর্বশীর মতো ভুগেছে বাসবদত্তা।

মধুমত্ত উদয়ন স্বর্গের বারাঙ্গনার সঙ্গে বধূ বাসবদত্তার তুলনা করে ফেলায় লজ্জায় মুখ লাল হয়ে উঠেছিল বাসবদত্তার। বিরহ স্পর্শ করেছিল দুই রমণীকেই। কিন্তু বেশ্যার বিরহ আর পতিভক্ত সতীর বিরহ কি এক জিনিস? তুলনাটা অসমীচীন।

তীক্ষ্ণধী মন্ত্রী তা বুঝেছিলেন। বাসবদত্তার লজ্জারুণ মুখ দেখেই বুঝেছিলেন, উপমাটা অসঙ্গত হয়েছে। বাসবদত্তা আহত হয়েছে।

তৎক্ষণাৎ জমিয়ে শুরু করেছিল পুরূরবা আর উর্বশীর গল্প। এমন ঢঙে যাতে বাসবদত্তার মনের মেঘ কেটে যায়। গল্পটা এই :

পুরূরবা ছিলেন বৈষ্ণব রাজা। খুবই উঁচুদরের রাজা। স্বর্গেও যেতে পারতেন যখন তখন।

একদিন তিনি হাওয়া খাচ্ছিলেন মনোরম নন্দনকাননে। মনোরমা বেশ্যা উর্বশীও উদ্যান বিহারে মত্ত ছিল। বেশ্যার বাগান-বেড়ানো মানে নানা রং, নানা ঢঙ, নানা খেলা, নারীর ভূষণ লজ্জা, বেশ্যাদের তা থাকে না, নন্দনকাননের কামমদির পরিবেশে বেশ্যা শ্রেষ্ঠা উর্বশী ছিল আরও লজ্জাহীনা। প্রায় নিরবসনা, অঙ্গবিক্ষেপে নিদারুণ কামবাসনা, কটাক্ষে কাম বিদ্যুৎ, অঙ্গসঞ্চালনে কামনিবৃত্তির ইসারা।

উর্বশীর এহেন বেহায়াপনা অকারণে ঘটেনি। সে-ও তো নারী। স্বতঃস্ফূর্ত কামাবেগ কি তার মধ্যে জাগতে পারে না? সে তো নিছক কামপ্রশমনের যন্ত্র নয়, কামবহ্নি যখন লেলিহ হয় তার পয়োধরা, অধর, চক্ষু, কটি, নিতম্ব ঘিরে, তখন কামবিদ্যুৎ তো বিশেষ পুরুষকে শুধু মোহিত করে না, তাকে মূর্চ্ছার ঘোরে ফেলে দেয়।

রাজা পুরূরবা সাত্ত্বিক পুরুষ। কামুক তো ননই। কিন্তু তিনিও কামতাড়নায় চোখে ধোঁয়া দেখলেন, জ্ঞান হারালেন।

উর্বশীর কামানল অকারণে বহ্নিমান হয়নি। সে-ও পুরূরবাকে দেখে যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। একে তো বেশ্যা, তায় স্বর্গের বেশ্যা, কামের উপকরণ তার প্রচুর, ভরাডুবি হয়েছিল নিজেরই কামসায়রে।

পরিণাম? পতন ও মূর্চ্ছা।

তৎক্ষণাৎ সোরগোল পড়ে গেছিল সুরলোকে। কী সর্বনাশ! কামের অনল ছুটিয়ে মুনিঋষির কামলতাকে অস্থির করে তোলে যে বারবনিতা, সে নিজের আগুনে নিজেই জ্ঞান হারিয়েছে! হায়! হায়! হায়!

বেশ্যা এমনই বস্তু। বেশ্যা কামাতুরা হয়েছে, বেশ্যার সংজ্ঞা লোপ পেয়েছে শুনে অস্থির হয়েছিলেন স্বয়ং হরি।

ঠিক সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন নারদমুনি। তিনি দেখলেন, ক্ষীরসাগরের অমন চমৎকার জায়গাতে বসেও মুষড়ে পড়েছেন ভগবান হরি।

কারণটা জিজ্ঞেস করতে হয়নি নারদকে, হরি-ই সাততাড়াতাড়ি বললেন, যাও, যাও এখুনি নন্দনকাননে যাও। সেখানে এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে উর্বশী।

উর্বশী কোনও কাণ্ড না ঘটালেই বরং আশ্চর্য হতে হয়। যত কুকাণ্ডের মূলে তো এই উর্বশী। কিন্তু ব্যাপারটা মনে হচ্ছে তার চাইতেও ঘোরালো।

জানতে চেয়েছিলেন, কাকে ঘায়েল করেছে?

আমার পরম ভক্ত পুরূরবাকে। কিন্তু নিজেও তো ঘায়েল হয়েছে।

নারদ তো অবাক, উর্বশী!

আরে হ্যাঁ। পুরূরবাকে দেখে নিজেও জ্বলে গেলুম... জ্বলে গেলুম বলেই আছড়ে পড়েছে। একটা মানুষ যদি একজন স্বর্গের বারবধূকে দিগঙ্গনা করে দেয় চোখের বান মেরে, সেটা কি একটা কেচ্ছা নয়? যাও... যাও... এখুনি গিয়ে ইন্দ্রকে বলো, আমার হুকুম ... শ্রীহরির আদেশ... উর্বশীকে যেন বিদেয় করা হয় স্বর্গ থেকে, পুরূরবার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে। বেশ্যাদের কলঙ্ক এই উর্বশী! ছিঃ ছিঃ!

নারদের মাথায় বজ্রাঘাত! সত্যিই তো এমন কাণ্ড কখনও তো শোনেননি! উর্বশী পটায়, কিন্তু নিজে কখনও পটে না। কাজ হাসিল করে কেটে পড়ে, এমনকি গর্ভের সন্তানটাকেও ফেলে যায় ধরার ধুলোয়। সেই উর্বশী কিনা এহেন কেলেঙ্কারী ঘটিয়ে বসল!

বেশ্যাদের কলঙ্ক, এই উর্বশী!

তৎক্ষণাৎ চলে এলেন পুরূরবার কাছে। বললেন, ওঠো হে, গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠো পড়ো।

তাকে নিয়ে সোজা ইন্দ্রের দরবারে, শ্রীহরির আদেশ, উর্বশীর বিয়ে দেওয়া হোক পুরূরবার সঙ্গে, এক্ষুনি।

তাই হল। পরমানন্দে বেশ্যা বউকে নিয়ে মর্ত্যে ফিরে এল পুরূরবা। স্বর্গে যেন আর জীবন রইল না। নিষ্প্রাণ। উর্বশী বিহনে গোটা স্বর্গলোক নিঝুম। বেশ্যার মহিমা এমনই। যেখানে থাকে, সে জায়গা তাতিয়ে রাখে।

এখন তাতিয়ে রাখল পুরূরবাকে। তার ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল উর্বশীরসের সিঞ্চনে। উর্বশী-সম্ভোগ যে এমন মৃত সঞ্জীবনী, কে তা জানত! রমণ-রসে নিমজ্জিত রেখে দিল পুরূরবাকে অষ্টপ্রহর।

অষ্টপ্রহর এই কর্মে বেশ্যারা কিন্তু পোক্ত, তারা যে অমানবী!

পুরূরবাকে এইভাবে হাতে রেখেছিল ইন্দ্র নিজেরও স্বার্থে। দানবরা স্বর্গ আক্রমণ করলে পুরূরবা যেন এসে পাশে দাঁড়ায়।

তার তলব পড়ল দানবরা স্বর্গে ঝাঁপিয়ে পড়তেই। এই দানবদের অধিপতির নাম মায়াবর। যে এক ভয়ানক যোদ্ধা। দেবতারাও ধরাশায়ী হয় তার প্রহারে।

পুরূরবা কিন্তু শমনদমনে পাঠিয়ে দিল মায়াবরকে, তার দৈত্যবাহিনী সমেত। অর্থাৎ, একদম খতম।

এতবড়ো একটা যুদ্ধজয়ের পর তো উৎসব হবেই। স্বর্গের মেয়েপুরুষ সব্বাই ধেইধেই করে নেচে গেল আকণ্ঠ সোমরস গিলে।

ইন্দ্রের সামনে নেচেছিল রম্ভা। স্বর্গের বেশ্যাদের অন্যতম তারকা রম্ভা। নেচেগেয়ে চাহনির সম্মোহনে যে অবশ করে দিতে পারে দেবতা দানব মানুষকে। তার সম্ভোগক্রিয়ার মধ্যে থাকে নৃত্যগীতের চারুকলা।

সেই রম্বার পা টলে গেল পুরূরবার সামনে নাচতে গিয়ে। ভুল হল ছন্দে, তালে, নৃত্য সুগমায়। এই সেই পুরুষ যে কিনা উর্বশীকে টলিয়েছে, রম্ভার পা তো টলবেই. হেসে ফেলেছিল পুরূরবা।

নাচ থামিয়ে, কোমরে দু-হাত রেখে, রোষ কটাক্ষ হেনে গর্জে উঠেছিল কুহকিনী রঙ্গিনী রম্ভা—আরে! আরে! মর্ত্যের মানুষ হয়ে স্বর্গের নাচ দেখে হাসছ? নাচের কিছু জানো?

হাসিমুখেই বলেছিল উর্বশী-পতি পুরূরবা, উর্বশী তো জানে। আমি তার কাছেই শিখেছি যা জেনেছি, তা তোমার গুরু তুম্বুরও জানে না।

সর্বনাশ! তুম্বুর যে স্বর্গের বেশ্যাদের নাচগানের গুরু?

তুম্বুর বসেছিল আসরে। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে অভিশাপ ঝেড়েছিল তৎক্ষণাৎ, বড়ো দেমাক উর্বশীকে কোলে শুইয়ে! কোলছাড়া যাতে হয়, সে ব্যবস্থা করছি।

তুম্বুর তো গন্ধর্ব। রাগের চোটে গন্ধর্বদের লেলিয়ে দিয়ে উর্বশীকে কেড়ে নিয়ে গেল পুরূরবার কাছ থেকে।

চোখে ধোঁয়া দেখল দুজনেই, পুরূরবা আর উর্বশী।

শ্রীহরির হুকুমেই দুজনের মিলন হয়েছিল। বিচ্ছেদের সময়ে দুজনেই একমনে ডেকে গেল শ্রীহরিকে। তিনি প্রীত হলেন। গন্ধর্বরা ফিরিয়ে দিয়ে গেল উর্বশীকে।

সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেল উর্বশী শুধু পুরূরবাকে নিয়ে সুখে ঘরকন্না করে।

মেয়েরা সব পারে!

গল্প শুনেই যখন মুচকি হাসি হাসছে বাসবদত্তা, তখন মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ বললে, আপনার নামের সঙ্গে এখন দেবী উপাধি যোগ করা যায়।

ভুরু তুলেছিল বাসবদত্তা, কিন্তু আমি তো মানবী। দেবকন্যা নই।

দেবী উপাধির যোগ্যতা যে অর্জন করে ফেলেছেন ত্যাগের মধ্যে দিয়ে। স্বামীর প্রকৃত কল্যাণ যে চায়, শত কষ্ট মুখ বুঁজে সহ্য করে যায়, তেমন স্ত্রী-কেই দেবী বলা যায়।

মিটি মিটি তাকিয়ে বলেছিল বাসবদত্তা, মনে হচ্ছে এহেন নামকরণের পেছনেও আছে একখানা গল্প?

আছে বইকি।

হোক সেই গল্প।

জমে উঠল বাসরের আসর নতুন এক গল্পে

মানবীকে দেবী বলা হবে কখন? তিমিরা নামে একটা নগর ছিল। সেখানকার রাজা ছিল বিহিতসেন। রানির নাম তেজোবতী। রূপসী, লাবণ্যময়ী, তেজস্বিনী। সবার ওপরে ছিল অচলা পতিভক্তি। স্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান, স্বামীই দেবতা।

এমন পত্নী যার ঘরে, সে কিন্তু পত্নী বিহনে চোখে অন্ধকার দেখে। স্ত্রী-কে চোখে চোখে রাখলেই পরম শান্তি।

অষ্টপ্রহর কামিনী দর্শন করে গেলে আর একটা অনর্থ এসে যায়। বিশেষ করে সেই ললনা যদি হয় বিশ্বসুন্দরী এবং একান্ত অনুরক্তা। ভোগস্পৃহা বেড়ে যায়। চোখে চোখে কামবাসনা সঞ্চারিত হয়। স্ত্রীভোগ যখন নিষিদ্ধ নয়, তখন মুহুর্মুহু রতিলালসায় শরীর মন উদগ্র হয়ে ওঠে।

বিহিতসেনেরও হয়েছিল তাই। ভোগের দশা। প্রথম রিপুও এমন একটা বিচিত্র রিপু যা কখনও বিরতি আকাঙ্ক্ষা করে না। তনুলতালিপ্সা আর কামলতা লিপ্সা যদি বিরামবিহীনভাবে আত্মচরিতার্থ ঘটিয়ে যায়, তাহলে রক্তমাংসের শরীরও ভেঙে পড়ে। অসংযত প্রথম রিপুই তা ঘটায়। ক্ষয় ধরে পুরুষের শরীরে, সঞ্চয় ঘটে নারীর দেহে।

বিহিতসেনের অবিহিত স্ত্রীসংসর্গ এহেন বিপর্যয়ই ঘটিয়ে ছাড়ল। শরীর-যন্ত্রে ভাঙন ধরল। বিবিধ ব্যাধির লক্ষণ দেখা দিল কলেবর জুড়ে।

রাজবৈদ্যরা একবাক্যে বললে, আর রমণ নয়।

বাজ পড়ল যেন রাজার মাথায়।

কিন্তু উপায় তো নেই। সতীসাধ্বী স্ত্রী রোগের কারণ জানতে পেরে তিলমাত্র প্রশয় দিল না স্বামীকে।

অথচ মনকে বশে আনতে পারল না রাজা। মন চালায়, শরীর চলে। মন চালক, শরীর গাড়ি। মন অবশ, শরীর আকাঙ্ক্ষাকাতর, কিন্তু নিবৃত্তির পথ বন্ধ।

পরিণাম?

মনের অসুখ। জটিল রোগ। ওষুধপথ্য দিয়ে বিটকেল এই ব্যাধি সারবে না। একটাই পথ আছে। মনকে পালটা ছাপ মারা। স্যাকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা, তাতেই ত্যাঁদোড় মন সিধে হয়ে যাবে।

প্রচণ্ড ভয়, এর দাওয়াই।

কিন্তু রাজা যে অকুতোভয় পুরুষ। দুনিয়ার কিসসুকে ভয় পান না।

তাহলে, প্রচণ্ড শোক, আচমকা।

হ্যাঁ। সেক্ষেত্রে ওষুধ ধরতে পারে বটে, রাজা ভয়ানক অনুভূতি প্রবণ। স্পর্শকাতর।

বৈঠকে বসল রাজার মন্ত্রীরা, পাঁচ কথার পর ঠিক হয়ে গেল, কীভাবে চোট মারা হবে রাজার মনে। দল বেঁধে গেল রাজার শোবার ঘরে। বললে, সর্বনাশ হয়েছে।

রাজা প্রায় লাফিয়ে ওঠেন আর কী, কী হল?

রানি আর নেই, হঠাৎ মারা গেলেন। এখুনি।

ধড়াস করে পড়ে গেলেন রাজা, মেঝের ওপর।

এক আছাড়েই চম্পট দিল মনের রোগ। সম্পূর্ণ নীরোগ হয়ে গেলেন পলকের মধ্যে।

তৎক্ষণাৎ রানিকে আনা হল সামনে। ক্ষমা চেয়ে নিল মন্ত্রীরা।

সজল চক্ষু রানিকে বললে রাজা, তুমি দেবী।

সত্যিই দেবী। স্বামীর মঙ্গলকামনায় নিজের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করতে দিলে?

গল্প শেষ হল। পরিশেষে টিপ্পনি জুড়ে দিল মন্ত্রী, রাজা উদয়ন, এরপর কি রানি বাসবদত্তাকে দেবী বলা যায় না? নিজের মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে দিয়ে আপনার নতুন বউ আর রাজ্যবিস্তারের পথ প্রশস্ত করে দিলেন।

রাজা খুশী। প্রয়োজনে মিথ্যেরও প্রয়োজন আছে বইকি।

সাধুবাদ জানালেন মন্ত্রী, সেনাপতি আর শ্যালককে। কিন্তু রেগে টং হয়ে গেলেন মগধের রাজা চক্রান্ত কাহিনি জানাবার পর।

পরের দিন তাঁর দূত এল উদয়নের শিবিরে।

তার বক্তব্য এই রানি বাসবদত্তার মিথ্যে মৃত্যুসংবাদ রটিয়ে রাজকন্যা পদ্মাবতীকে বিয়ে করার জন্যে খুবই রেগে গেছিলেন মগধের রাজা। এখন অবশ্য তিনি মানিয়ে নিয়েছেন। শ্বশুর-জামাইয়ে সম্পর্ক যাতে ভালো থাকে, সে ব্যাপারে আপনাকে নজর রাখতে বলেছেন।

উদয়ন তাকে সোজা পাঠিয়ে দিল পদ্মাবতীর শিবিরে। সেখানে তখন বাসবদত্তা হাজির। দুজনে মুখোমুখি বসে মনের আনন্দে গল্প করে যাচ্ছে। হাজির বসন্তকও। হাসিয়ে মারছে দুজনকে।

দূত বললে পদ্মাবতীকে, আপনাকে তো ছলচাতুরি করে এখানে আনা হয়েছে, আপনার স্বামীর তো অন্য স্ত্রী রয়েছে কথাটা চেপে যাওয়া হয়েছিল। আপনার বাবা ক্ষুব্ধ, কিন্তু মানিয়ে নিয়েছেন আপনার মুখ চেয়ে। আপনিও মানিয়ে নেবেন, ওঁর তাই ইচ্ছে।

পদ্মাবতী বললে, বাবাকে ভাবতে বারণ করবেন। আমি সুখে আছি। থাকব। স্বামী আমাকে ভালোবাসেন। রানি বাসবদত্তা আমাকে ছোটো বোনের মতো স্নেহ করেন। উনি যেন জামাইয়ের ওপর রেগে না থাকেন।

বিদায় নিল দূত। অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল পদ্মাবতী।

দেখল বাসবদত্তা। সদ্য বিয়ের পর বাপের বাড়ির লোক দেখলে আর বাবার রাগের কথা শুনলে মন উচাটন তো হবেই।

তাই ইসারা করেছিল বসন্তককে। মুখে বললে, একটা মজার গল্প হোক।

সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপি থেকে নতুন গল্প বের করেছিল বসন্তক।

পাটলীপুত্র নগরের নাম কে না জানে। সমৃদ্ধ নগর। টাকার কুমির এক সওদাগর থাকত সেই নগরে। তার নাম ধর্মগুপ্ত।

এহেন বণিকের স্ত্রী চন্দ্রপ্রভা যথাসময়ে সুলক্ষণা অতীব সুন্দরী এক কন্যাসন্তান প্রসব করার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

আঁতুড়ে মেয়ে উঠে বসে জমিয়ে গল্প শুরু করে দিল প্রত্যেকের সঙ্গে! খবর চলে গেল সওদাগরের কাছে। সে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল নিজের মেয়েকে। বললে গদগদ গলায়, কে তুমি, দেবী?

সদ্যোজাত মেয়ে বললে, সে খবরে তোমার দরকার কী? আমি এসেছি তোমার ভালো করার জন্যে। বড়ো হলে আমার বিয়ে দিতে যেও না।

ভয়ের চোটে সওদাগর মুখে মুখে খবর রটিয়ে দিল, মেয়ে একটা জন্মেছিল বটে। কিন্তু আঁতুড়ে মারা গেছে।

পাঁচজনের চোখের আড়ালে মেয়ে কিন্তু বড়ো হতে লাগল বণিক বাড়িতে। তার নাম রাখা হল, সোমপ্রভা। যার মানে, চাঁদের আলো। সার্থক নাম বটে। বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রূপ যেন ফেটে পড়ল তনুবরে। দেখে মনে হত, মানবী নয়, দেবী।

এত গোপনে থেকেও একদিন কিন্তু রূপের আগুনে ঝলসে দিল একজনের চোখ। তার নাম গুহচন্দ্র। বাবার নাম গুহসেন। বিখ্যাত সওদাগর। এবং ধনকুবের।

সেদিন ছিল মদনোৎসব। যৌবনমদে মত্ত সুন্দর-সুন্দরীরা হাসি-ঠাট্টায় রাস্তা মাতিয়ে দিয়ে চলেছে উৎসব প্রাঙ্গণে। ছাদে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়েছিল রূপের কণা সোমপ্রভা।

গুহচন্দ্র দেখে ফেলেছিল তাকে রাস্তা থেকে। দেখামাত্র মাথা ঘুরে গিয়ে রাস্তায় পড়েই অজ্ঞান।

কামদেবের কাণ্ডই তো এইরকম। যাকে তাক করে কামশর ছোঁড়েন, তার আর রক্ষে নেই।

দিনে দিনে শুকিয়ে গেল গুহচন্দ্র। অথচ তার শরীরে কোনও ব্যাধি খুঁজে পেল না বৈদ্যরা।

রোগ তো মনের মধ্যে। আতীব্র কামানল। দহন সহ্য করা যায়? বাবা-র কাছে মুখ ফুটে বলাও যায় না।

কিন্তু বন্ধুবান্ধবের কাছে কিছুই গোপন থাকে না। একদিন তার এক বন্ধুই আসল রোগটা জানিয়ে এল পিতৃদেবকে।

বিয়েই এ রোগের একমাত্র ওষুধ। যে সে মেয়েকে নয়, ধর্মগুপ্তের মেয়েকে।

বিয়ের প্রস্তাব গেল ধর্মগুপ্তের কাছে।

সে তো হেসেই খুন! আমার মেয়েই নেই তো মেয়ের বিয়ে!

মনে আঘাত পেয়েছিল গুহসেন। পাত্র হিসেবে আমার ছেলে অপছন্দ, তাই এই মিথ্যাকথা! বেশ কৌশলে কাজ হাসিল করব। ওই পাত্রীকেই বউমা করব।

এক থলি সোনার টাকা রাজাকে নজরানা দিতেই খুশি হয়ে রাজা বললে, বলো কি চাও!

ঘুষ এমনই জিনিস! সর্বশক্তিমান!

কাতর কণ্ঠে গুহসেন বললে, ধর্মগুপ্তর মেয়েটাকে বাড়ি থেকে বের করে দিন, আমার বউমা করবো।

এই ব্যাপার! প্রেমের দেবতা কলকাঠি নেড়েছেন আড়ালে! এসব ব্যাপারে যৎসামান্য সাহায্য না করলে যে অধম হবে!

রাজার হুকুমে সেনাপতি গেল সৈন্যসামন্ত নিয়ে। ধর্মগুপ্তর বাড়ি ঘেরাও করে বসে রইল।

সোমপ্রভা সব দেখল। সব বুঝল। অসহায় বাবাকে বললে, এ বিয়েতে দোষ হবে না, তুমি বাঁচবে। শুধু একটা কথা বলে দেবে জামাইকে বিয়ের পর, কক্ষনো যেন আমার সঙ্গে এক খাটে শুতে না আসে।

বাপের মন তো! বিয়ে হবে অথচ শারীরিক সম্পর্ক থাকবে না, এমন একটা চুক্তি আগে বলা যাক। তাতে যদি বিয়ে আটকায়।

কিন্তু ধড়িবাজ গুহসেন মনে মনে একচোট হেসে নিয়ে তাতেই রাজি হয়ে গেল। আগুন আর ঘি একসঙ্গে রাখলেই গোল চুকে যাবে। বিয়েটা তো হোক আগে।

হয়ে গেল বিয়ে। বিয়ের রাতেই বউমাকে কড়াগলায় বললে শ্বশুর, যাও, ছেলের পাশে শুয়ে পড়ো!

সোমপ্রভার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে এল। শুধু তর্জনী তুলে রইল শ্বশুরের দিকে। যেন, অদৃশ্য মারণরশ্মি ঠিকরে গেল আঙুলের ডগা থেকে।

আছড়ে পড়েই মারা গেল বদমাস গুহসেন।

ছেলে গুহচন্দ্র অলৌকিক সেই কাণ্ড দেখে গেল ঘাবড়ে! সর্বনাশ! এ কাকে বউ করে আনলাম! এ যে মৃত্যুবাণ ছোঁড়ে আঙুল তুলে! বাঁচি কি করে এর খপ্পর থেকে!

পরের দিন থেকে শুরু হল ঢালাও ব্রাহ্মণ ভোজন। যাগযজ্ঞ, দেব-আরাধনা। সোমপ্রভা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দক্ষিণা দিয়ে গেল ব্রাহ্মণদের। তার অলৌকিক রূপের প্রভায় চোখ ধাঁধিয়ে গেলেও সাহস করে কেউ জানতে চায়নি মেয়েটির পূর্বপরিচয়।

চেয়েছিল একজন। এক বৃদ্ধব্রাহ্মণ। এ তো বড়ো আশ্চর্য মেয়ে। এর পদক্ষেপ আশ্চর্য, চাহনি আশ্চর্য, আচরণ আশ্চর্য। মুখে কথা নেই, কর্তব্যে গাফিলতি নেই। কে এই কন্যা?

গুহচন্দ্র চুপি চুপি বলেছিল সমস্ত ঘটনা। প্রাণের ভয়ে এক খাটে শুতে পারে না, অথচ এক বাড়িতে থাকতে হচ্ছে। লোকে জানে বউ, আসলে অক্ষতযোনি।

দয়া হল বুড়োবামুনের। একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিল গুহচন্দ্রকে, অসম্ভবও সম্ভব হয় এই মন্ত্রপাঠে। বিয়ে করা বউ একত্র শয়নে রমণে একাকার হয়ে যাবে। ঠ্যাঁটামি ঘুচে যাবে।

প্রক্রিয়া মাফিক নিরালা জায়গায় একটা মস্ত অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে, আগুনের সামনে সে মন্ত্রপাঠ করে গেল গুহচন্দ্র। একনাগাড়ে মন্ত্রজপ।

আচমকা ঘটে গেছিল অদ্ভুত একটা ব্যাপার। আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে, তাল তাল ধোঁয়া উঠছে ওপর দিকে। সেই ধূম্রপুঞ্জের ভেতরে কায়াগ্রহণ করল এক ব্রাহ্মণ। আগুনের ঠিক ওপরে।

পরমুহূর্তেই সেই ব্রাহ্মণকে দেখা গেল গুহচন্দ্রের সামনে। যেন অগ্নিতেজ বিচ্ছুরিত হচ্ছে সারা গা থেকে।

ধূমিকা থেকে আগত সেই ধূম্রলোচন ধূমলবর্ণ ব্রাহ্মণকে দেখেই তাঁর সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হয়েছিল গুহচন্দ্র।

সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কামলোকের অদৃশ্য সহায়। গভীর গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, কাল দুপুরে খেতে আসব তোমার বাড়িতে। রাতেও থাকব তোমার বাড়িতে। যা চাও, তা পাবে।

বলেই শূন্যলোকে বিলীন হয়ে গেছিল ধূমদেবতা।

পরের দিন ব্রাহ্মণ ভোজন হল গুহচন্দ্রের বাড়িতে। হাজির ধূমল ব্রাহ্মণও। উদর তৃপ্তির পর দক্ষিণা নিয়ে প্রস্থান করেছিল সমস্ত ব্রাহ্মণ।

ধূম্রলোচন কিন্তু থেকে গেছিলেন বাড়ির মধ্যে। অন্তরালে রইলেন সারা দিন। রাতেও।

মধ্যরাত্রি। বণিক ভবনের সবাই সুষুপ্ত। জাগ্রত শুধু তিনজনে, ধূম্রদেহী সেই ব্রাহ্মণ, গুহচন্দ্র, সোমপ্রভা।

গাছের পাখি পর্যন্ত যখন নীরব, তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল সোমপ্রভা। একলা। খুব জোরে পা চালিয়ে হেঁটে যাচ্ছে জনহীন পথ বেয়ে।

যাচ্ছে কাথায়? ঘরের বউ পথে নেমে এসেছে এত রাতে, কিন্তু নিঃশঙ্ক নির্ভীক, প্রতিটি পদক্ষেপে সুগভীর আত্মপ্রত্যয়।

ধূম্রদেহী ব্রাহ্মণ অন্তরালে থেকে দেখলেন সেই দৃশ্য। ইঙ্গিতে কাছে ডাকলেন গুহচন্দ্রকে। মায়াবিদ্যার প্রভাব খাটালেন দুজনের ওপর।

ভোমরা হয়ে গেলেন দুজনে। উড়ে গেলেন নিশীথিনী সোমপ্রভার পেছন পেছন।

সোমপ্রভা হাঁটছে...হাঁটছে...নগর শেষ হয়ে গেল, তবুও হাঁটছে...হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছোল অনেক দূরের একটা অশ্বত্থ গাছের সামনে।

দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, একদৃষ্টে চেয়ে আছে গাছের দিকে। নিবাত নিষ্কম্প।

আচমকা শ্রুতিমধুর যন্ত্রসঙ্গীতের ঐকতান শোনা গেল গাছের নীচের দিকে। বাজছে বাঁশি, বাজছে বীণা, বাজছে আরও অনেক বাদ্যযন্ত্র।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সোমপ্রভা। গাছে উঠল।

সর্বাঙ্গসুন্দরী এক কন্যার পাশে গিয়ে বসল।

গুহচন্দ্র স্তম্ভিত! এ কী সে দেখছে! চক্ষুভ্রম নাকি?

ওদিকে গাছের ডালে শুরু হয়েছে মদ্যপান। দুই সুন্দরী সুরাপান করে চলেছে পাকা মদ্যপের মতো! বেশ কিছুক্ষণ পরে, নেশা যখন কড়া হয়েছে, তখন সোমপ্রভা জড়িত গলায় বললে সুরাসক্তা সঙ্গিনীকে, বোন, বড়ো ঝামেলায় পড়েছি।

সঙ্গিনী বললে ঢুলুঢুলু চোখে, কীসের ঝামেলা?

এক বুড়ো বামুন এসেছে বাড়িতে। খুব তেজি। শক্তি আছে ভেতরে। আমাকে ফাঁসিয়ে না দেয়। ভয় হচ্ছে। তাই এলাম তোমার কাছে। আর দেরি করব না। রাত অনেক হল।

বলেই, গাছ থেকে তরতর করে নেমে এল সোমপ্রভা।

তৎক্ষণাৎ ভোঁ করে উড়ে বাড়ি ফিরে এল সেই তেজস্বী ব্রাহ্মণ আর গুহচন্দ্র, ভোমরারূপে। বাড়ি ফিরেই স্বরূপ ধারণ করে লুকিয়ে রইল অন্য ঘরে।

কিছুক্ষণ পরে ফিরল সোমপ্রভা। গেল নিজের ঘরে। কে বলবে, একটু আগেই অলৌকিক বাজনা শুনতে শুনতে, গাছের ডালে বসে পা দোলোতে দোলোতে আসব পান করছিল!

মৃদুস্বরে ব্রাহ্মণ বললেন গুহসেনকে, দেখলে? তোমার এই বউ মানুষ নয়, দেবী, বোন বলে যার পাশে বসে এল, সে-ও দেবী।

ভয়ে কাঠ হয়ে গুহসেন বলেছিল, এখন উপায়? এ কাকে বিয়ে করলাম!

অভয় দিলেন ব্রাহ্মণ, একটা মন্ত্র দিচ্ছি, আগুন জ্বেলে জপ করবে। যা চাও, তা পাবে।

মন্ত্রদান করে, ভোরের আলো ফুটতেই উধাও হয়ে গেলেন রহস্যময় বৃদ্ধ।

সন্ধ্যে হতেই আগুন জ্বালিয়ে মন্ত্রজপে বসে গেল গুহসেন। এবার ছোট্ট অগ্নিকুণ্ড রচিত হয়েছে সোমপ্রভার ঘরের দরজার সামনেই, সে কিন্তু কিছু জানে না। নিজের কাজ নিয়ে তন্ময়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ ভারি সুন্দরী এক রমণীকে সামনে দেখতে পেল গুহসেন। ব্রহ্মাণ্ডসুন্দরী বললে অত্যুক্তি হয় না, এত রূপসী। সেই সঙ্গে জানে পুরুষকে রতিরঙ্গে লিপ্ত করার বিবিধ চমকপ্রদ কৌশল। তার

অঙ্গভঙ্গী, আদি তামাসা, বিদ্যুৎসম কটাক্ষ, কূচ বিমোচন, নিতম্ব নৃত্য দেখেও বিচলিত হল না গুহসেন। সাক্ষাৎ কামরূপা সেই কামিনী লালসা নিবিড় কণ্ঠে সুরতদ্বন্দ্ব জানিয়ে গেল গুহসেনকে বিন্দুমাত্র বিরতি না দিয়ে। বুড়ো বামুনের মন্ত্র যে বাতাস থেকে কামক্ষুধা-আকান্ত উপোসী ললনাকে তার সামনে মূর্ত করবে, তা তো ভাবেনি গুহসেন। বিমোহন বিদ্যায় বিলক্ষণ পটীয়সী এই কন্যা যে নাছোড়বান্দা।

কিন্তু এইখানেই তার নিখাদ প্রেমের চরম পরীক্ষা হয়ে গেল।

ব্যাভিচারিণীর কামরশ্মি তার গায়ে ছ্যাঁকাও দিতে পারল না।

কামাঙ্ক ধরা পড়ল না শরীরে।

কথাকাটাকাটির শব্দ পৌঁছেছিল ঘরের মধ্যে। দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিল সোমপ্রভা। চোখ ঝলসে গেছিল শুন্য থেকে অবির্ভূতা ললনার চোখে মুখে দেহে আদিম কামনার লেলিহ রূপ দেখে।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেছিল গুহসেন, এ কে?

বউকে দেখে যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেয়েছিল গুহসেন।

হাউমাউ করে বলেছিল, আমাকে নিয়ে শুতে চাইছে।

ঈশ্বর রমণী সৃষ্টির সময়ে যেসব উপাদানের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, তার মধ্যে ঈর্ষা ছিল অনেকখানি।

সেই ঈর্ষা নিমেষমধ্যে প্রজ্বলিত হয়েছিল সোমপ্রভার রুধিরধারায়। সে থাকতে অন্য মেয়ে তার স্বামীকে নিয়ে শোবে! কক্ষনো না।

মুখেও বলেছিল তাই, আমি থাকতে? ঘরে চলো, শোবে আমার সঙ্গে।

স্বামীকে ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে পরমা ললনার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করতেই রহস্যময়ী সেই নারী মুচকি হেসে মিলিয়ে গেছিল বাতাসে।

মন্ত্রপাঠ বিফলে গেল না।

গুহসেনের শরীর জর্জর করে ছেড়ে দিল সোমপ্রভা সেই রাতে। তারপর থেকে প্রতি দিনে রাতে, জমাট কাম গলিয়ে ছেড়ে ছিল, স্বামীর খিদের অবসান ঘটিয়েছিল, সেই সঙ্গে নিজেরও। উভয় পক্ষেই উৎকট রতি পিপাসার নিবৃত্তি ঘটতেই শান্তি নেমে এসেছিল সংসারে।

হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিয়েছিল বসন্তক এই গল্পের মাধ্যমে। মুখটিপে হাসি, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসি, চোখের তারায় তারায় হাসি।

গল্প শেষ করে বলেছিল বাসবদত্তাকে, সতী রমণী আগের জন্মের কর্মফলে এই ভাবেই সৎপুরুষের সহধর্মিণী হয়ে জন্মায়। পাপের ফল ফলবেই। সে স্বর্গেই থাকুক, কি মর্ত্যেই থাকুক। ইন্দ্রর কর্মফল কি তাকে রেহাই দিয়েছিল? রেহাই পেয়েছিল কি অহল্যা? একজন দেবরাজ, আর একজন গৌতম মুনির বউ। কামাসক্ত হয়েছিল দুজনে। ব্যভিচার করেছিল দুজনেই। পরিণাম? ঋষি গৌতমের প্রবল ইচ্ছাশক্তি শাপরূপে তাদের ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল। অহল্যা হয়ে গেছিল পাথর, জড় পদার্থের চূড়ান্ত রূপ। আর ইন্দ্র? সারা দেহে এক হাজার যোনি-চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। কী সর্বনাশ! লজ্জায় কেঁদে ফেলেছিল ইন্দ্র। যোনি-চিহ্নগুলিকেই একটু বদলে চোখের চিহ্ন করে দিয়েছিলো গৌতম। তিলোত্তমাকে দেখে হাজারটা চোখ বেরিয়েছিল বললেও ইন্দ্রের অপযশ আটকায় না। সারা গায়ে হাজারটা যোনির চাইতে ভালো গল্প।

হাসতে হাসতে চোখে জল এনে ফেলেছিল বাসবদত্তা আর পদ্মাবতী। সরস পরিবেশে আসল কথায় চলে এসেছিল তীক্ষ্ণবুদ্ধি বসন্তক। সপত্নীদের মনে তো ঈর্ষার বিষ কিছু থাকেই। চালাক মেয়েরা তা ঢেকে রেখে দেয়। বসন্তক সেই ঢাকনা উড়িয়ে দিয়ে ঈর্ষা-বিষকে বাষ্পীভূত করে দিলে শেষের কথায়।

আপনারা দুজনেই ছিলেন সতী আগের আগের জন্মে। একই স্বামীকে পেয়েছিলেন ভিন্ন ভিন্ন জন্মে। সেই পুণ্যই এজন্মে আপনাদের একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। এক স্বামী, দুই পত্নী দুই বোন।

পরিষ্কার হয়ে গেল দুই রানির মনের গহনের চাপা মেঘ।

পরের দিন সকালেই হুঁশিয়ার মন্ত্রী বললে উদয়নকে, এখানে আর নয়। পাততাড়ি গুটোন।

উদয়ন তো অবাক, কেন হে?

মগধরাজকে আসলে ঠকিয়েছি আমিই। বদলা তিনি নেবেন মরব আমি।

কী আশ্চর্য! ঠিক এই সময়ে মগধরাজার দূত এসে হাজির উদয়নের সামনে, মেয়ে সুখী জেনে মগধরাজা সুখী।

রাজ্যবিস্তারকে মূল লক্ষ্যে রেখে মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ এত কাণ্ড ঘটিয়েছেন, তা উনি জেনেছেন। আপনাকে রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হতে বলেছেন, উনি আপনার পাশে থাকবেন।

সৌগন্ধনারায়ণ নিশ্চিত হয়েছিল। দূরদর্শিতার ফল ফলতে আরম্ভ করেছে দেখে উদয়ন শতমুখে যখন মন্ত্রীর যুক্তি-বুদ্ধি-নীতির প্রশংসা করছে, ঠিক সেই সময়ে এল উজ্জয়িনী থেকে রাজা চণ্ডমহাসেনের দূত।

সৌগন্ধনারায়ণের চাতুর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে।

বাসবদত্তার সপত্নী-ভগ্নীর সংবাদে তিনি হৃষ্ট হয়েছেন। পদ্মাবতী এখন থেকে তাঁর মেয়ে। জামাই যেন আর দেরি না করে রাজকার্য আর রাজ্যবিস্তারে মন দেয়।

কৌশাম্বীতে ফিরে এল উদয়ন সদলবলে।

পাতালের মণিমুক্তো উদয়নের দখলে

দিন কয়েক বিশ্রাম নেওয়ার পর রাজকাজে মন দিল উদয়ন।

একদিন রাজসভায় হন্তদন্ত হয়ে এল এক ব্রাহ্মণ। কাঁদতে কাঁদতে বললে, তার একমাত্র ছেলে জঙ্গলে গেছিল, বদমাস বদমাস গয়লারা তার দুটো পা কেটে দিয়েছে।

জনাকয়েক গয়লাকে দরবারে তলব করা হল। তারা বললে, ঘটনাটা সত্যি। গোপালন আমাদের জীবিকা, জঙ্গলে যেতেই হয় গোরুকে ঘাস খাওয়াতে। আমাদের সর্দার একদিন একটা সুন্দর পাথর দেখতে পেয়েছিল। জঙ্গলের এমন কারুকার্যময় অপূর্ব পাথর হেলায় পড়ে আছে দেখে তার ওপর বসেছিল, বসার সঙ্গে তার হাবভাব কথাবার্তা একদম পালটে গেল। যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। আমাদের হাঁকডাক দিয়ে জড়ো করে বললে, আজ থেকে আমি তোমাদের রাজা। রাজা দেবসেন। আমার হুকুমে চলবে। অন্যথা ঘটলেই ধড় থেকে মুণ্ডু খসিয়ে দেওয়া হবে।

সেই থেকে রাজা দেবসেনের আদেশ আমাদের শিরোধার্য। আশ্চর্য ওই পাথরে বসে অদ্ভুত অদ্ভুত হুকুম দিয়ে যায় রাজা দেবসেন। আমাদের তা মেনে চলতেই হয়।

একদিন বনের পথে হাঁটছিল এক বামুনের ছেলে, রাজা দেবসেনের অঞ্চলে মাড়িয়ে গেলে রাজাকে পেন্নাম ঠুকে যেতে হয়। আমরা তাই বলেছিলাম ব্রাহ্মণ তনয়কে।

সে গ্রাহ্য করেনি।

রেগে গিয়ে রাজা দেবসেন তৎক্ষণাৎ তার দু-পা কেটে ফেলতে বলেছিল, যে পা দিয়ে অপবিত্র করেছে জঙ্গলের জমি।

আমরা শুধু হুকুম তামিল করেছি।

মন দিয়ে আশ্চর্য শিলার কাহিনি শুনছিল মন্ত্রী। এখন উদয়নকে ডেকে নিয়ে গেল অন্য একটা ঘরে।

বললে, দেবসেন সর্দার একটা আশ্চর্য সুন্দর পাথরে বসবার পর থেকেই পালটে গেছে। নিজেকে রাজা মনে করছে। গোটা জঙ্গলটাই তার রাজত্ব, এমনও মনে করছে। অদ্ভুত নয় কী?

উদয়ন বললে, খটকা লাগছে কেন?

মন্ত্রী বললে, আমার তো মনে হচ্ছে, পাথরের তলায় শক্তিমান পাথর আছে।

শক্তিমান পাথর! তার মানে?

মণিমুক্তো হিরে জহরৎ। গ্রহ-নক্ষত্রের শক্তি আকর্ষণ করে যারা নিজেরা শক্তিমান। যাদের ছোঁয়ায় থাকলে আশ্চর্য শক্তি সঞ্চারিত হয় রক্তধারায়, মস্তিষ্ককোশে, ভাগ্যরেখা পর্যন্ত পালটে যায়। তাছাড়া, বংশানুক্রমে

সঞ্চিত রত্নের মধ্যে থাকে বহু পূর্বপুরুষের অর্জিত বিক্রম। রাজা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিলাতলে গুপ্ত রয়েছে এমনই এক রত্নভাণ্ডার,—যার রশ্মিধারার তেজ গয়লাকে রাজা বানিয়ে দিয়েছে।

মন্ত্রীর যুক্তি অকাট্য। বাচভঙ্গী অনবদ্য। বুদ্ধি নিজেই যেন জহরৎ-জলুস।

তৎক্ষণাৎ সৈন্যসামন্ত নিয়ে জঙ্গলে গেছিল উদয়ন, পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছিল গয়লারা। সঙ্গে একদল নামী জহুরি।

জহুরিরা জহর চেনে। পাথর দেখেই তাদের ভুরু কুঁচকে ছিল। এখন পুরো জায়গাটা পরখ করে তারা একবাক্যে বললে, রত্নের খনি রয়েছে এখানে।

খনি! রত্নের!

চলল কোদাল, গাঁইতি, শাবল। বড়ো পাথর সরিয়ে ঠিক তার নীচে গর্ত খুঁড়তেই আচমকা ঘটে গেল এক ভীষণ কাণ্ড।

হু-উ-উ-স করে এক যক্ষ বেরিয়ে এল গর্তের ভেতর থেকে। তার বিশাল বিকট বিভীষিকা চেহারা দেখেই তো ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল খনকদের। ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল সৈন্যদের পা।

কিন্তু অভয় দিল যক্ষ। যদিও তার গলার আওয়াজে উড়ে গেল গাছের, পাখি, ঝড়ে গেল গাছের পাতা, হরিণ-টরিণ আঁৎকে উঠে চার-পা তুলে দৌড়োল অন্য দিকে। সে নিজেই তখন মহীরুহ সমান।

বাতাসে প্রলয় তুলেই বলে গেল ভীষণ যক্ষ, রাজা উদয়ন, এতদিন এইসব দামি দামি জিনিস আগলে রেখেছিলাম শুধু আপনার জন্যে। আজ শেষ হল আমার কর্তব্য। রাশি রাশি অমূল্য রত্ন আর একটা রত্নখচিত হাতির দাঁতের সিংহাসন আগে ছিল আপনার পূর্বপুরুষদের। শোর্যেবীর্যে তুলনাহীন। উপযুক্ত বংশধর আপনি, গ্রহণ করুন। আমি বিদায় নিলাম, কাজ শেষ।

যক্ষের প্রকাণ্ড অবয়ব ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে বিলীন হয়ে গেল বাতাসের মধ্যে।

বনভূমি নিস্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর খনিকদের খনিত্র ঝপাঝপ মাটি কুপিয়ে চলে গেল গর্তের আরও গভীরে। পাতালের যক্ষগর্ভ থেকে দফায় দফায় তুলে আনা হল বিস্তর হিরে জহরৎ। সবশেষে হেঁইও হেঁইও করে টেনে তোলা হল প্রকাণ্ড এক সিংহাসন মণিমাণিক দিয়ে গড়া, সোনা দিয়ে মোড়া, বিরাট বিরাট গজদন্ত দিয়ে নির্মিত বর্ণনাতীত সুন্দর অপূর্ব এক সিংহাসন।

বনভূমি ফের কলকাকলীতে মুখরিত। এতক্ষণ বুঝি নিরুদ্ধ নিশ্বাসে ছিল বনচরগণ, এখন তারাও বিপুল উল্লাসে বিচিত্র রবে বনের এক প্রান্ত থেকে আর ওক প্রান্ত ভরিয়ে তুলেছে।

রাজা উদয়নের মুখে বাক্যস্ফুর্তি নেই। এ যে অভাবনীয় ব্যাপার। অরণ্যের ভূগর্ভে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে অতুলনীয় সম্পদ, যুগ যুগ ধরে। নিশানা থেকেছে একটি মাত্র প্রস্তরবেদী, তা-ও ঝরাপাতায় ঢাকা, তাই কেউ গ্রাহ্য করেনি।

কিন্তু দৈব টেনে নিয়ে এসেছে এক গয়লাকে। রত্নকূপের ঢাকনায় বসতেই শক্তিরশ্মি তার মধ্যে রাজোচিত কর্তৃত্ব এনে দিয়েছে।

ঐশ্বর্য! কুবের সম্পদ! রত্ন-পাহাড়! নিতান্ত নির্বোধকেও অমানবিক শক্তির আধার করে তোলে। গয়লার সর্দারও আচমকা নিজেকে নৃপতি মনে করতে পেরেছিল। এ তার চিত্তবিকার নয়। মূলে রয়েছে রত্নরশ্মি প্রভাব। গয়লারা নির্দোষ, তাদের স্বঘোষিত রাজাও নির্দোষ। তার এই রাজোচিত আজ্ঞাপ্রদানের মূলে রয়েছে আশ্চর্য সুন্দর তুলনাবিহীন এই সিংহাসনের অলৌকিক প্রভাব।

গয়লাদের অব্যাহতি দিয়েছিল উদয়ন। তারা প্রস্থান করতেই সমস্ত রত্ন আর সিংহাসন আনিয়েছিল রাজ-কোষাগারে।

মন্ত্রী তখন বলেছিল, ওই সিংহাসন তো ফেলে রাখার জন্যে নয়, ধনাগারের ধনবৃদ্ধির জন্যেও নয়। আপনার পূর্বপুরুষ ওই সিংহাসনে বসেছেন। সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হয়েছেন। সম্রাট চক্রবর্তী হয়েছেন। সেই পুণ্য, সেই শক্তি বিবৃত রয়েছে মণিময় গজদন্ত সিংহাসনে। এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা হয়েছিল

উপযুক্ত অধীশ্বরের আবির্ভাব ঘটেনি বলে। আপনিই সেই অধীশ্বর। আপনার সিংহাসনে আপনি বসুন। পৃথিবীকে পায়ের তলায় আনুন।

তেজোময় বক্তৃতায় বিচলিত না হয়ে উদয়ন বলেছি, বুঝলাম। কিন্তু ধরার অধীশ্বর না হয়ে তো এই সিংহাসনে বসব না। আগে যোগ্যতা অর্জন করি, তারপর।

মন্ত্রী কিন্তু বুঝেছিল, শক্তিময় সিংহাসন তার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। অদৃশ্য বিকিরণ বর্ষণে এতদিন ধরে ভোগবাসনায় লিপ্ত তরুণ রাজার রক্তে নাচন ধরিয়েছে, তার চোখে এখন বিষয়বৃদ্ধির স্বপ্ন। বিশ্বজয়ের আকাঙ্ক্ষা।

এই তো চাই!

আড়ালে উদয়নকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দিয়েছিল অতীব গুপ্ত মন্ত্রণা। রাজ্যবিস্তারের কূটকৌশল।

বললে, প্রথমে জয় করুন পূবদিক।

রাজা বললে, কেন?

মন্ত্রী বললে, উত্তর দিকে সমৃদ্ধি আছে, সেই সঙ্গে আছে ম্লেচ্ছ, বিধর্মী। গোটা তল্লাটটা দূষিত করে রেখেছে। পশ্চিমে সূর্য ডোবে, সেদিকে গোড়ায় না যাওয়াই শুভ। দক্ষিণে তো রাক্ষস-টাক্ষস-অনার্য-দুরাচারদের রাজত্ব, যমের পুরীও সেদিকে, সুতরাং জয়যাত্রার পক্ষে সেদিক শুভ নয়। বাকি রইল, পূবদিক। যেদিকে সূর্য ওঠে। মঙ্গলময় যে-দিকের অধিপতি অরুণদেব। যেদিকে গঙ্গার জল ধেয়ে চলেছে গোটা অঞ্চলটা পবিত্র করে দিচ্ছে। হিমালয় আর বিন্ধ্যপাহাড়ের মাঝের সেই অঞ্চলের দেশ সব দেশের সেরা। যুগ যুগ ধরে তাই নৃপতিদের বিজয়োল্লাসে মুখরিত হয়েছে সেই দিক, গঙ্গার তীরেই তাঁরা জনপদ গড়েছেন। গঙ্গার তীরেই দেহ রেখেছেন। বড়ো পুণ্যভূমি এই পূবদিক, কৌশাম্বী বড়ো সুন্দর অঞ্চল বলে আপনার পিতামহ শতানীকই কেবল এখানে এসে রাজধানী করেছিলেন। অন্যান্য পূর্বপুরুষরা কিন্তু ছিলেন হস্তিনাপুরে, জগৎপ্রসিদ্ধ গঙ্গাতীরস্থ হস্তিনাপুরে। মন্ত্রীর সারগর্ভ বাচন রাজার অন্তর স্পর্শ করে গেছিল। সুযুক্তি ক্ষুরের চাইতেও ধারালো। প্রতিটি কথা কেটে কেটে বসে গেছিল রাজার মগজে। এতাবৎকাল মত্ত ছিল ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে, বয়সের যা ধর্ম, এখন রাজধর্মে নতুন করে মন দিতে গিয়ে হৃদয়ঙ্গম করেছিল বুদ্ধি, চাতুর্য আর দূরদর্শিতার প্রয়োজন সর্বাগ্রে, প্রতাপ আর রণকুশলতা তারপরে।

হৃষ্টচিত্তে বেরিয়ে এসেছিল নিভৃত মন্ত্রণাকক্ষ থেকে।

এখন সে স্থির প্রতিজ্ঞ। সবাইকে ডেকে বলেছিল, সত্যবানের গল্প কি শুনেছ?

রাজা বলবে গল্প! দুই রানি বললে সোৎসাহে, না না, তবে শোনো। এ গল্প এক পুরুষের শক্তি আর সাহসের কাহিনি। পুরস্কার একাধিক স্ত্রী, স্ত্রীধন আর বিপুল বিত্ত!

অনেক আগের কথা। উজ্জয়িনীতে আদিত্য সেন নামে এক রাজা ছিলেন। যথার্থ রাজা। রাজ্য বড়ো, কোষাগার প্রকাণ্ড, বিশাল সৈন্যবাহিনী। বড়ো শান্তিতে ছিল প্রজাসাধারণ।

একদিন সৈন্যসামন্ত নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে, সেখানেই তাঁবু খাটিয়ে সারারাত গঙ্গার পবিত্র সমীরণ সেবন করবেন মনস্থ করলেন রাজা।

খবর পেয়ে বহু লোকজন এল রাজাকে দেখতে। সেই সময়ে ঘটল একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।

সর্বাঙ্গ সুন্দরী একমাত্র কন্যাকে নিয়ে গুণবর্মা নামে এক ব্যক্তি এসে রাজাকে বললে, আমার তো এই একটিই মেয়ে। রূপেগুণে অদ্বিতীয়া। এর উপযুক্ত বর পাচ্ছি না, স্বয়ং রাজা ছাড়া আমার জামাই হওয়ার মতো কেউ নেই। সুতরাং হে রাজা, আপনি এই মেয়েকে বিয়ে করে ফেলুন।

রাজা তো অবাক হয়ে মেয়েটির দিকেই চেয়েছিলেন। সমস্ত প্রাণীর তিল তিল রূপ নিয়ে যদি তিলোত্তমা সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে বিশ্বব্রহ্মণ্ডের কণা কণা রূপ জড়ো করে এই কন্যা-সৃজন করেছেন সৃষ্টির দেবতা। অহো! অহো! কী রূপ! কী রূপ! মানবী, না, দেবী? আস্যে-হাস্যে-লাস্যে এ যে প্রকৃতই কল্প-কন্যার রূপায়ণ!

ফলে, বিয়ে হয়ে গেল কয়েকদিনের মধ্যেই। গঙ্গাতীরেই।

নতুন রাজরানির নাম, তেজস্বিনী।

উজ্জয়িনীতে ফিরে আসার পর রিরংসার দাস হয়ে পড়লেন রাজা। প্রথম রিপুর বায়না কখনও মিটোনো যায় না। শেষ থেকে শুরু। শুরু থেকে শেষ। চক্রাবর্ত কামচক্র।

ফলে, ঢিলেমি পড়ল রাজকার্যে। তেজস্বিনীর অণু-অণু রূপপানে মদির রাজা আর অন্তঃপুরের বাইরে পা দেয় না। লালসা-অগ্নি লেলিহান দুজনেরই প্রতিটি রক্তকণিকায়।

পরিণামে মাথা তুলল শত্রুপক্ষ।

মঞ্জুভাষিণী তেজস্বিনী তদ্দিনে আগামী প্রজন্মের মঞ্জরী বসিয়ে নিয়েছে নিজের গর্ভে। প্রথম রিপুর সহায়তায়।

যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হল একটি মেয়ে। কী রূপ! কী রূপ! যেন হাজার সূর্য ঝলসে উঠল রাজপ্রাসাদে।

আকৃতি দেখে তো মানব-কন্যা বলে মনে হয় না! সুরলোকের সুন্দরী নাকি? শাপ-টাপ পেয়ে জন্ম নিয়েছে মর্ত্যে?

কিন্তু তা নিয়ে ভাববার অবসর পেলেন না রাজা। খবর এল, উজ্জয়িনীর অধীন রাজা ফণা তুলেছে, বিদ্রোহী হয়েছে।

বাজল রণ ভেঁপু। সাজল সৈন্যসামন্ত। রওনা হলেন রাজা বিদ্রোহ দমনে। রাতের সঙ্গিনী কিন্তু রইল সঙ্গে। তেজস্বিনী। পাশাপাশি দুই ঘোড়ায়। তাকে যে আঁখির আড়াল করতে পারেন না রাজা, বিশেষ করে ঘোড়ায় চাপা অবস্থায় রূপবতীর আর এক রূপ দেখতে দেখতে যাচ্ছেন রাজা। তড়িৎ সঞ্চারিত হচ্ছে যেন বক্ষদেশের নৃত্যমান দুই পয়োধরে। লাল ঠোঁট আর কালো চোখ যেন খঞ্জনী আর মন্দিরা বাজিয়ে চলেছে তালে তালে।

ঈষৎ অন্যমনস্ক হয়েছিলেন রাজা আদিত্যসেন। ওদিকে হুহুঙ্কারে তেড়ে আসছে শত্রসৈন্য।

ক্ষিপ্ত হয়েছিল রাজ অশ্ব। তাকে বশে আনতে গিয়ে শনশন শব্দে চাবুক চালিয়ে ছিলেন রাজা।

ফল হয়েছিল বিপরীত। সমতল ভূমির ওপর দিয়ে প্রভঞ্জন বেগে ধেয়ে গেছিল তেজীয়ান অশ্ব। যেন ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা।

তাকে আর রুখতে পারেননি রাজা। দেখতে দেখতে প্রান্তর পেরিয়ে বিলীন হয়ে গেছিল দূর হতে দূরে।

তাই দেখে তো কেঁদে আকুল রানি তেজস্বিনী, চলমান ঘোড়ায় চোখের বাণ আর বুকের নাচন দেখানোর পরিণাম যে এই হবে, তা তো ভাবেনি।

যুদ্ধ মাথায় উঠল। অর্ধেক সৈন্য গেল রাজার খোঁজে, বাকি অর্ধেক বোরুদ্যমানা তেজস্বিনীকে নিয়ে ফিরে এল উজ্জয়িনীতে।

রাজা নিরুদ্দেশ হলে রাজ্য রক্ষা করবে কে? করতে হবে নিজেদেরকেই। নগরবাসীরা দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে রইল যে যার বাড়িতে। একই অবস্থা দেখা গেল গড়খাই দিয়ে ঘেরা রাজপ্রাসাদেও। তুলে দেওয়া হল সেতু। বন্ধ হল তোরণ আর বাতায়নের বড়ো বড়ো কপাট। দুরু দুরু বুকে সবাই বসে রইল ভেতরে।

বেয়াড়া ঘোড়াকে বশে আনতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন রাজা আদিত্যসেন। যাক, যেদিকে খুশি যাক।

সুতরাং মনের খুশিতে পক্ষিরাজের মতোই ধেয়ে গেছিল রাজঅশ্ব। শূন্যপথে অবশ্য নয়। পায়ের খুরে মাটি কাঁপিয়ে। যেন ঝড় বয়ে গেছিল বিভিন্ন পথ আর প্রান্তর, জনপদ আর বিজন এলাকায়।

তারপর শিরপা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছিল বিন্ধ্যের জঙ্গলে।

বিশাল জঙ্গল। দিগন্ত বিস্তৃত পাদপশ্রেণি। মানুষখেকো জানোয়ারদের আড্ডা। কোনদিকে যাবেন রাজা? পথ কোথায়?

বুদ্ধিমান তিনি। টপ করে নেমে পড়লেন ঘোড়ার পিঠ থেকে।

হাতজোড় করে বললেন পবনসম অশ্বকে, ঘাট মানছি। তুমি যে মর্তলোকের ঘোড়া নও, তা বুঝতে পারিনি। যাই হও না কেন, ঘোড়া কখনও মনিবের ক্ষতি করে না। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো রাজধানীতে।

হ্রেষারবে রাজার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিল দেবগণ অশ্ব। রাজাকে পিঠে নিয়ে উল্কা বেগে সন্ধ্যের আগেই ফিরে এসেছিল উজ্জয়িনীতে।

কিন্তু সব বাড়িরই দরজা-জানলা তো বন্ধ, এমনকি রাজপুরীও নিঝুম। দূর থেকে দেখলেন, গোটা শহর যেন মরে রয়েছে। ঠাঁই নেই কোথাও।

কাজেই ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে চললেন রাজা, রাত হল। গাঢ় অন্ধকার। শ্মশানে এসে পৌঁছোলেন রাজা, উজ্জয়িনীর মহাশ্মশান। দিনের বেলাতেই ভয়ংকর, রাতের অন্ধকারে নরক বললেই চলে। চারদিকে দাউ দাউ করে জ্বলছে চিতা।

পেরিয়ে এলেন নির্ভীক রাজা, পৌঁছোলেন শহর প্রান্তে। এইখানে দেখলেন ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘরের মধ্যে খোশগল্প জুড়েছে জনাকয়েক ব্রাহ্মণ। অতি বিটকেল চেহারা প্রত্যেকের।

একটামাত্র প্রদীপ মিটমিট করে জ্বলছে ঘরের মধ্যে।

রাজাকে দেখেই তারা 'চোর-চোর' করে এমন চেঁচিয়ে উঠেছিল যে ভয়ঙ্কর এক তলোয়ার নিয়ে দৌড়ে এসেছিল এক যুবক। তার নাম, বিদূষক। এই তলোয়ার সে পেয়েছে অগ্নির কৃপায়। শক্তি বিধৃত তার অস্ত্রে, মনে, শরীরে।

এই কাহিনির মূল নায়ক এই বিদূষক। অসমসাহসিক যুবাপুরুষ বিদূষক। সে-ও ব্রাহ্মণ। ভদ্রঘরের, নরাকারে অগ্নি।

তাই সে মানুষ চেনে। রাজাকে দেখেই বুঝেছিল, ইনি চোর তো নন-ই বড়ো ঘরের পুরুষ। তাই নির্ভয়ে থাকতে দিয়েছিল সেই ঘরে, হটিয়ে দিয়েছিল বিটকেল বামুনদের, নিজে তরবারি হাতে নিয়ে সারারাত জেগে পাহারা দিয়েছিল রাতের অতিথিকে।

ভোরের আলোয় ঘুম ভাঙতেই রাজা বেরিয়ে এসেছিলেন বাইরে। রাতের অন্ধকারে যাঁকে চিনতে পারেনি বিদূষক, দিনের আলোয় তাঁকে দেখেই চিনেছিল, রাজা আদিত্যসেন!

একটু ঘাবড়ে গেছিল বইকি। রাজা তাকে অভয় দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ঘোড়াটাকে খুঁজে আনতে।

বিদূষক এনে দিয়েছিল ঘোড়া। ঘোড়ায় চড়ে দিনের আলোয় প্রাসাদের সামনে যেতেই তাঁকে চিনতে পেরেছিল প্রাসাদরক্ষীরা, অন্তঃপুরের বাসিন্দারা। খুলে গেছিল সব কপাট।

কান্না বন্ধ হল তেজস্বিনীর। হাসি ফুটল মন্ত্রী, সেনাপতির মুখে। উৎসবে নেচে উঠল গোটা শহর।

এবার আসা যাক বিদূষক-প্রসঙ্গে।

নিশুতি রাতে যে-ব্যক্তি আশ্রয় দেয়, নিজে অতন্দ্র নয়নে অসিহস্তে ঘুমন্ত অতিথিকে পাহারা দেয়। তার মতো হৃদয়বান পরোপকারী ব্যক্তি দুর্লভ। সে রাজাকে চিনতে না পেরে কোনও কিছুর প্রত্যাশা না রেখে উচ্চ মনোবৃত্তির নির্দেশে অসহায়কে রক্ষা করেছে। এই রাজ্যে দৃষ্টান্ত রাখা দরকার, এমন মানুষই রাজঅনুগ্রহ পেতে পারে, তার উত্তর পুরুষও যেন রাজঅনুগ্রহে সুখে আর সম্মানে থাকতে পারে।

বিদূষককে এক হাজার গ্রাম পারিতোষিক দিলেন রাজা। নিষ্কর জমি, অর্থাৎ, এ জমির জন্যে কক্ষনো খাজনা দিতে হবে না রাজাকে।

এক হাজার গ্রাম! মানে, জমিদার হয়ে গেল বিদূষক। তাতেও ঋণশোধ হয়েছে বলে মনে করেননি রাজা। তাই বিদূষককে রাজপুরোহিতের পদে বৃত করলেন।

সেই রাতে কুটির ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে যে ব্রাহ্মণরা একা রাজাবাবুকে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দিয়েছিল, তাদেরও প্রচুর দান করলেন।

বিদূষক নির্লোভ পুরুষ, প্রত্যাশা নিয়ে পরোপকার করে না। পরোপকারেই তার আনন্দ, পুরস্কারে নয়। তাই এক হাজার নিষ্কর গ্রামের বেশির ভাগই বিলিয়ে দিল কুটিরের বাসিন্দা সেই ব্রাহ্মণদের। নিজে রেখে

ছিল খান কয়েক গ্রাম, নইলে যে রাজার অসম্মান করা হয়।

রাজপুরোহিত হওয়াই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার মনে করেছিল বিদূষক। ব্রাহ্মণের কাছে এর চাইতে বড়ো সম্মান আর নেই। অহোরাত্র রাজসেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিল।

কিন্তু এরকম মনোবৃত্তি তো ব্রাহ্মণের থাকে না। বিষয়-সম্পত্তি মানুষের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়ে দেয়। গরিব সেই ব্রাহ্মণদের ঘটল তাই।

বেশ কয়েক বছর পরেই আত্মকলহে লিপ্ত হল বিদূষককে গ্রাহ্য না করেই। বিষয় নিয়ে বিবাদ ঘটলে বিষয় ধ্বংস সুনিশ্চিত। এক্ষেত্রেও তার অন্যথা ঘটল না।

ফাঁপড়ে পড়েছিল গ্রামের লোকজন। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। ব্রাহ্মণ মনিবদের লাঠালাঠিতে প্রায় হাজারখানা গ্রামে নেমে এল নিদারুণ অশান্তি।

বিদূষক রইল তফাতে। তার এসব নষ্টামি ভালো লাগে না।

নাক গলালেন এক উচিত বক্তা ব্রাহ্মণ, তাঁর নাম চক্রধর। একটা চোখ নেই।

বিষয়লোভী ব্রাহ্মণদের ডেকে বললেন, তোরা মানুষ না, জানোয়ার? ছিলি তো রাস্তার ভিখিরি। বিদূষকের দৌলতে মোড়লি করতে এসেছিস। সবাই মিলে মাতব্বরি করতে গেলে লাটালাঠিই চলবে, নিষ্পত্তি হবে না। একজনকে মাতব্বর ঠিক করে নে। শান্তি পাবি। গাঁয়ের মানুষগুলোও বাঁচবে।

ফ্যাসাদ লাগল সেই ব্যাপারেও। নিরেটবুদ্ধি, ব্রাহ্মণরা প্রত্যেকেই ভাবল, আমি কম কীসে? আমি হব মাথা, উজবুকগুলো থাকুক আমার পায়ের তলায়।

ফয়শালা বৈঠকে বিদূষক নিজেও হাজির ছিল। রণরঙ্গ দেখে সে তো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সামান্য কর্তৃত্ব, তার জন্যে এরা তো দেখছি মাথা ফাটাফাটি করতেও পিছপা নয়।

মীমাংসা-সূত্র বাতলে দিয়েছিলেন একচক্ষু চক্রধর।

গাড়ল ব্রাহ্মণদের ডেকে বলেছিলেন, বেশ, বেশ, তোমাদের চাঁই কে হতে পারে, সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, তোমরা তো জানো, শ্মশানে রয়েছে তিনটে তস্কর? জানো! তাদের নাক আর কান যে কেটে আনতে পারবে, সে-ই হবে তোমাদের শিরোমণি, রাজি?

উত্তম প্রস্তাব, বললে বিদূষক।

কিন্তু রাজি নয় কেউই। চোরের নাক-কান কাটা কি চাট্টিখানি কথা? সমস্বরে তারা বললে, যে পারবে, সে কাটুক। তাকেই আমরা কর্তা বলে মেনে নেব।

বিদূষক বললে, যদি আমি গিয়ে কেটে আনি?

চিরদিন তোমাকে মাথার ওপর রাখব।

হই-হই করে ব্রাহ্মণরা এই কথা বললে বটে, মনে মনে কিন্তু জানত, কাজটা অসম্ভব। বিদূষক পারবেই না।

তখন রাত্রি নিশীথ। ভয়াল ভয়ংকর মহাশ্মশানে প্রবেশ অত সোজা নয়।

অকুতোভয় বিদূষক তৎক্ষণাৎ অগ্নির দেওয়া তলোয়ার বাগিয়ে ধেয়ে গেছিল শ্মশানের দিকে। এমনিতেই তার প্রাণে ভয়ডর নেই, হাতে ওই অসামান্য অসি থাকলে সে আরও বেপরোয়া।

বিরাট শ্মশান। তিন চোর আছে কোথায়? ছুটছে আর আনাচে কানাচে দেখতে দেখতে যাচ্ছে বিদূষক। ছুটতে ছুটতে এসে গেল যেখানে রাজার বধ্যভূমি, সেইখানে।

সেখানে মাটিতে পোঁতা খুব উঁচু শূল-এর ছুঁচোলো ডগায় গাঁথা রয়েছে তিন চোর। কাঠের সূচ্যগ্র শূল তাদের গোটা দেহ ফুঁড়ে শরীর থেকে প্রাণ বের করে দিয়েছে, কিন্তু শরীরের শূন্য খাঁচায় তৎক্ষণাৎ ঢুকে পড়েছে তিন বেতাল।

অর্থাৎ, মড়া এখন দানোয় পেয়েছে। তিন ভূতের দখলে চলে গেছে তিন চোরের কলেবর।

এ তো ভয়ানক অবস্থা। নাক-কান তো এখন ভূতেদের দখলে। কাটবে কী করে বিদূষক?

তলোয়ার দিয়ে। অসি উঁচিয়ে, ধারালো ডগা দিয়ে নাক আর কান কাটতে যেতেই তিন ভূতে-পাওয়া মড়া ঘুসি পাকিয়ে দমাদম উত্তম-মধ্যম দিয়ে গেছিল বিদূষককে।

ভূতের প্রহার বড়ো ভয়ানক। বেতালের ঘুসি খুলি গুঁড়িয়ে দেয়, ঘাড় ভেঙে দেয়।

কিন্তু বিদূষক তাতে চম্পট দেবার পাত্র নয়। মড়ার হাতে বেধড়ক মার খেয়েও দমেনি। বরং মাথায় খুন চেপে গেছিল। চোরের হাতে মার খাওয়া কার সয়? বিশেষ ভূতে-পাওয়া চোরের হাতে?

সুতরাং, বন বন করে তরবারি ঘুরিয়ে গেছিল বিদূষক। দৈবশক্তির বিচ্ছুরণ ঘটেছিল ইস্পাত থেকে। শূল থেকে খুঁচিয়ে তিন মড়াকে মাটিতে ফেলেছিল। তার ভয়ংকর আকৃতি আর ঘূর্ণমান তরবারির বিক্রম দেখে তৎক্ষণাৎ মড়া ছেড়ে চম্পট দিয়েছিল তিন বেতাল। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা!

তিন চোরের নাক আর কান কেটে নিয়েছিল বিদূষক। পুঁটলিতে বেঁধে রওনা হয়েছিল শ্মশানের মধ্যে দিয়ে।

কিন্তু থমকে গেল একটু এগিয়েই। চোখে পড়েছে আবার একটা মড়া। শবসাধনার মড়া!

সাধনা চলছে তার চোখের সামনেই। এক সন্ন্যাসী গ্যাঁট হয়ে বসে রয়েছেন মড়ার বুকে, অবশ্যই পদ্মাসনে। কোমরে গাছের ছালের কৌপিন। লম্বা দাড়ি লুটোচ্ছে চ্যাটালো বুকে। মাথায় জটা।

বিরাটকায় সেই, তান্ত্রিক বিরামবিহীন মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন। মন্ত্র-মাহাত্ম্য দেখা গেল বিদূষকের চোখের সামনেই।

শূন্যে ভেসে উঠল শব, তান্ত্রিক সমেত।

পেছনে দাঁড়িয়ে সব দেখছে বিদূষক, তার চোখের পাতা পড়ছে না।

নিরাবলম্ব শব ভেসে রয়েছে শূন্যে। নির্বিকার তান্ত্রিক বসে রয়েছেন বুকে। তিনমাত্র চিত্তবিকার নেই, মহামন্ত্র উচ্চারণে ক্ষণিক বিরতিও নেই।

ভাসমান শব এখন এগিয়ে চলেছে শূন্যপথে। যেন একটা ব্যোমযান। পা টিপে টিপে বিদূষকও চলেছে পেছন পেছন। তার গা ছমছম করছে না মোটেই। বিষম কৌতূহল তাকে টেনে নিয়ে চলেছে শবসাধনার শেষ নাটক দর্শনের আত্যন্তিক অভিলাষে। এরকম অদ্ভুত ঘটনার অনেক গল্প সে শুনেছে, দেখছে এই প্রথম।

ভেসে যেতে যেতে আচমকা শূন্যেই থমকে গেল শয়ান শব। তান্ত্রিকের সুগম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণে শিউরে শিউরে উঠতে লাগল নিশুতি রাত।
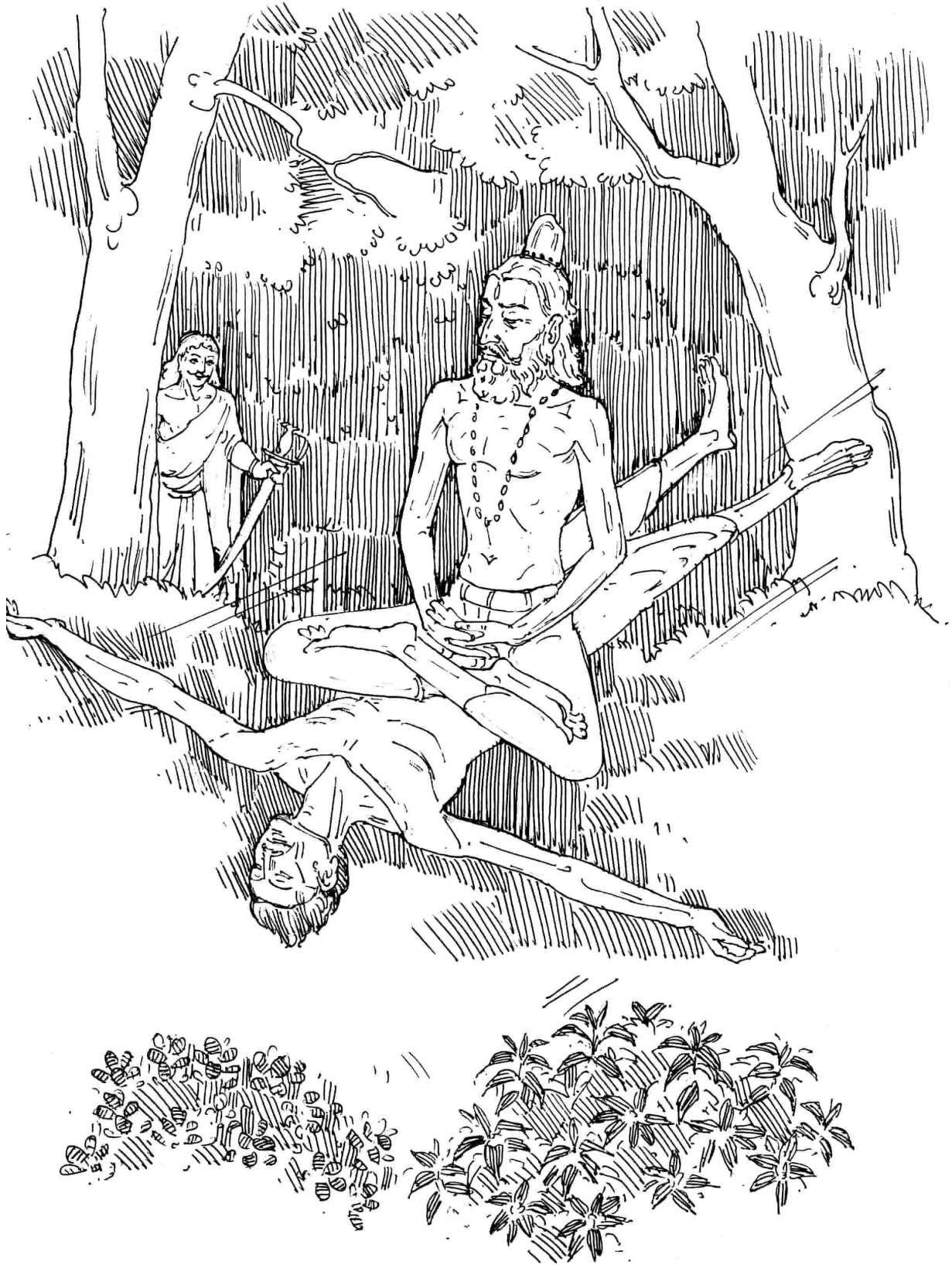
সোপান শ্রেণির সামনে ভাসছে শব। আর, শবারূঢ় তান্ত্রিক।

পরক্ষণেই দেখা গেল আবার একটা আশ্চর্য ব্যাপার!

আশ্চর্য বলে আশ্চর্য!

আচম্বিতে একটা মন্দির দেখা গেল শূন্যে। মাটি থেকে উঁচুতে। অথচ এতক্ষণ সেখানে কিছুই ছিল না। যেন, হাওয়া জমাট বেঁধে নিমেষে গড়ে দিল ইট-কাঠ-পাথরের সেই দেবালয়কে!

সোপান শ্রেণির সামনে ভাসছে শব। আর, শবারূঢ় তান্ত্রিক।

মন্দিরের আলোয় চোখ খুলে গেছিল শবসাধকের। শবাসন থেকে নেমে, শূন্যে হেঁটে, ঢুকে গেলেন মন্দিরের ভেতরে।

বিস্ময়বিমূঢ় বিদূষক বাইরে দাঁড়িয়ে শুনে যাচ্ছে মন্দিরের ভেতরে চলছে তান্ত্রিককণ্ঠে স্তোত্রপাঠ। দেবী আরাধনা।

একটু পরেই কানে ভেসে এল তান্ত্রিকের শিহরণ জাগানো কণ্ঠস্বর : মা, মাগো! বর দে!

রণরণে দেবীকণ্ঠে শোনা গেল জবাব, বলি চাই! নরবলী!

নে, আমার মুণ্ড নে! দে তোর খাঁড়া!

আত্মবলি চাই না....আত্মবলি চাই না!

তবে?

আদিত্যসেনের মেয়ের মুণ্ড চাই, কাটতে হবে আমার সামনে!

তাই হবে!

শূন্যে হেঁটে মন্দির থেকে বেরিয়ে এল বিশালকায় তান্ত্রিক। এখন তার চোখে ধকধকে আগুন। রাজকন্যাকে বলি দিলেই অভীষ্ট বর মিলবে। আজ রাতেই। আর দেরি নয়।

শবের বুকে বসে হুকুম দিতেই বেতাল-আশ্রিত মড়া সাঁ-সাঁ করে উড়ে গেল রাজপ্রাসাদের দিকে, যেন বিমান!

বিদূষক কিন্তু নড়ল না একচুলও। বুদ্ধিমান বলেই অনড় রইল স্বস্থানে। অদূরদর্শী হলে তৎক্ষণাৎ টেনে দৌড়োত রাজপ্রাসাদের দিকে। কিন্তু সেটা হতো অবিবেচনা। শূন্যে ধাবমান মড়ার সঙ্গে দৌড়ে পেরে উঠত না।

তাই দাঁড়িয়ে রইল ঘাপটি মেরে।

রাতের অন্ধকারে তান্ত্রিককে নিয়ে মড়া ঢুকে গেছিল মস্ত জানলা দিয়ে। পালঙ্কে ঘুমোছিল কিশোরী রাজকুমারী। তার চুলের মুঠি ধরে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল শূন্যপথে বাতায়ন দিয়ে বাইরে।

নিঃসীম আতঙ্কে কণ্ঠ রোধ হয়ে গেছিল রাজকন্যার, কেঁদে আকুল হয়ে গেছিল, কিন্তু পাষাণ হৃদয় কাপালিকের প্রাণ তাতে গলেনি। নিস্তব্ধ প্রাসাদপুরী অকস্মাৎ মুখরিত হয়েছিল নিরুদ্ধ-নিশ্বাস কান্নায়, কিন্তু কান্নার উৎস তো বোমমার্গে, তিমির অন্তরালে, নিমেষে মিলিয়ে গেছিল দূর হতে দূরে। রাজকন্যা গায়েব হয়ে গেল রাজপুরীর ভেতর থেকেই, কত সহজে!

বিবেচক বিদূষক এমনটা হবে আঁচ করে নিয়েই শ্মশানে থাকা মনস্থ করেছিল, একটু পরেই দেখেছিল সাঁ-সাঁ করে ফিরে এল বেতাল অধ্যুষিত শব, বুকে বসে এক হাতে রোরুদ্যমানা রাজকন্যার চুলের মুঠি ধরে ঝুলিয়ে রেখেছে নির্দয় কাপালিক।

বিলম্ব সইছে না তান্ত্রিকের। সেই মুহূর্তে কন্যেকে হাড়িকাঠে ফেলে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিল।

এইবার কিন্তু বিদূষক চলমান বিদ্যুৎ হয়ে গেছিল। আড়াল থেকে ঠিকরে এসে একলাফে উঠে গেছিল মন্দিরের সোপানে, পরমুহূর্তে মন্দিরের মধ্যে। কাপালিকের উদ্যত খাঁড়া নেমে আসার আগেই কাপালিক এক হুংকার ছেড়ে নিজের তরবারি চালনা করে চকিতে উড়িয়ে দিয়েছিল নরহন্তার মুণ্ড।

তাই দেখে তো ভয়ে প্রাণ উড়ে গেছিল কিশোরী রাজকুমারীর। প্রথমে দেখেছিল বিভীষণ আকৃতির এক মহাকায় কাপালিককে, সহসা তার ছিন্ন মুণ্ড ঠিকরে গেল দেবীর পদতলে, রক্তমাখা তরবারি হাতে এখন

তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক পরম সুন্দর যুবক। হাসছে। দুই চোখে ভাসছে অভয়।

যূপকাষ্ঠ থেকে রাজকন্যাকে মুক্তি দিতে দিতে বলেছিল বিদূষক, কাঁদবে না। আর ভয় নেই। এখুনি নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে অন্তঃপুরে।

কিন্তু কী ভাবে? ভয়ংকর এই শ্মশানের ওপর দিয়ে অবলা এই কন্যাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? অবলার সহায় হলেন স্বয়ং দেবী। মন্দিরের মধ্যে শোনা গেল দেবীর কণ্ঠস্বর, বিদূষক, তুমি বীর। এই মহাসংকট থেকে পরিত্রাণের পথ বলে দিচ্ছি। এই যে কাপালিকের শির তুমি ছিন্ন করলে, দীর্ঘ সাধনায় এ বেতাল সিদ্ধি অর্জন করেছিল, বেতাল এর আজ্ঞাবহ দাস। যা বলবে, তৎক্ষণাৎ তা করবে। সেই বেতাল এখন তো এখানেই রয়েছে। সকালের আলো ফোটবার আগে তুমি তাকে যা হুকুম করবে, তাই সে পালন করবে।

কেননা, কাপলিককে বলি দিয়ে তুমি এখন ওর প্রভু।

কিন্তু রাত ফুরোলেই বেতাল অদৃশ্য লোকে প্রস্থান করবে, তখন আর তাকে পাবে না। তাই আর দেরি না করে, রাজকন্যাকে কোলে নিয়ে বসে যাও শবের বুকে। শব তোমাদের নিয়ে যাবে, যেখানে যেতে চাও। আর একটা উপকার করে যাই।

নিষ্ঠুর এই কাপালিকের সর্ষপ সিদ্ধি ছিল। মন্ত্রপড়া সর্ষে ছুঁড়ে অনেক অলৌকিক ভয়ানক কাজ করতে পারত। সর্ষেগুলো বাঁধা আছে ওর কাপড়ের খুঁটে। তুমি নাও কাছে রাখো।

সর্ষের মহিমায় অনেক বিচিত্র ব্যাপার ঘটতে পারবে, সাধারণের কাছে যা দুঃসাধ্য, তা সম্ভবপর হবে এই শক্তি সঞ্চিত সর্ষের দৌলতে।

স্তব্ধ হল আকাশবাণী, বিদূষক হাত চালিয়ে কাপলিকের কাপড়ের খুঁট খুলে শক্তিময় সর্ষের প্রতিটি দানা বেঁধে নিল নিজের কাপড়ের খুঁটে।

এবার ফিরতে হবে রাজঅন্তঃপুরে। তার তোড়জোর করছে। এমন সময়ে ফের মন্দির মধ্যে ধ্বনিত হল দেবীর কণ্ঠস্বর, বিদূষক! ঠিক একমাস পরে আসবে এখানে, মনে থাকে যেন।

উড়ন্ত শব অচিরেই বিদূষক আর রাজকন্যাকে নিয়ে এল সটান রাজঅন্তঃপুরে। সর্ষের মহিমা দেখে চমৎকৃত হয়েছিল বিদূষক।

কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান হারায়নি। রাত ফুরোলেই যে বেতাল চম্পট দেবে, সর্ষে-মাহাত্ম্যও আর দেখা যাবে না, তা তার মনে আছে।

তাই বললে রাজকন্যাকে, আর নয়। এক্ষুনি আমাকে যেতে হবে। সকাল হলে আটকে যাব। ধরা পড়ব।

কিন্তু ভয়ে আখানা রাজকুমারী তাকে ছাড়বে কেন? একটু আগেই তাকে ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গেছিল, খাঁড়ার কোপে গলা কাটা যাচ্ছিল, রাত ভোর হওয়ার আগেই পরিত্রাতা বিদূষক বিদায় নিলে যদি বিকট বেতাল ফের হামলা শুরু করে? তুলে নিয়ে যায়?

তার কান্নাকাটিতে বিদূষক রাজি হয়েছিল রাজঅন্তঃপুরে রাত কাটিয়ে যেতে। অতিশয় ক্লান্ত ছিল বলে অকাতরে ঘুমিয়েও পড়েছিল।

ঘুমোয়নি কিন্তু রাজকন্যা। এ অবস্থায় ঘুম আসে? বিকট মড়ার বুকে বসে এক ভয়াল দর্শন তান্ত্রিক তাকে চুলের মুঠি ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে গেছে, সেই মড়া বায়ুবেগে বিমানের মতো উড়ে গেছে, হাড়িকাঠে গলা রেখে খাঁড়ার কোপ খেতে খেতে বেঁচে গেছে—

চোখের সামনেই কিন্তু তান্ত্রিকের মুণ্ড উড়িয়ে দিয়েছে যে অমিত বিক্রম অনিন্দ্যসুন্দর যুবাপুরুষ, সে এখন ঘুমে নেতিয়ে পড়েছে তারই শয্যায়!

অলীক নয় কিছুই। সুতরাং কিশোরী কন্যার চোখে ঘুম আসবে কী করে? সে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রয়েছে ঘুমন্ত মানুষটার দিকে।

এবং প্রেমের দেবতা এই সুযোগে তার অব্যর্থ শরনিক্ষেপ করেছে কিশোরীর কাঁচা মনে!

কৈশোরের প্রেম নিকষিত হেম! রাজকন্যার মন জুড়ে রয়েছে এখন বিদূষক।

ভোর হল। বিদূষক তখনও ঘুমোচ্ছে। রোদ উঠল। সে ঘুমের অতলে। রাজকন্যা পাশে বসে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে আছে অসমসাহসিক অথচ শিশুর মতো নিদ্রিত মানুষটার দিকে।

এমনই কপাল, ঠিক সেই সময়ে জনাকয়েক অন্তঃপুর প্রতিহারিণী নিয়মিক টহল দিতে গিয়ে দেখে ফেলেছিল অতীব আশ্চর্য সেই দৃশ্য!

রাজার মেয়ের খাটে শুয়ে ঘুমিয়ে কাদা এক অচেনা যুবক। রাজকন্যা বড়ো বড়ো চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে চোখে ভয় নেই, আছে ভালোবাসা!

সুতরাং, খবরটা নিমেষে পৌঁছে গেছিল রাজার কানে।

রাজা প্রধান প্রতিহারিণীকে পাঠিয়েছিলেন মেয়ের কাছে। মেয়ে সব খুলে বলেছিল তাকে।

রাজা আসল ব্যাপার শুনে স্তম্ভিত হলেন। উড়ন্ত শব, বিকট তান্ত্রিক আর খাঁড়ার কোপ থেকে মেয়েকে বাঁচিয়েছে বিদূষক!

ডাক পড়ল বিদূষকের। সে পুঁটলি খুলে দেখাল তিন চোরের কাটা নাক আর কান।

প্রত্যয় হল না রাজার। নিজে দৌড়লেন শ্মশানে। স্বচক্ষে দেখলেন তিন চোরকে, তাদের কান আর নাক নেই। আর দেখলেন তান্ত্রিকের কবন্ধ দেহ, অদূরে গড়াগড়ি যাচ্ছে তার কাটা মুণ্ড!

রাজপ্রাসাদে ফিরলেন। লগ্ন দেখলেন। বিদূষককে জামাই করে নিলেন। কিশোরী বধূর সঙ্গে বিদূষকের একটা মাস প্রেমের আর কামের খেলায় উড়ে গেল রাজবাড়িতে।

মাস যেদিন পূর্ণ হবে, সেইদিন কিন্তু সাতসকালেই রাজকন্যা মনে করিয়ে দিয়েছিল শ্মশান-দেবীর শর্ত। আকাশবাণী দিয়েছিলেন, এক মাস পরে বিদূষক যেন যায় শ্মশানে।

নতুন বউ পেয়ে সবই ভুলে মেরে দিয়েছিল বিদূষক। কিন্তু রাত হতেই ঘুমন্ত বউকে রেখে চলে গেছিল শ্মশানে, সঙ্গে নিয়েছিল অগ্নির দেওয়া অসি।

গিয়ে তো অবাক! শূন্যে ভাসছে সেই অপার্থিব মন্দির!

হতবাক বিদূষক দাঁড়িয়ে নীচে। মন্দিরের মধ্যে জ্বলছে আলো।

অদ্ভুত এক প্রভা ঠিকরে যাচ্ছে দেবালয়েরর গা থেকে।

কিছুক্ষণ পরে বলেছিল উচ্চকণ্ঠে, দেবী, আমি বিদূষক। এসেছি আপনার আদেশে। আজ পূর্ণ হল এক মাস।

অমনি সুরেলা নারীকণ্ঠে জবাব ভেসে এসেছিল মন্দিরের ভেতর থেকে, ভেতরে আসা হোক।

লম্ফ দিয়ে চাতালে উঠে মন্দিরে ঢুকেই থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছিল বিদূষক।

ওর সামনেই দাঁড়িয়ে এমন এক রূপসী যুবতী যার বর্ণনা চলে না কোনও ভাষায়। কেননা, কোনও মর্ত্যের মানবী এমন সুগঠনা, এমন বিদ্যুৎময়ী, এমন মোহিনী হয় বলে জানা নেই, বিদূষকের। শুধু কি লাবণ্য তার গায়ের রকমারি অলংকার, তার পরনের বিচিত্র বসন, সবই চোখে ধাঁধা লাগানো। কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে গেছিল বিদূষক সেই অপরূপা অতুলনীয়া ভুবনমোহনী ললনার সামনে।

আরও আশ্চর্য হয়েছিল একটা ব্যাপারে। বাইরে থেকে মন্দিরের মধ্যে যে আলো দেখেছিল, সে আলো এই অনিন্দ্যসুন্দরীর রূপের আলো! আশ্চর্য রূপ আশ্চর্যতর কিরণপাতে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে মন্দিরের অভ্যন্তর।

হাস্যে লাস্যে বিদ্যুৎবরণী সেই রমণী নিমেষহীন নয়নপাতে বিদ্ধ করে রেখেছিল বিদূষককে, চুম্বকের মতো চাহনি, বিদূষকও চোখের পাতা ফেলতে ভুলে গেছিল। সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিল ক্ষণপরেই। মোহাচ্ছন্ন স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, কে আপনি?

বীণা ঝংকৃত আবেশ জাগানো স্বরে উত্তর দিয়েছিল রূপবতী—আমি এক বিদ্যাধরী।

চমকে উঠেছিল বিদূষক, বিদ্যাধরী!

কুল মর্যাদায় বিদ্যাধরীদের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠা।

শ্রেষ্ঠতমোত্তমা। আমার নাম ভদ্রা।

একমাস আগে আপনিই কি আমাকে—

এখানে আসতে বলেছিলাম। ইচ্ছেমতো সর্বত্র গমনের ক্ষমতা আমাদের আছে। একমাস আগে গভীর রাতে এইখান দিয়েই যাচ্ছিলাম, শূন্যপথে। আপনি যখন কাপালিক বধ করছিলেন তখন, আপনার সাহস আর রূপ দেখে মোহিত হয়েছিলাম। নিজেকে উজাড় করে দিতে চেয়েছিলাম আপনার শক্তিময় দুই বাহুর মধ্যে। অস্থির হয়েছিলাম অতীব্র কামনায়। আমার প্রতি অঙ্গে কেঁদেছিল আপনার প্রতি অঙ্গের জন্যে। তাই মন্দিরে লুকিয়ে থেকে আপনাকে আহ্বান জানিয়েছিলাম। আমার রতিপিপাসা আপনি মিটিয়ে দিন।

এই এক মাস আপনি কোথায় ছিলেন?

এইখানে, এই শ্মশানে আপনার প্রতীক্ষায়। কিন্তু নববধূ ভোগে, মদির হয়ে আপনি প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয়েছিলেন। তাই প্রয়োগ করেছিলাম মায়াবিদ্যা। আমারই ইচ্ছায় আপনার কিশোরী পত্নী আপনাকে মনে করিয়ে দিয়েছে একমাস আগের প্রতিজ্ঞা, আমারই ইচ্ছায় সে এখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আপনি আমার ইচ্ছাপূরণ করুন।

বিদ্যুৎবতীর অবর্ণনীয় শ্রোণি সঞ্চালনে কামমদির হয়ে গেছিল বিদূষক, বিয়ে?

হ্যাঁ, এক্ষুনি গান্ধর্বমতে।

দেহমিলন যখন আর সময়ের অপেক্ষা রাখে না, তখন বিয়ে তো হবে গান্ধর্ব মতে। বিচক্ষণ এবং দূরদর্শী শাস্ত্রকারদের চটজলদি ব্যবস্থা!

তাই হয়েছিল। ভদ্রার আতীব্র কাম-পিপাসার তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি ঘটিয়েও নিষ্কৃতি পায়নি বিদূষক। পেতেও চায়নি। তাই বিস্মৃত হয়েছিল কিশোরী বধূকে। বিস্মৃত হয়েছিল রাজবাড়ি। দিবস রজনী আসঙ্গ-লিপ্সায় মত্ত থেকেছে। বিদ্যাধরী ভুলিয়ে রেখেছে তাকে মায়াবিদ্যা দিয়ে। এমনকি তাকে দৃশ্যমানও রাখেনি। দুজনেই বায়বীয় কলেবরে মিটিয়ে গেছে পরস্পরের সহবাস-আকাঙ্ক্ষা। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।

কিন্তু কিশোরী রাজকন্যা তো তা জানে না। সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখেছে শয্যা শূন্য।

তবে কি শ্মশানেই গেছে বিদূষক প্রতিজ্ঞা রাখতে?

রাজাকে তা জানাতেই তিনি নিজে ছুটেছেন শ্মশানে। কিন্তু বিদূষককে দেখতে পাননি। সেই মন্দিরও দেখতে পাননি।

মায়াবিনী বিদ্যাধরীরও বিদূষককে দেখতে দেয়নি রাজাকে। যুবতীর মায়া এমনিতেই পুরুষকে অন্ধ করে দেয়, আর এ তো বিদ্যাধরী শ্রেষ্ঠা ভদ্রা। পরস্পরের সূক্ষ্মদেহের রতিররঙ্গসুখ তখন বিরামবিহীন চরমাবস্থায় রয়েছে। সূক্ষ্ম কম্পনের সূক্ষ্মতর মিলন, যা ধরা পড়ে না পার্থিব উপলব্ধিতে।

ফলে, হতাশ রাজা ফিরে এসেছিলেন রাজপ্রাসাদে।

নিরুদেশ স্বামীর শোকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল বটে কিশোরী রাজকন্যা, কিন্তু তা হতে দেয়নি অলৌকিক শক্তিধর এক পুরুষ।

তিনিই বলেছিলেন, ধৈর্য ধরো, মা। তোমার স্বামী তোমারই আছে। ফিরে সে আসবেই। সে এখন মায়ায় আচ্ছন্ন।

বিদূষককে কিন্তু এ সবের কিছুই জানতে দেয়নি মায়াবিনী ভদ্রা। সে তখন ভরা যৌবন উৎসর্গ করেছে যার বাহুবন্ধনে, তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে তার অতীত। বিদূষকের ভুবনে তখন শুধু ভদ্রা। ছলাকলায় অদ্বিতীয়া।

অতিশয় রতিপ্রিয়া। অন্তহীন দেহসুখে সে বিরতি অথবা ছেদ, কোনোটাই চায়নি। বিদূষকও এমন রমণীর অসংখ্য আসঙ্গ-আসনের মধ্যে দিয়ে স্বর্গসুখে মদির হয়ে থেকেছে।

যে তারুণ্যের উপচার সাজিয়ে বিদ্যাধরীরা হয় দেবভোগ্যা, তা নিঃশ্বেষ করে দিচ্ছে বিদূষক উপভোগে। স্থূলশরীরী মানব যে সূক্ষ্মশরীরী কামিনীকে আকর্ষণ করে রেখে দিতে পারে, বিদূষক-আখ্যান তার উৎকৃষ্ট

প্রমাণ।

এদিকে কুলীন শ্রেষ্ঠা বিদ্যাধরী ভদ্রার নিরবচ্ছিন্ন আসঙ্গ-প্রীতির কাহিনি সোরগোল তুলেছে বিদ্যাধর জগতে। ঈর্ষায় চঞ্চল অন্যান্য বিদ্যাধরীরা শলাপরামর্শ করে যোগেশ্বরী নাম্নী এক অপরূপা বিদ্যাধরীকে পাঠালে ভদ্রার কাছে। সূক্ষ্মলোক থেকে যেন মূর্ত হল এক অলোকরশ্মি। মন্দির ঝলসে গেল তার রূপের আগুনে।

সে বললে ভদ্রাকে, করছ কী? তুমি না বিদ্যাধরীদের মুকুটের মণি? মনুষ্যলোকে আসক্তি তো তোমাকে মানায় না! তুমি তো রক্ত-মাংসের পৃথ্বী-কামিনী নও যে পৃথিবীর মানুষকে দিয়ে শরীরের প্রতিটি অণুপরমাণুতে রতি-প্লাবন ঘটিয়ে যাবে! ছিঃ ছিঃ ! নিজেকে অপবিত্র করেছ নর-সান্নিধ্যে, মানবিক কামে, নাম ডুবিয়েছো বিদ্যাধরদের। নিজে অপবিত্র তো হয়েইছ। কলঙ্কের ভাগীদার করেছ আমাদেরকেও। কিন্তু এই কামকেলী যদি এখনও অব্যাহত রাখো, তোমার সমূহ ক্ষতি হবে। বিদ্যাধরী নামের অযোগ্য হয়ে গেলে বিদ্যাধর-ভুবনে তোমার ঠাঁই হবে না। ভদ্রা, তুমি পালাও। নিজেকে ফের শুচিস্নিগ্ধ করে তোল। নীচ সংসর্গে তুমি এখন অস্পৃশ্যা। শোধনের জন্যে যাও পূব সাগর পেরিয়ে কর্কোটক নগরে। সেখানে আছে এক পবিত্র নদী। সেই স্রোতস্বিনীর নাম শীতোদা। নদীর অপর পাড়ে দেখতে পাবে অতি উচ্চ এক পাহাড়। এত উঁচু যে বিদ্যাধররাও সে পাহাড় পেরিয়ে যেতে পারে না। পাহাড়টার নাম উদয়গিরি। তুমি অবিলম্বে প্রস্থান করো সেই মহাপর্বতে, আত্ম-শোধনের জন্যে। তুমি এখন ভ্রষ্টা। নষ্ট বিদ্যাধর। মনুষ্যলোকে এত আসক্তি তোমার অধঃপতন ঘটিয়েছে। স্থূল কার তোমার সূক্ষ্মতার সর্বনাশ করে ছেড়েছে। পালাও, পালাও ভদ্রা, অবিলম্বে চম্পট দাও। এই পরমসুন্দর পুরুষকে বলে যাও, যাচ্ছ কোথায়, তাহলে সে উদ্বেগমুক্ত থাকবে। উদ্যোগী হয়ে খুঁজে খুঁজে উদয়গিরি চলে যাবে। সেখানে হোক তোমাদের মিলন আর রমণ, এখানে নয়। এই মহাশ্মশানের দূষিত পরিবেশে নয়।

যোগেশ্বরীর তীব্র বাক্য প্রহারে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিল ভদ্রা। সে যেন ঘোরের মধ্যে ছিল এতদিন, কথার চাবুকে কেটে গেল সেই ঘোর। কিন্তু কাটল না মানুষের শরীরের অতি প্রবল তৃষ্ণা। স্থূল শরীরের আকর্ষণ যে এত প্রবল হতে পারে, ভূলোকের রক্তমাংসের টান যে ভুবর্লোকের সূক্ষ্ম দেহধারিণীদের টেনে নামিয়ে রাখতে পারে, এমন ঘটনা তো কখনও ঘটেনি।

মানব বিদূষক তাই ভয় ধরিয়েছে বিদ্যাধরলোকে। ভয় পেয়েছে ভদ্রা নিজেও। অথচ বিদূষককে ভুলে যেতে চাইছে না। বিদূষকও যে তাকে ভুলে যাক, তাও ভাবতে পারছে না।

না, না, না। বিদূষককে তার চাই। আবার চাই। চিরকালের জন্যে চাই। কিন্তু এই মুহূর্তে বিদ্যাধর-জগতের শাসন মেনে চলাই শ্রেয়। যাওয়া যাক মহাপর্বতে। কিন্তু একটা আংটি পরানো থাক বিদূষকের অনামিকায়। ভদ্রা অন্তর্হিত হোক। এই অঙ্গুরীয়েই স্মরণ করিয়ে দেবে বিদূষককে, তার জীবনে এসেছে বিশ্বজগতের সেরা ললনা, বিদ্যাধরী ভদ্রা। তাকে অনুক্ষণ মনে করিয়ে রাখবে, অতুলনীয়া এই কামিনী এখন রয়েছে উদয় পাহাড়ে। পুনর্মিলন হবে সেখানে, পবিত্র পরিবেশে, চিরকালের জন্যে।

আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল বিদূষক। তার দৃষ্টিপথের বাইরে সূক্ষ্মতর মূর্তিতে যোগেশ্বরী আর ভদ্রার কোনও কথাবার্তাও শোনেনি, দেখতেও পায়নি যোগেশ্বরীকে। সে জানে তার জ্যোতির্ময়ী রূপলাবণ্যকে কীভাবে প্রচ্ছন্ন রাখতে হয় মানুষ-সুন্দরের সামনে।

অকস্মাৎ ঘোর কেটে গেছিল বিদূষকের।

মন্দির সহসা নিষ্প্রভ হয়ে গেল কেন? কোথায় গেল সেই দিব্যজ্যোতি? রূপের বর্ণ আর আলোক?

নেই...নেই...ভদ্রা নেই মন্দিরে।

ছুটে বাইরে এসেছিল বিদূষক। মহাশ্মশানের ভয়াবহতা বিপুলতর ধাক্কায় তার সম্বিৎ ফিরিয়ে এনেছিল পুরোপুরি।

এ তো উজ্জয়িনীর শ্মশান! সে এখানে কেন?

সহসা ঝিকমিকিয়ে উঠেছিল অনামিকার অঙ্গুরীয়। নিমেষে অতীত ঝলক তুলে গেছিল তার স্মৃতির পর্দায়।

সে যে ভদ্রার স্বামী। অনাস্বাদিতপূর্ব দেহমিলন আকাঙ্ক্ষার আগুন এখনও শিখা জ্বালিয়ে রেখেছে পঞ্চভূতময় এই কলেবরে! ভদ্রা বিহনে এ জীবন বৃথা। ভদ্রাকে তার চাই।

অঙ্গুরীয় অদৃশ্য বিকিরণ মারফত সে সংবাদও আনল তার গোচরে। ভদ্রা এখন আছে কোথায়। তা তার মনের পটে অক্ষরে অক্ষরে লেখা হয়ে গেল।

উদয়গিরি। মহাপর্বত উদয়গিরিতে এই মুহূর্তে অবস্থান করছে ভদ্রা, তার প্রতীক্ষায়।

এই আংটিই বর্ণময় বিচ্ছুরণের পথ দেখিয়ে বিদূষককে নিয়ে যাবে সেখানে, প্রিয়ামিলন হবে সেখানে।

কঠোর সংকল্প দৃঢ় করে দিয়েছিল বিদূষককে। আশ্রয় নিয়েছিল চাতুরীর।

স্ববেশে নয়, ধরা পড়ে যাবে উজ্জয়িনী রাজার লোকজনের হাতে। কিশোরী বধূ মধুময়ী ঠিকই কিন্তু ভদ্রা যে আসবময়ী। তার কাছেই যাওয়া যাক, ছদ্মবেশে।

কিন্তু স্বপ্নতুল্য স্মৃতিগুলো যেন কুহেলিকার মতো ভরিয়ে রেখে দিল অন্তর জগৎ। এ কি ভোজবাজি? অনিন্দ্যসুন্দরী দিগ্বসনা ভদ্রা নিরন্তর নিমগ্ন রেখেছিল তাকে কাম সায়রে....

অতর্কিতে কিছু নেই মতিভ্রম নিশ্চয় নয়। হাতের এই আংটি কল্পনাতীত সেই সুখ স্মৃতির প্লাবন বইয়ে দিয়ে যাচ্ছে কেন অন্তরের অন্তস্তলে? কেন উত্তাল করে তুলছে রুধির স্রোতকে? নারীদেহ যে এমন সুখাবহ হতে পারে, ইতিপূর্বে তা জানা ছিল না বিদূষকের।

জেনেছে যখন, তখন ওই নারীতনুই তার চাই। হোক সে বিদ্যাধরী। তার জন্যে যদি সাগর লঙ্ঘন আর পর্বতারোহণ করতে হয়, বিদূষক তা করবে।

নারী! তুমি বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃজন! তুমি ধারিণী, তুমি সংহারিণী, তুমি ধিকিধিকি কামের সঞ্চারিণী। তাই তুমি কামিনী। তোমাকে নমস্কার!

তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিদূষক তাই পরিকল্পনা রচনায় মন দিয়েছিল সর্বাগ্রে। হঠকারিতার পরিণাম হবে ভয়াবহ। স্বরূপে রওনা হলে সে ধরা পড়বেই রাজা আদিত্যসেনের বিশাল এই রাজ্যের কোথাও না কোথাও। এমনিতেই তার বীরত্বব্যঞ্জক সুদর্শন আকৃতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অতি সহজেই, তার ওপর সে রাজজামাতা, তাকে চেনে না এমন প্রজা এ রাজ্যে বিরল। সুতরাং, যুবক হয়ে যাক অশীতিপর বৃদ্ধ। রূপবদলের সহজতম পন্থা অবলম্বন করে মিশে যাক পাঁচজনের সঙ্গে। ধুলো দেওয়া যাক রাজপুরুষ আর চরদের চোখে।

তাই সুন্দরদেহী বিদূষক নিজেকে অসুন্দর করে তুলল বিবিধ উপায়ে। সটান শিরদাঁড়া এখন বেঁকে ঝুঁকে থাকায় অসাধারণ উচ্চতার চিহ্নমাত্র রইল না। শ্মশান থেকে কুড়িয়ে নিল অনেকগুলো শতছিন্ন কাপড়। সেগুলোকে গিঁট দিয়ে দিয়ে বেঁধে বানিয়ে নিল এমন একখানা বস্ত্র যা ভিক্ষুক ছাড়া কারও পরনে থাকে না। শ'খানেক গিঁট বাঁধা সেই কাপড় পরে, সেই কাপড় দিয়ে মাথা আর গলা মুড়ে, শ্মশানের ছাই মাখল চুলে, গালে, সর্বাঙ্গে। হাতে নিল একটা বেঁকা লাঠি।

অগ্নি-প্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন অসি তো সঙ্গে রাখা চাই। এই অসি তার নিত্য সঙ্গী। শ্রেষ্ঠ সহায়।

ন্যুব্জদেহী বৃদ্ধ শতাচ্ছিন্ন বস্ত্রের অন্তরালে সুকৌশলে লুকিয়ে রাখল অসাধারণ সেই অস্ত্র।

অতঃপর, যাত্রা হল শুরু। লাঠি ঠুকে ঠুকে, যেন প্রায়ান্ধ চক্ষু কিছুই ঠাহর করতে পারছে না। এমনি ভঙ্গিমায়, অনবদ্য অভিনয় সর্ব অঙ্গে প্রকট করে তুলে অগ্রসর হয়েছিল বিদূষক। সে যে বিদূষক, যা দুঃসাধ্য। সাধারণের কাছে অসম্ভব, সেই কাজেই ব্রতী হতে চায় তার তনুমন।

কিন্তু বিধি বাম থাকলে সকল প্রচেষ্টাই বিফলে যায়। বিদূষকের বিষম চাতুরি ব্যর্থ হয়ে গেল সেই কারণেই।

শ্মশান থেকে বেরিয়ে একটু যেতে না যেতেই খর নয়নে তাকে নজরে রেখেছিল কতিপয় অতীব ধুরন্ধর ব্যক্তি। তারা অতি-ছদ্মবেশের অন্তরালে ঠাহর করে নিয়েছিল এক দীর্ঘদেহী মানুষকে যে ক্ষিপ্রচরণকে গোপন

করতে চাইছে শ্লথতার অভিনয়ে। অতএব, ধরা পড়েছিল বিদূষক, নীত হয়েছিল রাজসভায়। বিদূষক তখন আর এক অভিনয়ের আশ্রয় নিয়েছিল। উন্মত্ততা।

সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি যদি অপ্রকৃতিস্থ সেজে থাকে স্বইচ্ছায়, তখন তার ছদ্মবেশ খসানো প্রকৃতই মুসকিল।

পাগলের চিকিৎসককেও বোকা বানানো যায়। মনকে দেখা যায় না। মনের রোগ আসল, না, নকল, তা ধরাও যায় না।

নিপুণ পাগল বিদূষকের আসল মনের চেহারা তাই অদৃশ্যই রয়ে গেল রাজবৈদ্যদের কাছে।

সেয়ানা পাগল বলেই মাত্র দুটি শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ মুখ দিয়ে বের করত না বিদূষক। সব জিজ্ঞাসাবাদেরই জবাব একটাই : 'হা ভদ্রে! হা ভদ্রে!'

বউ কোনও কথা জিজ্ঞেস করলেও 'হা ভদ্রে! হা ভদ্রে!'

দেশবিদেশের খ্যাতনামা চিকিৎসকদের প্রশ্নবর্ষণের জবাবও তাই : 'হা ভদ্রে! হা ভদ্রে!' শুষ্কবদনা রাজকন্যা ভালোমন্দ খাবার সাজিয়ে দিলে লাথি মেরে তা ফেলে দিয়ে 'হা ভদ্রে', ছেঁড়া বস্ত্র ছাড়িয়ে দামি কাপড় পরালেও তা খুলে ফেলে 'হা ভদ্রে, হা ভদ্রে'! গা ধুয়ে পরিষ্কার করে দিলেও পরক্ষণেই ধুলো নিয়ে গায়ে মাখতে মাখতে 'হা ভদ্রে! হা ভদ্রে!'

আস্ত উন্মাদ এমন মানুষকে রাজবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে আটকে রেখে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে না? এই কষ্টে উন্মাদের জীবনাবসান যদি ঘটে? মেয়ে যদি বিধবা হয়? তার চাইতে বরং ছেড়েই দেওয়া যাক বিদূষককে।

বদ্ধ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে গেলে নিশ্চয় সুস্থ বুদ্ধির প্রত্যাবর্তন ঘটবে। প্রকৃতিই হোক চিকিৎসক, নিশ্চয় ফিরিয়ে আনবে রোগমুক্ত বিদূষককে।

তাই, স্রেফ অভিনয়-নৈপুন্য দেখিয়ে মুক্তি পেল বিদূষক। যেখানে খুশি বেড়ানোর অনুমতি। কেউ তাকে অনুসরণও করল না, রাজাজ্ঞায়।

এই তো চাই! ভদ্রার জন্যেই তো পাগল সেজে ছিল বিদূষক। এবার তাহলে যাওয়া যাক ভদ্রার বর্তমান আলয়, উদয় পাহাড়ে। নিত্যসঙ্গী অগ্নি, অসি কিন্তু রইল সঙ্গে। এই একটি মাত্র বস্তু সে কাছছাড়া করে না কক্ষনো। অসি স্পর্শ করার সাহসও কারও হয়নি, তার রুদ্ররূপের ভয়ে। ওই তালঢ্যাঙা পাগল যদি তলোয়ার ঘোরাতে শুরু করে...

সুতরাং, অসিসমেত ভ্রমণে বেরোল বিদূষক, পেছনে অনুচরদের ছায়াও দেখতে পেল না। সোজা রওনা হল উদয়গিরি অভিমুখে, রাজবাড়ির দিকে আর নয়, তাকে পথ চেনাচ্ছে কে? হাতের আংটি। পাগলবেশী বিদূষক কিশোরী বধূ রাজকন্যাকে আংটি স্পর্শ করতেও দেয়নি পাছে আংটির অলৌকিকতা চলে যায়, এই ভয়ে। বোকা মেয়েটা বিদূষকের ঘুমের ঘোরেও আঙুল থেকে আংটি খসাতে পারেনি।

সেই আংটিই এখন তাকে সঠিক পথে টেনে নিয়ে গেল উদয়গিরি অভিমুখে। চুম্বক পাথরের চাইতেও শক্তিমান সেই অঙ্গুরীয়র মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে মায়াবতী ভদ্রার ইন্দ্রজাল। হুঁশ নেই বিদূষকের সে চলেছে...চলেছে...চলেছে! পেরিয়ে এল আদিত্যসেনের রাজ্য। পৌঁছোল পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্যে।

এইখানেই শুরু হল বিদূষক জীবনে আর এক বিচিত্র পর্ব।

নতুন রাজ্যে ঢুকেছিল বিদূষক বেশ রাতে। ঢুকেই দেখতে পেয়েছিল এক বুড়িকে। সটান তাঁর সামনে গিয়ে সবিনয়ে বলেছিল, মাগো, এদেশে এই নতুন এলাম। রাতটুকু আপনার ঘরে ঠাঁই দেবেন?

বৃদ্ধা বিদূষকের স্বজাতি। ব্রাহ্মণ। মানুষ দেখে চেনবার ক্ষমতা তাঁর আছে। দীর্ঘাকৃতি বিদূষকের চোখমুখের তেজ দেখেই বুঝেছিলেন, এমন মানুষকে রাতের অতিথি করা যায়, নিরাপদে।

তৎক্ষণাৎ নিয়ে গেছিলেন নিজের বাড়িতে। আগে খিদে-তেষ্টা মিটিয়েছিলেন। শরীরে জোর পেয়ে যখন সুস্থ বোধ করছে বিদূষক, তখন তার কাছে গিয়ে সোজাসুজি বলেছিলেন, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তুমি আমার ছেলের মতো। আমার বিষয়-সম্পত্তি তুমি নাও।

যেন আকাশ থেকে পড়েছিল বিদূষক, মা, কী বলছেন?

ঠিকই বলছি, বাবা, তাহলে শোনো—

বলে, এক অপূর্ব কাহিনি শোনালেন বৃদ্ধা।

আমার একটি ছেলে আছে। সুপুত্র। অথচ তাকে আমি হারাব বিনাদোষে। রাজার আদেশে।

তার প্রাণহানি ঘটবে কিন্তু অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে। এই ভাবেই এদেশের সোনার চাঁদ ছেলেদের একে-একে প্রাণ যাচ্ছে প্রতিরাতে।

রাজকন্যার ঘরে একরাত কাটানোর পর। বিয়ে আর হচ্ছে না। দুবার বিয়ে হয়েছে রাজকন্যার। দুবারই তার বর মারা গেছে রহস্যজনকভাবে। নিশুতি রাতে।

রাজকন্যার আর বর জুটছে না। বর করার জন্যে এক-একজনকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রোজ রাতে। রাত পোহালেই অদ্ভুতভাবে সে চলে যাচ্ছে পরলোকে।

কাল রাতে পালা এসেছে আমার একমাত্র ছেলের।

ছেলেই যদি না থাকে, তাহলে এই বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করবে কে? আমি? না। আমি মৃত্যুর পথ বেছে নেব ছেলের মৃত্যুর আগেই। তার আগেই দলিলপত্র করে, সব তোমাকে দিয়ে যেতে চাই। তুমি মহৎ। তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি। তোমার দেহের কান্তি তোমার মনের প্রভা। আমার ছেলের সমান।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল এইভাবে :

আমাদের বাজার মেয়ের মতো রূপসী কন্যা গোটা পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। যেমন রূপবতী তেমনি গুণবতী। রাজপুত্রী বলে কোনও দেমাক নেই। কিন্তু ভাগ্য তাকে মেরেছে।

যুবতী মেয়ের প্রথম বিয়ে দেওয়া হয়েছিল কচ্ছ দেশের এক রাজার সঙ্গে। কিন্তু কী আশ্চর্য! বিয়ের রাতেই বাসরঘরে মারা গেল নতুন জামাই।

কিছুদিন পরে ফের মেয়ের বিয়ে দিলেন রাজা আর এক রাজকুমারের সঙ্গে।

একইভাবে অদ্ভুত মৃত্যু ঘটল বাসর রাতে। দ্বিতীয়বার বিধবা হল রাজকন্যা।

আমাদের রাজার নাম দেবসেন। তাঁর মেয়ের দুর্ণাম ছড়িয়ে গেছে দেশে দেশে। কেউ আর অর্ধেক রাজত্বের বিনিময়েও ওই মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছে না।

রাজা তখন খেপে গেলেন। সেনাপতিকে হুকুম দিয়েছেন, রোজ একজন বামুনের অথবা ক্ষত্রিয়ের ছেলেকে ধরে এনে রাজকন্যার ঘরে রাখবে। যে প্রাণে বাঁচবে, তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবো।

সেই থেকে রোজ রাতে একটা করে জোয়ান ছেলেকে ঢোকানো হচ্ছে রাজার মেয়ের ঘরে। সকাল হতেই দেখা যাচ্ছে, সে মরে পড়ে আছে।

কাল পালা এসেছে আমার একমাত্র ছেলের। সেনাপতি তাকে ধরে নিয়ে যাবে আমিও ঠিক করেছি, তার মরণের খবর শোনবার আগেই যেন আমার মরণ হয়। আগুনে পুড়িয়ে মারব নিজেকে।

পরোপকারী বিদূষকের প্রাণ কেঁদে উঠেছিল মর্মান্তিক এই কাহিনি শুনে। সেই সঙ্গে জাগ্রত হয়েছিল দুর্নিবার কৌতূহল। মারণ-গ্রহ হানা দিয়ে যাচ্ছে রাজকন্যার শোবার ঘরে ঠিক সেই রাতে, যে-রাতে তার ঘরে উপস্থিত রয়েছে পাণিপ্রার্থী এক যুবক। আশ্চর্য ব্যাপার তো! তদন্ত প্রয়োজন।

বিদূষক নিজের প্রাণের পরোয়া করে না। তার দুঃসাহস ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। বুড়ি ব্রাহ্মণের দান সে নিল না। শুধু বললে, আপনার ছেলে আপনার ঘরেই থাকুক। তার বদলে আমি কাল যাব রাজকন্যার ঘরে। দেখি কী করে মরণ হয় আমার।

এমন আশ্চর্য কথা কে কবে শুনেছে? যেচে নির্ঘাৎ মৃত্যুর সঙ্গে টক্কর দিতে চাইছে?

বুড়ির কোনও কথা কানে তোলেনি বিদূষক, পরের দিন সকালে রাজার সেনাপতি আসতেই বলেছিল, আমি বিদেশি ব্রাহ্মণ। রাজকন্যার ঘরের উৎপাত নিবারণ করার একটা সুযোগ চাই। আমাকে নিয়ে যাবেন আজ রাতে। সেনাপতি নিজে বীরপুরুষ। কিন্তু এমন মহাবীর সে কখনও দেখেনি। সবাইকে ধরে বেঁধে নিয়ে যেতে হয়। এই মানুষ নিজে মরতে যেতে চাইছে! আশ্চর্য!

সন্ধ্যা হল। সেনাপতির সঙ্গে বুক ফুলিয়ে রওনা হল বিদূষক, কোমরে বেঁধে নিয়েছে সেই তরবারি, অগ্নির দেওয়া ভয়ংকর অসি।

রাত হল। বিদূষককে ঢুকিয়ে দেওয়া হল রাজকন্যার শোবার ঘরে।

ঢুকেই থ হয়ে গেছিল বিদূষক। রাজকন্যা তো নয়, অগ্নিকন্যা। এত রূপ বিদ্যাধরী ভদ্ররও আছে কিনা সন্দেহ। যৌবন যেন ফেটে ফেটে পড়ছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত। চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র যেন ঝলমল করছে ভূষণ আর বসনে। দুই চোখে যেন দু-টুকরো কমল হিরে। সুচারু অধরে নীরব কামনা, পয়োধরায় কামনার কান্না। আজও তো শৃঙ্গার সুখের আস্বাদ পায়নি। হিরে-চোখে টলটল করছে অশ্রু। সব মিলিয়ে কামদেবের কামাগ্নি পত্নী রতিকেই লজ্জা দেওয়ার অনবদ্য রূপের জেল্লা।

আশ্চর্য! আশ্চর্য! আশ্চর্য! এমন মেয়ের বিয়ে-করা বর অথবা ভাবী বর বাঁচে না। বিষকন্যা বলে তো মনে হয় না! তবে?

মাথার মধ্যে প্রহেলিকার ঘূর্ণিঝড় নিয়ে কন্যার পালঙ্কের একপাশে বসল বিদূষক। নিত্যসঙ্গী অগ্নি-অসি রাখল পাশে। কোষমুক্ত করে।

ছলছল চোখে বিদূষকের দিকে চেয়ে আছে মূর্তিময়ী কামনা, পালঙ্কের অপর পাশে। অঙ্গের প্রতিটি লোমরন্ধ্রে বাসনার বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে, কাম-তাপে জ্বলে যাচ্ছে বিদূষক, অথচ আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় মৃত্যুরূপিনী রতিশ্রেষ্ঠাকে স্পর্শ করতে পারছে না।

অতিক্রান্ত হল রাত্রির প্রথম প্রহর। থমথম করছে বিশাল ঘর। চারদিকে থরে থরে সাজানো কুবেরের সম্পদও যেন ম্লানজ্যোতি হয়ে গেছে কালান্তরের আগমন প্রতীক্ষায়।

চোখে চোখ চেয়ে আছে দুই রমণাভিলাষী পরস্পরের পানে। কামাগ্নির ধিকিধিকি প্রজ্বলন শুরু হয়েছে দুজনেরই অণুপরমাণুতে। উত্তাল হয়েছে শোণিত প্রবাহ। এই উত্তেজনার প্রশমন ঘটে শুধু যৌবনপুষ্ট দুটি দেহের নিবিড় মিলনে। কিন্তু...

শুরু হল যামিনীর দ্বিতীয় প্রহর।

মধু-যামিনী যদিও নয়। তবুও...

অতিক্রান্ত হল দ্বিতীয় প্রহর। রাজপুত্রীর চোখ এখন বিলক্ষণ বাঙ্গময়? নীরব আহ্বান জানিয়ে চলেছে বিদূষককে, যা হয় হোক। এসো আর্যপুত্র, মরণের আগে ভোগ করে যাও আমাকে। নিংড়ে নাও, ক্ষতযুক্ত করো আমার বাসনার দেহ-বিন্দুগুলোকে, ফণা তুলুক কাম ভুজঙ্গ!

বিদূষক কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে অতীব সংযমী। ব্রহ্মাণ্ডের কোনও প্রলোভনই তাকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারে না সঙ্গীন সময়...

আচমকা শোনা গেল ভীষণ এক শব্দ!

চমকে দেখল বিদূষক, মস্ত ঘরের সবকটা বাতায়ন, কপাট খুলে গেল একই সঙ্গে।

ভয়ংকর সেই শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে পালঙ্কে লুটিয়ে পড়েছে রাজকন্যা।

সিধে হয়ে বসে রয়েছে ক্ষিপ্ত বিদূষক। নিথর। এক হাত কোষমুক্ত তরবারির ওপর। ভৌতিক কাণ্ডের কারণ অন্বেষণে যুগপৎ ব্যস্ত তার চক্ষু আর মগজ।

আওয়াজের তরঙ্গে থরথর কাঁপছিল ঘর। ঝনঝন করে কাঁপছিল সমস্ত আসবাব। একটু একটু করে অখণ্ড নৈঃশব্দ ফের চেপে বসল বিশাল ঘরে। আবার শোনা গেল একটা প্রলয়ংকর শব্দ...এবার বিশেষ একটা জানলার! সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে চোখ ঘুরিয়েছিল বিদূষক। এবং শান্ত হয়ে গেছিল!

কারণ, জানলার বাইরে শূন্যে ভাসছে এক ভীষণদর্শন দৈত্য। দুটো হাতকে প্রসারিত করেছে জালার মধ্যে দিয়ে মূর্চ্ছিতা রাজকন্যার দিকে।

পরক্ষণেই ভুলটা বুঝে নিয়েছিল বিদূষক। ভীষণ দুই হাতের লক্ষ্য রাজকন্যা নয়, বিদূষক স্বয়ং।

অতএব আর দেরি নয়। শক্ত মুঠোয় তরবারির হাতল ধরে ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠেছিল বিদূষক। ভয় জিনিসটা তার ধাতে নেই কস্মিনকালেও। আর এখন? প্রতি হাতের বিভীষিকা চিরতরে বন্ধ করার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ।

দৈত্য-হস্তও থমকে গেছিল ক্ষণেকের জন্যে তার সেই রণমূর্তি দেখে। পরক্ষণেই বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে এসেছিল মুঠোর মধ্যে বিদূষককে ধরবার জন্য।

তখন...

বিদ্যুৎবেগে পালঙ্ক থেকে ছিটকে গেছিল বীর বিদূষক। আতঙ্কে স্নায়ু অসাড় হয় না তার কক্ষনো এই মুহূর্তে আতঙ্কসঞ্চারী ওই দৈত্যহস্ত সহস্রগুণ শক্তি আর সাহসের সঞ্চার ঘটিয়েছে তার মস্তিষ্কে, বাহুতে, সর্বদেহে। সে নিজেই এখন মূর্তিমান কালান্তক। ডান মুষ্টিতে ঝলকিত হচ্ছে অগ্নি-অসি। যেন বিদ্যুৎ-শিখার মতোই ধেয়ে গেছিল ইয়া-মোটা দৈত্য-মণিবন্ধের দিকে।

মোক্ষম এক কোপে ছিন্ন হয়েছিল কবজি। পাঁচখানা আঙুল সমেত মস্ত পা ছিটকে গেছিল পালঙ্কে।

নিদারুন যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠেছিল সাক্ষাৎ মৃত্যু, সেই দৈত্য। এতাবৎকাল বহু মনুষ্য নিপাত করেছে, কিন্তু এহেন নির্ভীকের এমন তরবারি চালনা কক্ষনো দেখেনি।

বিষম যন্ত্রণায় বিকট আর্তনাদ করে, নিমেষে সে কাটাহাত টেনে নিয়েছিল জানলার বাইরে। চম্পট দিয়েছিল চক্ষের নিমেষে।

হাতকাটা নিশাচর আর হানা দেয়নি রাজকন্যার ঘরে এরপর থেকে। কোনওদিনও না।

এত যে কাণ্ড ঘটে গেল শয়কক্ষে, তার বিন্দুবিসর্গ জানতে পারেনি রাজকন্যা। সে বেহুঁশ হয়েই লুটিয়েছিল প্রকাণ্ড পালঙ্কে...

হুঁশ ফিরেছিল পরের দিন উষালগ্নে। দুগ্ধফেননিত পর্যঙ্কে রুধিরসিক্ত ছিন্ন পাঞ্জা সে বিষম ত্রাসে শিউরে উঠেছিল।

বিভীষিকার বৃহত্তম কারণ, কাটা পাঞ্জা মনুষ্যহস্তের নয়, নির্ঘাৎ কোনও দৈত্যের।

বিস্ফারিত চক্ষু রাজকন্যার বুকফাটা চিৎকার আর, আপাদই মস্তকের বিপুল কাঁপুনি দেখে বিদূষক বিব্রত করেছিল রাত্রি নিশীথে কী ঘটেছিল এই শয়নকক্ষে। হানাদার দৈত্য এখন পলাতক, দৈত্য-হস্ত তাকে মুষ্ঠিগত করবার প্রয়াসে পাঁচ আঙুল মেলে দিতেই অগ্নি-অসি।

সুতরাং, আজ থেকে হে নক্ষত্ররূপিনী ললনা, তুমি নিরাপদ। স্বচ্ছন্দে জীবনসঙ্গী করে নিতে পার যে কোনও পুরুষকে, এমনকি আমাকেও, কেন না, হে কন্যা, নিযুত কাম-স্ফুলিঙ্গ তুমি রচনা করে গেছ আমার অঙ্গের অণু-পরমাণুতে, রক্তি এনেছে আসক্তি, অবসান ঘটাবে কে? তুমি! তুমি!

নির্নিমেষ নয়নে বিদূষককে দেখে যাচ্ছিল পরমাসুন্দরী। কে এই যুবক? রতিপতির মতো সুন্দর। বাচনভঙ্গীতে কামানল প্রজ্বলনের নিপুণ কৌশল, ছদ্মবেশী কোনও সুরসুন্দর নয় তো? দানব-জখম তো মনুষ্যের কর্ম নয়।

ডান মুষ্টিতে ঝলকিত হচ্ছে অগ্নি-অসি। যেন বিদ্যুৎ-শিখার মতোই ধেয়ে গেছিল ইয়া-মোটা দৈত্য-মণিবন্ধের দিকে।

রাজা দেবসেন এলেন। সব শুনলেন। সেই দণ্ডেই বিদূষককে জামাই করে নিলেন।

তিন নম্বর বউকে নিয়ে নতুন শ্বশুরবাড়িতেই থেকে গেল বিদূষক। সে রক্তমাংসের মানুষ। নিষ্কাম অবশ্যই নয়। বাহুবলে অর্জন করা অর্ধসঙ্গিনীর অঙ্গে অঙ্গ সমর্পণ করতে মন তো তার চাইবেই। এই সময়ে পুরুষমাত্রই আত্মবিস্মৃত হয়, জগৎ বিস্মৃত হয়, কামাগুণে পরস্পরকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চায়।

বিশেষ করে নতুন বউকে।

ভদ্রা তাই বিস্মরণে চলে গেছিল এই সময়ে।

আচমকা একদিন হাতের আংটির দিকে চোখ পড়েছিল বিদূষকের এক নারীদেহের ইন্দ্রজাল আর এক নারীর ঐন্দ্রজালিক অঙ্গুরীয়র ক্ষমতা খর্ব করে রেখেছিল নিশ্চয় এতদিন।

সহসা এক প্রভাবে ঘুম-ঝরানো চোখ মেলতেই অনামিকার অঙ্গুরীয় ঝকিত হয়েছিল চোখের সামনে। নিমেষমধ্যে ঘোর কাটিয়ে উঠেছিল বদুষক। স্মৃতিপথে উদ্দাম হয়েছিল ভদ্রা...বিদ্যাধরী ভদ্রা... তার তুলনাবিহীন রূপ আর সম্মোহিনী শরীর সুখের সূক্ষ্ম আকর্ষণ।

ফলে সারাদিন যেন উন্মাদ হয়েই রইল বিদূষক। প্রেমে উন্মাদ। বিদ্যাধরীর প্রেম। মুনিরও মাথা টলিয়ে দেয়, শক্তি খসিয়ে দেয়। ইন্দ্রের শ্রীঅঙ্গে সহস্রচক্ষুর আবির্ভাব ঘটায়.... অথবা, সহস্রযোনি চিহ্নর।

বিদূষকেরও অন্তরের অম্বরে ভেসে উঠেছিল নিশ্চয় এই জাতীয় সহস্র চিহ্ন।

ফলে তার প্রতিটি রুধির কণায় প্রজ্বলন্ত হয়েছিল নজির বিহীন কামস্পৃহা। সারাটা দিন ছটফট করেছে। নিরন্তর কামিনী-সান্নিধ্যে দেহানলের কিঞ্চিৎ প্রশমন ঘটিয়েছে, কিন্তু মোহিনী নিশীথিনী এসে রঙ্গিনী অর্ধাঙ্গিনীর চোখে ঘুমের পরশকাঠি বুলিয়ে দিতেই মায়াবতী বিদ্যাধরীর প্রবলতর আকর্ষণে চুপিসাড়ে গৃহত্যাগ করেছে বিদূষক। প্রেম পাগল মানুষটা একরাত্রেই পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে গেছে। অবিরাম হাঁটতে হাঁটতে, কুহকিনী ভদ্রাকে মনের চোখে নিরন্তর ভাসিয়ে রেখে, একসময়ে প্রবেশ করেছে তাম্রলিপ্ত শহরে।

তাম্রলিপ্ত একটা বন্দর-শহর। এখান থেকেই সমুদ্রযাত্রা শুরু করে দুঃসাহসী সওদাগররা বহুদূরের দ্বীপসমূহের দিকে, রত্নাকরের বুকে ভেসে যায় রত্নের আহরণ কামনায়।

বিদূষকের কামনা কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। সে-ও চায় রত্ন। কামিনী রত্ন। শুধু ভদ্রাকে।

তাই, ভদ্রা-প্রদত্ত আংটিই তাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে এসেছে এই নগরে।

খোঁজখবর নিয়ে এইখানেই আলাপ জমিয়ে নিল সওদাগর স্কন্দদাস-এর সঙ্গে। নিবিড়তর হলো বন্ধুত্ব। তারপর যেদিন স্কন্দদাস জাহাজ ভাসাল সমুদ্রের দিকে, সেদিন সেই জাহাজেই উঠে বসল বিদূষক।

কিন্তু বিঘ্নহীন হল না সমুদ্র-যাত্রা। জাহাজ হঠাৎ আটকে গেল এমন একটা জায়গায় যেখানে সমুদ্র বেশ গভীর। চড়া থাকার কথা নয়।

অথচ জাহাজ আর নড়ছে না। বড়ো বড়ো ঢেউ আশপাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, জাহাজ কিন্তু ঢেউ-এর তালে তালে উঠছেও না, নামছেও না, স্থির হয়ে রয়েছে একই জায়গায়।

এ তো বড়ো তাজ্জব ব্যাপার! ঘাম দেখা দিল বণিক স্কন্দদাসের ললাটে। সে ব্যবসা বোঝে। মূল্যবান পণ্যসামগ্রী নিয়ে যাচ্ছে দ্বীপে দ্বীপে লাভের আশায়। কিন্তু স্বয়ং রত্নাকর যদি রত্নবোঝাই অর্ণবপোতকে আটকে রেখে দেয়, তাহলে তো পথে বসতে হবে!

বিরাটকায় এক পুরুষ চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে সমুদ্রের তলায়। হাঁটু মুড়ে। জাহাজের খোল উঁচু করা দুই হাঁটুর মাঝখানে আটকে রয়েছে।

সুতরাং, হায় হায় করতে লাগল স্কন্দদাস। তখনই নজর গেছিল মহাবীর বিদূষকের দিকে। তার টান-টান শরীর, সাহসদীপ্ত দুই চক্ষু আজ কটিবন্ধের অসি দেখে মগ্ন হয়েছিল, এই মানুষটা হয়তো লড়ে যেতে পারে অতলজলের বিভীষিকার সঙ্গে। মুক্ত করতে পারে জাহাজের তলদেশ।

তাই তৎক্ষণাৎ ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, এই বিপদ থেকে যে আমাকে বাঁচাবে, তাকে আমি এই জাহাজের সমস্ত সোনাদানা, মণিমুক্তো, দামি দামি জিনিস দিয়ে দেব। সেটা হবে যৌতুক। কারণ, তার সঙ্গেই বিয়ে দেব আমার একমাত্র মেয়ের। তার মতো সুন্দরী ত্রিলোকে নেই। তাকে দেখলে আকাশের বিদ্যুৎ থমকে যায়, জ্যোৎস্নার চাঁদ লজ্জা পায়, সুরসুন্দরীরা ঈর্ষায় জ্বলে মরে।

পর পর তিন-তিনজন রূপের রানির বর হওয়ার পরেও বিদূষকের নিশ্চয় লোভ হয়েছিল বণিক-কন্যাকে বিয়ে করার। রূপবতী, রসবতী, যৌবনবতী স্ত্রী একাধিক থাকলে ক্ষতি কী?

স্কন্দদাসের ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাই সে বলে উঠেছিল আমি রাজী! দড়ি নামাও জলে। দড়ি ধরে নেমে যাই জলে। দেখে আসছি কোথায় আটকিয়েছে জাহাজের খোল।

তাই হয়েছিল। নাবিকেরা দড়ি ধরে বসে রইল জাহাজে। বিদূষক দড়ি পাকড়ে মটামট নেবে গেল সাগরের জলে।

একটু নেমেই দেখল, কীসে আটকেছে জাহাজ। দেখে তো তার চক্ষুস্থির।

বিরাটকায় এক পুরুষ চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে সমুদ্রের তলায়। হাঁটু মুড়ে। জাহাজের খোল উঁচু করা দুই হাঁটুর মাঝখানে আটকে রয়েছে।

কটিবন্ধের অসি বের করেছিল বিদূষক। ভয়ানক দুই কোপে উড়িয়ে দিয়েছিল জল দানবের দুই জঙ্ঘাশীর্ষ। নিমেষে মুক্ত হয়ে গেছিল বাণিজ্যপোত।

এইবার দড়ি টেনে তাকে তুলে নেবে নাবিকরা। এই রকম ব্যবস্থা করেই জলে নেমেছিল বিদূষক।

কিন্তু কাজ হাসিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর-চূড়ামণি স্কন্দদাস হুকুম দিয়েছিল নাবিকদের, দড়ি ফেলে দাও জলে।

অর্থাৎ, টেনে তোলার দরকার নেই বিপদ উদ্ধারকারী সঙ্গীকে। তুললেই তো জাহাজভর্তি সম্পদ তাকে দিতে হবে, সেই সঙ্গে রূপসী কন্যাকে।

মনিবের হুকুম তামিল করেছিল বেতনভোগী নাবিকরা। দড়ি ফেলে দিয়ে জাহাজ ভাসিয়ে নিয়ে গেছিল দূর থেকে দূরে! যথাসময়ে পৌঁছে গেছিল যেখানে যাবার কথা, সেইখানে।

কিন্তু বিদূষক? তার কি সলিল-সমাধি ঘটলো অবশেষে?

এক্কেবারে না।

দড়িতে টান মেরে সে সংকেত করেছিল এবার তাকে টেনে তোলা হোক। ডুবুরিরা যা করে।

কিন্তু সংকেত ব্যর্থ হল। অকস্মাৎ শিথিল হয়ে গেল টান-টান রশি। তারপরেই তালগোল পাকিয়ে নেমে এল জলের মধ্যে।

ঘোড়েল স্কন্দদাসের কুঅভিসন্ধি এতক্ষণে সুস্পষ্ট হল বিদূষকের কাছে। রাগও হয়েছিল নিজের ওপর। মেয়ের আর সম্পত্তির লোভ দেখিয়ে তার মতো বুদ্ধিমান বীরপুরুষকে টেক্কা মেরে গেল এক ধনকুবের বণিক! অর্থপিশাচ, নেমকহারাম, কুচক্রী!

কিন্তু জলের মধ্যে তা নিয়ে মাথা খারাপ করে তো লাভ নেই। আগে বাঁচাতে হবে নিজেকে।

সাঁতার কেটে জলের ওপর ভেসে উঠল বিদূষক। জাহাজের ছায়াও দেখতে পেল না দূর দিগন্তে।

মায়া-দানবের কাটা জঙ্ঘাদুটো কিন্তু ভেসে উঠেছে তার পাশে। সেইসঙ্গে ভাসছে দড়ির রাশি।

নিমেষে উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করেছিল বিদূষক। দড়ি দিয়ে জঙ্ঘা দুটোকে পেঁচিয়ে বেঁধে বানিয়ে নিয়েছিল ভাসমান ভেলা। মায়া-দানবের জঙ্ঘা বলেই বোধহয় ফের জলে ডুবে যায়নি। অথবা হয়তো দৈব সহায় হয়েছিল। মায়া-আংটির শক্তির প্রসাদও থাকতে পারে এই ঘটনার মধ্যে।

কাটা জঙ্ঘার ভেলায় বসে দরিয়ায় পাড়ি জমিয়েছিল বীর বিদূষক নিঃশঙ্ক মনে, সে জানে, সে বিশ্বাস করে, ভদ্রা তাকে বাঁচাচ্ছে, তাকে টানছে, তাকে নিয়ে যাচ্ছে উদয় পাহাড়ের দিকে। প্রিয়ামিলন ঘটবেই যখন, তখন দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধে বসে থাকা যাক।

সমুদ্র পেরিয়ে তীরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা হয়ে গেছিল, কাটা জঙ্ঘা কার কৃপায় ভেসে এসে পৌঁছেছে তীরে।

আকাশে সহসা শোনা গেছিল দৈববাণী, বিদূষক, প্রীত হলাম তোমার উপচিকীর্ষা আর দুঃসাহস দেখে। যা চাইছ, তা পাবে আর একটু গিয়ে কর্কোটক নগরে। আমার পরিচয় জানতে চাও? আমিই সেই অগ্নিদেব, যার অসি রয়েছে তোমার কোমরবন্ধে।

গমগমে আকাশবাণী দূর হতে দূরে মিলিয়ে যেতেই নব উৎসাহে অগ্রসর হয়েছিল বিদূষক। ভগবান যার সহায়, তার ভয় কী?

তবে হ্যাঁ, রমণীরত্নে লোভ করাটা সমীচীন হয়নি। প্রায়শ্চিত্ত তো হয়ে গেল মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষে!

একটানা সাতদিন হেঁটে পৌঁছেছিল কর্কোটক নগরের উপান্তে এক বিদ্যানুশীলন মঠে। রাজার টাকায় তৈরি মঠে পড়তে আসে দেশবিদেশের শাস্ত্র-অনুরাগীরা। নবাগত অতিথিকে বিলক্ষণ আপ্যায়ন করেছিল মঠের অধ্যাপকরা।

তখন সন্ধ্যে হচ্ছে। হঠাৎ শোনা গেছিল ঢেঁড়া পিটে রাজার ঘোষণা : রাজার জামাই যে হতে চায়, সে যেন আজ রাত কাটিয়ে যায় রাজকন্যার ঘরে।

শুনেই খটকা লেগেছিল বিদূষকের! এই তো কদিন আগে রাজ-ইচ্ছায় সে রাত কাটিয়েছিল পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের রাজকুমারীর ঘরে। দু-দুবার বিধবা সেই হতভাগিনীর ঘরে যে রাত কাটিয়েছে সে-ই রাত ভোর হওয়ার আগে মরেছে।

বিদূষক কিন্তু সেখানে রাতে থেকেছে, উড়ন্ত দানবের ডান হাত কেটে নিয়েছে, পরের দিন সেই কন্যাকেই বিয়ে করেছে। সে-ই তার তৃতীয় বিয়ে।

এখানেও আবার একই ঘটনা ঘটছে নাকি?

বেপরোয়া বিদূষক বললে মঠের অধ্যক্ষকে, আমি যাব।

তিনি বললেন, যেও না।

কেন?

ঢেঁড়া শুনে এর আগে যারা গেছে, তারা সেই রাতেই মরে পড়ে থেকেছে।

রাজকন্যার ঘরে?

হ্যাঁ।

তাহলে আমি যাবই।

কারও কথা শোনেনি বিদূষক। অগ্নিদেব যার সহায়, সে কিছুতেই ভয় পায় না। কোমরে তরবারি ঝুলিয়ে সেই রাতেই চলে গেছিল রাজকন্যার ঘরে।

এবং, অবাক হয়েছিল সজলনয়না রাজতনয়াকে দেখে। রূপবতী নিঃসন্দেহে, যেন আকাশ থেকে খসে পড়া একটা নক্ষত্র। যৌবনবতী নিঃসন্দেহে, যেন অনন্ত যৌবনা অপ্সরী। কিন্তু চোখের তারায় গভীর বিষাদ দেখে মনে পড়ে যাচ্ছে পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের রাজকুমারীকে। চোখ মুখের গঠনেও যেন একই ছাপ রয়েছে।

আশ্চর্য সাদৃশ্য তো!

দুজনে মুখোমুখি বসে দুগ্ধফেননিভ শয্যায়। চোখে চোখে চেয়ে, কিন্তু মুখে নেই কথা।

প্রতীক্ষা...শুধু প্রতীক্ষা...এক অভাবনীয় ভয়ংকরের প্রতীক্ষা।

প্রথম প্রহরেই সুসুপ্তির কোলে ঢোলে পড়ল অনিন্দ্যসুন্দরী লাবণ্যবতী।

জাগ্রত রইল বিদূষক।

দ্বিতীয় প্রহর যখন অতিক্রান্ত প্রায়, অনুসন্ধানী চোখে ধরা পড়ল সেই নিশাচর দানবকে। এই সেদিন যার ডান হাত কবজি থেকে উড়িয়ে দিয়েছে, সে!

এখন সে নিঃশব্দে খোলা জানলার মধ্যে দিয়ে বাঁ হাত প্রসারিত করেছে বিদূষকের দিকে। চিনেছে নিশ্চয়, তাই এত হুঁশিয়ার। এত নৈঃশব্দ! ধুমধাড়াক্কা সেই আওয়াজ আর নেই। পিলেচমকানো বিকট ব্যাপার-ট্যাপার নেই।

কোষমুক্ত তরবারি হাতে নিয়েই বসেছিল বিদূষক, এখন ছিটকে গিয়ে মণিবন্ধ কাটতে যেতেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল ব্যোমচারী দানব।

কে তুমি? বিদূষকের প্রশ্ন।

এই কন্যার পূর্বজন্মের বাবা।

বিদূষক চমকিত, পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের রাজকন্যা? সে কে হয়?

আমারই মেয়ে, পূর্বজন্মের।

দুই মেয়ে?

হ্যাঁ।

মেয়েদের বিয়ে হতে দিচ্ছ না কেন?

শক্তিমান পুরুষ ছাড়া কারও সঙ্গে সহবাস করতে দেব না বলে।

কী আশ্চর্য! তোমার প্রথম মেয়ে তো আমার বউ!

সেকী! তুমি আমার জামাই!

হ্যাঁ তোমার মেয়েও খুব সুখী।

ব্যস, ব্যস, আমার এই মেয়েও হোক তোমার বউ। এখন থেকে জামাই আদর করে যাবো। যখন ডাকবে, তখনই আসব।

এই বলেই হাতকাটা দানব চম্পট দিয়েছিল নিষেমধ্যে।

ভোর হল। আবার বিয়ে হল বিদূষকের। চতুর্থ বধূ নিয়ে পরম সুখে দিন কয়েক থাকতেই হল নতুন শ্বশুরবাড়িতে। সে যে কতখানি শক্তিমান পুরুষ, সেটা তো বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। সুখের সাগরে ভাসিয়েছিল নতুন বউকে।

ভোলেনি কিন্তু ভদ্রাকে। গান্ধর্বমতে বিয়ে আর সূক্ষ্ম অবয়বে সংসর্গ বলেই আকর্ষণ এত বেশি।

দিন কয়েক পরেই গভীর রাতে হাওয়া হয়ে গেল ঘুমন্ত বউকে ফেলে।

এবার তার পরম সহায় দানব-শ্বশুর। স্মরণমাত্র হাজির হয়েছিল হাতকাটা, কী ব্যাপার, জামাই?

তোমার এই মেয়েও কিন্তু সুখী।

তা বটে! তা বটে!

একটা উপকার করতে হবে যে।

এখুনি করব।

আজ রাতেই আমাকে পৌঁছে দাও উদয়গিরি পাহাড়ে।

সেকি! সেখানে কেন? সে যে সিদ্ধ পর্বত।

সেখানে আছে আমার দ্বিতীয় বউ, এক বিদ্যাধরী।

খুব ভালো! খুব ভালো! খাসা জামাই তুমি! কিন্তু বাবা, আমার যে উদয়গিরি পর্বতে প্রবেশ নিষেধ। আমি যে দানব।

শ্বশুরের ঘাড়ে চেপে আকাশ পথে কল্পনাতীত বেগে উদয় পাহাড়ের

পাহাড়ের নীচে পৌঁছে দিলেই হবে।

চলো।

শ্বশুরের ঘাড়ে চেপে আকাশ পথে কল্পনাতীত বেগে উদয় পাহাড়ের সানুদেশে হাজির হয়েছিল বিদূষক। জামাই-আদর সমাপ্ত করে তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধানও করেছিল শ্বশুরমশায়। জামাই আপ্যায়ন নানাভাবে হয়, কিন্তু ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া...!

কিছুটা ভয়ের চোটেও বটে। একটা হাত তো গেছে এই রোখা জামাইয়ের কৃপাণ কোপে।

মুচকি হেসে সেই রাতেই পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠে গেছিল বিদূষক, সেখানে আছে সিদ্ধ পুরুষদের আশ্রম।

মাঝপথে দেখেছিল একটা পর্বত-সরোবর। পাড়ে দাঁড়িয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে ভোরের আলোয় এমন সময়ে চোখে পড়ল নরম মাটিতে মেয়েদের পায়ের ছাপ।

দাঁড়িয়ে রইল আড়ালে। আরও একটু আলো ফুটতেই অতিশয় সুন্দরী দিব্যদেহিনী জনাকয়েক রমণী এল কলসী কাঁখে। তারা যখন জল ভরছে কলসীতে, আড়াল থেকে বেরিয়ে সুমিষ্টবচনে প্রশ্ন করেছিল বিদূষক, কার জন্য জল ভরছো গো?

দিব্যকান্তি বিদূষকের আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে মুগ্ধ হয়েছিল রমণীদল। সুপুরুষ মাত্রই সুকন্যাদের চোখের মণি হয়। এর অন্যথা ঘটে না।

এক রমণী তাই লালায়িত ভঙ্গিমায় জবাব দিয়েছিল, এক অপরূপা কন্যার স্নানের জন্যে।

অপরূপা! মানবী?

না। বিদ্যাধরী।

নাম কী?

ভদ্রা।

আর প্রশ্ন করেনি বিদূষক। একে একে কলসী কাঁখে রমণীদল হেলে দুলে বিদূষকের পানে অপাঙ্গ চাহনি নিক্ষেপ করতে করতে প্রস্থান করেছিল।

একজন বাদে।

সে যেন জলভরা কলসী তুলতে পারছে না, এমনি ভান করে বিদূষকের পানে আড়চোখে তাকিয়ে বলেছিল, দেখছো কী? তুলে দাও না।

ঠিক এইরকম একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল বিদূষক। মেয়েটি নিজে থেকে না বললে সে নিজেই এগিয়ে গিয়ে কলসী তুলতে সাহায্য করত এবং আলগোছে ভদ্রার দেওয়া মায়া-আংটি কলসীতে ফেলে দিত। এবং করলও তাই।

কলসী যখন তুলছে, নিতম্বিনী কন্যা তখন আঁখি পরে তাকে বিদ্ধ করে রেখেছিল। সেই ফাঁকে আংটি চলে গেছিল কলসীর জলে। বিদূষকের হাতের কারসাজিতে।

কটাক্ষ হেনে সুন্দরী দেবদাসী যখন প্রস্থান করছে, তখনও বিদূষক একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার দিকে।

বিলক্ষণ চালাক সে, কাজ হাসিল করার সময়ে কখন কী মন্ত্রগুপ্তির প্রয়োজন হয়, তা জানে।

দেবদাসীরা হেলেদুলে কলসীকাঁখে এল মন্দিরের স্নানকক্ষে। শুরু হল স্নানপর্ব। দেবদাসীরা একে একে কলসীভরা জল ঢেলে যাচ্ছে নিরাবরণা ভদ্রার সর্বঅঙ্গে। সে উন্মনা। নিয়মিত স্নানপর্ব সারছে বটে, নিখুঁত তনুর সর্বত্র পরিমার্জনাও চলছে দেবদাসীদের সহায়তায়। কিন্তু দুই চোখে বিষাদ। কামতপ্ত অঙ্গে শীতল জলের ধারা বইয়ে দিতে দিতে আড়চোখে তা নজর করছে দাসীরা। দেহতাপ সে কি কারণে, তা তারা অনুমান করে নিয়েছে। কারণ, তারা সেবাদাসী। পুরুষভোগ্যা। নৃত্যগীতে তাপ সঞ্চারণ এবং তাপ নিবারণের পন্থা তাদের অজানা নয়। বহু দিবস ধরেই তারা লক্ষ্য করেছে, ভদ্রা অষ্টপ্রহর যেন ধ্যানমগ্না; এ ধ্যান যে

পরমপ্রিয় পুরুষের জন্যে, আতীব্র বিরহের জন্যে, তা রমণীমাত্রই অনুধাবন করে নেয়। আর তারা তো সেবাদাসী। প্রথম রিপুচর্চায় পটীয়সী।

আর, আজ একটু আগেই দেখেছে দীঘির পাড়ে দীর্ঘকায় বলিষ্ঠদেহী এক পরমসুন্দর যুবককে, যার চোখেও যেন বিরহের তুফান। সে জানতে চেয়েছিল, কলসী কসী জল যাচ্ছে কার জন্যে? সেই সময়ে বিরহ-বিদ্যুৎ খেলে গেছিল তার দুই চোখে। বিদ্যাধরী ভদ্রার নাম শুনে কেঁপে গেছিল দুই চোখের পাতা। দেখেই সববোঝা হয়ে গেছিল সেবাদাসীদের। কলসীকাঁখে হেলেদুলে ফেরবার সময়ে বিষম কৌতুকে সেই প্রসঙ্গই আলোচনা করেছে এতক্ষণ।

তারাই এখন মুখটিপে হাসছে আর কলসী কলসী জল ঢালছে অনাবৃত ভদ্রার তাপিত অঙ্গে।

আচমকা একটা কলসীর জলধারার সঙ্গে বেরিয়ে এল একটা আংটি। ভদ্রার মাথায় পড়েই ঠিকরে পড়ল স্নানকক্ষের মেঝেতে। ভদ্রার চোখের সামনেই।

তৎক্ষণাৎ ঘোর কেটে গেল ভদ্রার। জিজ্ঞাসা করলে তীক্ষ্ণ স্বরে,

এ আংটি কলসীর মধ্যে কী করে এল?

চমকে গেছিল সেবাদাসীরাও। চমকে গিয়েই একজন কিন্তু হেসে বলেছিল, নিশ্চয় সে ফেলে দিয়েছে কলসীর জলে!

সে কে?

দীঘির ধারে যে বসে রয়েছে। কলসী তুলতে পারছিলাম না, সে এসে তুলে দিয়েছিল। তখন নিশ্চয় আঙুলের আংটি ফেলেছিল কলসীর জলে আমি দেখতে পাইনি। তোমার আংটি?

হ্যাঁ।

তাই তো বলি, অত কথা জিজ্ঞেস করছিল কেন? এত জল কার জন্যে, কী নাম তার। আমরা সব বলেছি।

ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠেছিল ভদ্রা, পোশাক পরাও আমাকে, নিয়ে এস সব গয়নাগাটি। আর আনো তাকে, আমার সামনে।

কেন গো, কেন?

সে যে আমার স্বামী, আমার অধিপতি, আমার নায়ক।

একটু পরেই হাস্যপরিহাসে মুখরিত হয়েছিল দীঘির পাড়। কৌতুকতরল কামিনীরা রঙ্গরসের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিয়ে ভদ্রার ভর্তাকে নিয়ে এসেছিল বিরহিনী বিদ্যাধরীর সামনে।

সরে গেছিল অবশ্য পরক্ষণেই। দীর্ঘ বিরহের পর মিলন তো দীর্ঘ হবেই। চুম্বন, আলিঙ্গন, শৃঙ্গার, সংসর্গ।

শীতল হয়েছিল দুজনের অঙ্গ। কামকাতুরা ভদ্রা বিদূষকের গলা জড়িয়ে ধরে গালে গাল রেখে বলেছিল, আর এখানে নয়। শ্মশানবাসের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে। এখন থেকে থাকবো তোমার সঙ্গে। অনুক্ষণ তোমাকে রাখবো আমার চোখের সামনে।

তাহলে তো আমার সঙ্গে যেতে হবে উজ্জয়িনীতে।

তাই যাব।

সেটা কিন্তু নরলোক। বিদ্যাধরলোক নয়।

সে-ই হবে আমার স্বর্গলোক। স্বামী যেখানে, আমি সেখানে। ভদ্রার চিবুক নেড়ে দিয়ে বিদূষক বলেছিল, তখন যে পঞ্চকন্যার অন্যতম হয়ে থাকতে হবে।

তার মানে?

সাড়ম্বরে তখন বর্ণনা দিয়েছিল বিদূষক তার আগের তিন বিয়ের। ভদ্রাকে নিয়ে এই মুহূর্তে তার চার বউ। পঞ্চম বধূকে হরণ করবে বিশ্বাসঘাতক বণিক স্কন্দদাসের আলয় থেকে।

হরণ করবে কেন?

কারণটা যখন শুনেছিল, তখন ক্ষিপ্ত হয়েছিল ভদ্রা, কথা দিয়ে কথা রাখেনি! ডুবিয়ে মারতে চেয়েছে তোমাকে! শোধ নাও, হরণ করো বণিক-কন্যাকে। আমার ইন্দ্রজাল, তোমার দানব-শ্বশুরের মায়ার জাল, আর অগ্নিদেবের অসি হোক তোমার সহায়।

তাই হয়েছিল। বনিক স্কন্দদাসের সুরক্ষিত আবাসের মধ্যে হঠাৎ শূন্যে মিলিয়ে গেছিল তার কন্যা, সবার চোখের সামনে। দৃশ্যমান হয়েছিল উজ্জয়িনীতে। তারপর উলুধ্বনি, মালাবদল, বিবাহ, অগ্নিসাক্ষী করে এবং অবশ্যই অসিকে সাক্ষী রেখে। এয়ো-স্ত্রী হয়েছিল বিদুষকের চার ভুবনমোহিনী বধূ।

অহল্যা ইত্যাদি পতিব্রতা পাঁচ বধূ পরিবৃত বিদূষক যথা সময়ে উজ্জয়িনী রাজ্যের অর্ধেক যৌতুক পেয়েছিল রাজার কাছে। বাহুবলে সেই রাজ্য বাড়িয়ে দিগবিজয়ী সম্রাটও হয়েছিল।

ঘরে বিরাজ করছে অনাবিল শান্তি, পাঁচ পতিব্রতার পুণ্যে।

সমাপ্ত হল উদয়নের কাহিনি। গালে হাত দিয়ে মুগ্ধ হয়ে এতক্ষণ শুনছিল বাসবদত্তা আর পদ্মাবতী। এখন চোখে চোখে চেয়ে হেসে ঢলে পড়ল পরস্পরের গায়ে।

গল্পের হিতোপদেশ তো একটাই : বহু বউ থাকে থাক, শান্তি যেন থাকে ঘরে!

১৩. রাজ্যবিস্তারে উদয়ন

এরপর একদিন মূল প্রসঙ্গে এল মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ। বললে উদয়নকে, এবার শুরু হোক দিগবিজয় যাত্রা। আপনি রাজ্য বাড়ান। ভোগ করবে আপনার বংশধরেরা। যা হয়ে এসেছে চিরকাল। এই দেখুন না, আপনার পূর্বপুরুষ যকের পাহারায় ধনরত্ন রেখে গেছিলেন, সে তো আপনার ভোগের জন্যে। এই সম্পর্কে একটা গল্প মনে পড়ছে। শুনুন বলছি।

দেবদাস ছিল বড়লোকের ছেলে বড়লোক। তার বাবা ছিলেন পাটলিপুত্রের ধনী বণিক। দেবদাসও ছিল তাই।

দেবদাসের বিয়ে হয়েছিল পৌণ্ড্রবর্ধনের এক ধনকুবের বণিক-কন্যার সঙ্গে। তখনও বেঁচে ছিলেন দেবদাসের বাবা আর মা।

দুজনের মৃত্যুর পর দেবদাসের ঘাড়ে ভূত চাপল। জুয়ো খেলায় মন দিল। পথের ফকির হল দুদিনেই।

সংসার আর চলে না দেখে শ্বশুর এসে মেয়েকে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে পৌণ্ড্রবর্ধনের।

দিন কয়েক পরে শূন্য গৃহে টিকতে না পেরে দেবদাস ঠিক করল, শ্বশুরের কাছে হাত পাতা যাক, নতুন করে ব্যবসায় মন দেওয়া যাক। পুঁজি দিক শ্বশুর।

গেল সে পৌণ্ড্রবর্ধনের নগরে। ধূলিধূসরিত দেহে দাঁড়িয়ে বড়লোক শ্বশুরের প্রাসাদের সামনে। জামাই সে। কিন্তু এখন দীনহীন কাঙালের মতো আকৃতি। এতটা পথ হেঁটে আসায় সারা গায়ে মাথায় পোশাকে ধুলো। এই চেহারা নিয়ে কি শ্বশুরবাড়ি ঢোকা যায়?

অসম্ভব। রাতটা কাটানো যাক সামনের ওই দোকানদারের ঘরে। কালকের কথা ভাবা যাবে কালকে।

ঠাঁই নিল সে দোকানে। রাত হল। হঠাৎ খুট খুট আওয়াজ শুনতে পেল অন্ধকার দোকানঘরে।

এক কোনে চাদর মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়েছিল দেবদাস। একটুও না নড়ে অন্ধকারে চোখ চালিয়ে দেখল, এক যুবক পা-টিপে টিপে ঢুকেছে দোকানে।

রকম সকম তো সুবিধের মনে হচ্ছে না! চুরিচামারির দিকেও মন নেই বারেবারে তাকাচ্ছে বাইরের দিকে। কারও প্রতীক্ষায় নিশ্চয়।

একটু পরেই আগমন ঘটল তার। এক রমণীর। সে-ও এল পা-টিপে টিপে। নিমেষে যুবক জড়িয়ে ধরল তাকে, চুমোয় আর আদরসোহাগে যেন পাগল হয়ে গেল দুজনেই। তার পরেই শুরু হল উদ্দাম সুরতক্রিয়া।

বারাঙ্গনা নিশ্চয় নয়। তারা এত লুকোছাপার ধার ধারে না। এই অভিসারিকা অবশ্যই কোনো সম্পন্ন ঘরের। অলংকার সৃজনে তার প্রমাণ রয়েছে।

সিৎকার শব্দ স্তব্ধ হল এক সময়ে। জান্তব ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটেছে। এখন শুরু হল প্রেমালাপ।

নাগরী বললে নাগরকে, প্রিয়তম, তোমাকে চার ঘড়া সোনার টাকার সন্ধান বলে দিচ্ছি। তুমি উদ্ধার করো কৌশলে। তারপর দুজনে মিলে ফুর্তি করব সেই টাকায়।

কণ্ঠস্বর শুনেই চমকে উঠেছিল দেবদাস। শক্ত হয়ে গেছিল সর্বাঙ্গ। আঁধার ঘরে এতক্ষণ যাকে চিনতে পারেনি, ঘষঘষে কামসিক্ত ওই কণ্ঠস্বর শুনেই তাকে চিনেছে।

তার স্ত্রী! অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্যি! তার বিয়ে করা বউ, যে কিনা অতীব ধণীকন্যা, শুধু দেহের ক্ষুধা মিটোতে রাত্রি নিশীথে এসেছে নির্জন দোকানঘরে। এমন কথা কেউ বললে দেবদাস বিশ্বাস করতো না। কিন্তু এখন শুনছে স্বকর্ণে!

তাই উৎকর্ণ হয়ে রইল কামুকী কন্যার পরবর্তী সংলাপের জন্যে।

বেশ্যারও অধম সেই বণিক-কন্যা বললে চাপা গলায়, আমার স্বামী দেবদাস মনে করছে। সে এখন রাস্তার ভিখিরি। কিন্তু মোটেই তা নয়। আমার শাশুড়ি মারা যাওয়ার আগে আমাকে বলে গেছিলেন, ভিটের চারকোণে চার ঘড়া মোহর পোঁতা আছে। স্বামীকে বলেননি ও উড়নচণ্ডে বলে। আমি ছাড়া কেউ জানে না। তুমি গোটা বাড়িটা জলের দরে কিনে নাও স্বামীর কাছ থেকে। ঘ্যান ঘ্যান করলে একটু বেশিও দিও। তারপর চারঘড়া সোনার টাকা নিয়ে চল ফুর্তি করা যাক দুজনে মিলে।

আর একদফা রসালাপ এবং শৃঙ্গারাদির পর দুজনে পা-টিপে টিপে বেরিয়ে গেল দোকান ঘর থেকে।

দেবদাসের তখনকার মনের অবস্থা অবর্ণনীয়।

পরের দিনই সে রওনা হল পাটলীপুত্রের বাড়ির দিকে, শ্বশুরবাড়ি আর নয়। বাড়ি পৌঁছেই আগে দেখল, সত্যিই ভিটের চারকোণে চার ঘড়া মোহর পোঁতা আছে কিনা।

পেয়ে গেল গুপ্তধন। রেখে দিল অন্যত্র। যথাসময়ে সেই লম্পট এল তার বাড়ি কিনতে। চড়া দামে বাড়ি বেচে অন্য জায়গায় বাড়ি কিনে নিল দেবদাস। তারপর শ্বশুরবাড়ি থেকে কুলটা বউকে এনে রাখল কাছে।

এমন সাজা দেওয়ার জন্যে যা মুখে ছড়িয়ে, পড়বার পর, কোনও ঘরের বউ আর পরপুরুষকে দেহদান করতে সাহস পাবে না। দোকানঘরের ব্যভিচার বৃত্তান্ত কিন্তু একদম চেপে গেল মধুমুখী চরিত্রহীনার কাছে। গয়নাগাটিতে মুড়ে রেখে তার দেহের বিকৃত খিদে মিটিয়ে গেল বিবিধ আসুরিক পন্থায়। যে যেমন তার দাওয়াই হোক তেমন, দেবদাস তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল, এক রাতেই। উপপতির রমণ পন্থাও অনুসরণ করতে বাদ দিল না। বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রের মহড়া দিয়ে গেল রাতের পর রাত।

দেবদাসের বাড়ি যে কিনেছিল চড়া দামে, সে কিন্তু চার ঘড়া মোহর না পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল!

টাকার শোক উপপত্নীর চাইতে বেশি। পরের বউকে বিনা পয়সায় ভোগ করা এক জিনিস, আর নিজের টাকা সেই উপপত্নীর পতির পকেটে চালান করা আর এক জিনিস। দরে পোষায় না।

নিশ্চয় কারসাজিটা ওই নিশাচরী ব্যাভিচারিণীর। নিজের শরীর বিকিয়ে টাকা পাইয়ে দিয়েছে স্বামীকে। পতিব্রতা রমণী, তাই না? দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোমার মজা!

হানা দিল সে দেবদাসের নতুন বাড়িতে। ফিরিয়ে দিতে চাইল তার পুরোনো বাড়ি, কিন্তু দেবদাস দেবে কেন?

তখন তুমুল বচসা লেগে গেল নাগর-নাগরীতে। পরস্ত্রী ভোগী সেই দুশ্চরিত্র দেবদাসের সামনেই যখন তার ঘরের বউকে নাগর বউ বলে বসল, তখন দেবদাস দুজনকেই টেনে নিয়ে গেল রাজার সামনে।

তিনি সুবিচারক। ঘরের বউকে যে পটায়, তার শাস্তি দিলেন নিজে, তাকে জেলখানায় ঢুকিয়ে। দেশে থাকুক একটা দৃষ্টান্ত।

কুলটা কামিনীর হাল কি হয়, সে দৃষ্টান্ত রেখেছিল দেবদাস। বউ-এর নাক-কান কেটে নিয়ে লাথিমেরে তাড়িয়ে দিল বাড়ি থেকে।

তারপরেই ঘরে নিয়ে এল দ্বিতীয় বউকে, পাঁচজনকে দেখিয়ে ধুমধাম করে বিয়ে করল সুলক্ষণা, সুরুপা, পতিব্রতা একটি মেয়েকে।

গুপ্তধনের টাকা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে নিল ব্যবসায়ে মন দিয়ে।

শান্তি পেল দেবদাস।

গল্প শেষ করে বললে মন্ত্রী, অর্ধমের টাকা কুপথে যায়। ধর্মপথে রোজগারের বিষয়-আশয় বংশধরদের ভোগে লাগে, থেকে যায়। আপনি রাজা, ব্যবসায়ী নন। আপনার ধনবৃদ্ধির পথ রাজ্যবিস্তার। আপনাকে পুবদিকে সর্বপ্রথম সমর অভিযান করতে বলেছিলাম। কারণ আছে, এই দিকেই রয়েছে বারাণসী। ওখানকার রাজা ব্রহ্মদত্ত আপনাকে দু-চক্ষে দেখতে পারেন না। আগে তাঁকে পদানত করুন।

গল্পের ওষুধে কাজ আরম্ভ হয়ে গেছিল, এখন যুক্তির ক্ষুরে উদয়নের আলস্য কচুকাটা হয়ে গেল। বসে খেলে রাজভাণ্ডারও শূন্য হয়ে যায়। পরম শুভানুধ্যায়ী মন্ত্রী উসকে দিচ্ছে তো সেই কারণেই।

ফলে, সাজ সাজ রব পড়ে গেল গোটা দেশে। গোপালক এল উজ্জয়িনী থেকে, রাজকুমার সিংহবর্মা এল মগধ থেকে। দুই শ্যালকই নিয়ে এল বহু সৈন্য। এই উদ্দেশ্যেই তো এতদিন ধরে ঘুঁটি সাজিয়েছে মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ। এদের একজনকে উদয়ন সৈন্যসমেত পাঠাল চেদি রাজ্যে, আর একজনকে বিদেহ রাজ্যে। নিজের সাহায্যের জন্য পুরোনো বন্ধু পুলিন্দককে আনিয়ে রাখলাম কাছে।

প্রেমে এবং রণে কূটকৌশলে প্রয়োজন সর্বাগ্রে। তখন কোনও পন্থাই নিন্দিত নয়। তাই, উদয়ন যখন হাতির পিঠে চেপে সৈন্যসামন্ত নিয়ে তেড়ে গেল বারাণসীর দিকে সৌগন্ধনারায়ণ তার আগেই কাপালিকের ছদ্মবেশে গুপ্তচর বাহিনী পাঠিয়ে দিল বারনসীতে।

ছদ্মবেশী এই কাপালিকদের একজন সত্যিই অনেক গুহ্যবিদ্যা জানত, চরদের অধিপতি করা হয়েছিল তাকেই। অর্থাৎ, কাপালিক, গুরু।

ছলচাতুরির প্রয়োজন হয় বইকি যুদ্ধের সময়ে। মিথ্যে প্রচারের প্রয়োজনও আছে। শত্রুদেশে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্যে, মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্যে। এটাও একটা রণকৌশল। কুশলী মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ এই কূটনীতি প্রয়োগ করেছিল বিচিত্র পন্থায়। কুহক-গুরুর চেলারা আগে আগে ঢুকে গেছিল শত্রুদেশে। রাস্তার লোকজনকে সাড়ম্বরে শোনাচ্ছিল কুহক-গুরুর নানান পিলেচমকানো আজব কাহিনি। গুরুর চোখে নাকি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান ছবির মতো ভাসে। ইচ্ছে করলেই তিনি বিবিধ অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারেন। এমনকি, যা একেবারেই অসম্ভব, তেমন ব্যাপারও সম্ভব করে দিতে পারেন। অসাধারণ সিদ্ধির ফলে। মহাপুরষ চলেছেন তাদের সঙ্গে। মানুষের মঙ্গল করার জন্যে।

গল্পের গোরু গাছে ওঠে। মিথ্যের গাছে ডালপালার সংখ্যা বেশি থাকে। রটনা হাওয়ার আগে ছোটে। এই হল প্রচার মাহাত্ম্য।

কাপালিক-গুরু যে সত্যিই অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী, তার প্রমাণও হাজির করতো মিথ্যে ঘটনা সাজিয়ে। যেমন, ছদ্মবেশে এক গুপ্তচর আগেভাগে চলে গেল এক গ্রামে। সেখানে দিন কয়েক থেকে শুনেনিল অদ্ভুত কোনও একটা ব্যাপার। তারপর ফিরে এল গুরুর কাছে। আজব ব্যাপারটা শুনিয়ে রাখল গুরুকে।

এবার, কুহক-গুরু শিষ্যটিষ্য নিয়ে হই-হই করে ঢুকল সেই গ্রামে। সবাইকে নিয়ে ঘিরে বসে তাজ্জব সেই কাহিনি এমন ভাবে বর্ণনা করে গেল যে গ্রামবাসীদের তো চক্ষুস্থির! সর্বনাশ, সত্যিই তো এই গুরু ভেল্কি জানে। নইলে দূর দেশ থেকে এসে গ্রামের অতীত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলছে কী করে।

অতীতের সেই আশ্চর্য ঘটনা বলবার সময়েও চমকদার কাণ্ড সৃষ্টি করা হত। আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে, অথবা মাটিতে ছক কষে, বিস্তর তন্ত্রমন্ত্রের বুকনি আউড়ে, বলা হত অতীতের ঘটনা। অথবা ভবিষ্যতে যা ঘটতে পারে। গুপ্তচররাই ভবিষ্যতের পরিকল্পনা আগেভাগে গোপনে জেনে যেত। কপট-গুরু ফলাও করে

তা প্রচার করতো। ফলে চেলাদের দৌলতে ভণ্ডসাধুর কাহিনি হুহু করে ছড়িয়ে গেল গ্রামে গঞ্জে, নগরে বন্দরে।

ভণ্ডামির সুফল হাতেনাতে পাওয়া গেল দিন কয়েকের মধ্যে। এক রাজপুত্র এল ভণ্ড গুরুকে দর্শন করতে। অং-বং-চং মন্ত্রতন্ত্র আউড়ে রাজপুত্রের মুণ্ড ঘুরিয়ে দিল। সে বেচারি যা জানতে এসেছিল, তা জানিয়ে দিল বইকি কপট গুরু, কিন্তু রংচঙে মিথ্যের জালবুনে, ধোঁয়াটে ভাবে, কিছুরই স্পষ্ট জবাব না দিয়ে।

কিন্তু কথার ফাঁকে ফাঁকে তাঁকে কায়দা করে রাজপুত্রের পেট থেকে বের করে নিল অনেক গুপ্ত সংবাদ। যে সব তথ্য জানবার জন্যেই কুহক-গুরুকে সৌগন্ধনারায়ণ আগেভাগে পাঠিয়ে দিয়েছে শত্রু দেশে, জমি তৈরি করার জন্যে, যাতে শত্রুরা বিপদে না ফেলতে পারে।

কী জানল কুহক গুরু? ভয়ানক ভয়ানক যুদ্ধ প্রস্তুতি!

বারানসীরাজ ব্রহ্মদত্ত উজবুক নন। তিনি গুপ্তচর মারফত আগেই খবর নিয়ে জেনেছেন উদয়ন আসছে মার-মার কাট-কাট করে। তিন দেশের সৈন্যদল একত্র হয়েছে। সোজা যুদ্ধে তাকে হারানো মুশকিল। সুতরাং চলুক চোরাগোপ্তা।

অর্থাৎ, গুপ্ত থেকে জখম করা। কীভাবে? এই ব্যাপারেই ব্রহ্মদত্তর বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়।

তিনি বিষ দিয়ে শত্রু মারবেন নানা পন্থায়। অথচ, শত্রু, অর্থাৎ উদয়নের সৈন্যসামন্ত, আগেভাগে তা জানতেই পারবে না। এমনকি, জীবনান্ত ঘটার পরেও কেউ বুঝতেও পারবে না, পালে পালে উদয়নের সৈন্যরা পরলোকে প্রস্থান করছে কীভাবে।

বিষ বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করা হয়েছে মূলত দু-ভাগে।

এক, উদয়নের সৈন্যসাসন্ত যে রাস্তা ধরে আসবে, সেই রস্তার দু-ধারের গাছ, লতা, ঘাস, পুকুর, খাবারদাবার, সব বিষিয়ে রাখা হয়েছে। তৃষ্ণার জলে বিষ, খিদে মেটাতে গেলেও বিষ, গাছের হাওয়ায় গা জুড়োতে গেলেও হাওয়ায় বিষ!

দুই, গণিকা-গমন সৈন্যদের চিরকালের অভ্যেস। লড়তে গিয়ে সন্ধ্যের পর বারাঙ্গনা-সংসর্গ না করলে তাদের চলে না। প্রমোদে ঢেলে দেয় মন, তারপর মরে যুদ্ধক্ষেত্রে। সুচতুর ব্রহ্মদত্ত প্রতিটি বন্দরে আর নগরে যেখানে যত বেশ্যাবাড়ি আছে, সর্বত্র দারুণ সুন্দরী বিষ-কন্যাদের মোতায়েন করেছে। তাদের সঙ্গে রমণে আনন্দ, কিন্তু মরণ সুনিশ্চিত।

দু-দুটো মারাত্মক রণকৌশল রাজপুত্রের পেট থেকে বের করে নিয়ে সেই রাতেই চম্পট দিল ভণ্ড গুরু চেলাদের নিয়ে।

শত্রুপক্ষের গুপ্তনীতি জানিয়ে দিল মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণকে।

চটপটে সৌগন্ধনারায়ণ তিলমাত্র সময় নষ্ট না করে গোপনে লোক পাঠিয়ে পালটা দাওয়াই প্রয়োগ করে নির্বিষ করে রাখল পথের দু-পাশের গাছপালা। লতাপাতা, ঘাস, ফল, পুকুর, সব। সেইসঙ্গে রটনা করে দিল সৈন্যদের মধ্যে বিষকন্যা আতঙ্ক! সাবধান সাবধান! পতিতালয়ে যেও না, থুক থুক করছে বিষকন্যারা মোহিনী রূপে। রমণের পরেই মরণ!

স্থুলবুদ্ধি সৈন্যদের বিশ্বাস নেই। ধুরন্ধর ব্রহ্মদত্ত যদি বিষকন্যাদের গ্রাম্য-নারী অথবা কুল-রমণী সাজিয়ে পাঠিয়ে নেয় সৈন্যদের, তাই এমন ঘোষণাও করা হল, অচেনা মেয়েছেলে গায়েপড়ে আলাপ করতে এলে কাছে ঘেঁষবে না।

তারপর সেনাপতি রুমন্বানকে ডেকে বললে, রাজা ব্রহ্মদত্ত পঞ্চম বাহিনী পাঠিয়েছেন। গুপ্তঘাতকরা রয়েছে ছদ্মবেশে। গুপ্তচররা দলে দলে ঢুকে পড়েছে। খুঁজে খুঁজে তাদের বের করো আর নিকেশ করো।

অক্ষরে অক্ষরে তাই করেছিল সেনাপতি। রক্তগঙ্গা বইয়ে ছেড়েছিল। সুচতুর আর দূরদর্শী সৌগন্ধনারায়ণের কাছে যুদ্ধপূর্ব রণচাতুর্যের মারপ্যাঁচে হেরে গেলেন রাজা ব্রহ্মদত্ত। এরপর যুদ্ধ করলে যে গোহারান হারবেন,

সে সংবাদ তাঁর কাছে আগেই এসেছিল। উদয়ন এতদিন আলস্যে কাটিয়ে এখন গা-ঝাড়া দিয়ে যে বিপুল সৈন্যসংগ্রহ করেছে। তার মুখোমুখি হওয়ার চাইতে বশ্যতা স্বীকার করাই ভালো।

তিনি তাই করলেন।

বিজয়োল্লাসে উদয়ন তখন পুবদিকের অন্যান্য রাজ্য জয় করে নিল অক্লেশে। রণতুফান সৃষ্টি করে ধেয়ে গেল তার যোদ্ধারা পুব থেকে পশ্চিমে। পশ্চিম সাগরের পাড়ে সব দেশে বিজয়কেতন উড়িয়ে চলে এল পুবসাগরের পাড়ে। কলিঙ্গ দেশকে পদানত করে সেখান থেকে সংগ্রহ করল বহু রণ হস্তী। তারপর গেল দক্ষিন দেণে। ছোটো ছোটো রাজ্যগুলো গুঁড়িয়ে দিতেই সেখানকার লোকজন পালিয়ে গেল পাহাড়ে পাহাড়ে। সবশেষে চোলরাজার দর্পচূর্ণ করলে উদয়ন, কাবেরী নদী পেরিয়ে।

প্রায় গোটা ভারতবর্ষকে জয় করে নিয়ে বিজয়োল্লাসে উদয়ন রেবা নদী অর্থাৎ নর্মদা নদী পেরিয়ে এল শ্বশুরের রাজ্যে, উজ্জয়িনীতে। সেখানে কিছুদিন জামাই-আদরে থেকে আবার সসৈন্যে গেল পশ্চিম দিকে, পরের পর দেশকে নিয়ে এল নিজের অধীনে। সে তখন মূর্তিমান আতঙ্ক দিকে দিকে। সিন্ধু সৌবীর, কিরাত, হুন, ম্লেচ্ছদের মতো দুধর্ষ জাতিরাও দাঁড়াতে পারেনি তার বীরত্বের সামনে। তাদের অধীনে এনে, তাদের সৈন্য দিয়েই নিজের সৈন্যবাহিনী বাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল সুদূর পারস্য দেশে। সেখানকার ভয়ংকর যোদ্ধারাও চম্পট দিয়েছিল রণক্ষেত্র ছেড়ে উদয়নের ভয়ংকরতম সৈন্যদের সামনে। পারস্যে বিজয়কেতন উড়িয়ে উদয়ন এল আর এক শ্বশুরবাড়ি, মগধ দেশে। তখন সে হিমালয় থেকে সৌরাষ্ট্র, বিশাল ভারতের অধিপতি, ভারতবর্ষের বাইরেও পারস্যরাজ তার পদানত। পদ্মাবতীর বাবা মগধরাজা বড়ো খুশি হলেন এমন জামাইকে আদর করে। মেয়েকে কৌশলে বিয়ে করেছিল উদয়ন, সে ক্ষোভ আর নেই তাঁর মনে। পৃথিবীর অধিপতি এখন তাঁর জামাই।

এরপর, উদয়ন ফিরে এল লাবণক দেশে নিজের জায়গায়।

দিগ্বিজয়ের পরে মন্ত্রীর গল্প উদয়নকে

শিবিরে শিবিরে চলল নাচ-গান-বাজনা। উৎসবে মেতে গেল বিরাট সৈন্যবাহিনী। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে এতবড়ো সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনা করেছে উদয়ন। সংযমের শেকল পরিয়ে রেখেছিল। উচ্ছৃঙ্খলার ধারে কাছে যেতে দেয়নি। গোটা ভারতবর্ষে তো বটেই, ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েও দেখিয়ে এসেছি যুদ্ধনৈপুণ্য।

তারপর একটু গা-ঢালা ভাব তো আসবেই। আসুক।

জিরেন নেই কিন্তু উদয়নের মস্তিস্কের। এক সময়েই এই উদয়নই কিন্তু বিলাস-ব্যসন-মৃগয়া-কামিনী নিয়ে অষ্টপ্রহর নিমগ্ন ছিল।

বিপুল বিষয়-বৈভব অর্জনের পর তার মাথায় ঘুরছে এখন বিষয় রক্ষার দুশ্চিন্তা। চোখ থেকে ঘুম না উড়ে গেলেও, উদ্বেগ আছে সবর্ক্ষণ।

তাই একদিন মন্ত্রী বৈঠকে বসে বললে দিকপাল মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণকে, বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তকে বিশ্বাস নেই। বিদ্রোহ করতে পারে।

মন্ত্রী বললে, তা হবে না একটাই কারণে। আমরা তাঁর অসম্মান করিনি, সাধারণত যা হয়। যে হেরে যায়, তাকে হেয় করা হয়। আমরা কিন্তু তাঁকে এমন সম্মান দিয়েছি, যা তার কাছে আশার অতিরিক্ত। যে ভয়ে বশ মানে, তাকে সম্মানে বেঁধে রাখাও একটা পররাষ্ট্রনীতি, আপনি নির্ভয়ে থাকুন। এ সম্পর্কে একটা গল্প বলতে ইচ্ছে করছে। শুনুন বলি।

শুরু হয়ে গেল মন্ত্রীর পররাষ্ট্রনীতি মূলক অথচ চমৎকার মনোরঞ্জনী এক গল্প, শুষ্ক উপদেশের চাইতে যা বেশি কার্যকর।

অগ্নিদত্ত ছিলেন এক নামকরা ব্রাহ্মণ। নিবাস পদ্ম নামক নগরে, তাঁকে বিলক্ষণ খাতির করতেন রাজা নিজে। গুণীর মর্যাদা রাখতেন প্রতিমানে একটা মাসোহারা দিয়ে। মিতব্যয়ী ব্রাহ্মণের সংসারের পক্ষে যথেষ্ট।

অগ্নিদত্ত ছিলেন দুই পুত্রের জনক। সোমদত্ত আর বৈশ্বানর। বড়ো সোমদত্ত। সুদর্শন কিন্তু গবেট। চোয়াড়ে। রগচটা। কারও সম্মান রক্ষা করা তার ধাতে নেই। লেখাপড়ায় ক-অক্ষর গোমাংস।

বিপরীত ছিল ছোটো ছেলে বৈশ্বানর। সুশিক্ষিত, সুবিনীত। কিন্তু সুদর্শন নয়। বুদ্ধিমান বলে সর্বজন প্রিয়।

দুই ছেলের বিয়ে দেওয়ার পর অগ্নিদত্ত পরলোকে গেলেন।

দুই ভাই তখন পৃথক হয়ে গেল। রাজার দেওয়া বৃত্তি দু-ভাগ হয়ে গেল দু-ভাইয়ের মধ্যে রাজদরবারে সম্মান পেয়ে গেল ছোটো ছেলে বিদ্যাবুদ্ধির জোরে।

চাষবাস নিয়ে মেতে রইল মূর্খ বড়ো ছেলে।

ব্রাহ্মণের ছেলের চাষবাসের উৎসাহ দেখে একদিন এক পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি খুব বকাঝকা করেছিলেন সোমদত্তকে। শুদ্র চাষিদের সঙ্গে চৌপর দিন মাঠে-ঘাটে লাঙল টানা কি ঠিক? বংশের নাম রেখেছে বটে ছোটোভাই। রাজা পর্যন্ত তাকে কত খাতির-যত্ন করে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

শুনেই তো খুন চেপে গিয়েছিল সোমদত্তর মাথায়। রাগলে সে চণ্ডাল! বাবার সেই ব্রাহ্মণ-বন্ধুকে লাথির পর লাথি মেরে গেছে মাঠে ফেলে।

সে ভদ্রলোক সাক্ষীসাবুদ নিয়ে হাজির হয়েছেন রাজার সামনে। রাজা সেপাই পাঠিয়েছেন সোমদত্তকে ধরে আনার জন্যে। সোমদত্ত চাষি বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে তাদেরকে বেধড়ক মেড়ে তাড়িয়ে দিয়েছে।

রাজা খেপে আগুন। তিনি বেশ কিছু সেপাই পাঠিয়ে তক্ষুনি সোমদত্তকে টেনে আনলেন রাজদরবারে। চটজলদি বিচার ও হয়ে গেল। দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। শূলে চাপিয়ে তৎক্ষণাৎ।

কিন্তু কপাল ভালো সোমদত্তের। শূলে চাপাতে না চাপাতে সে আছড়ে পড়ে গেল মাটিতে। জল্লাদরা তাকে যখন তুলে ফের শূলে চাপাতে যাচ্ছে তখন চোখে ধোঁয়া দেখল প্রত্যেকেই। প্রায় অন্ধ হওয়ার উপক্রম। স্রেফ দৈব সহায় হয়েছিল সোমদত্তের, তাই প্রাণে বেঁচে গেল ওইটুকু সময়ের মধ্যেই।

কেননা, হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির তার ছোটো ভাই বৈশ্বানর। রাজা দাদাকে শূলে চাপিয়ে দারুণ যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলার হুকুম দিয়েছেন শুনেই সে তার কাজ করেছে। রাজার কাছে দৌড়েছে। রাজা তাকে সম্মান করেন, তাই তার আবেদন মঞ্জুর করেছেন। সোমদত্তকে ছেড়ে দিতে হুকুম দিয়েছেন ঘাতকদের।

ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরে এল বটে সোমদত্ত, কিন্তু লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে ঠিক করল, এ রাজ্যে আর নয়। মুখ দেখান যাবে না। ছেলে-বউ নিয়ে চলে যাবে অন্য রাজ্যে।

কিন্তু শুভানুধ্যায়ীরা তা হতে দেবে কেন? নিরুপায় সোমদত্ত তখন রাগের চোটে রাজার মাসোহারা নেওয়াই বন্ধ করে দিল। যে রাজা জ্যান্ত শূলে চাপাতে গেছিলেন, তার অর্থ আর স্পর্শই করবে না।

তা না হয় হল, কিন্তু শুধু চাষবাস করে সংসার চালাতে গেলে তো আরও জমি-জায়গা দরকার। তাই জমির খোঁজে একদিন জঙ্গলে ঢুকেছিল সোমদত্ত। একটু গিয়েই দেখতে পেল প্রকাণ্ড একটা অশ্বত্থ গাছ।

এতটা পথ ঝোঁকের মাথায় এসে হেদিয়ে পড়েছিল সোমদত্ত। গাছের ছায়ায় ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসে ঘাম শুকোতে শুকোতে দেখছিল এদিক-সেদিক। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল বহুদূরবর্তী উর্বর জমি দেখে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খানাখন্দ টিলা পাথর, কিছু নেই। প্রকৃতি যেন চাষের জমি সাজিয়ে রেখে দিয়েছে। বীজ ফেললেই সোনা ফলবে।

কাজ শুরু করে দিয়েছিল সোমদত্ত। বাড়ি থেকে গোরু-টরু এনে শুরু করে দিয়েছিল চাষ-আবাদ। বাড়িতে আর ফিরল না। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত চাষবাস, রাত্রে অশ্বত্থ গাছের তলায় টেনে ঘুম। খাবার-দাবার আসতো বাড়ি থেকে, দিয়ে যেত সোমদত্তের বউ।

অশ্বত্থ গাছটাকে কিন্তু দেবতা জ্ঞানে রোজ পুজো করে যেত সোমদত্ত। ভাগ্যলক্ষ্মী মুখ তুলে চেয়েছেন তো এই বৃক্ষের কৃপায়। সুতরাং বৃক্ষ-দেবতাকে সকাল-সন্ধে আরাধনা না করে কোনও কাজে হাত দিত না।

গতর, গোঁ আর দৈবকৃপা, এই তিন শক্তির দৌলতে সোনা ফলিয়ে ফেলল। প্রথমে সবুজ শস্যে মাঠ ভরে গেল। তারপর তা পেকে হলদু হয়ে গেল।

খবর চলে গেছিল রাজার কাছে। তাঁর লোক এসে গায়ের জোরে কেটে নিয়ে গেল সমস্ত ফসল।

মন ভেঙে গেল সোমদত্তের। কিন্তু হাল ছেড়ে দিল না। অশ্বত্থ-দেবতাকে পুজো দিয়ে ফের শুরু করেছিল চাষবাস, সেই জমিতেই।

সোমদত্তর জীবনে নতুন অধ্যায়ের শুরু এরপর থেকেই।

সারাদিন হারভাঙা খাটুনির পর একদিন গাছতলায় শুতে না শুতেই ঘুম নেমেছিল চোখে।

ঘুম ছুটে গেছিল পরক্ষণেই। শূন্য থেকে ভেসে আসা এক গমগমে কণ্ঠস্বরে, সোমদত্ত, ও সোমদত্ত।

সোজা হয়ে বসেছিল সোমদত্ত। কার কণ্ঠস্বর?

আমি, যাকে তুমি রোজ পুজো করো।

অশ্বত্থ দেব?

না। আমি দেবতা নই, এক যক্ষ। এই বৃক্ষ আমার নিবাস। তোমার পুজো আমি গ্রহণ করেছি। তোমার অধ্যবসায় আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাই তোমাকে পুরস্কার দিতে চাই।

সোমদত্ত ভেবেছিল, যক-এর পুরস্কার নিশ্চয় গুপ্তধন-টুপ্তধন জাতীয় কিছু হবে।

যক্ষ কিন্তু সে সবের ধার দিয়েও যায়নি। দিয়েছিল সৎ উপদেশ। পরিশ্রমী পুরুষের কাছে যার চাইতে বড় পুরস্কার আর হয় না।

বলেছিল যক্ষ, এখন থেকে তোমার নাম হোক ফলভূতি। মুছে যাক পূর্ব পরিচয়। সেই সঙ্গে মুছে যাক অতীতের লাঞ্ছনা। পালটে যাক তোমার স্বভাব। ব্রাহ্মণ ধর্মই হোক তোমার ধর্ম চাষ-আবাদ ছেড়ে দাও। সোজা চলে যাও রাজা আদিত্যপ্রভর রাজধানীতে। ঠাঁই নেবে রাজপ্রসাদের কাছে। হেঁকে হেঁকে বলবে, শোনো, সবাই শোনো। আমি ফলভূতি, ব্রাহ্মণ ফলভ্রুতি, এ জীবনের সারসত্য তোমাদের শুনিয়ে রাখি। যে যেমন কর্ম করবে, তেমনি ফলপাবে। কর্মফলই অদৃষ্ট গড়ে দেয়। তার ওপর কিছু নেই। সৎকর্ম করো, শুভ ফল পাবে। অসৎ কর্মের ফল অশুব হবেই।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সোসদত্ত বললে, এ জীবনের সার সত্য তাই বটে। হাড়ে হাড়ে বুঝছি। কিন্তু, চেঁচিয়ে তা বলে লাভ কী?

যক্ষ বললে, সুদর্শন ব্রাহ্মণের মুখে পরম জ্ঞানের বাণী শুনলে সাধারণ লোক তোমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। মুখে মুখে কথা ছড়িয়ে যাবে। তোমার যশ হবে। অপযশের গ্লানি মুছে যাবে। আরও যশবৃদ্ধির জন্যে তোমাকে কয়েকটা মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি। মুখস্থ করে নাও।

শূন্যমার্গের অদৃশ্য যক্ষ মুখে মুখে কয়েকটা আশ্চর্য প্রহেলিকা সৃষ্টির মন্ত্র শিখিয়ে দিল সোমদত্তকে।

ফিরে গেল অশ্বত্থ-নিবাসে।

যক্ষের উপদেশ অনুসারে পরের দিন সকালেই সোমদত্ত বউ-ছেলে নিয়ে চলে গেল রাজা আদিত্যপ্রভার রাজধানীতে। উপদেশ পালন করল অক্ষরে অক্ষরে। অর্থাৎ, ঠাঁই নিল রাজার বাড়ির কাছেই। তোরণের সামনে হেঁকে হেঁকে বলে গেল ভাগ্য-নিয়ন্তা কর্মফলের অমোঘ শক্তি-কাহিনি, সেই সঙ্গে ছুঁয়ে, ছুঁয়ে গেল সদ্যলব্ধ মন্ত্র-ক্ষমতার অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার।

মুখে মুখে যে কথা ছড়িয়ে পড়ে, তাতে বিশ্বাস রাখে আপামর জনগণ। যার নাম গুজব তারাই খবরটা নিয়ে গেল রাজার কানে। রাজা তৎক্ষণাৎ ফলভূতি নামধারী ব্রাহ্মণকে নিয়ে এলেন নিজের সামনে।

মুগ্ধ হলেন সুপুরুষ ফলভূতির বচনধারায়। রেখে দিলেন তাকে নিজের কাছে। দু-দিনেই তাঁর নয়নের মণি হয়ে উঠল ফলভূতি। ঠাঁই নিতে হল রাজবাড়িতে। চেহারার ধারের সঙ্গে কথার ধার যখন মিশে যায়, তখন সেই মানুষ রাজ-রত্ন তো হবেই।

এরপরেই অতি-অদ্ভুত ঘটনার পর ঘটনা ঘটে যেতে লাগল ফলভূতির জীবনে। সে সব ঘটনা শুধু বিস্ময়কর নয়, অতীব লোমহর্ষক।

ঘটনাক্রমের শুরু এইভাবে :

ফলভূতিকে রাজবাড়িতে রেখে শিকার করতে জঙ্গলে গেছিলেন রাজা। দিন কয়েক পরে হঠাৎ তিনি ফিরলেন। অন্তঃপুরে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য, অথচ দেখতে হচ্ছে চোখের সামনে।

তাঁর রানি সম্পূর্ণ নগ্না হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝে। কপালে লাল সিঁদুরের লম্বা তিলক। চোখ আধবোজা। মন্ত্র উচ্চারণ করছে বিড় বিড় করে। খোলা চুল এলিয়ে রয়েছে বুকে পিঠে। হাতে ভাঁড়ভর্তি রক্ত, মাংস আর মদ। নানা রঙের গুঁড়ো দিয়ে আঁকা বিশাল গোলাকার গণ্ডির ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক বিবসনা ভয়ংকরী।

রানির কিন্তু খেয়াল নেই কোনও দিকে। যেন সম্বিৎহারা।

টনক নড়েছিল পরক্ষণেই। বিষম লজ্জায় তাড়াতাড়ি বসন তুলে নিয়ে বরতনু আবৃত করে আনত মুখে দাঁড়িয়েছিল রাজার সমানে। তখন যেন বিনয়ের অবতার। লজ্জাবতী লতা।

হতভম্ব রাজা ঢোঁক গিলে জিজ্ঞেস করেছিলন, এসব কী?

ব্রত করছিলাম। আপনার মঙ্গলের জন্যে।

অর্ধাঙ্গিনী যদি ব্রতচারিণী হয়, তাহলে পতিবেদতার কিছু বলার থাকে না।

তা সত্ত্বেও বিড় বিড় করে জিজ্ঞেস করেছিলেন রাজা আদিত্যপ্রভ, ব্রত? এইরকম ভাবে?

লীলাময়ী ভঙ্গিমায় বলেছিল রানি, তাহলে শুনুন এই ব্রত কাহিনি। একদম ছেলেবেলা থেকেই শুরু করছি। বাপের বাড়িতে থাকার সময়ে একদিন বান্ধবীদের নিয়ে গেছিলাম বাগানে, বসন্ত উৎসবে। সখীরা বললে, মনের মতো বড়ো চাও তো বিঘ্নরাজ বিনায়ক দেবতার পুজো করো। বিগ্রহ রয়েছে এই বাগানেই—গাছের আড়ালে। আমি বলেছিলাম, এই কাঁচা বয়েসে পুজো করলে বিঘ্নরাজ আমার পুজো নেবেন কেন? বান্ধবীরা বললে, না করলেই বরং বিপদ। শম্ভুপুত্র ষড়ানন তো বিঘ্নরাজের কৃপায় জাত পুত্র। তারকাসুর বধের জন্যে যখন তাঁকে দেবরাজের কৃপায় জাতপুত্র। তারকাসুর বধের জন্যে যখন তাঁকে দেবসেনাপতি করা হচ্ছিল, তিনি বিঘ্নরাজের পুজো না করায় হাত এমনই অবশ হয়ে গেছিল যে সেনাপতিই করা যাচ্ছিল না। তারপর অবশ্য বিঘ্নরাজকে পুজো দেওয়া হয়, হাত ঠিক হয়ে যায়। সুতরাং বিঘ্নরাজকে দেবতারাও প্রসন্ন রাখে বাঞ্ছাপূরণের জন্যে। তুমি মানবী, তাঁকে খুশি রাখো। মনের মতো বর পাবে।

তুমি পুজো দিলে বিঘ্নরাজ কে? রাজার প্রশ্ন?

হ্যাঁ। একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল তরপরেই। পুজোয় তন্ময় ছিলাম বলে আশেপাশে তাকাইনি। পুজো শেষ করেই সখীদের দিকে মুখ ফিরিয়েছিলম। কাউকে দেখতে পেলাম না। খিল খিল হাসি ভেসে এসেছিল মাথার ওপর থেকে। চমকে উঠে ওপরে তাকিয়েছিলাম। দেখলাম, সঙ্গিনীরা শূন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গালে হাত দিয়ে শুনে যাচ্ছেন রাজা আদিত্যপ্রভ— তারপর? তারপর?

রানি বললে, আমার মূর্চ্ছা যাওয়ার মতো অবস্থা দেখে আরও জোরে হেসে উঠেছিল সখীর দল। পায়ের তলায় মাটি নেই, অথচ হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে শূন্যে। যেন একদল পরী।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—তোরা শুন্যে রয়েছিস কি করে?

ওরা বললে—আমরা যে ডাইনি হয়ে গেছি। ডাকিনীমন্ত্র জপ করে সিদ্ধিলাভ করেছি।

কার কাছে মন্ত্র শিখলি?

কালরাত্রির কাছে।

সে কে?

এক ব্রাহ্মণী।

শুধু মন্ত্রজপ করতে হয়?

তার সঙ্গে মানুষের মাংস-টাংস খেতে হয়।

নর মাংস! ছিঃ ছিঃ!

অভ্যেস করলেই হল। খেতে তো খারাপ নয়। তারপরেই সিদ্ধিলাভ।

কী সিদ্ধি?

খেচরি সিদ্ধি। শূন্যে ভেসে উঠে যেখানে খুশি যাওয়ার ক্ষমতা। ঠিক পাখির মতো।

কিন্তু নর মাংস...

একটু অভ্যেস করো না, ভাই।

তোমাকে ফেলে কোথাও যেতে মন চায় না। এসো না আমাদের সঙ্গে।

কিন্তু কালরাত্রি......

এখান থেকে বেশিদূরে তো নয়। চলো নিয়ে যাচ্ছি।

হুটোপাটি করে আকাশ থেকে নেমে এসে সখীরা আমাকে নিয়ে গেছিল সেই ব্রাহ্মণীর কাছে। ওরে বাবা! কী বিকট চেহারা! গর্তে ঢোকা দুই চোখ, আঁকশির মতো নাক, তেড়াবেঁকা জোড়া ভুরু, চওড়া কাঁধ, গালে মাংস ঝুলছে, গজালের মতো ছুঁচলো দাঁত বেরিয়ে আছে, বুকে যেন জোড়া লাউ, পেটখানা ঠিক জালার মতো।

ওরে বাবা! বললেন রাজা আদিত্যপ্রভ।

রানি বললে হি-হি হাসির পর, ভয়ে আমারও প্রাণ উড়ে গেছিল। ঠকঠক করে কাঁপছিলাম। সখীরা ধরে না থাকলে নির্ঘাৎ অজ্ঞান হয়ে যেতাম। ওরাই অনেক কথা-টথা বলে আমার ভয় ভাঙিয়ে দিল। ওদেরই কথায় কালরাত্রিকে পুজো করলাম।

পুজো করলে? পারলে?

পারলাম। সখীদের জন্যেই পারলাম। পুজো পেয়ে, বন্দনা শুনে, কালরাত্রি তো খুব খুশি। সেই দণ্ডেই আমাকে উলঙ্গ করে দিল। স্নান করাল রাজা। হয়ে শুনছেন। বিয়ের আগে বউ প্রকাশ্যে পাঁচজনের সামনে বিবস্ত্রা হয়েছিল শুনলে যে কোনও পতিপ্রবরের চক্ষুস্থির হয়। রাজা আদিত্যপ্রভরও তাই হয়েছিল। তিনি বাক্যহারা হয়েছিলেন।

রানি সেই সুযোগে বিনা বাধায় বলে গেছিল তার ব্যোমবিহারিণী হওয়ার রোমাঞ্চকর কাহিনি। আগো বিঘ্নরাজের পুজো করতে হয়েছিল রানিকে ওই উলঙ্গ অবস্থায়। তারপর পট্টবস্ত্র পরে বসতে হয়েছিল গণ্ডির মধ্যে ভৈরব-এর আরাধনা করার জন্যে। তারপর খেতে হয়েছিল মানুষের মাংস। আনা হয়েছিল সবার জন্যে, তা থেকেই কালরাত্রি রানিকে খেতে দিয়েছিল খানিকটা।

মন্ত্র দিয়েছিল তারপরে। কালরাত্রিই শিখিয়ে দিয়েছিল সেই মন্ত্র।

সখীরা তখন ওকে টেনে এনেছিল মণ্ডলের বাইরে। এনেই ফের উলঙ্গ করে দিয়েছিল রানিকে।

কী আশ্চর্য! ঠিক তারপরেই, ওই দিগম্বরী অবস্থাতেই, রানি ভেসে উঠেছিল শুন্যে। মন্ত্রের ফল, দীক্ষাগ্রহণের সিদ্ধি পেয়েছিল হাতে হাতে।

জীবনে প্রথম আকাশচারিণী হয়ে আহ্লাদে ফেটে পড়েছিল রানি। সখীদের নিয়ে হৈহুল্লোড় করেছিল শূন্যে অনেক্ষণ ধরে। রঙ্গরসিকতার তুফান ছুটেছিল ব্যোমমার্গে। অঙ্গে যে বসন নেই, তা ভুলেই গেছিল।

তারপর দলবল নিয়ে নেমে এসেছিল মাটিতে। গুরু কালরাত্রি অনুমতি দেওয়ার পর ফিরে এসেছিল বাড়িতে।

একটা বসন্ত উৎসব এইভাবে উদ্যাপন করার পর বহুবার রানি শূন্যে উঠেছে ডাইনিদের সঙ্গে। তখন কতোই বা বয়স। দিগবসনা হয়ে আকাশে সখীদের নিয়ে হুটোপাটি করেছে বহুবার। তারাও তো ডাইনি। অল্পবয়সী সুন্দরী ডাইনি।

হতভম্ব রাজা আদিত্যপ্রভ সব শোনবার পর জানতে চেয়েছিলেন কে এই কালরাত্রি? ব্রাহ্মণের মেয়ে, ডাইনিদের রাণী হয়ে গেল কী করে?

রানি তখন গুছিয়ে বলে গেছিল ভয়ংকরী কালরাত্রির পূর্ববৃত্তান্ত।

বেদজ্ঞ ছিলেন কালরাত্রির স্বামী বিষ্ণুস্বামী। আচার নিষ্ঠায় তিলমাত্র ক্রটি ছিল না। তাঁকে দেখলেই মাথা নুয়ে আসত শ্রদ্ধায়।

এমন পণ্ডিত স্বামীর প্রতিও অচলাভক্তি রাখতে পারেনি কালরাত্রি। কামশরে মরেছিল স্বামীর এক কন্দর্পকান্তি শিষ্যকে দেখে।

বিদ্যাদিগ্গজ বিষ্ণুস্বামীর ছাত্রাবাসে দেশবিদেশ থেকে শিক্ষার্থীরা আসত। নিয়ামিত থাকত। একটা ছাত্রের নাম সুন্দরক।

সুন্দরক সত্যিই সুন্দর ছেলে। ঠিক যেন ময়ূর ছাড়া কার্তিক। আচার ব্যবহার একদিন অন্য এক গ্রামে গেছিলেন বিষ্ণুস্বামী। বাড়ীতে ছিল শুধু এই সুন্দরক আর বিষ্ণুস্বামীর স্ত্রী। সুন্দরকের গুরুপত্নী। অনেকদিন ধরেই সুন্দরককে মনে মনে কামনা করে আসছিল কালরাত্রি। শরীরে শরীর মিশিয়ে দেওয়ার দুর্বার বাসনায় ছটফট করছিল। কিন্তু স্বামী বাড়ি থাকায় সুযোগ পায়নি।

সেদিন আর সামলাতে পারেনি নিজেকে। শূন্য গৃহ, স্বামী অন্য গ্রামে। গুরুপত্নীর ভোগাকঙক্ষ না মিটিয়ে পারিবে না সুন্দরক। এই ভেবে সোজাসুজি তার কাছে সংসর্গ কামনা করেছিল কালরাত্রি।

তারপরেই বুঝেছিল, ভুল হয়েছে। সুন্দরকের সুন্দর চেহারাটা সে দেখেছে, সুন্দর মনটা দেখেনি। সে বেদঅধ্যয়ন করতে এসেছে, কামশাস্ত্র চর্চা করতে আসেনি। কাম-কটাক্ষে সে অবিচল, যুবতী গুরুপত্নীর রতি-লালসা সে মিটোবে না। প্রস্তাবটা অত্যন্ত কদর্য। মুখের ওপরেই তা বলে দিয়েছিল।

কামিনী তখন বাঘিনী হয়ে গেছিল। অতৃপ্ত কামক্ষুধা উদগ্র ক্রোধে পরিণত হয়েছিল। নিজের সারাগায়ে আঁচড় কেটে, স্তনে রক্তরেখা ফুটিয়ে গালে নখের দাগ এঁকে, নিজের ঠোঁট নিজেই কামড়ে রক্তাক্ত করে, চুল খুলে বুকে পিঠে এলিয়ে দিয়ে, এবং কাপড়চোপর খুলে ফেলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ঘরময় ছড়িয়ে রেখে নগ্ন অবস্থায় দুগালে কান্নার জল গড়িয়ে বসেছিল স্বামীর ফিরে আসার পথ চেয়ে।

ভিন গাঁয়ের কাজ সেরে ক্লান্ত বিষ্ণুস্বামী বাড়ি ফিরতেই খুব আওয়াজ করে কেঁদে উঠেছিল কালরাত্রি।

বিষ্ণুস্বামী হতবাক। ছলাকলায় পটিয়সী কালরাত্রি মঞ্চ সাজিয়েছিল চমৎকার, দেখলেই যে কেউ বুঝবে, পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। মানানসই সংলাপও তৈরি করা ছিল। ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তা নিবেদন করে গেল সাত পাকে বাঁধা স্বামীকে।

শুনে তো বিষ্ণুশর্মা থ। তাঁর অবর্তমানে তাঁরই প্রিয় ছাত্র সুন্দরক কীনা গুরুপত্নীকে বলাৎকার করেছে জানোয়ারের মতো?

তিনি রেগে টং হলেন। ছাত্রকে উচিত শিক্ষা দেবেন মনস্থ করলেন। সূর্যের মতো জ্বলে উঠলেন সদাচারী ব্রাহ্মণ।

সুন্দরকের কপাল ভালো, ঠিক সেই সময়ে সে বাড়িতে ছিল না। অথবা, ইচ্ছে করেই গা-ঢাকা দিয়েছিল। কামুকী গুরুপত্নীর সঙ্গে কে বাড়িতে থাকা যায়? নিরাপদ নয়।

সন্ধ্যের সময়ে ফিরল গুরুগৃহে। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুস্বামী ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার ওপর। তিনি একা নন। অন্য ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে। এমন মার মারলেন যে অজ্ঞান হয়ে গেল সুন্দরক। আসল ব্যাপারটা বলবার সুযোগই পেল না।

কালরাত্রির দু-চোখ তখন ধক ধক করে জ্বলছে। রাগে, কামজ্বরে।

অজ্ঞান সুন্দরককে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেওয়া হল রাস্তায়।

গভীর রাতে জ্ঞান ফিরেছিল সুন্দরকের। বিনাদোষে এহেন প্রহারের পর গুরুগৃহে আর নয়, যে বাড়িতে ওই কুহকিনী ভ্রষ্টা আছে, সে বাড়িতে আর নয়।

টলতে টলতে এগিয়েছিল অন্যদিকে। সামনেই দেখেছিল একটা গোয়ালঘর। যন্ত্রণায় অস্থির অবস্থায় ঠাঁই নিল সেই গোয়ালঘরেই রাতটুকু কাটানোর জন্যে।

কিন্তু আতঙ্কে আর শরীরের যন্ত্রণায় দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি।

অমানিশার বিভীষিকাদের দেখতে পেয়েছিল সেই কারণেই।

হঠাৎ একটা ভীষণ আওয়াজ কানের ওপর ফেটে পড়তেই বিষম আতঙ্কে সেদিকে চেয়েছিল বেচারা সুন্দরক।

দেখেছিল, আবার এক ভয়ানক মেয়েছেলেকে!

বেচারা সুন্দরক! সুন্দর সে চেহারায়-চরিত্রে, তা সত্ত্বেও চোরের মার খেয়ে এসেছে এইমাত্র এক চরিত্রহীনার খপ্পরে পড়ে।

তারপরেই দেখতে হচ্ছে আর এক নারীকে। আরও বিভীষণা! আরও আতঙ্কময়ী! দুনিয়ার বিভীষিকা যেন পুঞ্জীভূত হয়েছে সেই করালকায়া রমণীর মধ্যে।

উঃ, কী ভীষণ! ভলকে ভলকে আগুন ছিটকে আসছে তার মুখ দিয়ে।

পরক্ষণেই দেখা গেল, ভয়ংকরী একা আসছে না, সঙ্গে রয়েছে আরও অনেক নিশীথিনী। কারও মুখ দিয়ে আগুন ছিটকোচ্ছে, কারও মুখ দিয়ে আলোকরশ্মি।

এবং তারা প্রত্যেকেই দিগবসনা!

পুরোধা সেই ভয়ংকরী নিশ্চয় পালের গোদা। ডাইনি প্রত্যেকেই। নিলাজ। নাচতে নাচতে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করতে করতে ছুটে আসছে গোয়ালঘরের দিকেই। লক্ষ্য নিশ্চয় সুন্দরক।

ভয়ে প্রাণ উড়ে গেছিল বেচারা সুন্দরকের। একে তো এক যৌনক্ষুধাতুরার চক্রান্তে প্রহার জর্জরিত শরীর, তার ওপর শেষরাতে এই অলৌকিক ব্যাপার। এবার একটা নয়, অনেকগুলো মেয়েছেলে ডাইনি প্রত্যেকেই উদোর প্রত্যেকেই।

ভয়ের চোটে ভূত-তাড়ানো মন্ত্র জপ করতে শুরু করেছিল সুন্দরক।

আর সেই মন্ত্রের জোরেই গোয়ালঘরের সামনে এসেও ভেতরে ঢুকতে পারল না ভীষণাকৃতি সেই পুরোধা রমণী, ডাইনি দলবল সমেত। তখন শুরু হল বিকট নাচ, বিশ্রী নাচ, ধাত ছেড়ে যাওয়ার মতো নাচ, সেই সঙ্গে ভলকে ভলকে আগুন বমি, ডাইনি রানির মুখ থেকে।

রাজা আদিত্যপ্রভকে এই পর্যন্ত কাহিনি শুনিয়ে বললে তার রানি, বুঝেছেন এই পালের গোদা ভয়ংকরী কে?

রাজার আত্মারাম তখন খাঁচাছাড়া হওয়ার উপক্রম। ঢোক গিলে বললেন, কে?

কালরাত্রি। বিষ্ণুপত্নীর কুলটা বউ। এরই ষড়যন্ত্রে মারের চোটে সুন্দরকের প্রাণ গলায় এসে ঠেকেছিল। ছেলেবেলা থেকেই ডাইনিদের নিয়ে রাত্রি নিশীথে টহল দেওয়া তার অভ্যেস, সেই রাতে ডাইনি-বাহিনী নিয়ে এসেছিল সুন্দরককে দিয়ে কামজ্বর জ্বর শরীর ঠাণ্ডা করার জন্যে। রূপলাবণ্য দেখিয়ে যখন হল না, তখন পিলে চমকে দিয়ে আশ মিটিয়ে সংসর্গ করা যাক। ডাইনি-সহবাস মানে তো শরীর থেকে রক্ত শুষে নেওয়া। সুন্দরক তা হতে দেবে কেন? তখন কালরাত্রি একটা জোরাল মন্ত্র আউড়ে সুন্দরকের ভূত-তাড়ানি মন্ত্রকে কাটিয়ে দিয়েছিল। দলবল নিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছিল গোয়ালঘরের নোংরা পারিবেশে। ডাইনিদের কাছে এমন জায়গাই তো কাম চরিতার্থতার প্রকৃষ্ট পরিবেশ। সুন্দরকও কম যায় না সে জানত ধাঁ করে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মন্ত্র। এখন সেই মন্ত্র পাঠ করতেই তাকে আর দেখা গেল না। কালরাত্রিও সংঘাতিক মেয়েছেলে। সে ডাইনি-রানি। অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর মন্ত্র তার কণ্ঠস্থ। এমন একটা মন্ত্র আউড়ে গেল যে গোটা গোয়ালঘরটাই সাঁৎ করে উঠে গেল শূন্যে। মন্ত্র যখন উচ্চারণ করছিল কালরাত্রি, অদৃশ্য অবস্থায় তা শুনে শুনে মুখস্থ করে নিয়েছিল সুন্দরক। এখন সেই মন্ত্রই বিড় বিড় করে বলে যেতেই গোয়ালঘর শূন্যপথে উড়ে গেল উজ্জয়িনীর দিকে। ভেসে রইল মহাশ্মশানের ওপর হাতখানেক ওপরে। কালরাত্রি তার ডাইনি সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে গোয়লঘর থেকে বেরিয়ে নেমে গেল শ্মশানে। শুরু হল উদ্দাম নাচ আর গান, সেইসঙ্গে নানারকমের বীভৎস খেলা, দেখলে কলজে বন্ধ হয়ে যেতে চায়।

এদিকে খিদের চোটে নাড়িভূড়ি জলে যাচ্ছিল সুন্দরকের। গোয়ালঘর থেকে চুপিসারে বেরিয়ে এদিকে সেদিকে চাল-টাল যা পাওয়া গেছিল, তাই খুঁটে খুঁটে খেয়ে নিয়ে ফের ফিরে এসেছিল গোয়ালঘরে। অদৃশ্য ছিল বলেই কামাতুরা কালরাত্রি তাকে দেখতে পায়নি। ডাইনি সঙ্গিনীদের নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ উদোম অবস্থায় বিকৃত কামক্রীড়া করে ফিরে এসেছিল। গোয়ালঘরে। মন্ত্র উচ্চারণ করতেই সাঁ সাঁ করে আকাশপথে গোয়ালঘর ফিরে গেছিল গোয়ালঘরের জায়গায়।

নেমে পড়েছিল কালরাত্রি। ডাকিনি সঙ্গিনীদের বিদেয় করে দিয়ে নিজে ঢুকেছিল স্বামীর বাড়িতে। আগের মতো ঘরের বউ সেজে।

আর তখনই গুরুপত্নীকে চিনতে পেরেছিল সুন্দরক। বেচারা সুন্দরক! ভয়াল ভয়ংকর এই ডাইনিই তাহলে গুরুদেব বিষ্ণুস্বামীর ঘরণী!

ভয়ে কাঠ হয়ে বাকি রাতটা কাটিয়েছিল গোয়ালঘরে। ভোরের আলো ফুটতেই সাহসে বুক বেঁধে গেছিল বন্ধুদের কাছে। বলেছিল অবিশ্বাস্য কাণ্ডকারখানার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

গুরুপত্নী দিনে ঘরণী, রাতে ডাকিনি! কী সর্বনাশ! শুনে তো বুকের রক্ত থমকে গেছিল সুন্দরক-সতীর্থদের।

এখন উপায়? সুন্দরকের ইচ্ছে ছিল, এ-তল্লাট ছেড়ে চম্পট দেওয়ার। কিন্তু তা হতে দেবে কেন তার বন্ধুরা? একটা কুলটা কামাতুরা পাপিষ্ঠার ভয়ে দেশত্যাগী হতে হবে বিনাদোষে? কক্ষনো নয়। সুন্দরককে থাকতে হবে এইখানেই। অন্য বাড়িতে।

এরপর আবার একদিন দেখা হয়ে গেল দুজনের। কালরাত্রি একটা দোকানে গেছিল কিছু জিনিস কিনতে, একই দোকানে তার আগেই গিয়ে জিনিসপত্র কিনছিল সুন্দরক।

পাপিষ্ঠার সারা শরীরে কামদাহ শুরু হয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ। এমনই উদগ্র কামপীড়া যে হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে দোকানের মধ্যেই চেপে ধরেছিল সুন্দরককে, হে রতিপতি, হে কামদেবতা, হে সুন্দরক, আমার শরীর যেজ্বলে গেল কামের আগুনে। তোমাকে না পেলে এ আগুন নিভবে না। ওগো সুন্দরক, এসো, আমাকে ঠাণ্ডা করো!

সুন্দরক ঠাণ্ডা মাথায় বললে, আপনি না আমার গুরুপত্নী? দোকনঘরে কাম প্রস্তাব করছেন সামান্য শিষ্যের কাছে! ছিঃ ছিঃ!

তাতেও বাগে আনা গেল না কামপিপাসাতুরা কালরাত্রিকে। তার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখন লকলক করছে কামশিখা।

সবিনয়ে বললে সুন্দরককে, তুমি না ধার্মিক? যে মরতে বসেছে, তার প্রাণরক্ষা করা কি তেমার ধর্ম নয়? আমার খিদে মেটাও, সুন্দরক। নইলে ব্রাহ্মণীর মৃত্যুর পাপ স্পর্শ করবে তোমাকে।

চোখা চোখা কথা বলে সুন্দরক হাঁকিয়ে দিয়েছিল কালরাত্রিকে। গুরুপত্নীকে সহবাস করলে যে ধর্ম করা হয়, এমন অধর্মের কথা জীবনে শোনেনি। শুনতেও চায় না।

আবার প্রত্যাখ্যান! কালরাত্রি বিভীষণা হয়ে গেল নিমেষে। অঙ্গের বসন ছিন্ন ভিন্ন করে দৌড়ে গেল স্বামীদেবতার কাছে, দেখুন! দেখুন! আপনার প্রিয় ছাত্র সুন্দরক আমার কী অবস্থা করেছে দেখুন। সেদিন আপনি বাড়িতে ছিলেন না, জানোয়ারের মতো ধর্ষণ করেছে। আর আজকে দোকানে গেছিলাম, আমার জামাকাপড় সব ছিঁড়ে প্রায় ন্যাংটো করে দিয়েছে।

বিষ্ণুস্বামীর মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ঠিক করলেন, আর নয়, এবার স্বহস্তে খতম করে দেওয়া যাক সুন্দরককে। আগে তার খাওয়াদাওয়া বন্ধ করলেন। যেখানে খেতে যেত সুন্দরক, বিষ্ণুস্বামীর আদেশে তারা হাঁকিয়ে দিল বেচারাকে।

নিষ্পাপ ক্ষুধার্ত ছেলেটা ফের এল সেই গোয়ালঘরে।

সব খবরই রাখছিল ভয়ংকরী কালরাত্রি। মতলব মতোই কাজ এগোচ্ছে দেখে সেই রাতেই ফের ডাইনি-বাহিনী নিয়ে হানা দিল গোয়ালঘরে। আগের মতোই মন্ত্রের জোরে নিজেকে অদৃশ্য করে রাখল সুন্দরক।

শূন্যবিহারের বিদ্যে তো সুন্দরকও জানত। কালরাত্রি তো জানতই। দুজনের মন্ত্রপাঠের ফলে আবার ব্যোমমার্গে সাঁ-সাঁ করে উড়ে গেল গোয়ালঘর। সমস্ত রাত আকাশে আকাশে টহল দিয়ে শেষ রাতের দিকে গোয়ালঘর মাটিতে নামিয়ে কালরাত্রি ফিরে গেল নিজের বাড়ি।

খিদের চোটে সুন্দরকের পেটে তখন আগুন লকলক করছে। মন্ত্রতন্ত্র সে অনেক জানে বটে, কিন্তু খাবার জোগাড়ের মন্ত্রটা জানা নেই। তাই ভোরের আলো ফুটতেই টলতে টলতে বেরোল পেটের জ্বালা নিভাতে।

পৌঁছোল একটা ফলের দোকানে। কিনল কিছু ফল। খানকয়েক খেয়ে নিল ওইখানেই। খিদে মিটল, তেষ্টাও গেল, হাতে পায়ে জোর এল। বাকি ফলগুলো হাতে নিয়ে রাস্তা দিয়ে যখন হেঁটে যাচ্ছে, এমন সময়ে ঘটল নতুন একটা বিপদ।

মালোয়া দেশের জনাকয়েক রাজকর্মচারী যাচ্ছিল সেই রাস্তা দিয়ে। সুন্দরকের হাত থেকে সুন্দর সুন্দর ফলগুলো কেড়ে তো নিলই, শুধুমুধু তাকে বেধড়ক পিটতে পিটতে নিয়ে গেল রাজার কাছে। পেল করলসম্পূর্ণ মিথ্যে এক নালিশ, সুন্দরকের বিরুদ্ধে। অধ্যাপক বিষ্ণুস্বামীর উসকানিতেই ঘটল এই কাণ্ড। তিনি রইলেন আড়ালে।

অসহায় সুন্দরককে মারতে মারতে যখন রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন তা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। খবর পৌঁছে গেছিল সুন্দরকের বন্ধুদের কাছে, যাদের সঙ্গে বেদাভ্যাস করে এসেছে এতদিন।

সুন্দরকের মতো হিরের টুকরো ছেলে চোরের মার খাচ্ছে প্রকাশ্য রাস্তায়, রাজা নাকি তাকে শূলে চাপাবেন, এই সব পল্লবিত রটনা সতীর্থদের কানে যেতেই তারা আর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারেনি। গুরুর উসকানিতেই একদিন এই সুন্দরককেই তারা উত্তম মধ্যম দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসেছিল।

সেই সকালে চাকা ঘুরে গেল উল্টোদিকে। পুরো ছাত্রবাহিনী দৌড়োল রাজদরবারে।

বিচার শুরু হল সুন্দরকের দরবার ভর্তি লোকের সামনে। কোনও কথারই জবাব দিল না সুন্দরক। মিথ্যে মামলায় কথা বলে লাভ কী? বলতে গেলে তো অনেক কথা বলতে হয়। তাহলে যে হাটে হাঁড়ি ভেঙে যাবে। গুরু বিষ্ণুস্বামীর নামে ঢি-ঢি পড়ে যাবে। গুরুপত্নীর নামে কেচ্ছা-কাহিনি সুন্দরকের মুখ দিয়ে বের করা কি সম্ভব? তার শিক্ষাদীক্ষা যে অন্যরকম।

তাই সে নিশ্চুপ রইল।

তখন সোচ্চার হয়েছিল তার বন্ধুরা।

বলেছিল, মহারাজা, আমরা সব জানি। কিন্তু এখানে কিচ্ছু বলবো না।

রাজার প্রশ্ন, তবে কোথায় বলবে?

ছেলেরা, আপনার এই রাজদরবারের সামনে যে প্রাসাদটা রয়েছে, আমাদের যদি ওই প্রাসাদের ওপরে উঠতে দেন, তাহলেই বলব।

এ তো বড়ো অদ্ভুত আবদার! মজা লেগেছিল রাজারও কৌতূহলও হয়েছিল বিলক্ষণ, এতগুলো সোনার চাঁদ ছেলে সর্বসমক্ষে মুখ খুলতে নারাজ কেন?

বন্ধুদের নিয়ে সুন্দরককে তিনি প্রাসাদের ওপরে যেতে বললেন। রাজা তাঁর পারিষদবর্গ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন প্রাসাদের বাইরে।

মোক্ষম সুযোগ এসে গেল সুন্দরকের হাতে। অনেক মার খেয়েছে, অনেক লাঞ্ছনা সয়েছে, মুখ বুজে। বন্ধুদের বুদ্ধিতে এবার সবকিছুর সুরাহা ঘটবে।

না, বদলা সে নেয়নি, ওটা তার স্বভাবে নেই।

শুধু আবৃত্তি করেছিল আশ্চর্য সেই আকাশচারী মন্ত্র। যে মন্ত্র উচ্চারণ করলে বিহঙ্গের মতো শূন্যে ভেসে যাওয়া যায়; উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যায় পায়ের তলার পর্বতকেও।

আর এতো সামান্য প্রাসাদ। যদিও সুউচ্চ।

কিন্তু খেচর মন্ত্র তার মহিমা দেখিয়ে দিল তৎক্ষণাৎ, চোখ ছানাবরা হয়ে গেল দেশের রাজা সমেত তালেবড় রাজপুরষদের।

আস্তে আস্তে শূন্যে ভেসে উঠল প্রকাণ্ড প্রাসাদ। পরক্ষণেই বিপুলাকায় বিমানের মতো ধেয়ে গেল আকাশপথে। দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল দূরদিগন্তে।

নিমেষে নিমেষে নীচে বিলীন হয়ে গেল একটার পর একটা দেশ। পৌঁছোল এক পুণ্যভূমিতে, প্রয়াগে, যেখানে গঙ্গা আর যমুনার পবিত্র সলিল মিলিত হয়েছে।

সঙ্গমের জলে তখন স্নান করতে নেমেছিলেন এক রাজা। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দেখলেন, এক ভাসমান প্রাসাদ অবতীর্ণ হল প্রয়াগতীর্থে। তা থেকে বেরিয়ে এল অপূর্বকান্তি একটি ছেলে।

সে সুন্দরক।

রাজা তাকে যথোচিত সম্ভ্রম প্রদর্শন করলেন। তারপর সবিনয়ে শুধোলেন, তুমি কে বাবা? আকাশ থেকে নেমে এলে কেন?

সুন্দরক আত্মপরিচয় গোপন করে গেল উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে।

বললে, আমার নাম মুরজক। শিবের এক অনুচর। তাঁর আদেশ হয়েছে, তাই এসেছি। দেখতে চাই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা।

রাজা বললেন, সোজা কৈলাস থেকে?

সুন্দরক বললে, তা তো বটেই।

রাজা তাকে নিয়ে এলেন নিজের জায়গায়। আলাদা একটা প্রাসাদ বানিয়ে দিলেন সুন্দরকের জন্যে। মণিমাণিক্য দিয়ে সাজানো আশ্চর্য সেই, প্রাসাদ উৎসর্গ করলেন সুন্দরককে।

সুন্দরক থেকে গেল সেই দিব্য অট্টালিকায়।

কিছুদিন পর আলাপ হল এক যোগাচার্য পুরুষের সঙ্গে। সুন্দরকের শিক্ষাদীক্ষায় তিনি প্রীত হলেন। স্বেচ্ছায় তাকে শিখিয়ে দিলেন আর একটি মহাবিদ্যা।

ইচ্ছেমতো শূন্যপথে ভ্রমণের বিদ্যা। মন্ত্রজপ করলেই আকাশপথে যত্রতত্র বিহারের ক্ষমতা। কোনও কিছুতে না চেপেই। এর আগে দেখা গেছে মন্ত্র পড়ে গোয়ালঘরকে শূন্যে ভাসিয়েছে সুন্দরক। কালরাত্রি যে মন্ত্র আউড়ে এই কাণ্ড করেছিল, তা শুনে শুনে শিখে নিয়েছিল সুন্দরক। শ্রুতিধর বলে তা সম্ভব হয়েছিল। গোয়ালঘর উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার মন্ত্রও শুনে শুনে শিখে নিয়েছিল।

এবার শিখল কোনও কিছু আঁকড়ে না থেকেই শূন্যবিহারের মন্ত্র। শেখবার পরেই ইচ্ছে হল, এবার তাহলে জন্মভূমি কান্যকুব্জ ঘুরে আসা যাক।

তৎক্ষণাৎ মন্ত্রবলে হাজির হয়ে গেল কান্যকুব্জের ওপরে। আকাশ থেকে যখন সাঁ-সাঁ করে নেমে আসছে মাটিতে, কান্যকুব্জের রাজা দেখলেন সেই আশ্চর্য দৃশ্য!

সুন্দরক ভূমি স্পর্শ করতেই এসে দাঁড়ালেন সামনে। সবিনয়ে জানতে চাইলেন সুন্দরকের পরিচয়। কেনই বা গগন তেকে ধরণীতে তার আগমন। সুন্দরক কি মানব, না দেবতা?

সেই প্রথম তার নিগ্রহ কাহিনি বলে গেল সুন্দরক। ছলনাময়ী কালরাত্রির ব্যভিচারের রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্ত শুনে রাজা বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস করলেন। সেই মুহূর্তেই সেই পাপিষ্ঠা কুহকিনীকে আনালেন নিজের সামনে।

কালরাত্রি রাজার সামনে সুন্দরককে দেখেই বুঝে নিয়েছিল, তার কল্পনাতীত পাপ-কাহিনি কিছুই আর গোপন নেই। অস্বীকার করেও লাভ নেই।

সদম্ভে তাই বলে গেছিল গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো কীর্তিকলাপ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব সত্যি। সুন্দরক তার স্বামীর ছাত্র হতে পারে, কিন্তু তার শরীরটা বড়ো সুন্দর। তাকে দেখলেই কামানল উপস্থিত হয় কালরাত্রির সর্বঅঙ্গে। তাই যা কিছু সে করেছে, শরীরের চাহিদা মিটোতেই করেছে।

নির্লজ্জ কালরাত্রির সদম্ভ স্বীকারোক্তি শুনে রাজা আর স্থির থাকতে পারেননি। সেই মুহূর্তে হুকুম দিয়েছিলেন, কাটো ওই পাপিষ্ঠার নাক আর কান। থাকুক কুৎসিৎ হয়ে বাকি জীবনটা।

কিন্তু কালরাত্রির নাক-কান কাটা অত সোজা নয়। নিজের পাপাচার যে সদম্ভে বলে যায়, পরবর্তী পন্থা তার মনে মনেই তৈরি থাকে। কালরাত্রিও মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই বেহায়র মতো বলে গেছিল এক সুন্দর মানুষের প্রতি তার অগ্নি সম অতৃপ্ত কামক্ষুধার কাহিনি।

যে মুহূর্তে রাজ-আদেশে জল্লাদ এগিয়ে এসেছিল তার নাক আর কান কাটবার জন্যে তরবারি উঁচিয়ে...

সেই মুহূর্তেই দেখিয়ে দিল আর এক ভোজবাজি।

নিমেষে বাতাসের মধ্যে যেন গলে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই কুলটা কামিনী।

অবশ্যই খেচরী মন্ত্রবলে। সে যে ডাকিনী!

রাজাও কম যান না। গোটা দেশে জানিয়ে দিলেন কালরাত্রির কাহিনি। যেখানেই সে দৃশ্যমান হোক না কেন, খবর যেন চলে আসে রাজার কাছে।

অর্থাৎ, তাঁর রাজ্যের মধ্যে কালরাত্রির ডাকিনী ক্রিয়া আর চলবে না।

উত্তম ব্যবস্থা খুশি হল সুন্দরক। রাজার কাছে বিদায় নিয়ে উড়ে গেল আকাশে।

রাজা আদিত্যপ্রভ নিজের রানির মুখেই শুনলেন অবিশ্বাস্য এই কাহিনি। অন্য কেউ রানি সম্পর্কে বীভৎস এই কাহিনি শোনাতে এলে নির্ঘাৎ তার শিরচ্ছেদন করতেন। কিন্তু বলছে যে রানি নিজেই। ফলাও করে শোনাচ্ছে, ছেলেবেলা থেকে কীভাবে ডাকিনী তন্ত্রের সাধনা করে এসেছে, ডাইনি-রানি কালরাত্রির ভজনা করেছে!

সুতরাং তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়!

রাজার এহেন নিশ্চল মানসিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে সাড়ম্বরে এবার আসল কথায় চলে এল রানি।

বললে, রাজা, কালরাত্রি-কাহিনি আপনাকে সমস্ত বললাম একটাই কারণে। কুহক বিদ্যায় প্রকৃত জাদুকরী সে। অজস্র অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী। দেশের সর্বশক্তিমান নৃপতিও তার চুলের ডগাও ছুঁতে পারেননি। আমি সেই ক্ষমতার অনেকটা শিখেছি ছেলেবেলা থেকে তার সঙ্গে থেকে, তার শেখানো পন্থায় ডাকিনী-তন্ত্রের চর্চা করে। সেই ক্ষমতাকে আমি আরও বাড়িয়ে নিয়েছি পরমগুরু পতি-পুজো করে। পতির কল্যাণেই প্রয়োগ করেছি আমার যাবতীয় ক্ষমতা। সতীর কাছে পতির চেয়ে বড়ো দেবতা আর নেই। আপনি আমাকে একটু সাহায্য করলেই আমার ব্রত সম্পূর্ণ হবে। তখন যে সিদ্ধি অর্জন করবো, তা নিয়োজিত হবে আপনার কল্যাণেই।

রানির বাকচাতুর্যে টলে গেলেন রাজা। বললেন, কী সাহায্য?

রানি বললে, আপনার প্রিয় যে পুরুষ, তার মাংস।

আঁৎকে উঠলেন রাজা, আমার প্রিয় পুরুষ তো একজনই—

রানি বললেন, হ্যাঁ রাজা। তিনি ফলভূতি। ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণের মাংসই যে চাই।

রাজা থ, ফলভূতির মাংস! কিজন্যে?

রানি বললে, ভোজনের জন্যে। আপনি খাবেন, আমিও খাবো, তবেই ব্রত সম্পূর্ণ হবে। আপনি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হবেন।

শিউরে উঠেছিলেন রাজা। সেই সঙ্গে প্রবল ঘৃণায় মন বেঁকে গেছিল রানির ওপর। কী কুৎসিত প্রস্তাব। ফলভূতির মতো সৎ ব্রাহ্মণের মাংস আহার করতে চায় রানি! কী সাংঘাতিক মেয়েছেলে! খাওয়াতে চায় স্বামীকেও, বিশাল রাজত্বের প্রলোভন দেখিয়ে!

কক্ষনো না! কক্ষনো না! কক্ষনো না!

কিন্তু 'না' কে কী করে হ্যাঁ করতে হয়, তা জানে ডাকিনী বিদ্যায় বিদূষী নারীরা। তারা কথায় কুহকিনী, চাহনিতে মায়াসঞ্চারিণী, অঙ্গ-বিদ্যুতে কাম প্রবাহিনী রাজার মন ঘুরিয়ে দিতে বেশি সময় লাগেনি অপরূপা

রানির, কালরাত্রির সুযোগ্য শিষ্যার। কালরাত্রি কাহিনি সে অকারণে শোনায়নি রাজাকে, না শোনালেও চলতো। ফলভতির মাংস আহারেরমূল কারণ শূধু অলৌকিক ক্ষমতালাভ তো নয়, না, মূল কারণ সেটা নয়।

মূল উদ্দেশ্য, ফলভূতি নিধন!

কারণ? ফলভূতি নাকি রানিকে রমণ করতে চেয়েছিল!

রাজা জ্বলে উঠলেন তৎক্ষণাৎ। যাকে আশ্রয় দিয়েছেন, তার এতবড়ো স্পর্ধা! এই কুকর্মের একমাত্র সাজা, প্রাণদণ্ড!

মেয়েদের এই এক ক্ষমতা ঈশ্বর দিয়েছেন। নিজেদের কলঙ্ক ঢাকতে অন্য পুরুষকে কলঙ্ক-পাঁকে ডুবিয়ে দিতে পারে অনায়াসে, তার জন্যে তাদের মুখের কথাই যথেষ্ট। সাক্ষ্য-প্রমাণের দরকার হয় না।

ডাকিনী তন্ত্রের দোহাই দিয়ে রানি রাজার মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে আর একটা প্রলোভন। সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হওয়া যাবে ফলভূতির মাংস ভক্ষণে।

নিমরাজি রাজার মুখ বিকৃত হয়ে রয়েছে দেখে তৎক্ষণাৎ উত্তম ভোজনের ব্যবস্থাও বাতলে দিয়েছিল।

কাঁচা মাংস তো খেতে হবে না। রান্না মাংস চাই, ফুলভূতির। বিষয়-লোভের মতো সর্বনাশা আর কিছু নেই। সাহসিক নামে এক পাচককে ডেকে রাজা তক্ষুনি হুকুম দিলেন, এখুনি যে আসবে রান্নাঘরে, তখুনি কাটবে তার মাথা, সে যেই হোক না কেন, সেই মাংস কড়া করে রেঁধে নিয়ে আসবে আমার আর রানির খাবার জন্যে, এই ঘরে।

হুকুমটা দিয়েই ফলভূতিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন রাজা। রাজার আদেশে তৎক্ষণাৎ হাজির হয়েছিল ফলভুতি। মোলায়েম গলায় রাজা বলেছিলেন, ওহে ফলভুতি, আমার একটা কাজ করে দেবে?

ফলভূতি তৎক্ষণাৎ রাজি, বলুন, কী আজ্ঞা?

বড্ড মাংস-খিদে পেয়েছে। রান্নাঘরে গিয়ে সাহসিক বামুন ঠাকুরকে বলে দাও, এখুনি যেন আনে মাংস।

রাজার মাংস খেতে ইচ্ছে হয়েছে! স্বাভাবিক, মৃগয়া থেকে ফিরে খিদে তো পাবেই। দৌড়েছিল ফলভূতি।

কিন্তু নির্দিষ্ট পরমায়ু নিয়েই তো আসতে হয় এই ধরায়। মেয়াদ না ফুরোলে ধরণীর মায়া কাটানো যায় না, পরলোকে প্রস্থান করা যায় না।

ফলভুতিরও মেয়াদ ফুরোয়নি।

তাই যখন রওনা হয়েছে পাচক-ঘর অভিমুখে, দেখা হয়ে গেছিল রাজকুমার চন্দ্রপ্রভর সঙ্গে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে যাচ্ছিল বিশ্বস্ত কারও খোঁজে যে এখুনি গিয়ে একজোড়া সোনার কুণ্ডল গড়িয়ে আনবে। কুণ্ডল কানে দেওয়ার বড়ো ইচ্ছে হয়েছে রাজকুমারের, কিন্তু নিজে কর্মকারের কাছে যায় কী করে?

এই কথা! ফলভূতি বললে, আমি যাচ্ছি কুণ্ডল গড়াতে। তুমি সোজা চলে যাও পাচক-শালায়। সাহসিক বামুন ঠাকুরকে বলবে, এখুনি যেন কড়া পাকের মাংস রেঁধে আনে রাজা মশায়ের জন্যে।

ফলে, যার ভাগ্যে যা আছে, তা ঘটে গেল।

সাহসিক-এর ওপর হুকুম ছিল, এখুনি যে আসবে, তাকে খতম করে তার মাংস রান্না করার। সে যে-ই হোক না কেন। কারও নাম তো করেননি রাজা।

সুতরাং, বেঁচে গেল ফলভূতি। প্রাণ গেল রাজপুত্রের। তার মাংস রান্না করে আনাও হল। রাজা-রানির সামনে। তৃপ্তির সঙ্গে সেই মাংস আহারও হল। তার আগে অবশ্য ব্রত-অনুষ্ঠানের বাকিটুকুও সেরে নিতে হয়েছিল রানিকে।

কিন্তু পৈশাচিক ব্রতাচার এমনই মাথা গরম করে দিয়েছিল রাজামশায়ের যে বাকি রাতটুকু তিনি ঘুমোতেই পারেননি। তৎসহ অনুশোচনার চাপা আগুনের দহন তো আছেই।

ভোরের দিকে তাই পায়চারি করছেন অস্থির চরণে, এমন সময়ে দেখলেন, হন্তদন্ত হয়ে আসছে ফলভূতি। হাতে একজোড়া সোনার কুণ্ডল!

আঁৎকে উঠলেন, রাজা আদিত্যপ্রভ! সক্কালবেলা নিশ্চয় ভূত দেখছেন না। জ্যান্ত ফলভূতিকেই দেখছেন। তাহলে কার মাংস খেলেন রাতে? সাহসিক কার মাংস রেঁধে এনেছিল?

জিজ্ঞেস করেছিলেন ফলভূতিকে, সাহসিককে মাংস রান্নার হুকুম দিতে বলেছিলাম তোমাকে। তুমি দিয়েছিলে?

না তো। রাজাকুমার এসে বললে কুণ্ডল গড়িয়ে আনতে। আমাকে পাঠিয়ে ও নিজেই তো গেল সাহসিক-এর কাছে। মাংস পাননি?

মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন রাজা আদিত্যপ্রভ।

নিয়তি বড়ো নির্মম। তাঁর পরিহাসও নিষ্করুণ। তাই একদিকে তিনি নিরপরাধ ফলভূতির প্রাণরক্ষে করলেন, আর একদিকে স্ত্রৈণ হওয়ার কঠোর সাজা রাজাকে দিলেন, নিজের ছেলের মাংস খাইয়ে, রেহাই দিলেন না রানিকেও, নারকীয় তন্ত্র-চর্চার পুরস্কার দিলেন গর্ভজাত সন্তানের মাংস খাইয়ে। এক ঢিলে দু-পাখি মারা হয়ে গেল!

রাজা অজ্ঞান। হইচই পড়ে গেল প্রাসাদে। রানি কেঁদে ভাসাল আর নিজের মহাপাপের কাহিনি বলে যাচ্ছে ঘোরের মাথায়।

শুনে সবাই বললে একটাই কথা, যেমন কর্ম তেমনি ফল। ফলভূতি এই আপ্তবাক্যই এসে পর্যন্ত সবাইকে শুনিয়ে যাচ্ছে। শক্ত দেওয়ালে পাথর ছুঁড়ে মারলে, সেই পাথর নিজের গায়েই ঠিকরে এসে লাগে।

সুতরাং, ফলভূতি দূরদর্শী, রাজা নন।

জনমত রাজার বিপক্ষে। রাজা-রানি নিজেরাও মহাশোকে আর অনুতাপানলে মৃতপ্রায়। দুজনেই একসাথে মৃত্যুবরণ করলেন জ্বলন্ত চিতায়।

মহাসমারোহে রাজ সিংহাসনে অভিষেক করা হল ফলভূতিকে।

যক্ষ-আদিষ্ট সোমদত্ত ওরফে ফলভূতির বাকি জীবনটা কেটে গেল রাজার হালে।

গল্প শেষ করে মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ বললে উদয়নকে, ভালোকাজ করলে পরিণাম ভালো, খারাপ কাজে পরিণাম খারাপ। আপনি রাজা ব্রহ্মদত্তকে যুদ্ধে হারিয়েও তাঁর প্রতি সম্মান দেখিয়ে আসছেন। তিনি যদি প্রতি-সম্মান না দেখিয়ে নিচ চক্রান্তে লিপ্ত হন, যোগ্য ফল পাবেনই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

নিশ্চিন্ত হল উদয়ন। সৈন্যসামন্ত নিয়ে ফিরে এল রাজধানী কোশাম্বিতে। বিপুল অভ্যর্থনা পেল আমজনতার কাছে। মহোৎসব অন্তে বসল বাপ-পিতামহের গজদন্ত সিংহাসনে, দুপাশে দুই রানিবাসবদত্তা আর পদ্মাবতী।

সুখে কেটে গেল দিনের পর দিন, সৎ পরামর্শ দিয়ে গেল মন্ত্রী আর সেনাপতি।

পিঙ্গলা আখ্যান

বিশাল সাম্রাজ্যের ভার মন্ত্রী আর সেনাপতিকে দিয়ে আনন্দসাগরে ডুবে গেল উদয়ন। বীণা রাজায় ভালো, বাসবদত্তা আর পদ্মাবতীর গানের গলা ভালো। সেই সঙ্গে মধুপান। মাঝে মাঝে মৃগয়া। হরিণ মেরে বড়ো আনন্দ পেত উদয়ন।

এই নিয়েই একদিন বকে গেলেন নারদমুনি। তিনি রাজসভায় এসে বললেন, মৃগয়ায় অতি-আসক্তি কত রাজার কত সর্বনাশ করেছে। পাণ্ডু রাজার জীবনটাই তো গেল হরিণের অভিশাপে। হরিণের ছদ্মবেশে ঋষি কিন্দম মেয়ে হরিণের সঙ্গে সঙ্গম করছিলেন। ওই সময়ে ঋষির বুকে তির ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন পাণ্ডুরাজা। মরবার আগে অভিশাপ দিয়ে গেছিলেন ঋষি, নিজের বউয়ের সঙ্গে সঙ্গম করতে করতে তুমিও মরবে। অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছিল অভিশাপ। নিজের রানি মাদ্রীর সঙ্গে সুরতক্রিয়ার সময়ে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন পাণ্ডু।

নারদ মুনির চাঁচাছোলা কথার বকুনি শুনে অধোবদন হয়ে গেছিল উদয়ন। দুশ্চিন্তাও হয়েছিল। বনেজঙ্গলে কত হরিণই তো সে মেরেছে। এদের কেউ শাপ দিয়ে যায়নি তো? কামপীড়ায় আক্রান্ত মুনি ঋষিরাও যখন হরিণ রূপে হরিণী সঙ্গম করে বেড়ায় জঙ্গলে, তখন মৃগয়া ব্যাপারটা খুব নিরাপদ নয়। বাসবদত্তা আর পদ্মাবতী দুজনেই রতি পটিয়সী। মধুমত্ত অবস্থায় উপগত হতে গিয়ে যদি প্রাণটাই বেরিয়ে যায়?

উদয়নের বিবর্ণ মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ কবে নারদ মুনি বুঝলেন, ভর্ৎসনার ওষুধ ধরেছে। সঙ্গম-সময়ে এবং চরমানন্দের আগে কোনও পুরুষই মরতে চায় না।

সুতরাং একটা সুখজনক বার্তা প্রকাশ করলেন উদয়নের মলিন বদনে হাসি ফোটানোর অভিপ্রায়ে, তোমার স্ত্রী বাসবদত্তা সাধারণ মানবী নয়, তার মধ্যে রয়েছে ভগবতী গৌরীর অংশ। সে নিজেও শিবপুজো করে। তাই শিগগিরই তার গর্ভে যে ছেলে আসবে, তোমার ঔরসজাত সেই পুত্র কে জানো? কামদেব স্বয়ং, রতিপতি কামদেব।

শুনে উৎফুল্ল হয়েছিল উদয়ন। মানবরূপী কামদেবের পিতা হওয়া তো বিলক্ষণ সৌভাগ্য।

নারদ মুনি এই সৌভাগ্য বিবরণই শুনিয়ে বলে গেলেন অবশেষে, এই ছেলে বিদ্যাধর, চক্রবর্তী হবে। রাজপরিবারে সুখশান্তি আনন্দ বাড়বে। কিন্তু অকারণে জীবহত্যা বড়ো নৃশংস কাজ, তা যেন আর না হয়।

এইভাবে শিকারের নেশা থেকে উদয়নের মন সরিয়ে নারদ মুনি ফিরে গেলেন স্বস্থানে। উদয়নও হন্তদন্ত হয়ে অন্তঃপুরে গিয়ে সর্বাগ্রে সুসংবাদটা দিল রানি বাসবদত্তাকে। তারপর শুরু হল সানন্দ প্রতীক্ষা।

এই সময়ের একটা ঘটনা বলা যাক। নারদ মুনি যেদিন এসেছিলেন, তার পরের দিনের ঘটনা।

রাজসভা আলো করে বসে আছে উদয়ন। এমন সময়ে খবর এল, এক দুঃখিনী ব্রাহ্মণী রাজদর্শন করতে চায়। তার সঙ্গে রয়েছে দুটি ছেলে। দ্বারপাল কি তাদের ঢুকতে দেবে?

উদয়নের হুকুম পেয়ে তার সামনে এল ব্রাহ্মণী তারা দুই ছেলেকে নিয়ে। একদমই শিশু। তারা রয়েছে মায়ের কোলে। ব্রাহ্মণীর শরীর অনাহারে শীর্ণ। পোশাক অতি জীর্ণ, কোনও রকমে লজ্জা নিবারণ করা হয়েছে। কণ্ঠস্বর কিন্তু মর্যাদা গম্ভীর। বললে রাজাকে, জন্মেছিলাম বড়ো বংশে। কিন্তু ভাগ্য আমাকে মেরেছে। দুটো ছেলের মুখে দেওয়ার মতো বুকের দুধও আমার নেই। নিজেই খেতে পাই না। আমাকে বাঁচান, ছেলে দুটোকে বাঁচান।

সোজা সরল এবং অতি করুণ আবেদন। তৎক্ষণাৎ করুণার প্লাবন বয়ে গেছিল উদয়নের মনের দু-কূলে। কোলের দুই ছেলে সমেত ব্রাহ্মণীকে পাঠিয়ে দিলেন বড়ো রানি বাসবদত্তার কাছে।

বাসবদত্তা নিজে মা হতে চলেছে। এমন সময়ে তার সামনে হাজির হয়েছিল অনাহার শীর্ণ এক রমণী, যার কোলের দুই শিশুর মুখে দেওয়ার মতো দুধও নেই শরীরে। মনটা কীরকম যেন হয়ে গেল বাসবদত্তার। অন্যমনস্ক। কী যেন ভাবছে। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তৎক্ষণাৎ পরিচারিকাদের দিয়ে স্নানঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিল ব্রাহ্মণীকে। আবার কিছুক্ষণ বসেছিল গালে হাত দিয়ে। ব্রাহ্মণীর স্নান আর নতুন কাপড় পরা শেষ হলে নিজে স্নান আর অন্যান্য স্ত্রী-আচার শেষ করে এসে বসল ব্রাহ্মণীর সামনে।

বাসবদত্তা বুদ্ধিমতী। ব্রাহ্মণী যে উচ্চবংশের কন্যা, তা মুখ দেখে বোঝা হয়ে গেছে। অথচ আজ সে খেতে পাচ্ছে না, ছেঁড়াকাপড় পড়ে আছে। মা হয়ে নাড়ী ছেঁড়া ধনযুগলকে অভুক্ত রেখেছে। কেন? সোজা প্রশ্ন করা অসমীচীন। তাই ঘুরিয়ে বলল, একটা গল্প বলুন।

গল্প! এই অবস্থায়! বুদ্ধিমতী ব্রাহ্মণীর বোঝা হয়ে গেল, বাসবদত্তা কী গল্প শুনতে চাইছে। গল্পের আড়ালে সত্যকাহিনি। হৃদয়বিদারক। অথচ গল্পচ্ছলে বলে গেলে কথা জড়িয়ে যাবে না।

প্রখরবুদ্ধি ব্রাহ্মণী বাসবদত্তার চোখে চোখে চেয়ে তাই বললে, গল্প আমি জানি না। একটা সত্যি গল্প বলছি, শুনুন।

এক রাজা ছিলেন, তাঁর নাম জয়দত্ত। রাজ্য খুব বড়ো না হলেও বৈভব কম ছিল না। তাঁর এক ছেলে। নাম, দেবদত্ত।

দেবদত্তর বিয়ে নিয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। রাজার ছেলের বিয়ে হওয়া উচিত রাজার মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু রাজবাড়ির লক্ষ্মী বড়ো চঞ্চলা হয়। যার শক্তি বেশি, তার ঘরে যায়।

সে তুলনায় বণিকঘরের লক্ষ্মীর অনুরাগ বেশি। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। রাজলক্ষ্মীর মতো চঞ্চলা নয়।

এইসব বিবেচনা করে জয়দত্ত ঠিক করলেন, ছেলের বিয়ে দেবেন বণিককন্যার সঙ্গে।

সে রকম পাত্রী পাওয়া গেল পাটলীপুত্র নগরে। ধনকুবের ব্যবসায়ী বসুদত্তর মেয়ে বিয়ে হয়ে গেল। প্রচুর পণ পেলেন রাজা জয়দত্ত। বউমা এসে রইল বাড়িতে।

কিছুদিন পরে গেল বাপের বাড়ি।

আর ঠিক এই সময়ে চঞ্চলা লক্ষ্মী সরে গেলেন রাজবাড়ি থেকে। হঠাৎ মারা গেলেন রাজা জয়দত্ত। চিরশত্রুরা মওকা বুঝে রাজ্য দখল করে নিল। রাজকুমার দেবদত্ত মাকে নিয়ে পালিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে। রাজধানীর বাইরে। অন্য দেশে।

চরম দুরবস্থার সেই শুরু। দেবদত্তর মা বুদ্ধি দিয়েছিল ছেলেকে, এই দেশের সম্রাটের অধীন ছিল তোর বাবার রাজ্য। সম্রাটের কাছে যা, তার সাহায্য নিয়ে শত্রুদের তাড়িয়ে রাজ্য দখল কর।

ছেলে বললে, এই চেহারায়? ঢুকতেই দেবে না।

মা বললে, তাহলে শ্বশুরবাড়ি যা, শ্বশুরের কাছে টাকা-পয়সা নিয়ে ভালো জামাকাপড় কিনে, রাজপুত্র-চেহারায় সম্রাটের কাছে যা।

উত্তম প্রস্তাব। এক সন্ধ্যায় শ্বশুরবাড়ির সামনে হাজির হল দেবদত্ত। কিন্তু শ্রীহীন চেহারা নিয়ে ঢোকবার ইচ্ছে হল না।

শ্বশুরবাড়ির সামনেই ছিল একটা ফাঁকা বাড়ি। ভাবল, রাত কাটানো যাক সেখানে। রইল বাইরের দিকে এমন একটা জায়গায় যেখান থেকে শ্বশুরবাড়ি দেখা যায়।

রাত দুপুরে দেখল এক আশ্চর্য দৃশ্য।

ঝপাস করে একটা দড়ি ঝোলানো হল শ্বশুরবাড়ির ওপরের তলা থেকে নীচের তলা পর্যন্ত। দড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল এক ভরাট যৌবনা মেয়ে।

দীনহীন চেহারায় একটা লোক হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেখে মেয়েটি তার কাছে গিয়ে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, কে তুমি?

মিন মিন করে ধূলিধূসরিত দেবদত্ত বলেছিল, ভবঘুরে।

তাচ্ছিল্যে মুখ বেঁকিয়ে ফাঁকা বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেছিল যুবতী।

দেবদত্ত কিন্তু চিনে নিয়েছিল ওইটুকু সময়ের মধ্যেই। তারই বিয়ে করা বউ!

তাই পা-টিপে টিপে গিয়ে উঁকি মেরেছিল ফাঁকা বাড়ির মধ্যে।

দেখেছিল এক জঘন্য দৃশ্য। ঘরের মধ্যে আগে থেকেই বসেছিল একটা লোক। বণিক কন্যাকে সে মাটিতে ফেলে লাথির পর লাথি মারছে দেরি করে আসার জন্যে! কুলটা কামিনী ক্ষমা চাইছে রাতের নাগরের কাছে!

মন গলে গেল পরপুরুষের। শুরু হল প্রমের কথা, চুম্বন, শৃঙ্গার, সংসর্গ, সারারাত ধরে, বিরামবিহীন ভাবে।

বাইরে দাঁড়িয়ে রাগে শুধু ঠকঠক করে কেঁপেই গেছিল দেবদত্ত। তার ধমনীতে আছে রাজরক্ত। আছে শৌর্য, বীর্য, দর্প। নীচ কুলের রমণীকে গৃহবধূ করলে যে কি পরিণাম হয়, তা প্রত্যক্ষ করে সহ্যশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল। কাক-কন্যা কি কোকিলা-পুত্রকে ভালোবাসতে পারে? যে নীচ, সে নীচ-এর সঙ্গে মিশে যায়, উচ্চসংসর্গ তার অসহ্য। সুতরাং বণিক-কন্যা ক্ষমার্থ। তবে হ্যাঁ, এই দৃশ্য চোখ খুলে দিল দেবদত্তর। সে জানল একটা নির্মম সত্য, মেয়েরা সব পারে।

ভোরের আলো ফোটবার আগেই রতিলীলা শেষ করে বেরিয়ে এল দুজনে। রওনা হল যে-যার বাড়ির দিকে। দড়ি বেয়ে বণিক-কন্যা ফের উঠে গেল ওপর তলায়।

ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে একঘুম ঘুমিয়ে নিল দেবদত্ত। ঘুম যখন ভাঙল, তখন রোদ ঢুকছে ঘরে। সেই আলোয় রশ্মি ঠিকরে যাচ্ছে ঘরের কোণে পড়ে থাকা একটা জড়োয়া গয়না থেকে।

তারই বউয়ের গায়ে ছিল এই গয়না। সুরতক্রিয়ার সুবিধের জন্যে খুলে রেখেছিল। অবসাদক্লান্ত শরীর মনে করিয়ে দেয়নি গয়নার কথা।

মতলব স্থির হয়ে গেল দেবদত্তর, সেই মুহূর্তে। গয়না রাখল কাছে, শ্বশুরবাড়িতে আর ঢুকল না। গেল এক জহুরির কাছে গয়না বন্ধক রেখে এক লক্ষ টাকা নিয়ে জামাকাপড়, ঘোড়া, গাড়ি এই সমস্ত কিনে, রাজার মতোই বীরদর্পে হাজির হল সম্রাটের সামনে।

সম্রাট সমস্ত শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। ছোটো রাজ্য বলে কেড়ে নেওয়া হয়েছে গায়ের জোরে, মা আর ছেলেকে পথে বসিয়ে। তৎক্ষণাৎ তাঁর হুকুমে বিরাট সৈন্যবাহিনী গিয়ে বজ্জাৎ দখলদারদের খেদিয়ে দিয়েছিল। রাজত্ব ফিরে পেয়েছিল দেবদত্ত।

সিংহাসনে বসে শুরু হল দুশ্চরিত্রা বউয়ের মুখোশ খুলে দেওয়ার আয়োজন। ব্যভিচারিণীর সমস্ত বৃত্তান্ত লিখল এখটা গোপন চিঠিতে। প্রমাণ স্বরূপ, সঙ্গে রইল ফাঁকা বাড়িতে ফেলে যাওয়া সেই জড়োয়া গয়না। গয়নাটা জহুরির কাছ থেকে আগেই ফিরিয়ে এনেছিল দেবদত্ত সুদসমেত এক লক্ষ টাকা ফিরিয়ে দিয়ে।

এই গুপ্ত চিঠি আর জড়োয়া অলঙ্কার এক বিশ্বাসী কর্মচারির হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিল শ্বশুরমশায়ের কাছে। তার আদরের মেয়ের চরিত্র যে বেশ্যার চরিত্রের চাইতেও খারাপ, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ধনী শ্বশুরকে।

অর্থের অহংকারে স্ফীত শ্বশুর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন সেই চিঠি আর গয়না। তাঁর এতদিনের সমাজিক প্রতিষ্ঠা ধুলোয় লুটিয়ে দিল কলঙ্কিনী কন্যা।

পাপ আর পারা কখনও চাপা থাকে না। ফুটে বেরবেই। নৈশ অভিসারের রগরগে কাহিনি যখন প্রমাণ সমেত চলে এসেছে পিতৃদেবের সামনে তখন আর ক'দিন পরেই পথেঘাটে ছড়িয়ে পড়বে বড়ো বাড়ির বড়ো কেচ্ছা।

সুতরাং এ মুখ আর না দেখানোই ভালো। আত্মহত্যার পথ বেছে নিল কুলটা কামিনী।

দেবদত্তর ধৈর্য, তিতিক্ষা আর সহিষ্ণুতার এহেন নিদর্শন যথা সময়ে সম্রাটের কানে গেল। যে শক্তিমান, সে শক্তিকে সংহত করে রাখতে পারে। এমন ছেলেকেই জামাই করা যায়। সাম্রাজ্যের লাভ, সম্রাটের গর্ব, সম্রাট-কন্যার চির নিরাপত্তা।

ধুমধাম করে বিয়ে দিলেন মেয়ের সঙ্গে দেবদত্তর। মনের মতো প্রেমময়ী, ঐশ্বর্যময়ী বউ পেয়ে বড়ো সুখে রইল দেবদত্ত এরপর থেকে।

কাহিনি নিবেদন করে বললে প্রবীণা ব্রাহ্মণী, তাহলেই দেখুন, সব মেয়ে সমান হয় না। নীচ বংশে জন্মালে অন্তঃকরণ নীচ হয়, উচ্চবংশের মেয়েরা হয় নিষ্কলঙ্ক। এ বিষয়ে আমি আমার জীবন থেকেই একটা উদাহরণ দিতে পারি।

বাসবদত্তা ইঙ্গিত বুঝলেন। ব্রহ্মণী নবীনা নন, প্রবীণা। চেহারায় উচ্চকূলের সুস্পষ্ট ছাপ, অথচ নির্ধন। বড়ো ঘরের মেয়ে বলেই রাজ দরবারে এসেছেন, পা কাঁপেনি, গলা কাঁপেনি— কোলের শিশুপুত্র দুটির জন্যে। গৌরবহানি ঘটছে বলে একদম মনে করেননি।

কে ইনি?

ইঙ্গিত যখন দিয়েছেন জীবন থেকে নেওয়া আর এক গল্পের, তাহলে সেই গল্পই তাঁর জীবন কাহিনি।

বললে বাসবদত্তা, আপনি বড়ো বংশের দুহিতা, তা বুঝেছি। বিয়ে হয়েছিল কোথায়? এ রকম অবস্থাই বা হল কেন?

বাসবদত্তা শুধু ধরিয়ে দিয়েছিল। গল্প শুরু করেছিলেন ব্রাহ্মণী, প্রকারান্তরে যা তাঁর আত্মকাহিনী।

মালব নগরের নাম তো শুনেছেন। অগ্নিদত্ত নামে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ থাকতেন সেই নগরে। তাঁর অর্থেরও অভাব ছিল না। অন্তর থেকে দানবীর ছিলেন। প্রার্থীকে বিমুখ করতেন না।

দান করতে করতে নিজেই শেষে গরিব হয়ে গেলেন। আর ঠিক তখনই দুই ছেলের বাবাব হলেন। বড়ো ছেলের নাম শঙ্করদত্ত, ছোটর নাম শান্তিকর।

অল্প বয়েসেই শান্তিকর গৃহত্যাগী হয়েছিল। বিদ্যা অর্জনের জন্যে।

বড়ো ছেলে শঙ্কর দত্ত বিয়ে করেছিল আমাকে।
বিয়ের পরেই পরলোকে গেলেন আমার শ্বশুর আর শাশুড়ি।
শোক সহ্য করতে পারেনি আমার স্বামী। প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল সরস্বতীর জলে।
আমি তখন গর্ভবতী। তাই পতির পথ অনুকরণ করতে পারলাম না। এই অবস্থাতেও আমাকে নিষ্কৃতি দিল না একদল লুঠেরা। লুটে নিয়ে গেল সর্বস্ব। কাণাকরিও রইল না কাছে।
স্বামী নেই, শ্বশুর-শাশুড়ি নেই, দেওর নেই, খাঁ-খাঁ বাড়ি। টাকা-পয়সাও কিছু নেই। ঠিক করলাম, এদেশে আর নয়।
ঠিক এই সময়ে মুখ তুলে চাইলেন ভাগ্যদেবী। পরিচয় হল তিন মহিলার সঙ্গে। তাঁরা আমার করুণ কাহিনি শুনলেন। দেশান্তর গমনের ইচ্ছায় সায় দিলেন। আমাকে নিয়ে এলেন এই কৌশাম্বী নগরে।
প্রসব বেদনা শুরু হল তার পরেই। তারপর মা হলাম। একই সঙ্গে দুই ছেলের।
কিন্তু এদের বাঁচিয়ে রাখি কী করে?
অনেক ভাবলাম। ঠিক করলাম, রমণীর রমণীয়তা যে ভূষণের জন্যে, তা ত্যাগ করবো। লজ্জা। দুই দুই ছেলের মুখচেয়ে। তদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে।
এলাম রাজদরবারে। নির্লজ্জভাবে খেতে-পরতে চাইলাম।
রাজা উদয়ন মহানুভব, পাঠালেন আপনার কাছে।
রানি, এই আমার কাহিনি।
সুস্পষ্ট। সরল, সত্যভাষণ। গল্পের নলচের আড়াল দিয়ে শুরু, শেষটা কিন্তু মর্মস্পর্শী বাস্তব। প্রকৃতই উচ্চবংশ, উচ্চশিক্ষা আর দীক্ষার ফসল এই তেজস্বিনী প্রবীণা। মেয়েরা সব পারে। সন্তানের জন্যে লজ্জাও বিসর্জন দিতে পারে।
বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর বাসবদত্তা বললে, আপনার দেওর কোথায়?
শান্তিকর? জানি না কোথায়।
আবার একটু চুপ করে থেকে বললে বাসবদত্তা, একটা খবর আপনাকে দিতে পারি। যাচাই করে নিতে হবে আপনাকে।
দীপ্ত হল ব্রাহ্মণীর চক্ষু, কী খবর?
রাজবাড়ির প্রধান পুরোহিত বিদেশ থেকে এসেছেন। পণ্ডিত মানুষ। এখানেই থাকেন। আলাদা বাড়িতে।
কী নাম?
শান্তিকর।
স্থির চোখে চেয়ে রইলেন ব্রাহ্মণী, নিশ্চয় আমার দেওর।
বাসবদত্তা বললে, কাল তাঁকে অন্তঃপুরে আসতে বলব।
পরের দিন পুরুৎ ঠাকুর আসতেই আগে তার বংশপরিচয় জেনে নিল বাসবদত্তা। বর্ণে বর্ণে মিলে গেল ব্রাহ্মণী-কথিত অতীত কাহিনির সঙ্গে।
তারপর ব্রাহ্মণীকে ডাকা হল তাঁর সামনে।
ব্রাহ্মণীর চক্ষু সজল, কিন্তু পুরুৎমশায় চিনতে পারছে না বৌদিকে। স্বাভাবিক। অনেক ঝড়-জল-শোকতাপ-দারিদ্র্য গেছে এই রমণীর ওপর দিয়ে। দেখে গেছিল সধবা, এখন দেখছে এক বিধবাকে। কোলে দুটি ছেলে। না চেনাই স্বাভাবিক।
চিনিয়ে দিল বাসবদত্তা, আপনার বৌদি।
শান্তিকর স্তম্ভিত, দাদা?
নেই। বললেন ব্রাহ্মণী।
বাবা? মা?

কেউ নেই। এ দুজন এসেছে তারপরে। তোমার ভাইপো।

ব্রাহ্মণীর চোখ শুকনো। কিন্তু অশ্রু নেমেছে শান্তিকরের দু-গাল বেয়ে।

স্মিতমুখে বাসবদত্তা বললে ব্রহ্মণীকে, সব তো হল। আপনি কিন্তু এখনও আপনার নিজের নাম বলেননি।

আমার নাম পিঙ্গলা।

ছেলেদের নাম?

দেওরের দিকে চাইলেন পিঙ্গলা, নামকরণ তুমি করবে, ঠাকুরপো।

শান্তিকর চোখ মুছে নিয়ে তৎক্ষণাৎ নাম দিল দুই ভাইপোর। শান্তিসোম, বড়ো। বৈশ্বানর, ছোটো। কে বড়ো, কে ছোটো?

হেসে ফেললেন পিঙ্গলা, সে আমি জানি।

হালকা হাসির ঢেউয়ে পরিবেশ লঘু হয়ে যেতেই বাসবদত্তা বললে, এখন থেকে আপনি আমার সখী। থাকবেন আপনার দেওরের বাড়িতে। অবাধ গতি থাকবে অন্তঃপুরে।

কিছুদিন পরে, জানলায় দাঁড়িয়ে দুই সখী গল্প করছে। এমন সময়ে দেখা গেল রাস্তা দিয়ে এক কুমোর-বউ যাচ্ছে পাঁচ-পাঁচটা ছেলেকে নিয়ে।

দেখে চোখে জল এসে গেছিল বাসবদত্তার, কত ভাগ্যবতী। পাঁচটা ছেলে। আমার একটাও হল না।

পিঙ্গলা বললেন তৎক্ষণাৎ, গরিবের ঘরেই বেশি সন্তান জন্মায়, পাপের ফল। আপনি পুণ্যবতী। ধনবতী। আপনি হবেন এক সন্তানের মা।

ঠিক এই সময়ে রাজা উদয়ন ঢুকছিল ঘরের মধ্যে। শেষ কথাটা তারা কানে গেছিল। দেখেছিল বাসবদত্তার চোখে অশ্রু।

বলেছিল নরম গলায়, ভাবনা কীসের? ছেলে হবেই হিরের টুকরো। কিন্তু শিবের আরাধনা করার কথা ছিল, তা কি করা হয়েছে? দুজনকেই তো করতে হবে, একসঙ্গে।

তাই করা হয়েছিল। একরাতে পুজো শেষ করে যখন ঘুমোচ্ছে রাজা আর রানি, বাসবদত্তার স্বপ্নে হাজির হলেন এক জ্যোতির্ময় সাধু। একটা ফল দিলেন বাসবদত্তার হাতে।

তৎক্ষণাৎ ঘুম ভেঙে গেছিল বাসবদত্তার। উদয়নকে ঠেলে তুলে বলেছিল স্বপ্ন-কাহিনি।

রাজসভায় গিয়েই মন্ত্রীদের কাছে স্বপ্নের মানে জানতে চেয়েছিলেন উদয়ন।

জবাব হয়েছিল একটাই, শুভ স্বপ্ন। ফলের আকারে পুত্র উপহার গিয়ে গেলেন স্বয়ং শিবঠাকুর। আপনি পিতা হতে চলেছেন।

জীমুতবাহনের কাহিনি

বাসবদত্তার গর্ভে সন্তান এল এই স্বপ্ন দেখার পরেই। লক্ষণ প্রকাশ পেল শরীরে। ফ্যাকাশে হল মুখ, কালচে হল স্তনাগ্র, শরীর হল শীর্ণ, একটুতেই অবসাদ।

সখীরা মহাখুশি। অষ্টপ্রহর তাকে ঘিরে তার যত্ন নিয়ে চলেছে।

রাজা আহ্লাদে আটখানা। বাসবদত্তা যা বায়না ধরছে, উদয়ন সঙ্গে সঙ্গে তা রাখছে।

চলে এল বিদ্যাধরীরা। পরমানন্দে শূন্যে থেকে তারা রানির সেবাযত্ন, চিত্তবিনোদন করে গেল বিবিধ পন্থায়।

গগনবিহারী এই বিদ্যাধরীদের বিবিধ বৃত্তান্ত জানবার বড়ো আগ্রহ হয়েছিল বাসবদত্তার। অপরূপা পরীরা শূন্যে ভেসে থেকে হাসিমুখে রঙ্গপরিহাসে নৃত্যগীতে কত রকম ভাবে তার মনোরঞ্জন করে যাচ্ছে।

মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ রাজপরিবারের একান্ত সুহৃদ। অন্তঃপুর তার কাছে সদা অবারিত। গল্প জমাতে ওস্তাদ।

সুতরাং তাকেই ডেকে পাঠিয়েছিল বাসবদত্তা। বিদ্যাধর-কন্যারা কেন এত পরোপকার করে যাচ্ছে, বিনা প্রত্যাশায়, তা কি জানে সৌগন্ধনারায়ণ?

সৌগন্ধনারয়ণ বললে, জানি বই কী। গৌরী দেবীর জন্মস্থান হিমবান পাহাড়ে থাকে এই বিদ্যাধররা। এদের যিনি প্রধান, তাঁর নাম জীমূতকেতু। এঁর বাড়ির বাগানে ছিল এক কল্পগাছ। বৃক্ষরূপী দেবতা। তাঁর কাছে যা চাওয়া যেত, সঙ্গে সঙ্গে তা পাওয়া যেত।

জীমূতকেতু একদিন সেই কল্পতরুর কাছে গিয়ে বললেন, আপনি তো আমাদের কোনও প্রার্থনাই অপূর্ণ রাখেন না।

কল্পবৃক্ষ বললেন, কি চাই তোমার?

জীমূতকেতু বললেন, পুত্র চাই। বাবা হতে চাই।

কল্পবৃক্ষ বললেন, তথাস্তু। সে ছেলে হবে দানবীর, জাতিস্মর। সব্বার মঙ্গল করবে।

যথাসময়ে একটি ছেলে হল জীমূতকেতুর। তার নাম দেওয়া হল জীমূতবাহন।

বড় হল রাজপুত্র জীমূতবাহন. নানা গুণের প্রকাশ পেল তার মধ্যে। অন্তর জুড়ে থই থই করছে সর্বভূতে করুণা। মায়াদয়ার প্রতিমূর্তি।

যথাসময়ে যুবরাজ হল জীমূতবাহন। বাবার সামনে এসে বললে, এই পৃথিবীতে সবই অনিত্য। মহাকাল সবই নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যায়, থেকে যায় কেবল মহাপুরুষদের কীর্তিকথা। আমিও গরিব আতুরদের উপকার করে যেতে চাই, এই কল্পবৃক্ষের দৌলতে। আপনি অনুমতি দিন।

জীমূতকেতু খুশি হলেন। ছেলেকে নিয়ে গেলেন কল্পবৃক্ষের সামনে।

বললেন, আপনি বৃক্ষরূপী দেবতা। এতাবৎকাল আমরা যা চেয়েছি, তাই দিয়েছেন। এখন আমার ছেলে চাইছে দুনিয়ার দরিদ্রদের যেন দারিদ্র্য ঘুচে যায়। আপনি ওকে দয়া করুন।

কল্পতরু ডালপাতা দুলিয়ে অলৌকিক ব্যজন সৃষ্টি করে বিদ্যাধর রাজার অভিপ্রায় অনুমোদন করেছিলেন। তস্য তনয় জীমূতবাহনের দরিদ্র সেবায় সর্বতোভাবে সাহায্য করে গেছিলেন। ফলে, পৃথিবীতে গরিব আর রইল না। ডালপাতা থেকে অঝোরে ঝরে গেল দামিদামি মণিমাণক্য সোনাদানা। গরিবদের ঘরে ঘরে চলে গেল কল্পনাতীত সেই রত্নরাজি। জীমূতবাহনের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হল দশদিক। মহাপ্রাণ যুবরাজ। পিতার অনুমতি নিয়ে কল্পবৃক্ষ পর্যন্ত গরিবদের দুঃখমোচনে কাজে লাগায় যে ব্যক্তি সে প্রকৃতই ঋষিকল্প।

জীমূতবাহনের এহেন দশদিক ব্যাপী সুখ্যাতি কিন্তু ঈর্ষানলে দগ্ধে মারতে লাগল শত্রুপক্ষদের। তারা বিবেচনা করে দেখলে, কল্পবৃক্ষ যখন প্রার্থীদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাহলে জীমূতকেতুর শক্তিও হ্রাস পেয়েছে। এই সুযোগে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করা যাক চারদিক থেকে।

তাই হয়েছিল। সহসা চতুর্দিক থেকে শত্রুপরিবেষ্টিত হয়ে নাজেহাল হতে লাগলেন জীমূতকেতু। অতিষ্ঠ হয়ে শান্তিপ্রিয় জীমূতবাহন বাবা কে এসে বললে, শান্তি কোথায় এখানে। এখন থেকে বনবাস করব ঠিক করেছি। ধনঐশ্বর্য যত অশান্তির মূল।

জীমূতকেতু বললেন, আমি এখন বৃদ্ধ। বিষয়লালসা আমারও নেই। তুমি নিজেই যখন সর্বত্যাগী হচ্ছ, তখন আমিও তোমার সঙ্গে আছি।

পিতাপুত্রে গেলেন মলয়াচলে। সঙ্গে রইল জীমূতবাহনের বুড়িমা, সেখানকার মহীরূহরা মৃদুমন্দ সমীরণ ব্যজন করে দূর করে দিল তিনজনের মনের অশান্তি। চন্দন গাছ ঘেরা একটা নির্জন আশ্রমে রইলেন তিনজনে।

এই সময়ে একটা ঘটনার ফলে জানা গেল, মহাপ্রাণ জীমূতবাহন জাতিস্মরও বটে। পূর্বজন্মের কথা তার মনে আছে।

ঘটনাটা ঘটল এইভাবে।

মলয়াচলে তার এক বন্ধু জুটে গেল। সে-ও রাজপুত্র। সিদ্ধদের নৃপতি বিশ্ববসুর ছেলে। নাম, মিত্রাবসু। একজন সিদ্ধরাজকুমার, আর একজন বিদ্যাধররাজকুমার। কেউ কাউকে চোখের আড়াল করতে পারে না, এমনই বন্ধুত্ব।

এইসময়ে একদিন সিদ্ধরাজকুমারীকে দেখে কীরকম যেন হয়ে গেল বিদ্যাধররাজকুমার। মিত্রাবসুর এই ছোটো বোনকে দেখেই সে চিনেছে। যদিও এজন্মে দেখল এই প্রথম। কিন্তু যেহেতু তার আগের জন্মের কথা মনে আছে, তাই সেই ভুবনমোহিনী যুবতীকে দেখামাত্র মনে পড়ে গেছে, আগের জন্মে এই কন্যাই ছিল তার অর্ধাঙ্গিনী।

এ জন্মে এই কন্যার নাম মলয়াবতী।

প্রাণের বন্ধুদের কাছে কিছুই গোপন থাকে না। দুই রাজকুমারের মনের কথাও একদিন প্রকাশ পেল দুজনের কাছে। মিত্রাবসুর অনেকদিনের ইচ্ছে, জীমূতবাহন হয় যেন তার ভগ্নিপতি। শুধু বন্ধু নয়, শ্যালক হতেও চায়।

শুনে হাসল জীমূতবাহন। বললে, মিত্রাবসু, গতজন্মেও আমরা যে পরম মিত্র ছিলাম। তোমার বোন ছিল আমার বউ, এ জন্মেও তাই হোক।

জীমূতবাহন জাতিস্মর! এতদিনে তা জানা গেল। বিস্ময়াবিষ্ট মিত্রাবসু বললে, বন্ধু, আমার কৌতূহল মেটাও।

কী কৌতূহল?

তোমার পূর্বজন্মের কাহিনি শোনাও।

তাহলে শোনো।

আগের জন্মেও আমি ছিলাম বিদ্যাধর। আকাশে আকাশে টোটোঁ করতাম। একদিন হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু চুড়োটার ওপর দিয়ে যখন উড়ে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময়ে নীচের বাগানে হরগৌরীর মিলন চলছিল। মাথার ওপর দিয়ে আমাকে সাঁ-সাঁ করে যেতে দেখে তাঁরা রেগে যান। অভিশাপ দেন। যেন, মানুষ হয়ে জন্মাই।

ভয়ংকর অভিসম্পাত। মানুষ আমাকে হতেই হবে। খুব দমে গেলাম।

আমার ম্লানমুখ দেখে সদয় হলেন হরগৌরী।

বললেন, মানুষ হও, তারপর বিয়ে করবে এক বিদ্যাধরীকে। তোমার ঔরসে তার গর্ভে আসবে এক ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে ফের তুমি বিদ্যাধর হয়ে যাবে। আগের বিদ্যাধর জন্মের সব কথা মনে পড়ে যাবে।

এই বলেই উধাও হয়ে গেলেন মিথুনমত্ত হরগৌরী। আমাকেও বিদ্যাধর, শরীর ছেড়ে চলে আসতে হল মর্ত্যের মানব-শরীরে। জন্ম নিলাম মানুষ হয়ে, এক বণিক বংশে। আমার বাবা ছিলেন খুব বড়োলোক। বল্লবীনগরে তাঁর নিবাস। আমার নাম দেওয়া হল বসুদত্ত।

যখন যুবক হলাম, যেতে হল বাণিজ্য-অভিযানে। বহুদূরের এক দ্বীপে। বাণিজ্য অভিলাষী আরও কয়েকজন ছিল আমার সঙ্গে। ব্যবসার মতলব নিয়ে এদের সঙ্গেই দ্বীপময় টহল দিয়ে দেখতে লাগলাম কোথায় কী আছে, সস্তায় কী জিনিস নিয়ে যাওয়া যায় দ্বীপ থেকে।

কিন্তু কপালে ছিল দুঃখ। ডাকাতের খপ্পরে পড়লাম। সব কেড়ে নিয়ে বেঁধে নিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে। এক চণ্ডিকা মন্দিরে। আমার হাত-পা বেঁধে, চণ্ডিকার সামনে ফেলে রেখে, ডাকাতরা গেল পুজোর ব্যবস্থা করতে। ফিরে এসেই বলি দেবে আমাকে।

কিছুক্ষণ পরে দড়াম করে খুলে গেল মন্দিরের দরজা।

আঁৎকে উঠেছিলাম। দেখলাম, দরজা খুলে মন্দিরে ঢুকছেন ভীমদর্শন এক পুরুষ। পেশিময় বিরাট পুরুষ। হাতে পুজোর সামগ্রী।

একটু একটু করে জানলাম ভীমাকৃতি পুরুষের পরিচয়। এই জঙ্গলের সমস্ত সবরদের রাজা তিনি। নাম, পুলিন্দক।

বুঝলাম, এই মহাকায় পুরুষই এবার আমার মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করবেন ধর থেকে।

ভয়ে বেড়ে গেল হৃদস্পন্দন।

আমাকে দেখে কিন্তু করুণার সঞ্চার ঘটেছিল পুলিন্দকের মনে। আমার সুন্দর আকৃতি আর শুষ্ক বদন দেখে তাঁর ভেতরটা দুলে উঠেছিল। নিজে থেকেই আমাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে দিতে চাইলেন।

আমি চুপ করে রইলাম।

মুক্তি দিতে চাইছেন, অথচ মুক্তির কথা মুখে প্রকাশ করছেন না হাত-পা বাঁধা মানুষটা, এ কেমন জীব?

করুণার প্লাবন বয়ে গেল মহাপ্রাণ পুলিন্দকের অন্তরে। স্নেহ মমতা এমনই নির্ঝর, জগতের কঠিনতম প্রাণকেও নরম করে দিতে পারে।

কিন্তু আমাকে মুক্তি দিলে দেবীর বলিদান হবে কী করে? রুষ্ট হবেন যে দেবী চণ্ডিকা?

'নিঃশ্বেসে প্রাণ যে করিবে দান, ভয় নাই, তার ভয় নাই'। পুলিন্দক মনস্থ করলেন নিজেকে উৎসর্গ করবেন দেবীর পদতলে। আমাকে তাই বন্ধনমুক্ত করে দিলেন। আমি নিষ্ক্রান্ত হলাম মন্দির থেকে।

কিন্তু বাইরে থেকে চোখ রাখলাম মন্দিরের ভেতরে। দেখলাম এক আশ্চর্য দৃশ্য।

পুলিন্দক নিজের গলায় খড়েগর কোপ দিতে উদ্যত হতেই জাগ্রত হলেন দেবী চণ্ডিকা!স্বর্গীয় স্বরে বললেন, পুলিন্দক, তুমি স্বার্থপর নও। পরার্থে নিজের প্রাণ পর্যন্ত আহুতি দিতে পরাঙ্মুখ নও। আমি প্রীত হয়েছি। বলি চাই না। রুধির চাই না। বলো কি চাও।

পুলিন্দক বললেন, এই বণিকের সঙ্গে যেন আমার বন্ধুত্ব থাকে অন্যান্য জন্মেও।

প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন দেবী। তাঁর জ্যোতির্ময়ী প্রকাশ বিলীন হয়ে গেল বিগ্রহের মধ্যে। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। মন্দির মধ্যে সেই বহু বর্ণের আলোক নৃত্য আর রইল না। আমি বুঝলাম, পূর্ব পূর্ব জন্মের সঞ্চিত পুণ্যের দৌলতেই এমন এক অসাধারণ দৃশ্য দর্শন করলাম, আমার প্রাণটাও অকালে ঝরে গেল না।

পুলিন্দক বেরিয়ে গেলেন মন্দির থেকে। গেলেন নিজের ভবনে।

আমিও অরণ্যের গোলকধাঁধা অতিক্রম করলাম অতিকষ্টে। ডাকাতরা সেখানে থুকথুক করছে। কিন্তু দেবী কৃপায় প্রাণ নিয়ে ফিরে এলাম নিজের দেশে। বাড়ি ফিরে বাবাকে বললাম সব কথা।

বাবা খুশি হলেন। ডাকাতরা বাণিজ্য সম্পদ লুঠে নিয়ে গেছে, কিন্তু আমি তো প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি। উনি আনন্দে আটখানা হয়ে এক বিশাল উৎসবের আয়োজন করলেন।

উৎসব শেষে বাড়িতেই রয়ে গেলাম। বাণিজ্য করতে আর বাইরে গেলাম না।

কিছুদিন পরে বিরাট ডাকাতি হয়ে গেল আমাদেরই রাজধানীতে। লুঠপাটের সঙ্গে সঙ্গে নররক্তে মাটি ভিজে গেল।

দিন কয়েক পরে খবর পেলাম, ডাকাতদল ধরা পড়েছে। রাজার লোকজন তাদের ধরে নিয়ে এসেছে রাজধানীতে।

বন্ধুবান্ধব নিয়ে দেখতে গেলাম ভয়ংকর দস্যুদের, রাজধানীতে।

তারপর একাই চলে গেলাম জেলখানায়। দূর থেকে দেখেই চিনলাম। এই সেই রত্নলোভী দস্যুদল, যারা আমার বাণিজ্য সম্পদ কেড়ে নিয়েছিল, আমাকে বলি দিতে চণ্ডিকার মন্দিরে নিয়ে গেছিল।

ডাকাতদলকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিচারশালায়, তাদের মধ্যে দেখলাম পুলিন্দককে।

পণ করলাম, সংসর্গ দোষে এই হীন কাজ করেছে পুলিন্দক। কিন্তু সে আমার বন্ধু। প্রাণদাতা মিত্র। তার প্রাণরক্ষা আমি করবই।

বাড়ি ফিরেই বাবাকে সব বললাম, বাবা আমাকে নিয়ে রাজধানীতে গেলেন, রাজভাণ্ডারে এক লক্ষ সোনার টাকা দিলেন, পুলিন্দককে মুক্ত করলেন। বাড়ি নিয়ে এলেন।

দুই বন্ধু হৈ-হৈ করে কাটালাম বেশ কয়েকটা দিন। তারপর, পুলিন্দক ফিরে গেলেন স্বস্থানে।

নিজের জায়গায় ফিরে গিয়েও কিন্তু পুলিন্দক ভুলতে পারেননি আমাকে। কী ভাবে আমার ভালো করা যায়, আমাকে খুশির সাগরে ভাসিয়ে রাখা যায়, এই চিন্তাতেই তন্ময় হয়ে থাকতেন দিনরাত।

অনেক ভেবেচিন্তে একদিন ঠিক করলেন, একছড়া রত্নমালা উপহার দেবেন আমাকে। দামিদামি রত্ন তাঁর কাছে আছে অনেক। কিন্তু এই রত্নহার তিনি তৈরি করবেন গজমুক্তো দিয়ে!

কিন্তু যে হাতির মাথায় মুক্তো জন্মায়, সে হাতি তো থাকে হিমালয়ে। তিরধনুক নিয়ে হিমালয়ে চলে গেলেন পুলিন্দক। বেশ কিছু হাতি মেরে এদের মাথা থেকে সংগ্রহ করলেন অনেক গজমুক্তো। আরও চাই। আরও চাই।

হিমালয়ের নানান জায়গায় টইল দিয়ে গেলেন দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, গজমোতি হস্তীর সন্ধানে। এ হাতি বড়ই দুর্লভ। হিমালয় জায়গাটাও দুর্গম। কিন্তু ক্লান্তি নেই পুলিন্দকের শরীরে।

একদিন হঠাৎ চোখে পড়ল একটা সুরম্য দেবনিকেতন। সামনে এক মস্ত সরোবর। পরিষ্কার জল।

তেষ্টা পেলে নিশ্চয় গজমোতি হাতি আসে এখানে। এই ভেবে, দীঘির পাড়ে তিরধনুক নিয়ে লুকিয়ে রইলেন পুলিন্দক।

দীঘি থেকে একটু দূরে একটা ভারি সুন্দর বাগানে ছিল একটা মন্দির। ভগবান শঙ্করের মন্দির। মন্দিরে পুজো দিতে প্রায়ই আসত দেবলোকের রূপসীরা। সঙ্গে আনত নানান উপহার। শঙ্কর তুষ্ট হলে তাঁর মধ্যে বর পাওয়া তো যাবে। শিবলিঙ্গ সব কুমারীর আরাধ্য।

এই রকমই এক পরমাসুন্দরীকে হঠাৎ একদিন দেখতে পেলেন পুলিন্দক। যে সে কন্যা নয়, সিংহবাহিনী কন্যা!

পুলিন্দক হতভম্ব! সিংহের পিঠে সুন্দরী!

মানব-কন্যা নিশ্চয় নয়, দেব-কন্যা!

চোখের পলক না ফেলে অপরূপা সেই নারীরত্নকে দেখতে দেখতে হঠাৎ পুলিন্দক ভাবলেন, পেয়েছি! পেয়েছি! প্রিয়বন্ধু জীমূতকেতুকে উপহার দেওয়ার মতো রত্ন এতদিনে পেয়েছি। দুর্গম এই গিরিকান্তার থেকে সংগ্রহ করেছি বিস্তর গজমোতি, এবার পেলাম ত্রিভুবনে দুর্লভ এই নারীরত্নকে। অহো! অহো! কী রূপ! কী তেজ! পশুরাজ যাকে পৃষ্ঠে নিয়ে ধন্য করছে, এমন কন্যাই তো বন্ধুবর জীমূতবাহনের অঙ্কশায়িনী হওয়ার উপযুক্ত ললনা।

সিংহ যার বাহন, এমন কন্যার সংসর্গেই সৃষ্টি হোক সুন্দরতর। রতিপ্রতিম এই রমণী সম্ভোগে সুখী হোক আমার বন্ধু।

সংকল্পটা মনের মধ্যে গ্যাঁট হয়ে বসে যেতেই পা টিপে টিপে পুলিন্দক বেরিয়ে এলা দীঘির পাড়ের লুকোনো জায়গা থেকে। সিংহবাহিনী সুন্দরী ছিল বাগিচার ঠিক মাঝখানে। নিঃশব্দচরণে হাজির হল তার পাশে।

মেয়েটি তাকে দেখেই সিংহের পিঠ থেকে নেমে পায়ে পায়ে চলে গেল পদ্মদীঘির দিকে। জলে নেমে পদ্ম চয়ন সুরু করে দিল আপন মনে।

পুলিন্দক গিয়ে দাঁড়াল অপরূপার সামনে, চোখ নামিয়ে।

কোকিল কণ্ঠে বললে কামিনী, কে তুমি পথিক? কী-হেতু এসেছ এহেন দুর্গম পাহাড়ি জায়গায়?

পুলিন্দক বললে, দেবী, আমি ভবানি-উপাসক, জন্মেছি শবর কুলে। আমিই তাদের রাজা। আমার নাম পুলিন্দক। গজমুক্তা সংগ্রহের অভিলাষে এসেছিলাম এখানে। দেখলাম আপনাকে। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল আমার এক প্রিয় বন্ধুর কথা,

কে তিনি?

তার নাম বসুদত্ত। জন্ম বণিককুলে। আশ্চর্য রূপবান, পরম গুণবান, দিব্যকান্তি যুবক। এমন পুরুষরত্ন ত্রিলোকে আছে কীনা সন্দেহ। এমনই সুন্দর যে পুরুষমাত্রই তাকে দেখেই থ হয়ে যায়, ললনাদের চিত্ত চঞ্চল হয়। ভাবনা তো সেই কারণেই। এমন ত্রিভুবনসেরা সুন্দর মানুষ না জানি শেষ পর্যন্ত কার কামবাণে জর্জরিত

হয়। আপনাকে দেখে আমার সে আশঙ্কা দূর হয়েছে। আপনারা দুজনে যদি পরস্পরকে ভোগ করেন, তাহলে আমার চিত্ত স্থির হবে।

কথায় কিনা হয়। নিপুণ কামকথা বর্ষণে অলোকসুন্দরীর কাম-শিহরণ জাগ্রত করে দিয়েছিল পুলিন্দক। শুধু কথার প্যাঁচে কামরসের ক্ষরণ ঘটানো যায়, শবররাজা পুলিন্দক এহেন বাক্যকৌশলে বিলক্ষণ কুশলী। অপরূপা রমণীর প্রতিটি লোমরন্ধ্রে যেন একশ একটি কামশর প্রবিষ্ট হয়ে গেল কথার জাদুতে।

কামসিক্ত কণ্ঠে সে তাই বললে, হে শবররাজা, কোথায় তোমার সেই সুহৃৎ? তাকে দেখতে মন বড়ো ব্যাকুল হয়েছে। আনো তাকে এখানে।

পুলিন্দক তো তাই চায়। সুন্দর পতির সঙ্গে রতিরঙ্গ লোভে সুন্দরীকে কন্টকিত অবস্থায় রেখে দিন কয়েকের মধ্যেই চলে এল নিজের পাড়ায়। দামি দামি মণিরত্ন নিয়ে গেল বল্লবীনগরের রাজবাড়িতে, আমার আবাসস্থলে।

বাবার পায়ের ওপর লক্ষ লক্ষ মুদ্রার জহর ঢেলে দিয়ে, পাদবন্দনা সমাপ্ত করে, সেই রাতে থেকে গেল রাজবাড়িতে।

গভীর রাতে একটা নির্জন ঘরে, আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে সব কথা।

সব শেষে বললে তার পরিকল্পনা। রাত ভোর হওয়ার আগেই যেন রওনা হই সেই অপরূপা পর্বত কন্যার আলয় অভিমুখে।

কন্যার রূপরাশির সরস বর্ণনা শুনে ইস্তক আমি কামনা-কন্টকিত হয়েছিলাম। মানবীরূপে অমানবিক রূপের অধিকারিণীকে দেখবার জন্যে অস্থির হয়েছিলাম।

ভুবনমোহনী সেই গিরিকন্যার আকর্ষণেই সেই রজনীতেই পুলিন্দককে নিয়ে রওনা হলাম গিরিকান্তার অভিমুখে।

রাত প্রভাত হওয়ার পর আমি বাড়িতে নেই দেখে পিতৃদেব চিন্তিত হয়েছিলেন। তারপর যখন শুনলেন, পুলিন্দকও নেই, তখন বুঝলেন অজানার অভিযানে বেরিয়েছে দুই মিত্র। তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

গেলাম হিমাচলে। পুলিন্দক সঙ্গে ছিল বলেই অমন দুর্গম অঞ্চলও নির্বিঘ্নে অতিক্রম করে পৌঁছোলাম এক বনানীতে। রাত ভোর হতেই গেলাম দীঘির পাড়ে। দেখতে পেলাম সিংহের পিঠে উপবিষ্টা সেই আরূঢ়যৌবনাকে। সিংহবাহিনী, অথচ কমনীয়তা তার সর্বাঙ্গে। লোচনের কামবিদ্যুতেও শীতল স্নিগ্ধতা, প্রকৃতই যেন মানবীরূপে এক মণিকান্ত অমানবী। আমি অবশ হলাম, বিভোর হলাম, নিবিড়তম প্রেমে আত্মহারা হলাম।

সিংহবাহিনী সুন্দরী কিন্তু আমাদের তখনও দেখেনি। রূপের আলোয় দিকবিদিক ঝলকিত করে সে নামল সিংহের পিঠ থেকে। সিংহ যার বাহন, না জানি সে কি অমিত-বিক্রমা। পশুরাজ যাকে পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়ে গর্বিত, না জানি সে কোন লোকের অধিবাসিনী। আমি দেখলাম এবং মরলাম।

আমরা লুকিয়ে থেকে দেখলাম সুন্দরীর স্নানপর্ব। বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। রতিকান্তি রমণী যখন শিথিলবস্ত্র হয়ে স্নানরতা হয়, তখন ঊর্ধ্বগগনের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীও বুঝি স্তব্ধ হয়। আমার বস্থা হল সেই রকম। আমি প্রস্তরবৎ হয়ে রইলাম।

স্নান সমাপনান্তে সিক্ত অঙ্গে সরোবর থেকে উঠে এসে কামবর্ষিণী সেই কামিণী ফুল তুলে নিয়ে ঢুকলো বাগানের মধ্যিখানের চন্দ্রশেখর-মন্দিরে। পুজো দিয়ে যখন বেরিয়ে আসছে পুলিন্দক ধীর চরণে তার সামনে গেল।

বললে, আমি পুলিন্দক। আমার বন্ধুকে দেখতে চেয়েছিলেন, তাকে এনেছি।

মুহূর্তের মধ্যে বুঝি লক্ষ বিদ্যুৎ ঝলক তুলে দিয়ে গেছিল কামিনীর বরতনুতে। লোচনে দেখেছিলাম সেই বিদ্যুতাভাস, যা শীতল এবং স্নিগ্ধ।

নিবিড় গভীর স্থলিত স্বরে সে বলেছিল, কোথায় তিনি?

আমি পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম তার সামনে।

বিষম বিস্ময়ে চক্ষুপল্লব পর্যন্ত স্থির হয়ে গেছিল অপরূপার। আমার মাথার কেশ থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত যেন লেহন করে নিয়েছিল কাম-কাতর অক্ষি মণিকা দিয়ে। যেন আমি আর এক কন্দর্প। যেন আমার মতো রূপবান এই ব্রহ্মাণ্ডে আর নেই.

অতঃপর বলেছিল পুলিন্দককে, আপনার এই মিত্র কি প্রকৃতই মনুষ্য? নাকি মনুষ্যরূপী দেবতা? এসেছেন আমাকে অস্থির চঞ্চল করতে?

পুলিন্দক জবাব না দিয়ে আমার দিকে শুধু চেয়েছিল। বুদ্ধিমান পুরুষ। প্রেম যখন দুটি অঙ্গে বন্ধন সৃষ্টি করে ফেলেছে, তখন তার বাকরহিত থাকাই সঙ্গত।

জবাবটা আমিই দিয়েছিলাম। বলেছিলাম. ভুবনমোহিনী, সত্যিই আমি মানুষ। ঠকাতে চাই না তোমার মতো নিষ্পাপ সরলা নারীকে। তাই দিচ্ছি আত্মপরিচয়। বল্লবীপুরের মানুষ আমি। আমার বাবা এক সওদাগর। বিলক্ষণ ধনপতি। আমার নাম বসুদত্ত। আমার এহেন দিব্যকান্তির কারণ আছে। পুত্র কামনায় আমার বাবা মহাদেবের উপাসনা করেছিলেন, ফলে, আমার জন্ম। বড়ো হয়ে বাণিজ্য করতে বেরিয়েছিলাম। শবররাজা এই পুলিন্দকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। ইনি অতিশয় বন্ধুবৎসল। আমার কিছু গজমুক্তার প্রয়োজন হয়েছিল। সেই খোঁজেই ইনি দুর্গম গিরিঅঞ্চলে এসেছিলেন। সেই সময়ে পরিচয় ঘটে তোমার সঙ্গে। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্যে নিয়ে এসেছেন এখানে।

ব্রীড়াবিনম্র অবনতমস্তকে সব কথা শুনে গেল সেই আশ্চর্য সুন্দরী। তারপর বললে বীণানিন্দিত কোকিল-কণ্ঠী স্বরে, মহাদেবের কৃপায় আপনি ধরায় এসেছেন। আমি তাঁরই আরাধনা করি। কাল রাতে তিনি আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলে গেছেন, আজ পাবো দেবসম স্বামীকে। স্বপ্ন সত্যি হল।... পেলাম অপরূপ পতি, আপনাকে। আর পেলাম এক ভাইকে, আপনার সুহৃদ এই শবররাজাকে। আজ আমার পরম সৌভাগ্য।

পুলিন্দকের সঙ্গে পরামর্শে বসলাম, বিবাহ প্রসঙ্গে। সে বললে, বিয়ে হোক আমার বাড়িতে। ভাবী বধূ চলুক আমাদের সঙ্গে।

ভাবী বধূকে কোলে নিয়ে বসেছিলাম সিংহের পিঠে। ... পশুরাজের পিঠে আমি,
আমার কোলে যেন স্বর্গের দেবী।

সিংহবাহিনী কামিনী সম্মত হয়েছিল আমাদের প্রস্তাবে। চোখের ইঙ্গিত করেছিল দূরের সিংহকে। তৎক্ষণাৎ সিংহ এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে। ভাবী বধূকে কোলে নিয়ে বসেছিলাম সিংহের পিঠে। অগ্রসর হয়েছিল সিংহ, পুলিন্দক পথ দেখিয়ে হেঁটে গেছিল সামনে। পৌঁছেছিলাম বল্লবীপুরে। নগরবাসীরা হতভম্ব হয়েছিল আমাদের দেখে। পশুরাজের পিঠে আমি, আমার কোলে যেন স্বর্গের দেবী। খবর পেয়েই বাবা বেরিয়ে এসেছিলেন বাড়ি থেকে। সিংহের পিঠ থেকে নেমে তাঁকে প্রণাম করেছিলাম। প্রিয়তমাকে নিয়ে গৃহপ্রবেশ করেছিলাম। পুলিন্দক সব কথা বলেছিল আমার বাবাকে।

এরপরই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। আমাদের শুভবিবাহ সাঙ্গ হতেই সিংহ আর সিংহ রইল না, রূপান্তর ঘটলো, সিংহের জায়গায় দেখলাম এক দেবদর্শন পুরুষকে।

ঠিক যেন ইন্দ্রজাল? সবাই স্তম্ভিত!

দেবদর্শন পুরুষ হেসে বললে আমাকে অবাক হয়েছ? শোনো তাহলে আমার কাহিনি। আমার পূর্ববৃত্তান্ত।

আমার জন্ম বিদ্যাধর বংশ নোম চিত্রাঙ্গদ। এইমাত্র যে মেয়েটিকে বিয়ে করলে তার নাম মনোবতী। মনোবতী আমারই মেয়ে। বড়ো আদরের মেয়ে। সব সময়ে কোলে রাখতাম। একদিন যখন ওকে কোলে নিয়ে মন্দাকিনীর তীরের এক তপোবনের ওপর দিয়ে আকাশপথে খুব দ্রুত উড়ে যাচ্ছি, সেই সময়ে হাওয়ার বেগে আমার গলা থেকে একটা ফুলের মালা ছিঁড়ে গিয়ে পড়েছিল এক তাপসের পিঠে। তিনি গঙ্গায় দাঁড়িয়ে তপস্যা করছিলেন। ফুলের মালা পিঠে আছড়ে পড়ায় তাঁর তপস্যা ভঙ্গ হয়। রেগে গিয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন, আমি সিংহ হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াবো, আর কোলের এই মেয়ে আমার পিঠে বসে থাকবে। হিমালয়ের নানান জায়গায় এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে যেদিন এক মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হবে, এবং সেই মানুষ যখন বিয়ে করবে আমার মেয়েকে, সেই মুহূর্তেই আমার ওপর শাপের অবসান ঘটবে।

অভিশাপ ফলে গেছিল মুহূর্তের মধ্যে। আমি রূপান্তরিত হয়েছিলাম সিংহে। বিদ্যাধরী কন্যাকে পিঠে চাপিয়ে বিরামবিহীনভাবে টহল দিয়ে গেছি হিমালয় পাহাড়ের নানান অঞ্চলে। কিন্তু প্রতিদিন একটি সরোবরের তীরে এসে মহেশ্বরের পুজো দিয়ে যেত আমার মেয়ে। শবররাজা পুলিন্দক তা দেখেছিলেন। তাঁরই আগ্রহে আর উদ্যমে ফলে সম্পন্ন হল এই বিয়ে। শাপমুক্ত হলাম আমি। আপনাদের কল্যাণ কামনা করে আমি বিদায় নিচ্ছি।

পরমুহূর্তে শূন্যে উঠলেন বিদ্যাধর চিত্রাঙ্গদ। ক্ষণপরেই বিলীন হলেন আকাশপথে।

পত্রবধূ যে এক বিদ্যাধরী, তা জানতে পেরে খুব খুশি হলেন আমার বাবা, উৎফুল্ল হয়েছিল বন্ধুবর পুলিন্দকও। আনন্দের আতিশয্যে সমস্ত জঙ্গল রাজ্য আমার হাতে তুলে দিয়েছিল বিয়ের উপহার স্বরূপ।

দিন কেটে গেল পরম সুখে। যথাসময়ে নাতির মুখ দেখলেন আমার পিতৃদেব। যথাসময়ে তার বিয়েও দিলেন। তারপর গঙ্গাতীরে গিয়ে দেহ রাখলেন।

আমি ভাসলাম দুঃখসাগরে। কিন্তু মিত্র পুলিন্দক প্রায়ই চলে আসত আমার কাছে, অরণ্যরাজ্য থেকে। তার মতো বন্ধু জগতে বিরল। দুঃখ চলে গেল তার সান্নিধ্যে।

কালের নিয়মে যখন বৃদ্ধ হলাম, ছেলের হাতে সংসারে ভার দিয়ে গৃহত্যাগ করলাম পত্নী মনোবতী আর মিত্র পুলিন্দককে নিয়ে। কালঞ্জর পাহাড়ে আসতেই মনে পড়ে গেল আমার পূর্বজন্মের কথা।

আমিও তো বিদ্যাধর ছিলাম। শিব-পার্বতীর অভিশাপে মানুষ হয়ে জন্মেছি। অভিশাপটা কী অপরাধে, তাও মনে পড়ে গেল।

পত্নী আর মিত্রকে সব বললাম। সেই দণ্ডেই মনুষ্য কলেবর ত্যাগ করব, মনস্থ করলাম। পাহাড় চূড়া থেকে ঝাঁপ দিলাম তিনজনে একসাথে।

তারপর জন্ম নিলাম বিদ্যাধরকূলে, জাতিস্মর হয়ে। সিদ্ধরাজ বিশ্বাবসুর ছেলে আর মেয়ে হয়ে জন্ম নিল আমার বন্ধু পুলিন্দক আর স্ত্রী মনোবতী।

পুলিন্দক এখন মিত্রাবসু, মনোবতী এখন মলয়বতী। ভাই আর বোন।

সুতরাং, তোমার বোনের সঙ্গে আমার বিবাহ প্রস্তাব অতিশয় সঙ্গত, কারণ সে আমার পূর্বজন্মের স্ত্রী। কিন্তু আমার বৃদ্ধ বাবা-মা রয়েছেন আশ্রমে। তাঁদের অনুমতি না নিয়ে তো এ বিয়ে আমি করতে পারি না।

এরপর, জীমূতবাহন আর মলয়বতীর প্রত্যেকের বাবা আর মায়ের সম্মতি নেওয়া হল বিবাহ ব্যাপারে। বিয়ে হয়ে গেল। স্ত্রী মলয়বতীকে নিয়ে জীমূতবাহন ফিরে গেল মলয়াদ্রিতে নিজের আশ্রমে। বেশ কিছুদিন সেখানে থাকবার পর একদিন শ্যালক মিত্রাবসুকে নিয়ে নানান জায়গা দেখতে দেখতে এসে পৌঁছোল সমুদ্রের ধারে। দেখল এক রমণীকে। তীরে বসে কাঁদছে। একজন যুবক তার কান্না থামানোর চেষ্টা করছে।

ব্যাপার কি, জানতে চেয়েছিল জীমূতবাহন।

যুবক বললে, ইনি আমার মা। আমার নাম শঙ্খচূড়। আমাদের জন্ম নাগকুলে। অনেক আগে সাপেদের মা কদ্রুর সঙ্গে খুব ঝগড়া হয় গরুড়ের মা বিনতার। বিনতা বলেছিলেন, সূর্যের ঘোড়ার ল্যাজের রং সাদা। কদ্রু বলেছিলেন, কক্ষনো না। সূর্যের ঘোড়ার ল্যাজের রং কালো। বাজি ধরে ঝগড়ার নিষ্পত্তি করা সাব্যস্ত হয়। বিবাদে যে হারবে, তাকে অপরজনের পরিচারিকা হয়ে থাকতে হবে। চতুরা কদ্রু গোপনে নাগদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সূর্যের ঘোড়ার কাছে। ল্যাজে লেপটে থেকে তারা ঘোড়ার সাদা ল্যাজ কালো করে রেখেছিল। হেরে গিয়ে বিনতাকে কদ্রুপ ঝি হয়ে থাকতে হয়েছিল। রমণীকুল বড়ো হিংসুটে। অন্য রমণীর সৌভাগ্য সহ্য করতে পারে না। ওরা ছিল সহোদর বোন আর পরস্পরের সপত্নী, মহর্ষি কশ্যপের ধর্মপত্নী। বিনতার ছেলে গরুড় কিন্তু মর্মাহিত হয়েছিল। নাগেদের কাছে বিনীতভাবে জানতে চেয়েছিল, মা-কে ঝিগিরি থেকে মুক্তি দিতে গেলে গরুড়কে কী করতে হবে।

অসম্ভব এক সুরাহা বাতলেছিল নাগকুল। অমৃত-ভাণ্ড এনে দিতে হবে। দেবতারা তখন ক্ষীরোদ সাগর মন্থন করছিলেন। অমৃতে ভরা কলসিটা গরুড় চুলি করে আনুক, তাহলেই ঝিগিরি থেকে তার মা-কে মুক্তি

দেওয়া হবে।

মহাপক্ষী গড়ুরের কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই। দুঃসাহসী এবং অমিতবিক্রম পক্ষীরাজ তৎক্ষণাৎ সাঁ-সাঁ করে উড়ে গেছিল দেবতা-বাহিনীর কাছে। দেবগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছিল একা গরুড়ের বিক্রমে।

দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন নারায়ণ। গরুড়কে বর নিতে বলেছিলেন। নাগেদের ওপর তেলেবেগুনে জ্বলছিল গরুড়। তার গর্ভধারিণীকে দিয়ে যারা ঝিগিরি করার মিথ্যেগিরি করে, তাদের ধরে ধরে খেতে চেয়েছিল। অর্থাৎ, সাপেরা হোক গরুড়ের আহার্য।

নারায়ণ বলেছিলেন, তথাস্তু, তাই হোক।

বেগতিক দেখে ধুরন্ধর দেবরাজ ইন্দ্র বলেছিলেন, বেশ, বেশ, অমৃতের কলসি তুমি নিয়ে যাও। কিন্তু তোমার শর্ত ছিল শুধু কলসি পৌঁছে দেওয়ার। পৌঁছে দেওয়ার পর এমন একটা কৌশল করে রেখো, যাতে অমৃত খেতে না পারে সাপেরা। তারা অমর হলে বিপদ। আমি অনেক ছলনা জানি। অমৃতের কলসি ফিরিয়ে আনব।

গরুড় বললে, তাতো বটেই! তাতো বটেই!

বলেই, কলসি নিয়ে উড়ে গিয়ে পৌঁছোল নাগমহলে।

বললে, অমৃতে মুখ দেওয়ার আগে ফিরিয়ে দাও আমার মা-কে। খসে যাক তার ঝিগিরির শৃঙ্খল।

নাগেরা কাজ হাসিল হয়েছে দেখে খুবখুশি। অমৃতের কলসি সামনেই হাজির রয়েছে যখন তখন আর কালবিলম্ব করেনি। আহ্লাদে আটখানা হয়ে নাচতে নাচতে দৌড়েছিল নাগমাতার কাছে। কদ্রুর দাসীত্ব মোচন করে ফিরে এসেছিল তাকে নিয়ে, গেছিল গরুড়ের কাছে।

খলিফা গরুড় কিন্তু তার আগেই একটা কাণ্ড করে রেখেছে। একরাশ কুশের ওপর বসিয়ে রেখেছে কলসি।

মা এসে পৌঁছোতেই বলেছিল নাগেদের, তোমরা সাপ। সারা গায়ে নোংরা। অপবিত্র অবস্থায় সুধা খেলে কাজ হবে না। যাও, নদীতে স্নান করে এসো।

বলেই, চোখ টিপে দিয়েছিল আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা ইন্দ্রকে।

নাগেরা বলেছিল, সত্যিই তো! সত্যিই তো! চলো, দল বেঁধে স্নান করে আসি।

বলেই, ছুটে গিয়ে দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নদীর জলে।

এই তো সুযোগ! আড়াল থেকে বিরিয়ে এসেছিল ইন্দ্র। অমৃতের কলসি তুলে নিয়ে দে চম্পট! দে চম্পট!

গরুড়ও মা বিনতাকে পিঠে নিয়ে পিঠটান দিয়েছিল তৎক্ষণাৎ।

স্নান সেরে আনন্দে নাচতে নাচতে সর্পবাহিনী এসে দেখেছিল, অমৃতের কলসি নেই!

রয়েছে শুধু রাশি রাশি কুশ, যার ওপরে সযত্নে বসানো ছিল কলসি।

কুশ একরকমের ঘাস। এমনই এক ঘাসপাতা যাদের কিনারা অতিশয় ধারাল, ক্ষুরের মতো।

অমৃতলোভী সাপেরা কলসি নেই দেখে দিশেহারা হয়ে ওই কুশ চাটতে শুরু করে দিয়েছিল। ভেবেছিল, আকাশ পথে কলসি উড়িয়ে এনে কুশের ওপর রাখবার সময়ে নিশ্চয় খানিকটা অমৃত ছলকে পড়েছিল কুশের ওপর। সুতরাং জিভ দিয়ে চাটা যাক। এক কণা অমৃত লকলকে জিভে ঠেকে গেলেই অমর হওয়া যাবে।

কিন্তু হায়! কণামাত্র অমৃত ছলকে পড়েনি কুশে, বড়ো হুশিয়ার গড়ুর, বিরাট ডানা সঞ্চালনের সমতা বজায় রেখে কলসিকে টলতে দেয়নি এতটুকু।

অমৃতলোভে কাণ্ডজ্ঞানহীন সাপেরা তাই চটাস চটাস করে কুশ চাটতে গিয়ে জিভ কেটে ফেলেছিল। লম্বা জিভ কেটে দুটো হয়ে গেছিল। সেই থেকে সাপেদের জিভ দুটো, লকলক করলেই দেখা যায়। এই পৃথিবীর কোনও প্রাণীর এমন জিভ নেই, সাপেদের ছাড়া। জিভ বের করে ভেংচি কাটতেও আর পারে না।

অতিলোভ করতে গেলে পরিণামটা যে কি হয়, অন্যের বিদ্রুপের উৎস হয়ে উঠতে হয়, এই ঘটনাই তার প্রমাণ। নিজের লাভ কিস্‌সু হয় না।

গড়ুরের তখন পোয়াবারো। দেদার খাদ্য পাতালে রয়েছে, নাগকুলের আবাস যেখানে। কাঁড়ি কাঁড়ি খেয়ে নাগকুল প্রায় শেষ করে আনল।

তখন টনক নড়েছিল বাসুকির। সন্ধি করেছিল গড়ুরের সঙ্গে। সর্ত একটাই : গড়ুরকে আর কষ্ট করে পাতালে গিয়ে নাগ ভক্ষণ করতে হবে না। রোজ একটা করে নাগ সমুদ্রতীরে পাথরের ওপর রেখে আসা হবে।

আজ আমার পালা। গড়ুর এসে খাবে আমাকে। এই আমার মা। কেঁদে কূল পাচ্ছে না।

নাগপুত্র শঙ্খচূড়ের কাহিনি শুনে মন গলে গেল জীমূতবাহনের।

এল গড়ুর। চঞ্চু দিয়ে জীমূতবাহনকে ধরে নিয়ে গেল পাহাড়ের চূড়োয়।
ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে গেল গায়ের মাংস ...

বললে শঙ্খচূড়কে, গড়ুর আমাকে খাক। তুমি যাও।

শঙ্খচূড় বললে সবিনয়ে, তাই কি হয়? আপনার সুন্দর আকৃতিতেই প্রমাণ, আপনি মাণিক্য, সে তুলনায় আমি নগণ্য কাঁচ। আমাকে মরতে দিন।

জীমূতবাহন তখন কাজের অছিলায় মিত্রাবসুকে পাঠাল বাড়িতে, শঙ্খচূড়কে পাঠাল শিবমূর্তিকে প্রণাম জানিয়ে আসতে।

নিজে গিয়ে দাঁড়াল পাথরের ওপর।

এল গড়ুর। চঞ্চু দিয়ে জীমূতবাহনকে ধরে নিয়ে গেল পাহাড়ের চূড়োয়। ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে গেল গায়ের মাংস, জীমূতবাহন কিন্তু নির্বিকার।

আশ্চর্য এই পরোপকার দেখে স্বর্গ থেকে যখন পুষ্পবৃষ্টি করছে দেবগণ, তখন টনক নড়েছিল গড়ুরের।

যাকে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছি একে তো নাগসন্তান বলে মনে হচ্ছে না! মানুষের মতো দেখতে। কিন্তু অসাধারণ মানব!

গড়ুর সংশয়ে পড়েছে বুঝতে পেরে বলেছিল জীমূতবাহন—

আমার মাংস কি তোমার ভালো লাগছে না? খাওয়া বন্ধ করলে কেন?

গড়ুর বললে, আপনাকে তো নাগবংশীয় বলে মনে হচ্ছে না। পরের উপকার করার জন্যে প্রাণ দিতে এসেছেন? কে আপনি?

জীমূতবাহন বললে, সত্যি সত্যিই নাগকুলে আমার জন্ম। মনের আনন্দে খাও আমাকে।

ঠিক সেই সময়ে শঙ্খচূড় এসে হাজির সেখানে। গলা তুলে চেঁচিয়ে বললে, কী সর্বনাশ! কাকে খাচ্ছেন? ছেড়ে দিন.....ছেড়ে দিন। উনি নাগ নন, আমিই নাগতনয়। খান আমাকে।

গড়ুর স্তম্ভিত। এরকম কাণ্ড সে অপিচ দেখেনি। পরের জন্যে স্বেচ্ছায় নিজেকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেয়, এ কেমন মানুষ?

তারপরে প্রকাশ পেল আসল ঘটনা।

গড়ুর জানল, চঞ্চুতে পাকড়ে পাহাড়চূড়ায় যাকে এনেছে, সে সমস্ত বিদ্যাধরদের রাজা, জীমূতবাহন।

অনুতপ্ত হয়েছিল বিলক্ষণ। মহাপাপ করেছে। আগুনে ঢুকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যাক।

কিন্তু জীমূতবাহন তা হতে দেয়নি। গড়ুর যখন আগুন জ্বালিয়ে অগ্নিপ্রবেশ করতে যাচ্ছে, তখন বলেছিল, অনুতপ্ত হয়েছ? প্রাণ না দিয়ে অন্য একটা কাজ করো।

কী কাজ? জানতে চেয়েছিল গড়ুর।

সাপেদের আর খেও না। যাদের খেয়েছ, তাদেরকেও বাঁচিয়ে দাও।

উত্তম প্রস্তাব। গড়ুর তৎক্ষণাৎ অমৃত নিয়ে এল স্বর্গ থেকে। দুন্দুভি বেজে উঠল আকাশে বাতাসে। জীমূতবাহন-সহধর্মিণীর পুজো পেয়ে ভগবতী নিজে এসে অমৃত ছিটিয়ে দিলেন জীমূতবাহনের ক্ষতবিক্ষত রুধির প্লাবিত দেহে। নিমেষে তার শরীর হয়ে গেল আগের মতো, বরং আরও সুন্দর। আরও জোতির্ময়।

সাপেদের কঙ্কালে অমৃত ছিটিয়ে দিয়েছিল গড়ুর নিজে। বেঁচে উঠেছিল সবাই।

সেই সঙ্গে অমৃতসমান হয়ে উঠেছিল সমুদ্রের সৈকতভূমি। জীমূতবাহনের সুনাম ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে। তার শত্রু বিদ্যাধররাও খুশি হয়ে আরও ধনরত্ন দিয়ে গেল তাকে।

বন্ধু, বউ আর বাবাকে নিয়ে সুখে রইল জীমূতবাহন, মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণের আখ্যায়িকা সমাপ্ত হতেই দেবী বাসবদত্তা বুঝতে পেরেছিল, এইবার তার গর্ভে আসবে এক বিদ্যাধর কুমার।

নরবাহনদত্তের উৎপত্তি

পরের দিন।

স্বামীর পাশে বসে বললে বাসবদত্তা, গর্ভবতী হওয়ার পর থেকেই আমার কষ্ট হচ্ছে। পেটের বাচ্ছাকে সুস্থ রাখার দায়িত্ব তো আমার। কাল রাতে এই সব চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, স্বপ্নে দেখলাম এক মহাপুরুষকে। তাঁর হাতে ত্রিশূল, মাথায় জটা। আমাকে অভয় দিলেন। বললেন, তোমার গর্ভে যে ছেলে এসেছে, তাকে আমিই রক্ষা করব। আমার এই কথা যে অলীক নয়, তার প্রমাণ পাবে কাল সকালে।

একটা খাণ্ডারনি মেয়েছেলে আসবে তোমার স্বামীর কাছে তার স্বামীর বিচারের জন্যে। স্বামীকে সে গায়ের জোরে টেনে আনবে বিচারালয়ে। সঙ্গে থাকবে দুশমন প্রকৃতির কয়েকজন পুরুষ। মেয়েটার আসল মতলব যেনতেন প্রকারেন স্বামীকে খতম করায় তাহলেই উপপতিদের সঙ্গে সে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। রাজার

সামনে বানিয়ে বানিয়ে বলবে অনেক কথা, তোমার স্বামী যেন এক বর্ণও বিশ্বাস না করে। নির্দোষ স্বামীকে মুক্তি দেয়।

তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীদের ডেকে স্ত্রী-র স্বপ্নকথা বলেছিল উদয়ন। যাঁর মাথার জটা পিঙ্গলবর্ণের, হাতে ত্রিশূল, তিনি নিশ্চয় স্বয়ং মহাদেব। বাসবদত্তার গর্ভে যে পুত্র এসেছে, সে সংবাদও দিল। স্বপ্নের সত্যতা যাচাই করে নেওয়ার জন্যে কুলটা কামির কাহিনী শুনিয়ে গেছেন মহাদেব। এখন দেখা যাক, স্বপ্ন সত্যি হয় কীনা।

এবং তা সত্যি হল। এক রমণী এল রাজসভায় তার পাঁচ ছেলে, জনাকয়েক পুরুষ আর আতঙ্কে কাঠ স্বামীকে নিয়ে। খাণ্ডারনি মেয়েছেলেটা পতিদেবতাকে হিড় হিড় করে টেনে আনছে।

খাণ্ডারনি মহিলার অভিযোগ এই : স্বামী তাকে ভাত-কাপড় দেয় না, কিন্তু বেদম প্রহার করে।

স্বামীর জবাব এই : স্ত্রী পরপুরুষে আসক্ত। স্বামীর অন্নবস্ত্র ধ্বংস করে কাম প্রবৃত্তির তাড়নায় কেলেঙ্কারি করে বেড়াচ্ছে। এখন স্বামী-নিধনের পরিকল্পনা এঁটেছে। গাঁয়ের লোকদের জিজ্ঞেস করলেই প্রমাণ মিলবে।

রাজা উদয়ন সব শুনল। বললে, সাক্ষীর আর দিরকার কী? গত রাতে স্বয়ং মহাদেব এই কেচ্ছার কথা বলে গেছেন।

মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ অতিশয় বিচক্ষণ। সে বললে, শুধু সপ্ন কথায় নির্ভর করে বিচার করা অনুচিত। ন্যায় বিচারে দরকার সাক্ষী আর প্রমাণ। সেটাই হবে লৌকিক বিচার, অলৌকিক নয়।

কথাটা যথার্থ। ডাকা হল সাক্ষীদের। কুলটা কাহিনির সব কেচ্ছা তারা ফাস করে দিয়ে বললে, স্বামী সম্পূর্ণ নির্দোষ।

রাজা তখন অদ্ভুত সাজা দিল কুলটাকে। বিস্তর অর্থ দিল তার স্বামীকে, দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্যে। দুশ্চরিত্রা হয়ে গেল স্বামী পরিত্যক্তা।

বললে সভার সবাইকে, চরিত্রহীনা মেয়েরা এই রকমই হয়। বড়ো কুটিল, বড়ো নিষ্ঠুর। পাপের পথে হড়কে গিয়ে পরি পরম গুরুকে শমন সদনে পাঠাতে দ্বিধা করে না। কিন্তু যে মেয়েদের জন্ম ভালো বংশে, চরিত্র যাদের নিষ্কলঙ্ক, তারা স্বামীসেবা করে যায় সারা জীবন, স্বামীর যদি কোনও গুণ না থাকে, তাহলেও স্বামীকে দেবতার মতো পুজো করে, স্নিগ্ধ ছায়ার মতো সব সময়ে স্বামীর পাশে পাশে থাকে। জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্য সঞ্চয়ের ফলেই পুরুষ পায় এমন ভার্যা।

রাজার পাশেই বসেছিল প্রিয়বন্ধু বসন্তক। অসতী প্রসঙ্গ এসে যেতেই মুখ চুলবুল করে উঠেছিল তার। জুৎসই একটা গল্প ছাড়বার মোক্ষম সুযোগ যখন এসে গেছে.....

উৎসুক হয়েছিল রাজা উদয়ন, পেটে গল্প গজ গজ করছে মনে হচ্ছে?

করছেই তো, বলেই আশ্চর্য একখানা উপাখ্যান শুনিয়ে দিল গল্পবাজ বসন্তক।

অনেক অনেক আগে সিংহবিক্রম নামে এক পণ্ডিত পুরুষ ছিলেন বারাণসীতে। সেখানকার রাজা বিক্রমচণ্ড তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। রাজার চাকরিতে রোজগার ভালোই ছিল, সংসারে অনটন ছিল না, চারদিকে ছিল সুনাম আর সম্মান, যথাসময়ে বিয়ে, করেছিলেন, তিনটে ছেলেও হয়েছিল। এমতাবস্থায় তাঁর সুখী থাকার কথা। কিন্তু তিনি সুখী হননি।

মূলে ওই স্ত্রী। ঝগড়া লেগেছিল প্রথম থেকেই, ক্রমে ক্রমে তা মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। অথচ সংসারে অভাব-অনটনের চিহ্নমাত্র ছিল না। কোমর বেঁধে ঝগড়া করারও কোনও কারণ ছিল না। তবুও একটা না একটা ছুতো নিয়ে স্বামীকে সুধু বঁটিতে কুটতে বাকি রাখত কলহপ্রিয়া সেই রমণী।

কাঁহাতক সহ্য করা যায়। গৃহত্যাগ করলেন সিংহবিক্রম। গেলেন বিন্ধ্যারণ্যে। বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর শরণ নিলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী তাঁকে বললেন, ফিরে যাও বারাণসীতে। সেখানে গিয়েই দেখবে সামনে রয়েছে একটা অশ্বত্থগাছ। সেই গাছের নীচে মাটিতে পোঁতা আছে একটা মণি। মাটি খুঁড়ে মণি বের করবে। মণির দিকে

তাকাবে। তাকালেই দেখবে, আগের জন্মে তুমি কী ছিলে, তোমার স্ত্রী কী ছিল। আগের জন্মে স্ত্রী আর পুরুষ যদি অসমান জাতীয় হয়, পরের জন্মে তাদের মধ্যে নিরন্তর কোঁদল লেগে থাকবেই।

মণি মারফৎ তা জানতে পারলেই দেখবে তোমাদের মনের অমিল কতটা, আর তার সমাধান!

তাই করেছিলেন সিংহবিক্রম। বারাণসীধামে ফিরে গিয়ে অশ্বত্থ গাছের তলা থেকে মণি তুলে তার ভেতরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে থ হয়ে গেছিলেন!

আগের জন্মে তিনি ছিলেন পশুরাজ সিংহ! আর তাঁর স্ত্রী ছিল ভল্লুক! পরাক্রমে কেউই কম যেত না!

এ জন্মে মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েও কারোরই পশু স্বভাব পালটায়নি। প্রকৃতিতে তিনি সিংহ, তাঁর স্ত্রী ভল্লুকী!

এই ভেদ তো মেটবার নয়, এই লড়াইও চলবে আমৃত্যু!

সুতরাং চম্পট দেওয়াই শ্রেয়। এহেন স্ত্রী সংসর্গ আর নয়!

কিন্তু...!

স্ত্রী সহবাস তো প্রয়োজন। ভেবেচিন্তে আশ্চর্য মণির মধ্যে ফের দৃকপাত করলেন সিংহবিক্রম মনের ইচ্ছা মণিময় হয়ে উঠলো তৎক্ষণাৎ!

সন্ধান পেলেন এমন এক তেজস্বিনী রমণীর, আগের জন্মে যে ছিল সিংহিনী!

বাঁচলেন সিংহবিক্রম। বীরবিক্রমে গমন করলেন অপরূপা ক্ষীণকটি পীবরবক্ষ সেই কামিনী সান্নিধ্যে, তাকে জয় করলেন প্রকৃত সিংহের মতোই এবং কলহশূন্য রমণানন্দে উপভোগ করে গেলেন জীবনের প্রতিটি দিন।

গলে হাত দিয়ে সখা বসন্তকের অপূর্ব কাহিনি শ্রবণ করে গেছিল উদয়ন। মুখে বাক্যস্ফুর্তি ঘটেনি।

গল্পের উপসংহারে সার কথাটা তখন নিবেদন করেছিল বসন্তক। বলেছিল, বিয়ে জিনিসটা জন্মজন্মান্তরের বন্ধন বলা হয় এই কারণেই। আগের জন্মে সমপ্রকৃতির মেলবন্ধন ঘটলে পরের জন্মে বিবাহ শুভ হবেই, নচেৎ নয়।

কিছুদিন পর ছেলের বাবা হয়ে গেল মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ, একটু আগেপিছে আরও তিনজন, সেনাপতি, প্রিয়বন্ধু বসন্তক আর প্রাসাদ রক্ষীদের অধ্যক্ষ।

চার ছেলেকে মানুষ করা হল এমনভাবে যেন বড়ো হয়ে চার শক্তি একত্রে থেকে শত্র দমন করে যেতে পারে।

তারপর প্রসব বেদনা দেখা দিল রানি বাসবদত্তার। যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হল সুলক্ষণযুক্ত এক পুত্র।

এবং আকাশে শোনা গেল এক দৈববাণী :

রাজা উদয়ন, তোমার এই পুত্র কামদেবাবতার।

এর নাম দেবে নরবাহনদত্ত। এ হবে বিদ্যধর চক্রবর্তী, পুরো এককল্প, দিব্য এককল্প থাকবে বিদ্যাধরপতি হয়ে।

আকাশবাণী দিকে দিকে নিনাদিত হয়ে গেল। পরক্ষণেই সূচনা ঘটলো দিব্য লক্ষণের। ঝর ঝর করে ফুল ঝড়ে পড়ল আকাশ থেকে। সেই সঙ্গে দিকে দিকে শোনা গেল দুন্দুভির আওয়াজ। দৈব্য বাদ্য মেঘ ফুঁড়ে নেমে এল স্বর্গ থেকে।

এ যে অতিশয় শুভলক্ষণ! দেবলোকে আনন্দ ফেটে পড়ছে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাধরের মর্ত্য আগমনে। তাই এত খুশির বাজনা, এত কুসুম বৃষ্টি!

মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল পুত্রের জন্মোৎসব। তখন আকাশ কেঁপে কেঁপে উঠেছিল তূর্য নিনাদে, পরমানন্দে অন্তরীক্ষ প্রকম্পিত করে গেছে বিদ্যাধরগণ।

তালে তাল মিলিয়ে রাজপ্রাসাদে বেজে গেছিল রকমারি বাজনা, সুরে সুর মিলিয়েছিল কণ্ঠসংগীত।

তালে তাল মিলিয়েছিল সুবেশা সুন্দরী নগরবধূদের নূপুর-নৃত্য। দ-হাতে গরিব দুঃখীদের দান করে গেছিল রাজা উদয়ন।

যার আবির্ভাব উপলক্ষ্যে এত অমোদ। উৎসব, দানধ্যান, সে যে প্রকৃতই অসামান্য পুরুষ, তার নজির রেখে গেল ধীরে ধীরে বড়ো হওয়ার সময়ে। সে যে এক সময়ে ধরণীর অধীশ্বর হবে, তা প্রমাণ করে গেল দিনে দিনে। বালক বয়েসেই দেখিতে গেল যুবকোচিত বুদ্ধি আর শক্তি। সঙ্গী রূপে পেল মন্ত্রী, সেনাপতি, বয়স্য, প্রাসাদরক্ষী অধ্যক্ষ আর প্রধান পুরোহিতের পুত্রদের।

একটা শক্তিশালী দল গঠিত হয়ে গেল কৈশোরেই। সুখসাগরে ভাসমান রইল প্রত্যেকেই।

এবং লাবনক নামক তৃতীয় লম্বকের সমাপ্তি এইখানেই।

ছেলে তো বড়ো হচ্ছে হেসেখেলে, বাপমা'র মন কিন্তু চিন্তামুক্ত নয়। অমঙ্গলের ছায়া যেন কুরে কুরে খাচ্ছে মনের ভেতর।

রাজা আর রানির এ হেন উদ্বেগ লক্ষ্য করেছিল তীক্ষ্ণচক্ষু মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ।

বলেছিল রাজাকে, ছেলেকে নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন?

রাজা বলেছিল, স্বাভাবিক। রাজপুত্রের অনিষ্ট করার জন্যে গোপন শত্রুদের অভাব থাকে না।

মন্ত্রী বললে, বাপের মন তো, আশঙ্কাটা অযথা নয়। আজ সে খবর পেলাম।

চমকে উঠেছিল রাজা উদয়ন, কী খবর? কার কাছে পেলে?

পেলাম এক সন্ন্যাসীর কাছে। ঈর্ষাকাতর বিদ্যাধররা যদি অনিষ্ট করতে চায় আপনার পুত্রের, যে কিনা নিজেই বিদ্যাধর চক্রবর্তী, তাই স্বয়ং মহাদেব তার রক্ষণাবেক্ষণের আয়োজন করেছেন।

স্বয়ং শিব আগলাচ্ছেন নরবাহণদত্তকে?

হ্যাঁ। তিনি তাঁর এক অনুচরকে সেই ভার দিয়েছেন। তার নাম স্তম্ভক। অনেকদিন থেকেই সে সবার অলক্ষ্যে থেকে রাজকুমারকে আগলে রেখেছে।

কথাটা যে কতখানি যথার্থ, তার প্রমাণ পাওয়া গেল তৎক্ষণাৎ।

আকাশ থেকে ভূতলে অবতীর্ণ হয়েছিল এক দিব্য পুরুষ। তার মাথায় সোনার মুকুট, কানে বলয়াকার সোনার গয়না। আচমকা অপরূপকান্তি জ্যোতির্ময় সেই পুরুষকে দেখে হতচকিত হয়ে গেছিল রাজা আর মন্ত্রী দুজনেই। যার গা ফুঁড়ে আশ্চর্য আভা বিকিরিত হচ্ছে, সে নিশ্চয় ঊর্ধ্বলোকের অসামান্য কোনও সত্তা।

যথোচিত অভ্যর্থনার পর সবিনয়ে তার পরিচয় জানতে চেয়েছিল রাজা উদয়ন।

জবাবে বলেছিল সুরলোকের সেই পুরুষ, আগে ছিলাম মর্ত্যের মানুষ। এখন আমি বিদ্যাধর। আমার নাম শক্তিবেগ। শুনলাম, আপনার পুত্র সমস্ত বিদ্যাধরদের অধিপতি হবে। তাই তাকে দেখতে এসেছি।

নিয়ে আসা হল রাজপুত্রকে শক্তিবেগের সামনে।

কিন্তু শক্তিবেগ বিলক্ষণ ভয় পেয়ে গেল রাজপুত্রের পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখবার পর।

অবাক হয়েছিল উদয়ন। পুলকিতও হয়েছিল। ভাবী বিদ্যাধর চক্রবর্তীকে দেখে ভীত হয়েছে একজন বিদ্যাধর। এ তো সুলক্ষণ! বিরাট পূর্বাভাস।

তাই চলে গেছিল ভিন্ন প্রসঙ্গে। জিজ্ঞেস করেছিল শক্তিবেগকে, ছিলেন মর্ত্যবাসী, হয়ে গেলেন বিদ্যাধর। কীভাবে, তা বলবেন?

শক্তিবেগ বললে, ভগবান শঙ্করের উপাসনা করে। উপাসনা পদ্ধতি তো অনেক রকমের আছে। যে যে-রকম পদ্ধতি গ্রহণ করে, সে সেই রকম অবস্থা পায়।

রাজা বললে, তা বেশ। কিন্তু আপনি বিদ্যাধর হলেন কোন আরাধনায়?

শোনা যাক এবার শক্তিবেগের উপাখ্যান।

বর্ধমানে একটা সুন্দর নগরী আছে। গোটা ভারতবর্ষে এমন সুন্দর শহর আর নেই।

শক্তিবেগ আখ্যায়িকা অনেক আগে এই শহরের যিনি রাজা ছিলেন, তাঁর নাম পরোপকারী। তাঁর রাণির নাম কনকপ্রভা। সত্যিই তাঁকে দেখলে সোনার প্রতিমা মনে হত। সার্থক নামকরণ।

এঁদের একটি কন্যা রত্ন ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মনে হয়েছিল যেন রূপসী রতি আবির্ভূত হয়েছে মর্ত্যলোকে। কী রূপ! কী রূপ! ধাঁধা লেগে যায় চোখে।

স্বর্ণবরণী সেই কন্যার নাম রাখা হয়েছিল কনকরেখা। যেন রেখাময়ী সজীব সোনা। গড়নপেটন অতীব নিখুঁত।

যৌবনবতী হল যখন এই কনকরেখা, তখন ধাঁধা লেগে যেত চোখে তার সহস্র চন্দ্রসম অঙ্গকান্তি দেখে।

রাজা স্থির করলেন, এইবার তার বিয়ে দেওয়া যাক।

কিন্তু রানি বললেন, কী মুশকিল! মেয়ের বিয়ের জন্যে খামোকা চিন্তা করতে যেও না। সে বিয়ে করবে না।

বিয়ে করবে না! কনকরেখা! কেন?

কারণ বলেনি। শুধু বলেছে, তার বিয়ে দিতে গেলেই নিজেই নিজের প্রাণ হরণ করবে।

উদ্বিগ্ন হলেন রাজা। অন্তঃপুরে গেলেন। মেয়েকে সোজা জিজ্ঞেস করলেন, মা, তুমি বিয়ে করবে না কেন?

আনত চোখে বললে কনকরেখা, কারণ আমার ইচ্ছে নেই।

কিন্তু বয়স্থা কন্যাকে পাত্রস্থ না করলে যে আমার পাপ হবে। যা খুশি করবো। এমন ইচ্ছে কন্যাসন্তানকে মানায় না। সে চিরকাল আর একজনের অধীন থাকে। ছেলেবেলায় বাবার, যৌবনে স্বামীর, বার্ধক্যে পুত্রের। এই হল শাস্ত্রের বিধি। মেয়ের বিয়ে দিতে হয় রজস্বলা হওয়ার আগেই। নইলে শাস্ত্রে তাকে বৃষলী বলা হয়। বৃষলী মেয়েকে যে বিয়ে করে, তার নাম হয়ে যায় বৃষলীপতি। এইসব দুর্ণাম এড়োনোর জন্যে তোমার বিয়ে হওয়া দরকার এখুনি।

কনকরেখা তখন বললে, আমি এমন পুরুষকে বিয়ে করতে চাই, যে কনকপুরী দেখেছে, সেখানে যাওয়ার রাস্তা জানে। সেই মানুষ ব্রাহ্মণসন্তান হোক, কী, ক্ষত্রিয়সন্তান হোক, তাতে কিছু এসে যায় না।

রাজা ভাবলেন, যাক, রাজি করানো তো গেছে। তবে মনে হচ্ছে, এ মেয়ে আগের জন্মে স্বর্গের কোনও দেবী ছিল। নইলে কনকপুরীর কথা বলছে কেন? এমনভাবে বলছে যেন ও অনেক কিছু জানে, অনেক কিছু দেখেছে। এইটুকু বয়েসে এত জ্ঞান তো কারও দেখা যায় না।

কনকপুরী জায়গাটা কোথায়, রাজা নিজেও তা জানতেন না।

পরের দিন সকালে রাজসভায় গিয়ে সভাসদদের জিজ্ঞেস করলেন রাজা, কনকপুরী কোথায় জানা আছে? না, এনাম কেউ শোনেনি। কোথায় আছে, তাও জানা নেই। চিন্তায় পড়লেন রাজা।

দ্বারপালকে ডাকলেন। বললেন, ঢ্যাঁড়া পিটে ঘোষণা করো, ব্রাহ্মণ হোক কী ক্ষত্রিয় হোক, কনকপুরী কোথায়, এ তথ্য যার জানা আছে, তার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব, সেই সঙ্গে আমার এই রাজত্ব দেব।

রাজত্ব আর রাজকন্যার লোভে এগিয়ে এল শক্তিদেব নামে এক ব্রাহ্মণ তনয়। জুয়োখেলে সে সর্বস্ব উড়িয়েছে। এখন ভাবলে, স্রেফ বানিয়ে বানিয়ে গল্প শুনিয়ে রাজার জামাই হবে।

কিন্তু কনকরেখা যে কি বস্তুতে গড়া, তা তার জানা ছিল না। দ্বারপালের সঙ্গে শক্তিবেগ গেল রাজার কাছে। রাজা তাকে পাঠিয়ে দিলেন কনকরেখার কাছে।

কনকরেখা তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে প্রশ্ন নিক্ষেপ করে গেছিল এইভাবে :

কনকপুরী দেখেছেন?

নিশ্চয়, লেখাপড়া তো সেখানেই শিখেছি।

কোন রাস্তা দিয়ে গেছিলেন?

আগে গেছিলাম হরপুরে, সেখান থেকে বারাণসীধামে, দিনকয়েকের রাস্তা হেঁটে পৌণ্ড্রবর্ধন নগরে, তারপরেই তো কনকপুরী।

হেসে ফেলেছিল কনকরেখা। পরিচারিকাকে দিয়ে শক্তিবেগকে বের করে দিয়েছিল অন্তঃপুর থেকে।

রাজাকে বলেছিল, লোকটা মিথ্যেবাদী। ধড়িবাজ। লোক ঠকানোই এর কারবার। এ রকম ধূর্তদের অনেক কাহিনি আমি জানি। একটা বলছি।

রত্নপুর একটা নগরের নাম। আছে এই ভারতবর্ষে। সেখানে ছিল দুই ধড়িবাজ পুরুষ। তাদের নাম শিব আর মাধব।

রত্নপুরের সব বড়োলোকদের ঠকিয়ে তাদের পথে বসানোর পর শিব আর মাধব ঠিক করল এবার উজ্জয়িনী শহরে গিয়ে লোক ঠকানো যাক। রত্নপুরের সব রত্নপতিদের রত্নকক্ষ এখন শূন্য, বলতে গেলে, শহরটাই এখন রত্নহীন, বড়োলোকগুলো ফ্যা-ফ্যা করছে। লোক ঠকানোর কারবার এখানে আর চলবে না। কিন্তু উজ্জয়িনীতে চুটিয়ে প্রবঞ্চনা কর্ম করা যাবে। সেখানে ধনবান প্রায় প্রত্যেকেই।

কিন্তু প্রথমে যাওয়া যায় কার কাছে?

শলাপরামর্শ করে দুজনে ঠিক করল, আগে পথে বসানো যাক শঙ্করস্বামীকে। জাতে ব্রাহ্মণ। কর্মে, উজ্জয়িনী রাজার পুরোহিত। উজ্জয়িনী নগরীর প্রচুর ধনরত্ন অবশ্যই তাঁর কাছে আছে। পণ্ডিত মানুষ যখন তখন ধূর্ত নন নিশ্চয়।

প্রবঞ্চকদের পরিকল্পনা আঁচ করতেও পারবেন না।

তারপর? টাকাকড়ি হাতে আসার পর সেই ঐশ্বর্য ভোগ করা হবে কী করে?

ভোগ করার প্রথম পর্যায় দিয়ে শুরু করলেই হল মালব দেশ থেকে বহু বিদ্যুৎসমা বারাঙ্গনা চোখের আর শরীরের বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে চলেছে উজ্জয়িনীতে। তাদের সুনাম দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। পতঙ্গের মতো কামুক পুরুষরা তাদের পায়ে হিরেজহরৎ ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে।

শিব আর মাধব পুরোহিতের অর্থ আত্মসাৎ করে এই নগরবধূদের নিয়ে লীলা করে যাবে। অহো! অহো! সে বেশ মজ্জা হবে!

আরও একটা মজা করতে হবে। শিব আর মাধব যে প্রকৃত শঠ-শিরোমণি, তার অভিনবতম স্বাক্ষর রেখে যাবে উজ্জয়িনীতে। সেটা কী?

পণ্ডিত উজ্জয়িনী পুরোহিতের পরমা সুন্দরী কন্যাটিকে দুজনেই কৌশলের কাঁচি মেরে একই সঙ্গে বিয়ে করে নেবে। দ্রৌপদী যদি পাঁচ পুরুষকে নিয়ে শুতে পারে, সেই মেয়েও খিলখিলিয়ে হেসে দুই পুরুষকে দু'পাশে নিয়ে কামকেলি করে যাবে, সে বড়ো রঙ্গ হবে!

পরম পুলকে ফুলে উঠে সেই দিনই দুই শঠ-শিরোমণি রওনা হয়েছিল উজ্জয়িনীর দিকে। শহরে ঢুকে দুজনে কিন্তু এক জায়গায় রইল না। এক রকম চেহারা আর বেশবাসেও রইল না।

ধরিবাজ মাধব ছদ্মবেশ নিল এক রাজপুত্রের। শহরে না থেকে রইল এক পল্লীগ্রামে।

খলিফা শিব হল তার উলটা। সাধু সাজল।

শিপ্রা নদীর পারে একটা আশ্রম বানিয়ে শেখানে ধোঁকা দেওয়ার সাধনা চালিয়ে গেল।

শুধু নদীতটে বসে হোম ইত্যাদি করলে তো পাবলিসিটি হয় না। প্রচার করা দরকার যে নদীর তীরে অলৌকিক বিভূতিসম্পন্ন এক সাধু এসে আস্তানা নিয়েছে।

তাই সে নিত্য গায়ে মুখে ছাই-টাই মেখে নগর পরিকল্পনায় বেরোত আর টুকটাক ভোজবাজি দেখিয়ে যেত। তার ওই চেহারা, মুখের ফুটুনি আর হাতের কারসাজিতে ওষুধ ধরে গেল। গোটা উজ্জয়িনী জেনে গেল, অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী এক সাধু আস্তানা নিয়েছে শিপ্রা নদীর তীরে। তাকে দেখলে সাক্ষাৎ শিবঠাকুর বলে মনে হয়।

ঠগবাজ মাধবের কানেতে পৌছে গেল জোচ্চোর বন্ধু শিবের কাহিনি। পুলকিত চিত্তে সে এল লোক ঠকানো আশ্রমের পাশে, অবশ্যই রাজবেশে বিস্তার দুমধাম সহকারে, অনুচরদের নিয়ে নদীতে অবগাহন করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল বন্ধুবর শিবকে, বলে গেল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, অনেক তীর্থ ঘুরেছি, অনেক মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এসেছি, কিন্তু এ হেন যোগবিভূতি কখনও দেখিনি! আজ আমার কপাল খুলে গেল, শরীরী

স্বর্গবাসীর সাক্ষাৎ পেলাম। ইনি নিশ্চয় শিব, স্বয়ং শিব, কৈলাস ছেড়ে বায়ু পরিবর্তনে এসেছেন শিপ্রা নদীর তীরে। পুণ্যতীর্থ হয়ে গেল এই উজ্জয়িনী আজ থেকে!

মাধবের গুরু গম্ভীর নিনাদী কণ্ঠস্বরের সেই প্রশস্তি রোমাঞ্চ জাগিয়ে গেল দর্শনার্থীদের সর্ব অঙ্গে।

ক্রমে সন্ধ্যা এল। রাতের অন্ধকার ঘন হল। আশ্রম যখন ফাঁকা, তখন চুপিচুপি রাজপুত্রবেশী মাধব ঢুকল জোচ্চোর শিবের, মানে, সাধুর আশ্রমে।

শুরু হল প্রবঞ্চনা অভিযানের দ্বিতীয় পর্ব।

একজোড়া খুব দামি কাপড় পাঠানো হল রাজ পুরোহিতের কাছে। নিয়ে গেল রাজপুত্রবেশী মাধবের ভাড়াটে অনুচর।

সেই রাতেই সে মূল্যবান বস্ত্রজোড়া রাজার পুরোহিতকে উপহার দিয়ে বললে শেখানো কথা, এই বস্ত্র আপনাকে উপহার পাঠিয়েছেন দাক্ষিণাত্য থেকে পলাতক এক রাজকুমার। শত্রুদের ভয়ে তিনি রাজঐশ্বর্য নিয়ে পালিয়ে এসেছেন, উজ্জয়িনী রাজার সাহায্য পেলে তিনি কৃতার্থ হবেন।

রাজার পুরুৎ ঠাকুরের নাম শঙ্করস্বামী। মহাপণ্ডিত কিন্তু অতি সরল। কথায় বলে, বিদ্বানরা বোকা হয় অনুচরের, তিনি তাই মাধবের অনুচরের লম্বা চওড়া বক্তৃতায় তিনি আপ্লুত হলেন। খুব খাতির করে তাকে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন। দামি কাপড়জোড়া গ্রহণ করলেন।

চতুর অনুচর তৎক্ষণাৎ চলে এল মাধবের কাছে।

পরের দিন.....

সেই অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে মাধব স্বয়ং হাজির হল রাজপুরোহিতের সামনে। সেদিনও ভেট দিল দামি দামি কাপড়। এমনই মহার্ঘ বস্ত্র যে দেখলে চোখে বাঁধা লেগে যায় পরিচয় পর্ব মধুরভাবে সমাপ্ত হতেই প্রস্থান করল মাধব তৎক্ষণাৎ।

ফিরে এল পরের দিন। সঙ্গে নতুন বস্ত্র। আরও দামি। দেখে তো রাজপুরোহিতের মাথা ঘুরে যায় আর কী!

এবার কাজের কথায় চলে এল মাধব। জমি তৈরি করে নেওয়ার পর।

ভিক্ষা চায় মাধব। একটাই ভিক্ষা। উজ্জয়িনী রাজার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

এ আর এমন কথা কী! আহ্লাদে গদগদ হয়ে তৎক্ষণাৎ উজ্জয়িনী রাজ সমীপে মাধবকে নিয়ে গেছিলেন রাজপুরোহিত।

সেখানেও মূল্যবান উপহার সামগ্রীর ভেলকি দেখিয়ে স্বয়ং রাজার চক্ষুস্থির করে ছেড়েছিল মাধব। প্রতারকের হাতযশ এমনই হয়। রাজাও ঠকে গেলেন। প্রতারককে প্রতারক বলে চিনতেই পারলেন না, মাধবকে মনে করলেন সত্যিই এক রাজপুত্র। রাজ্য ছাড়া বটে, কিন্তু কুবেবেরর সম্পদ আছে সঙ্গে।

মহাসমাদরে রাজবাড়িতেই নকল রাজতনয়কে ঠাঁই দিলেন রাজা। কাজ হাসিল হয়ে গেল চতুর চূড়ামণির।

কিন্তু আসল কাজ যে এখনও বাকি।

তাই প্রতিদিন সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত রাজার বাড়িতে রাজকীয় চালে কাটিয়ে সন্ধ্যে হলেই চলে যেত নদীতীরে ঠগবাজ বন্ধুর আশ্রমে। রাত কাটাত নকল শিবঠাকুরের সঙ্গে নানারকম প্যাঁচ-পয়জারের আলোচনায়।

এইভাবে গেল কয়েকটা দিন। মাধবের সঙ্গে অনেকদিন দেখা না হওয়ায় রাজপুরোহিতের চিত্ত অস্থির হয়েছিল। তিনি একদিন কপট তপস্বীর আশ্রমে এলেন। নকল রাজপুত্র অর্থাৎ ঠগবাজ মাধবকে খুব খাতির করে নিজে গিয়ে নিজের বাড়িতে রাখলেন।

সেখানেই রইল বটে মাধব, কিন্তু ঠকানোর প্রস্তুতি চালিয়ে গেল গোপনে। বিস্তর নকল জহরৎ সংগ্রহ করে, পুরোহিতকে দেখিয়ে দেখিয়ে যেন নিতান্ত অবহেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখল একধারে।

এত জহরতের ওপর যার আকর্ষণ নেই কী, সে কী রকম মানুষ? দেখে তো স্তম্ভিত রাজপুরোহিত! মাধবের খাতির যত্ন বেড়ে গেল আগের থেকে।

এই তো মওকা! এই সুযোগের প্রতীক্ষাতেই ছিল মাধব। এমন ভান শুরু করে দিল যেন শরীরে ঘুন ধরেছে। শরীর আর বইছে না। ইচ্ছে করে খাওয়া কমিয়ে দিয়ে শরীর রোগা প্যাঁকটি করে তুলল, মহাভাবনায় পড়লেন পুরোহিত মশায়।

পুরোহিত শব্দটার অর্থ যিনি মানুষের হিত করেন। মাধব তো এই সুযোগটাই নিতে চায়।

ফলে, তার রীতিমতো সেবাশুশ্রূষা শুরু করে দিলেন পুরোহিত, অথচ তার শরীরে নেই কোনও রোগ।

দিনকয়েক পরে চিঁ-চিঁ স্বরে বললে মাধব, আমি আর বাঁচবো না। আমার একটা ইচ্ছে আপনি রাখুন।

শশব্যস্তে পুরোহিত বললেন, কী ইচ্ছে?

একজন খাঁটি বামুনকে আনুন। আমি আমার সব কিছু তাঁকে দান করবো। তা হলেই আমার ব্যাধি সারবে।

ব্যাধি তো ঘন্টা! কিন্তু সরল পরোহিতমশায় ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে কয়েকজন সদাচারী ব্রাহ্মণকে নিয়ে এলেন জোচ্চোরটার সামনে।

কিন্তু কাউকেই মনে ধরলো না মাধবের। তার বিচারে কেউই নাকি উত্তম দ্বিজ নয়। সুতরাং শুষ্ক বদনে ফিরে যেতে হল প্রত্যেককেই।

পুরোহিত যখন মহা অপ্রস্তুত, তখন এগিয়ে এল খল মাধবের এক খলিফা অনুচর। বিনীত স্বরে বললে পুরোহিতকে, শিপ্রা নদীর তীরে যে সাধক রয়েছেন, ওঁকে আনান। দান গ্রহণের যথার্থ ব্রাহ্মণ তিনিই।

তৎক্ষণাৎ প্রবঞ্চক শিবের সামনে দৌড়ে গেলেন রাজপুরোহিত। তাকে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখেই চোখ বুঁজে ফেলেছিল শিব। রাজপুরোহিতের কাকুতি মিনতি শুনে পিট পিট করে তাকিয়ে বললে, কী ব্যাপার? বিচরণ করছিলাম ব্রহ্মলোকে, আকর্ষণ করে আনা হল কেন?

করজোড়ে অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন রাজ পুরোহিত। তাঁর অতিথি একজন নৃপতিপুত্র। কায়ক্লেশে বেঁচে আছে ব্যাধির প্রকোপে। নিরাময় হতে চায় যথাসর্বস্ব দান করে, একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণকে। সন্ন্যাসীবর কি তাঁর জীবন রক্ষা করবেন?

প্রতারক শিব মনে মনে অট্টহেসে মুখে বললে, আমরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। টাকা-পয়সায় লোভ রাখতে নেই।

ছাড়বার পাত্র নন পণ্ডিত পুরোহিত। অমনি তিনি শাস্ত্রবচন আউড়ে বুঝিয়ে দিলেন, বিয়ে করার পর টাকার জোরে অতিথি এবং অন্যান্যদের সেবা করলেই তো আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

শিবের মুখে জবাব তৈরিই ছিল। বললে সবিনয়ে, বিয়েই করিনি। যার তার মেয়েকে বিয়ে করব না। টাকা নিয়ে করবটা কি?

পুরোহিত দেখলেন, এই তো সুযোগ। এক ঢিলে দু-পাখি মারা যাক। মেয়েটাকেও পার করা যাক। অতিথিকেও সুস্থ করা যাক। তাপস মহাশয়ের বিয়ে করার ইচ্ছে যে আছে, তা কথা থেকেই যখন আঁচ করা যাচ্ছে তখন—

মুখে বললেন, তাহলে এক কাজ করুন। আমার অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যার পানিপীড়ন করুন, আর অতিথির দান গ্রহণ করে আমার জিম্বায় রেখে দিন।

খুব গম্ভীর হয়ে গেল শিব। যেন একটা মহা ফ্যাচাংয়ে পড়েছে এমনি একটা ভাব দেখিয়ে বললে, সোনাদানা মণিমাণিকা দেখতে কী-রকম, তাই তো জানি না। ঘর সংসারেরও কিছু জানি না। কিন্তু আপনি জ্ঞানী পুরুষ, আপনার কথা মাথায় তুলে নিলাম।

কাজ হাসিল হয়ে গেল। শিপ্রা নদীর তীর থেকে এক জোচ্চোরকে নিয়ে আসা হল আর এক জোচ্চোরের সামনে। পুরুৎকন্যাকে দেখেই তো কাম-অবশ হয়ে পড়েছিল শিব। সেই অবস্থায় জোচ্চোর বন্ধুর নকল মণিমুক্তোর দান গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ সমর্পণ করল পুরোহিতকে। যেন স্পৃহা নেই ধনরত্নে। গদগদ হয়ে বিনিময়ে কন্যা সমর্পণ করে দিলেন বোকা বামুন।

নিপুণ চক্রান্তের আর এক অধ্যায় সমাপ্ত হল এইভাবে।

আর তো অসুখের অছিলা করার দরকার নেই। বন্ধুর যুবতী বধূ সান্নিধ্যে তা করাও যায় না। সুতরাং রমণ পর্ব চলল সমানে। দেখতে দেখতে বেশ তাগড়াই হয়ে উঠল মাধব।

তারপর একদিন ইনিয়ে-বিনিয়ে শিব বললে রাজপুরোহিতকে এই নৃপতি-পুত্রের দান গ্রহণ করেছি বলেই তো আজ আমি সুস্থ। সুতরাং ইনি হোক আমার মিত্র।

কাজেই সেইদিন থেকে পুরোহিত ভবনে পাকাপাকি ঠাঁই হয়ে গেল দুই বন্ধুর। মিত্রের তৃপ্তিসাধন করলে যে পতি হৃষ্ট হয়, তা জেনে পুরোহিত কন্যা নিজের দেহ-যমুনায় ভাসিয়ে দিল দুই বন্ধুকে। রতিপ্রিয় রমণীদের অসাধ্য কিছু নেই।

কিছুদিন পর শুরু হল অভিনব চক্রান্তের পরবর্তী পর্ব।

মিন মিন করে জামাতা শিব বললে শ্বশুরমশায়কে, এভাবে আপনার অন্নধ্বংস করতে আমার বিবেকে আটকাচ্ছে। আমার যে ধনদৌলত আপনার জিম্মায় আছে, তা আপনি কিনে নিন। কম দাম দিন। কিন্তু আমাকে স্বাধীনভাবে থাকতে দিন।

বোকা বামুন অনেক ভেবে দেখলেন। রাশি রাশি এই-হিরে জহরতের (যদিও নকল) আসল দাম জানবার ক্ষমতা তাঁর নেই। জহুরি ডাকাও সমীচীন নয়। তাহলেই তো ঢিঢি পড়ে যাবে। রত্নের বিনিময়ে কন্যা সম্প্রদান সমাজ তো ভালো চোখে দেখবে না।

তার চাইতে বরং নিজের যা বিষয়আশয় আছে, তা জামাই শিবকে দান করা যাক।

এবং তাই হল। লেখা হল দুটো দানপত্র। একটায় শিব দিচ্ছে তার হিরেমাণিক শ্বশুরকে, আর একটায় শ্বশুর তাঁর বিষয় সম্পত্তি দিচ্ছেন জামাতাকে।

এইভাবে গেল বেশ কয়েকটা দিন। রতিপ্রিয় পুরুৎকন্যা পালা করে সুখ দিয়ে যাচ্ছে দুই বন্ধুকে এবং মিটিয়ে নিচ্ছে নিজের যামিনীর যাতনা।

পুরুৎমশায়ের জমানো টাকায় একদিন টান পড়ায় তিনি ভাবলেন, গচ্ছিত রত্নরাজির একটা বিক্রি করা যাক।

গেলেন জহুরির কাছে একটা জড়োয়া গয়না নিয়ে।

জহুরি জহর চেনে। তিনি বললেন, এ তো নকল জড়োয়া। কাঁচ আর স্ফটিকে তৈরি।

মুখ শুকিয়ে গেছিল পুরুৎ ঠাকুরের। বাড়ি ফিরে অন্যসব জড়োয়া নিয়ে ফের গেলেন জহুরির কাছে।

মুচকি হেসে জহুরি বলল, সবই নকল। আসল একটাও নয়।

বাড়ি ফিরেই জামাই শিবকে ধরলেন পুরুৎমশায়।

বললেন, তোমার জড়োয়া তুমি নাও। আমার বিষয়সম্পত্তি আমাকে দাও।

শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল শিব, বলেন কী!

রীতিমতো দানপত্র লিখে সব বদলাবদলি হয়েছে। আপনার টাকা কবে খরচ করে ফেলেছি, দেব কোত্থেকে?

পুরোহিতের মাথায় যেন বাজ পড়ল এই কথায়। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। পরিণাম, তুমুল ঝগড়া।

ধড়িবাজ মাধব অর্থাৎ নকল নৃপতি তনয় রোজ যেত রাজসভায়। বিস্তব চালিয়রাতি-টালিয়াতি মারত রাজার কাছে বসে। বচনের তোড়ে সবার মুণ্ড ঘুরিয়ে ছাড়ত। দরবার গমগম করত। থমথম করত তার হাঁকডাকে।

কিন্তু দরবার ভঙ্গ হলেই ফিরে আসত পুরোহিতের বাড়িতে। সেখানে চালিয়ে যেত অন্য প্রতারণা নাটক। বন্ধুস্ত্রী সম্ভোগ।

নকল সাধু শিব জামাই যেদিন তুমুল বচসা চালিয়ে গেল পুরুৎ শ্বশুরের সঙ্গে, সেদিনের ঘটনা বলা যাক।

রাজসভা জমিয়ে বসে আছে নকল রাজপুত্র মাধব, এমন সময়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এলেন রাজপুরোহিত।

তিনি বিচার চাইলেন। জামাইবাবাজি তাঁকে যেসব জড়োয়া দিয়েছিল, সব নকল। বিনিময়ে পুরোহিতের সমস্ত টাকা, সমস্ত বিষয়সম্পত্তি নিয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে, সব জড়োয়াই কাচ আর স্ফটিক দিয়ে তৈরি। অর্থাৎ জামাই ঠকিয়েছে শ্বশুরকে। এই অপরাধের বিচার হোক।

পুরোহিতের কথা শেষ হতে না হতেই তাঁর জামাই এসে হাজির হয়েছিল সভায়। ঠগ-শিরোমণি শিব, অবশ্যই সাধুবেশে।

গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে সে গেয়ে গেল সাফাই, হে রাজা, আমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। বাল্যকাল থেকে জপতপ নিয়ে থাকি। আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ, পার্থিব জগতের কোনটা মেকি, কোনটা খাঁটি, এ সবের খবর রাখি না। কারও দানও কখনও নিইনি। কিন্তু আমাকে সাধনচ্যুত করেছে এই ব্রাহ্মণ। জড়োয়াগুলো খাঁটি কি নকল, তা বোঝবার জ্ঞান আমার আমার নেই, জিনিসগুলো আমার বাবার কাছ থেকেও পাইনি, পেয়েছি এই রাজতনয়ের কাছ থেকে, পুরোহিতের উপরোধেই এই দান আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে, তাঁর অনুরোধেই তাঁর কন্যাকে বিবাহ করতে হয়েছে। গৃহী জীবনে অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় সেই সব গয়না আমি টাকা নিয়ে বেচেছি পুরোহিত মশায়কে, এই দেখুন দানপত্র, পরস্পরের মধ্যে লেখা হয়েছিল। সাক্ষী এই নৃপতিপুত্র।

মাধব বললে, কী আশ্চর্য! গয়নাগুলো যে নকল, তা তো জানতাম না। বাবার কোষাগারে ছিল। শত্রুরা পাছে লুঠে নেয়, তাই সঙ্গে করে এনেছিলাম। তবে এটাও ঠিক যে, এই মণিমাণিক্য দান করেই তো ব্যাধিমুক্ত হয়েছি আসল রত্ন বলেই তা সম্ভব হয়েছে, নকল হলে কখনো তা হত না।

এমন অকাট্য যুক্তি শোনাবার পর হাসির হররা ছুটল রাজসভায়। বাজিমাৎ করে দিল মাধব তার অপূর্ব বাচনভঙ্গী দিয়ে। শিব আর মাধব যে দুজনেই নির্দোষ, সে বিষয়ে রইল না তিলমাত্র সংশয়।

মাথা হেঁট করে ঘরে ফিরে গেলেন পুরোহিত।

অধর্মের জয় হল, ধর্মের পরাজয় ঘটল কুবুদ্ধির প্রভাবে।

গল্প শেষ করে বললে কন্যা কনকরেযা, ধূর্ত যারা, তারা এইভাবেই কথার জাল ফেলে বোকাদের ঠকায়, ঠিক যে ভাবে জেলেরা জাল ফেলে মাধ ধরে। কনকপুরী দেখে এসেছে বলে যে ব্রাহ্মণের ছেলেটা এইমাত্র মনগড়া গল্প শুনিয়ে গেল, সে পয়লা নম্বরের প্রতারক, তাই বলি, আমার বিয়ে দিতে যাবেন না, অনূঢ়া থাকতে দিন।

ফাঁপড়ে পড়লেন রাজা। তারপর অবশ্য বললেন, অনূঢ়া মেয়েদের অনেক বদনাম রটে। মিথ্যে বদনাম সবাই বিশ্বাস করে। যারা সৎ চরিত্রের মানুষ, নিন্দে রটে তাদেরকে নিয়েই। বিয়ের ব্যাপারটা তাই ভেবে দ্যাখো, থামোকা মিথ্যে কলঙ্কের কালি গায়ে মাখতে যেও না।

কন্যা মাথা নীচু করে পিতৃবাক্য শুনে গেল। জনক তখন একটা কাহিনি শোনালেন কন্যাকে।

কুসুমপুর নামে একটা শহর ছিল গঙ্গার পারে। অনেক কাল আগে সেখানে এক সন্ন্যাসী থাকতেন। তাঁর নাম হরস্বামী। বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন করতেন। ভিক্ষে করতেন রোজ। গঙ্গাতীরের আশ্রমে সাধনভজন করতেন।

এরকম একজন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সুনাম আপনা থেকেই ছড়িয়ে পড়ে। সবার কাছে সম্মান পান। হরস্বামীও সকলের শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠলেন।

সেটাই সহ্য হলো না কিছু হিংসুটে মানুষদের। তারা দল বেঁধে এক অতিশয় জঘন্য কুৎসা রটাতে লাগল নগরময়।

কুৎসিত অপবাদটা সুনলে গা শিউরে ওঠে।

হরস্বামী রাক্ষসের মতো চিবিয়ে চিবিয়ে খায়।

হসস্বামী নাকি দিবসে তাপস, রজনীতে শিশুখাদক। বাচ্ছাদের ধরে এনে রাক্ষসের মতো চিবিয়ে চিবিয়ে খায়।

গুজব বড়ো শক্তিশালী। যার কানে গেল এই রটনা, সে শুনেই কানে আঙুল দিল বটে, পরক্ষণেই ভাবল, যা রটে, তার কিছু তো বটে! হরস্বামী অবশ্যই শিশুখাদক।

অতএব তার সংশ্রব ত্যাগ করাই মঙ্গল।
নিজেদের ছেলেপুলে লুকিয়ে রেখেই স্বস্তি, নেই নাগরিকদের, তার চাইতে বরং শিশুখাদককেই নগর থেকে বের করে দেওয়া যাক।
একদিন তাই করতে গেল বিশিষ্ট কয়েকজন নাগরিক। হরস্বামীর আশ্রমের বাইরে দাঁড়িয়ে হেঁড়ে গলায় বললে, বেরিয়ে যান নগর থেকে।
হরস্বামী তো অবাক, বললেন, কেন যাবো?
জবাবটা এল এভাবে, ন্যাকা। রোজ রাতে পেট ভরাচ্ছেন আমাদের কচি বাচ্ছাদের খেয়ে, আবার কথা!
আকাশ থেকে পড়লেন হরস্বামী। তৎক্ষণাৎ গেলেন নগরের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণদের কাছে।
কিন্তু তাঁকে আসতে দেখেই ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে মাচায় উঠে বসে রইল ব্রাহ্মণেরা।
নীচ থেকে হেঁকে বললেন হরস্বামী, আমি নাকি আপনাদের কচি বাচ্ছাদের ধরে ধরে খাই।
সমস্বরে বললে ব্রাহ্মণরা কথাটা অসত্য নয়।
হরস্বামী বললেন, কিন্তু গুজব অসত্যই হয়। তাকিয়ে দেখুন খোঁজ নিয়ে দেখুন, কারও বাচ্ছা কি নিখোঁজ হয়েছে!
টনক নড়ল ব্রাহ্মণদের। খোঁজ নেওয়া হল তৎক্ষণাৎ। এবং মুখ চুন হয়ে গেল।
সব ঘরেই বহাল তবিয়তে রয়েছে বাচ্ছারা।
হইচই পড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। গোটা নগরের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা জড়ো হল হরস্বামীর আশ্রমে।
তাঁকে নগর ত্যাগ করতে দেওয়া হল না।
কাহিনি সমাপ্ত করে রাজা বললেন কনকরেখাকে, গুজব বড়ো ভয়ংকর ভয়ানক শক্তিশালী। নিষ্কলঙ্ক মানুষের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করা দুষ্ট ব্যক্তিদের স্বভাব। তোমার যৌবন আসছে, স্বামী সঙ্গে থাকা নিরাপদ, নইলে দুর্ণাম নির্ঘাৎ।
হেসে বললে কনকরেখা, নিশ্চয় বিয়ে করবো, যিনি কনকপুরী দেখেছেন, শুধু তাঁকে।
এ তো অদ্ভুত গোঁ। মেয়ে জাতিস্মর নাকি?
আবার রাজ্যময় ঘোষণা করলেন রাজা, কে দেখেছে কনকপুরী? আসুক সে, বিয়ে করুক রাজকন্যাকে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বাছবিচার নেই।

২৫. শক্তিদেবের আখ্যায়িকা

বামুনের ছেলে শক্তিদেব যেদিন যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হল কনকরেখার কাছে, সেদিনই গোঁ চাপল তার মাথায়, কনকপুরী সে খুঁজে বের করবেই। হন্যে হয়ে খুঁজবে কন্যে লাভের স্বপ্ন নিয়ে, তাতে জীবন যায় যাক।
সেইদিনই বেরিয়ে পড়ল বর্ধমান থেকে। রওনা হল দক্ষিণ দিকে, মনে মনে অনেক হিসেব নিকেশ করবার পর।
অনেক...অনেকদিন পর পৌঁছোল বিন্ধ্যপর্বতে। সেখানকার গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে দেখতে পেল বিরাট একটা সরোবর, বিরাজ করছে গহন গভীর অরণ্য মধ্যে। অপূর্ব দৃশ্য দেখে মোহিত হয়ে গেছিল শক্তিদেব। সরোবরে ফুটে রয়েছে অজস্র পদ্মফুল, আশপাশ দিয়ে জলে হিল্লোলী তুলে যাচ্ছে রাজহংস।
দীঘির জলে স্নান সেরে নিয়েছিল শক্তিদেব। পথশ্রমের লাঘব ঘটতেই অগ্রসর হয়েছিল নবীন উদ্যমে।
এবার সামনে দেখতে পেয়েছিল একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ। মহীরূহ ঘিরে ঝলমল করছে বহুবর্ণের বিস্তর ফুলঝোপ।
ঠিক যেন তপোবন।
সত্যিই তাই বটে।

আর একটু এগোতেই চোখে পড়েছিল একটা আশ্রম। সাধুর আশ্রম।

বেশ কয়েকজন সাধু বসে রয়েছেন উজ্জ্বল তারকাসম এক তাপসকে ঘিরে। তার নামও সূর্যতাপস। বয়সের গাছ পাথর নেই।

তাকে প্রণাম করেছিল শক্তিদেব।

ঋষি জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি? কোত্থেকে আসছ? কোথায় যাচ্ছ?

আত্মপরিচয় দিল শক্তিদেব। ব্যক্ত করল আগমনের অভিপ্রায়।
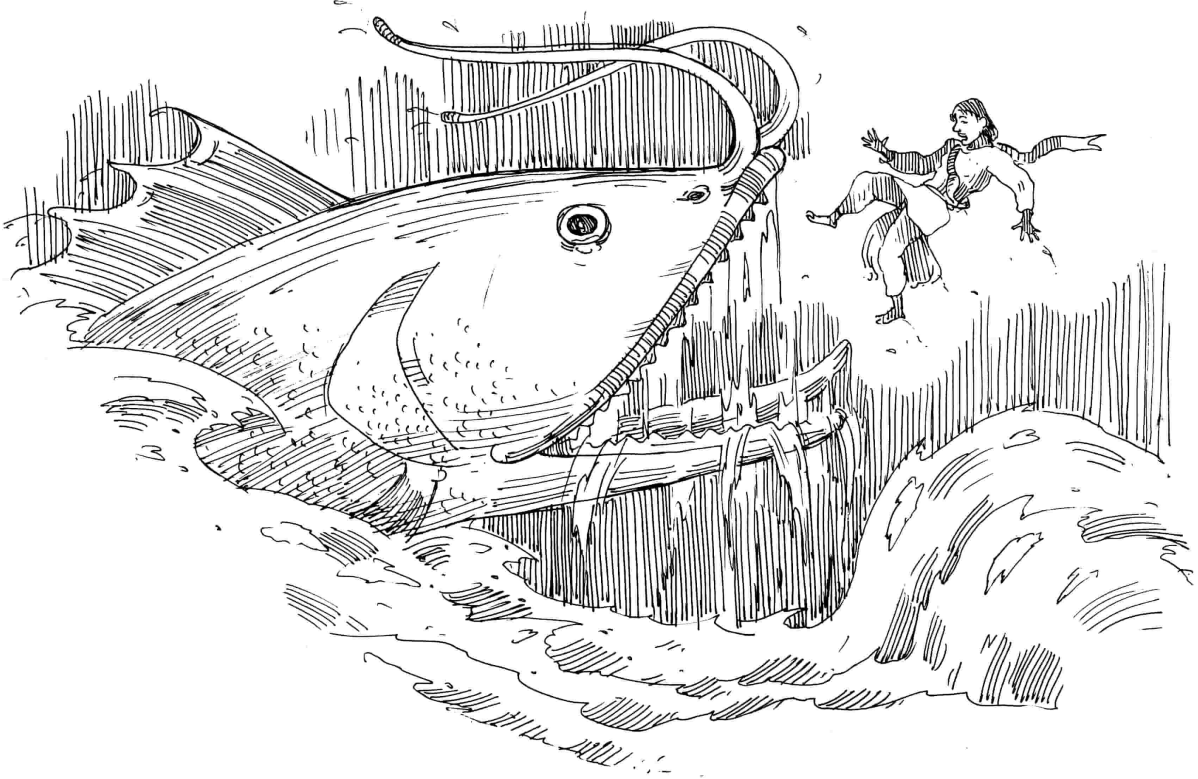
বিশালকায় একটা মাছ কোঁৎ করে গিলে নিল শক্তিদেবকে...

কনকপুরীর সন্ধানেই সে হয়েছে বিবাগী।

ঋষি বললেন, একটানা প্রায় আটশো বছর ধরে সাধন ভজন করে যাচ্ছি এই আশ্রমে, কিন্তু কনকপুরীর নাম তো কানে আসেনি।

শক্তিদেব কিন্তু নাছোড়বান্দা। আগে কনকপুরীর হদিশ তাকে বলতেই হবে।

অগত্যা বললেন সূর্যতাপস, এই মহারণ্যের তিনশো যোজন দূরে একটা দেশ আছে। সে দেশের নাম কাম্পিল্য।

খুব উঁচু একটা পাহাড় দেখতে পাবে সেখানে। পাহাড়টার নাম উত্তর। সানুদেসে আছে একটা আশ্রম। আমার বড়োভাই মহা ঋষি দীর্ঘতপা তপস্যা করেন সেখানে। তিনি যদি সদয় হন, কনকপুরীর ঠিকানা পেয়ে যাবে।

অনেক হেঁটে, অনেক কষ্ট করে মহর্ষি দীর্ঘতপার সামনে পৌঁছেছিল শক্তিদেব।

কিন্তু কনকপুরীর ঠিকানা তাঁর জানা নেই। হতোদ্যম হয়নি শক্তিদেব।

তখন ধ্যানস্থ হয়ে গেছিলেন মহাঋষি দীর্ঘতপা। যা তাঁর জানা ছিল না, তা জেনে গেলেন যোগবলে।

কী পন্থায় কনকপুরী সন্দর্শন ঘটবে, তার বিবরণ দিয়ে গেলেন মুখে মুখে।

সমুদ্রের মাঝে একটা দ্বীপ। সেই দ্বীপের নাম উৎস্থল।

সত্যব্রত নামে এক বেজায় বড়োলোক জেলে থাকে সেখানে। বড়ো কারবারি। দুনিয়াময় ছড়ানো অসংখ্য দ্বীপের অনেকগুলোতে যেতে হয় তাকে ব্যবসার জন্যে। কনকপুরী নিশ্চয় সে দেখেছে, উৎস্থল দ্বীপে যেতে গেলে আগে পৌঁছোতে হবে বিটঙ্কপুরে, সমুদ্রের ধারে রয়েছে সেই নগর। সেখান থেকে একটা সওদাগরি জাহাজে চাপলেই পৌঁছানো যাবে উৎস্থল দ্বীপে।

অনেক কষ্টে বিটঙ্কেপুরে পৌঁছেছিল শক্তিদেব। আলাপ জমিয়েছিল সমুদ্রদত্ত নামে এক সওদাগরের সঙ্গে। তারপর একদিন চেপে বসেছিল সমুদ্রদত্তের জাহাজে, জাহাজ যাচ্ছে উৎস্থল দ্বীপে ব্যবসার জন্যে।

কিন্তু সমুদ্রযাত্রায় বিপদ তো থাকবেই। সেই বিপদে পড়ল দুই বন্ধু, জাহাজ সমেত।

প্রবল ঝড় আর পর্বত প্রমাণ ঢেউ ডুবিয়ে দিল বাণিজ্য পোত।

একটা ছোটো নৌকো নিয়ে জলে ভেসে গেল শক্তিদেবের বন্ধু, শক্তিদেব সাঁতার কেটে এগিয়ে গেল, কোথায় কে জানে।

ঠিক এই সময়ে ঘটল একটা অদ্ভুত কাণ্ড। বিশালকায় একটা মাছ কোঁৎ করে গিলে নিল শক্তিদেবকে, আস্ত শক্তিদেব নিমেষে চালান হয়ে গেল তার পেটে!

আরও আশ্চর্য! শক্তিদেব দিব্বি বেঁচে রইল মাছের পেটে! শুধু মনে হয়েছিল, রয়েছে যেন একটা জেলখানায়!

জল তোলপাড় করে মীন মহারাজা বহুদিন পরে এসে পৌঁছেছিল উৎস্থলদ্বীপের কাছে। কাতারে কাতারে জেলে দাঁড়িয়েছিল সমুদ্রতীরে। এই দ্বীপ তাদের বড়ো খাঁটি। সত্যব্রত ধীবর তাদেরই রাজা। মহাকায় মৎস্যপ্রভুকে দেখে হৈ হৈ করে পাড়ি দিয়েছিল সমুদ্রে। মীন মহোদয়কে পাকড়ে এনে তুলেছিল দ্বীপে। সত্যব্রত ধীবর এত বড়ো মাছ কখনও দেখেনি। তার হুকুমে তৎক্ষণাৎ মাছের পেট কাটা শুরু হতেই......

অবাক কাণ্ড! সজীব এক পুরুষ হন হন করে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে!

হতভম্ব ধীবর রাজা শুধিয়েছিল তাকে, কে হে তুমি? মাছের পেটে কী করছিলে?

শক্তিদেব নিজেও কম হতভম্ব হয়নি। অদৃষ্ট এ কী লীলা দেখিয়ে যাচ্ছে? জাহাজ ডুবি, মৎস্যের গলাধিকরণ, উদর থেকে নিষ্কৃতি, অসম্ভব অসম্ভব ব্যাপার পর পর ঘটে যাচ্ছে।

ধীরেসুস্থে অসম্ভবের কাহিনি পরম্পরা নিবেদন করার পর বলেছিল, বেরিয়েছি তো কনকপুরীর সন্ধানে। বলতে পারেন ঠিকানা?

ধীবর রাজা বললে, জানলে তো বলব। তবে শুনেছি একটা দ্বীপে আছে কনকপুরী। কিন্তু সে দ্বীপ কোথায়, তা তো জানি না।

ভীষণ মুষড়ে পড়েছিল শক্তিদেব। সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল জেলেদের রাজা, এত ঘাবড়ে পড়ার কী আছে? ভাগ্য তো উদ্যোগী পুরুষকেই সাহায্য করে যায়। তোমাকেও করবে। রাত কাটাও একটা মঠে। তারপর দেখা যাক।

সত্যিই ভাগ্য সহায় হয়ে গেল শক্তিদেবের, রাত্রি নিবাস করল সেই মঠেই। দেখা হয়ে গেল বিষ্ণুদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে। পরিচয়ও বেরিয়ে গেল। সম্পর্কে তিনি শক্তিদেবের মামাতো ভাই!

তিনিই শক্তি জুগিয়ে গেলেন শক্তিদেবের মনে। বললেন, আরে ভাই, এখানে বহু বণিকের যাতায়াত আছে। নানান দ্বীপে তাদের বসবাস। কনকপুরীর হদিশ তারাই দেবে।

সেই রাত্রে শক্তিদেবের ভাঙা মনকে জোড়া লাগানোর জন্যে চমৎকার একটা গল্প শুনিয়ে দিলেন বিষ্ণুদত্ত।

গল্পটা এই :

বহুকাল আগের কথা। কালিন্দী নদীর তীরে থাকতেন এক ব্রাহ্মণ। তাঁর নাম গোবিন্দস্বামী। দুই ছেলের বাবা। বড়ো ছেলের নাম অশোকদত্ত, ছোটর নাম বিজয়দত্ত।

দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় সপরিবারে কাশী রওনা হয়েছিলেন গোবিন্দস্বামী।

পথে দেখা হয়েছিল এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। দুই ছেলে সম্বন্ধে তিনি ভবিষৎবাণী করে গেলেন, ছোটো ছেলে কাছ ছাড়া হবে খুব শিগগিরই, কিন্তু ফিরে আসবে বড়ো ছেলের গুণে।

কাশীতে এসে গোবিন্দস্বামী ঠাঁই নিলেন কাশীর বাইরে, একটা চণ্ডিকা দেবালয়ের পাশে।

এক রাত্রে হঠাৎ কাপুনি দিয়ে জ্বর এল ছোটোল ছেলের। ঠাণ্ডার জ্বর। দরকার জ্বলন্ত কাঠ, গা গরম করার জন্যে।

কিন্তু অত রাতে কার কাছে কাঠ পাবেন গোবিন্দস্বামী?

ছোটো ছেলে বললে, কারও কাছে হাত পাতবার দরকার নেই। ওই তো দূরে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। আমাকে ধরে ধরে নিয়ে চলুন।

বাবা বললেন, কী সর্বনাশ! ও যে চিতার আগুন। শ্মশানে পিশাচরা নেচে বেড়াচ্ছে। ছেলেমানুষ তুমি, তোমাকে কি ওখানে নিয়ে যাওয়া যায়?

নির্ভীক বিজয়দত্ত হেসে বললে, পিশাচকে আবার ভয় কীসের? চলুন.....চলুন।

ভয়ডরহীন বিজয়দত্ত বাবার হাত ধরে চলে গেল শ্মশানে। গিয়েই দাঁড়িয়ে গেল একটা জ্বলন্ত চিতার সামনে। গা গরম করে গেল আগুনের আঁচে।

কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করেছিল বাবাকে, চিতায় কী পুড়ছে, বাবা?

একটা মানুষের মাথা!

ছেলে একটা চ্যালাকাঠ তুলে নিয়ে দমাস করে মেরেছিল জ্বলন্ত মুণ্ডতে।

ফেটে গেছিল করোটি। খিলু ছিটকে এসে লেগেছিল বিজয়দত্তর নাকে মুখে চোখে চিবুকে।

রাক্ষসিক ভেলকি শুরু হয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ। ঘিলুর গন্ধ নাকের মধ্যে দিয়ে আর স্বাদ জিভের মধ্যে দিয়ে বিজয়দত্তের মগজে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেছিল অভাবনীয় রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া, যা শুধু পৈশাচিক পরাবিজ্ঞাণেই সম্ভব। রাক্ষসরূপ পরিগ্রহ করেছিল বিজয়দত্ত!

হাড়-চামড়া ঝুলে পড়েছিল সারা শরীরে, লকলকে জিভ বেরিয়ে এসেছিল মুখবিবর থেকে একহাত বাইরে।

সে এক বর্ণনাতীত বীভৎস আকৃতি। পরিবর্তন এসেছিল প্রকৃতিতেও। খপ করে একটা ধারালো তলোয়ার তুলে নিয়ে কচুকাটা করতে গেছিল নিজের বাবাকেই!

ঠক ঠক করে কাঁপছিলেন গোবিন্দদত্ত। সেই অবস্থাতেই স্মরণ করেছিলেন ঈশ্বরকে, বিপন্নের পরিত্রাতাকে।

শরণাগতের রক্ষায় আকাশবাণী হয়েছিল তৎক্ষণাৎ।

করছো কি রাক্ষস? উনি যে তোমার বাবা!

ভীষণ চমকে উঠেছিল রাক্ষসে রূপান্তরিত বিজয়দত্ত। লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে নিমেষে উধাও হয়ে গেছিল শ্মশান থেকে।

কিন্তু সেই ঘটনায় বিলক্ষণ অভিভূত হয়ে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেছিলেন গোবিন্দস্বামী। অনেকক্ষণ অপেক্ষাও করেছিলেন। কিন্তু রাক্ষসরূপী পুত্র আর ফিরে আসেনি।

মন্দিরে ফিরে এসে হাপুসনয়নে সমস্ত ঘটনা বলেছিলেন ব্রাহ্মণীকে। কান্নাকাটি শুনে লোক জড়ো হয়ে গেছিল চণ্ডিকা মন্দির ঘিরে। স্তম্ভিত হয়েছিল তারাও। এরকম অলৌকিক রূপান্তর কাহিনি কেউ কখনও শোনেনি।

খপ করে একটা ধারালো তলোয়ার তুলে নিয়ে কচুকাটা করতে গেছিল নিজের বাবাকেই!

ঠিক সেই সময়ে সমুদ্রদত্ত এসেছিলেন সেখানে। নামী সওদাগর তিনি। করুণার অবতার। ব্রাহ্মণ দম্পত্তির বিলাপ শুনে তাঁদের নিয়ে গিয়ে রেখেছিলেন নিজের বণিক-ভবনে।

শোকের বিহ্বলতা কিঞ্চিৎ স্তিমিত হওয়ার পর গোবিন্দদত্তের মনে পড়েছিল সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ভবিষ্যৎবাণী। ভবিষ্য-দৃষ্টি দিয়ে তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তার প্রথমাংশ ঘটে গেল। বাকিটুকুও তাহলে ঘটবে। এবং তা মিলনান্তক হবে।

এই ভেবে চোখের জল মুছেছিলেন ব্রাহ্মণ দম্পতি। বড়ো ছেলে অশোকদত্তকে মানুষের মতো মানুষ করতে লাগলেন ভবিষ্যৎবাণীর শেষার্ধ স্মরণে রেখে। শুধু শাস্ত্র নয়, যুদ্ধবিদ্যাতেও তাকে দক্ষ করে তুললেন এমনভাবে যে তার সমকক্ষ কেউ আর রইল না ভূভারতে।

পুরস্কারও এল যথাসময়ে। দাক্ষিণাত্যের এক মল্লবীর কাশীর সমস্ত মল্লযোদ্ধাকে গোহারাণ হারিয়ে দিয়ে মাথা হেঁট করে দিয়েছিল কাশীর রাজা প্রতাপমুকুটের। তখন তলব পড়েছিল কুস্তিগির অশোকদত্তের। সে তুলে আছাড় মেরেছিল দাক্ষিণাত্যের মহাবীরকে। হইচই পড়েগেছিল কাশীধামে। সেই থেকে রাজার পার্শ্বচর হয়ে গেছিল অশোকদত্ত। মানসম্মান, ধনরত্ন, সব এসে গেল এরপর থেকেই। শুধু তাই নয়, মাননীয় প্রধান সহচরকে রাজবাড়িতে রেখে দিলেন রাজা প্রতাপমুকুট।

একদিন শিবের পুজো দিতে রাজা বেরিয়েছিলেন সহচর অশোকদত্তকে নিয়ে। সেদিন ছিল চতুর্দশী। রাত হয়ে গেছিল পুজো শেষ করতে। ফিরছিলেন শ্মশানের পাশ দিয়ে।

এমন সময়ে প্রাণান্ত চিৎকার ভেসে এসেছিল শ্মশানের ভেতর থেকে ; রাজা, আমার মুখে একটু জল দিয়ে জান। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। তিনদিন হয়ে গেল শূলবিদ্ধ হয়ে রয়েছি। বিনা অপরাধে আমাকে শূলে চাপিয়েছেন ন্যায় আদালতের বিচারপতি।

নিদারুণ সেই হাহাকার বিচলিত করেছিল রাজাকে। তৃষ্ণার্তর মুখে জল দেওয়া মহান কর্তব্য। অশোকদত্তকে সেই দায়িত্ব তিনি দিয়ে নিজে ফিরে গেছিলেন রাজবাড়িতে।

অশোকদত্ত চলে গেছিল শ্মশানের ভেতরে। গিয়ে দেখেছিল অতিভয়ানক দৃশ্যের পর দৃশ্য। কোথাও শিয়াল ছুটছে মানুষের মাংস খাওয়ার জন্যে, কোথাও দাউদাউ করে জ্বলছে চিতা ধোঁয়ার কুণ্ডলি রচনা করে, কোথাও পাগলা পিশাচরা ধেই ধেই করে নাচছে মানুষের কঙ্কাল নিয়ে, কোথাও হাততালি দিয়ে উৎকট নৃত্য আর বিকট সংগীত জুড়েছে ভূতে পাওয়া মড়া আর ভয়ংকর দেহী তান্ত্রিকরা।

মহাশ্মশানের এহেন বুক কাঁপানো দৃশ্য দেখে তিলমাত্র ভয় না পেয়ে গলার শির তুলে অট্টরোলের ঊর্ধ্বে কণ্ঠস্বর উঠিয়ে বলেছিল অশোকদত্ত, জল চাইছিলে কে?

ভেসে এসেছিল বিকৃত স্বরের নিনাদী জবাব, আমি।

স্বরের উৎস লক্ষ্য করে দৌড়ে গেছিল অশোকদত্ত। গিয়ে দেখেছিল বিচিত্র এক দৃশ্য।

দাউ দাউ করে জ্বলছে একটা চিতা। তার পাশেই চর্বি মাখানো শূলে গেঁথে রয়েছে এক পুরুষ। নীচে দাঁড়িয়ে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে এক পরমাসুন্দরী যুবতী।

বিস্ময়বিমূঢ় অশোকদত্ত বলেছিল, ব্যাপারটা কী? এত কান্না কেন? কে তুমি?

অশ্রুধারা দ্বিগুণ করে দিয়ে জবাব দিয়েছিল রূপসী রমণী, এই মুমূর্ষুর কান্তা আমি। তিনদিন ধরে শূলে বিঁধে রয়েছেন আমার স্বামী, সহমরণের জন্যে আমি তৈরি। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু না হলে জ্বলন্ত চিতায় উঠতে পারছি না। তিন-তিন দিনের মৃত্যুযন্ত্রণায় তৃষ্ণায় কাতর হয়েছেন, মুখে জল দিতেও পারছি না। অত উঁচু শূলের নাগাল যে পাচ্ছি না।

অশোকদত্তের মন গলে গেছিল তৎক্ষণাৎ। বলেছিল, আমি হেঁট হয়ে বসছি, তুমি আমার পিঠে উঠে স্বামীর মুখে পিপাশার জল দাও। এই নাও জল।

দুহাত মাটিতে রেখে রূপসীকে পিঠে তুলে নিয়েছিল অশোকদত্ত। চোখ মাটির দিকে থাকায় দেখতে পায়নি পিপাসা কাতরের মুখে জল দেওয়া হচ্ছে কিনা।

কিন্তু চমকে উঠেছিল টপটপ করে গরম রক্ত মুখে আর পিঠে পড়ায়।

শিউরে উঠেছিল ঘাড় বেঁকিয়ে ওপরে তাকিয়েই।

একী কাণ্ড করছে সর্বাঙ্গসুন্দরী! শূলে বেঁধা মানুষটার গায়ের মাংস ছুরি দিয়ে কেটে কেটে মুখে পুরছে আর খাচ্ছে!

স্বচক্ষে নৃশংস সেই দৃশ্য দেখবার পর আর স্থির থাকতে পারেনি মহাবীর অশোকদত্ত। ঝটকান দিয়ে মেয়েটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে কুস্তিগিরের কায়দায় তাকে তুলে আছাড় মারবার জন্যে খামচে ধরেছিল একটা পা।

কাঁচা নরমাংস যে খায়, সে রাক্ষসী ছাড়া কিছু নয়। কান্তাবিদ্যার জোরে সে অপরূপ সেজেছে ঠিকই, আছাড়ের পর আছাড় মেরে তাকে রক্তমাংসের পিণ্ডি পাকানো দরকার।

কিন্তু পায়ের গোড়ালি তো ধরতে পারেনি অশোকদত্ত, চেপে ধরেছিল নূপুর।

কৌশলবতী ঝটকান মেরে পা খসিয়ে এনেছিল অশোকদত্তের মুঠো থেকে...

মহাবীরের হাতে থেকে গেছিল পায়ের নূপুর!

পরমুহূর্তে শূন্যে উড়ে গেছিল অপরূপা, যেন একটা বিদ্যুৎ শিখা, আর তাকে দেখতে পায়নি অশোকদত্ত।

নূপুর হাতে নিয়ে রাজার কাছে গেছিল অশোকদত্ত, হাতে সেই রত্ন খচিত নূপুর।

শ্মশান-কাহিনি শুনে শিহরিত রাজা তৎক্ষণাৎ নূপুর নিয়ে রানির কাছে গিয়ে বলেছিলেন, এমন বীরপুরুষকেই জামাই করতে চাই। একমাত্র বিক্রম দিয়েই বসুন্ধরাকে কুক্ষিগত করা যায়, বৈভব দিয়ে নয়, কারণ তা অস্থায়ী।

সায় দিয়েছিলেন রানি, তাই হোক। কেননা, কন্যা মদনলেখা ইতিমধ্যে মন দিয়ে ফেলেছ অশোকদত্তকে, মাত্র একদিন দেখেই। সেদিন একা বাগানে বেড়াছিল অশোকদত্ত। তারপর থেকেই শয়নে স্বপনে জাগরণে বিচরণে অশোকদত্ত ছাড়া তার আর কোনও ধ্যানের বিষয় নেই। হোক, এই বিয়ে হোক, তাড়াতাড়ি হোক, কিন্তু অশোকদত্তকে সম্মত করান, দেরি করবেন না। কারণ, কাল রাতে আমি এমন একটা স্বপ্ন দেখেছি যার পর থেকে মন আমার বড়ো অস্থির।

রাজা শুনতে চাইলেন রানির স্বপ্নবৃত্তান্ত।

রানি বললেন, একজন বয়স্কা মহিলা আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, চিন্তা কীসের? মদনলেখার উপযুক্ত বর তো এসে গেছে। জামাই করে নাও অশোকদত্তকে। পূর্বজন্মে ওরা ছিল স্বামী-স্ত্রী।

সেইদিনই মদনলেখা-অশোকদত্তের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হল সাড়ম্বরে।

দিন কয়েক পরে....

রানি বললেন রাজাকে, শ্মশান থেকে জামাই যে নূপুরটা এনেছিল, তার জোড়া নূপুর বানিয়ে দেবেন? এমন মণিময় অপূর্ব সুন্দর নূপুর কখনও দেখিনি।

গয়নার কারিগরদের ডেকে পাঠালেন রাজা। তারা তো হতবাক নূপুর দেখে। তারপর বললে, প্রভু, এমন নূপুর নির্মাণের দক্ষতা আমাদের নেই। যেখান থেকে এটি পেয়েছেন, সেখানে বরং খোঁজ করুন।

কী মুশকিল! নূপুর তো ছিল এক মাংসখাকী পিশাচিনীর পায়ে, সে তো লম্বা দিয়েছে অন্তরীক্ষে!

অশোকদত্ত অভয় দিয়ে বললে, চিন্তা কীসের? আমি এনে দিচ্ছি অন্য পায়ের নূপুর।

এমনভাবে বলে গেল কথাগুলো, এত সহজে, যেন অসম্ভব বলে একটা শব্দ জানা নেই অশোকদত্তের।

গম্ভীর রাতে একা চলে গেল মহাশ্মশানে। গিয়ে দেখলে আগের মতোই গা-কাপানো বুকের রক্ত ছলকানো দৃশ্য। দানো আর পিশাচরা শ্মশানময় লম্ফ দিয়ে বেড়াচ্ছে এবং এক জায়গায় চুপ করে বসে রয়েছে।

সেই সর্বাঙ্গ সুন্দরী যুবতী, যেন কামলালসার জীবন্ত ফোয়ারা। চোখের বিদ্যুতে, কুচযুগলের সঞ্চালনে, নিতম্বের আন্দোলনে নীরব এবং অমোঘ আহ্বান, এস, তৃপ্ত করো মোরে!

রাক্ষসীই বটে! মোহিনী মায়ায় সিদ্ধা। কান্তা বিদ্যায় বিদূষী। সারা শরীর ঘিরে সম্ভোগানন্দের লেলিহ শিখা।

কিন্তু তা দিয়ে টলানো গেল না বীর অশোকদত্তকে। রূপের ফাঁদ পেতে যে বসে আছে, কাঁচা মাংস খাবে বলে, তাকে কাঁচা মাংসের টোপ ফেলেই গাঁথা যাক

শুরু হল নির্জন নিশীথে শ্মশান পরিক্রমা। মড়া চাই। একটা মড়া।

পাওয়া গেল একটা মড়া। গলায় দড়ি দিয়ে গাছের ডালে ঝুলে রয়েছে। দড়ি কেটে মড়া নামাল অশোকদত্ত। সেই দড়ি ধরেই মড়া টেনে নিয়ে গেল শ্মশানভূমির ওপর দিয়ে।

হেঁকে হেঁকে ডেকে গেল ভূতপ্রেত দানো পিশাচদের; মড়া চাই? মড়া চাই? এই এনেছি মড়া। দাও দাম, নাও মড়া।

পিশাচরা কখনও কিনে মড়া খায় না। সুতরাং কেউ কাছে ঘেঁসল না।

কিন্তু সাড়া এল দূর থেকে, রমণী কণ্ঠে।

এস, এস, এখানে এস। দাম দেব, মড়া কিনব।

হিড়হিড় করে মড়া টেনে নিয়ে গিয়ে অশোকদত্ত দেখল, সেই অপরূপাই বটে। পা ছড়িয়ে বসে 'মড়া দাও' 'মড়া দাও' বলে বীণা কণ্ঠে, কামজাগানো কায়দায় চেঁচিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এখন তো সে একা নয়! অথচ একটু আগেই দেখে গেছিল একাকিনী।

উদ্দেশ্য যে মহৎ নয়, তা নিমেষে বুঝে গেছিল অশোকদত্ত।

টক্কর দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল তৎক্ষণাৎ।

বলেছিল মোলায়েম কামক্ষরিত গলায়, কে নেবে মাংস? দাম দাও, আগে দাম ছাড়ো।

রজনীর মাদকতায় যেন মদির হয়ে উঠেছিল রহস্যময়ী সেই কামিনীরা। চোখে চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেছিল অশোকদত্তের চিৎকারে। মাঝখানে বসেছিল যে রূপসী, জবাবটা ভেসে এসেছিল তার কণ্ঠ থেকে, নেব তো আমি। কিন্তু দাম দিতে হবে কত?

রত্নখচিত অপূর্ব সুন্দর সেই নূপুর দেখিয়ে বলেছিল অশোকদত্ত, এর জোড়া যেটা, অপর পায়ের নূপুরটা।

কলকল স্বরে কামেশ্বরী কামিনী বলেছিল তৎক্ষণাৎ, ওর জোড়া তো আমার এই পায়ে। আপনার হাতে যেটা রয়েছে, ওটাও ছিল আমার আর এক পায়ে। ছিনিয়ে নিয়ে গেছিলেন আপনি। কিন্তু মড়ার বদলে অপর নূপুর তো পাবেন না। আমি যা বলব, তা করতে হবে। তবে দেব।

আমি রাজি, বলেছিল অশোকদত্ত।

উচ্চহাস্য করে বলেছিল অপরূপা, আপনি কি ভেবেছিলেন, নূপুর আপনি ছিনিয়ে নিয়ে গেছিলেন?

অশোকদত্ত তো থ! বলে কী এই কুহকিনী?

হেসে গড়িয়ে পড়েছিল কামরূপিনী কন্যারা। মাঝের রমণী বলেছিল সাদা দাঁতের ঝিলিক তুলে, মহাশয়, নূপুরখানা ইচ্ছে করেই আপনার হাতে খসিয়ে ফেলে আমি অন্তর্ধান করেছিলাম।

অশোকদত্ত এবম্বিধ বাক্য কখনও শ্রবণ করেনি। এক পায়ের নূপুর স্বেচ্ছায় খসিয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেছিল এই দামিনী সদৃশা কামিনী!

কিন্তু কেন? শুধিয়েছিল অশোকদত্ত।

কলকণ্ঠী কামিনীর গায়ে গা দিয়ে বসেছিল কমবয়সী একটি মেয়ে। যৌবন তার সারা শরীরে সবে ডালপালা মেলে ধরছে। দুই গাল তার আপেলের মতো রক্তিম।

স্ফুরিত অধরে আতীব্র কামপিপাসা ফুটি ফুটি হয়ে রয়েছে।

তার কুচযুগল ইষৎ অনাবৃত। কটিদেশের মেখলা স্খলিত। তনুঘিরে নীরব আহ্বান, ওগো এসো, নিংড়ে নাও আমাকে।

সেই মেয়েটিকে, দেখিয়ে বললে প্রথম ছদ্মবেশিনী, আমার এই মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়ার জন্যে।

রেগে গেলেও মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিল অশোকদত্ত। বলেছিল, রাক্ষসীর মেয়েকে বিয়ে করব আমি?

নইলে পাবে না আমার এই পায়ের নূপুর। এর জোড়াও পাবে না ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও।

রাক্ষসী, কী তোমার পরিচয়?

আমার নাম বিদ্যুৎশিখা।

সার্থক নাম। স্বামী নিশ্চয় আর এক রাক্ষস?

অবশ্যই। তার নাম লম্বজিহ্ব?

মানে, জিভ যার ইয়া লম্বা?

হ্যাঁগো, ভাবীজামাই হ্যাঁ। কিন্তু তার বউ একটাই এ আমি। আমার প্রতি অণুপরমাণুতে কাম বিদ্যুৎ। তাই তার বহু ভার্যার প্রয়োজন হয় না। আমার আরও অনেক গুণ আছে। তার কিছুটা তুমি দেখেছো। আমি ইচ্ছে করলেই নানা আকার নানা চেহারায় নিজেকে মূর্তিমতী করতে পারি। কিন্তু আমার কপাল পুড়লো এই কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই।

কীভাবে?

কপালস্ফোট নামে এক রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গেল লম্বজিহ্ব। আমি বিধবা হলাম।

তাতে কী? কপালস্ফোট নিশ্চয় তোমাকে অঙ্কশায়িনী করেছে?

করলে তো বাঁচতাম, অম্লানবদনে বলে গেল বিদ্যুৎশিখা, কপালস্ফোট, আমাকে আর আমার এই মেয়েকে খুব যত্ন করে রেখে দিল নিজের বাড়িতে। সেই বাড়িতেই সে বড়ো হয়েছে, দূরন্ত যৌবন তার শরীরে প্রচণ্ড কামনা জাগিয়েছে। সেই কামানল নিবৃত্তি করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। উপযুক্ত বরের অন্বেষণে প্রতি রাতে

শ্মশানে শ্মশানে ঘুরেছি। ভূতপ্রেত দত্যিদানব, কাউকেই উপযুক্ত মনে করিনি। কিন্তু সেই রাতে তোমাকে দেখেই আমার মন বলেছিল, এই সেই মানুষ যে রাক্ষসী কন্যাকেও তৃপ্তি দিতে পারবে।

অশোকদত্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ নিঃসন্দেহে। প্রকৃতই বীর্যবান। কিন্তু সেই শক্তি এক রাক্ষসী তনয়াকেও লোবাতুরা করতে পারে, এমনটা কখনও ভাবেনি।

বিদ্যুৎশিকার কন্যার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল, সে আরও বিবশা, রতিসুখ অভিলাশে আত্মহারা।

বিদ্যুৎশিখা বললে, ওগো ভাবা জামাই, সেরাতে আমি ইচ্ছে করেই আমার এক পায়ের নূপুর তোমার হাতে গছিয়ে সরে পড়েছিলাম, যাতে অপর নূপুরের সন্ধানে ফিরে আসো এখানে, স্বচক্ষে দেখে নিতে পারো আমার মেয়েকে। পাত্রী পছন্দ হয়েছে, চোখ দেখেই বুঝছি, এবার বিয়েটা হয়ে যাক, নূপুর নাও দখলে।

মিথ্যে বলে লাভ নেই, পাত্রী অবশ্যই পছন্দ হয়েছিল বীরশ্রেষ্ঠ অশোকদত্তের কামবাণের বশীকরণ ক্রিয়া প্রথম দর্শন থেকেই সুরত স্পন্দন জাগিয়ে গেছিল অশোকদত্তের অণুপরমাণুতে—সুতরাং পাত্রীর জন্মবৃত্তান্ত ঠাঁই পায়নি তার মগজে।

সবচেয়ে বড়ো কথা, সম্ভোগ অন্তে নূপুর তো পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং সয্যাসঙ্গিনী এক্ষেত্রে একটা ফাউ।

অতএব ব্যোমমার্গে সদলবলে অশোকদত্ত চলে গেছিল হিমাচল শিখরের কালঘন্টপুর অঞ্চলে। রাক্ষস নগরী কালঘন্টপুর। সুরখ্য নিকেতনের পর নিকেতন। অভিনব এবং আশ্চর্য সুন্দর। বিমোহিত হয়েছিল অশোকদত্ত।

রাক্ষস-দুহিতার সঙ্গে পরমানন্দে বেশ কিছুদিন এখানে কাটিয়ে দিয়েছিল। রঙিন প্রজাপতির মতো উড়ে গেছিল একটার পর একটা দিন।

তারপর একদিন শপথবাক্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল শাশুড়িকে। নূপুর চাই...নূপুর!

হাতে এসেছিল অতুলনীয় সেই নূপুর।

সেই সঙ্গে একটা সোনার পদ্ম। শাশুড়ির উপহার জামাইকে। সে রকম কনক কমল ভূভারতে কেউ দেখেনি।

আকাশপথে জামাইকে তুলে সাঁ-সাঁ করে চলে এসেছিল কাশীর মহাশ্মশানে।

বলে গেল বিদায় নেওয়ার সময়ে, প্রতি কৃষ্ণচতুর্দশীর রাতে আমি আসব এই শ্মশানে। মুখটা দেখিয়ে যেও।

এই বলে অন্তরীক্ষে শাশুড়ি অদৃশ্য হয়ে যেতেই অশোকদত্ত আগে গেছিল বাবা গোবিন্দ স্বামীর কাছে। ছোটো ভাই রাক্ষসে পরিণত হওয়ার পর থেকে পিতার মানসিক অবস্থা যে কতখানি শোচনীয়, তা তো তার অজানা নয়। তার ওপর জ্যেষ্ঠপুত্রের সহসা নিরুদ্দেশ হওয়া।

সুতরাং, নূপুর নিয়ে আগে রাজার কাছে না গিয়ে বাবার কাছে গেছিল অশোকদত্ত। গিয়েই দেখতে পেয়েছিল রাজা প্রতাপমুকুটকেও। তিনিও অতিশয় উৎকণ্ঠিত হয়ে জামাই অশোকদত্তের খোঁজ নিতে নিজেই গেছিলেন বেয়াইয়ের কাছে।

অতঃপর রাজপুরী মাতিয়ে দিয়েছিল অশোকদত্ত তার বীরত্বগাথা শুনিয়ে আর স্বর্ণকমল সহ মণিময় নূপুর দেখিয়ে।

রানিতো জোড়া নূপুর পেয়ে খুশিতে ডগমগ। রাজার মাথায় এল অন্য একটা মতলব, কনক কমল নিয়ে। নূপুর যেমন নারীর পায়ে শোভা পায়, পদ্ম তেমনি মন্দিরে শোভা পায়। রাজবাড়ির সামনেই ছিল একটা দেবমন্দির চূড়ায় বসানো ছিল একজোড়া রুপোর ঘট।

একটা ঘটে সোনার পদ্ম রেখে দিলেন রাজা। আর তখন থেকেই মাথায় ঘুর ঘুর করতে লাগল অন্য একটা ইচ্ছে : আর একটা সোনার পদ্ম যদি পাওয়া যেত। জোড়া মন্দিরের জোড়া রজত কলস দু-দুটো কনক কমল নিয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করে যেত শুধু কাশীধামে নয়, দেশে দেশে।

অশোকদত্ত বুঝে গেছিল রাজার মনস্কামনা।

বলেছিল, আপনি হুকুম করলেই আর একটা সোনার পদ্ম এনে দেব।

রাজা বললেন, যথেষ্ট হয়েছে। আর ডানপিটেমি দেখাতে হবে না।

অশোকদত্ত আর তর্কাতর্কির মধ্যে গেল না। এক ঢিলে দু-পাখি মারার প্রতীক্ষায় রইল। এক যাত্রায় দুটো কাজ হাসিল করতে হবে। নতুন স্ত্রী সম্ভোগ আর সোনার কমল সংগ্রহ।

তাই চতুর্দশী তিথির রাত্রে কাউকে না বলে চলে গেল শ্মশানে। রাক্ষসী শাশুড়ি আগে থেকেই হাজির সেখানে অবশ্যই অনিন্দ্যসুন্দরী রূপে। দুজনে আকাশে উড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। বিদ্যুৎপ্রভা পরমানন্দে স্বামীসঙ্গ করে গেল বেশ কিছুদিন।

তারপর শাশুড়ির কাছে বায়না ধরল অশোকদত্ত, আর একটা সোনার পদ্ম চাই, অবিকল আগেরটার মতো।

শাউড়ি বললে, কী সর্বনাশ! এই পদ্ম যে কপালস্ফোট রাক্ষসের সরোবরে ফোটে। একটাই দিয়েছিল আমাকে, সেটাই দিয়েছি তোমাকে।

অশোকদত্ত বললে, কোথায় সেই সরোবর?

আঁৎকে উঠেছিল শাউড়ি, বুকের পাটা তো তোমার কম নয়। নিজে গিয়ে পদ্ম তুলবে? কয়েকশো রাক্ষসের পাহারা পেরিয়ে? অসম্ভব।

কিন্তু অবশেষে হার মানতে হল অশোকদত্তের নিজের কাছে। দূর থেকে জামাইকে দেখিয়ে দিল সোনার পদ্মভর্তি মনোরম সরোবর।

তৎক্ষণাৎ জলে নেমে গিয়ে যখন মনের আনন্দে স্বর্ণকমল চয়ন করছে অশোকদত্ত, কয়েকশো ভীষণাকার রাক্ষস প্রহরী রে-রে করে তেড়ে এসেছিল একসঙ্গে।

কিন্তু পারবে কেন মল্লবীর অশোকদত্তের সঙ্গে? একাই চমকপ্রদ কৌশলে যখন প্রায় সব রাক্ষসকে স্রেফ আছড়ে ফেলে তাদের নাভিশ্বাস উঠিয়ে দিয়েছে, তখন একজন প্রাণভয়ে দৌড়ে গিয়ে খবরটা দিয়েছিল রাক্ষস কপালস্ফোটকে।

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল কপালস্ফোট। সামান্য একটা মানুষের এতবড়ো স্পর্ধা! কমলবন লুঠ করেও ক্ষান্ত হয়নি, রাক্ষসবাহিনীকে ঠেঙাচ্ছে।

রণহুঙ্কার ছেড়ে তেড়ে এসেছিল ভয়ংকর কপালস্ফোট।

কিন্তু কাছে এসেই বোবা হয়ে গেছিল বিষম বিস্ময়ে! সরোবরে স্বর্ণকমল লুঠ করছে কে? এ যে তার বড়োভাই অশোকদত্ত।

এই দেখেই তো অস্ত্র খসে পড়েছিল কপালস্ফোটের হাত থেকে! তীরবেগে দৌড়ে গেছিল অশোকদত্তের সামনে। বলেছিল অবরুদ্ধ কণ্ঠে, দাদা! আমি বিজয়দত্ত, তোমার ছোটোভাই!

অশোকদত্ত স্তম্ভিত, সে কী! তুমি তো রাক্ষস কপালস্ফোট।

সে তো ভাগ্যদোষে। ছিলাম মানুষ, হয়ে গেলাম রাক্ষস। শ্মশান-মড়ার ঘিলু চোখেমুখে লাগার পর থেকেই। সেই থেকে আমার নাম হয়েছে কপালস্ফোট, কপাল ফাটিয়ে ছিলাম বলে। দাদা, তোমাকে দেখেই সব মনে পড়ে যাচ্ছে।

আমি আর রাক্ষস নই। মানুষ হয়ে গেছি।

ঠিক এই সময়ে আর একটা অতিপ্রাকৃত ঘটনা। সাঁ-সাঁ করে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতীর্ণ হল এক দিব্য পুরুষ—সেই মহাশ্মশানে, অশোকদত্ত আর বিজয়দত্তের সামনে।

বললে স্নিগ্ধ কণ্ঠে, আমার নাম কৌশিক। আমি বিদ্যাধরদের গুরু। তোমরা দুই ভাই আগের জন্মে ছিলে বিদ্যাধর। শাপগ্রস্ত হয়েছিলে, তাই মর্ত্যে এসে ব্রাহ্মণপুত্র হয়ে জন্মেছিলে। এখন তোমাদের শাপ কেটে গেছে। আবার তোমরা বিদ্যাধর হয়ে গেছ। নিজের নিজের বিদ্যা গ্রহণ করো। যার যেখানে বাড়ি, সেখানে চলে যাও।

বলেই, বিদ্যাধরদের গুরুমশায় সেই সব বিদ্যা অর্পণ করছিল অশোকদত্ত আর বিজয়দত্তকে, বিদ্যাধর থাকার সময়ে যে-যে বিদ্যায় বিদ্বান ছিল তারা।

সেই মহতী অনুষ্ঠান সাঙ্গ হতে না হতেই দিব্যদর্শন বিদ্যাধরে রূপান্তরিত হয়ে গেছিল দুজনেই।

কৌশিকও স্বকার্য সম্পাদন করে প্রস্থান করেছিল বিদ্যাধর লোকে।

সোনার পদ্ম তুলতে আর তো কোনও বাধা নেই। দুই ভাই এবার একসঙ্গে নেমে পড়ল সরোবরে, জল তোলপাড় করে চয়ন করল বিস্তর স্বর্ণপদ্ম। তার পরেই অন্তরীক্ষে উড়ে গিয়ে পৌঁছে গেল হিমালয় শিখরের কালঘন্টপুরে, রাক্ষস নগরীতে।

মজা এই যে, অশোকদত্ত শাপমুক্ত হয়ে বিদ্যাধর হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিণীতা স্ত্রী বিদ্যুৎপ্রভারও শাপমুক্তি ঘটেছিল, সেও বিদ্যাধরী হয়ে গেছিল। তিনজনে মিলে ব্যোমমার্গে বিচরণ করে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে গেছিল কাশীতে।

প্রথম দর্শন দিয়েছিল বাবা আর মা-কে। আনন্দে অধীর হয়েছিলেন সস্ত্রীক গোবিন্দস্বামী। ত্রিকালদর্শী সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎবাণী তাহলে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল!

খবরটা বায়ুবেগে চলে গেছিল রাজপ্রাসাদে। জামাই-বাবাজি ফিরে এসেছে শুনেই তিনি হন্তদন্ত হয়ে চলে এসেছিলেন গোবিন্দস্বামীর গৃহে।

দেখেছিলেন, গুণধর জামাতা এখন বিদ্যাধর হয়ে গেছে এবং.....

একটা নয়, অজস্র স্বর্ণকমল সংগ্রহ করে এনেছে।

উল্লখিত রাজা কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ গোবিন্দস্বামী সহ সব্বাইকে পরম সমাদরে নিয়ে গেছিলেন রাজভবনে। আনন্দের প্লাবনে ভেসে গেছিল রাজপুরী, মহা মহা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রতিদিন।

তারপর একদিন সবার সামনেই গোবিন্দস্বামী পুরো ব্যাপারটা জানতে চেয়েছিলেন বিজয়দত্তের কাছে। যে ছেলে রাক্ষস কপালস্ফোট নামে বিভীষিকার সঞ্চার করে গেছিল একদা।

বিজয়দত্ত তখন বলে গেল সেই অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর কাহিনি। চিতায় জ্বলন্ত খরার মাথায় খুলি ফাটাতেই ঘিলু ছিটকে এসে তার মুখময় লিপ্ত হওয়ার সঙ্গে দুর্গন্ধ আর উৎকট স্বাদ তাকে রাক্ষস করে তুলেছিল। অন্য রাক্ষসরা তাকে ডেকে নিয়ে চলে গেছিল রাক্ষসরাজার কাছে।

রাক্ষসরাজার সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হয়েছিল তৎক্ষণাৎ। নামকরণ হয়েছিল কপালস্ফোট, কপাল ফাটিয়ে যে রাক্ষস হয়েছে। তারপর একদিন গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হয়েছিল রাক্ষসরাজা। রাক্ষসপ্রজারা বীর কপালস্ফোটকেই রাজা বলে মেনে নিয়েছিল। এর কিছুদিন পরেই খবর এল কে একটা মানুষ নাকি গায়ের জোরে সোনার পদ্ম তুলছে, রাক্ষস প্রহরীদের ধরাশায়ী করেছে। শুনেই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে সরোবর তীরে লম্ফ দিয়ে দৌড়ে এসেই চমকে উঠেছিল অশোকদত্তকে দেখে।

নিমেষে মনে পড়ে গেছিল আগের সব কথা। সে তো রাক্ষস নয়, মানুষ; নাম তার বিজয়দত্ত, আর কমলবন তছনছ করছে যে বীরপুরুষ, সে তো তার দাদা, অশোকদত্ত।

ঘোর কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু মনুষ্যত্ব প্রাপ্তি নয়, শাপমুক্তিও ঘটেছিল আগের জন্মের বিদ্যাধরত্ব পেয়ে গেছিল যথাসময়ে।

কাহিনি সমাপ্ত করে বিজয়দত্ত জিজ্ঞেস করেছি বড়োভাই অশোকদত্তকে, কিন্তু আমরা আগের জন্মে বিদ্যাধর থেকে এ জন্মে মানুষ হলাম কেন? কোন অভিশাপে?

অশোকদত্ত তখন খুলে বলেছিল অভিশাপ কাহিনি। আগের জন্মের কাহিনি। গালব মুনির আশ্রমের কাছে গঙ্গায় স্নান করছিল কয়েকজন তাপস কন্যা। দিগবসনা যৌবনবতীদের দেখেই কামজর্জর হয়েছিল দুই ভাই। শাপ দিয়েছিলেন ঋষিরা। পরিশেষে এমন কথাও বলেছিলেন, দুই ভাইয়ে বিচ্ছেদ ঘটবে, ফের মিলিত হবে, তারপর আবার বিদ্যাধর হয়ে যাবে।

দুই ভাই বিদ্যাধরত্ব পেয়ে যেতেই নিকটজনেরাও বিদ্যাধর হয়ে গেল এর পরেই। অর্থাৎ, দুই ভাইয়ের বাবা আর মা, তাদের পত্নীগণ, প্রত্যেকেই দিব্যকান্তি বিদ্যাধরে রূপান্তরিত হয়ে গেল যেন জাদুমন্ত্রবলে, সবার চোখের সামনে।

অতঃপর মনুষ্যলোক ত্যাগ করে সব্বাই উপনীত হয়েছিল বিদ্যাধরলোকে। গোবিন্দকূট পর্বতে নিবাস রচিত হল গোটা পরিবারের। অশোকদত্তের নতুন নামকরণ হলো—অশোকবেগ; বিজয়দত্তের নতুন নাম বিজয়বেগ।

বিপুল হর্ষলাভ করলেন রাজা প্রতাপমুকুট। এ যে মেঘ না চাইতেই জল। চেয়েছিলেন সুলক্ষণযুক্ত জামাই। পেয়ে গেলেন বিদ্যাধর জামাই, বধূরূপে বিদ্যাধরী হয়ে গেল কন্যাও।

সুতরাং পরমানন্দে তিনি সোনার পদ্ম দিয়ে শিবমন্দির সাজিয়ে তাঁর নিত্য আরাধনায় নিমগ্ন রইলেন।

কাহিনি সমাপ্ত করে বললেন ব্রাহ্মণ বিষ্ণুদত্ত। শক্তিদেব, মনে হচ্ছে তুমিও শাপগ্রস্ত দেবলোক অধিবাসী। রাজকন্যা কনকরেখাও তাই। নইলে কনকপুরীর জন্যে সে জেদ ধরবে কেন? তুমিও বা তাকে বিয়ে করার জন্যে মহা-মহা বিপদে অটল থেকেও কনকপুরী খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন? সবই যখন দৈবলীলা, তখন চিন্তা পরিত্যাগ করে ঘুমিয়ে পড়ো। ইচ্ছা পূরণ হবেই।

ঘুমোতে অবশ্য পারেনি শক্তিদেব। ঘুরেফিরে তার মনের মধ্যে যাতায়াত করেছে শুধু দুটো নাম :

কনকরেখা আর কনকপুরী।

২৬. কনকপুরী দেখল শক্তিদেব

পরের দিন সকালে...

ঘুম ভাঙবার পর বিছানায় বসে রয়েছে শক্তিদেব, এমন সময়ে ধীবরপতি সত্যব্রত এল তার কাছে।

বললে, আপনার ইচ্ছাপূরণের পন্থা বের করেছি।

লাফিয়ে উঠেছিল শক্তিদেব। ভাবল বুঝি, গতকাল বিষ্ণুদত্ত যে রকম খাসা একটা কাহিনি শুনিয়ে গেলেন, সেইরকম আর একটা কাহিনি উপস্থিত হয়েছে।

কিন্তু এবার হিতকথার গল্প নয়, খবর এনেছে জেলেদের রাজা।

বললে, এই যে সমুদ্র দেখছেন, এর মাঝে একটা দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপের নাম রত্নকুট।

শক্তিদেব নড়েচড়ে বসে বললে, বেশ?

সত্যব্রত বললে, ওখানকার নারায়ণ মন্দিরে নানা দেশ থেকে অনেক লোক আসে, আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষে, দ্বাদশীর দিন। তাদের কেউ নিশ্চয় কনকপুরীর খবর দিতে পারবে।

সোৎসাকে বলেছিল শক্তিদেব, চলুন রত্নকুটে।

সেইদিনই জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল সত্যব্রত আর শক্তিদেব। তখন ঘোর বর্ষা চলছে। সমুদ্র উত্তাল হয়ে রয়েছে। বহুদূরে দেখা গেল পাহাড়ের মতো কী যেন একটা উঁচু হয়ে রয়েছে।

জেলেদের রাজা বুঝিয়ে দিয়েছিল জিনিসটা কী?

পাহাড় নয়, একটা প্রকাণ্ড বটগাছ। ওর নীচের দিকে রয়েছে মহাঘূর্ণিপাক। তার নাম বড়োবামুখ।
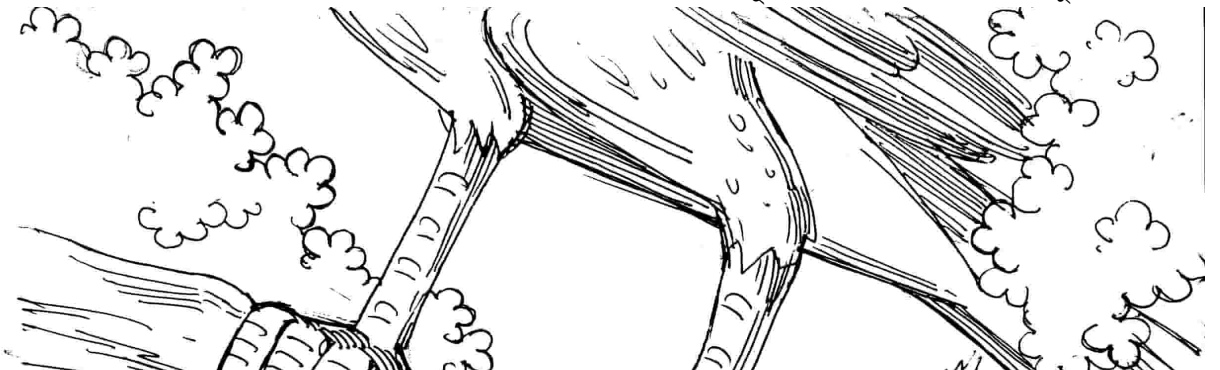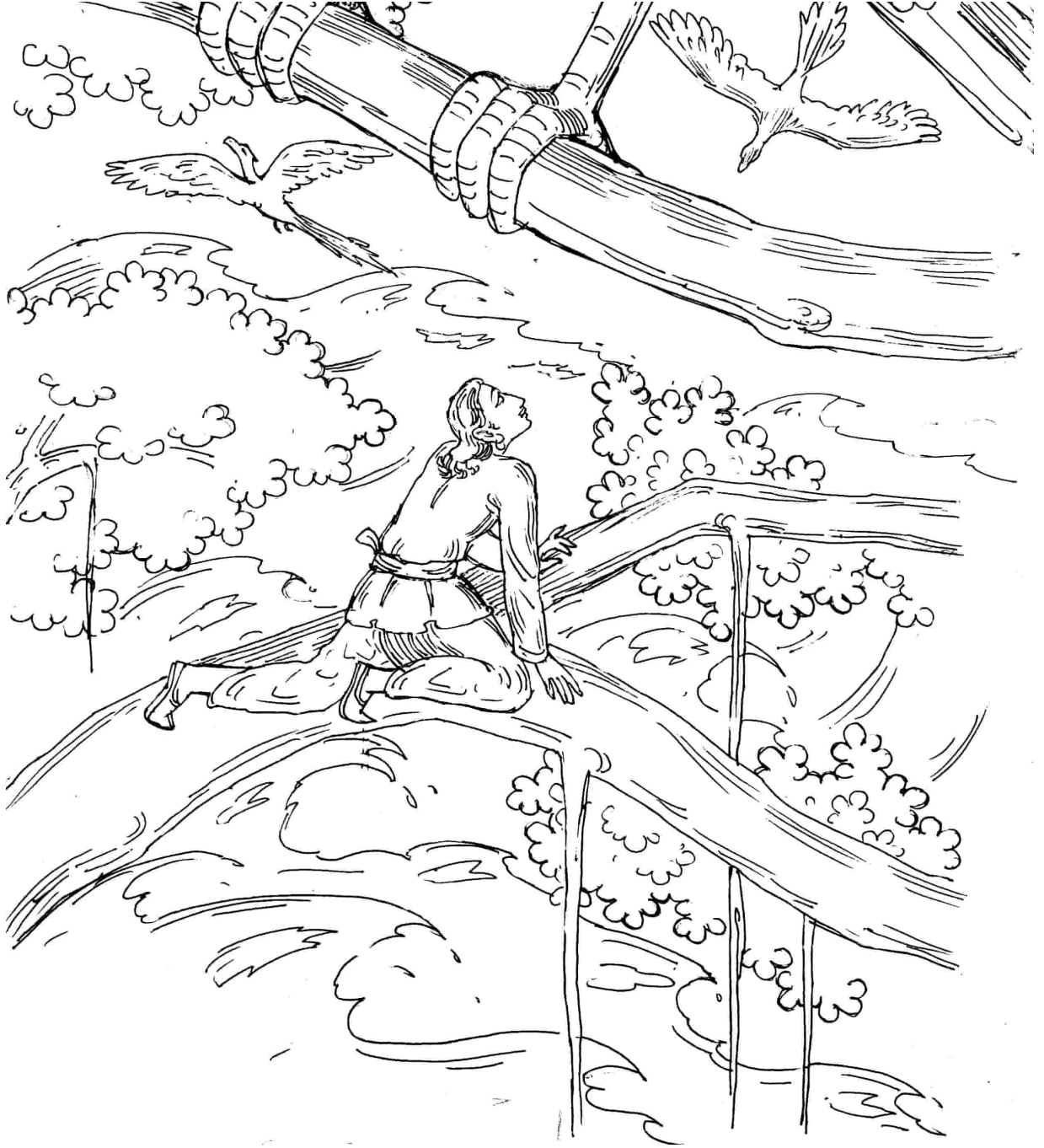
কিন্তু আকারে কেউ ছোটো নয়, অতি বিশাল। দানব-পক্ষী।

ভয়ংকর ওই জায়গারই পাশ দিয়ে যেতে হবে জাহাজকে।

পাশ কাটিয়ে যওয়ার উপায় তো নেই। প্রবল বায়ুস্রোত চুম্বকের মতো গোটা জাহাজটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভৈরবরূপী এই ঘূর্ণিপাকের দিকে। সামাল সামাল রব উঠল জাহাজে।

জাহাজ যখন স্রোতের টানে প্রায় উড়ে যাচ্ছে জলের ওপর দিয়ে, মাথার ওপর একটা বটের ঝুড়ি দেখে থপ করে চেপে ধরে ঝুলে পড়েছিল শক্তিদেব।

যথাসময়ে নিজের প্রাণটা বাঁচিয়ে ছিল। কেননা, পরক্ষণেই গোটা জাহাজটাকে গিলে নিয়েছিল বিভীষণ ঘূর্ণিপাক।

শক্তিদেব তখন একা, সঙ্গী সাথী কেউ নেই।
ঝুড়ি বেয়ে উঠে গেছিল একটা শক্ত ডালে। মাথা ঘুরে গেছিল নীচের উত্তাল জলরাশি দেখে। কী ভীষণ!
কল্পনাতেও আনা যায় না। এমন ভয়ংকর জায়গা এই, পৃথিবীতে আছে তাও অকূল দরিয়ায়!
ডালপালার আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে শক্তিদেব সারাদিন। পরিত্রাণ নেই...মৃত্যু সুনিশ্চিত।
কিন্তু রাখে হরি মারে কে!
অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে গেল সন্ধ্যে নাগাদ।
সন্ধ্যে নামলেই তো বাসায় ফেরে পাখিরা।
বিক্ষুব্ধ এই জলরাশির মধ্যেকার বিশাল এই বটবৃক্ষেও ফিরে এল কাতারে কাতারে পাখি।
কিন্তু আকারে কেউ ছোটো নয়, অতি বিশাল। দানব-পক্ষী।
তার চাইতেও আশ্চর্য ব্যাপার, তারা কথা কইছে মানুষের ভাষায়!
হঠাৎ বলে উঠল একটা মহাকায় বিহঙ্গ, কাল যাবো কনকপুরীতে!
চমকে উঠেছিল শক্তিদেব। কনকপুরী! এত কষ্ট যেখানে যাওয়ার জন্যে, সেই কনকপুরীতে আগামীকাল উড়ে যাবে এই বিহঙ্গ!
অতএব চুপিসারে আশ্রয় নেওয়া যাক এর পালকের মধ্যে। রইলও তাই। টেরও পেল না দানব-পাখি।
পরের দিন সূর্য উঠতেই আকাশে ডানা মেলে দিয়ে সাঁ-সাঁ করে উড়ে গিয়ে কনকপুরীর তোরণের সামনে নেমে পড়েছিল মস্ত বিহঙ্গ।
সুরুৎ করে পালকের মধ্যে থেকে পিচলে মাটিতে নেমে এসেছিল শক্তিদেব। ঘাপটি মেরে রইল একটা গর্তে, পাখি উড়ে না যাওয়া পর্যন্ত।
তারপর পা-টিপে টিপে ঢুকে গেল নগরের মধ্যে। সার্থক নাম বটে কনকপুরীর। সত্যিই সোনা দিয়ে গড়া শহর। আশ্চর্য সুন্দর নিকেতনের পর নিকেতন। কিন্তু রাস্তায় লোকজন তেমন নেই।
হঠাৎ দেখলে সুতনু দুই নারীকে। হন হন করে চলেছে ফুল তুলতে। যেন আর তর সইছে না।
এই তো সুযোগ। শক্তিদেব তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভীষণ অবাক হয়ে থমকে গেছিল দুই রমণী।
বিনয়বচনে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করেছিল শক্তিদেব ভুবনমোহিনী! কে আপনারা? এই জায়গাটার নাম কী?
সত্যি কনকপুরীতে পৌঁছেছে কিনা জানবার জন্যেই প্রশ্নটা নিক্ষেপ করেছিল শক্তিদেব। সে জানে রমণীমন জয় করার মন্ত্রগুপ্তি। সুন্দরীকে সুন্দরী বললে আর রক্ষে নেই, রমণীচিত্ত দুলে উঠবেই।
হলও তাই। থমকে দাঁড়িয়ে গেল দুই অপরূপা। শক্তিদেবের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিয়ে মুচকি হেসে বললে একজন, আমাদের কাজ ফুলবাগানের পরিচর্যা করা। যাচ্ছি ফুল তুলতে। আর এই নগরের নাম কনকপুরী।
এত সুন্দর!
কারণ, এ যে বিদ্যাধরদের নগর। সেরা সুন্দরী তো এই কনকপুরীতেই থাকেন।
তাঁর নাম?
চন্দ্রপ্রভা।
ফুল তুলতে যাচ্ছেন তাঁর জন্যে?
তাতো বটেই।
আমার একটা উপকার করবেন?
অপাঙ্গ চেয়ে বললে একজন কাননপলিকা।
সেটা কী?
তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দেবেন?
কেন?

সেরা সুন্দরীকে কে না দেখতে চায়?

তা তো বটেই! তা তো বটেই! আমরাও সুন্দরী বটে, কিন্তু তাঁর নখের যুগ্যি নই। আসুন, আসুন, দেখিয়ে দিচ্ছি তিনি কোথায় থাকেন।

দুই কামিনীর পেছন পেছন গেছিল শক্তিদেব।

আশ্চর্য সুন্দর একটা মণিময় নিকেতনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। হিরে মাণিক সোনা রূপো দিয়ে তৈরি এমন বিচিত্র স্থাপত্যের অট্টালিকা শক্তিদেব জীবনে দেখেনি। দেখলে দু-চোখ কপালে উঠে যায়।

হাঁ হয়ে গেছিল শক্তিদেব। তাকে ওই অবস্থায় রেখে হনহনিয়ে চলে গেছিল দুই কানন-কামিনী পুষ্প চয়নের ব্যগ্রতায়।

স্তম্ভিত নয়নে এক অপরিচিত যুবাপুরুষ নিকেতনের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে জনা কয়েক কাজের মেয়ে তৎক্ষণাৎ খবরটা দিয়েছিল বিদ্যাধর চন্দ্রপ্রভাকে। শুনে তো অবাক হয়েছিল চন্দ্রপ্রভা। বিদ্যাধর-নগরে একজন মানুষ ঢুকেছে! দাঁড়িয়ে আছে তারই প্রাসাদের সামনে।

দ্বারপালকে হুকুম দিয়েছিল তৎক্ষণাৎ, যাও তো, নিয়ে এস মানুষটাকে আমার সামনে।

শক্তিদেবকে আনা হল বিদ্যাধরীর সামনে। দেখেশুনে বিলকুল বাকরহিত হয়ে গেল শক্তিদেব। এ রকম সাজানো গোছানো মহল সে কক্ষনো দেখেনি। স্বয়ং বিশ্বকর্মা যেন আশ মিটিয়ে ঘরসজ্জা করেছেনা। বিচিত্র আসবাবপত্র, বিচিত্রতর স্থাপত্য কৌশল। কুবেরের সম্পদ যেন উপুড় করা রয়েছে ঘরের সর্বত্র।

এত জলুসকেও ম্লান করে দিয়েছে ঘরের ঠিক মধ্যিখানের মাণিক্যমণ্ডিত সোনার পালঙ্কে উপবিষ্টা এক সুন্দরী। রূপের প্রভা বুঝি তার অঙ্গ ঘিরে চন্দ্রপ্রভার মতো বিকীর্ণ হচ্ছে। বিশাল ঘর ঝলমল করছে শুধু ওই একজনের বরতনু কিরণে। চোখে যেন ধাঁধা লেগে গেছিল শক্তিদেবের। তবুও বিস্ফারিত চোখে শুধু চেয়েছিল বর্ণনারও অতীত সেই রূপের খনির দিকে।

চন্দ্রপ্রভা কিন্তু বিমূঢ় শক্তিদেবকে দেখে বসে থাকেনি সোনার পালঙ্কে। লীলায়িত ভঙ্গিমায় অঙ্গশুষমা সহস্রগুণে বিচ্ছুরিত করে নেমে এসেছিল মেঝেতে। মরাল ছন্দে শক্তিদেবের সামনে এসে অতিশয় সম্ভ্রমের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিল, কে আপনি? এই কনকপুরী মনুষ্যের অগম্য। আপনি এলেন কোন জাদুমন্ত্রবলে?

মোলায়েম কণ্ঠের জিজ্ঞাসা শুনে শক্তিদেবের বিকল বাকযন্ত্র সচল হয়েছিল তৎক্ষণাৎ। সংক্ষেপে গুছিয়ে বলেছিল, এক অপরূপা কামিনীর পানিগ্রহণের অভিলাষে যে কত কষ্ট করেছে, কত দুসাহসিক পথ পরিক্রমা করেছে, কত অসম্ভব অভিযানের অন্তে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

সব শোনবার পর বেশ কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করেছিল চন্দ্রপ্রভা।

তারপর জিজ্ঞেস করেছিল, ভাগ্যবতী সেই কন্যার নাম কী?

কনকরেখা।

শুনেই মাথা হেঁট করে দীর্ঘস্বাশ মোচন করেছিল অপরূপা কিরণময়ী। তারপর শক্তিদেবকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করেছিল একটা নির্জন ঘরে।

বলেছিল, মহাশয়, আপনি প্রাণ খুলে সব কথা যখন বলেছেন, আমারও কর্তব্য আমার মনের রুদ্ধ কপাট আপনার সামনে উন্মোচন করা।

এই কনকপুরী নগরীতে যিনি বিদ্যাধর নৃপতি, তাঁর নাম শশিখণ্ড।

তাঁর চার মেয়ে। আমি বড়ো মেয়ে। আমার নাম চন্দ্রপ্রভা। চন্দ্ররেখা, শশিরেখা আর শশিপ্রভা আমার পরের তিন সহোদরার নাম।

একদিন ওরা তিনজনে মন্দাকিনীতে স্নান করতে গেছিল, আমাকে বলে যায়নি। তীরে বসে তপস্যা করছিলেন এক মহামুনি। চপলা ভগ্নীরা কৌতুক করার জন্যে জল ছিটিয়ে দিয়েছিল ধ্যানমগ্ন ঋষির গায়ে। যৌবন রঙ্গের পরিণাম কী হতে পারে, তা কল্পনাও করতে পারেনি।

চোখ খুলে তিন নগ্না যৌবনমদে মত্তাকে দেখে ক্রোধে ফেটে পড়েছিলেন সেই কঠোরতপা মুনি।

তিনি কামরিপু জয়ী। কিন্তু আচ্ছন্ন হয়ে গেছিলেন দ্বিতীয় রিপু ক্রোধের প্রবল আক্রমণে।

অভিশাপ দিয়েছিলেন আমার তিন বোনকে জন্ম নাও মর্ত্যে।

শুনেই মন্দাকিনী তীরে দৌড়ে গেছিলেন আমার পিতৃদেব। চপলা কন্যাদের হয়ে ক্ষমাভিক্ষা চেয়েছিলেন।

বহুতর প্রচেষ্টায় অগ্নিশর্মা ঋষি ক্রোধ প্রশমিত করেছিলেন।

কিন্তু মুখ দিয়ে যে কথা বেরিয়ে গেছে, তার শক্তি তো যাবার নয়। বাকশক্তি বড়ো ভয়ানক কম্পন সৃষ্টি করে যায় এই ব্রহ্মাণ্ডে। সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ যা বলেন, তা ফলে।

সুতরাং তিন প্রগলভা বোনকে মর্ত্যে জন্ম নিতেই হবে। তার অন্যথা হবে না। কিন্তু ক্রোধ প্রশমনের পর ঋষি একটা বর দিলেন তিন বোনকে। তারা জাতিস্মর হবে। পূর্বজন্মের সব কথা মনে থাকবে। কিন্তু বিস্মৃত হবে না।

অতঃপর তাদের দেহত্যাগ ঘটলো, জন্ম নিল মর্ত্যকন্যা রূপে।

দুঃখে ভেঙে পড়লেন আমার পিতৃদেব। তিনি গৃহত্যাগ করে বনবাসী হলেন। এই কনকপুরী দিয়ে গেলেন আমাকে।

একদিন রাত্রে ঘুমের মধ্যে দেখলাম এক আশ্চর্য স্বপ্ন। দেবী দুর্গা দর্শন দিলেন। বললেন, একজন মানুষ হবে তোমার স্বামী।

ঘুম ভেঙে গেল তৎক্ষণাৎ। বাকি রাতটা ঘুমোতেই পারলাম না। আমি বিদ্যাধরী শ্রেষ্ঠা, কিন্তু আমার বিয়ে হবে একজন মানুষের সঙ্গে! ভারি আশ্চর্য তো!

কিন্তু দুর্গাবাক্য তো মিথ্যা হবার নয়। পরের দিন থেকে অনেকেই এল আমাকে বিয়ে করতে। কিন্তু তারা সব্বাই বিদ্যাধর। আমারও পছন্দ হল না কাউকে।

তারপরেই আজ ঘটল এই অতীব বিচিত্র ঘটনা। দানব-পক্ষী আপনাকে নামিয়ে দিয়ে গেল কনকপুরীতে যা মানবের কাছে অগম্য। আপনি এসে দাঁড়িয়ে রইলেন প্রাসাদের সামনে। খবর পেয়ে কৌতূহলে ফেটে পড়ে ডেকে পাঠালাম আপনাকে।

এবং, আপনাকে দেখেই হর্ষ-পুলক-রতিবাসনা আমাকে উদ্বেল করে তুলেছে। মনে মনে তৎক্ষণাৎ আপনাকে স্বামীত্বে বরণ করেছি। এখন হোক আমাদের বিয়ে। কিন্তু বাবার অনুমতি নিয়ে।

তিনি এখন অরণ্যবাসী। চতুর্দশীর দিন শিবের অর্চনা করতে বিদ্যাধররা জড় হবে ঋষভ পাহাড়ে। বাবাও আসবেন সেখানে।

আমি যাব সেখানে। তাঁর অনুমতি নেব। ফিরে এসে আপনাকে বিয়ে করবো। এই কটা দিন অনুগ্রহ করে একা থাকুন প্রাসাদে। আপনার যথা পরিচর্যার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

সুতরাং ভাবী শ্বশুর গৃহে পরমানন্দে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিল শক্তিদেব।

চতুর্দশী তিথি আসতেই চন্দ্রপ্রভা প্রাসাদের সব্বাইকে নিয়ে চলে গেল শিবের মন্দিরে। যাবার সময় বলে গেল শক্তিদেব, প্রাসাদে এখন আপনি একা। সর্বত্র অবাধ গতি রইল আপনার, শুধু একটা জায়গা ছাড়া। পুরীর ওপরতলায় কখনও যাবেন না।

নিষেধ করলে কৌতূহল চাগাড় দেয়। শক্তিদেবের অবস্থা হয়েছিল তাই। জনহীন প্রাসাদে একা-একা ঘুরতে ঘুরতে ইচ্ছে হয়েছিল ওপরতলায় ওঠার। উঠে গিয়ে দেখেছিল তিনটে গুপ্তকক্ষ। প্রথম ঘরে ঢুকেই দেখেছিল, সোনার পালঙ্কে গা এলিয়ে শুয়ে কনকরেখা।

কিন্তু তার দেহে প্রাণ নেই!

এ কী করে সম্ভব? কনকরেখা তো রয়েছে বর্ধমানে। তাকে বিয়ে করার লালসায় এত কষ্ট স্বীকার করেছে শক্তিদেব।

সেই কনকরেখা এখন মারা গেছে! কিন্তু প্রাণহীন দেহ এখানে কেন?

বিস্ময়াবিষ্ট শক্তিদেব কৌতূহলের তাড়নায় প্রবেশ করেছিল অন্য দুটি গুপ্তকক্ষের।

দুটি ঘরেই দেখেছিল সোনার পালঙ্কে দুই অপরূপা কন্যার মৃতদেহ।

মাথা ঘুরে গেছিল এই দেখে। নির্জন পুরীতে এ কী প্রহেলিকা! জাদুর খেলা, না, ভৌতিক কাণ্ড!

মাথা ঠাণ্ডা করার জন্যে নেমে গেছিল নীচের তলায় সরোবরের ধারে। ভারি সুন্দর একটা ঘোড়া সেখানে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করছে দেখে ইচ্ছে হয়েছিল একটু অশ্বারোহণ করে মাথা ঠাণ্ডা করা যাক।

বিপত্তিটা ঘটল তখনই। ঘোড়ার এক লাথিতেই ছিটকে গিয়ে পড়ল সরোবরের জলে।

ডুবে গিয়েই সাঁতার কেটে জলপৃষ্ঠে উঠে কি দেখল?

সে এসে গেছে বর্ধমান শহরের বাগানের সরোবরে!

ভাগ্যের চাকা কি ইন্দ্রজালের মায়া বিস্তার করে চলেছে শক্তিবের অদৃষ্টের আকাশে?

মাথা ঘুরছিল বলে শক্তিদেব সেখান থেকে সটান গেল বাবার বাড়ি। একরাত টেনে ঘুমিয়ে পরের দিন সকালেই ফের গেল রাজবাড়ি।

রাজসভায় ঢুকে রাজাকে বললে, এবার আর মিথ্যে বলতে আসিনি। কনকপুরী কোথায় দেখে এলাম।

কনকরেখা রাজার সামনে আসতেই কিছুক্ষণ থ হয়ে চেয়ে রইল শক্তিদেব।

বললে তারপরে, কনকপুরীতে মড়া হয়ে সোনার পালঙ্কে শুয়েছিলেন কীভাবে?

জাতিস্মর কনকরেখার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেছিল পূর্বজন্মের সব কথা।

সে তো বিদ্যাধরী। অভিসম্পাতের ফলে সেই দেহ কনকপুরীতে রেখে এসে জন্মেছে মানবীগর্ভে।

খুলে বলল রাজাকে পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত। মুনির সঙ্গে ফচকেমি করতে গিয়ে আজ তার এই অবস্থা। তারা মোট চার বোন। চার বোনই বিয়ে করবে এক স্বামীকে, এই শক্তিদেবকে।

বলেই, আছড়ে পড়ল মাটিতে। প্রাণ বিয়োগ ঘটল তৎক্ষণাৎ।

বিষম শোকে অজ্ঞান হয়ে গেলেন রাজা।

শক্তিদেব বেরিয়ে এল বাইরে। তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস, কনকরেখা তার বউ হবেই, মরবার আগে তো সেই কথাই বলে গেছে।

সুতরাং ফের রওনা হওয়া যাক কনকপুরী অভিমুখে।

বিটঙ্কপুর পৌঁছোল পূর্বপথ পরিক্রমার পর। বন্ধুবর বণিকপুত্র সমুদ্রদত্তের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল, যে কিনা জাহাজডুবি হয়ে মারা গেছিল বলেই ধারণা ছিল শক্তিদেবের। নিজে তো বেঁচেছিল মাছের পেটে গিয়ে।

এখন শুনল, সমুদ্রদত্ত বেঁচে গেছে একটা মস্ত কাঠ ধরে জলে ভেসে গেছিল বলে। ভাগ্যক্রমে বাবার জাহাজ যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। ছেলেকে তুলে নেয় জাহাজে।

বণিক ভবনে তিন দিন জিরিয়ে নেওয়ার পর আবার উৎস্থল দ্বীপে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল শক্তিদেব। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করেছিল সমুদ্র দত্ত। তার জনাকয়েক বন্ধু যাচ্ছে ওই দ্বীপে, শক্তিদেব যাক তাদের সঙ্গে।

কিন্তু জাহাজঘাটে আসতেই জেলেদের রাজা সত্যব্রতের ছেলেরা চেপে ধরেছিল তাকে, কোথায় আমাদের বাবা?

ঘূর্ণিপাকে তলিয়ে যাওয়ার কাহিনি কেউ বিশ্বাসই করল না। একই জাহাজে যাত্রা, অথচ শক্তিদেব বেঁচে গেল, আর সত্যব্রত ডুবে গেল, তা কি হয়? নিশ্চয় সত্যব্রতকে খতম করে জাহাজ লুঠ করেছে এই শক্তিদেব। সুতরাং একে বলি দেওয়া হোক দুর্গা মন্দিরে, পরের দিন সকালেই!

হাত-পা বেঁধে শক্তিদেবকে তৎক্ষণাৎ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দুর্গা মন্দিরে। ভোর না হওয়া পর্যন্ত পড়ে থাক দেবীর পায়ের তলায়।

ঘুমিয়ে পড়েছিল শক্তিদেব ধকল সইতে না পেরে।

ঘুমের মধ্যে দেখেছিল এক স্বপ্ন।

নিঃসীম লাবণ্যে গড়া এক অপরূপা দাঁড়িয়ে তার সামনে। অভয় ক্ষরিত কণ্ঠে বলছেন, শিক্তদেব, ভয় নেই। কাল সকালে জেলেদের একটি মেয়ে আসবে এই মন্দিরে। রূপসী মেয়ে। বিন্দুমতী তার নাম। জেলেদের রাজার যে ছেলেরা তোমাকে এখানে এনেছে, তাদের বোন। তোমাকে দেখামাত্র তোমার সঙ্গে সহবাস ইচ্ছার সঞ্চার ঘটবে তার অণুপরমাণুতে। তোমার স্ত্রী হতে চাইবে। কাম নিবারণ করার প্রার্থনা জানাবে। তুমি তাকে বিমুখ করবে না। জেলের মেয়ে বলে তাকে তাচ্ছিল্য করবে না। তাকে দিয়ে হাত-পায়ের বাঁধন খুলিয়ে নেবে। নীচ ধীবর কুলে তার জন্ম নিছক কপাল দোষে, অভিশাপের ফলে। রমণে তাকে তৃপ্তি দিও, তোমার ইচ্ছে পূরণ হবে।

ভোরের আলো ফুটতেই মন্দিরে এল সেই ধীবর কন্যা। নিকষকৃষ্ণ কন্যা। কিন্তু রূপ তার চোখে মুখে বুকে নিতম্বে। যৌনতা দিয়ে গড়া অপরূপা। শক্তিদেবকে দেখে আতীব্র কামপিপাসায় যেন সহস্রগুণে বৃদ্ধি পেল তার যৌন আবেদন। বিনা ভূমিকায় বিবাহ মারফৎ রমণ প্রার্থনা করল শক্তিদেবের কাছে।

প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিল শক্তিদেব। যৌনাবেগে সে নিজেও তখন অধীর। বলেছিল, বাঁধন খুলে দিতে। তৎক্ষণাৎ বিবাহ হয়েছিল দেবী দুর্গার সামনে। দুজরেই প্রতি অঙ্গ কেঁদে উঠেছিল প্রতি অঙ্গের সঙ্গকামনায়। সাঙ্গ হয়েছিল উপর্যুপরি সুরতক্রিয়া।

হৈ হৈ করে কন্যার ভ্রাতারা এসে দেখেছিল, বন্দি শক্তিদেব এখন তাদের ভগ্নীপতি!

বোনকে তো আর বিধবা করা যায় না। কাজেই সেই মন্দিরেই কয়েক দিবস মধুচন্দ্রিমা যাপন করে গেল শক্তিদেব সেই কামকন্যার সঙ্গে। সবলতর হল শরীর আর মন। শ্যালকরাও বিলক্ষণ তোয়াজ করে গেল ভগ্নিপতিকে।

এরপর একদিন একটা ঘটনা ঘটল। কালো বিদ্যুতের মতো বউকে নিয়ে বসে রসালাপ করছে শক্তিদেব, এমন সময়ে দেখল গোরুর মাংস নিয়ে যাচ্ছে একজন ব্যাধ।

মন খারাপ হয়ে গেছিল শক্তিদেবের। গাভীহত্যা মহাপাপ। অথচ মহাপাপী ব্যাধ বিলকুল নির্বিকার।

মনের ভাবটা বউয়ের কাছে ব্যক্ত করেছিল শক্তিদেব।

বিন্দুমতী হেসে বলেছিল, কিন্তু ওই পাপ তো আমি নিজেই করেছি নীচ ধীবরকুলে জন্ম নিয়েছি।

তুমি?

হ্যাঁগো। আগের জন্মে তো আমি বিদ্যাধরী ছিলাম। আমার স্বামীও ছিল বিদ্যাধর। একদিন বীণা বাজাতে বসে আমাকে বলেছিল বীণার তার লাগিয়ে দিতে। বীণার তার যে গোরুর শরীরের অংশ দিয়ে তৈরি হয়, তা তো আমি জানতাম না। আমি দাঁত দিয়ে তার কেটেছিলাম। ভীষণ রেগে গিয়ে স্বামী অভিসম্পাত দিয়েছিল, নীচকুলে জন্ম হোক।

শক্তিদেবের মুখে আর কথা নেই। না জেনে অপরাধ করার জন্য এত বড়ো শাস্তি?

বিন্দুমতী বললে, আর একটা কথা বলব?

কী?

কাউকে বলবেন না, কথা দিন।

বেশ, বলবো না।

কিন্তু যা বলবো, তা করতে হবে।

তাই করবো।

এই দ্বীপেই আর এক বউ পাবেন। রূপবতী। মনে হবে যেন সজীব হিরেমাণিক দিয়ে গড়া। সহবাস যে কত আনন্দদায়ক, সে আপনাকে তা বুঝিয়ে দেবে। আপনার শুক্রপাতে তার গর্ভাধান হবে। তারপরেই আপনাকে একটা নির্মম কাজ করতে হবে। আটমাসের গর্ভবতীর গর্ভপাত করাতে হবে।

সে কী! শিউরে উঠে বলেছিল শক্তিদেব।

বিন্দুমতী কিন্তু নির্বিকার, মনের মধ্যে কোনও রকম ঘৃণার ভাব আনবেন না। গভীর গোপন একটা কারণ আছে। যথাসময়ে বলব আপনাকে।

বিন্দুমতী যে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা তার প্রমাণ পাওয়া গেল দিন কয়েক পরে। কয়েকজন জেলের ছেলে হুল্লোড় করে এল শক্তিদেবের কাছে। হোক সে ব্রাহ্মণ তনয়, কিন্তু এখন তো জেলেদের জামাইবাবু।

কাজেই আবদার ধরেছিল তার কাছে, একটা বুনো শূকর ঢুকেছে গ্রামে। গোরু-ভেড়া-মোষদের গুঁতিয়ে মারছে। ওই.... ওই .... এই দিকেই তেড়ে আসছে। উঠে পড়ুন......উঠে পড়ুন .....ঘোড়ায় চেপে মারুন শূকর।

শক্তিদেব বীরপুরুষ নিঃসন্দেহে। উপরন্তু তরতাজা বউয়ের সান্নিধ্যে থেকে আর ভালোমন্দ খেয়ে বলবীর্য তার বৃদ্ধি পেয়েছিল। একটা শূকর মারা তার কাছে কিছু নয়।

তাই বীরদর্পে তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ করে, তেড়ে গেছিল খুনে শূকরের পেছন পেছন, বর্শা দিয়ে তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আধমরা করে এনেছিল। প্রাণভয়ে রক্তাক্ত দেহে শূকর ঢুকে গেছিল একটা গহ্বরের মধ্যে।

বেশ বড়ো গুহা। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে শক্তিদেব তীরবেগে ঢুকে গেছিল ভেতরে শূকর মহাশয়কে চন্দ্রবিন্দু করে দেওয়ার জন্যে।

কিন্তু কোথায় সেই ভয়ংকর খুনে শূকর? এ-গুহা সে-গুহা পেরিয়ে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছিল শক্তিদেব।

গুহার শেষে একী দেখছে সে? ভেলকি নাকি?

আশ্চর্য সুন্দর একটা বাগান বাড়ি রয়েছে চোখের সামনে।

হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল শক্তিদেব। অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য। জাদুবিদ্যা নয় বাস্তব। মনোমুগ্ধকর অদ্ভুত এই কানন আর প্রাসাদ যে পর্বতগুহার মধ্যে সম্ভবপর কেউ বললে তা বিশ্বাস করত না।

কিন্তু নিজের চোখে দেখার পর অবিশ্বাস করে কী করে?

কিছুক্ষণ পর দুর্নিবার কৌতূহল চালিত করেছিল তার পদযুগল। পায়ে পায়ে ঢুকেছিল বাগানের মধ্যে, সেখান থেকে অট্টালিকার অভ্যন্তরে।

এবং স্তম্ভিত হয়ে গেছিল এমন এক ত্রিভূবন সুন্দরীকে দেখে যার সঙ্গে তুলনা করা চলে না কোনও রূপসীর, স্বর্গের নগরবধূরাও বুঝি নিষ্প্রভ তার রূপের জ্যোতির সামনে।

অরণ্যদেবী নিশ্চয়। লাবণ্য সারা অঙ্গে। অথচ যেন শরীরী তড়িৎ।

মুগ্ধ নয়নে কিছুক্ষণ সেই বনবিবির দিকে চেয়ে থাকার পর আবিষ্ট স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল শক্তিদেব, কে তুমি?

বীণাঝংকৃত স্বরে জবাব দিয়েছিল কন্যা।

আমার নাম বিন্দুরেখা। আমার বাবার নাম চণ্ডবিক্রম। রাজা চণ্ডবিক্রম। তাঁর রাজ্য এই অরণ্যের দক্ষিণ দিকে।

এখানে এলে কী করে?

এক দৈত্যের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে।

কোথায় সে?

শূকরের দেহ ধারণ করে জঙ্গলে গেছিল মাংস খেতে। ফিরেছিল জখম হয়ে। মারা গেছে একটু আগে।

রাজকন্যা, জখম করেছিলাম আমি।

কে আপনি?

শক্তিদেব। ব্রাহ্মণ সন্তান।

দুই চোখে কামবাণ হেনে তৎক্ষণাৎ খুশিতে ফেটে পড়েছিল রাজকন্যা, আমাকে বিয়ে করবেন?

শক্তিদেব টলে গেছিল নয়ন-শরের নিপুণ আঘাতে। এই নির্জন বাগানবাড়িতে দৈত্য সহোদয় নিত্য ভোগ করেছে এই অলোক সামান্যা রাজকন্যাকে, তা জেনেও তাকে অঙ্কশায়িনী করার বাসনা তীব্র হয়ে উঠেছিল মনের মাঝারে। পুরুষের মন এমনই হয়, ধর্ষিতা গমনের ইচ্ছা মনের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে।

তা সত্ত্বেও বলেছিল মৃদুস্বরে, আমার স্ত্রীর অনুমতি যে প্রয়োজন।

আমাকে নিয়ে চলুন তার কাছে।

বিন্দুমতী খুশি হয়েছিল বিন্দুরেখাকে দেখে। বিয়ে হয়ে গেছিল সেই দিনই।

পরমানন্দে কেটে গেল বেশ কয়েকটা মাস। ধীবরকন্যা আর, রাজকন্যা দুজনেই দুভাবে আনন্দ দিয়ে গেল শক্তিদেবকে।

চিত্তবিক্ষেপ দেখা দিল বিন্দুরেখা গর্ভবতী হওয়ার পর। বিন্দুমতী স্মরণ করিয়ে দিল শক্তিদেবকে, রাজকন্যা এখন আটমাসের গর্ভবতী। স্বহস্তে তার গর্ভনাশ করুন।

শক্তিদেবের মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়েছিল। মন মুষড়ে পড়েছিল। ঔরসজাত সন্তান রয়েছে পত্নীগর্ভে, অতিয় নিরাপদে। স্নেহরস নিয়ত সিঞ্চিত হয়ে চলেছে মনের মধ্যে। এমতাবস্থায় স্বহস্তে আটমাসের শিশু হত্যার মতো জঘন্য নিষ্ঠুর কাজ তার পক্ষে কি সম্ভব?

কিন্তু নাছোড়বান্দা বিন্দুরেখা, রাজকন্যা বিন্দুরেখা, যার গর্ভে রয়েছে আটমাসের শিশু, বললে নরম গলায়, আর্যপুত্র, কাজটা বীভৎস, কিন্তু তবুও আপনাকে করতে হবে, কারণ আছে বলে। বিন্দুমতী এই কারণেই আপনাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটা কাহিনি বলছি, শুনুন।

কম্বুক নামে একটা নগর ছিল সেকালে। এক ব্রাহ্মণের নিবাস ছিল সেখানে। তাঁর নাম হরিদত্ত। তাঁর ছেলের নাম দেবদত্ত।

হরিদত্ত ছিলেন অর্থশালী পুরুষ। ছেলেকে টাকার জোরে পণ্ডিত করে তুলেছিলেন বটে, কিন্তু কুসঙ্গে পড়ে ছেলের চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। জুয়োখেলায় পরনের বস্ত্র পর্যন্ত খোয়া যায়।

বিষম লজ্জায় আর বাড়ি ফিরতে পারেনি দেবদত্ত। কপর্দকহীন অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে গভীর রাতে পৌঁছেছিল একটা মন্দিরের সামনে। ভেতরে ঢুকে দেখেছিল ধ্যান করছেন এক সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসীর নাম জালপাদ। এই দেবালয় তাঁর জপতপের জায়গা। দেবদত্ত তাঁর পাশে বসতেই তিনি চোখ মেলে তাকে দেখেছিলেন।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছিলেন দেবদত্তের নির্ধন হওয়ার কাহিনি। সুবচনে বলেছিলেন, বাসনায় লিপ্ত মানুষকে এইভাবেই নীচে নামতে হয়। ঊর্ধ্বে উঠতে হলে প্রয়োজন সাধনা। সাধু ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছেন কেন? বিদ্যাধরদেহ প্রাপ্তির জন্যে। পার্থিব কোনও কামনা তাঁর মধ্যে নেই। দেবদত্ত তাই করুক। মনোরথ পূর্ণ হবে।

শুনে তো লাফিয়ে উঠেছিল দেবদত্ত। ভোগঐশ্বর্য তো অনেক হল, এবার একটু তপস্যা-টপস্যা করা যাক।

বসে গেল সাধুর কাছে। বিবিধ প্রশ্নে মনের কৌতূহল মিটিয়ে নিতে নিতেই বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে এসে গেল। তারপর ঘুটঘুটে রাত। চারদিকে থমথমে নীরবতা। গাছগাছালির শিহরণ পর্যন্ত স্তব্ধ।

ঠিক তখনই দেবদত্তকে হুকুম দিয়েছিলেন সন্ন্যাসী জালপাদ, চলো আমার সঙ্গে।

কোথায়?

দূরের ওই শ্মশানে। ওখানে আছে একটা মস্ত বটগাছ। গোড়ায় বসে সিদ্ধিলাভের পুজো করি রোজ রাতে। আজ রাতে তুমি থাকবে আমার সঙ্গে।

বলেই, পুজোর জিনিসপত্র তুলে নিয়ে শ্মশান অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন জালপাদ—পেছন পেছন চলল দেবদত্ত।

এসে গেল বটগাছ। জিনিসপত্র সাজিয়ে নিয়ে পুজোয় মন দিলেন সন্ন্যাসী জালপাদ। কাছে বসে পুজোর পদ্ধতি দেখে গেল দেবদত্ত।

কিছুক্ষণ পরে বললেন সন্ন্যাসী, পুজোর পদ্ধতি শিখে তো গেলে। রোজ রাতে এসে এইভাবে পুজো করবে। তারপর চোখ বুঁজে বলবে, বিদ্যুৎপ্রভা, নাও আমার পুজো।

রোজ যদি তাকে ডাকতে পারো, সাড়া পাবেই। তখন হয়ে যাবে বিদ্যাধির।

বাড়ি ফিরে গেল দেবদত্ত। পরের দিন রাতে গিয়ে ফের পুজো দিল বিদ্যুপ্রভার নামে। পুজো শেষে ফিরে গেল বাড়িতে। এইভাবে চলল রাতের পর রাত।

একদিন ঘটল একটা কাণ্ড। পুজো শেষে ধ্যানে বসেছে দেবদত্ত। এমন সময়ে দুম করে ফেটে চৌচির হয়ে গেল বটগাছ।

আতঙ্কিত দেবদত্ত দেখল, সামনেই দাঁড়িয়ে এক দারুণ সুন্দরী নারী।

দুজনে চেয়ে রইল দুজনের দিকে। কারও মুখে নেই কথা। তারপর আস্তে করে দেবদত্তর গা স্পর্শ করে বটবৃক্ষের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই আশ্চর্য সুন্দরী।

এ আবার কী? অপরূপা কি দেবলোক কন্যা, না, মর্ত্যলোক বাসিনী? খোঁজ নেওয়া তো দরকার।

বটগাছ তো ফেটেফুটেই রয়েছে। ঢুকে পড়া যাক গুঁড়ির ভেতরে।

ঢুকে দেখল, আগাগোড়া রত্নখচিত যেন এক অলকাপুরী। দেখলে চোখে ধাঁধা লেগে যায়।

কিন্তু চোখের পলক পড়ে না শুধু একজনের দিকে তাকিয়ে থাকলে। ঈশ্বর যেন মণিমুক্তার চাইতেও দামি পদার্থ দিয়ে গড়েছেন তাকে। প্রকৃতই কিরণময়ী সেই নারীমূর্তি। বিবিধ বিচিত্র অলঙ্কারে ঈশ্বরদত্ত রূপের জেল্লা সহস্রগুণে বাড়িয়ে সে শুয়ে আছে একটা বিরাট পালঙ্কে, তার রূপের আভায় জহরৎ মণ্ডিত কক্ষও বুঝি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

দেবদত্তের চোখের পাতা পড়ছে না দেখে হেসে ফেলেছিল সেই সৌন্দর্যের আকর।

বলেছিল দেবদত্তকে শ্বেতদন্তের ঝিলিক তুলে, কি ভাবছেন?

স্খলিত স্বরে দেবদত্ত বলেছিল, আ-আপনি কি দেবী?

না।

তবে?

আমি যক্ষী। আমিই বিদ্যুৎপ্রভা। যাকে এত ডাকাডাকি করছিলেন।

যক্ষী?

যক্ষপতি রত্নবর্ষ আমার বাবা।

সন্ন্যাসী জালপাদ আপনারই পুজো করে এসেছেন এতদিন?

আপনিও করেছেন। খুশিও করেছেন, যা জালপাদ পারেননি। সুতরাং আমাকে বিয়ে করুন, এখানে থাকুন।

বিয়ে! অতুলনীয়া এই কন্যা তার অঙ্কশায়িনী হতে চাইছে স্বেচ্ছায়? নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না দেবদত্ত।

কিন্তু ওই ঢল ঢল চাহনির মানে তো একটাই, গ্রহণ করো আমাকে, নিষ্পেষণ করো তোমার বুকের মাঝে!

তাই করেছিল দেবদত্ত। যক্ষীর গর্ভাধান ঘটিয়ে দিয়েছিল যথাসময়ে।

অহর্নিশ প্রিয়ামিলনের ফলে সন্ন্যাসী জালপাদের কথা ভুলে মেরে দিয়েছিল দেবদত্ত। হঠাৎ একদিন স্মৃতি চাবুক মেরে তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, জালপাদের পন্থা অনুসরণ করেই বিদ্যুৎপ্রভাকে সে পেয়েছে। অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ।

এবং তা লক্ষ্য করেছিল বিদ্যুপ্রভা। কারণটা জিজ্ঞেস করেছিল।

মনোভাব ব্যক্ত করেছিল দেবদত্ত। যার জন্যে এত সুখ, এত সম্ভোগ, সেই সন্ন্যাসীর পায়ে একটা প্রণাম রেখে আসা উচিত।

আপত্তি করেনি বিদ্যুৎপ্রভা। কিন্তু পথে নেমেই দেবদত্তের মনে ভাবান্তর দেখা দিয়েছিল। সমীচীন হচ্ছে কি জালপাদের কাছে যাওয়া? বিদ্যুৎপ্রভাকে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন তো তিনি নিজেই? কিন্তু বরমাল্য পেয়েছে

দেবদত্ত।

দুরুদুরু বুকে জালপাদের আদ্যোপান্ত নিবেদন করতেই কিন্তু বিষম আহ্লাদে ফেটে পড়েছিলেন জালপাদ।

এবং একটা বীভৎস আদেশ দিয়েছিলেন দেবদত্তকে, বৎস, এখুনি গিয়ে বিদ্যুৎপ্রভার গর্ভ কেটে বাচ্চাটাকে নিয়ে এসো আমার কাছে।

দেবদত্তের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল হুকুম শুনে! পা টেনে টেনে কোনো রকমে ফিরে এসেছিল বিদ্যুৎপ্রভার সামনে।

বিদ্যুৎপ্রভা কিন্তু তিলমাত্র বিচলিত না হয়ে এবং দেবদত্তের মুখে কোনও কথা না শুনেই বলেছিল ধীর স্থির স্বরে, আর্যপুত্র, আমি সব জানি। জালপাদ যা বলেছেন, তা করুন। পেট কেটে বাচ্ছা বের করে নিন এখুনি।

প্রহেলিকার পর প্রহেলিকা! সন্ন্যাসী বলছেন, গর্ভবতীর গর্ভনাশ করো, গর্ভবতীও বলছে, করুন, করুন, পেট কেটে বাচ্চা বের করে নিন!

কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেবদত্তের সামনেই অবশেষে এই নৃশংসতম কর্মটি সম্পাদন করেছিল যার গর্ভ, সে নিজেই।

ছুরি দিয়ে পেট কেটে বাচ্ছাকে তুলে ধরেছিল দেবদত্তের সামনে!

কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে থাকতে পারেনি দেবদত্ত। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিতেই প্রশান্ত কণ্ঠে বলেছিল বিদ্যুৎপ্রভা মনে ব্যথা পাবেন না। অভিসম্পাত খণ্ডন করার জন্যেই এই কদাচার আমাকে করতে হয়েছে। শুনুন, সব বলছি।

আমি আগে ছিলাম বিদ্যাধরী। আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে শক্তিমান এক পুরুষের অভিসম্পাতে যক্ষী হয়ে গেছিলাম। কিন্তু পূর্বজন্মের কথা স্মরণে ছিল। সেই বিরাট পুরুষের নির্দেশ অনুসারে নিজের গর্ভ নিজেই নাশ করে ফের বিদ্যাধরী হয়ে গেলাম। কিন্তু আমাদের পুনর্মিলন ঘটবে খুব শিগগিরই।

বলেই, বাতাসের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল বিদ্যুৎপ্রভা, শুধু দেখা গেল একটা বিদ্যুৎ ঝলক।

মুহ্যমান দেবদত্ত রক্তমাখা শিশুটিকে নিয়ে এল জালপাদের সামনে। খুশি হয়ে জালপাদ বললেন, বাচ্ছা থাক এখানে। তুমি যাও শ্মশানে। তান্ত্রিকমতে শিবপুজো করো।

গুরুর আদেশে সেই কাজেই যখন তন্ময়চিত্ত দেবদত্ত, তখন.....

শিশুটিকে কাঁচা খেয়ে নিয়েছিলেন সন্ন্যাসী জালপাদ।

এবং, এহেন অমানবিক কাজের পেছনে ছিল একটা গূঢ় উদ্দেশ্য।

কিছুক্ষণ পরেই পুজো সাঙ্গ করে ফিরে এসে দেবদত্ত যখন দেখেছিল তার ঔরসজাত সন্তানকে উদরস্থ করে বসে আছেন জালপাদ, তখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। সহ্যের একটা সীমা আছে।

তেড়ে গেছিল জালপাদ নিধনের অভিলাষে।

কিন্তু তাঁকে স্পর্শও করতে পারেনি।

চকিতে মানব কলেবর ত্যাগ করেছিলেন জালপাদ, দেবদত্তের সামনে আবির্ভূত হয়েছিল এক দিব্যকান্তি বিদ্যাধর। বিদ্যুৎগতিতে বিলীন হয়ে গেছিল শূন্যে।

কাণ্ড দেখে দেবদত্ত স্তম্ভিত। অথচ চণ্ডাল রাগে জ্বলে যাচ্ছে সর্বশরীর। মাথায় জ্বলছে আগুন। শোধ তুলতেই হবে। কিন্তু কীভাবে? কীভাবে?

হঠাৎ মাথায় এল একটা কিম্ভুত মতলব। যে যেমন, তার সঙ্গে সেই ভাবে চলা যাক। বদমায়েসির জবাব বদমায়েসি দিয়ে দেওয়া যাক।

শ্মশানে গিয়ে বেতাল পুজোয় বসে গেল দেবদত্ত। মড়া যেন দানোয় পেয়ে উঠে বসে দেবদত্তর বাঞ্ছপূরণ করে। ভূতেরা সব করতে পারে। সুতরাং ভূতপুজোই জালপাদকে জব্দ করার প্রশস্ততম পন্থা।

গ্যাঁট হয়ে তাই বসল একটা বটগাছের তলায়। শুরু হল মড়া পুজো। বেতালের অধিষ্ঠান ঘটে যেন সেই মড়ায়।

যথাবিধি পূজা অন্তে আরাধ্যের খাদ্য হিসেবে নিজের গায়ের মাংস যেই কাটতে যাচ্ছে, উঠে বসল মড়া।

ঘ্যাঁঘোঁ করে বললে, এসে গেছি আমি বেতাল। চমৎকার পুজো। খুব খুশি হয়েছি। গায়ের মাংস আর কাটতে হবে না। হুকুম করুন, কী করতে হবে?

দেবদত্ত বললে, তুমি কি আমার বশ মেনেছ?

বেতাল বললে অবশ্যই।

দেবদত্ত বললে জালপাদকে চেন?

বেতাল বললে সে তো একটা প্রবঞ্চক কাপালিক।

দেবদত্ত বললে, মাকে নিয়ে চল তার কাছে। এখুনি। বজ্জাতির শাস্তি দেব।

বেতাল তৎক্ষণাৎ দেবদত্তকে কাঁধে চাপিয়ে সাঁ-সাঁ করে উড়ে গেল আকাশে। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেল বিদ্যাধর লোকে। খুব সুন্দর একটা প্রাসাদ দেখিয়ে বললে দেবদত্তকে, পাপিষ্ঠ জালপাদ ওইখানে আছে। পয়লা নম্বরের ভণ্ড। আপনি ভেতরে গিয়ে তাকে খুঁজে নিন।

দেবদত্ত টপাস করে বেতাল স্কন্ধ থেকে ভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে সাঁ-সাঁ করে ঢুকে গেছিল সুরম্য সেই প্রাসাদে। একটা ঘর যেন আলোয় আলো রয়েছে। রূপের প্রভায় ঘর ঝলমলিয়ে দেবদত্ত-পত্নী বিদ্যুৎপ্রভা সেখানে আসীন রয়েছে।

তার সামনে রয়েছে কে?

মহাশয়তান জালপাদ। বিরামবিহীন অনুরোধ-উপরোধ করে যাচ্ছে বিদ্যুৎপ্রভাকে, অচিরে তাকে পতিত্বে বরণ করার জন্যে।

বেতাল তৎক্ষণাৎ দেবদত্তকে কাঁধে চাপিয়ে সাঁ-সাঁ করে উড়ে গেল আকাশে।

দেখেই তো সিংহগর্জন ছেড়ে তেড়ে গেছিল দেবদত্ত।

ভয়ের চোটে কেঁচোর মতো কুঁচকে গিয়ে তার পায়ের কাছে আছড়ে পড়েছিল জালপাদ। জ্ঞান হারিয়েছিল তক্ষুণি, ভয় এমনই জিনিস।

কিন্তু দেবদত্ত তখনও ক্ষমাহীন। ধারালো তলোয়ার মাথার ওপর তুলে জালপাদের মুণ্ডটা ধড় থেকে কেটে বাদ দিতে যেতেই বাগড়া দিয়েছিল বিদ্যুৎপ্রভা।

দু-হাতে বেদদত্তের অসিসমেত হাত খামচে ধরে মিনতি মাখানো গলায় বলেছিল, থামুন। একে খতম করে আপনার লাভ তো কিছু হবে না।

রণচণ্ডাল দেবদত্ত সুন্দরী স্ত্রীর কাকুতিমিনতিতে কথঞ্চিৎ শান্ত হয়ে হুকুম দিয়েছিল বেতালকে, যাও, নিয়ে যাও এই নরাধমকে আমার সামনে থেকে। যেখানে পচে মরছিল, রেখে দাও সেইখানে, শ্মশানে থাকুক জঘন্য তান্ত্রিক হয়ে।

যথা হুকুম, তথা কর্ম! চকিতে জালপাদকে কাঁধে চাপিয়ে বেতাল তাঁকে আছড়ে ফেলে দিয়েছিল মহাশ্মশানে।

দেবদত্তের এহেন মহত্ত্ব কিন্তু বিচলিত করেছিল ভবপত্নী মা দুর্গাকে। এমতাবস্থায় কোনও বীরপুরুষ ক্ষমাহীন থাকতে পারে না, প্রতিহিংসা নিয়ে তবে ছাড়ে। দেবদত্ত কিন্তু নিমেষে দ্বিতীয় রিপুকে বশে এনে ফেলেছিল স্ত্রীর সুপরামর্শে।

তাই প্রীত হয়ে ভবপত্নী ভবানী দেখা দিলেন তাকে।

দিলেন এক মহাবর।

সেইদিন থেকে বিদ্যাধর করে দেওয়া হল দেবদত্তকে, শুধু তাই নয়, সমস্ত বিদ্যাধরদের অধিপতিও করে দেওয়া হল তাকে।

সেরা সুন্দরীসহ পরমানন্দে বিদ্যাধরলোকেই থেকে গেল দেবদত্ত।

উপাখ্যান সমাপ্ত করে বললে বিন্দুরেখা, গল্পটা কেন বললাম, এখন তা বুঝলেন? দ্বিধা করবেন না। আমার গর্ভনাশ করুন। বিন্দুমতীর কথার অন্যথা করবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল এক দৈববাণী, শক্তিদেব, বিন্দুমতীর গর্ভ থেকে শিশুকে বের করে এনে নিজের গলায় ঠেকাও। শিশু রূপান্তরিত হবে এক দৈব কৃপাণে।

আর দ্বিধা করেনি শক্তিদেব। সুন্দরীশ্রেষ্ঠার গর্ভ কেটে শিশুকে বের করে এনে কণ্ঠদেশে ছোঁয়াতেই দেখে দিল, কোথায় শিশু? তার দুহাতে ঝলমল করছে ক্ষুরধার আশ্চর্য কারুকার্যময় চোখ ধাঁধানো এক কৃপাণ!

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বায়ুপথে বিলীন হয়ে গেছিল বিন্দুরেখা। আর......

বিদ্যাধর হয়ে গেছিল শক্তিদেব।

বউ বিন্দুমতীর কাছে গিয়ে বলেছিল অতীব আশ্চর্য ঘটনা পরম্পরা।

বিন্দুমতী কিন্তু মোটেই অবাক হয়নি। অবাক না হওয়ার কারণটাও ব্যক্ত করেছিল শক্তিদেবকে। বলেছিল, হে প্রিয়তম, আমরা তো কেউই মানুষ নই।

তবে কী?

বিদ্যাধরী। আমরা চার বোন। চারজনেই রাজকুমারী। আমাদের বাবা বিদ্যাধরদের রাজা। অভিশাপের ফলে আমাদের তিন বোন মানুষ হয়ে জন্মেছিলাম, তিনজনেরই বিদ্যাধরীদেহ সুরক্ষিত রয়েছে কনকপুরীতে, আপনি নিজেই তা দেখে এসেছেন। দেখেছেন আমাদের বড়দি চন্দ্রপ্রভাকেও। ছোটো বোন কনকরেখার শাপের মেয়াদ ফুরিয়েছে বর্ধমানে। বিন্দুরেখাও শাপমুক্ত হল। বাকি রইলাম আমি। আমিও এখন ফিরে যাব কনকপুরীতে। আপনিও সেখানে যাবেন, এই যে দৈব কৃপাণ হাতে পেয়েছেন, এর দৌলতে। সেখানেই আমরা চার বোনেই বউ হবো আপনার। কনকপুরীও আপনার হবে।

জেলের মেয়ে বিন্দুমতীর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ঘটল তার রূপান্তর। ছিল মানবী, হয়ে গেল বিদ্যাধরী। সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল আকাশপথে। মদির হেসে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল শক্তিদেবকে, অঙ্গুলি

সংকেতে দেখিয়ে দিয়েছিল হাতের কৃপাণ। চোখের ভাষার অর্থ তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট হয়ে গেছিল শক্তিদেবের মনের মধ্যে। হাতে ধরা কৃপাণের কাছে প্রার্থনা করেছিল, শূন্যপথে গমনের ক্ষমতা যেন সে ও পায়, বধূর পেছন পেছন।

পরমুহূর্তে দৈব কৃপাণ দিয়েছিল তাকে সেই ক্ষমতা।

অচিরে পৌঁছে গেছিল কনকপুরীর তোরণের সামনে।

ভেতরে ঢুকে চক্ষুস্থির হয়ে গেছিল শক্তিদেবের।

তিন কন্যাই উঠে বসেছে পালঙ্কে, তাদের দেহ আর নিষ্প্রাণ নয়।

কিন্তু মুশকিলটা হল তার পরেই। কে যে কনকরেখা, কে বিন্দুমতী, আর কে বিন্দুরেখা, তা তো চেনা যাচ্ছে না।

বিন্দুমতী জেলের মেয়ে, বিন্দুমতী রাজকন্যা বটে, কিন্তু তাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছিল এক দৈত্য। আর কনকরেখা তো বর্ধমানের রাজকুমারী ছিল।

এখন তারা প্রত্যেকেই ত্রিভুবনমোহিনী বিদ্যাধরীকে বিন্দুমতী, কে বিন্দুরেখা আর কে কনকরেখা তা একদম বোঝা যাচ্ছে না। এ তো ভয়ানক দৃষ্টিবিভ্রম!

মুচকি হেসে চিনিয়ে দিল বড়ো বোন চন্দ্রপ্রভা। বিন্দুমতী এখন হয়েছে শশিরেখা, বিন্দুরেখা যে ছিল, সে এখন শশিপ্রভা। এই হচ্ছে কনকরেখা, এখানে সে চন্দ্ররেখা। দুই চন্দ্র, দুই শশি, চার জনেরই মানে এক, চাঁদ।

এরপরেই আর্জি পেশ করেছিল চার বোন, শক্তিদেব যেন আজই বিয়ে করে নেয়। চারজনকে! চার চাঁদের বর হোক এক শক্তি!

কোন পুরুষ একসঙ্গে চন্দ্ররূপী চার বোনকে বউ হিসেবে পেতে না চায়? শক্তিদেব সম্মত হতেই অরণ্যনিবাস থেকে চলে এলেন চার বোনের পিতৃদেব। বিয়ে দিয়েই জামাতাকে পণ দিলেন গোটা কনকপুরী। সেই সঙ্গে দান করলেন তাঁর রহস্যময় শক্তি, বিদ্যাধর জ্ঞান।

বললেন তারপরে, এই জ্ঞান লাভের ফলে ত্রিভুবনের সর্বত্র তুমি যেতে পারবে, প্রত্যেকেই তোমার পদানত হবে। আজ থেকে তোমার নতুন নাম হোক শক্তিবেগ। শুধু একটা কথা মনে রাখবে, খুব শিগগিরই এক অমিতবিক্রম রাজা আত্মপ্রকাশ করবেন। তাঁর টক্কর নিতে যেও না, হেরে যাবে। তাঁকে সম্মান দেখিও।

জিজ্ঞেস করেছিল শক্তিদেব ওরফে শক্তিবেগ, তিনি কে? কী তাঁর নাম?

তিনি নরবাহন দত্ত, রাজা উদয়নের ছেলে।

কাহিনি শেষ করে রাজা উদয়নকে বললে শক্তিবেগ, আমিই সেই বিদ্যাধররাজ। দেখতে এসেছিলাম নরবাহন দত্তকে। এখন চললাম।

বলেই, শূন্যে বিলীন হয়ে গেছিল শক্তিবেগ।

২৭. কলিঙ্গদত্তের কাহিনি

নয়নের মণি নরবাহনদত্ত বাবা উদয়ন আর মা বাসবদত্তার আদরযত্নে বড়ো হয়ে পা দিল ন' বছরে। মন্ত্রীদের ছেলেদের সঙ্গে তার বিদ্যাশিক্ষা চলল সর্ববিষয়ে। সেই সময়ে দেখা গেছিল তিরধনুকে তার আশ্চর্য দক্ষতা।

তক্ষশিলা নামে একটা শহর ছিল সেই সময়ে। সেখানকার রাজার নাম কলিঙ্গদত্ত। তিনি ছিলেন অহিংস ধর্মে বিশ্বাসী।

বিতস্তদত্ত বণিক এই নগরেই ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। প্রচুর রোজগার করতেন। কিন্তু সবটাই ব্যয় করতেন অতিথি সৎকারে। নিজের জন্যে নয়।

বিতস্তদত্ত বয়েসে বৃদ্ধ। তাঁর এক ছেলে। ছেলের নাম রত্নদত্ত। প্রকৃতই অপদার্থ। বাবার এই মহৎ কাজ তার মোটেই পছন্দ হত না। পিতৃনিন্দা করে বেড়াতো শহরময়।

মনে কষ্ট পেয়ে বৃদ্ধ বণিক একদিন তিরস্কার করেছিলেন এ হেন অপবাদ রটানোর জন্যে। তিনি ধর্মের পথে আছেন। অধর্ম তো করছেন না। তবে কেন এই কুৎসা?

তেড়েমেড়ে জবাব দিয়েছিল রত্নদত্ত, ভিখিরিদের পেছনে টাকা ওড়ানো আবার ধর্ম নাকি?

বাবা বলেছিলেন, সব ধর্মের সেরা ধর্ম কিন্তু অহিংসা ধর্ম।

ছেলে বলেছিল, আপনি মহাপাপী।

আবার শহরময় শুরু হল একই রটনা, একই কুৎসা। বণিক বিতস্তদত্ত ধর্মের নামে অধর্ম করছেন।

অতিষ্ঠ হয়ে রাজা কলিঙ্গদত্তের কাছে গিয়ে বিচার প্রার্থনা করলেন বৃদ্ধ বণিক।

কলিঙ্গদত্ত অহিংসা ধর্মে পরম বিশ্বাসী হয়েও বিচারের প্রহসন না করে কেবলমাত্র বাবার মুখের কথায় ছেলের প্রাণ নেওয়ার হুকুম দিলেন।

অথচ তিনি অহিংস ধর্মের প্রচারক।

শুনে তো মাথা ঘুরে গেছিল বৃদ্ধ বণিকের? ছেলের সুমতি ফেরানোর জন্যে এসেছিলেন রাজদরবারে, বধ্যভূমিতে পাঠাতে তো চাননি।

করুণ স্বরে দণ্ডলাঘবের প্রার্থনা জানিয়েছিলেন রাজাকে।

কলিঙ্গদত্ত বলেছিলেন, ঠিক আছে। সময় দিলাম দুমাস। এর মধ্যে যদি ছেলের ধর্মে মতি না হয়, তাহলে উচিত শাস্তি দেব।

দুর্বিনীত পুত্রকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে বৃদ্ধ বিতস্তদত্ত অনেক বোঝালেন।

এবার আর কিন্তু মুখে মুখে জবাব দিল না রত্নদত্ত। একদম বোবা মেরে রইল। কিন্তু নিদারুণ দুশ্চিন্তায় শরীর শুকিয়ে যেতে লাগল দিনের পর দিন। মৃত্যুভয় বড়ো ভয়ানক জিনিস।

দু-মাস অন্তে ছেলেকে নিয়ে রাজার সামনে গেলেন বৃদ্ধ বণিক। ক্ষীণ কলেবর পুত্রকে দেখে রাজা বললেন, কী ব্যাপার? আমি তো তোমাকে না খেয়ে থাকতে বলিনি। চেহারার এমন হাল হল কেন?

রত্নদত্ত সত্যি কথাই বলেছিল, প্রাণের ভয়ে। খেতে আর রুচি নেই।

হেসে বললেন রাজা, এই শিক্ষাটা তোমাকে দেওয়ার জন্যেই প্রাণে মেরে ফেলার আদেশ দিয়েছিলাম। মরণ হবে, শুধু এই ভয়েই তুমি আধমরা। আর তোমার পুণ্যবান পিতা যখন কায়মনোবাক্যে অহিংসা ধর্ম পালন করেন, তখন তাঁর নিন্দে করে বেড়াও। বাবার পায়ে ধরে ক্ষমা চাও, তোমাকে ছেড়ে দেব।

রাজাদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করেছিল রত্নদত্ত।

তারপর বলেছিল করজোড়ে, আমাকে অহিংসা ধর্মে দীক্ষা দিন।

রাজা বলেছিলেন, ছোট্ট একটা কাজ করে এসা। তাহলেই বুঝবো তুমি অহিংসা ধর্মের উপযুক্ত হয়েছ কি না। আজ রাজধানীর বাইরে একটা উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তুমি সেই অনুষ্ঠান দেখে এসো। কিন্তু একবাটি তেল হাতে নিয়ে যাও। তেল ছলকে না পড়ে। তোমার পেছনে থাকবে অসিধারী শান্ত্রী। এক ফোঁটা তেল যদি মাটিতে পড়ে, তৎক্ষণাৎ মুণ্ড উড়ে যাবে ধড় থেকে।

এ হেন অসম্ভব কর্মকেও সম্ভব করে তুলেছিল রত্নদত্ত স্রেফ প্রাণের ভয়ে। উৎসবের হৈ-হট্টগোলে কান দেয়নি, চোখ তুলে সুবেশা সুন্দরীদের লাস্যময়ী হাস্য, রঞ্জিত কুচ আর শিঞ্জিত নূপুরের দিকে ফিরেও তাকায়নি।

তেলভর্তি বাটি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল রাজার সামনে।

সব শুনে প্রীত হয়ে রাজা বলেছিলেন, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গের শ্রেষ্ঠ বর্গ লাভের পন্থা তুমি শিখে এলে, একাগ্র হওয়া। চঞ্চল মনকে মুক্তির পথে রেখে দাও, ঈশ্বরের দর্শন পাবে। সব ধর্মের সার ধর্ম অর্থভোগ নয়, তত্ত্বজ্ঞান লাভ। যাও, তুমি মুক্ত।

এই বলে রাজা কলিঙ্গদত্ত গেলেন অন্তঃপুরে মহিষী তারাদত্তর কাছে।

আর সেই রাতেই গর্ভাধান ঘটল রাজমহিষীর দেবসভায় একটা কাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর।

সুরভিদত্তা নামে এক নাচনি অপ্সরা সেদিন নাচের সভায় আসেনি। খোঁজ নিয়ে ইন্দ্র জানলেন, সুরভিদত্তা তখন এক বিদ্যাধর তনয়ের সঙ্গে লালসায় নিবৃত্তি ঘটাচ্ছিল।

রেগেমেগে শাপ দিয়েছিলেন ইন্দ্র, যা, মর্ত্যে গিয়ে কামক্রীড়া করে আয়।

দেবরাজের অভিসম্পাত ফলে গেছিল মুহূর্তের মধ্যে। স্বর্গ থেকে মর্ত্যে পতন ঘটেছিল সুরভিদত্তার, ঠাঁই হয়েছিল রানি তারাদত্তর গর্ভে।

সহবাসের পরেই স্বপ্নে তলিয়ে গিয়ে রানি কিন্তু দেখেছিল, আকাশ থেকে যেন একটা তীব্র জ্যোতি এসে তার উদর ভেদ করছে।

ঘুম ভাঙতেই আশ্চর্য স্বপ্নকাহিনী শুনিয়েছিল স্বামীকে।

রাজা বলেছিলেন, এত ভালো স্বপ্ন। নিশ্চয় দেবলোক থেকে খসে পড়েছে শাপগ্রস্ত কোনও আত্মা। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাই নিশ্চয় দেবগণ শব্দটা এসেছে। রানি বলেছিলেন, আমারও তাই মনে হচ্ছে। একটা গল্প মনে পড়ছে। বলছি, শুনুন।

অনেক দিন আগে ধর্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। কোশল ছিল তাঁর রাজ্যের নাম। নাগশ্রী ছিলেন তাঁর রানি। আমি তাঁর মেয়ে হয়ে জন্মেছিলাম।

আমি যখন নিতান্ত ছোটো, তখন একদিন আমার মা বললে বাবাকে, আমার আগের জন্মের সব কথা যে মনে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা আপনাকে বলামাত্র এই দেহ ত্যাগ করে যেতে হবে। শুনেই বললেন আমার বাবা, তোমার কথা শোনামাত্র আমারও আগের জন্মের সব কথা মনের মধ্যে ভেসে উঠছে? আমরা দুজনেই যখন জাতিস্মর, তখন তোমার কাহিনী আগে বলো, তারপর আমি বলবো আমার কাহিনি।

মা বললেন, এই রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ থাকতেন। আমি ছিলাম তাঁর ঝি। আমাকে বিয়ে করেছিলেন যিনি তিনি খুব গরিব। তাঁর নাম দেবদাস। এক বণিকের বাড়িতে চাকরের কাজ করতেন। কিছুদূরে একটা কুঁড়েঘরে থাকতাম স্বামী-স্ত্রী। সারাদিন খাটতাম, মালিকদের বাড়ি থেকে খাবার এনে খেতাম, কুঁড়ে ঘরে ঘুমোতাম, ঘরে ছিল শুধু চারটে জিনিস, একটা ঘটি, একটা কলসি, একটা চৌকি আর একটা ঝাঁটা। বাড়তি কোনও জিনিস পেলেই গরিবকে দিয়ে দিতাম। অল্পে সন্তুষ্ট ছিলাম। সুখী ছিলাম।

এই সময়ে দুর্ভিক্ষ শুরু হল দেশে। গরিব বড়োলোক কেউই রেহাই পেল না। মালিকদের দেওয়া খাবারও পরিমাণে কমতে লাগল। অতিকষ্টে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতাম তাই দিয়ে। রোগা হয়ে গেলাম দুজনেই।

এই সময়ে এক ব্রাহ্মণ অতিথি এলেন আমাদের কুঁড়েঘরে। অতিথি নারায়ণ। নিজেরা না খেয়ে আমাদের দুজনের খাবার তাঁকে খাইয়ে দিলাম।

তিনি খুশি হয়ে বিদায় নিলেন। আমার স্বামী অনাহারে প্রাণত্যাগ করলেন তৎক্ষণাৎ। আমি টলতে টলতে তাঁর মৃতদেহ চিতায় চাপিয়ে জ্বলন্ত চিতায় প্রাণবিসর্জন দিলাম। এই জন্মে আমি আপনার রানি।

রাজা ধর্মদত্ত বললেন, আর আমিই তোমার পূর্বজন্মের সেই স্বামী। ছিলাম চাকর, হয়েছি রাজা, সুকৃতির ফলে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে দেহত্যাগ করে গেলেন আমার বাবা আর মা, অবশ্যই স্বর্গে গেলেন।

কাহিনি শেষ করে বললে রানি তারাদত্তা, আমি মানুষ হলাম মাসীর কাছে। একদিন এক অতিথি এলেন বাড়িতে। তিনি ব্রাহ্মণ। প্রাণ ঢেলে তাঁর সেবা করলাম। যাবার সময়ে আমাকে আশীর্বাদ করে গেলেন, তুমি রানি হবে। কিছুদিন পরে আপনি আমাকে রানির সিংহাসনে বসালেন। তাই বলি, ধর্মপথে যে চলে, তার কল্যাণ হবেই।

রাজা কলিঙ্গদত্ত বললেন, কথাটা ঠিক। সত্যের পথই প্রকৃত ধর্মের পথ। এ বিষয়ে একটা গল্প মনে পড়ে গেল। শোনো...

সেকালের কথা। গঙ্গার ধারে একই সঙ্গে না খেয়ে ঈশ্বর নাম জপ করে চলেছিল দুই ব্যক্তি। তাদের একজন উঁচু জাতের ব্রাহ্মণ, আর একজন নীচু জাতের চাঁড়াল।

একটু দূরে প্রচুর মাছ রান্না করে মজাসে খাচ্ছিল একদল জেলে।

পেটে খিদে, নাকে সুগন্ধ। ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবছিল, আহা-রে, কী সুখী ওই জেলের দল। ভাগ্যবান পুরুষ। কত সহজে কত মাছ পেটে চালান করছে।

চাঁড়াল ভাবছিল ঠিক উলটো কথা। নিছক উদরতৃপ্তির জন্যে এত প্রাণীহত্যা! এ দৃশ্য দেখাও মহাপাপ। চোখ বুঁজে ফেলেছিল তৎক্ষণাৎ।

শরীরে খাদ্য না গেলে শরীর কি টেঁকে? তাই যথাসময়ে প্রাণবিয়োগ ঘটেছিল দুজনের। ব্রাহ্মণের মড়া খেয়ে গেল কুকুরে, কিন্তু চাঁড়ালের মড়া ছুঁতেও পারলো না, কেননা সে মড়া আপনা থেকেই ছিটকে গিয়ে পড়েছে গঙ্গার জলে।

যাই হোক, গঙ্গাতীর্থের মাহাত্ম্য আছে বই কী।

স্বর্গে যা মন্দাকিনী, মর্তে তা গঙ্গা, পাতালে গিয়ে ভোগবতী। সবটাই শ্রীকৃষ্ণের চরণাম্বুজ। সেই পুণ্যবলে ব্রাহ্মণ পরের জন্মে জন্মাল জেলে হয়ে, কিন্তু স্মরণে রইল পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত। চাঁড়াল জন্মাল কিন্তু রাজপুত্র হয়ে, সেও হল জাতিস্মর। জেলের অনুশোচনার অন্ত রইল না সারা জীবনে, রাজপুত্র মহা আনন্দে কাটিয়ে দিল গোটা জীবন।

তাই বলি, মনই সব। ধর্ম আর অধর্ম, সবই এই মনের মধ্যে। মন শুচি থাকলে ধর্ম, অশুচি থাকলে অধর্ম। সুখ আর দুঃখ তৈরি হয়ে যায় সেই কর্মফলের ফলে।

গল্প শেষ করে রাজা কলিঙ্গদত্ত বললেন, ধর্ম আর অধর্মের কর্মফল কী রকম হয়, এ সম্বন্ধে আর একটা গল্প শুনবে? অদ্ভুত গল্প।

রানি তারাদত্তা হেসে বলেছিল, কী রকম অদ্ভুত?

কলিঙ্গদত্ত বললেন, তাহলে শোনো। উজ্জয়িনীতে একসময়ে রাজত্ব করতেন রাজা অমরসিংহ। ছিলেন রণশাস্ত্রে অদ্বিতীয়।

একদিন তিনি দূরের জঙ্গলে গেছিলেন শিকার করতে, সৈন্যসামন্ত নিয়ে, যেতে যেতে জঙ্গলের মধ্যে দেখতে পেলেন একটা ভারি সুন্দর দেবালয়। দুটো লোক ফিসফাস করছে মন্দিরের মধ্যে। নিশ্চয় গোপন মন্ত্রণা।

রাজা তাদেরকে একবার দেখলেন। কোনও কথা বললেন না। জঙ্গলে ঢুকে গেলেন।

অনেকদিন পর শিকার শেষ করে উজ্জয়িনীতে ফেরবার সময়ে সেই মন্দিরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ফের সেই দুটো লোককেই রাজা দেখতে পেলেন, একইভাবে চুপিসাড়ে কথা বলে চলেছে।

কোনও রাজার চর নাকি? সন্দেহ হয়েছিল রাজার।

মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে আতীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কে তোমরা? কীসের অভিসন্ধি চলছে এখানে?

চমকে উঠেছিল দুই ব্যক্তি। স্বয়ং অমরসিংহকে দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সিঁটিয়ে গেছিল।

রাজা বলেছিলেন, নির্ভয়ে বলো। শলাপরামর্শটা কীসের? মিথ্যে বললেই মরবে।

মিথ্যে কেন বলবো, হুজুর? বলেছিল এক ব্যক্তি, ব্যাপারটা এক রমণীরত্নকে নিয়ে।

মেয়েছেলেকে নিয়ে এত গভীর গোপন মন্ত্রণা! ব্যাপারটা তো জানতে হয়।

ধীরে ধীরে সব শুনেছিলেন রাজা। সমস্ত ব্যাপারটার মূল্যে রয়েছে এমনই এক কামিনী, যে নিজে রানি, তার রাজা স্বামী বর্তমান, তা সত্ত্বেও বিয়ে করতে চায় এক পরপুরুষকে, যেহেতু সেই পুরুষ তার প্রাণ রক্ষে করেছিল এই অরণ্য অঞ্চলে।

কী অদ্ভুত নারী চরিত্র!

ব্যাপারটা এই :

দুই ব্যক্তির একজন করভয় নামক এক ব্রাহ্মণের ছেলে। অগ্নিপুজো করে পাওয়া ছেলে। কিন্তু পাঁচ বছর বয়েসে বাবা আর মা মারা যাওয়ায় বদসঙ্গে পড়ে বখে যায়। একদিন তির ছোঁড়া অভ্যেস করার জন্যে জঙ্গলে এসে দেখেছিল, সামনে পেছনে সুন্দরী সঙ্গীনীদের নিয়ে গাড়ি চেপে যাচ্ছে এক অনিন্দ্য সুন্দরী কান্তা। তার রূপের আলোয় বন ঝলমল করছে। পুরুষ প্রহরীরা ঘিরে রয়েছে তাকে।

এমন সময়ে এক পাগলা হাতি তেড়ে আসতেই ভেগে পড়েছিল সব্বাই, সেই পরমাসুন্দরীকে একা ফেলে।

আচমকা বুনোহাতির রণমূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেছিল করভয়-পুত্র নিজেও। কিন্তু এক অসহায় রমণীকে বাঁচানোর প্রেরণায় অকস্মাৎ অবিশ্বাস্য সাহস এসে গেছিল মনের মধ্যে।

পাগলা হাতি যখন মাটি কাঁপিয়ে তেড়ে যাচ্ছে সুন্দরীর দিকে, করভয়-পুত্র তখন তেড়ে গেছিল হাতিকে লক্ষ্য করে। নতুন আপদকে সামনে দেখেই সুন্দরীকে ছেড়ে হাতি ধাওয়া করেছিল করভয়-পুত্রকে।

আর ঠিক তাই চাইছিল সহসা অসমসাহসিক করভয়-পুত্র। কিন্তু হাতির সঙ্গে লড়াই করা তো মূর্খতা। তাই সামনেই একটা বটগাছ আর বটগাছের একটা সুড়ঙ্গ দেখে সাঁৎ করে ঢুকে গেছিল সুড়ঙ্গের মধ্যে। সাঁই সাঁই করে যখন নেমে যাচ্ছে সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে, মত্ত হস্তী তখন দাঁত দিয়ে টুকরো টুকরো করছে বটগাছটাকেই।

সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে করভয়-পুত্র দেখেছিল প্রাণভয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে অনেকদূরে চলে গেছে সেই অনিন্দ্যসুন্দরী। রক্ষাকর্তাকে দেখেই কিন্তু দৌড়ে এসেছিল সামনে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল, আমাকে প্রাণে যখন বাঁচিয়েছেন, তখন আমি আপনার। আমাকে বিয়ে করুন।

এমন সময়ে শোনা গেছিল চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়ে আসছে অনেক সশস্ত্র লোক, তাদের সঙ্গে রয়েছে এই সুন্দরীর স্বামী।

দেখেই কয়েকটা মোহর করভয়-পুত্রের হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিল রূপসী, গা ঢাকা দিন। ফের দেখাহবে।

মুহূর্তের মধ্যে জঙ্গলে অন্তর্হিত হয়ে গেছিল করভয়-পুত্র। রমণীরত্ন স্বামীর সামনে দৌড়ে গিয়ে প্রাণে বেঁচে যাওয়ার গল্পটাই কেবল শুনিয়েছিল, কিন্তু কার অসমসাহসিকতার দৌলতে খ্যাপাহাতি তাকে ছেড়ে দিয়ে বটগাছ গুঁড়িয়েছে, তা আর বলেনি।

করভয়-পুত্র আশ্রয় নিয়েছিল এই দেব দেউলে। সেখানেই আলাপ ঘটে আর এক ব্যক্তির সঙ্গে, যে রয়েছে এখন তার সঙ্গে।

দিন কয়েক পরে অন্য এক রমণী এসেছিল সেই মন্দিরে। যে আসছে সেই সুন্দরী শ্রেষ্ঠার কাছ থেকে, তাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে করভয়-পুত্র। এসেছে দূতিয়ালি করতে। খবর-টবর নিয়ে বেরিয়ে গেল মন্দির থেকে।

একটু পরেই ফিরে এসেছিল দূতী, সঙ্গে পুরুষবেশী সেই রমণীরত্ন, যাকে হাতির খপ্পর থেকে বাঁচিয়েছে করভয়-পুত্র।

সে এসেই আছড়ে পড়েছিল রক্ষাকর্তার বুকে, সপ্রেম আলিঙ্গন এবং সহস্র চুম্বনে ভেসে গেছিল করভয়-পুত্র। আত্মহারা হয়েছিল কামতপ্ত কোমল শরীরের নিবিড় সংস্পর্শে। সম্ভোগ আকাঙ্ক্ষায় দুজনেই যখন অধীর, তখন করভয়-পুত্রের সঙ্গী পুরুষটিকে নারীবেশে সাজিয়ে দূতী বেরিয়ে গেছিল মন্দির থেকে।

কামনার অবসান ঘটিয়ে দুজনে বেরিয়ে এসেছিল মন্দির থেকে। পুরুষের ছদ্মবেশ ফের গায়ে চাপিয়েছিল সেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা। এখন যেন দুই পুরুষ চলেছে পাশাপাশি, গল্পে মশগুল হয়ে। আসলে চলেছিল প্রেমালাপ আর রসালাপ। দুদিন এইভাবে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটেছে দুজনে এবং আশ মিটিয়ে পরস্পরকে উপভোগ করেছে। তৃতীয় দিনে এসে পৌঁছেছিল উজ্জয়িনীতে।

করভয়-পুত্রের মন্দিরের সেই পুরুষ-সঙ্গী, যাকে নারীবেশে সাজিয়ে নিয়ে দূতী রওনা হয়েছিল বনপথে, সে-ও এসে যোগ দিয়েছিল তাদের সঙ্গে। জঙ্গলের নির্জনে রমণক্রিয়া করেছে তারাও।

আনন্দে মেতে গেছিল চারজনেই। দুই পুরুষ আর দুই নারী। নারী দুজনের স্বামী বর্তমান; পরপত্নী। কিন্তু পরকীয়া স্বাদের বৈচিত্র্য দাম্পত্য স্বাদের চেয়ে গভীরতর এবং পরম আনন্দময়।

অতএব বেশ কিছুদিন প্রেমপাত্রী দুই পরনারী বিভোর হয়ে রইল করভয়-পুত্র আর তার মন্দির-সঙ্গীর সঙ্গে। আশ মিটিয়ে আনন্দ করে নেওয়ার পর রমণীরত্ন (!) দুজনে ফিরে গেল স্বস্থানে, মন্দিরে বসে দুই পুরুষ হঠাৎ-পাওয়া আনন্দ-সম্ভারের আলোচনায় মেতে রইল নিরন্তর, এই আলোচনার শেষ নেই। কেননা নিয়মিত আসছে দুই পরনারী, রকমারি যৌন আসনে পরিতৃপ্ত করছে পরস্পরকে, তারপর স্বগৃহে ফিরে গিয়ে নিজ নিজ পতিদেবতাদের কাছ থেকেও ইন্ধন এনে শান্ত করছে কামানল। বাৎস্যায়ন কী সাধে বলেছেন, পুরুষের চেয়ে নারীর কামতৃষ্ণা আটগুণ বেশি।

এমতাবস্থায় দুই পুরুষকে মন্দির মধ্যে দেখে ফেলেছিলেন রাজা অমরসিংহ। ভেবেছিলেন, অন্য রাজার গুপ্তচর। এখন জানলেন, আসল ব্যাপার; গোপন প্রেমলীলা তো উচ্চকণ্ঠে পরস্পরকে বলা যায় না, তাই এত ফিসফাস। এত লুকোচুরি।

কিন্তু মিথ্যে তো এতটুকু বলেনি। এত স্পষ্ট কথায় কেউ কি বলে পরদারের সঙ্গে পারদারিক কাহিনি? এ যে অতিশয় গুপ্ত ব্যাপার। অথচ এই দুই ব্যক্তি সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে গেল তাদের কেলি-কথা।

সত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে দুজনে। সন্তুষ্ট হয়েছিলেন রাজা। সত্য কথা বলার জন্যে অর্থ পুরস্কারও দিয়েছিলেন।

সেই টাকা নিয়ে দুই বন্ধু তাদের দুই কামসঙ্গিনীকে নিয়ে পরমানন্দে দিনাতিপাত করে গেছিল উজ্জনিয়ীতে।

আখ্যায়িকায় উপসংহার টেনে রাজা কলিঙ্গদত্ত বলেছিলেন রানি তারাদত্তাকে, প্রাণেশ্বরী, সত্যের পথ চিরকালই প্রকৃত ধর্মের পথ। সত্যমার্গ আর ধর্মমার্গ এক আর অভিন্ন। যে সত্যবাদী, ঈশ্বর তার সহায়, ইহকাল পরকাল তার কাছে পুণ্যময়। আজ রাতে তুমি যে শুভস্বপ্ন দেখেছো, তা ইঙ্গিতবহ। অচিরেই তোমার গর্ভ প্রদীপ্ত হবে কোনও দেবলোক বাসিন্দার আত্মক্রীড়ায়।

২৮. সুলোচনা কাহিনি

কলিঙ্গদত্ত কিন্তু মুষড়ে পড়লেন রানির সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর। আকাঙ্ক্ষা ছিল পুত্র হবে, হয়েছে কন্যা। যদিও অপরূপা, কিন্তু পুত্র তো নয়। তিনি আর জানবেন কী করে যে অপ্সরা সুরভিদত্তা ইন্দ্রের শাপে জন্মেছে তাঁর কন্যা হয়ে।

একদিন এক ব্রাহ্মণ সাধুর কাছে আশাহত হওয়ার কথা ব্যক্ত করেছিলেন কলিঙ্গদত্ত।

সাধু বলেছিলেন, কী আশ্চর্য! কন্যাসন্তান কত কল্যাণ করে জানেন? একটা কাহিনি বলছি শুনুন।

চিত্রকূট পাহাড়ে এক সময়ে সুষেণ নামে এক রাজা থাকতেন। অত্যন্ত সুন্দর পুরুষ। বয়েসে যুবক।

একদিন, তিনি দীঘির ধারে একা একা বসেছিলেন। মণিমুক্তো দিয়ে বাঁধানো ঘাট। হীরকখচিত সিঁড়ি। এত রত্নের মধ্যে সেরা রত্ন কিন্তু রাজা চিত্রকূট।

কিন্তু তিনি বিষণ্ণ। কারণ তিনি একা। নেই উপযুক্ত সঙ্গিনী।

ঠিক এই সময়ে রম্ভা উড়ে যাচ্ছিল আকাশ দিয়ে। স্বর্গের প্রধানা অপ্সরাদের অন্যতমা রম্ভা, রাবণ যাকে দেখে কামমুগ্ধ হয়ে গায়ের জোরে ধর্ষণ করেছিলেন। যে রম্ভা জাবালি মুনির তপোভঙ্গ করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গম করে কন্যা ফলবতীর জন্ম দিয়েছিলেন।

সেই রম্ভা নিজেই নিদারুণ কামসিক্ত হয়েছিল শূন্যপথে অপূর্বসুন্দর সুষেণ রাজাকে দেখেই। সে অমরলোকের নগরবধূ, অথচ মর্ত্যলোকের মানুষ কামশিহরণ জাগিয়ে গেল তার অণুপরমাণুতে।

বারবণিতাদের ছলাকলার অভাব ঘটে না কস্মিন কালে। শূন্যপথেই রূপ পরিবর্তন করে নিয়েছিল রম্ভা।

মর্ত্যলোকের মানবী রূপ ধারণ করে শিঞ্জিত চরণে, লোচনে কামবিদ্যুতের ঝিলিক তুলে, হিল্লোলিত নিতম্ব আর প্রায় অনাবৃত রঞ্জিত পীবর বুকের সঞ্চালন ঘটিয়ে উপস্থিত হয়েছিল যুবকরাজার সামনে।

কোনও বীর্যবান পুরুষ এহেন মূর্তিময়ী কামকে দেখে স্থির থাকতে পারে না। আর এ মেয়ে তো মানবী রূপে স্বর্গের বেশ্যা।

কিন্তু মুখ দিয়ে বাক্য নিঃসরণও তো ঘটাতে পারছে না। ইচ্ছে যাচ্ছে আলাপ করার, কিন্তু রসনা যে অসাড়।

মুচকি হেসে নিজেই আলাপ জমিয়েছিল রম্ভা। প্রারম্ভিক আলাপ থেকে সমালাপ, প্রেমালাপ, রসালাপ, পরিশেষে সুরতালাপ এবং সুরত ক্রিয়া। মণিমাণিক্যময় ওই দীঘির ঘাটেই।

রম্বার মতো রমণী, যে কিনা নিরাসক্ত রমণে অদ্বিতীয়া, কাজ হাসিল করেই পলকে পলায়ন করতে অদ্বিতীয়া।

সেই রম্ভা নিরন্তর সুষেণ সম্ভোগের লালসার ইচ্ছায় থেকে গেল সেই উদ্যানেই এবং যথাসময়ে গর্ভবতী হয়ে দশ মাস পরে প্রসব করল যেন দ্বিতীয় রম্ভাকে, এতই রূপলাবণ্যময়ী সেই কন্যারত্ন।

রম্ভার ঘোর কেটে গেছিল অবশ্য তৎক্ষণাৎ। মানবী রূপ ত্যাগ করে ধারণ করেছিল অপ্সরারূপ। সুষেণ তো হতবাক।

মিষ্টবচনে বিস্তর চুম্বন বিনিময়ের পর বলেছিল রম্বা, প্রিয়তম, এই আমার অদৃষ্টলিপি কপালে লেখা ছিল একটা অভিশাপ। আমি রম্ভা, স্বর্গের অপ্সরা। শাপমুক্ত হলাম এই কন্যার জন্ম দিয়ে। বেশ্যাদের এর বেশি আকর্ষণ রাখতে নেই। সংসর্গের ফুল রইল আপনার কাছে।

বলেই বায়ুমার্গে বিলীন হয়ে গেছিল রম্ভা।

ভেঙে পড়েছিলেন রাজা সুষেণ। কিন্তু কন্যার মুখ চেয়ে সামলে রাখলেন নিজেকে। কন্যা তো নয়, যেন রূপের আগুন। যৌবন সমাগমে যেন রূপের দাবানল। বিশেষ করে তার চোখের দিকে একবার চাইলে আর চোখ ফেরানো যায় না, প্রথম রিপুজয়ী পুরুষও চঞ্চল হয়ে যেত তার লোচন-বিজুলি দেখলে। এই চোখ দেখেই তো রাজা সুষেণ তার নাম রেখেছিলেন সুলোচনা।

এহেন সুলোচনাকে দেখে মোহিত হল এক সুদর্শন ঋষিপুত্র। বিবাহ-কামনা জাগ্রত হল মনের মধ্যে।

মুনি পুত্রের নাম বৎস।

সুলোচনা সেই সময়ে সখীদের নিয়ে বাগানে বেড়াচ্ছিল। দূর থেকে দেখেই স্তব্ধ হয়েছিল মুণিপুত্রের পদযুগল। হাতের কমণ্ডলু খসে পড়ে আর কী!

বিয়ে করার সাধ প্রবল থেকে প্রবলতর হওয়ায় ধীর চরণে উদ্যানে প্রবেশ করেছিল বৎস। একে সন্ন্যাসী, তায় সুপুরুষ। ছুটে এসে প্রণাম জানিয়েছিল সুলোচনা। এবং প্রথম দর্শনেই প্রেমের সঞ্চার ঘটেছিল মনের পরতে পরতে। যাকে দেখে মুণিরও বিয়ের ইচ্ছে জেগেছে, সেই কন্যা নিজেই ছুটে এসে সকাম চোখে চেয়ে রয়েছে মুনির দিকেই!

এমতাবস্থায় আশীর্বাদটা হয়েছিল উভয়ের স্বার্থ বজায় রেখে।

প্রেমস্থরিত কণ্ঠে বলেছিল ঋষিতনয়, রাজকন্যা, মনের মতো স্বামী লাভ হোক অবিলম্বে।

আশীর্বচন উচ্চারিত হয়েছিল বাকযন্ত্রে, কামবিদ্যুৎ সঞ্চালিত হয়েছিল চক্ষুযন্ত্রে।

ইঙ্গিত বুঝে নিয়ে সরম ত্যাগ করে বলেছিল সুলোচনা, ঠাট্টা করছেন না তো?

মুনিতনয় অতিশয় গম্ভীর হয়ে বলেছিল, আমার কথা মিথ্যে হবার নয়।

সুলোচনা আর কী দেরি করে? চৌষট্টি কলাবিদ্যার শিক্ষিতা সে। তাই কালবিলম্ব না করে বলেছিল তৎক্ষণাৎ, তাহলে আমার পাণিপীড়ন করুন।

কিন্তু গান্ধর্ব মতে গলায় মালা দিয়েই সহবাস সমীচীন নয় মনে করেছিল মুনিকুমার। হোক রাজকন্যা, কিন্তু বংশপরিচয় তো জানা দরকার। দীর্ঘ তপস্যার দৌলতে সে নিজেও যে বিলক্ষণ শক্তিময়। যততত্র শক্তির আধারকে নিক্ষেপ করা যায় না।

সুলোচনার সঙ্গে গেল রাজা সুষেণের সামনে, আশ্চর্য রূপবান যে মানুষটাকে দেখে রম্ভার মতো রূপসীও নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি।

তাদের সম্মিলনে এসেছে এই সুলোচনা, যেন এক শরীরী বিদ্যুৎ।

সুরসুন্দরীর সঙ্গে সহবাসের ফলে সুলোচনার জন্মকাহিনী বিবৃত করেছিলেন রাজা সুষেণ। মেয়ের জন্ম দিয়েই চম্পট দিয়েছে রম্ভা, কিন্তু সুষেণ যে আজও তাকে চান। রম্ভা তাঁর মধ্যে যে রমণতৃষ্ণা জাগ্রত করেগেছে, সেই অনল নিভানোর ক্ষমতা কোনও মানবীর নেই। তাই নিজেকে আজও নির্লিপ্ত রেখে দিয়েছিল সুষেণ। যে প্রকার রতি নির্মন্থন রম্ভার কাছে পেয়েছেন, তা কোনও মানবী বধূ অথবা নগরবধূর কাছে আশা করা যায় না।

কিন্তু যদি মুনিতনয় তার তপস্যার শক্তি প্রয়োগ করে সুরসুন্দরী রম্ভাকে ফের সুষেণের শয্যাসঙ্গিনী করে দিতে পারে, তাহলে সুলোচনাকে দিয়ে মুনিপুত্র স্বচ্ছন্দে তার রমণীক্ষুধা মিটাতে পারে।

সোজা কথায়, মেয়ের মাকে এনে দাও। মেয়েকে নিয়ে যাও, অপূর্ব এই শর্ত শুনে তিলমাত্র বিচলিত না হয়ে মুনিপুত্র বলেছিল, তাই হবে। শাশুড়িকে এনে দেব আপনার কোলে। তার আগে আমার কোলে দিন আপনার মেয়েকে।

হয়ে গেল বিয়ে। নিজেকে উজাড় করে দিল সুলোচনা, প্রতিটি লোমকূপের কামবহ্নির মুহূর্মুহু প্রশমন ঘটিয়ে নিল প্রতি-অগ্নিস্বরূপ মুনিকুমারকে দিয়ে।

পরিতৃপ্ত জামাই কথা রেখেছিল। শাশুড়িকে শ্বশুরের কাছে না এনে শ্বশুরকেই যোগবলে সশরীরে স্বর্গে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সুরলোকে চলুক তাদের রতিমন্থন। অনন্তযৌবনা বেশ্যা রম্ভাকে বিশ্বাস নেই। মর্ত্যলোকে থাকলে জামাইকেও টলিয়ে দিতে কতক্ষণ!

বুদ্ধিটা সুলোচনার। নির্ঝঞ্ঝাটে নিরন্তর সুরতক্রিয়ার পরিকল্পনা!

কাহিনি শেষ করে রাজা কলিঙ্গদত্তকে বলেছিলেন ব্রাহ্মণ সাধু, তাহলেই দেখুন, কন্যাও কাজে লাগে। আর আপনার কন্যা নিশ্চয় দেবলোক থেকে শাপ খেয়ে খসে পড়ে আশ্রয় নিয়েছিল আপনার মহিষীর গর্ভে, স্বপ্নে তাই তিনি দেখেছিলেন আকাশ থেকে জ্যোতি নেমে এসে প্রবেশ করছে উদরে। রাজা, এই কন্যা অবশ্যই দেবলোকবাসিন্দা ছিল এক সময়ে, সে আপনার উপকারই করবে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

শুনে পুলকিত হলেন রাজা কলিঙ্গদত্ত। মেয়ের নাম রাখলেন কলিঙ্গসেনা।

অনন্ত যৌবনার কন্যার যৌবন যখন সমুপস্থিত হয়েছিল, তখন স্তম্ভিত হতে হয়েছিল সবাইকেই। তুলনাবিহীন এহেন রূপরাশি যে কোনও মর্ত্যকন্যার শ্রীঅঙ্গে কখনও দেখা যায়নি। বরতনু ব্যেপে এ যে যৌবন জলতরঙ্গ।

সুন্দরীদের ললাটে বিচিত্র ঘটনা সন্নিবেশ যেন একটু বেশি করে ঘটে। তা না হলে ময়দানবের মেয়ে সোমপ্রভার সঙ্গে কলিঙ্গসেনার হঠাৎ গলায় গলায় ভাব হয়ে যাবে কেন?

পৌরাণিক অভিধানে আছে ময়দানবের একটিই মেয়ে, মন্দোদরী, যার সঙ্গে বিয়ে হয় রাবণের, কিন্তু কথাসরিৎসাগরে বলা হচ্ছে ময়দানবের দুই মেয়ে, সোমপ্রভা আর স্বয়ংপ্রভা।

আলাপটা ঘটল এইভাবে। সোমপ্রভা আকাশ দিয়ে সাঁ-সাঁ করে উড়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখেছিল নীচের এক রাজপ্রাসাদের ছাদ আলো হয়ে এক অতিশয় রূপবতী একললনার রূপের ছটায়। তার সখীরাও এক-একজন রূপের খনি বিশেষ। হৈ-হুল্লোড় করছে ছাদময়। কিন্তু একজনের লাবণ্য ছাড়িয়ে গেছে আর সবাইকে, যাকে দেখেই আকাশ পথে থমকে গেছিল সোমপ্রভা।

স্বর্গলোকের বাসিন্দা নাকি? এমন মেয়ের সঙ্গে ভাব না করলেই নয়। দেখেই যখন মন টানছে, তখন মনে হয় আগের জন্মে নিশ্চয় ছিল আমার বান্ধবী।

টুক করে নীচে নেমে এসেছিল সোমপ্রভা, নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে, তাই কেউ দেখতে পায়নি গগন থেকে তার অবতরণ।

তারপর হেলেদুলে সর্ব অঙ্গে দ্যুতি রূপের বিকিরণ করে গিয়ে দাঁড়াল কলিঙ্গসেনার সামনে।

দেখেই তো চোখের পাতা ফেলতেও ভুলে গেছিল কলিঙ্গসেনা। তার নিজের জন্ম সুরসুন্দরীর গর্ভে। কিন্তু এই মেয়েটি যে রূপের বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে চলেছে প্রতি পদক্ষেপে।

মানুষের মেয়ে কি এত রূপবতী হয়? দ্বন্দ্বে পড়েছিল কলিঙ্গসেনা।

জিজ্ঞেসও করেছিল, ওগো সুন্দরী, কে তুমি? কী তোমার পরিচয়?

সোমপ্রভা হাসির ছটায় ভুবন আলো করে দিয়ে বলেছিল, যথাসময়ে জানবে। এখন তো ভাব করা যাক। একটা গল্প বলবো, শুনবে?

গল্প শুনতে কে না চায়। আনন্দে নেচে উঠে কলিঙ্গসেনা বললে, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

সোমপ্রভা বললে, তার আগে বলো, কী তোমার নাম?

আমি রাজকন্যা কলিঙ্গসেনা।

রাজকন্যা! তাহলে তোমার ভাব হবে রাজপুত্রদের সঙ্গেই।

তা তো হবেই।

বিশেষ করে যখন এত রূপসী। তবে কী জানো কলিঙ্গসেনা, রাজপুত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্ব টেঁকে না। বড্ড দেমাকি হয়তো। একটুতেই রেগে যায়। এবার শোনো সেই গল্প।

পুষ্করাবতী নামে একটা নগর ছিল পুরাকালে। সেখানকার রাজার নাম ছিল গূঢ়সেন। তাঁর একটাই ছেলে, মেয়ে ছিল না। এক সন্তান বলেই বেশি আদর পেয়েছে। কড়া কথা কখনও শোনেনি. অন্যায় করলেও বকুনি খায়নি। আলালের ঘুরের দুলালের যথাসময়ে একজন বন্ধু জুটেছিল। বণিকের ছেলে। হরিহরাত্মা হয়ে গেছিল দুজনে। কেউ কাউকে চোখের আড়লে করতে পারত না।

ছেলের বিয়ের বয়স হতেই পাত্রী নির্বাচন করে ফেলেছিলেন রাজা গূঢ়সেন। অনেকদূরের অহিচ্ছত্র নগরের রাজকন্যা। বিশাল বরযাত্রী বাহিনী নিয়ে রওনা হয়েছিল রাজপুত্র। প্রাণের বন্ধু বণিকপুত্রও রইল সঙ্গে।

ইক্ষুমতী নদীর তীরে পৌঁছোতে পৌঁছোতেই সন্ধ্যে হয়ে গেছিল। সৈন্যসামন্ত শিবির ফেলেছিল সেইখানেই। দুই বন্ধু মদ খেতে বসেছিল তখন থেকেই। জমিয়ে গল্প বলছিল রাজপুত্র মদে চুমুক দিতে দিতে। কিন্তু নেশা জমে উঠতেই বন্ধ হল গল্প। বেহুশ হয়ে রাজপুত্র ঘুমিয়ে পড়লেও জেগে রইল বণিকপুত্র বন্ধু।

বন্ধুকৃত্য করে গেল তার পরেই।

আকাশ পথে ভ্রমণে বেরিয়েছিল কয়েকজন বিদ্যাধরী দেবযোনি। রাজপুত্রের জমাটি গল্প শুনছিল আকাশে দাঁড়িয়ে। গল্প শেষ না করে রাজপুত্র ঘুমিয়ে পড়তেই তারা গেল খেপে। গল্প এমনই জিনিস। শুরুতে জমে গেলে শেষ শোনা চাই। নইলে মেজাজ যায় খিঁচড়ে।

বিদ্যাধরীরাও ক্ষিপ্ত হয়ে গেছিল এই কারণে। আকাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে যাওয়ার পর শেষটুকু শুনতে দিল না যে রাজপুত্র, তাকে অভিশাপ দেওয়া যাক।

চার বিদ্যাধরী তখন মনের ঝাল ঝেড়ে গেল চার অভিসম্পাত দিয়ে।

এক : কাল সকালে রাস্তায় বেরিয়ে একগাছা সোনার হার দেখতে পাবে এই রাজপুত্র। হাতে তুলে নিলেই তক্ষুনি মরবে। মরুক, মরুক, মরুক!

দুই : যদি প্রথম শাপ পাশ কাটিয়ে যায় নচ্ছার এই রাজপুত্র, তাহলে সামনে দেখতে পাবে ফলভর্তি একটা আমগাছ। পাকা আম মুখে দিলেই মরবে তৎক্ষণাৎ। মরুক! মরুক! মরুক!

তিন : প্রথম দুটো শাপ যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে বিয়ের পর বউকে নিয়ে যখন ফুলশয্যা করতে ঢুকবে পাজির পা ঝাড়া এই রাজপুত্র, তখনই হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো করে হাঁচবে একশোবার। প্রতিটা হাঁচির সময়ে কেউ যদি 'জীব জীব' না বলে, তাহলে বদমাসটা অক্কা পাবে নতুন বউয়ের সামনেই মরুক। মরুক! মরুক!

চার : এই তিন তিনটে শাপের কথা কেউ যদি আগে ভাগে বলে দেয় কুচুটে এই রাজপুত্রকে, তাহলেও তক্ষুনি পরলোক যাত্রা করবে বেল্লিকটা। মরুক! মরুক! মরুক!

শাপ-শাপান্ত করে শান্ত হয়ে নিজলোকে প্রস্থান করেছিল চার রগচটা বিদ্যাধরী। জাগ্রত অবস্থায় ছিল বলে প্রতিটি শাপবৃত্তান্ত কর্ণগোচর হয়েছিল বণিকপুত্রের।

বাকি রাতটা তাই কেটে গেল বিনিদ্র অবস্থায়। সূর্য উঠতেই হই-হই করে বেরিয়ে পড়েছিল রাজপুত্র, বণিকপুত্র রয়েছে ঠিক পেছনে।

পথে দেখা গেছিল একটা চকচকে সোনার হার। রোদ ঠিকরে যাচ্ছে গা থেকে। দেখেই যেই তুলে নিতে যাচ্ছে রাজপুত্র, পেছন থেকে টেনে ধরেছিল বণিকপুত্র, নিও না, নিও না ওই সোনার হার। ওযে আকাশিক প্রবঞ্চনা। অলীক মায়া। সত্যিই যদি ওটা আগে থেকেই রাস্তায় পড়ে থাকত, আগে যারা গেছে, তাদের চোখে পড়েনি কেন?

অকাট্য যুক্তি। সোনার হার স্পর্শ না করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল রাজপুত্র।

ব্যর্থ হল প্রথম শাপ।

কিন্তু একটু এগোতে না এগোতেই সামনে দেখা গেল একটা ফলভর্তি আমগাছ। খাসা আম, পেকে টুস টুস করছে। রসিয়ে উঠেছিল রাজপুত্রের জিভ। লম্ফ দিয়ে আম পাড়তে যেতেই পেছন থেকে টেনে ধরেছিল বণিকপুত্র, ছুঁইয়ো না, ছুঁইয়ো না বন্ধু, ও যে অলীক মায়া। অসময়ের আম। অমঙ্গল ঘটবেই।

তর্ক না করে তৎক্ষণাৎ আমগাছ পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেছিল রাজপুত্র।

ব্যর্থ হয়েছিল দ্বিতীয় অভিশাপ। সেইসঙ্গে আরও একটা অভিশাপ। কেন না, কোনও অভিশাপের কথাই আগেভাগে রাজপুত্রকে বলেনি তো বণিকপুত্র।

এবার তাহলে চতুর্থ অভিশাপের পালা এবং খুবই কঠিন জায়গায়। ফুলশয্যার ঘরে ঢুকেই স্ত্রী সহবাসের আগে হাঁচি শুরু হবে রাজপুত্রের। গুনে গুনে একশোবার 'জীব জীব' বলে যেতে হবে বণিকপুত্রকে।

এবং, রাজপুত্রকে না জানিয়ে। ফুলশয্যার ঘরে লুকিয়ে থাকা তো বরদাস্ত করবে না। যা বদরাগী।

কিন্তু উপায় নেই। সে ঝুঁকিও নিতে হল বণিকপুত্রকে। লুকিয়ে রইল খাটের তলায়। নতুন বউকে নিয়ে ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিয়ে আদর ভালোবাসা শুরু করার আগেই শুরু হলো হাঁচি।

হ্যাঁচ্চো ....হ্যাঁচ্চো...হ্যাঁচ্চো......

ঠিক একশোবার!

ঘাটের তলায় থেকে বণিকপুত্রও একশোবার 'জীব জীব' আউড়ে কাটান করে দিল অভিশাপ।

এরপর তো আর খাটের তলায় লুকিয়ে থাকা সমীচীন নয়। সেটা অতিশয় বিবেকহীন কাজ।

তাই ঘর অন্ধকার হতেই যেই চুপিসাড়ে খিল খুলে বেরোতে যাচ্ছে বণিকপুত্র, রাজপুত্রের চোখ পড়ে গেল সেদিকে।

রেগে কাঁই হয়েছিল তৎক্ষণাৎ। হাঁকডাক দিয়ে লোকজন সেপাই শাস্ত্রী জড়ো করে হুকুম দিল কড়া, যাও, কারাগারে রাখো সারারাত। সকালেই কাটবে গলা!

বাঙনিষ্পত্তি না করে কারাগারেই গেছিল বণিকপুত্র। কিন্তু সকালে গোঁ ধরেছিল শান্ত্রীদের কাছে, একবারটি নিয়ে চলো রাজপুত্রের কাছে। তার সঙ্গে কথা বলে নিই। তারপর কেটো আমার মাথা।

শান্ত্রীদের কথা শুনে রাজপুত্র বললেন, বেশ তো, শেষ কথা বলে নিক বন্ধুর সঙ্গে।

প্রিয় বন্ধুর কাছে গিয়ে অতি অপ্রিয় চার-চারখানা শাপ-বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিল বণিকপুত্র। আগে তো বলেনি, এখন বলছে, ভয়টা কীসের?

শুনে তো মাথা হেঁট রাজপুত্রের। এমন বন্ধু যে বিরল। রাগের মাথায় এরই মাথা নিতে বলেছিল সে গত রাতে!

গল্পবাজ সোমপ্রভা গল্প শেষ করার পর বলেছিল, রাজপুত্রেরা এই রকমই হয়। হরিহরাত্মা বন্ধুর প্রাণ হরণ করতে দ্বিধা করে না ঝাঁ করে রেগে গিয়ে। সুরা এদের স্নায়ুকে অপ্রকৃতিস্থ করে তোলে। সখি গো, তাই বলি, রাজপুত্রদের সঙ্গে ভাব জমাতে যেও না।

কলিঙ্গসেনা বললে, যার কথা বললে, সে তো দেখছি নামেই রাজার ছেলে, চরিত্রে পিশাচ প্রকৃতির। আজ পর্যন্ত কোনও রাজার ছেলের সঙ্গে যখন ঢলাঢলি করিনি, তখন বলতে পারব না তারা আদৌ কি রকম। তবে হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে তো বন্ধুত্ব হয়ে গেল। প্রাণের বন্ধুত্ব।

খুশি হয়ে সোমপ্রভা বললে, তাহলে এখন আসি, ফের দেখা হবে।

বলেই, ২৯খুশির চোটে সাঁ করে উড়ে গেছিল আকাশে।

দেখেই তো কলিঙ্গসেনার চক্ষু চড়কগাছ! দেবী নাকি? মর্ত্যের মেয়ে তো এমনভাবে অক্লেশে নিমেষে গগন বিহারিনী হতে পারে না?

মনে পড়ে গেছিল সিদ্ধাঙ্গনা অরুন্ধতী কাহিনি। দেবলোক থেকে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়েছিল মর্ত্যবালা পৃথুরাজদুহিতার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্যে। পরিণামটা হয়েছিল মঙ্গল কারক। সুরভিকে স্বর্গ থেকে আনিয়েছিলেন রাজা পৃথু। তার দুধ খেয়ে নিজেই চলে গেছিলেন স্বর্গে।

২৯. কলিঙ্গসেনা কাহিনি

পরের দিন অনেক পুষ্প নিয়ে আকাশ থেকে ফের নেমে এল সোমপ্রভা। ময়দানব কন্যা সোমপ্রভা। বহুবিধ মায়াবিদ্যায় যে অতিশয় নিপুণা।

কলিঙ্গসেনার গাল টিপে দিতেই কলিঙ্গসেনা বলেছিল, সখি হে, মনে হচ্ছে আগের জন্মে নিশ্চয় আমরা প্রাণের বন্ধু ছিলাম। তোমার কী মনে হয়?

সোমপ্রভা বললে, মনে তো হচ্ছে তাই। নইলে পলক দর্শনেই পরস্পরের প্রাণপ্রিয় হলাম কী করে? তবে তাই, আমি তো জাতিস্মর নই। আগের জন্মের কথা বলতে পারব না।

কলিঙ্গসেনা তখন জানতে চেয়েছিল, সোমপ্রভার পিতার নাম, কোন বংশে তার জন্ম, আর হাতে রয়েছে কেন ফুলের সাজি।

তখন আত্মপরিচয় দিয়েছিল সোমপ্রভা। বলেছিল : সখি, আমি দানব কন্যা। ময়দানব আমার বাবা। দানবত্ব ত্যাগ করে বিষ্ণুর সাধনা যখন করছিলেন, তখন দানবদের উৎপাত এড়ানোর জন্যে বিন্ধ্য পাহাড়ের গহন অঞ্চলে একটা মায়াদুর্গ বানিয়ে নিয়েছিলেন। ইচ্ছে করলেই সেখানে ঢোকা যায় না। আমি সেখানেই থাকি আমার আর এক বোনের সঙ্গে। তার নাম স্বয়ংপ্রভা। আমার দিদি। সে বিয়ে-যা করেনি, করবেও না। আমার নাম সোমপ্রভা। আমার বিয়ে দেওয়া হয়েছে কুবেরের ছেলে নলকুবেরের সঙ্গে। আর এই যে ফুলের সাজি দেখছো, এর মধ্যে আছে অনেক রকমের মায়াযন্ত্র। ইন্দ্রজাল রচনা করার যন্ত্র। ভেলকি দেখানোর কলকবজা। তোমাকে দেখানোর জন্যে এনেছি।

বলে, সাজি থেকে নানারকম মজার মজার খেলনা বের করতে লাগল সোমপ্রভা। দেখে তো হতবাক কলিঙ্গসেনা।

এবার আকাশ বিমানে চেপে এসেছিল ময়দানব-কন্যা সোমপ্রভা। চলেও গেল বিমানে চেপে। যাবার সময় কলিঙ্গসেনার কাছে রেখে দিয়ে গেল অদ্ভুত যন্তর মন্তর বোঝাই টুকরিখানা।

পরমানন্দে বিচিত্র সেই সব খেলনা নিয়ে দিনরাত মেতে রইল কলিঙ্গসেনা। যথাসময়ে স্নানাহারের কথা পর্যন্ত মনে রইল না। মা তারাদত্তা ভাবলেন বুঝি কঠিন রোগ হয়েছে মেয়ের। বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে বললে, শরীরে ব্যাধি নেই। তবে মনে খুব আনন্দ। আনন্দের চোটে খাওয়া দাওয়া ছেড়েছে।

পরের দিন আকাশ থেকে নেমে এসে সোমপ্রভা বললে কলিঙ্গ সেনাকে, আমার স্বামী তো তোমার কথা শুনে বড়ো উৎসুক হয়েছেন তোমাকে দেখবার জন্যে। চলো যাই তোমার বাবা-মায়ের কাছে। তাঁদের অনুমতি নেওয়া যাক।

তৎক্ষণাৎ রাজা কলিঙ্গদত্ত আর রানি তারাদত্তার সামনে ময়দানব কন্যাকে নিয়ে গেছিল কলিঙ্গসেনা। সোমপ্রভার আশ্চর্য রূপের বহর দেখে তো হতবাক রাজা আর রানি। ভাষা দিয়ে সেই সৌন্দর্যের বর্ণনা দেওয়া যায় না। তাঁরা খুশি হলেন। কলিঙ্গসেনার উপযুক্ত বান্ধবী যখন পাওয়া গেছে, তখন যেখানে মন চায় সেখানে যাক দুজনে।

দুজনে গেল বাগানে বেড়াতে। সোমপ্রভা সেইখানেই দেখিয়ে দিল এক পরমাশ্চর্য ভেলকি। টুকরির মধ্যে থেকে বের করল এক যক্ষকে হুকুমের দাস যক্ষ। সোনার পদ্ম আনার হুকুম হল তার ওপর। চকিতে শূন্যে উড়ে গেল যক্ষ। ফিরে এল একটু পরেই, একগাদা সোনার পদ্ম নিয়ে।

বাগানের দেবদেউলে গিয়ে সেই স্বর্ণকমল দিয়ে পুজোয় বসে গেল সোমপ্রভা।

খবর পেয়ে দৌড়ে গেছিলেন রাজা আর রানি। সোমপ্রভার কাছে গিয়ে জানতে চেয়েছিলেন ময়দানব রচিত অত্যাশ্চর্য মায়াসৃষ্টির কলকবজার বিবরণ।

সোমপ্রভা বলেছিল, বাবা তো আমাকে খানকয়েক যন্ত্রবিদ্যা শিখিয়েছে। একটা দিয়ে বাড়ির সব দরজা বন্ধ করে দেওয়া যায়, কেউ খুলতে পারবে না। আর একটা দিয়ে মড়াকে জ্যান্ত করা যায়। তৃতীয়টা থেকে অনবরত আগুন ছিটকে বেরোয়। চতুর্থ মায়াযন্ত্র যেখানে খুশি আমাকে নিয়ে যেতে পারে। পঞ্চমটার দৌলতে বহুদূরের যে-কোনও লোকের সঙ্গে কথা বলা যায়।

যন্ত্র-বিবরণ শুনে বিমূঢ় রাজদম্পতি প্রত্যাবর্তন করলেন স্বগৃহে। এমন সব অলৌকিক কলকবজার যার হস্তগত, আদরের মেয়েকে তার হাতে নিশ্চিন্ত মনে ছেড়ে দেওয়া যায়।

সেই সুযোগে বান্ধবী কলিঙ্গসেনাকে নিয়ে আকাশে উড়ে গেল সোমপ্রভা। এত ওপর থেকে ভূতল-দৃশ্য যে এত মনোহর হয়, তা জানা ছিল না কলিঙ্গসেনার। মোহিত অবস্থায় অবিলম্বে পৌঁছে গেছিল বিন্ধ্যাচলে, ময়দানবের ইন্দ্রজাল ভবনে। সেখানে গিয়েই আগে বড়দি স্বয়ংপ্রভার সঙ্গে কলিঙ্গসেনার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল সোমপ্রভার। তারপর প্রাণের বান্ধবীকে নিয়ে উদ্যান বিহারে বেরিয়েছিল।

বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ বলেছিল সোমপ্রভা, সখি, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার সঙ্গে আমার এই প্রাণের সম্পর্ক বেশিদিন টিকবে না। টিকবে তোমার বিয়ের আগে পর্যন্ত। তাই বলি, বিয়ে করবে দেখেশুনে, হঠ করে নয়। শোনো তাহলে কীর্তিসেনার গল্প।

কীর্তিসেনার বাবা ছিলেন ধনী বণিক। নিবাস পাটলিপুত্র নগরে। কীর্তিসেনা তাঁর একমাত্র সন্তান। প্রকৃতই রূপের রানি।

এমন মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে অনেক ভাবতে হয়। ধনপালিত বণিকও অনেক খোঁজ খবর নিয়ে মেয়ের বিয়ে দিলেন যে বণিকপুত্রের সঙ্গে, তার নাম দেবসেন। নিবাস মগধে। বাবাকে হারিয়েছিল ছেলেবেলায়।

মায়ের চরিত্র নষ্ট হতে থাকে তখন থেকেই।

অথচ দেবসেনা ছিল অতিশয় সৎ চরিত্রের পুরুষ। এমন স্বামীর সংস্পর্শে থাকলে স্ত্রী-র চরিত্রও নিষ্কলঙ্ক থাকে। কীর্তিসেনাও ছিল সত্যিই সতী। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।

শাশুড়ির তা সহ্য হত না। নিরন্তর নানাবিধ অত্যাচার চলত কীর্তিসেনার ওপর। মুখ বুজে সয়ে যেত সে। প্রতিবাদ তো করতই না, স্বামীর কাছেও কিছু বলত না। শাশুড়ির নিন্দে সবাই করে, কীর্তিসেনা মুখ খুললে তা আরও বাড়বে, তাই বোবা হয়ে থাকাই মনস্থ করেছিল কীর্তিসেনা। যে সয়, সে রয়।

একদিন কিন্তু মুখ খুলতেই হল, স্বামী যেদিন বল্লভীনগরে ব্যবসা করতে যাবে বলে তোড়জোড় করছে, সেই দিন।

মৃদুস্বরে বলেছিল কীর্তিসেনা, এতদিন বলিনি তোমাকে, কাছে ছিলে বলে। এখন যাচ্ছ দূর দেশে। তুমি না থাকলে আমাকে আরও যন্ত্রণা দেবেন আমার শাশুড়ি।

শুনে মন খারাপ হয়ে গেছিল দেবসেনার। সে চরিত্রবান, কিন্তু মা দুশ্চরিত্রা। ছেলে হয়ে তা নিয়ে কথা বলতে পারেনি। এখন যখন শুনল, বধূর ওপরে চলছে পীড়ন, মুখ বুজে থাকাই শ্রেয় মনে করল।

মাকে বললে, মা, আজ যাচ্ছি বল্লভীনগরে। দেখো, যেন তোমার বৌমার কোনও কষ্ট না হয়।

কীর্তিসেনাও তখন দাঁড়িয়েছিল স্বামীর পেছনে। দুজনকে একসঙ্গে দেখেই সুর পালটে নিয়ে বলেছিল শাশুড়ি, কেন কষ্ট হবে? আমি যখন রয়েছি, গায়ে আঁচ লাগতে দেব না।

কিন্তু স্বমূর্তি ধরেছিল শাশুড়ি ছেলে চলে যেতেই। গালিগালাজ তো বটেই, উত্তম মধ্যম মারধরও শুরু হয়ে গেল। তাতেও আক্রোশ মিটল না। বাড়ির ঝি-কে দিয়ে একদিন বেদম পেটাল বৌমাকে। মারের চোটে অজ্ঞান হয়ে গেছিল কীর্তিসেনা। হৃদয়হীনা শাশুড়ি ওই অবস্থাতেই বেচারাকে আটকে রেখে দিল একটা বন্ধ ঘরে।

এহেন নরক যন্ত্রণা দিয়ে সুখ কিন্তু উথলে উঠেছিল শাশুড়ির বুকের মধ্যে। তার মতলব, এই তো সুযোগ, ছেলে এখন বিদেশে, এই ফাঁকে না খাইয়ে মেরে ফেলা যাক বউটাকে। তারপর পুড়িয়ে দিলেই আপদ বিদায় হবে। ছেলে বাড়ি ফিরলে বলা হবে, বউ মরেছে রোগে। তখন আর একটা বিয়ে দেওয়া যাবে।

অন্ধকার ঘরে কেঁদে কেটে একসা করেছে কীর্তিসেনা, প্রহারে অনাহারে মৃতপ্রায় হয়েছে, কিন্তু শাশুড়ির মন গলেনি, বরং আনন্দে নেচে নেচে বেরিয়েছে আর নানারকম পাপকাজ মনের আনন্দে করে গেছে।

তারপর একটু দয়া করেছিল অবশ্য। সারাদিনে সামান্য খাবার ঘরের মধ্যে ফেলে দিত।

এত যন্ত্রণা এত অত্যাচারের মধ্যে কীর্তিসেনা তো মানুষ হয়নি, অমানুষিক এই পীড়ন কতদিন আর সইবে? ঠিক করল। এইভাবে তিলে তিলে মরার চাইতে পালানো যাক। কিন্তু বাবার কাছে নয়, যাবে সে স্বামীর কাছে, বল্লভীপুরে।

এই বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল পায়ে একটা শাবল ঠেকতেই। অন্ধকার ঘরে পড়েছিল মেঝের এক কোণে, অন্যান্য বাজে জিনিসের সঙ্গে। রোজ একটু একটু করে মেঝে খুঁড়ে, সুড়ঙ্গ বানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছিল কীর্তিসেনা। কী ভাগ্যিস গায়ের সব গয়না কেড়ে নেয়নি বদমাস শাশুড়ি। সব গয়না গা থেকে খুলে আঁচলে পুঁটলি বেঁধে নিল। ঘরের মধ্যে পেয়েছিল স্বামীর ফেলে দেওয়া পোশাক। সেই পোশাক পরতেই রূপের দৌলতে তাকে মনে হয়েছিল যেন এক রাজপুত্র। সারারাত হাঁটবার পর দেখেছিল একটা গয়নার দোকান। একটা গয়না সেখানে বেচে, কিছু টাকা নিজের কাছে রেখে, বাকি টাকা দোকানদারকে দিয়ে তার ঘরেই আশ্রয় নিয়েছিল সেদিনের মতো। পরের দিন খবর নিয়ে জেনেছিল, বল্লভীপুর রওনা হচ্ছেন একজন বণিক। তাঁর নাম সমুদ্রসেন। কীর্তিসেনা তাঁর কাছে রাজপুত্র বেশে গিয়ে, রাজপুত্র পরিচয় দিয়ে, তাঁর সঙ্গে বল্লভীপুর যেতে চেয়েছিল। তার চেহারা দেখে আর কথা শুনে রাজি হয়ে গেছিলেন সমুদ্রসেন। একজন রাজপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া তো ভাগ্যের কথা।

অনেক দামি দামি জিনিস নিয়ে যাচ্ছিলেন বলে সমুদ্রসেন ঘুরপথে গিয়ে সময় নষ্ট না করে একটা জঙ্গলের পথে রওনা হয়েছিলে, যাতে কম হেঁটেই বল্লভীপুর পৌঁছোনো যায়। সঙ্গে ছিল আরও বণিকের দলবল।

কিন্তু জঙ্গল পেরিয়ে যাওয়ার আগেই সূর্য পাটে বসতেই নিবিড় অন্ধকারে আর তো পথ চলা যায় না জঙ্গলে।

ডাকাতের ভয় দেখা দিল তখনই।

বণিকদের সঙ্গে না হয় অস্ত্রশস্ত্র সেপাই শান্ত্রী আছে, কিন্তু রমণী হয়ে কীর্তিসেনা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ডাকাতদের সঙ্গে লড়বে কী করে? তাছাড়া, রাজপুত্রের পোশাকের আড়ালে যে তো যুবতী। মারপিটের সময়ে তার নারীচিহ্ন প্রকাশ পাবেই। সতীত্বও যাবে।

তার চাইতে বরং চম্পট দেওয়া যাক।

অন্ধকারে গা ঢেকে সরে পড়েছিল কীর্তিসেনা। একটা মস্ত গাছের গুঁড়ির গায়ে বড়ো কোটর দেখে তার মধ্যে গুটিসুটি মেরে বসেছিল, ঝরা পাতা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল কোটরের মুখ। অরণ্যের নৈশব্দ ভেঙে গেছিল অকস্মাৎ। দলে দলে ডাকাত হুহুংকারে বন কাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বণিকদের শিবিরে। নিমেষে তছনছ করে ফেলেছিল সশস্ত্র রক্ষা-ব্যবস্থা। নিহত হয়েছিল প্রায় সকলেই, দু-একজন ছাড়া, যারা পালিয়ে

বেঁচেছিল। লুঠ হয়ে গেছিল সমস্ত বণিক সম্পদ। চারিদিকে তখন রক্ত, রক্ত আর রক্ত; আর, কাটা হাত-পা-মুণ্ড।

ভোর হতেই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোটর থেকে বেরিয়ে এসেছিল কীর্তিসেনা। দৈব কৃপায় দেখা হয়ে গেছিল এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। কীর্তিসেনাকে তিনি বল্লভীপুরের পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

সন্ন্যাসী তো চলে গেলেন, একা-একা দুরুদুরু বক্ষে অরণ্য অতিক্রম করতে গিয়ে রাত করে ফেলেছিল কীর্তিসেনা। ফের আশ্রয় নিয়েছিল এক বৃক্ষ-কোটরে।

নরমাংসভুক রাক্ষসীকে দেখেছিল সেইখানেই।

কোটরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল বিকটদর্শন এক রাক্ষসী। বিপুলাকৃতি অতিশয় ভয়ংকরী সেই নারী-রাক্ষসকে দেখেই বুকের রক্ত ছলকে উঠেছিল কীর্তিসেনার। মানুষের গন্ধ পেয়েই সে এসে দাঁড়িয়েছিল কোটরের সামনে। কটমট করে চেয়ে চেয়ে দেখছিল কীর্তিসেনাকে।

একা নয়, সঙ্গে ছিল একপাল রাক্ষস খোকাখুকু।

কিন্তু কী আশ্চর্য! কীর্তিসেনাকে উদ্দেশ করে কোনও রকম তর্জনগর্জন না করে, বাচ্ছাগুলোকে নিয়ে মহীরুহের ওপরের ডালে উঠে গেছিল রাক্ষসী।

বাচ্চাগুলোকে নিয়ে মহীরুহের ওপরের ডালে উঠে গেছিল রাক্ষসী।

কোটরে বসেই শুনতে পেয়েছিল কীর্তিসেনা, খুদে রাক্ষসরা বলছে মা রাক্ষসীকে, খিতে পেয়েছে। খেতেদাও।

রাক্ষসী জবাব দিয়েছিল এইভাবে, শোনরে। আজ মহাশ্মশানে গিয়ে শুনে এলাম, এমন একটা মড়া শিগগিরই পড়বে যার মাংস খেলে ছ-মাস আর খিদে পাবে না।

লোলুপ রাক্ষস-শিশুরা বললে, কার মড়া মা?

রাক্ষসী মা বললে, শ্মশানে মড়া পেলাম না কোথাও। ভৈরবমন্দিরে গেলাম। ঠাকুরকে পুজো দিয়ে বললাম, খিদে পেয়েছে, খেতে দাও। ভৈরব ভগবান বললেন, চলে যা বসুদত্তনগরে। সেখানকার রাজা বসুসেন শিগগিরই মরবে। শিকার করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কেঁচো জাতের পোকা ঢোকে কানের মধ্যে দিয়ে মাথার ভেতরে। সেই পোকার এখন অনেক ছানাপোনা হয়েছে। ফলে, ভারি রোগে পড়েছেন রাজা। বৈদ্যরা হার মেনেছে। রোগটা কোথায় আর কেন, তা ধরতে পারেনি। পারবেও না। রাজা মরবে এবার। তার মাংস খাবি, ছ-মাস আর খিদে থাকবে না। সবুর কর।

রাক্ষস-বাচ্ছারা শুনে তো খুব খুশি। কৌতূহলও চাগাড় দিয়েছিল তৎক্ষণাৎ। রোগ নিরাময়ের কোনও পন্থা যদি কারও মাথায় এসে যায়? তাহলে তো রাজা মরবে না!

হি-হি করে হেসে রাক্ষসী বলেছিল, তাহলে শোন।

বলে, বলেছিল বাচ্ছাদের। কীভাবে দুশ্চিকিৎস্য সেই রোগেরও চিকিৎসা সম্ভব। কিন্তু কেউ তা জানে না।

কোটরে লুকিয়ে থেকে কীর্তিসেনার তো তা জানা হয়ে গেল।

আধমরা অবস্থায় বাকি রাতটা কাটিয়ে দিয়েছিল গাছের কোটরে।

পরের দিন দিনমানে রওনা হয়েছিল বসুদত্তনগরে। বণিক সমুদ্রসেনের কাছে আগেই শুনেছিল, বসুসেন রাজা বড়ো ভালো মানুষ। বহু বণিক তাঁর রাজ্যে আসেন অনেক সুবিধে পান বলে। স্বামী দেবসেনও নিশ্চয় আসবেন। দেখা হবেই। তখন রোদ উঠেছে। দেখা হয়ে গেল এক গোপালক বালকের সঙ্গে। রাজা বসুসেনের কথা জিজ্ঞেস করতেই সে বললে, আপনি তো এখন তাঁর রাজ্যেই রয়েছেন। কিন্তু তাঁর তো ভারি রোগ হয়েছে। মরণ আসন্ন। আপনি কে?

কীতিসেনা বললে, দেখতেই তো পাচ্ছো, আমি এক রাজপুত্র। রাজার রোগ সারিয়ে দেব বলে বেরিয়েছি।

রাখাল বললে, চলুন আমার সঙ্গে।

রাজার দ্বারপাল রাখালের কাছে যখন শুনল, নবাগত এই রাজপুত্র (ছদ্মবেশিনী কীতিসেনা) আরোগ্য-পন্থা অবগত আছে, তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে গেছিল রাজসমীপে।

চিকিৎসকরা যদি সুদর্শন হয়, রোগীর অর্ধেক রোগ সেরে যায়। পুরুষবেশে কীর্তিসেনা তো তার সৌন্দর্যকে শত চেষ্টাতেও ঢেকে রাখতে পারেনি। আর তাই দেখেই উৎফুল্ল হয়ে রাজা বসুসেন বলেছিল, মনে হচ্ছে এবার আমার মাথার রোগ সারবে। সেরে উঠলেই অর্ধেক রাজত্ব আপনাকে দেব।

আড়ি পেতে রাক্ষসীর মুখে রোগশান্তির যে প্রক্রিয়াটা শুনে মুখস্থ করে রেখেছিল বুদ্ধিমতী কীর্তিসেনা, এবার গম্ভীর বদনে সেই পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়ে গেল রাজার কানের মধ্যে দিয়ে।

এই গেল চিকিৎসার প্রথম পর্ব। দেখে তো হতবাক রাজবৈদ্যরা। কী কাণ্ড করছে এই ছোকরা? কিন্তু বাধা দেবেন কোন সাহসে? রাজা তো আরাম পাচ্ছেন, ঘুমিয়েও পড়লেন।

পরদিন সকালে ঘর ভর্তি বৈদ্যদের সামনেই রাজার কানের মধ্যে দিয়ে কাতারে কাতারে আধমরা কেঁচো জাতীয় পোকা বেরিয়ে এল, কীর্তিসেনার অভিনব চিকিৎসায়।

রাজা এক্কেবারে সেরে উঠলেন।

এমন বৈদ্যকে তো কাছে রেখে দিতে হয়। সোনার প্রাসাদে কীর্তিসেনার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন রাজা বসুসেনা। দেশের লোক তাকে মাথায় করে রাখল দেবতা জ্ঞানে।

রাক্ষসী-বিদ্যের দৌলতে কীর্তিসেনার নিরন্তর ধকলের অবসান ঘটল। শুরু হল স্বামীর জন্যে পথ চেয়ে থাকা। দিনকয়েক প্রতীক্ষায় থাকবার পরেই মুখ তুলে চাইলেন ভাগ্যদেবী। বণিক দেবসেনা এল বসুদত্তনগরে। বণিকদের আসা যাওয়ার পথে চোখ রেখে দুরু দুরু বক্ষে রোজ জানলায় বসে থাকত কীর্তিসেনা। স্বামীদেবতাকে দেখেই দৌড়ে গিয়ে আছড়ে পড়েছিল তার পায়ে।

দেবসেনা তো অবাক। একী কাণ্ড সুপুরুষ এই রাজপুত্র সহসা তার পা জড়িয়ে ধরেছে কেন?

কীর্তিসেনা মুখ তুলে স্বামীর মুখপানে চেয়ে দুই গালে অশ্রুর বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। আর এই অশ্রুপাত দেখেই প্রাণেশ্বরী সহধর্মিনীকে নিমেষে চিনে ফেলেছিল দেবসেনা, রাজপুত্রের ছদ্মবেশ তার চোখে ধুলো দিতে পারেনি।

কিন্তু ব্যাপারটা কী? অন্তঃপুর ছেড়ে অন্তরের রানি পথের ধুলোয় কেন?

রাস্তায় লোক জমে গেছিল অভিনব এই নাটক দেখে। তাদের সামনে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে শাশুড়ির নৃশংস অত্যাচার আর তার পরের অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলি পরের পর শুনিয়ে গেছিল কীর্তিসেনা।

ধন্য ধন্য রব পড়ে গেছিল জনগণের মধ্যে। মহীয়সী স্ত্রী বটে। এইভাবেই যে রমণীরা স্বামীকে দেবতার আসনে বসিয়ে দাম্পত্যরথে সারথী হয়, রক্ষাকবচ হিসেবে কাছে রাখে স্বামীভক্তি, স্বয়ং ধর্মদেবতা সেই রথ সুরক্ষা করে যান, হাতিয়ার হয় স্বয়ং স্বামী। এমনই নারীর সুনাম আপনা থেকেই ছড়িয়ে পড়ে দেশে দেশে, ঢক্কানিনাদের প্রয়োজন হয় না।

কীর্তিসেনার ক্ষেত্রেও ঘটল তাই। যেন হাওয়ায় ভর করে তার অসাধারণ পতিভক্তি কাহিনী ছড়িয়ে গেল গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে শহরে।

রাজা বসুসেন শুনলেন, বিস্মিত হলেন এবং বললেন আজ থেকে কীর্তিসেনা আমার বোন।

সেইসঙ্গে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন, অর্ধেক রাজত্ব দান করলেন ভগ্নী আর ভগ্নীপতিকে।

পাপিষ্ঠা মায়ের সংস্পর্শ ত্যাগ করে বসুদত্তনগরেই থেকে গেল দেবসেনা।

কাহিনি শেষ করে ময়দানবের মেয়ে সোমপ্রভা বললে কলিঙ্গসেনাকে, বিয়ে করলে এইরকম উৎপাত ঘটে, শাশুড়ি-ননদের অত্যাচার চলে।

৩০. তেজস্বতীর কাহিনি

গল্পটল্প বলে সোমপ্রভা হালকা মনে ফিরে গেল নিজের জায়গায়। মানব-কন্যা কলিঙ্গসেনার মন কিন্তু ছটফট করতে লাগল পরের দিন দানব-কন্যা সোমপ্রভার আগমন প্রত্যাশায়। বন্ধুত্বের চাইতে নিবিড়তর বন্ধন ব্রহ্মাণ্ডে আর নেই।

সোমপ্রভার পথ চেয়ে তাই বাগানে টহল দিচ্ছে কলিঙ্গসেনা। পরের দিন, এমন সময়ে তাকে দেখে কামে পাগল হল এক বিদ্যাধর তনয়।

তার নাম মদনবেগ। কলিঙ্গসেনা যখন তার রূপযৌবনের রশ্মি বিকিরণ করে তন্ময় হয়ে বেড়াচ্ছে বাগানে, তখন আকাশ থেকে তাকে দেখেই অস্থির হয়েছিল এই মদনবেগ। বহু বিদ্যাধরী সম্ভোগ করেছে সে, কিন্তু এই মানবীর মতো রূপরশ্মিময় নয় তো কেউই। কে এই কন্যা, আপন রূপে আপনি ধন্যা?

যে প্রকারেই হোক, রূপযৌবনের এমন খনিকে অঙ্কশায়িনী করতেই হবে। বিয়ে করতেই হবে।

কিন্তু......

মানবী-সংসর্গে তার বিদ্যাধর দেহে দোষ প্রবেশ করবে না তো?

সুতরাং জানা দরকার রূপের মূর্তিময়ী বিজ্ঞাপন স্বরূপা এই কামিনীর প্রকৃত পরিচয়।

বিদ্যাধররা অনেক বিদ্যায় বিদ্বান, বিজ্ঞাপন বিদ্যাও জানা ছিল মদনবেগের। মনে মনে ডাক দিয়েছিল এই বিদ্যার দেবীকে।

সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনবিদ্যা দেহধারণ করে হাজির হয়েছিল মদনবেগের সামনে। এসেই বলেছিল, কেন ডেকেছেন, তা জানি, ওই মেয়েটি আগে ছিল দেবলোকের মেয়ে। শাপ খেয়ে মর্ত্যে জন্মেছে। অতিশয়

সুলক্ষণা। ভোগ করার মতো কন্যা। ওর বাবার নাম রাজা কলিঙ্গদত্ত। নির্ভয়ে সঙ্গম করুন, দূষিক হবেন না।

জ্ঞান দিয়ে তো হাওয়া হয়ে গেল বিজ্ঞাপন বিদ্যার দেবী, মদনবেগ মদনশরে মুহ্যমান অবস্থায় নিজের আলিয়ে ফিরে এসে নানান ফন্দি ফিকিরের প্যাঁচ কষতে লাগল মাথার মধ্যে। হিড়হিড় করে টেনে এনে লালসা মিটিয়ে নিলেই তো হয়!

কিন্তু তাতে যদি চটে যায় কোনও শক্তিমান পুরুষ? শাপের ঠেলায় যে বিদ্যাধরলোক থেকেই ছিটকে যেতে হবে মদনবেগকে! ক্ষণিকের মদনানন্দ দীর্ঘকালের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অনেক ভেবেচিন্তে শিবের পুজো করে গেছিল মদনবেগ।

খুশি হয়ে শিব তাকে দেখা দিয়ে বললেন, বাছা মদনবেগ, যে মেয়েকে দেখে তুমি মজেছো, সেই মেয়েকে বিয়ে করার মতো পুরুষ একজনই আছে পৃথিবীতে। তার নাম রাজা উদয়ন। বড়ো বউ বাসবদত্তার ভয়ে মনের খিদে মনেই রেখে দিয়েছে। কলিঙ্গসেনার জন্যে সে-ও পাগল। মেয়েটা যখন নিজের বর নিজে বেছে নেওয়ার জন্যে সভা ডাকবে, তখন উদয়নও হাজির হবে সেখানে। সভা ডাকা হবে উদয়নের রাজধানীতেই। তুমি উদয়ন সেজে হাজির থেকো সেই সভায়, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে। নইলে কলিঙ্গসেনাকে কোলে শোয়াতে পারবে না কোনওদিনই।

রূপসী কন্যাকে ঘরণী করতে চায় সব পুরুষই। দেশে দেশে ঝড় বয়ে গেল তার অতিপ্রাকৃত রূপরাশির বর্ণনা ছড়িয়ে পড়ায়। রাজারা দূত পাঠিয়ে দিল রাজা কলিঙ্গদত্তের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে।

কলিঙ্গদত্ত, কিন্তু বেছে নিলেন এমন এক রাজাকে বয়েসে যিনি বুড়ো। কিন্তু তাঁর গুণ অনেক। শ্রাবস্তীর রাজা তিনি। নাম প্রসেন।

বুড়ো রাজাকে বিয়ে করতে হবে শুনে কেঁদে ফেলেছিল কলিঙ্গসেনা। মনের ভার হালকা করেছিল সখী সোমপ্রভার কাছে।

জল এসে গেছিল সোমপ্রভার চোখেও। বলেছিল, রাজা প্রসেন সব দিক দিয়েই তোমার যোগ্য, শুধু একদিক বাদে। বয়েসে। বৃদ্ধ বর যুবতী বউকে কী আনন্দ দিতে পারে? এই পৃথিবীতে শুধু একজনই তোমার বর হওয়ার যোগ্য, রাজা উদয়ন।

কলিঙ্গসেনা জিজ্ঞেস করেছিল, তাঁর জন্ম কোন বংশে?

সোমপ্রভা বলেছিল, পাণ্ডব বংশে। মৃগাবতীর গর্ভে।

জন্মের সময়ে আকাশবাণী অনুসারে ওঁর নাম উদয়ন।

মলিনমুখে বলেছিল কলিঙ্গসেনা, কিন্তু বাবা যে চান বুড়ো রাজা প্রসেনকে জামাই করতে।

হেসে বলেছিল সোমপ্রভা, বিয়েটা তো আর মানুষে করায় না, ভগবানে করায়। কপালের লিখন খণ্ডাবে কে? তাহলে শোনো একটা গল্প।

অনেক আগের কথা। উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন বিক্রমসেন। তেজস্বতী ছিল তাঁর মেয়ে। ঈশ্বর তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত রূপ দিয়ে সাজিয়েছিলেন।

এমন মেয়ের বিয়ে দিতে গেলেই বিভ্রাট উপস্থিত হয়। মনের মতো জামাই পাওয়া যায় না। ফলে, জামাই খুঁজতে খুঁজতে হেদিয়ে গেলেন রাজা।

এদিকে যৌবনের জ্বালায় মেয়ে তো আসঙ্গ লিপ্সায় ছটফট করছে। প্রাসাদের ছাদে দাঁড়িয়ে একদিন দেখেছিল এক পথচারীকে। পছন্দ হয়েছিল তৎক্ষণাৎ। শরীরের জ্বালা বড়ো জ্বালা। এই লোকটাকে দিয়েই মেটানো যাক। তাগড়াই পুরুষ।

এক সখীকে দিয়ে প্রস্তাবটা পাঠিয়ে দিয়েছিল রাস্তার লোকটাকে। সে তো ভয়ে কাঁটা। সখী বলেছিল, ঘাবড়াবেন না। সামনে ওই যে মন্দিরটা দেখছেন, রাতে ওখানে থাকবেন। অভিসারে আসবে রাজকন্যা।

অভয় দিয়ে সখী চলে যেতেই ভয়ের চোটে চম্পট দিয়েছিল লোকটা।

কিন্তু কপাল বটে আর একজনের। তাঁর নাম সোমদত্ত। পদমর্যাদায় রাজা বিক্রমসেনের অধীনস্থ রাজা। শত্রুরা তাঁর রাজত্ব আক্রমণ করেছিল। সৈন্য সাহায্যের জন্যে দরবার করতে আসছিলেন রাজা বিক্রমসেনের কাছে। রাত হয়ে যাওয়ায় ঠাঁই নিয়েছিলেন সেই মন্দিরে।

অভিসারিকা তেজস্বতী নিকষ অন্ধকারে তাঁকেই মনে করেছিল রাস্তার সেই পথচারী। বাক্যব্যয় না করে মালাবদল করে নিল অন্ধকারেই। কোমলাঙ্গিনীকে কোলে শুইয়েও টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করেনি সোমদত্ত। ঘটে বুদ্ধি থাকলে কেউ করে? বিশেষ করে যার শরীরে আগুনের হলকা!

শরীরের জ্বালানি বিনিয়মপর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর কমুকী কন্যা সোমদত্ত অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছিল সোমদত্তকে দিয়ে, নিশীথ রাতের এই অভিসার যেন পুনঃপুন ঘটে এবং গান্ধর্ব মতে বিয়েটাই যখন হয়ে গেল, তৎসহ নিবিড় অন্ধকারে উদ্দাম ফুলশয্যা, তখন জামাই হিসেবে নিজেকে যেন শ্বশুরের সামনে হাজির করে সোমদত্ত।

সোমদত্ত তো অবাক। এ যে মেঘ না চাইতেই জল। চাইতে এসেছিলেন শুধু সৈন্য, তার আগেই পেয়ে গেলেন অভিসারিকা রাজকন্যাকে।

পরের দিন সকালে রাজা বিক্রমসেনের সামনে গিয়ে সৈন্য প্রার্থনা করেছিলেন সোমদত্ত।

মানুষটার পুরুষালি চেহারা দেখে রাজা বিক্রমসেন সঙ্গে সঙ্গে ভেবে নিলেন, এমন পুরুষই কামুকী কন্যার খিদে মিটিয়ে যেতে পারবে।

সুতরাং, আগে বিয়ে করুক আমার মেয়েকে, তারপরে সৈন্য উপঢৌকন দেব জামাইকে।

প্রস্তাবটা রাখলেন সোমদত্তের সামনে।

সোমদত্তও সঙ্গে সঙ্গে বললে, আজ্ঞে, আমি তো আপনার জামাই বটেই। শুনুন কাল রাতের ঘটনা।

অদৃষ্ট এমনই। কার ললাটে কী লিখন লিখে দিয়ে যান, তা আগে বোঝা যায় না। বিধি সুপ্রসন্ন থাকলে নিধি পাওয়া যায়। নইলে নয়।

রাজকন্যার এই কাণ্ড যখন রাজসভায় হইচই ফেলে দিয়েছে, তখন বিচক্ষম রাজমন্ত্রী বললেন, কপালে যা ঘটবার তা ঘটবেই, এরই নাম ভবিতব্য। সততা যার নিধি, বিধি তার পথ সুগম করে দেয়। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ে গেল। শুনুন।

হরিশর্মা নামে একটা লোক থাকত এক নগরে। খুবই গরিব আর ডাহা বোকা। ছেলে অনেকগুলো। ভিক্ষে করে সংসার চালাত। একদিন তাও জোটেনি। খিদের জ্বালায় বৌ-ছেলেদের নিয়ে গেছিল শীলদত্ত নামে এক গেরস্তের কাছে। সপরিবারে চাকরগিরির কাজ পায় সেখানে।

শীলদত্তের মেয়ের বিয়ের দিন অনেক লোক এসেছিল বাড়িতে। ঢালাও খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। ভালোমন্দ খাওয়ার লোভে সারাদিন সপরিবারে না খেয়ে খেটে গেছিল বোকা হরিশর্মা। লোকজন চলে যাওয়ার পর দেখা গেল, খাবারও ফুরিয়েছে।

চালাক হলে নিমন্ত্রিতদের সঙ্গেই সপরিবারে খেয়ে নিত হরিশর্মা। বোকামির ফল পেল এইভাবে।

মনের দুঃখে বলেছিল বউকে, আমি যে বোকা নই, এবার তার একটা প্রমাণ দেব। শীলদত্ত তখন আমাকে মাথায় তুলে রাখবে।

বউ বললে, কী করবে?

হরিশর্মা বললে, শীলদত্তের জামাইয়ের ঘোড়াটাকে লুকিয়ে রাখবো। কেউ খুঁজে পাবে না যখন, তখন আমি খড়ি পেতে গুণে বলে দেব, কোথায় আছে ঘোড়া।

ঠিক তাই করেছিল হরিশর্মা। নিরুদ্দেশ ঘোড়াকে কেউ যখন খুঁজে পায়নি, তখন হরিশর্মার বউ গিয়ে বলেছিল শীলদত্তকে, আমার স্বামী গুণতে জানে। ওকে বলুন। বলে দেবে কোথায় আছে ঘোড়া।

ডাক পড়েছিল হরিশর্মার। সে পরম বিজ্ঞের ভান করে, খড়ি দিয়ে মাটিতে উলটো-পালটা দাগ টেনে। বিড় বিড় করে মন্তর আউড়ে বলেছিল, ঘোড়া রয়েছে দক্ষিণ দিকে। আজ রাতেই তাকে নিয়ে যাওয়া হবে সেখান

থেকে।

তৎক্ষণাৎ শীলভদ্রের লোকজন ছুটেছিল দক্ষিণ দিকে। এবং, পাওয়া গেছিল ঘোড়া।

হরিশর্মার কপাল খুলে গেছিল সেইদিন থেকে। শীলভদ্র তাকে মাথায় করে রেখে দিয়েছিল এরপর থেকেই। গণক হরিশর্মার সুনাম ছড়িয়ে গেছিল দিকে দিকে।

দিন কয়েক পরেই একটা বড়ো চুরি হয়ে গেছিল রাজবাড়িতে। ডাক পড়েছিল হরিশর্মার।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাজার সামনে গেছিল হরিশর্মা। বেচারি! গণনা শাস্ত্রের অ-আ-ক-খ জানে না। অথচ মস্ত গণক হিসেবে সে খ্যাতিমান এই শহরে। এখন উপায়? অনেক ভেবেচিন্তে একদিনের সময় প্রার্থনা করেছিল রাজার কাছে। এতবড়ো চুরি, গণনায় একাগ্রতার জন্যে সময় দরকার।

রাজা সময় দিয়েছিলেন। একরাত্রির।

হরিশর্মার মতলব ছিল সেই রাতেই চম্পট দেবে শহর ছেড়ে।

কিন্তু ধড়িবাজিতে রাজাও তো কম যান না। হরিশর্মাকে বাড়ি ফিরতে দিলেন না। আটকে রাখলেন রাজবাড়ির একটা ঘরে। বাইরে রাখলেন পাহারা।

ভয়ের চোটে হরিশর্মা কেঁদে গেল নিঃশব্দে। রাত ফুরোলেই তো জোচ্চুরি ধরা পড়বে। গর্দান যাবে।

এই সময়ে ঘটে গেল একটা অতীব আশ্চর্য কাকতালীয়।

রাজবাড়ির এক ঝি-এর নাম জিভ। দুশ্চরিত্রা মেয়ে। রাজবাড়ি থেকে জিনিসপত্র বাইরে সরিয়ে দিত নিজের ভাইয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। সাম্প্রতিক চুরি-টাও তার কীর্তি। প্রতিবার পার পেয়ে গেছে, কিন্তু এবার রাজা বড়ো গণক আনিয়েছেন শুনে ইস্তক ভয়ের চোটে সে ঠকঠক করে কাঁপছিল।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এসেছিল মাথায়। গণক তো ঘরে আটক, বাইরে আড়িপাতা যাক না কেন। কি বলছেন গণক, তা শোনা যাক।

পাহারাদারদের ছেনালি করে সরিয়ে দিয়ে কান পেতে রইল দরজায়।

তখন রাত বেশ গভীর হয়েছে। গোটা রাজবাড়ি ঘুমোচ্ছে। পাহারাদাররাও ঝি-কে নিয়ে ফুর্তি-টুর্তি করে সরে পড়েছে।

ঠিক সেই সময়ে ঘরের মধ্যে কী করছিল রহিশর্মা?

নিজের মুণ্ডপাত করছিল। ভাওতা মেরে গণক হওয়ার পরিণামটা ভাবছিল আর নিজের মনে বকবক করে যাচ্ছিল। ঝি জিভ যখন দরজায় কান পেতেছে, ঠিক তখনই সে নিজের জিভকে গালাগাল দিয়ে বলছিল, ওরে জিভ, কুকাজ যখন করেছিস, ফলভোগ করতেই হবে।

কথাটার আসল মানে এই : ওরে জিভ, তুই মিথ্যে বলে আমাকে গণক সাজিয়েছিলি, এখন পাপের ফলভোগ করতেই তো হবে!

কিন্তু দরজায় কান লাগিয়ে ঝি ভাবলে, কী সর্বনাশ! গণকমশায় তো জেনে ফেলেছে আমার নাম! এবার তো আমার প্রাণ যাবে! গণকের মুখ বন্ধ করা যাক, এখুনি!

দরজা খুলে জিভ আছড়ে পড়েছিল হরিশর্মার পায়ে, রক্ষে করুণ। আমার নামটা ফাঁস করবেন না রাজার কাছে।

হরিশর্মা তো অবাক, তুমি কে?

জিভ বললে, আমি জিভ। আপনি তা ধরে ফেলেছেন। চুরিটা আমিই করেছি। পশ্চিমের বাগানে ডালিম গাছের তলায় পুঁতে রেখেছি। আমার যথাসর্বস্ব নিন, চোরাইমাল রাজাকে ফিরিয়ে দিন, আমাকে প্রাণে বাঁচান, আমার নামটা বলবেন না।

নিন, নিন, নিংড়ে নিন আমাকে।

বোকা হলেও হরিশর্মা তো পুরুষ মানুষ। রাত্রি নিশীথে ডবকা মেয়ে যদি পাওয়া যায়, সুযোগ ছাড়া যে উচিত নয়, সে বুদ্ধি তার আছে। সুতরাং চুরি করার শাস্তিটা দিয়েছিল ভালোভাবেই, জিভ-এর জিভ বেরিয়ে

না যাওয়া পর্যন্ত।

পরিশেষে, জিভ-এর গা থেকে সমস্ত গয়না খুলে নিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল ঘর থেকে।

জিভ ভাবল, যাক বাবা, আরামও পেলাম, প্রাণেও বাঁচলাম। একটু পুণ্যও হয়ে গেল। দেওয়া নেওয়ার ফলে আমার পাপ গণকের শরীরে গেল, গণকের পুণ্য আমার শরীরে চলে এল।

পরের দিন সকালে রাজসভায় বিস্তর আস্ফালন, ফাঁকা বুলি আর খড়ি দিয়ে অঙ্ক কষে হরিশর্মা বললে, চোরাই মাল রয়েছে অমুক জায়গায়। এখুনি আনান। চোরকে কিন্তু পাবেন না। সে এখন দেশের বাইরে।

পাওয়া গেল চোরাই মাল। পুলকিত রাজা অনেক জায়গা জমি, বাড়ি, ধনরত্ন দান করলেন হরিশর্মাকে।

সুদিন এসে গেল হরিশর্মার। দিন কেটে গেল সুখে।

জিভকে অবশ্য প্রসাদ দিয়ে গেছিল প্রায় প্রতি রাতেই।

বদবুদ্ধির পুরস্কার একটু বদ তো হবেই!

জমাটি গল্প সমাপ্ত করে হাসির হল্লোড়ের মধ্যে মন্ত্রী বললেন, এই গল্পের মধ্যে হিতবাক্য একটাই : অদৃষ্ট সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে। এবং তা ভালোর জন্যেই করছে। যা ঘটে তা ভালোর জন্যেই ঘটে। ঘটেছে তো সর্বশক্তিমান দৈব। রাজকন্যা সোমদত্তর সঙ্গে রাজা সোমদত্তের মিলনও এই দৈবচক্র। মেনে নিন আর ঘটা করে বিয়ে দিন।

তাই হয়েছিল।

সখী সোমপ্রভার মুখে এহেন মজার গল্প শুনে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল সুন্দরী কলিঙ্গসেনা।

হাসিমুখে সোমপ্রভা বলেছিল, গল্পের সারকথা তাহলে কী? দৈব সর্বশক্তিমান। দৈব কৃপা থাকলে অঘটনও ঘটে যায়। রাজা উদয়নও তোমার শয্যাধর্ম সহচর হয়ে যেতে পারেন, কেউ তা আটকাতে পারবে না।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছিল। সোমপ্রভা নিজের জায়গায় ফিরে গেল পরের দিন আসবে বলে।

৩১. কলিঙ্গসেনার কাহিনি

বন্ধুত্ব যখন নিবিড় হয়, তখন কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। সোমপ্রভাও রাতটা স্বামীর সঙ্গে কাটিয়েই সাতসকালে ছুটে এসেছিল কলিঙ্গসেনার কাছে। বান্ধবীর মনের অবস্থা তো তার অজানা নয়।

তাকে দেখেই হাউমাউ করে উঠেছিল কলিঙ্গসেনা, সারা রাত ঘুম নেই চোখে, তুমি তো মজাসে স্বামীসঙ্গ করে এলে। এদিকে আমার কপাল যে পুড়তে চলেছে। বুড়ো প্রসেন রাজার গলায় আমাকে ঝুলিয়ে দেওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন বাবা। তুমি এর বিহিত করো, এখুনি!

সোমপ্রভা বললে, এখুনি? কী করবো?

কলিঙ্গসেনা বললে, বুড়ো প্রসেন রাজার কাছে আগে নিয়ে চলো। তাকে দেখাও। তারপর যাবো রাজা উদয়নের চরণতলে।

সোমপ্রভা বললে, তাহলে প্রিয় সামগ্রী যা কিছু আছে, সব সঙ্গে নাও। কারণ, রাজা উদয়নকে দেখলে আর তুমি ফিরতে পারবে না। আমাকে তো ভুলবেই, বাবা আর মাকেও ভুলবে।

তাহলে রাজা উদয়নকেই এখানে নিয়ে এসো। তোমাকে ছেড়ে তো আমি থাকতে পারবো না। তোমরা সব পারে, তোমরা, দানব-কন্যারা, ঊষা ছিল দানবদুহিতা। তার সখী চিত্রলেখা অনিরুদ্ধকে এনে দেয়নি?

সোমপ্রভা বললে সখী হে, চিত্রলেখার মতো অত শক্তি আমার নেই। তোমাকে মায়াযন্ত্র দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি রাজা উদয়নের কাছে, তুমি মোহিনী মায়া দিয়ে তাঁকে নিয়ে এস এখানে।

কলিঙ্গসেনা তাতেই রাজি। চৌষট্টি কলায় কলাবতী সে, রাজা উদয়নকে কামকলায় বশ করতে নিশ্চয় পারবে।

তার জন্যে বাবা আর মায়ের অনুমতি নিতে যাবে কেন? সাঁ করে উড়ে গেল আকাশে সখী সোমপ্রভার সঙ্গে, সখীর আকাশি মায়াযন্ত্রে চেপে।

পেরিয়ে গেল কত দেশ, কত হ্রদ, কত অরণ্য, কত পর্বত। অবশেষে এসে পৌঁছোলো শ্রাবন্তী নগরের কাছে। ওপর থেকেই দেখে নিল রাজা প্রসেনকে, শিকার করতে বেরিয়েছেন।

এক ঝলক দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সক্রোধে বলেছিল সখী সোমপ্রভাকে, বুড়ো! বুড়ো! আর দেখতে চাই না, চলো রাজা উদয়নের কাছে।

মায়াযন্ত্র উল্কাবেগে চলে এল কৌশাম্বী নগরের কাছে। বাগানে হাওয়া খাচ্ছিলেন রাজা উদয়ন। একবার দেখেই কলিঙ্গসেনার সর্ব অঙ্গ অবশ হয়ে এসেছিল। কামরশ্মি যেন অযুত বিযুত নিযুত ধারায় মূর্চ্ছার ঘোরে এনে ফেলল কামিনীশ্রেষ্ঠা কলিঙ্গসেনাকে।

বলেছিল অস্ফুট স্বরে, কী সোমপ্রভা। আমাকে বাঁচাও। ওই শরীরী কামের অঙ্গে আমার অঙ্গসংস্থাপনের সুযোগ এনে দাও। আমি শীতল হতে চাই।

কাম-কাতরা কলিঙ্গসেনাকে ধৈর্য সহকারে বুঝিয়েছিল কাম-চতুরা সোমপ্রভা, বুঝেছি তোমার অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু এখুনি ওই কর্মটি করতে যেও না। লুকিয়ে থাকো বাগানে। তোমার আগমন বার্তাও জানতে যেও না রাজাকে। দুর্বার কামাগ্নি তোমার বুদ্ধিনাশ করেছে। হঠকারিতা একদম নয়। কাল সকালে আমি আসব। তোমার প্রতিটি অঙ্গের কান্না তাঁর প্রতিটি অঙ্গের সান্নিধ্যে এসে যাতে হাসিতে পরিণত হয়, সেই চেষ্টা করব।

এই বলেই আর দাঁড়ায়নি সোমপ্রভা। আগুন তার শরীরেও জ্বলছে। মায়া যন্ত্রে চেপে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করেছিল স্বীয় স্বামীর কাছে, লেলিহ কামাগ্নি নির্বাপণের অভিলাষে।

প্রথম রিপুর স্রষ্টা আড়ালে মুচকি হেসেছিলেন নিশ্চয়। রিপুক্ষমতা দুই নারীকে টলিয়ে দিয়েছে এক পুরুষ দর্শনে।

সাবাস রাজা উদয়ন! তিনি কিন্তু এত কাণ্ডের কিছুই জানলেন না। কানন সমীরণে শীতল হয়ে প্রবেশ করলেন রাজভবনে।

সোমপ্রবা চক্ষের নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে যেতেই কামপ্রদাহে বিমূঢ় কলিঙ্গসেনা বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কানন মাঝারে। অশরীরী আকাঙ্ক্ষা স্থানু করে দিয়েছিল তার তনুবরকে। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে থাকবার পর সচল হয়েছিল তার মস্তিষ্ক। তৃষ্ণা যখন তুঙ্গে পৌঁছেছে, তখন তার নিবারণের পন্থা বের করে নিয়েছিল মস্তিষ্ক খাটিয়ে। খুঁজে খুঁজে বাগানের মধ্যেই এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করেছিল। তার নাম মহত্তর। সুন্দরী কলিঙ্গসেনার নয়নবাণ আর সুমিষ্ট বচন তাকে বঁড়শি দিয়ে মাছ গাঁথার অবস্থায় এনে ফেলেছিল। বার্তাবহ হয়ে রাজা উদয়নের কাছে যেতে রাজি হয়েছিল।

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত শুরু হয়ে গেল তারপর থেকেই।

বার্তাবহ মহত্তর সাজিয়ে গুছিয়ে কলিঙ্গসেনার বক্তব্য পেশ করেছিল রাজা উদয়নকে। জগতের সেরা সুন্দরী স্বেচ্ছায় স্বস্থান ত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছে রাজ উদ্যানে এবং হিয়া পদ্মাসনে স্বামীরূপে বরণ করে নিয়েছে রাজা উদয়নকে। এরপর রাজার যথা অভিরুচি।

পুলকিত নৃপতি তদগতচিত্তে সমস্ত শ্রবণ করে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেওয়া মনস্থ করলেন। তন্বঙ্গী কলিঙ্গসেনার নিছক বিররণই সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের মোহন পাশে তাঁকে আবদ্ধ করে ফেলেছিল।

মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণকে ডেকে সোজাসুজি বললেন, সুন্দরীশ্রেষ্ঠা কলিঙ্গসেনা অবস্থান করছে আমারই কাননে।

অবিলম্বে পাণিপীড়নের প্রার্থনা জানিয়ে গেল ঘটক। আমার আর বিলম্ব সইছে না, হোক বিয়ে, এখুনি!

কুশাগ্রবুদ্ধি মন্ত্রী দেখল, সর্বনাশ হয়েছে। বিয়ের পাত্রী নিজেই হাজির বাগানে। কিন্তু ওই বিশ্বসুন্দরীকে বিয়ে করার পর তো রাজার মাথা ঘুরে যাবে, রাজকার্যে শৈথিল্য আসবে, সবচেয়ে বড়ো বিপদটা ঘটবে বড়ো রানি বাসবদত্তাকে নিয়ে। সে যা অভিমানী, প্রাণে বাঁচবে কিনা সন্দেহ। যদি মারা যায়, রাজপুত্র নরবাহনদত্তকে তখন কে দেখবে? তারও তো প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে।

চকিতে এহেন অনর্থ আর অমঙ্গল পরম্পরা চিন্তা করে সুমিষ্ট বচনে বলেছিল মন্ত্রী, হঠকারিতার মধ্যে যাবেন না। আগে গণক ডাকুন। সুভলগ্ন বিচার করুন, দেবগণের কাম্য মহাসুন্দরী কলিঙ্গসেনা রাজকন্যার ভালোভাবে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করুন, বাগানে থাকবেন কেন?

ফলে, উদ্যান-ভবনে ঠাঁই হয়ে গেল কলিঙ্গসেনার, ধড়িবাজ মন্ত্রীর গোপন পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হল। শাসনকার্যে কিছু সিদ্ধান্ত হয় তাৎক্ষণিক, কিছু সিদ্ধান্তে সময় নিতে হয়, আর কিছু সিদ্ধান্ত অনিবার্য পরিণতির অপেক্ষায় ঠেকিয়ে রাখতে হয়। মন্ত্রীমশায় হাতে সময় নিয়েছিল এই কারণেই।

সেই মুহূর্তে অবশ্য তার মনে পড়ে গেছিল রাজা নহুষ আর ইন্দ্রের স্ত্রী শচীদেবীর কাহিনি। স্বর্গের সিংহাসনে যে বসবে, বিনাবাক্যব্যয়ে শচীদেবীকে তার অঙ্কশায়িনী হতে হবে। ওজোর আপত্তি চলবে না। নহুষ রাজা তাই শচীদেবীকে হিড়হিড় করে টেনে আনতে যাচ্ছিল স্বর্গের সিংহাসনে বসেই।

বাগড়া দিয়েছিলেন বৃহস্পতি। দেবতাদের গুরু তিনি। তাঁর পরামর্শে শচী বলে পাঠাল, আপনি এসে আমাকে নিয়ে যান। আসবেন কিন্তু ঋষিরা যে বাহনে চাপে, সেই বাহনে চেপে।

শচীদেবীর চালটা ছিল এইখানেই। ঋষিরা বাহন কী দিতে চান? লাথি মেরে ঋষিদের ছিটকে ফেলে দিয়ে তাঁদের বাহন দখল করেছিল নহুষ।

সঙ্গে সঙ্গে শাপ দিয়েছিল অগ্নিশর্মা ঋষিরা। স্বর্গ থেকে পতন ঘটে গেল নহুষের। তার কোলে বসবার বাধ্যতামূলক বিড়ম্বনা থেকেও নিষ্কৃতি পেল শচীদেবী।

বুদ্ধি যার, বল তার। সময় নেওয়া যাক। গণক ঠাকুরকেও কানে কানে মন্ত্র দিয়ে এল মন্ত্রী, বিয়ের শুভলগ্ন অবিলম্বে নেই, দেরি হবে।

এই সব আয়োজন করতে করতেই খবর পৌঁছে গেছিল বাসবত্তার কানে। এক সতীন পদ্মাবতীকে সে মেনে নিয়েছে মন্ত্রীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে। আবার সতীন?

ডাক পড়ল মন্ত্রীর। কড়াগলায় বলেছিল বাসবদত্তা, এসব কী শুনছি? আপনি আমার মরণ চান?

জিভ কেটে বলেছিল মন্ত্রী, ছিঃ ছিঃ! কীসব উদ্ভব চিন্তা করছেন? আমি থাকতে আপনার নতুন সতীন কস্মিনকালেও হবে না। আপনি কিন্তু পুরো অভিনয় করে যাবেন রাজার সঙ্গে। কলিঙ্গসেনার প্রসঙ্গ উঠলেই ফেটে পড়বেন। চটপট বিয়েটা দেওয়ার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার ভান দেখাবেন। রানি পদ্মাবতীকে এই ছলনার তালিম দিয়ে দেবেন। তাহলে রাজা খুব খুশি হবেন, আপনাদের ওপর খাপ্পা হবেন না। তারপর দেখুন না আমি কী করি।

বাসবদত্তাকে ঠাণ্ডা করে মন্ত্রী রওনা হয়েছিল পরিকল্পনার পরবর্তী কিস্তি রূপায়ণের জন্যে।

কলিঙ্গসেনার ধ্যানে উন্মাদপ্রায় উদয়ন সে রাতে আর অন্তঃপুরেই ঢুকলেন না।

ভোগাকাঙ্ক্ষা কোন পুরুষকে বিচলিত করে না? বিশেষ করে যখন সম্ভোগ লিপ্সা উভয় তরফ থেকে পরস্পরকে তড়িতাবিষ্ট করে রাখে।

৩২. ব্রহ্মরাক্ষসের গল্প

পরের দিন সূর্য উঠতেই ধুরন্ধর মন্ত্রী এসে হাজির রাজা উদয়নের সামনে। উদ্বেগ যেন চোখে মুখে ফেটে পড়ছে। কণ্ঠস্বরেও সেই অভিব্যক্তি, মহারাজ, শুভকাজে বিলম্ব করতে নেই। গণক ঠাকুরকে ডাকুন। লগ্ন স্থির করে দিক। আজকের দিনটা যদি উত্তম হয়, তাহলে বিয়ে হোক আজকেই।

দ্বারপালকে তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন উদয়ন, ডাকো গণৎকারদের।

ওঁর নিজেরও যে আর তর সইছেন না। এক্কেবারে বিয়ে পাগলা হয়ে গেছেন।

যে গণৎকাররা পঞ্জিকা-টঞ্জিকা নিয়ে ভিড় করে এল তাদেরকে গত রাতেই পইপই করে মন্ত্রী শিখিয়ে দিয়ে এসেছিল, রাজা ডাকলে কী বলতে হবে, ছ মাসের মধ্যে শুভ লগ্ন নেই।

বিস্তর সময় নিয়ে গণনার ভান করে তারা এই কথাটাই বলে গেল একবাক্যে।

মন্ত্রী তখন বিলক্ষণ কপট উদ্বেগ প্রকাশ করে বললে, আরও ভালো গণৎকার আনা যাক। বিয়ে দিতে হবে আজকেই।

রাজার হুকুমে এল আর একদল গণৎকার। তাদেরকেও শিখিয়ে রেখেছিল মন্ত্রী, কী বলতে হবে রাজার সামনে। তোতাপাখির মতো তা আউড়ে গেল, ছ মাসের মধ্যে নেই কোনও শুভলগ্ন।

শুনে যেন তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠার ভান দেখিয়েছিল মন্ত্রী। গণৎকার বাহিনী নিয়ে তৎক্ষণাৎ হাজির হয়েছিল কলিঙ্গসেনার সামনে।

বলেছিল, বলুন তো আপনার জন্মের সময়ে কোন নক্ষত্র কী অবস্থায় ছিল। রাশিচক্র দেখে বিচারে বসুক গণৎকাররা। শুভলগ্ন চাই, আজকেই।

আনন্দে ডগমগ হয়ে নিজের রাশিচক্র বলে দিয়েছিল কলিঙ্গসেনা। বিস্তর কপট গণনার পর জ্যোতিষীরা একবাক্যে বলে গেছিল একই মিথ্যে, ছ মাসের মধ্যে নেই কোনও শুভলগ্ন।

মুখ শুকিয়ে গেছিল কলিঙ্গসেনার। মন্ত্রী মশায়ও যেন ভেঙে পড়েছিল জ্যোতিষী বাক্য শুনে। মিন মিন করে বলেছিল কলিঙ্গসেনাকে, তড়িঘড়ি অশুভ সময়ে বিয়ে করা কি উচিত হবে?

ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিল কলিঙ্গসেনা, কক্ষনো না।

বৎস, এই কথাটাই দরকার ছিল ধুরন্ধর শিরোমণি মন্ত্রীমশায়ের। ছুটে গিয়ে রাজাকে জানিয়ে দিয়েছিল, গণৎকারের রায় মেনে নিয়েছে কলিঙ্গসেনা। ছ মাসের আগে বিয়ে হবে না।

ভগ্নমনোরথ রাজাকে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে প্যাঁচপয়জারে তুখোড় মন্ত্রীমশায় তখন মনে মনে ডেকেছিল তার প্রিয় দোস্ত এক ব্রহ্মরাক্ষসকে।

নিমেষে হাজির হয়েছিল ভীষণ দর্শন ব্রহ্মরাক্ষস।

বন্ধু সৌগন্ধনারায়ণ, স্মরণ করেছ কেন?

বন্ধু ব্রহ্মরাক্ষস, তোমাকে একটু খোঁজ খবর নিতে হবে

কার ব্যাপারে? কী ব্যাপারে?

বিয়ে-পাগলি কলিঙ্গসেনার ব্যাপারে।

আরে, সে তো এই পৃথিবীর এক নম্বর সুন্দরী!

সুতরাং লম্পট বিদ্যাধরবা নিশ্চয় তাকে চেখে দেখেছে। এই খোঁজটাই নিতে হবে। পাত্রী কী এখনও অক্ষতযোনি?

সে খবর এনে দেব। আর কী ফররাশ?

যদি এখনও অক্ষতযোনি থাকে, তাহলে কাউকে দিয়ে তাকে রমণ করিয়ে দাও।

তাও করানো যাবে। কিন্তু কেন, বন্ধু কেন?

রাজা উদয়নকে তাহলে বলা যাবে, কলিঙ্গসেনা নষ্ট মেয়ে, তাকে বিয়ে করা সমীচীন নয়।

অত কাণ্ড না করে কলিঙ্গসেনাকে যদি কোঁৎ করে গিলে নিই?

আরে না, না, কাউকে খামোকা প্রাণে মেরে কাজ হাসিল করলে পরিণামটা ভালো হবে না. তুমি শুধু খোঁজ নাও, কলিঙ্গসেনাকে আগে কেউ সম্ভোগ করেছে কীনা। না করে থাকলে, ছলচাতুরি দিয়ে সেটা করিয়ে দাও। মেয়ে যখন খাসা, টোপ গিলবে অনেকেই।

তখন বলাৎকারকেও উপভোগ করবে কলিঙ্গসেনা। শরীর-মিলন ঘটাও, যেভাবেই হোক।

তাই হবে।

কলিঙ্গসেনাকে এক ঝলক দেখে নেওয়ার জন্যে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মরাক্ষস তার সামনে চলে গেছিল অদৃশ্য অবস্থায়, গিয়ে দেখেছিল সখী সোমপ্রভা বলছে কলিঙ্গসেনাকে, কাজটা ভালো করোনি। রাজার কাছে ঘটক পাঠিয়ে ভুল করেছো। শুভ কাজে বিঘ্ন থাকে। সেই বিঘ্নগুলো একে একে সরিয়ে তারপর শুভকাজ করতে হয়। না করলে ফলটা হয় অশুভ। এই সম্পর্কে একটা গল্প মনে এল শোনা বলছি।

অন্তর্বেদী নামে একটা শহর ছিল সেকালে। সেখানে থাকত এক ব্রাহ্মণ। তার নাম বসুদত্ত। তাঁর ছেলের নাম বিষ্ণুদত্ত।

বিষ্ণুদত্ত যোল বছলে পা দেওয়ার পর পড়াশুনোর জন্যে রওনা হল বল্লভীনগরের দিকে। পথে পেল সাতজন বন্ধু। সাতজনেই ব্রাহ্মণ পুত্র। কিন্তু ডাহা বোকা প্রত্যেকেই। কাণ্ডজ্ঞানহীন ছোকরা বলতে যা বোজায়, তাই।

সে যাই হোক, বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হওয়ার পর সাতবন্ধু পণ করেছিল কেউ কাউকে ছেড়ে যাবে না বিষম বিপদের সময়েও। আবার সম্পদের শিখরে আরোহণ করলেও কেউ কাউকে ত্যাগ করবে না।

এটাও ঠিক যে এমন কথা সব বন্ধুই বলে বন্ধুত্ব জমানোর সময়ে, কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় বিপরীত।

শপথ গ্রহণের পর একটু অগ্রসর হওয়ার পরে একটা অলক্ষণ দেখে দূরদর্শী বিষ্ণুদত্ত সেপথে আর না গিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা বলেছিল।

কর্ণপাত করেনি গোঁয়ার বন্ধুরা।

কিছুদূর গিয়েই ফের দেখা গেল অশুভ লক্ষণ। কিন্তু কথা শোনেনি বন্ধুরা। উলটে যথেষ্ট বকাঝকা করেছিল বিষ্ণুদত্তকে।

ক্ষুব্ধ হয়েছিল বিষ্ণুদত্ত। ঠিক করেছিল, তার নয়। প্রাণ যাওয়ার মতো বিপদ লক্ষণ দেখলেও আর মুখ খুলবে না।

সারাদিন হাঁটবার পর সন্ধ্যের দিকে পৌঁছোলো একটা মৃগয়াজীবী মানুষদের পাড়ায়। চালু কথায় যাদের বলা হয়, ব্যাধ।

কিন্তু পাড়া ফাঁকা। একজন ছাড়া। সে এক ব্যাধের বউ। বয়েসে যুবতী। সুন্দরী।

সারাদিন পথচলার ধকলে ক্লান্ত সাত বন্ধু শুয়ে পড়েছিল। ঘুমোতে পারেনি শুধু বিষ্ণুদত্ত, যার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অতিশয় প্রখর, বিপদের পূর্বাভাস পায় অদ্ভুতভাবে।

রাত গভীর হল। চোখ মুদে শুয়ে আছে বিষ্ণুদত্ত। ঘুম নেই চোখে।

হঠাৎ মৃদু পদশব্দ শুনেই সচকিত হয়েছিল। চোখের কোণ দিয়ে দেখেছিল, রূপসী যুবতী ব্যাধ-বধূর ঘরে প্রবেশ করছে এক যুবক ব্যাধ। পা টিপেটিপে। ব্যাধ-বউ জেগেই ছিল। স্পষ্টতই পরপুরুষের প্রতীক্ষায় ছিল।

তারপর যা ঘটল, তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারত না বিষ্ণুদত্ত। নিলাজ ব্যাধ-বধূ সম্পূর্ণ নিরাবরণা হয়ে ব্যাধ-যুবককে দিয়ে যৌবনতৃষ্ণা মিটিয়ে গেল উপর্যুপরি। যেন বুভুক্ষু ছিল এতদিন, আকণ্ঠ যৌন পিপাসায় অস্থির হয়েছিল নিজের বর থাকা সত্ত্বেও, পরকীয়া সম্ভোগেই জ্বালা জুড়োল দেহের।

অতপর ঘুমে নেতিয়ে পড়েছিল সঙ্গম ক্লান্ত দুজনেই।

আর ঠিক সেই সময়ে ফিরে এসেছিল ব্যাধ-যুবতীর বর।

সে গেছিল গ্রামান্তরে। কুলটা বউ ভেবেছিল, দূর গ্রাম থেকে ওই রাতে আর বাড়ি ফিরবে না। তাই মেতে গেছিল রতি উৎসবে।

ব্যাধ-স্বামী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে যখন দেখলে, বিয়ে করা যুবতী বউবস্ত্র ত্যাগ করে পরপুরুষের সঙ্গে সঙ্গম ক্লান্ত অবস্থায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে, তখন বিষম ক্রোধে তলোয়ারের নিপুণ এক কোপে উপপতির মুণ্ড ধড় থেকে কেটে আলাদা করে দিয়ে, দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে না জাগিয়ে, ঘুমিয়ে পড়ল অন্য এক বিছানায়।

অতি কদর্য এবং অতি ভয়ংকর পর-পর এই দুটো ঘটনা দেখবার পর ঘুমোতেও পারেনি বিষ্ণুদত্ত।

তাই দেখেছিল, আচমকা ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসেছে চরিত্রহীনা সেই বধূ। চোখ বড়ো বড়ো করে দেখছে নিহত উপপতি আর নিদ্রিত আপন পতিকে।

মতলবটা মাথায় এল পরক্ষণেই। শয্যাত্যাগ করল নিঃশব্দে। উপপতির কাটা মুণ্ড আর কবন্ধ দেহটা একে একে বয়ে নেয়ে গেল ঘরের বাইরে। পুঁতে রাখল ছাইগাদায়। ফিরে এল ঘরে।

এসেই স্বামীর ফেলে দেওয়া রক্তমাখা তলোয়ারটা দুহাতে মাথার ওপর তুলে এক কোপে ধড় থেকে আলাদা করে দিল মুণ্ড। ব্যাধের বউ তো, অস্ত্রচালনায় নৈপুণ্য আছে।

পরক্ষণেই ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে বুকফাটা চিৎকার ছেড়ে জাগিয়ে দিল পাড়ার লোকদের। হইহই করে তারা ছুটে এসে দেখলে রক্তগঙ্গায় শুয়ে গৃহস্বামী এবং সেই কুলটা মেয়েটার স্বামী ব্যাধ-যুবক। অদূরে মেঝেতে শুয়ে সাতটা ছেলে ঠকঠক করে কাঁপছে বিষম ভয়ে।

নিঃসন্দেহে এই বদমাসরাই খুন করেছে যুবতীর স্বামীকে, যুবতীর বক্তব্যও তাই, ইনিয়ে বিনিয়ে।

খুন চেপে গেছিল পল্লীবাসীদের মাথায়। সাত কোপে সাতজনের মুণ্ড উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে সাতজনকে লাইন দিয়ে দাঁড় করাতেই মুখ খুলেছিল বিষ্ণুদত্ত।

ফাঁস করে দিয়েছিল স্বচক্ষে যা দেখেছে। প্রথমে রমণ, তারপরে উপপতি নিধন, তৎপরে স্বামীবধ।

পরিশেষে ছাইয়ের গাদা ঘেঁটে বের করে দিয়েছিল ব্যাধ, যুবকের কাটা মুণ্ড আর কবন্ধ দেহ।

মুক্তি পেয়ে গেল সাতবন্ধু। প্রাণে বেঁচে গেল। হাড়ে হাড়ে বুঝে গেল, সারাদিনে কেন অতবার বিষ্ণুদত্ত অশুভ লক্ষণ দেখে বাড়ি ফিরে যেতে বলেছিল।

গল্প শেষ করে সোমপ্রভা বললে সখী কলিঙ্গসেনাকে, এই কাহিনির হিতবাক্য একটাই, কোনও কাজের শুরুতে যদি অশুভ লক্ষণ দেখা যায়, তবে জানবে পরিণামে আছে অমঙ্গল। যেমন তুমি করেছো। তর সইল না, ঘটক পাঠিয়ে দিলে রাজার কাছে বেহায়া মেয়ের মতো। পাঠালে অশুভ সময়ে, তাই বাগড়া পড়ছে বিয়েতে, আরও পড়বে বলেই আমার বিশ্বাস। সহজ বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারছি, মন্ত্রীমশায় এ বিয়ে চান না, তাই চালাকি দিয়ে বিয়ে পিছিয়ে দিতেন, তোমার লাশ ফেলেও দিতে পারতেন, অধর্ম হবে বলে তা করেনি। কিন্তু চক্রান্ত করে চলেছেন পাকা মাথায়, এ বিয়েতে দোষ আছে, এটা প্রমাণ করে দিতে পারলেই কোনও পক্ষই বিয়ের ফাঁদে পা দেবে না। মন্ত্রীর পেছনে রাজার অন্য রানিরাও নিশ্চয় আছেন। শতীন সংখ্যা বাড়ুক, এটা মন দিয়ে কোনও মেয়ে চায় না। এখন চলি। আর আসতে পারবো না। স্বামীর ঘরে কত কাজ জানো? তিনি যদি বলেন আসতে, ফের আসব। বলেই চম্পট দিয়েছিল সোমপ্রভা।

চাষার ধর্মকাহিনি

রাজা উদয়নের বাগান বাড়িতে একা থেকে গেল কলিঙ্গসেনা, বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা কলিঙ্গসেনা। একদম একা। মা-বাবা, বন্ধুবান্ধব, স্বজন পরিজন, কেউ নেই। কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও নেই। অষ্টপ্রহর ধ্যান করে যাচ্ছে রাজা উদয়নের। প্রেম আর কামের যুগপৎ আক্রমণে বিস্মৃত হয়েছে বিশ্বসংসার। সোমপ্রভা কী সাধে পালিয়েছে। এমতাবস্থায় অধিকাংশ যুবতী নারীর ললাটলিপিতে কী লেখা থাকে, এবার আসা যাক সেই কাহিনিতে।

কলিঙ্গসেনার সর্বঅঙ্গ সঙ্গমের লালসায় অস্থির, রাজা উদয়নের চিত্তেও নেই শান্তি। কবে যে কামনার অবসান ঘটাবেন, এই কল্পনায় অস্থির দিবারাত্র, বিশেষ করে কামনার রত্ন যখন অনতিদূরে নিজের বাগানবাড়িতেই অবস্থান করছে।

মাঝেমধ্যে শরীর আর মনকে শান্ত করার জন্যে যেতেন বড়ো রানি বাসবদত্তার কাছে। চতুরা বাসবদত্তা মাথায় তুলে রাখত উদয়নকে, দেখেশুনে অবাক হয়ে যেতেন উদয়ন। বাগানবাড়িতে ভাবী সতীন রয়েছে জেনেও বাসবদত্তা তো অখুশি নয়, বরং আহ্লাদে যে ফেটে পড়ছে!

পুরুষের চোখে রং ধরিয়ে দেওয়ার আশ্চর্য এই মন্ত্রগুপ্তি স্রষ্টা দিয়েছেন শুধু রমণীকুলকেই। ছলাকলায় বিভ্রম সৃষ্টি করতে পীনপয়োধরা নিতম্বিনীরা তাই চিরকালই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রাজা উদয়নের চোখেও ধুলো নিক্ষেপ করে গেল দুই রানি সহাস্যে চারুদন্ত, বিদ্যুৎ চক্ষুর আর কুসুম তনুর ইন্দ্রজাল রচনা করে।

প্রীত হয়েছিলেন রাজা উদয়ন। আসঙ্গ-আসনে বসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বাসবদত্তাকে, শুনেছ কি বাগান বাড়িতে একটা মেয়ে এসে রয়েছে আমাকে বিয়ে করার জন্যে?

রক্তিম অধরে রাজাকে চুম্বন দিয়ে বাসবদত্তা বলেছিল, শুনেছি বইকি। খুব খুশিও হয়েছি। এবার থেকে দুজনে যে সুখ আপনাকে দিতে পারছি না, তিনজনে তা পারব নিশ্চয়।

এছাড়াও আপনার বিষয় বৃদ্ধি ঘটবে। আপনি যার জামাই হবেন, তিনি রাজা কলিঙ্গদত্ত আপনার মুঠোয় চলে আসবেন। তাঁর রাজ্যটাও শেষ পর্যন্ত আপনি পেয়ে যাবেন। এ কী কম লাভ? আপনার প্রতাপ বাড়লে আমরা এই ঘরনীরা, খুশিতে নেচে নেচে বেড়াব।

চরমানন্দ বিনিময়ের আগে আর পরে এবম্বিধ আলাপ-আলোচনার পর হৃষ্ট উদয়ন নিদ্রিত হয়েছিলেন। নিশ্চিন্ত নিদ্রা।

অন্তরের অন্তস্তল থেকে একটা দুশ্চিন্তা কিন্তু সেই চেতন মনে উঠে এসে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল রাজা উদয়নের।

একটাই দুশ্চিন্তা কুরে কুরে খেয়ে গেছিল গোটা মনটাকে। রমণীমনের বর্ণালী তাঁর অজানা নয়। কামিনী চিত্তের সর্পিল গতি তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। রানি বাসবদত্তা আর রানি পদ্মাবতী দুজনেই তাঁর মন রেখে স্তোকবাক্য দিয়ে যাচ্ছেন তো? রাজা উদয়ন তাদের চোখের মণি। সেই মণি যখন তৃতীয় রমণীর দখলে যাবে, তখন চাপা কষ্টে দুজনেই আত্মঘাতী হবে না তো?

কলিঙ্গসেনা তো তখন সব সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

না। এ মেয়েকে বিয়ে করা উচিত নয়। কক্ষনো নয়। অকল্যাণের অগ্রদূত এই কন্যা উদ্যান আলো করেই থাকুক, অন্তঃপুরে প্রবেশ যেন না ঘটে, বধূরূপে।

পরের রাতে পদ্মাবতীও বিবিধ আসঙ্গ আসনে রাজা উদয়নকে চরম তৃপ্তি দিয়ে সহাস্যে বলেছিল, আসুক, আসুক, কলিঙ্গসেনা আসুক। তিন বউ তিনটে সুখের পাহাড় রচনা করবো আপনাকে ঘিরে।

বিমূঢ় রাজা পরের দিন মন্ত্রীর শরণাপন্ন হলেন।

ব্যাপার কী? দুই রানিই যে সতীন চাইছে?

মন্ত্রী বললে, ওটা মুখের কথা, মনে মনে কোনও নারীই সতীন চায় না। রমণীমনের গতিপ্রকৃতি সবজান্তা দেবতারাও জানতে পারেন না, মানুষ কোন ছার। শুনুন তাহলে একটা গল্প।

দক্ষিণ ভারতে গোকর্ণ নামে একটা জনপদ ছিল। সেখানকার রাজা ছিলেন শ্রুতসেন। বহু গুণের অধিকারী হয়েও তিনি সব সময়ে বিষাদ নিমগ্ন থাকতেন। কারণ তাঁর ঘরে বউ ছিল না।

এই সময় হরিশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ একদিন তাঁকে দুটো অদ্ভুত বৃত্তান্ত শোনালেন।

প্রথম বৃত্তান্ত : হরিশর্মা তীর্থ করতে বেরিয়েছিলেন। পঞ্চতীর্থে পৌঁছেছিলেন। এই তীর্থের এহেন নামকরণের পেছনে আছে এক বিচিত্র কাহিনি। পাঁচজন পরমাসুন্দরী বিষম চপলা অপ্সরা যৌবনমদে মত্ত হয়ে এক মুনিকে বিরক্ত করে গেছিল বিবিধ কাম-কৌতুকের প্রদর্শন ঘটিয়ে, অশোভন উক্তি আর বারনারীসুলভ গোপনাঙ্গ প্রদর্শনও ছিল সে সবের মধ্যে।

ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন ঋষি। কঠোর তপস্যাবলে তিনি অপরিমেয় সূক্ষ্ম শক্তির অধিকারী ছিলেন। স্থূল প্রমোদ লালসার উৎকট প্রকাশ দেখে শাপ দিয়েছিলেন পাঁচ অপ্সরাকে। বাকসিদ্ধ পুরুষ তিনি। যা বলেছিলেন, অতি অদ্ভুত সেই কাণ্ডই ঘটে গেছিল চক্ষের নিমেষে।

পাঁচ ললনা তাদের রূপযৌবনে ফেটে পড়া আকৃতি হারিয়েছিল নিমেষ মধ্যে।

মুনি বলেছিলেন, তোরা কদাকার কুমির হয়ে থাক।

তৎক্ষণাৎ পঞ্চকুমিরে রূপান্তরিত হয়েছিল পঞ্চকন্যা।

কিন্তু তাদের সাপমুক্তি ঘটেছিল আর এক শক্তিমান পুরুষের আবির্ভাবে। তিনি পাণ্ডুপুত্র অর্জুন, পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম।

সেই থেকে পাঁচ অপ্সরা পরে পাঁচ কুমিরের আবাসস্থলের নাম হয়ে যায় পঞ্চতীর্থ। এমনই পুণ্যময় অঞ্চল যেখানে গিয়ে পাঁচদিন উপোস করে স্নান করলেই বিষ্ণুলোকে যাওয়ার পথ সুগম হয়ে যায়।

হরিশর্মা দেখলেন, একজন চাষা সেখানকার জমিতে লাঙল দিতে দিতে মনের আনন্দে গলা ছেড়ে গান ধরেছে।

তন্ময় হয়ে গান শুনছিলেন হরিশর্মা, এমন সময়ে সেখানে হাজির হয়েছিলেন এক ভিক্ষু, নিত্যভ্রমণকারী সন্ন্যাসী। গাইয়ে চাষাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পথঘাটের হদিশ।

কিন্তু প্রশ্নটা চাষার কানে ঢোকেনি। সংগীত সুধায় বিভোর হয়েছিল বলে।

বার দু-তিন একই প্রশ্ন করে গেছিলেন পরিব্রাজক। কিন্তু সংগীত ধ্যানে ধ্যানস্থ চাষার তা কর্ণগোচর হয়েনি।

রেগে আগুন হয়ে গেছিলেন ভিক্ষু। সামান্য এক চাষার এতবড়ো স্পর্ধা। সন্ন্যাসীকে পাত্তাই দিচ্ছে না।

শুরু হয়েছিল বকাঝকা। ফলে সংগীতচর্চা স্তব্ধ করে চাষা বলেছিল বিক্ষুকে, আপনি নিত্য ভ্রমণকারী সন্ন্যাসীর সাজে সেজেছেন বটে, কিন্তু ধর্ম কি বস্তু, সে জ্ঞান এখনও হয়নি। কিন্তু আমার হয়েছে, যদিও আমি অশিক্ষিত চাষা।

লজ্জায় মাথা হেঁট হয়েছিল ভিক্ষুর। এমন কী ধর্মজ্ঞান সামান্য এই চাষা জেনে ফেলেছে, যা এত ঘুরেও তাঁর হয়নি?

জ্ঞানের আকর সেই ধর্মজ্ঞান চাষার মুখে শুনতে চেয়েছিলেন ভিক্ষু।

গাছের ছায়ায় পরিব্রাজককে বসিয়ে ধর্মতত্ত্ব বলতে শুরু করেছিল চাষা।

বলেছিল একটা গল্প।

এই যে গ্রাম দেখছেন, এখানে থাকেন তিনজন ব্রাহ্মণ। তাঁদের নাম যজ্ঞদত্ত, সোমদত্ত আর বিশ্বদত্ত। তিন ভাই। বড়ো দুভাই বিয়ে করেছেন, ছোটো করেননি। তিনজনে একসঙ্গে থাকেন। আমিই তাঁদের চাষা। থাকি ওঁদেরই বাড়িতে। ছোটো ভাই বিশ্বদত্ত থাকেন ঠিক বাড়ির চাকরের মতো, আমার সঙ্গে। ফাইফরমাশ খেটে যান। কিন্তু মানুষটা ভালো, নির্মল চরিত্র। তবে বড়ো বোকা।

একদিন তাঁর বড়বৌদি আর মেজবৌদি তাদের অতৃপ্ত কামক্ষুধা নিবারণের জন্যে ছোটো ঠাকুরপোকে এসে ধরেছিল। দেবর মানেই তো দ্বিতীয় বর। সুতরাং শরীরের খিদে মিটিয়ে দিক দেবর।

নির্বোধ কিন্তু সদাচারী বিশ্বদত্ত দুই বৌদিকে সঙ্গম করতে রাজি হয়নি। তার বিবেক সায় দেয়নি।

সম্ভোগ পিপাসায় অস্থির হয়েই দুই বৌদি শলাপরামর্শ করে এসেছিল দেবরের কাছে। তাগড়াই পুরুষকে দিয়ে প্রতিদিন একাধিকবার কামতপ্ত শরীরের আগুন নিভানো যেত। দেবর তো ঘরের পুরুষ, পরপুরুষ তো নয়। তাদের যুক্তিতে, এর মধ্যে কেচ্ছা নেই। বরং দেওরের লাভ হত। দু-দুটো বৌদিকে যখন তখন রমণ করতে পারত। দ্রোপদী করেনি?

দেবরের প্রত্যাখ্যান তাদের বাঘিনী করে তুলেছিল। নারীর সম্ভোগ তৃষ্ণার নিবারণ যে পুরুষ ঘটায় না, নারী তাকে ক্ষমা করে না।

দেবরের নামে দুই বৌদি বানিয়ে বানিয়ে নালিশ করেছিল তাদের স্বামীদের কাছে। পতি পরম গুরু, সতীর ধর্মরক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে এই বাড়িতে। আইবুড়ো দেওর তাদের দুজনকেই শয্যাসঙ্গিনী করতে চায়। প্রতিদিন বুভুক্ষু শরীরের তৃষ্ণা মেটাতে চায় বৌদিদের উপর্যুপরি সঙ্গম করে। বলদৃপ্ত ঠাকুরপোকে তারা আটকাতে পারছে না। পারেনি। ধর্ষিতা হয়েছে।

প্রকৃত ঘটনার বিপরীত প্রতিবেদন ঘরের বিয়ে করা বৌদের কাছে শুনে ইস্তক তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল দুই দাদা।

সোজাসুজি বলেছিল ছোটোভাইকে, এ বাড়িতে আর থাকতে হবে না। দূর হও। মাঠে গিয়ে মাটি কাটো। ঢিপি-টা কেটে সমান করো।

আসল কথা না ভেঙে নিরুত্তরে বিশ্বদত্ত তৎক্ষণাৎ কোদাল নিয়ে চলে গেছিল মাঠে। একটাই ঢিপি ছিল চাষের খেতে। কেউ কখনও কোদাল চালাতনা সেই ঢিপি তে। কেন, তা জানতো দুই দাদা। জানতাম

আমিও। জানতো না শুধু বোকা বিশ্বদত্ত।

বৌদিদের রমণেচ্ছায় রাজি না হওয়ায় দাদাদের ধমক খেয়ে সেই ঢিপিতেই বিশ্বদত্ত কোদাল চালনা করতে উদ্যত হতেই আমি তাকে নিষেধ করেছিলাম।

বলেছিলাম, করছেন কী? ঢিপির মধ্যে যে সাপের বাসা। ওই গর্ত দিয়ে চরতে বেরোয় মাঠে। ফিরে যায় গর্ত দিয়ে।

বোকা বিশ্বদত্ত, গোঁয়ার বিশ্বদত্ত, আমার সদুপদেশে কর্ণপাত করেনি। আমি যে বাড়ির চাকর, চাষা।

আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটল কিন্তু তারপরেই।

সাপের বদলে গর্ত থেকে ঠিকরে এল দু-দুটো মোহরভর্তি কলসি, কোদাল চালনা শুরু হতেই।

আমি বলেছিলাম, দুটো কলসিই আপনার কাছে রাখুন। কাউকে দেবেন না।

মূর্খ বিশ্বদত্ত, সচ্চরিত্র বিশ্বদত্ত, আমার কথা শোনেনি। সোনার টাকা বোঝাই কলসি দুটো ঘাড়ে করে দাদাদের দিয়েছিল। যদি তাদের রাগ কমে।

কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। পরিণামটা হয়েছিল আরও খারাপ। মাঠের ফসল যেমন তিনভাগ হয়, এই সোনার টাকাও তো তিনভাগ করতে হবে। একভাগ দিতে হবে ছোটো ভাইকে।

না দেওয়ার মতলবে, ছোটো ভাইয়ের হাত-পা বেঁধে একটা ঘরে ফেলে রেখেছিল দুই সহোদর দাদা। তাতেও খুশি না হয়ে ধারাল অস্ত্র দিয়ে চিরে চিরে দিয়েছিল সারা গা, যাতে ক্ষতস্থান বিষিয়ে গিয়ে অক্কা পায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বেঁধে রেখেছিল হাত আর পা।

মুখ বুঁজে সব সয়ে গেছিল বিশ্বদত্ত। এতটুকু প্রতিবাদ করেনি। তার চোখে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা গুরুজন, তাদের পত্নীরাও গুরুপত্নী। অন্যায় আচরণ তার ধর্মে লেখা নেই।

এই হল ধর্ম। গতিপ্রকৃতি বোঝা ভার। বড়ো রহস্যময়।

ধর্মাচরণের পথ কোনটা ঠিক, আর কোনটা বেঠিক, তা সহজবুদ্ধি দিয়ে মানুষ বুঝে ওঠে না। ধর্মকর্ম তাই মানবমনের কাছে চির প্রহেলিকা। প্রকৃত ধর্মের রূপরেখা আজও তাই রহস্যাবৃত। ধর্ম অধর্মের ভেদাভেদ গোটা বিশ্বের মানুষের কাছে হরেক রকম, বড় বিচিত্র।

সারা দেহে কাটাকুটির উল্কি বানিয়ে ছোটো ভাইকে প্রায় মড়া বানিয়ে ঘরে ফেলে রেখে গেছিল অর্থপিশাচ কানপাতলা দুই দাদা। কিন্তু ধর্ম তার নিজস্ব গতি অনুসরণ করে নিরাময় করে তুলেছিল বিশ্বদত্তকে।

এই ধর্ম তার নিখাদ ভাই-ভক্তির ধর্ম।

কাটাছেঁড়া মিলিয়ে গেছিল গা থেকে। জ্বালাযন্ত্রণা আর থাকেনি। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে বসেছিল। আপনা থেকেই খসে পড়েছিল হাত-পায়ের বাঁধন!

বিস্ময়-বিমূঢ় দাদা-বৌদিদের সামনে দিয়েই ঘুরে ফিরে বেরিয়েছে। নিজের কাজ করে গেছে, মুখে টুঁ শব্দটি করেনি। ক্ষোভ নয়, প্রতিবাদ নয়, শুধু সহ্য, সহ্য, সহ্য!

এই মহাশক্তি, সহ্যশক্তি, সব ধর্মের মূল।

আমি নিজের চোখে দেখেছি এই দৃশ্য। বুঝেছি, রাগ ত্যাগ করে জীবন কাটাতে পারলে আমিও বিশ্বদত্তর মতো স্বধর্মে শক্তিমান হয়ে থাকব। কিন্তু আপনি ভিক্ষু হয়েও ক্রোধ ত্যাগ করতে পারেননি। ধর্মজ্ঞান হয়নি বলেই ক্রোধ রিপুকে বিসর্জন দিতে পারেননি। যে রাগতে জানে না, তার চাইতে বড়ো ধার্মিক আর হয় না। আপনি ধার্মিক নন। আপনি জানেন না, ক্রোধশূন্যতাই সব ধর্মের সার।

কাহিনি সমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে মরদেহ ত্যাগ করেছিল চাষা। গেছিল অমরলোকে।

হরিশর্মা বললেন রাজা শ্রুতসেনকে, এই গেল প্রথম বৃত্তান্ত। এবার শুনন দ্বিতীয় বৃত্তান্ত। বিদ্যুদ্দ্যোতার কাহিনি

দ্বিতীয় বৃত্তান্ত : বেড়াতে বেড়াতে একদিন রাজা বসন্তসেনের রাজ্যে পৌঁছেছিলাম। অন্ন বিতরণশালায় যাচ্ছিলাম খাওয়ার জন্যে, জনাকয়েক ব্রাহ্মণ বললেন, ওদিকে যাবেন না।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন যাবো না?

বাহ্মণরা বললেন, রাজকন্যা বিদ্যুদ্দ্যোতা রয়েছে ওদিকে।

তাতে আমার কী?

প্রাণে বাঁচবেন না। প্রথমে কামের জ্বালায় ছটফট করবেন, তারপর মরবেন। ঋষিরাও কামের জ্বালায় ছটফটিয়ে ওঠেন তাকে দেখে। পাগল হয়ে যান। মারা যান।

মূর্তিময়ী কাম? প্রকৃতই কামিনী ওই রাজকুমারী?

হ্যাঁ। সাবধান, পথিক, সাবধান। যে আগুনকে দেখা যায় না, সেই আগুনই আপনাকে জ্বালিয়ে দেবে ভেতর থেকে। সর্বনাশা কামের আগুন। বিদ্যুদ্দ্যোতাকে একবার দেখলেই তার দহন শুরু হয়ে যায় অণুপরমাণুতে। পাগল হয়ে যেতে হয়। পরিশেষে আসে মরণ। এতএব, হে পথিক, ওমুখো হবেন না।

রমণ-ইচ্ছা জাগানো রমণী বিদ্যুদ্দ্যোতার কাহিনি শুনেই আমার মনে পড়ে গেছিল রাজা শ্রুতসেনের কথা। সত্যিই যেন কন্দর্প ছিলেন তিনি। অর্থাৎ, কামদেব স্বয়ং প্রেম, আর কামের দেবতা। সর্গের অপ্সরাদের অধিপতি। মানুষের মনে কামভাবের উদ্রেক করাই ছিল কন্দর্পের কাজ। সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন আর স্তম্ভন, এই পঞ্চশর নিক্ষেপ করে নিদারুণ কাম সৃষ্টি করে মানুষ কেন ঋষি আর দেবতাদেরও বাতুল বানাতে তিনি সিদ্ধহস্ত, বিশেষ করে ছলনাময়ী অপ্সরা কাহিনি যাঁর অনুগত।

রাজা শ্রুতসেন মানব হয়েও এই কাণ্ড করে বেড়াতেন। তিনি পথে বেরোলে বাড়ির বউরা কামানলে দগ্ধ হয়ে সতীত্ব বিসর্জন দিতে চায়, মনে মনে ব্যভিচার করে চলে, রাজা শ্রুতসেন তাদের রকমারি যৌন আসনে পরিতৃপ্ত করে যাচ্ছেন, এবংবিধ কামচিন্তায় অষ্টপ্রহর নিমগ্ন থাকে।

সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন আর স্তম্ভন, এই পঞ্চশক্তি সক্রিয় হয় নারীমনে তাঁকে দেখলেই।

এই কারণেই রাজা শ্রুতসেন পথে বেরোলেই, সতী মেয়েদের পথ থেকে সরিয়ে দিত রাজরক্ষীরা।

সবই আমি জানতাম। জেনেশুনেও সটান চলে গেলাম বিনাপয়সায় ভাত খাওয়ার জায়গায়। সেখানকার কাজকর্ম যিনি দেখেন, তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন রাজার কাছে।

দেখলাম বিদ্যুদ্দ্যোতাকে। অহো, অহো, কন্দর্পের পঞ্চশর যেন কায়াগ্রহণ করেছে সেই মেয়ের সর্ব অঙ্গে। মনে মনে ভাবলাম, এমন নারীই তো আমাদের রানি হওয়ার উপযুক্ত। রাজা অবশ্য রাজ্যপাট বিস্মৃত হবেন ললনা বিদ্যুদ্দ্যোতাকে দেখে। তাই বলে কি, এমন অত্যাশ্চর্য কামিনীর কথা রাজাকে বলব না? তাই দৌড়ে এলাম আপনার কাছে। মহারাজ, আমার কাহিনি সমাপ্ত হয়েছে। পরপর দুটি বৃত্তান্ত বললাম, এখন এর মর্ম বুঝে আপনার ধর্ম আপনি পালন করুন।

মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ বললে রাজা উদয়নকে পরপর দুটো ঘটনা ব্রাহ্মণের মুখে শুনেও সাবধান হননি রাজা শ্রুতসেন। বিয়ে করেছিলেন বিদ্যুদ্দ্যোতাকে। কিন্তু নিদারুণ কামানল তাঁর বুদ্ধিবিবেচনা নাশ করে দিয়েছিল কিছুদিনের মধ্যেই। বিদ্যুদ্দ্যোতা তাঁর শরীরে যে আগুন এনে দিয়েছিল, তার নিবারণ ঘটানোর সাধ্য তার একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কামের লেলিহ শিখায় ধিকিধিকি জ্বলে মরা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে আর এক রাজকন্যার রূপযৌবন নিয়ে দেহের খেলায় মেতেছিলেন রাজা শ্রুতসেন। পরিণাম যা ঘটবার, তা ঘটেছিল। একদা প্রাণেশ্বরী বিদ্যুদ্দ্যোতা নিছক দেহের ইন্ধন জুগিয়ে বেঁচে থাকাটা বারবনিতার কাজ বলে মনে করেছিল। একই স্বামী যুগপৎ দুই রানিকে সম্ভোগ করেও তৃপ্তি পাচ্ছেন না, আরও চাই, আরও চাই কামতৃষ্ণা তাঁকে দগ্ধে মারছে দেখে মনের দুঃখে মরদেহ ত্যাগ করেছিল বিদ্যুদ্দোতা। বিদ্যুদ্দ্যোতা বিহনে চোখে অন্ধকার দেখেছিলেন রাজা, যে নিদারুণ তাপপ্রবাহ নিরন্তর তাঁকে দগ্ধে মারছিল, অকস্মাৎ তার তিরোধান ঘটায় মানসিক আঘাতে নিভে গেছিল রাজা শ্রুতসেনের প্রাণের প্রদীপ। ঘটনার আকস্মিকতায় দ্বিতীয় পত্নী মাতৃদত্তাও পরলোকে প্রস্থান করেছিল। কামানল, কামিনী সম্ভোগ আর কাম রিপুকে নিরন্তর প্রশ্রয় দেওয়ার পরিণামে সব হারালেন রাজা শ্রুতসেন, ছারখার হয়ে গেল রাজ্য।

একটু থেমে বলেছিল মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ, এই যেসব কাহিনি বলে গেলাম, এ সবের মধ্যে হিতোপদেশ কিন্তু একটাই : যে নারী প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, ভালোবাসার সেই মনের মানুষ যদি ষোলআনা ভালোবাসা ফিরিয়ে না দেয়, তাহলে সেই মর্মান্তিক আঘাত চিতার আগুনের চাইতেও দুঃসহ। দেহমন্দির থেকে প্রাণ প্রতিমাও তখন বিদায় নেয়। নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার পর নারী যদি দেখে ঠকে গেলাম, তখন কী সে আর চায় প্রমহীন দেহ-দেবালয় হোক নিছক শরীরের জ্বালা নিবারণের উপকরণ সে কী কাঠের পুতুল? বারনারী?

রাজা উদয়ন একাগ্রমনে মন্ত্রী-বচন শ্রবণ করার পর বললেন, মোদ্দা কথাটা কী?

মন্ত্রী বললে, সারকথা এই : কলিঙ্গসেনার গলায় মালা দিলে আপনার আগের দুই স্ত্রী মারা যাবেন। যা না থাকলে রাজপুত্র নরবাহনদত্তের অবস্থা শোচনীয় হবে। আপনি নিজেও ভেঙে পড়বেন। রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে।

উদয়ন বললেন, সর্বনাশ!

মন্ত্রী বললে, এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে সব নষ্ট হয়ে যায়। উদয়ন বললেন, তাহলে কলিঙ্গসেনাকে বিয়ে করব না। জ্যোতিষীরা অবিলম্বে শুভ লগ্ন পাচ্ছে না বিধি সদয় বলে। তবে আমার একটু অধর্ম হবে বইকি।

মন্ত্রী বললে, কী অধর্ম?

উদয়ন বললেন, রাজার মেয়েরা যখন নিজেরাই বর বেছে নিয়ে বিয়ে করতে আসে, তখন তাদের বিমুখ করাটা অতিশয় অধর্ম।

বুদ্ধিমান মন্ত্রী কাজ হাসিল করে সাজসভা থেকে চম্পট দিতেই রাজা চলে গেলেন বড়ো রানি বাসবদত্তার কাছে। তাঁর যে সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে, তা বললেন। ঘরের বউদের মনে কষ্ট দিয়ে পরের মেয়েকে আর বউ বানাবেন না, তা জানিয়ে দিলেন।

বাসবদত্তার সঙ্গে রজনী অতিবাহিত হল বড়ো আনন্দে।

সৌগন্ধনারায়ণ কিন্তু বসে নেই। বিচক্ষণ সবদিকেনজর রাখতে হয়। কলিঙ্গসেনার চরিত্র নষ্ট হয়েছে কিনা জানবার জন্যে যে ব্রহ্মরাক্ষসকে নিযুক্ত করেছিল, সে আসতেই কানখাড়া করে শুনে যাচ্ছিল কলিঙ্গসেনা, উচ্ছিষ্ট হওয়ার পর এখানে এসেছ কিনা।

কিন্তু হতাশ হয়েছিল,

ব্রহ্মরাক্ষসের মতো অদৃশ্য অনুচরও সে রকম কোনও সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেনি। কলিঙ্গসেনার দেহে মনে মালিন্য নেই এতটুকু। সে সত্যিই ভোরের তাজাফুল। নির্জন বাগানবাড়িতে সে একাস এক্কেবারে একা, কেউ তার কাছে আসে না।

তবে হ্যাঁ, একটা ব্যাপার খটকা লেগেছে ব্রহ্মরাক্ষসের। রোজ সন্ধ্যায় বাগানবাড়ির ছাদে দুমদাম আওয়াজ হয়। অথচ কাউকে দেখা যায় না, ব্রহ্মরাক্ষস সংকেত-বিদ্যা প্রয়োগ করেছিল। শব্দ সংকেতের মধ্যে দিয়ে কী জ্ঞাপন করা হচ্ছে, তা জানবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হালে পানি পায়নি। ভয়ানক ভয়ানক আওয়াজ দিয়ে কী বোঝানোর চেষ্টা চলছে, তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারেনি।

তখন ব্রহ্মরাক্ষসের মনে হয়েছিল, নিশ্চয় কোনও উচ্ছৃঙ্খল বিদ্যাধর তনয় সুন্দরী মেয়েছেলে দেখে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে রাত গভীর হলে। অধরে অধর জঘনে জন সংযোজনের তাড়নায় নির্দেশক শব্দ সৃষ্টি করে চলেছে।

মন্ত্রী বললে, ওহে ব্রহ্মরাক্ষস, জ্ঞাপনী অথবা সংকেত নির্দেশক বিদ্যা প্রয়োগ করে যা জানা যায় না, সেই রহস্যের ভেতরে ঢুকে যাওয়া যায় স্রেফ বুদ্ধিচালনা করে। বুদ্ধির চেয়ে বড়ো শক্তি আর নেই এই ধরাধামে। যাও, যাও, ফের যাও। বুদ্ধি খাটিয়ে বের করো শব্দের পেছনে সূক্ষ্মলোকের কামার্ত কোনও পুরুষ আছে কিনা। নিশ্চয় আছে। কলিঙ্গসেনার ওই আগুন রূপ মানুষ কেন, দেবতাদের কামযন্ত্রের শিহরণ জাগিয়ে

তুলতে পারে। নিশ্চয় কোনও পুরুষের যাতায়াত আছে কলিঙ্গসেনার ঘরে রাত্রি নিশীথে। কান পেতে শুনবে, পুরুষের গলা পাও কিনা, প্রণয়ভাষণ আর সম্ভোগ শব্দ শোনা যাচ্ছে কিনা। যদি হদিশ পেয়ে যাও, তাহলেই নিশ্চিন্ত হবে। উচ্ছিষ্ট কলিঙ্গসেনাকে রাজা উদয়ন কক্ষনোই আর ভোগ করবার লালসা মনের মধ্যে পোষণ করবেন না। তখন আর তাঁর অধর্ম হবে না।

ব্রহ্মরাক্ষস অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, অধর্ম? মেয়েমানুষ যদি স্বেচ্ছায় শয্যাসুখ দিতে চায়, তাতে অধর্ম কী?

মন্ত্রী বলেছিল, যে মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে শয্যাসুখ দিতে চায়, তাকে ভোগ না করাটা অধর্ম, রাজার মতে। কিন্তু যে নারী গৃহত্যাগ করে এসে, কাম্য পুরুষের অভাবে ভিন্ন পুরুষকে দিয়ে জ্বালা জুড়েচ্ছে, তাকে গ্রহণ না করাটা অধর্ম নয়।

ব্রহ্মরাক্ষস পুলকিত হয়ে বললে, মন্ত্রীবন্ধু, সত্যিই তোমার বুদ্ধি আছে বটে। মেয়ে জাতটার মস্ত সুবিধে এই একটি ব্যাপারে। ইচ্ছে না থাকলেও অনিচ্ছাতেও রমণ সুখ পেয়ে যায়। তবে কী জানো, কলিঙ্গসেনা সে ধাতুতে গড়া মেয়ে নয়। রাজা উদয়ন ছাড়া তার মনে ভিন্ন পুরুষের চিন্তা নেই। সারাদিন গুম হয়ে বসে থাকে, বিকেল হলেই ছাদে উঠে দেখে রাজপ্রাসাদের ছাদে বেড়াচ্ছেন রাজা উদয়ন, তাতেই তার শান্তি।

গোপন তদন্তে এবার বুদ্ধি প্রয়োগ করার মনস্কামনা প্রকাশ করে বিদায় নিয়েছিল ব্রহ্মরাক্ষস গুপ্তচর।

বেচারি কলিঙ্গসেনা! তার নির্মল প্রেম নিয়ে এত সন্দেহ? এত কূটকচালি?

সন্ধ্যের পর সে যখন রাজা উদয়নের ধ্যানে নিমগ্ন, ঠিক তখন তার বাড়ির আশেপাশে খরনজর রেখে চলেছে ব্রহ্মরাক্ষস।

এইবার একটা পূর্বকাহিনি স্মরণ করিয়ে দেওয়া যাক পাঠককে। মদনবেগকে মনে পড়ছে? সুন্দরীপ্রিয় মদনবেগ? জন্ম তার বিদ্যাধরলোকে। কিন্তু নজর তার মর্ত্যের ললনাদের দিকে। কলিঙ্গসেনার লালিত্য তাকে প্রলুব্ধ করেছিল। কিন্তু পাছে মর্ত্যের মানবীর সংসর্গে তার দিব্যদেহ দূষিত হয়ে যায়, এই ভয়ে সে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্যে বিজ্ঞাপন বিদ্যার স্মরণ নিয়েছিল। সবজান্তা বিদ্যাঠাকরুণ এসে তাকে অভয় দিয়ে বলেছিল, ভয় নেই, ভয় নেই! কলিঙ্গসেনার বরতনুতে নেই কোনও মানুষী বিষ। ও মেয়ে যে আগে দেবকন্যা ছিল, শাপ খেয়ে কলিঙ্গদত্তের মেয়ে হয়ে জন্মেছে। নির্বিষ মেয়ে, নিঃশেষে ভোগ করা যায়।

সেই থেকে কামজ্বরে ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছিল মদনবেগ কলিঙ্গসেনার বাড়ির আশেপাশে, প্রতিদিন। রাত ঘন হলেই আতীব্র হত সম্ভোগ লিপ্সা, বিদ্যাধরদেহের কামপ্রবাহ শব্দ রচনা করে যেত বাড়ির ছাদে, রমনীদেহে সুখপ্রবাহ সৃষ্টি করতে না পেরে।

ব্রহ্মরাক্ষসকে যেদিন বুদ্ধি প্রয়োগ করে পুনর্বার গোয়েন্দগিরি করতে পাঠিয়েছিল মন্ত্রী, ঠিক সেইদিনই আচম্বিতে কামাতুর মদনবেগের মনে পড়ে গেছিল শিবের আদেশ। তিনি তো পুজো পেয়ে প্রসন্ন হয়ে কলিঙ্গসেনাকে রমণের গুপ্তকৌশল জানিয়ে গেছেন মদনবেগকে।

নকল উদয়ন সেজে যেতে হবে কলিঙ্গসেনার সামনে! এই সহজতম পন্থাটা এতদিন ভুলে মেরে দিয়েছিল মদনবেগ, মদনজ্বালা অসহ্য হয়ে ওঠায়!

অতএব আর বিলম্ব নয়।

সেই রাতেই স্বীয় গুপ্তবিদ্যা খাটিয়ে মদনবেগ হয়ে গেল অবিকল রাজা উদয়ন। দর্পণে প্রতিবিম্ব যে রকম, হুবহু সেই রকম। এসব আশ্চর্য বিদ্যা জানে বলেই তো সে বিদ্যাধর।

কলিঙ্গসেনা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছিল অকস্মাৎ নিশুতি রাতে মনের মানুষ রাজা উদয়নকে চোখের সামনে দেখে। তার চিন্তার চৌম্বক শক্তিই যে রাজাকে গভীর রাতে কলিঙ্গসেনাকে ভোগের লালসায় উদ্দীপ্ত করেছে, সে বিষয়ে চাক্ষুস প্রমাণ পেয়ে শুভকাজে আর দেরি করেনি। পাত্রপাত্রী দুজনেই চাইছে যখন দুজনের কামানলে নিজেদের শরীর স্নিগ্ধ করতে চায়, তখন বিবাহ সাঙ্গ হয়েছিল তৎক্ষণাৎ। অবশ্যই গান্ধর্ব মতে, স্রেফ মালাবদল করে। এখন তারা বর বউ। আর কোনও বাধা নেই শরীর খেলায়।

আড়ালে অদৃশ্য ব্রক্ষরাক্ষসের অগোচর রইল না কিন্তু কিছুই।

সে ভাবল, যাচ্চলে! যার দোষ খুঁজতে এসেছিলাম, এখন তো দেখছি তাকেই দুষ্টু করে দিতে এসেছেন দোষ-সন্ধানী রাজা নিজে। তাহলে আমি আর রমণ-রঙ্গালয়ে কেন হাজির থাকব! যেখানে আমার ঠাঁই, পালাই সেই শ্মশানে। যাবার সময়ে খবরটা ঢেলে দিয়ে যাব মন্ত্রীর কানে।

সুচতুর এবং বহুদর্শী মন্ত্রী কিন্তু ব্রহ্মরাক্ষসের আনা সমাচারের একটা বর্ণও বিশ্বাস করতে পারেনি। কাপট্য আর ছলনা ভেদ করে গুপ্ত ব্যাপার দেখবার জ্ঞান তার আছে বলেই এতবড়ো রাজ্যের সে মন্ত্রী। তার চোখে ধুলো দেওয়া এত সহজ নয়।

সটান বললে গুপ্তচরকে, হতেই পারে না। রাজা উদয়ন লুকিয়ে যাবে পরের মেয়ের সঙ্গে বিছানায় শুতে? বলছ কী?

কিন্তু আমি যে স্বচক্ষে দেখলাম......

মায়া দেখেছ। মরীচিকা দেখেছ। নিশ্চয় কেউ রাজা উদয়ন সেজে রাজকুমারী কলিঙ্গসেনার ধর্মনাশ করতে এসেছে।

হুবহু রাজা উদয়ন যে?

জবর বিদ্যা জানা থাকলে সেটা অসম্ভব নয়। মর্ত্যলোকের কেউ এবিদ্যে জানে না, জানলে অনর্থ বেঁধে যেত। জানে কেবল দেবলোক অথবা বিদ্যাধরলোকের মায়া পারঙ্গম ব্যক্তিরা। মেয়েদের রূপই মেয়েদের সর্বনাশ করে।

কলিঙ্গসেনা নিশ্চয় অজ্ঞাতসারে এই রকম কাউকে কাম-পাগল করেছে। রাজা উদয়নের ছদ্মবেশে সে এসেছে। প্রমাণ, রাজা উদয়ন এই মুহূর্তে অন্দরমহলে আছেন, বাগানবাড়িতে নেই।

ব্রহ্মরাক্ষস বললে, হতেই পারে না।

মন্ত্রী বললে, তাহলে এসো আমার সঙ্গে।

অন্দরমহলে প্রবেশের গুপ্তদ্বার কোথায়, মন্ত্রী তা জানত। সেইখান দিয়ে অন্দরমহলে ব্রহ্মরাক্ষসকে নিয়ে গেছিল মন্ত্রী। আঙুল তুলে দেখিয়ে বলেছিল, কি দেখছ?

ব্রহ্মরাক্ষস চক্ষু বিস্ফারিত করে দেখেছিল অবিশ্বাস্য সেই দৃশ্য! একই উদয়ন রাজা বাসবদত্তা বানিকে নিয়ে কামকেলিতে আত্মহারা!

সৌগন্ধনারায়ণ কিন্তু এতটুকু দেরি না করে ব্রহ্মরাক্ষসকে নিয়ে পরমুহূর্তেই হাজির হয়েছিল বাগানবাড়িতে। দেখিয়েছিল, কী নিশ্চিন্ত মনে নিরাবরণা দেহবল্লরীকে বিলিয়ে দিচ্ছে কলিঙ্গসেনা নকল উদয়ন রাজার আদিম আলিঙ্গনে।

চক্ষু ছানাবড়া করে বলেছিল ব্রহ্মরাক্ষস, বন্ধু সৌগন্ধনারায়ণ, তুমি প্রকৃতই ষড়যন্ত্রভেদী দৃষ্টিশক্তির অধিকারী। এহেন রহস্যভেদী বুদ্ধি যাদের থাকে তারাই মন্ত্রী হওয়ার উপযুক্ততম ব্যক্তি। তোমার জ্ঞানচক্ষু ছলনার কুহেলিতে ঝাপসা হয় না। তোমার মতো মন্ত্রণাদাতা যে রাজ্যে নেই, সে রাজ্যের অবস্থা হয় দিবাকরবিহীন দিবসের মতো, নিশামণি বিহীন নিশীথের মতো, অসত্যে ভরপুর অসার কথার মতো, আর অধর্মের অভিপ্রায়ে কাজকর্মের মতো।

এইসব বলে নিমেষমধ্যে শূন্যমার্গে বিলীন হয়ে গেছিল ব্রহ্মরাক্ষস। সে রাক্ষস বটে, কিন্তু এত পাকচক্র তার ধাতে সয় না। বদহজম হয়।

সৌগন্ধনারায়ণ আর কী করে। যা চলছে চলুক রাজবাড়ি আর বাগানবাড়িতে, এখন তো ঘরে ফেরা যাক।

ভোর হতেই কিন্তু ফের তলব করেছিল ব্রহ্মরাক্ষসকে। পাকা ষড়যন্ত্রী না হলে পাকা মন্ত্রী হওয়া যায় না। গুপ্তচর তথা সাক্ষীকে নিয়ে হাজির হয়েছিল রাজা উদয়নের সামনে।

রাজার প্রশ্ন, কী ব্যাপার? এত সকালে?

মন্ত্রী বললে, রাজকুমারী কলিঙ্গসেনার চরিত্র সম্পর্কে আপনাকে ওয়াকিবহাল করার জন্যে।

উৎসুক হয়েছিলেন রাজা, খবর আছে?

মন্ত্রী বলেছিল, পাকা খবর। আগের খবর তো জানেনই, শ্রাবস্তীর রাজা প্রসেনের সঙ্গে প্রেম করেছিলেন এই রাজকুমারী। কিন্তু বৃদ্ধের কাছে প্রাপ্তির আশা কম বলে এসেছেন এখানে। এখানেও তিনি অবৈধ কামাসক্তি চালিয়ে যাচ্ছেন অবাধে। এমন কন্যাকে রাজরানি করা সঙ্গত নয়।

রাজা তো অবাক, আমার বাগানবাড়িতে অবৈধ কামচর্চা? অসম্ভব।

মন্ত্রী বললে, তাহলে আপনাকে স্বচক্ষে সেই দৃশ্য দেখাব।

কিন্তু সেখানে মানুষ ঢুকবে কী করে?

মানুষ তো নয়, অমানুষও নয়, দিব্য পুরুষ কলিঙ্গসেনার রূপ, এদের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট যেখানে খুশি এরা যেতে পারে, যে কোনও রূপ ধারণ করতে পারে। স্বচক্ষে দেখুন, প্রত্যয় হবে।

হতভম্ব রাজা উদয়ন তদ্দণ্ডেই রানি বাসবদত্তার কাছে গিয়ে পেট আলগা করে কলিঙ্গসেনা, কেচ্ছার রসালো কাহিণী বর্ণনা করেছিলেন।

শুনে, মনে মনে খুশির জোয়ারে ভেসে গেছিল রানি বাসবদত্তা। মন্ত্রীর বুদ্ধি আছে বটে। কায়দা করে রাজার মন তো ঘুরিয়ে দিয়েছে।

সারাদিন বিস্তর দুর্ভাবনায় কাটিয়ে রাজা উদয়ন মন্ত্রীসহ গেলেন কলিঙ্গসেনার শোবার ঘরের পাশে।

কিন্তু পা টিপে টিপে গেলেও নিঃশব্দে তো যেতে পারেননি। নিথর রাতে তাঁদের যুগল পদধ্বনি বাগানবাড়ির হাওয়ায় ভেসে গেছিল।

আর সেই ক্ষীণ পদধ্বনি শুনেই সচকিত হয়েছিল মদনবেগ, যে কিনা সন্ধ্যে হতে না হতেই এসে, রাজা উদয়নের রূপ ধরে, কলিঙ্গসেনাকে উপভোগ করবার পর ঘুমন্ত কন্যাকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিল পাশেই।

দিব্যকর্ণ দিয়ে কিন্তু শ্রবণ করেছিল কারা যেন পা টিপে টিপে আসছে অলিন্দ বেয়ে। তৎক্ষণাৎ ছিটকে গেছিল শয্যা থেকে।

ততক্ষণে কিন্তু রাজা উদয়ন তরবারি কোষমুক্ত করে ফেলেছেন। অবিকল তাঁরই মতো একটা মানুষ কলিঙ্গসেনাকে সুখ দিয়ে যাচ্ছে দেখে হকচকিয়ে গিয়েই পরক্ষণেই উদোম লোকটাকে কচুকাটা করতে ধেয়ে গেছিলেন।

কিন্তু পারেননি। অতিশয় ধূর্ত বিদ্যাধর তনয় মদনবেগ নিমেষমধ্যে অদৃশ্যকরণী বিদ্যার জোরে বাতাসে গলে মিলিয়ে গেছিল।

পরক্ষণেই ঘুম ভেঙে গেছিল কলিঙ্গসেনার। নিবিড় আলিঙ্গন সহসা খসে পড়লে ঘুম তো ভাঙবেই।

কিন্তু ঘরের মধ্যে কেউ তো নেই! গেলেন কোথায় রাজা উদয়ন?

আসল রাজা উদয়ন তখন স-মন্ত্রী দাঁড়িয়ে বাইরে, অলিন্দে। সেখান থেকেই শুনতে পেলেন কঁকিয়ে কেঁদে উঠেছে কলিঙ্গসেনা, রাজা উদয়ন! রাজা উদয়ন! কোথায় গেলেন আমাকে ফেলে? রাত কাটাব কাকে নিয়ে?

কী সর্বনেশে কথা! রাজা উদয়ন তো দাঁড়িয়ে বাইরে। তবে এই বিলাপ কেন?

বুঝিয়ে দিয়েছিল মন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ।

বলেছিল, এইমাত্র যাকে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে দেখলেন, সে মানুষ নয়, এক বিদ্যাধর। যে, কোনও দেহ ধারণের বিদ্যে জানে। আপনার রূপ ধরে রাতের পর রাত রাজকুমারীর শরীর নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, রাজকুমারী ভেবেছিলেন, প্রাণেশ্বর রাজা উদয়নকে দেহদান করছি। তাই তাঁর দোষ নেই।

আগে বলা হয়নি কেন?

বললে কি আপনি বিশ্বাস করতেন? স্বচক্ষে দেখানোর জন্যে নিয়ে এসেছি।

হন হন করে কলিঙ্গসেনার ঘরে ঢুকেছিলেন রাজা উদয়ন। তাঁকে দেখেই কঁকিয়ে উঠেছিল কলিঙ্গসেনা, কোথায় গেছিলেন আমাকে ফেলে? উফ! কী ভাবনায় পড়েছিলাম।

রাজা নীরব।

মন্ত্রী বললে, আপনি ভুল করছেন। আসল রাজা উদয়ন ইনিই বটে। কিন্তু ইনি কোনও রাতেই আপনার কাছে আসেননি। এসেছিল এক মায়াবী, আপনাকে ঠকাতে। আপনি তাকেই বিয়ে করেছেন, এঁকে নয়।

স্তম্ভিত কলিঙ্গসেনা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল, রাজা কেন আমার সঙ্গে অভিনয় করছেন?

রাজা বললেন, মন্ত্রী ঠিকই বলেছেন। আমি আপনাকে বিয়েও করিনি, আপনার সঙ্গে রাতও কাটাইনি।

আপনিই তো.....

না, আমি নয়। সে এক বিদ্যাধর। আপনি আমাকে চেয়েছিলেন, তাই আমার রূপ ধারণ করে আপনার সর্বস্ব লুঠে নিয়ে গেছে। আমি যখন এই ঘরের বাইরে, সে তখন আপনাকে জড়িয়ে ধরেই শুয়েছিল, আমাকে দেখেই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কলিঙ্গসেনার মুখে আর কথা নেই। চোখ মেঝের দিকে। রাজার মুখেও কথা নেই। চোখ অন্যদিকে।

মন্ত্রী তখন বললে, রাত তো অনেক হল, রাজা। এবার বাড়ি ফেরা যাক।

একা বসে থেকে ঝরঝর করে কেঁদে গেল। কলিঙ্গসেনা। প্রিয় বান্ধবী সোমপ্রভার বারণ শোনেনি, বাবা-মায়ের আশ্রয় ছেড়ে পালিয়ে যাঁর আশ্রয় নিতে এখানে এসেছিল, তাঁর চোখেই এখন সে ব্যাভিচারিণী। এমন নারীকে কেউ রানি করে?

এখন উপায়?

উপায়টা নিজেই ভেবে বের করেছিল কলিঙ্গসেনা। মায়াবী হয় হোক, যে তাকে বিয়ে করেছে, প্রকৃত বরের মতোই বউয়ের সাধ মিটিয়েছে, তার সঙ্গেই থাকা যাক, বউ রূপেই। তাই আকুল কণ্ঠে ডেকেছিল মদনবেগকে, আপনি যে-ই হোন, আমাকে গ্রহণ যখন করেছেন, তখন আমি আপনার। আমাকে ত্যাগ করবেন না।

তৎক্ষণাৎ স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিল মদনবেগ।

চমকে উঠে শুধিয়েছিল কলিঙ্গসেনা, আপনি আবার কে?

আমিই সেই বিদ্যাধর, যে উদয়নের রূপে তোমাকে বিয়ে করেছে। আমার নাম মদনবেগ। বিদ্যাধরদেব রাজা। অনেকদিন আগে তোমাকে তোমার বাপের বাড়ির বাগানে দেখেছিলাম। শিবের পুজো করেছিলাম। তাঁর নির্দেশে রাজা উদয়নের ছদ্মবেশে তোমাকে বিয়ে করেছি।

স্বামীজ্ঞানে তার সঙ্গে প্রণয়ালাপে রাত ভোর করে দিয়েছিল কলিঙ্গসেনা।

বাতাসে গলে মিলিয়ে যাওয়ার আগে মদনবেগ কথা দিয়ে গেছিল, রাত হলেই ফের আসবে। বিচিত্রতর রতিরঙ্গ দেখাবে।

৩৪. মদনমঞ্চুকা আখ্যায়িকা

ঘুমন্ত সুন্দরী পুরুষেরা বক্ষে দোলন জাগায়। রতিক্ষত অবস্থায় দেখলে চিত্ত বিকল হয়।

বিশ্বসুন্দরী কলিঙ্গসেনাকে ঠিক এই অবস্থায় দেখে ইস্তক রাজা উদয়নের মুণ্ড ঘুরে গেছিল। নিদারুণ কামনার বুদ্ধিবিবেচনা লোপ পেয়েছিল। কলিঙ্গসেনাকে রমণ করতেই হবে, যেভাবেই হোক। এক হয়ে যাক দুজনে দুজনের সঙ্গে।

গভীর রাতে উন্মুক্ত অসি হাতে কলিঙ্গসেনার সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন উদয়ন, সুন্দরী, সম্ভোগে সম্মত হও।

এ যে বলাৎকারের হুঙ্কার!

কেঁপে গেছিল কলিঙ্গসেনা। কিন্তু সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছিল সেই মুহূর্তে। মন টনটন করে উঠেছিল কথাগুলো বলতে গিয়ে, কিন্তু বিবেকের নিগড় শিথিল হয়নি এতটুকু।

যাঁর সঙ্গম-কামনায় সব কিছু ত্যাগ করে এই বাগানবাড়িতে অবস্থান, স্বয়ং তিনি যাচ্ঞা করছেন কলিঙ্গসেনাকে!

কিন্তু কলিঙ্গসেনা যে নিছক নারীমাংসের খেলনা নয়, পতিপ্রাণা রমণী, সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার সময় হয়েছে এখন।

বদলা নেওয়াও বলা যায়।

তাই অবিচল চিত্তে উদ্যত অসির দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বলেছিল কলিঙ্গসেনা, আর তা সম্ভব নয়। আমি এখন পরের বউ। পরনারী।

উদয়ন বললেন, কিন্তু তুমি তো বারনারী নও? প্রেমের অভিনয় করোনি? নকলকে ভালোবেসেছো, দেহ দিয়েছ। আমি আসল, আমাকেও ভালোবেসেছো, দেহ দেবে। বারনারী সম্ভোগের পাপ আমাকে স্পর্শ করবে না।

কিন্তু অসতী তো নই। মদনবেগ আপনার রূপ ধরে যখন আমাকে বিয়ে করেছে তখন আমি তাঁরই বউ। এখন পরকীয়া করা পাপ, আমার কাছে। আমাকে মাপ করবেন। যদি জোর করেন, ধর্ষিতা হবো, কিন্তু আত্মহত্যা করবো।

রাজা উদয়ন থমকে গেলেন।

কলিঙ্গসেনা বললে, আপনার বিবেকের উন্মেষ ঘটানোর জন্যে একটা গল্প বলছি, শুনুন।

ইন্দ্রদত্ত ছিলেন চেদি বংশের রাজা। কীর্তিমান হওয়ার জন্যে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরের সামনের হ্রদে স্নান করতে নামত মেয়েরা।

রোজ একবার মন্দিরে যেতেন রাজা। একদিন স্নানরতা এক সুন্দরীকে দেখে মোহিত হলেন। তার সঙ্গে সঙ্গম করতে চাইলেন।

মেয়েটি বললে, আমি বণিকঘরের বউ। আমার ধর্ম নষ্ট করবেন না। এসেছি আপনার আশ্রয়ে, আমাকে নষ্ট করা আপনার উচিত নয়। যদি ধর্ষণ করতে আসেন, আমার আত্মা দেহশূন্য হবে। পাবেন একটা খালি খাঁচা।

রাজা ইন্দ্রদত্তের তখন হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে কামের পঞ্চশরে। কুলবধূর মিনতিতে কান দিলেন না। তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন।

আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেছিল মেয়েটি। হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ।

মহাপাপ স্পর্শ করে গেছিল রাজা ইন্দ্রদত্তকেও। কুলবধূকে স্পর্শ করার পাপ। সতীনারীর অদৃশ্য রক্ষাব্যূহ ভেদ করে গেছিল তাঁর প্রাণকবচ।

দিন কয়েক পরেই মৃত্যু হয়েছিল তাঁর।

গল্প শেষ করে বলেছিল কলিঙ্গসেনা, আপনার বাগানবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি বলেই কি আমার সতীত্ব নাশ করতে এসেছেন? আমি আর থাকতে চাই না এখানে, আপনি বাধা দেবেন না।

তৎক্ষণাৎ চৈতন্যোদয় ঘটেছিল রাজা উদয়নের।

বলেছিলেন, যাবে কেন? থাকো এখানে, স্বামীর সঙ্গে। নির্ভয়ে।

চলে গেছিলেন উদয়ন।

তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে আবির্ভূত হয়েছিল মদনবেগ। বলেছিল হাসিমুখে—সবই তো দেখলাম, ভালো শিক্ষা দিয়েছ রাজা উদয়নকে। আমাকেও, তুমি যে নিখাদ সতী, তার প্রমাণ দিলে। পতিই তোমার গতি, তা বুঝিয়ে দিলে। এস, বুকে এস।

রাতটা কাটাল পরমানন্দে, মধুমিলনে।

এক রাত নয়, প্রতিরাত। রকমারি সঙ্গম আসনে।

বিদ্যাধরদের বহু বিদ্যার নিদর্শন পেয়ে গেল কলিঙ্গসেনা। গর্ভে সন্তানও এল যথাসময়ে। তারপরেই সুর পালটে গেল মদনবেগের।

বললে, আমরা তো অমরলোকের বাসিন্দা। আমাদের নিয়ম, মর্ত্যের মেয়েদের গর্ভসঞ্চার ঘটিয়েই বিদায় নিতে হয়। তুমিও ছিলে অমরলোকের অপ্সরা। ইন্দ্র অভিশাপ দিয়ে তোমাকে মর্ত্যের মেয়ে করেছে। এখন

সেইভাবেই সন্তান ভূমিষ্ঠ করো। আমি চললাম।

কেঁদে ফেলেছিল কলিঙ্গসেনা।

মদনবেগ বলেছিল, আমি তো আবার আসব। এই নাও গয়না, এই নাও দামি দামি পোশাক। এখন চলি।

পরের বাড়িতে একা রয়ে গেল কলিঙ্গসেনা।

ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলেন শিব। কামদেবের বউ রতিকে ডেকে বলেছিলেন, তোমার বর আমার চোখের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে রাজা উদয়নের ছেলে হয়ে জন্মেছে, তার নাম এখন নরবাহন দত্ত। বরের সঙ্গে পুনর্মিলন চাও?

নিশ্চয় চাই। ...বলেছিল রতি।

তাহলে স্বর্গের এই দেহ ছেড়ে মর্ত্যের মেয়ে হয়ে জন্মাও।

ঠিক সেই সময়ে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিল কলিঙ্গসেনা। মায়াবতী রতি দিব্যদেহ ত্যাগ করে নেমে এসেছিল মর্ত্যে, ছেলের জায়গায় শুয়ে রইল নিজে। ছেলে হয়ে গেল মেয়ে।

প্রসব যন্ত্রণা কমে গেলে চোখ মেলে তাকিয়ে কলিঙ্গসেনা দেখেছিল, ফুটফুটে মেয়েটিকে। জানতেও পারেনি, এ মেয়ে তার গর্ভজাত নয়!

খবরটা রাজা উদয়নের কানে যেতেই তিনি বললেন মন্ত্রী আর বড়ো রানিকে, এই মেয়েই হবে আমার ছেলের বউ, ভবিষ্যতে।

মন্ত্রী তো অবাক, সে কী! এক কুলটা মেয়ে হবে আপনার বেয়ান?

রাজা বললেন, সে তো সতীত্ব নষ্ট করেনি। যাকে বিয়ে করেছে তাকেই দেহ দিয়েছে, তারই ঔরসে এই কন্যার জন্ম। সবই কর্মফল।

একটু থেমে বলেছিলেন রাজা, এ ছাড়াও আমার মনে হয়, কলিঙ্গসেনা নিশ্চয় স্বর্গচ্যুতকন্যা, অভিশাপের ফলে, এমন নারীর কন্যাও তো দেবকন্যা হতে বাধ্য।

মন্ত্রী বললে, রাজা, আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। খটকা আমারও লেখেছিল।

কি খটকা?

যে দাই কলিঙ্গসেনার সন্তান প্রসব করিয়েছে, তার মুখেই শুনেছি, ভূমিষ্ঠ হয়েছিল একটি ছেলে, হঠাৎ সেই ছেলে রূপান্তরিত হয়ে যায় একটি মেয়েতে।

চমৎকৃত হয়ে বলেছিলেন রাজা, রূপান্তরের কারণ?

মন্ত্রী বললেন, স্রস্টার ইচ্ছায় অমরলোক থেকে অবতীর্ণ হল এক দেবকন্যা।

সে কে হতে পারে, মন্ত্রী?

রাজা, আপনার ছেলে নরবাহনদত্ত কী কামদেবের অবতার নয়?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

কামদেবের স্ত্রী তো রতি। পতিমিলনের ইচ্ছায় এসেছে মর্ত্যে, কলিঙ্গসেনার কন্যাহয়ে। আমাদের রাজবংশের রানি হওয়ার জন্যে।

মদনবেগের ঔরসে জন্ম বলে এই কন্যার নামকরণ করা হয়েছিল মদনমঞ্চুকা।

দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে গেল মদনমঞ্চুকা। আশ্চর্য রূপ যেন সূর্য চন্দ্রের মতো কিরণ বর্ষণ করে গেল তার দেহবল্লরী থেকে। প্রতি অঙ্গে সুষমা আর লাবণ্য যেন তরঙ্গাকারে নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই মেয়ে যে স্বয়ং রতি, এ বিষয়ে তিলধি সন্দেহ রইল না কারও মনে।

রানি বাসবদত্তা একদিন মদনমঞ্চুকাকে নিয়ে এলেন রাজবাড়িতে, কুমার নরবাহনদত্তের সামনে।

কামদেব এল রতিরানির সামনে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। দুজনের চোখ দুজনের দিকে। যৌবনের বসন্ত তখনও তাদের স্পর্শ করেনি, অথচ দুজনেই বিমুগ্ধ দুজনের পানে তাকিয়ে।

রতি আর কাম। বিপুল শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটে চলেছে যেন দুজনেরই শরীর ঘিরে।

শরীর সংযোজনের বয়স তখনও হরনি। অথচ দুজরেই হিয়া ব্যাকুল দুজনের জন্যে। পরস্পরের অদর্শন, ঘটলেই অস্থির দুজনেই। এ-বাগানে সে-বাগানে খেলায় মত্ত দুই বালক-বালিকা। তাদের হাসি, তাদের ক্রীড়া, তাদের কৌতুক মাতিয়ে রেখেছিল সবাইকে, তারপর একদিন দুজনকে বিয়ের বাঁধনে বেঁধে ফেলবার কথা ভাবলেন রাজা উদয়ন আর রানি বাসবদত্তা।

প্রস্তাবটা কলিঙ্গসেনার কানে যেতেই তার আহ্লাদ আর ধরে না। মনের মতো জামাই তো পাওয়া গেল, সেই সঙ্গে এমন একজন বেয়াই মশায় যাকে একদিন সে মনে মনে কামসঙ্গী হিসেবে প্রার্থনা করেছিল। ভাগ্যচক্রে তা না হলেও মধুর রসের সম্পর্ক তো এবার ঘটতে চলেছে।

একেই বলে দৈবলীলা!

যথাসময়ে যুবরাজপদে অভিষিক্ত হল নরবাহন দত্ত।

পরম সুখী কলিঙ্গসেনা এই সময়ে একরাতে ভাবছিল সখী সোমপ্রভার কথা। সেই যে রাগ করে চলে গেছিল স্বামী নলকুবরের কাছে, আর স্বামীছাড়া হয়নি, সখী সান্নিধ্যেও আসেনি।

ভাবনার ঢেউ অতিতীব্র হওয়ায় টের পেয়েছিলেন নলকুবর স্বয়ং। মেয়েদের মন-তরঙ্গ তো আগে ছেলেদের মন-উপকূলেই আছড়ে পড়ে।

বলেছিল প্রিয়তমা সোমপ্রভাকে, তোমার প্রাণের সখী সোমপ্রভাকে আর একদিনও দেখতে গেলে না? সে যে তোমার কথা ভেবে ভেবে আধখানা হয়ে গেল। যাও, যাও, সখী সন্দর্শনে যাও, তার যে ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে, সেই মেয়ের খেলা করার উপযুক্ত একটা চমৎকার বাগান বানিয়ে দিয়ে এস।

স্বামীর আদেশে আর স্যতার আকর্ষণে নিমেষ মধ্যে কলিঙ্গসেনার সামনে এসে গেল অপরূপা সোমপ্রভা। মান অভিমানের পালা সাঙ্গ হবার পর সোমপ্রভা বললে, কলিঙ্গসেনা? তুমি ছিলে অপ্সরা, আবার হবে অপ্সরা। তোমার এই মেয়ে স্বয়ং রতি, তার বিয়েও হবে কামদেবের সঙ্গে, যে এখন কুমার নরবাহনদত্ত। সেই উপলক্ষ্যে এমন একটা কানন আমি সৃষ্টি করে দিয়ে যাব যা কেউ কখনও দেখেনি।

নলকুবরের স্ত্রী সোমপ্রভা, ময়দানবের কন্যা সোমপ্রভা, যখন বাগান বানায়, তখন সেই বাগান চক্ষুস্থির করার মতনই হয়।

কাজশেষ করেই স্বামী সন্নিধানে চম্পট দিয়েছিল সোমপ্রভা। পৃথিবীর মাটির আকর্ষণ বড়ো মারাত্মক, মায়ার বাঁধনে বাঁধা না পড়ে!

কিন্তু স্রেফ মায়া দিয়ে এমনই একটা কানন সৃষ্টি করে গেল, যা ধরাপৃষ্ঠে আর নেই। নন্দনকানন বললেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ তার আবির্ভাব ঘটেছে আচমকা রাতারাতি। কলিঙ্গসেনার বাগানবাড়ির ঠিক সামনেই।

থ হয়ে গেছিল প্রত্যেকেই। এরকম ভোজবাজি তো কেউ কখনও দেখেনি। গাছে গাছে ফলফুল, সব ঋতুর সমাহার। পাখি উড়ছে, ভোমরা ছুটছে। সুগন্ধে ভরপুর চতুর্দিক। চোখ ঝলসে যাচ্ছে মাণিক্যে গড়া থাম দেখে। একাধিক জলাশয়ের ঘাট পর্যন্ত জহরৎ দিয়ে বাঁধানো। রাজহংস সাঁতরে যাচ্ছে জলে।

আশ্চর্য উদ্যানের সংবাদ রাজা উদয়নের কানে যেতেই তিনি সপারিষদ দৌড়ে এসেছিলেন। থ হয়ে গেছিলেন। কানন-স্রস্টার নামধাম জিজ্ঞেস করেছিলেন কলিঙ্গসেনাকে।

সে বলেছিল, সোমপ্রভা বানিয়ে দিয়ে গেছে।

সে কে?

আমার বান্ধবী। ময়দানবের মেয়ে। মায়া দিয়ে সৃষ্টি করেছে চকিতে, আমার মেয়ের খেলার জন্যে।

বিমূঢ় বৎসরাজ ফিরে গেলেন রাজপ্রাসাদে। ফিরে এলেন পরের দিন। অনেকগুলো মন্দির ছিল বাগানে। একটা মন্দিরে ঢুকতেই দেখলেন ভারি মিষ্টি চেহারার দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে।

কে তোমরা?.... জিজ্ঞেস করেছিলেন রাজা।

আমরা বিদ্যার দেবী আর কলা দেবী। আপনার চুলের শরীরে অধিষ্ঠান করব বলে এসেছি।

পরমুহূর্তেই তাদের আর দেখতে পেলেন না রাজা উদয়ন। পরিষ্কার বুঝলেন, সর্ববিদ্যায় আর চৌষট্টি কলায় পারদর্শী হতে চলেছে তাঁর ছেলে, এই দুই দেবীর কৃপায়।

ঘটলও তাই। শুধু নরবাহন দত্ত নয়, মদনমঞ্চুকাও পাল্লা দিয়ে গেল নরবাহনদত্তের সঙ্গে এই দুই ব্যাপারে।

রাজযোটক মিল। যৌবন সমাগমে দুজনেই দুজনকে অহোরাত্র নয়নবন্দি করে দিতে পারলে যেন বাঁচে। ছয় রসের শ্রেষ্ঠ রস যৌনগ্রন্থির মধুর রসের জন্যে ব্যাকুলতা দেখা দিল দুজনেরই মন আর দেহে।

এই সময়ে একদিন রাজকুমার দুটি নিগূঢ় বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছিল প্রিয় বন্ধু গোমুখের কাছে।

প্রথমটি স্ত্রীচরিত্র, দ্বিতীয়টি রাজনীতি।

ঘটনাটা ঘটল এইভাবে।

বন্ধুসহ একদিন বেড়াতে বেরিয়েছিল নরবাহন দত্ত। আলাপ হয় এক সওদাগর বাড়ির বউয়ের সঙ্গে। তার বেশি কিছু না। কিন্তু নির্দোষ গোমুখকে গরলপান করিয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছিল সেই দুশ্চরিত্রা বধূটি।

প্রাণরক্ষে করার পর বন্ধু নরবাহনদত্তকে বলেছিল গোমুখ, মেয়েজাতটা এই রকমই। এদের কক্ষনো বিশ্বাস করতে নেই। বিধাতা এদের অদ্ভুতভাবে গড়েছেন। শরীরে শক্তি দিয়েছেন কম, মনে দিয়েছেন সীমাহীন শক্তি, জিভে দিয়েছেন ক্ষুরের ধার। একাধারে গরল আর সুধা, এই দুই বিপরীত বস্তু দিয়ে গড়ে দিয়েছেন এদের কোমল তনুর কঠিন চিত্ত। তাই এদের দুঃসাহস কল্পনাতীত। এদের অসাধ্য কিছুই নেই। এরা একাধারে জায়া, জননী, বহু বল্লভা। এদের মন আর মুখ কখনোই এক নয়। এদের জঠরে সৃষ্টির ফুল সযত্নে লালিত হয়, অন্তরে লুকিয়ে রাখে ধ্বংসের ডম্বরু, ষড়যন্ত্রের শাণিত চক্র। এরা যখন প্রেম দেয়, তখন তা সুধা; যখন তা তুলে নেয়, তখন দেখায় করাল চেহারা। এরা কখনও কোকিল, কখনও গৃধিনী। ত্রিভুবনে এদের অসাধ্য কিছু নেই। হিত আর অহিত, এই দুই কর্মই এরা সম্পাদন করে হাস্যমুখে, তিলমাত্র চিত্তবিকার না ঘটিয়ে। আমার কপাল ভালো বলে আজ গরল পানে বিগত প্রাণ হলাম না।

রাজনীতি প্রসঙ্গে বন্ধুবর গোমুখকে অন্য একদিন বিস্তর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে গেছিল নরবাহনদত্ত।

গোমুখ বলেছিল, যার নেই নির্দিষ্ট নীতি, তার নাম রাজনীতি। যখন যেমন, তখন তেমন, কাজ হাসিল করার জন্যে যখন যে উপকরণটির প্রয়োজন, কার্যসিদ্ধির পর তার মূল্য ফুরিয়ে যায়। বড় জটিল, বড়ো কুটিল, এই রাজনীতি। অথচ রাজ্যবর্ধন আর রাজ্যশাসন, এই দুটিকেই যথাযথভাবে করতে গেলে চাই রাজনীতির সূচ্যগ্র যথাপ্রয়োগ। শুধু তাই নয়। হে বন্ধু, সিংহাসনে বসতে গেলে প্রথম রিপু কাম থেকে আরম্ভ করে সবকটা সর্বনাশা রিপুকে বশে রাখতে হয়। প্রয়োজনে যতটুকু, তার বেশি নয়। ইন্দ্রিয়গুলোকেও কবজায় রাখতে হয়। মন যদি বশে না থাকে, শত্রুজয় সম্ভব নয়। মন্ত্রীদেরও তৈরি করে নিতে হয় সেইভাবে। ইন্দ্রিয় পরবশ মন্ত্রীরা রাজ্যকে রসাতলে নিয়ে যায়। সুকৌশলে তাদের প্রতিটি ক্রিয়াকর্ম আর চিন্তাধারায় খবর রাখতে হয়। ধর্মের নামে যাতে অধর্ম না হয়, সে দিকে নিশ্চিন্ত থাকার জন্যে অনুরূপ দেবপ্রতিম পুরোহিতকে রাজসভায় রাখতে হয়। রাজকর্মচারীরা অসাধু হয়ে যাচ্ছে কিনা নিরন্তর সেই সংবাদ সংগ্রহ করে যেতে হয়। এজন্যে চর নিয়োগ রাজার কর্তব্য। শত্রুনিপাত আর কোষাগার বৃদ্ধি, এই দুটোই রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির মূল ভিত। প্রয়োজনে সন্ধি, অথবা যুদ্ধ, যখন যেমন তখন তেমন। বুদ্ধিমান জ্ঞানী মন্ত্রী পাশে থাকলে তবেই এসব সম্ভব। রাজ্যলক্ষ্মী তখনই রাজ্যে থাকেন যখন রাজা সুনীতির যথা প্রয়োগ করে যান নিজের রাজ্যে আর পরের রাজ্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে। এরই নাম রাষ্ট্রবিজ্ঞান। স্বরাষ্ট্র আর পররাষ্ট্র, ওয়াকিবহাল থাকতে হয় এ ব্যাপারে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রদের আগ্রাসী মতলবের খবর রাখতে হয়, প্রয়োজনে ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটাতে হয়, নইলে অস্ত্রধারণ, নিজের রাজ্য তখনই সমৃদ্ধ থাকে যখন প্রজারা রাজ-অনুগত থাকে, আর প্রজারা পাশে থাকলে রাজার কোনও ভয় নেই। কিন্তু যে রাজা এই সব ব্যাপারে বিজ্ঞ নন, কামিনী, যাঁর অতিপ্রিয়, প্রজাদের মনোরঞ্জনের বদলে প্রজাপীড়ণ করে যান, বিজয়লক্ষীর প্রসাদ

থেকে তিনি বঞ্চিত হন। আশ্রিত ব্যক্তিরাই তাঁকে ঠকিয়ে পথে বসিয়ে যায়। তাই, সংক্ষেপে, রাজার কাছে প্রজার মঙ্গল সর্বাগ্রে, সেই লক্ষ্য সামনে থাকলে নিজেকে ত্যাগী করে তুলতে হয়।

প্রহেলিকাবৎ রাজনীতি তত্ত্ব শ্রবণ করে বিমুগ্ধ হয়ে গেছিল যুবরাজ নরবাহনদত্ত। অনুপুঙ্খ আলোচনায় মেতে গেছিল বন্ধুবর গোমুখের সঙ্গে।

তারপরেই অবশ্য মন চঞ্চল হয়েছিল মদনমঞ্চুকার জন্যে।

বন্ধুকে নিয়েই গেছিল কলিঙ্গসেনার বাড়িতে। মদনমঞ্চুকা নিজেও যুবরাজের অদর্শনে অস্থির হয়েছিল। রতি আর কামদেব মানবী হয়েও আলাদা থাকবে কী করে? গ্রন্থির বন্ধন যে অণুপরমাণুতে! বিশেষ করে নবযৌবন যখন উত্তাল দুজনেরই মন আর তনুর সিংহদ্বারে!

কলিঙ্গসেনা, বাসবদত্তা আর উদয়ন তা উপলব্ধি করেছিলেন। শুভকার্যে আর বিলম্ব করতে চাননি। শুরু হয়েছিল বিয়ের আয়োজন।

খবর পেয়েই বাগড়া দেওয়ার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিল মদনবেগ। মদনমঞ্চুকা যে তারই কন্যা। উদয়ন পুত্রের সঙ্গে সে মেয়ের বিয়ে দেবে না। কিছুতেই না।

খবরটা পেয়েছিলেন শিব। বিঘ্নসৃষ্টির অন্তরায় স্বরূপ নিজের অনুচরদের নিয়োগ করেছিলেন, অবশ্যই অদৃশ্য অবস্থায়। তারা নিয়ত ঘিরে রেখেছিল মদনমঞ্চুকা আর নরবাহনদত্তকে, মদনবেগের হাজারো বিদ্যাধর, বিদ্যার প্রয়োগ ঘটতে দেয়নি। বিদ্যাধর অনুচররা পারবে কেন শিবের অনুচরদের সঙ্গে?

অদৃশ্যলোকে এহেন অপচেষ্টা আর প্রহরা যখন চলছে, তখন ধুমধাম করে বিয়েটা হয়ে গেল দুজনের।

শুরু হল সুখের জীবন। কিন্তু তক্কে তক্কে রইল জিঘাংসু মদনবেগের কুটিল চরেরা।

৩৫. হেমপ্রভার কাহিনি

কৌশাম্বীর রাজপ্রাসাদ জমে উঠল নরবাহনদত্ত আর মদনমঞ্চুকার বিয়ের পর থেকে। হাসি আর গান, নাচ আর উল্লাস, আমোদপ্রমোদের যাবতীয় উপকরণ অঢেল, যৌবন যেন নেচে নেচে গেল তালে তাল মিলিয়ে।

একদিন বন্ধুদের নিয়ে বাগানে হইচই করছে যুবরাজ, তখন বসন্ত ঋতু, গোটা বাগান ঝলমল করছে আনন্দ ঋতুর আগমনে, এমন সময়ে নরবাহনদত্তের এক সখা দৌড়াতে দৌড়াতে এসে বললে, কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!

নরবাহনদত্ত বললে, হলটা কী?

বয়স্য বললে, অপরূপা এক রমণীকে দেখে এলাম। রূপের ঝরনা বললেই। সূর্য চন্দ্র হার মেনে যায়। তেমনি তার কথার সুধা। আহা! কি মধুর! কি মধুর! যুবরাজ, এহেন নারীরত্ন আপনার অপেক্ষায় গাছতলায় বসে আছে।

যেন আকাশ থেকে পড়েছিল নরবাহনদত্ত, আমার পথ চেয়ে? কেন হে? কেন হে?

আপনাকে দেখে চক্ষু সার্থক করবে বলে, জীবন ধন্য করবে বলে নেমে এসেছে আকাশ থেকে।

আকাশ থেকে? পরী না, অপ্সরা।

কে জানে। একদল পরমাসুন্দরী সখী নিয়ে তাদের চাইতেও সুন্দরী সেই ভেসে ভেসে নেমে এল মেঘলোক থেকে। অশোক গাছের তলায় আসর জমিয়ে বসে ডাক দিল আমাকে। আমিতো হাঁ করে চেয়েছিলাম। তলব শুনেই দৌড়েছিলাম। আমাকে বললে তোমাদের যুবরাজকে গিয়ে বলো আমি এসেছি। উনি কি দয়া করে আসবেন?

সুন্দর মেয়েছেলে কে না দেখতে চায়? বিশেষ করে সেই রূপসী যদি বার্তা পাঠায়?

অতএব কালবিলম্ব না করে নরবাহনদত্ত তৎক্ষণাৎ রওনা হয়েছিল দলবল নিয়ে। মাথা ঘুরে গেছিল দূর থেকেই, অপরূপার রূপের ছটা দেখে। কাছে যেতেই সুন্দরী কিন্তু সবিনয়ে প্রণাম করেছিল যুবরাজকে।

বয়স্য গোমুখ তখন মুখ খুলেছিল, কে আপনি?

যুবরাজকে চোখে চোখে রেখে, অথবা চোখ দিয়ে যেন গিলতে গিলতে বলেছিল রূপবতী, লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়েই তাহলে বলি আমার কথা। কৈলাস পাহাড়ের চূড়োয় কাঞ্চনশৃঙ্গ নামে একটা শহর আছে। সোনা দিয়ে গড়া নগর। সেখানে থাকেন এক বিদ্যাধর। তাঁর নাম হেমপ্রভ। স্ত্রী তাঁর অনেক। সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন যাকে, তার নাম অলঙ্কারবতী। বলা বাহুল্য, সে অলঙ্কার তার রূপের অলঙ্কার।

হেমপ্রভ পরম ধার্মিক পুরুষ শিব আর পার্বতীর রোজ পুজো করেন। মর্ত্যে এসে দানধ্যান করেন।

কিন্তু তিনি অপুত্রক।

এবং এইটাই ছিল তাঁর একমাত্র দুঃখ।

অলঙ্কারবতী তা বুঝেছিল। বলেছিল স্বামীকে, শিব আর পার্বতীকে তুষ্ট করুন। তাহলে মনের খেদ মিটবে।

তাই করেছিলেন হেমপ্রভ। নানা প্রক্রিয়ায় সাধনভজন করার ফলে একদিন রাত্রে শিব এসে বললেন, ছেলে চেয়েছিলে, ছেলে পাবে, আমাকে পুজো করেছিলে বলে। একটা মেয়েও পাবো, পার্বতীকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছ বলে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, সেই মেয়ে বড়ো হলে তার বিয়ে দেবে রাজা উদয়ন পুত্র নরবাহনদত্তের সঙ্গে।

যথাসময়ে অলঙ্কারবতীর প্রথমে হল একটি ছেলে, তারপরে একটি মেয়ে।

ছেলের নাম রাখলেন রত্নপ্রভ, মেয়ের নাম রাখলেন হেমপ্রভা।

যুবরাজ, আমিই সেই হেমপ্রভা। স্বপ্নে দেখলাম, আপনাকে বিয়ে করছি। মা তা শুনে বললে, শিবের ইচ্ছা তো তাই। যাও, নিজে বিয়ের প্রস্তাব জানাও যুবরাজকে।

হেমপ্রভার রূপের আলোয় আর কটাক্ষ বর্ষণে এমনিতেই মুগ্ধ হয়ে গেছিল নরবাহনদত্ত। এখন সরাসরি বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। এমন মেয়েকে বউ না করে থাকা যায়? কথা বলার কায়দা কী! ভূমিকা থেকে উপসংহার, এক্কেবারে নিখুঁত। যথার্থই বাক্যবিদ্যায় বিদুষী!

যুবরাজের সম্মতি পেতেই তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎ বেগে সংবাদ চলে গেল বিদ্যাধর হেমপ্রভর কাছে। তিনি চলে এলেন আত্মীয়স্বজন নিয়ে। রাজা উদয়নও খবর পেয়ে চলে এলেন অশোক গাছের তলায়। যথাবিহিত কন্যার পিতা বিয়ের প্রস্তাব রাখলেন পাত্রের পিতার কাছে। সম্মতি পেয়েই হেমপ্রভ মায়ার জাদু দিয়ে একটা অলৌকিক আকাশযান বানিয়ে নিয়ে, তাতে বর, বরের বাবা-মা আর বরযাত্রীদের নিয়ে চলে গেলেন কাঞ্চনশৃঙ্গ নগরে। বিয়েটা হয়ে গেল সেখানেই।

বড়-বউ সেখানে কিছুদিন থাকবার পর চলে এল কৌশাম্বী নগরে।

৩৬. রাজদত্তার কাহিনি

গোমুখ ছিল নরবাহনদত্তের সবচেয়ে কাছের বন্ধু। একদিন দলবল নিয়ে অন্তঃপুরে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেয়েছিল নারী-দ্বারপালের কাছে। সে তার কর্তব্য করেছে। অন্তঃপুরে পুরুষ ঢুকবে কেন?

গোমুখ কিন্তু চলে আসেনি। মহিলা-শান্ত্রীকে বলেছিল, যাও, যুবরানি হেমপ্রভাকে গিয়ে বলো, গোমুখ এসেছে বন্ধুদের নিয়ে।

প্রহরিণী, তৎক্ষণাৎ গিয়ে বলেছিল, এক দঙ্গল পুরুষ এসেছে। তাদের নেতার নাম গোমুখ। অন্তঃপুরে ঢুকতে চায়।

এখুনি আনো, সব্বাইকে। .....কড়া হুকুম হেমপ্রভার।

এসেছিল সব্বাই। বিপুল অভ্যর্থনা পেয়েছিল হেমপ্রভার কাছে। স্বামীর বন্ধুদের তিলমাত্র অনাদর যাতে না হয়, সে বিষয়ে জ্ঞান দিয়েছিল হতচকিত প্রহরিণীকে, যখনই এঁরা আসবে, সমাদর জানাবে। খেয়াল রেখো, এঁরা আমার স্বামীদেবতার প্রাণের বন্ধু।

প্রহরিণীকে বিদায় দিয়ে বলেছিল যুবরাজকে, হে আর্যপুত্র, অন্দর মহল যেন কখনও কারগারের মতো মনে না হয় অন্তঃপুরবাসিনীদের কাছে। মেয়েদের চরিত্রের শক্তিই তাদের কুপথ থেকে সরিয়ে রাখে, প্রহরিণী দিয়ে তাদের চরিত্রবতী রাখা যায় না। যে মেয়ে হীন চরিত্রের, স্বভাব যাদের চঞ্চল, কুপথ তাঁদের টেনে

নামাবেই। স্বর্গবাসী শক্তিমানরাও তা রোধ করতে পারবে না। নদী, নারী আর নখী, এদের বিশ্বাস করতে নেই। এটা একটা প্রবচন। বিশেষ করে যে নারীর প্রকৃতি নদীর মতো উদ্দাম আর সদা প্রবহমান, সেই নারীর দুরন্ত কামনার স্রোতকে বাঁধ দিয়ে আটকানো যায় না, যেমন রোধ করা যায় না বন্যায় স্ফীত নদীর জলকে। এ সম্পর্কে একটা গল্প বলছি, শুনুন।

রত্নকূট নামে একটা দ্বীপ ছিল সমুদ্রের মাঝখানে। সে দ্বীপের রাজা ছিলেন পরম বৈষ্ণব। ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত।

তাঁর কামতৃষ্ণা ছিল অতিশয় প্রবল। একাধিক মহিষী সঙ্গমেও তৃষ্ণা মিটছিল না। চাই আরও অনেক সহবাস সঙ্গিনী।

তাই একদিন ভাবলেন, আহা-রে, যদি এই গোটা ধরণীটা আমার রাজত্ব হত, আর সবকটা রাজ্যের রাজকন্যাদের দিয়ে শয্যাসুখ আদায় করতে পারতাম, তাহলেই শান্ত হত আমার চিত্ত আর শরীর। বিষ্ণুর কাছে সেই বর চাওয়া যাক।

ভগবান বিষ্ণু তাঁর কঠোর তপস্যায় বিলক্ষণ প্রীত হয়ে দেখা দিলেন এবং মনের মতো বর দিলেন।

বললেন, কলিঙ্গদেশে একটা সাদা হাতি আছে। তার নাম শ্বেতরশ্মি। আগের জন্মে সে ছিল গন্ধর্ব। ঋষির শাপে হাতি হয়েছে। কিন্তু আমার বরে সে শূন্যে উড়তে পারে, আগের জন্মের কথাও স্মরণ করতে পারে। আমি তাকে স্বপ্নে হুকুম দিচ্ছি, তোমাকে পিঠে নিয়ে আকাশে উড়ে এক-একটা দেশে যাবে, একটার পর একটা দেশ জয় করে যাবে, তার সে শক্তি আছে। পদানত রাজ্যের রাজারা নিজেদের রাজকন্যাদের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে তোমাকে হাতে রাখতে চাইবে। একই সঙ্গে তুমি ধরণীর অধীশ্বর হয়ে যাবে, সমস্ত রাজকন্যাদের সঙ্গে সঙ্গম-লালসা মিটিয়ে নিতে পারবে।

বিষ্ণুর বর বর্ণে বর্ণে ফলে গেছিল। ভোর হতেই আকাশ থেকে নেমে এসেছিল সাদা হাতি। বৈষ্ণব রাজাকে পিঠে নিয়ে উড়ে গেল দেশে দেশে। পৃথিবীজয় সমাপ্ত হল। গোটা পৃথিবীর রাজকন্যারা তাঁর অঙ্কশায়িনী হয়ে গেল। হাজার হাজার বধূ নিয়ে রত্নকূট দ্বীপে মহাসুখে দিবসরজনী কাটিয়ে গেলেন কামপ্রিয় বৈষ্ণব রাজা।

এরপরেই ঘটল একটা অদ্ভুত কাণ্ড। সাদা হাতির পিঠে চেপে বৈষ্ণব রাজা একদিন নিজের রাজ্যের আকাশ পথে উড়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময়ে পক্ষিরাজ গড়ুর সাঁই সাঁই করে উড়ে এসে চঞ্চুর ঠোক্কর মেরে খতম করে দিল সাদা হাতিকে। আকাশ থেকে ধরণীতে আছড়ে পড়ে রাজা প্রাণে বেঁচে গেল বটে, কিন্তু অন্ত রইল না হা-হুতাশের। উড়ুক্কু হাতি প্রাণে না বাঁচলে বৈষ্ণব রাজার প্রতাপও তো আর থাকছে না।

তিনদিন রইলেন না খেয়ে। তারপর ঠিক করলেন, নিজের মাথা কেটে দিকপালদের খুশি করবেন, তাঁদের বরে সাদা হাতিকে ফের বাঁচাবেন।

ভেবেচিন্তে নিজের মাথা নিজেই যেই কাটতে যাবেন, অমনি শোনা গেল একটা আকাশবাণী :

রাজাদের রাজা, এমন কাণ্ড করবেন না। বুকের পাটা তো আপনার কম নয়! খুঁজে পেতে একজন সতী নারীকে জোগাড় করুন। মরা হাতিকে সে ছুঁলেই হাতি বেঁচে উঠবে।

উত্তম উপদেশ! বৈষ্ণব সবার আগে তাঁর অন্তঃপুর বন্দিনী হাজার হাজার বউকে এনে হাতিকে ছুঁতে বললেন।

সাদা হাতির পিঠে চেপে বৈষ্ণব রাজা একদিন নিজের রাজ্যের আকাশ পথে উড়ে যাচ্ছিলেন।

হাতি কিন্তু মরেই রইল!

অর্থাৎ, প্রতিটি বউ কুলটা, অথচ আটক ছিল অন্তঃপুরে!

এই সময়ে একদল বণিক এলেন রাজার কাছে। তিনি তাঁর স্ত্রী-কে নিয়ে তাম্রলিপ্ত থেকে এসেছেন বৈষ্ণব রাজার রাজ্যে, বাণিজ্য করতে। তাঁর নাম হর্ষগুপ্ত। শ্বেত হস্তী বেঁচে উঠবে সতী নারীর স্পর্শে। এই রটনা শুনেই নিজের স্ত্রীকে দিয়ে মরাহাতির পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল শ্বেত হস্তী।

বণিকের স্ত্রী তাহলে প্রকৃত সতী! অথচ অন্তঃপুর বন্দিনী নয়! হাটেবাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে! রেগেমেগে বৈষ্ণব রাজা তাঁর হাজার হাজার অসতী বউদের তাড়িয়ে দিলেন অন্তঃপুর থেকে, অন্য একটা বাড়িতে রেখে শুধু খাওয়া পরার ব্যবস্থা করে দিলেন।

রাজসভায় কিন্তু রোজ আসতেন হর্ষগুপ্ত তাঁর বউকে নিয়ে। বৈষ্ণব রাজা তাঁদের বিলক্ষণ সমাদর করতেন আর ভাবতেন, আহা, এমন সাধ্বী রমণীর মতো একটা বউও যদি পেতাম, সুখী হতাম।

একদিন তা বলেও ফেললেন বণিক-বধূকে।

সে বললে, তাহলে আমার বোনকে বিয়ে করুন। রূপে গুণে সে অতুলনীয়া।

বৈষ্ণব রাজার আর তর সইল না। তক্ষুণি সাদা হাতির পিঠে বণিক-পত্নীকে নিয়ে গেলেন তাম্রলিপ্ত নগরে, আকাশ পথে।

পৃথিবী জয়ী রাজা নিজে এসেছে বিয়ে করতে শুনেই বণিক-পত্নীর পিতৃদেব রাজি তো হলেনই, তৎক্ষণাৎ গণকদের ডাকিয়ে বিয়ের লগ্ন ঠিক করতে বললেন।

গণকরা একবাক্যে বললে, ছমাসের মধ্যে শুভ লগ্ন নেই।

একদম নেই?..... উৎকণ্ঠিত বৈষ্ণব রাজার প্রশ্ন।

আছে বটে, তবে তা সর্বোত্তম নয়। সে লগ্নে বিয়ে করলে বউ কখনও বর-অন্তপ্রাণ হয় না।

অসতী হয়?

আজ্ঞে।

বলে, পিঠটান দিয়েছিল গণকরা।

পাত্রীর নাম রাজদত্তা। শতকরা ষোলআনা রূপসী। তার রূপসাগরে বৈষ্ণব রাজা এমন ডুবে গেছিলেন যে এক্ষুনি বিয়ে না করলে প্রাণ যায়-যায় অবস্থা। ছমাস বসে থাকতে গেলে ধড়ে প্রাণ টিকবে কিনা সন্দেহ। নিত্য বহু সম্ভোগে অভ্যস্ত থাকার পর সহসা ললনাহীন জীবনযাপন কতদিন আর চালাবেন?

সুতরাং বিয়ে তিনি করবেনই এবং এই মেয়েকেই। গণকদের লগ্নবিচার মাথায় থাকুক। বিচারকে তিনি ভুল প্রমাণ করে দেবেন। নতুন রানিকে রত্নকূট রাজ্যে একটা দ্বীপের ঠিক মাঝখানে একটা কেল্লা-প্রাসাদে আটকে রাখবেন। নিজে সেখানে থাকবেন চারিদিকে অষ্টপ্রহর শান্ত্রী মোতায়েন থাকবে। রানি অসতী হবে কী করে? তার ছায়াও তো কেউ দেখতে পাবে না। পরস্পরের যৌনজ্বালা নিবারণ করবে শুধু দুজনে। অতএব বৈষ্ণব রাজা তড়িঘড়ি রাজদত্তাকে বিয়ে করে নিলেন সেইদিনই। মেয়ের বাবাও দেখলেন, শুভ কাজে গণকদের বিচারে কান না দেওয়াই ভালো। মেয়ে তো পার হোক, এমন পাত্র হাতছাড়া করা সমীচীন হবে না।

বিয়ে করেই বৈষ্ণব রাজা তক্ষুণি বউ নিয়ে হাতির পিঠে চেপে চলে এলেন একটা একেবারে জনহীন দ্বীপে। চারদিকে শুধু জল আর জল। দ্বীপের ঠিক মাঝখানে একটা কেল্লা-প্রাসাদ। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। প্রাসাদের মাঝখানে অন্তঃপুর। নতুন বউকে রাখলেন সেখানে। বহু সশস্ত্র প্রহরিণী মোতায়েন করলেন প্রাসাদের বাইরে। ভেতরেও রাখলেন প্রহরিণী আর পরিচারিকা। পরপুরুষের ছায়া পর্যন্ত গলবার উপায় রইল না।

সেই রাত্রে রাজদত্তার সতীচ্ছদ ছিন্ন করলেন রাজা এবং নিশ্চিন্ত হলেন, প্রকৃতই সতীর পাণিগ্রহণ করেছেন। রাজদত্তা সত্যিই অক্ষতযোনি ছিল এতাবৎকাল।

ভোর হল। হাতির পিঠে চেপে নিজের প্রাসাদে ফিরলেন রাজা। চুটিয়ে রাজকার্য সমাপন করে রাত হতেই হাতির পিঠে চেপে চলে এলেন দ্বীপের মাঝের কেল্লায়, সতী রানির সঙ্গ কামনায়।

এইভাবেই গেল এক-একটা দিন, এক-একটা রাত। রতিপ্রিয় রাজার রতিক্রীড়ার বৈচিত্র্য স্বপ্নরঙিন করে তুলল রাজদত্তার প্রতিটি রজনী। কয়েকটা দিবস-রজনী গেল এইভাবে।

তারপর একটা বিশ্রী স্বপ্ন ভীষণ উৎকণ্ঠার মধ্যে ফেলল রাজদত্তাকে।

অশান্ত-চিত্ত রাজদত্তা কিছুতেই স্থির থাকতে না পেরে চুমুক দিয়েছিল সুরার পাত্রে। পাত্রের পর পাত্র। কিন্তু মনের মধ্যে ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে যে জঘন্য স্বপ্ন বৃত্তান্ত, তা থেকে মুক্তি পেল না কিছুতেই।

রাত্রে রাজা এসে দেখলেন ঢুলু-ঢুলু চক্ষু কামনায় স্খলিত বসনা রাজদত্তাকে। দেখেই তাঁর নিজের কামনা বেড়ে গেল চতুর্গুণ। নিরবধি সঙ্গম করে গেলেন কাম-বন্যায় ভাসমান রাজদত্তার সঙ্গে। রাত প্রভাত হল। রাজাকে এবার যেতে হবে, রাজদত্তা কিন্তু তাঁকে ছাড়ছে না। সে তখনও অতৃপ্ত। জোর করে চলে এলেন রাজা। কামতপ্ত নারীর সঙ্গে নিরন্তর সহবাস মধুর সন্দেহ নেই, কিন্তু রাজকার্য যে রয়েছে। তাই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও কামাগ্নি, প্রজ্বলন্ত রাজদত্তাকে একা ফেলে এলেন রাজা।

নিয়তি তখন হেসেছিলেন। তাঁর লিখন খণ্ডাবে কে?

কেননা, ঠিক সেইদিনই কেল্লা-প্রাসাদের ভেতরের আর বাইরের সমস্ত প্রহরিণী আর দাসীরা যে-যার কাজের জায়গা ছেড়ে সরে গিয়ে জিরেন নিচ্ছিল শুধু একটা কারণে, যাকে আগলে রাখার জন্যে এত কড়াক্কড়ি, সেই যুবতী মহিষীই সারা রাতের কাম-খেলায় ক্লান্ত আর মদের নেশায় বেহুশ। সুতরাং সে ঘুমোক সারাটা দিন, রাতে তো ফের হবে রতিরঙ্গ।

ফলে, গোটা তল্লাট আর কেল্লাপ্রাসাদ প্রহরাহীন হয়ে গেছিল শ্বেত হস্তীতে চেপে বিনোদন-ক্লান্ত রাজামশায় প্রস্থান করতেই।

নিয়তি ঠাকরুণের অমোঘ লিখন ফলতে শুরু করেছিল ঠিক তখন থেকেই।

আচমকা রতি-ক্লান্ত রাজদত্তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সুঠামদেহী এক যুবাপুরুষ। যেন লোহা দিয়ে পেটা শরীর। চোখ মুখ অতীব সুন্দর।

এক দৃষ্টে সে চেয়ে আছে রমণ-রণক্লান্ত রাজদত্তার দিকে।

মদ সব মানুষকেই বেহেড করে দেয়। হিতাহিত জ্ঞান লোপ করে দেয়। রাজদত্তার অবস্থা হয়েছিল তাই।

আচমকা কন্দর্প, প্রতিম ভীম-সদৃশ সেই যুবককে সামনে দেখে রাজদত্তা স্খলিত স্বরে শুধিয়েছিল, কে আপনি? এখানে এলেন কী করে? সাগর ঘেরা এই দ্বীপে, পরিখা ঘেরা এই প্রাসাদে আপনি কি উড়ে এলেন?

যুবক বললে, হেঁটে এলাম। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। জল থেকে ডাঙায় উঠেই দেখতে পেয়েছিলাম এই প্রাসাদ। তাই এসেছি। চাই আশ্রয়।

জাহাজে চেপে এসেছেন?

না। একটা গাছের গুঁড়ি ধরে ভাসতে ভাসতে এসেছি।

কোত্থেকে?

একটা ডোবা জাহাজ থেকে। হে কন্যে, আমার কপাল বড়ো মন্দ। বাবা আর মা অনেক বিষয় সম্পত্তি রেখে মারা যেতেই ঠকিয়ে আমাকে পথে বসাল আত্মীয়-স্বজন। পরের বাড়িতে চাকরগিরি করে দুপয়সা জমিয়ে ব্যবসা করতে বেরলাম। সর্বস্ব কেড়ে নিল একদল ডাকাত। ঘুরতে ঘুরতে কয়েকজন বন্ধু পেলাম, আমারই মতো তাদের অবস্থা। ভিক্ষে করেছি একটার পর একটা গ্রামে। তারপর পৌঁছোলাম একটা সোনার খনির পাশের নগরে, নগরটার নাম সুবর্ণক্ষেত্র। রাজাকে খাজনা দিয়ে খনি থেকে সোনা তুললাম। কিছু জহরতও পেয়ে গেল আমার বন্ধুরা। এত খেটেও বছর শেষে যখন লাভের মুখ দেখলাম না, বন্ধুদের ছেড়ে চলে এলাম সমুদ্রের ধারে। আগুন জ্বেলে পুড়ে মরতে গেছিলাম। একজন বণিক তা হতে দিলেন না, নিজের

জাহাজে তুলে নিলেন, আমাকে মাস মাইনের কর্মচারী করে রাখলেন। সুবর্ণদ্বীপের দিকে পাঁচদিন যাওয়ার পর ঝড় উঠল। জাহাজ ডুবে গেল। ভাগ্য একটা আস্ত গাছ ভাসিয়ে আনলেন আমার কাছে, সেই গাছে চেপে এসেছি এই দ্বীপে। হে সুতনু কন্যা, আমাকে আশ্রয় দিন।

মদিরা লাঞ্ছিত বিশাল দুই নয়ন মেলে করজোড়ে দণ্ডায়মান যুবকের আপাদমস্তক লেহন করে নিয়েছিল রাজদত্তা, তার শিরায় উপশিরায় তখন লেলিহ আগুন, কামের আগুন!

জগতে পাঁচ রকমের আগুন আছে। পুরুষ, নারী, মাতলামি, নির্জন পরিবেশ আর আটক অবস্থা। এই পাঁচটা আগুনের যখন সহাবস্থান ঘটে, তখন একটা ঘাস কি দপ করে জ্বলে না উঠে থাকতে পারে?

পাঁচ রকমের এই আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

রাজদত্তা, সুরার আগুন যার রক্তে নাচন জাগিয়েছে, যৌবনের আগুনে যে জ্বলে যাচ্ছে, জেলখানার মতো অন্তঃপুরের পরিস্থিতি যার শোণিতে মুক্তির দহন জাগ্রত করেছে, জনপ্রাণীহীন পরিবেশে যার চিত্তে মুক্তির লালসা উদগ্র হয়ে উঠেছে, তা নির্বাণ রতি-স্পৃহা যার অণুপরমাণুতে ধিকি ধিকি জ্বলে চলেছে। যার সামনে অতীব সুন্দর বিলক্ষণ বলিষ্ঠ এক যুবাপুরুষ করজোড়ে দাঁড়িয়ে আশ্রয় যাঞ্চা করছে বিনয় বচনে—

তৃণপ্রতিম রাজদত্তা তখন কি নিজেকে আহুতি না দিয়ে থাকতে পারে? চিতার আগুনের চাইতেও অসহ্য এই কামদাহ আগে তো নিভুক, নির্জন খাঁচায় বন্দিনী সুরামত্ত সঙ্গম-বুভুক্ষু রমণীর সতীত্ব রক্ষার ক্ষমতা যে বৈষ্ণব রাজার নেই, তা হাতেনাতে দেখিয়ে দেওয়া যাক।

পিপাসা...পিপাসা...অদ্যম কাম পিপাসা....কেউ কোথাও নেই....শুষ্ক তৃণসম রমণী রাজদত্তা সতীত্ব জলাঞ্জলি দিয়েছিল পঞ্চঅগ্নির লেলিহ শিখায়....দুহাত বাড়িয়ে যুবককে টেনে নিয়েছিল বুকে....

আদিম খেলায় মেতে গেছিল দুজনে। রাজদত্তাকে প্রায় নিংড়ে সুখ আহরণ করেছি আগন্তুক যুবক, রাজদত্তাও বিনিময় প্রথায় নিংড়ে নিয়েছিল যুবককে।

অবশেষে, অতিশয় রতিক্লান্ত অবস্থায় দুজনেই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে তলিয়ে গেছিল ঘুমের অতলে।

দিন গড়িয়ে গিয়ে রাত এসেছিল। সাদা হাতিতে চেপে রাজা এসেছিলেন। বিস্ফারিত চোখে দেখেছিলেন, তার সহস্র ব্যবস্থা বিফলে গেছে। গণকদের কথাই সত্য হয়েছে। কুলগ্নে বিবাহ সতীকে অসতী বানিয়েছে। এবং, রাজদত্তার অন্তরের অন্তস্তলে সুপ্ত পরপুরুষ কামনা সামান্যতম সুযোগে লেলিহ রূপ ধারণ করেছে।

হাড়ে হাড়ে বুঝলেন। বেগবতী তটিনী আর চঞ্চলা রমণী, এই দুইয়েরই শেষ লক্ষ্য, সঙ্গম। প্রথমটির সাগর সঙ্গম, দ্বিতীয়টির যেকোনও পুরুষ-সঙ্গম!

অসি কোষমুক্ত করেছিলেন বৈষ্ণব রাজা। ঘুমন্ত অবস্থাতেই, দিগবসনা রাজদত্তা আর নিরাবরণ যুবককে অলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই নিকেশ করবেন বলে।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলে নিলেন নিজেকে। দোষ তো তাঁরই? বিজ্ঞদের সুবচনে কর্ণপাত না করার প্রতিফল ভোগ করছেন।

রাজার ক্রুদ্ধ নিনাদ জাগ্রত করে দিয়েছিল দুজনকে। পাপিষ্ঠা রাজদত্তার দিকে দৃকপাত না করে অচেনা যুবকের কাহিনি আগে শ্রবণ করলেন বৈষ্ণব রাজা। তারপর তাকে তাড়িয়ে দিলেন দ্বীপ থেকে, ফেলে দিলেন সাগরের জলে।

কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেল সে এক মহানুভব সওদাগরের কৃপায়। জল থেকে তুলে নিয়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন নিজের জাহাজে। তাঁর পত্নী ছিল ডানাকাটা পরীর মতো রূপসী। কিন্তু অন্তরে সুপ্ত ছিল অবৈধ কামলালসা। দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের মাঝে জাহাজের দুলুনিতে তা লেলিহ হয়েছিল বলিষ্ঠ পরপুরুষকে দেখে। গ্রহণেই রমণীর আনন্দযন্ত্র হিসেবে পরপুরুষকে ব্যবহার করাই সঙ্গত, এই কু-মানসিকতা নিয়ে সুন্দরী বণিকবধূ সুযোগ মতো অচেনা অজানা পুরুষটাকে যৌনসঙ্গী করে যেত।। বণিক তা জানতে পারেন। পাপ আর পারা কখনও চাপা থাকে না। জল থেকে তুলে যাকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন, জলে ফেলে দিয়েই তার প্রাণ নাস করেছিলেন।

বৈষ্ণব রাজাও বিষম কুপিত হয়ে রাজদত্তাকে নিয়ে গেলেন তার দিদি, বণিক পত্নীর কাছে। সখেদে বললেন, ভুল! ভুল! ফের ভুল করলাম। অথবা আমাকে দিয়ে নিয়তি ভুল করালেন, সতীনারী সংসর্গ আমার কপালে লেখা নেই। তাই সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছি। আপনি প্রকৃতই সতী, আমার অর্ধেক রাজত্ব আপনাকে দিলাম। বাকি অর্ধেক দিচ্ছি ব্রাহ্মণদের।

উপর্যুপরি মানসিক আঘাতে বিধ্বস্ত বৈষ্ণব রাজার কথার নড়চড় হয়নি। বিলি ব্যবস্থা করে যেই শ্বেতহস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করে অরণ্য গমন করতে যাচ্ছেন, অমনি শ্বেতহস্তীর কায়া পরিবর্তন ঘঠল,

ছিল হাতি, হয়ে গেল এক ভারী সুন্দর পুরুষ।

মিষ্টি হেসে বললে হতবাক বৈষ্ণব রাজাকে, ভাইরে, আমি জাতিস্মর। তাই তোমাকে শোনাই তোমার পূর্বজন্মের কাহিনি। তুমি আর আমি ছিলাম একই মায়ের পেটের দুই ভাই। ছিলাম গন্ধর্ব। মলয়গিরিতে ছিল আমাদের নিবাস। একদিন বৌদিকে কোলে নিয়ে দেবদর্শনে গেছিলে। তার রূপ দেখে হাঁ হয়ে গেছিলেন এক যোগীপুরুষ। তুমি তাই দেখে গালাগাল দিয়েছিল যোগীকে। তাঁর শাপে তোমাকে মানুষ হয়ে জন্মাতে হয়েছিল, তোমার আশি হাজার বউ-ই হয়েছে অসতী। তোমার দর্প চূর্ণ করার অভিশাপ শুনে আমি খাপ্পা হয়ে যোগীকে যা মুখে আসে তাই বলেছিলাম। পরিনামটা ভালো হয়নি। তাঁর আর এক শাপে আমাকে সাদা হাতি হয়ে জন্মাতে হয়েছে। বিপদ বুঝে তাঁকে প্রসন্ন করেছিলাম। বর দিয়েছিলেন সিদ্ধপুরুষ। বলেছিলেন, মানুষ হয়ে জন্মাবে তুমি রাজবংশে, পাবে সসাগরা ধরিত্রীর রাজত্ব আর আশি হাজার রাজকন্যার বরমাল্য। কিন্তু যেদিন দেখবে অসতী প্রত্যেকেই, সেদিন তুমি সংসার আর কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করবে। ফের গন্ধর্ব হয়ে যাবে। আমিও হাতি থেকে গন্ধর্ব হয়ে যাব। চলো ভাই, আমাদের শাপমুক্তি ঘটেছে, ভোগান্তি শেষ হয়েছে। বিস্মৃত পূর্বকথা নিমেষে ঝলসে উঠেছিল বৈষ্ণব রাজার চিত্তপটে। ভাইকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করেছিলেন স্বস্থানে।

গল্প শেষ করে বলেছিল হেমপ্রভা, তাই তো বলি, জোর করে মেয়েদের সতী রাখা যায় না। সতী সে-ই থাকে, যার ভেতর পরিষ্কার। কেউ তাদের দুশ্চরিত্রা করতে পারে না। যেমন, সীতা।

৩৭. মর্কটের কাহিনি

যুবরাজ নরবাহনদত্তের প্রধান বয়স্য এতক্ষণ কান খাড়া করে শুনে গেছিল হেমপ্রভার শিক্ষামূলক অথচ মজার কাহিনি। একজন নয়, দুজন নয়, আশি হাজার বধূরত্নই ব্যভিচারিণী! অন্তঃপুরে বন্দিনী রাখলেও হয়ে যাচ্ছে কুলটা। এর চাইতে মহত্তর শিক্ষা আর কী হতে পারে?

তাই মুখ চুলবুল করে উঠেছিল গল্পের আসরে আর একটা গল্প নিবেদন করার আত্যন্তিক অভিলাষে।

হেসে বলেছিল বড়ো সত্যি কথা বললেন যুবরানি। সত্যিই শতকরা ষোলআনা কাঞ্চন চরিত্রের রমণী এ সংসারে খুবই কম। যুবরানির নাম সার্থক। হেমপ্রভা, অর্থাৎ, সোনার কিরণ। কিন্তু সব মেয়ে কি এমন কিরণ বর্ষণ করতে পারে? সব মেয়ে কি নিখাদ সোনা দিয়ে চরিত্র গড়তে পারে? না, না, না। বেশির ভাগ মেয়েরাই হয় বড়ো চপলা, বড়ো অস্থির। চরিত্রের দৃঢ়তা তাদের থাকে না, তাদেরকে, বিশ্বাস করা যায় না। যুবরানি আমার সত্য কথনের জন্যে ক্ষমা করবেন। কিন্তু এই, প্রসঙ্গে একটা কাহিণী এই আসরে নিবেদন না করে পারছি না।

ঘটনাটা ঘটেছিল সেকালের উজ্জ্বনিয়ী শহরে। বহু বড়োলোক বণিকের নিবাস সেখানে। এমনি এক ধনী বাণিজ্য ব্যবসায়ীর ছেলে ছিল একটিই। তার নাম নিশ্চয়দত্ত। বাপের এত টাকাপয়সার তোয়াক্কা না করে সেই ছেলে রোজ প্রচুর টাকা রোজগার করত, বাণিজ্য করে নয়, জুয়ো খেলে। সেই টাকা নিজের ভোগে না লাগিয়ে দানধ্যান করে উড়িয়ে দিত। আর রোজ পুজো করতে যেত শিপ্রানদীর তীরে শিব ঠাকুরকে।

মন্দির থেকে কিছু তফাতে ছিল উজ্জয়িনীর মহাশ্মশান। সেখানে ছিল একটা বিরাট থাম, পাথরের। জুয়োপ্রিয় অথচ দানবীর আর ধার্মিক এই বণিকপুত্র রোজ সেই পাথরে চন্দন কাঠ ঘষে সেই রস নিজের গায়ে মাখতো। অর্থাৎ, পাথরের থাম ছিল তার চন্দন পিঁড়ি।

দানধ্যান শেষ করে প্রতিদিন চন্দন ঘষতে ঘষতে পাথরের অনেকখানি জায়গা বেশ চকচকে হয়ে গেছিল, খড়খড়ে ভাব আর ছিল না। বিলক্ষণ মসৃণ পাথর দেখে একদিন এক চিত্রশিল্পী আবেগের বশে পাথরের পটে এঁকে গেছিল গৌরীদেবীর ভারি সুন্দর একটা মূর্তি।

এরপর থেকেই শুরু হল বিচিত্র ঘটনার পর ঘটনা। শিবের পুজো দিতে এক বিদ্যাধরী নেমে এসেছিল আকাশ থেকে। শিবের আর এক নাম মহাকাল অথবা মহাকালেশ্বর। এ মন্দিরে শিব ভজনা করলে মনস্কামনা পূর্ণ হবেই। বিদ্যাধরি, কন্যার আগমন সেই কারণেই।

সে এসে দেখেছিল মস্ত থামের গায়ে আঁকা অপূর্ব সেই গৌরীমূর্তি। হিমালয়, মেনকার কন্যা। অপর্ণা, উমা, হৈমবতী নামেও যিনি পুজো পান মেয়েদের কাছে।

মুগ্ধ বিদ্যাধর কন্যা গৌরী ভজনা করে একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্যে ঢুকে গেছিল থামের মধ্যে। বিদ্যাধরীরা সব পারে, সূক্ষ্ম শরীরী হয়ে থামে প্রবেশ করে জিরোচ্ছে, এমন সময়ে, নিশ্চয়দত্ত এল সেই থামের সামনে, চন্দন কাঠ ঘষবার জন্যে।

তেলতেলে পাথরের গায়ে অপরূপ গৌরীমূর্তি আঁকা রয়েছে দেখে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। মূর্তির গায়ে চন্দন কাঠ ঘষা কি যায়? অসম্ভব।

অতএব, থামের উলটোদিকে গিয়ে ঘষ ঘষ করে ঘষে গেল চন্দন কাঠ।

সূক্ষ্মদেহী বিদ্যাধরী থামের ভেতরে থেকে মুগ্ধ হয়ে গেছিল নিশ্চয়দত্তের আশ্চর্য কান্তিময় শরীরটা দেখে। চোখে বিদ্যুৎ, বুকের পাটায় শক্তি, অঙ্গসঞ্চালনে বল আর বীর্য যেন ঠিকরে ঠিকরে যাচ্ছে।

কামনাসিক্ত হয়ে গেছিল সঙ্গম-পারঙ্গমা বিদ্যাধরী। থামের মধ্যে থেকে সহসা দুহাত প্রসারিত করে চন্দন মাখিয়ে দিয়েছিল নিশ্চয়দত্তের পৃষ্ঠদেশে। রমণীসুলভ চাপল্যে। শৃঙ্গার-ইচ্ছা বলবতী হওয়ায়। যা কিনা পূর্বরাগের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। প্রণয় সঞ্চারের লক্ষণ। আদর করে চন্দন লেপে দিতে গিয়ে টুং টাং করে রিন ঝিন শব্দে ঠোকাঠুকি লেগেছিল বিদ্যাধরী যুবতীর দুহাতের সোনার চুড়িতে। বড়ো মধুর শব্দ। পুরুষ অবয়বে চিরকাল শিহরণ জাগিয়ে এসেছে এই শব্দ। শুধু কি শব্দ? নরম হাতের তেলো গোটা পিঠ জুড়ে মোলায়েম ছোঁয়া দিয়ে যাচ্ছে শব্দের সাথে সাথে, এ সুখানুভূতি থেকে কি কোনও পুরুষ মানুষ নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে?

নিশ্চয়দত্তও আবেশে চোখ মুদে ফেলেছিল। প্রথমে ভেবেছিল, কোমল করস্পর্শ যে মেয়েটি ঘটিয়ে চলেছে, সে নিশ্চয় দাঁড়িয়ে আছে পেছনে।

ইচ্ছে ছিল করপল্লবের অধিকারিণীকে করতলগত করবে। সুখ-হিল্লোলিত অবস্থাতেই চোখ খুলেছিল সেই মতলবে।

অবাক হয়ে গেছিল থামের ভেতর থেকে দুটি রমণী হস্ত বেরিয়ে রয়েছে দেখে। সোনার চুড়ির রিন ঝিনঝিন শব্দ উত্থিত হচ্ছে এই দুটি হাতের স্বর্ণবলয় থেকে।

দুধের মতো সাদা তুলোর মতো নরম হাতদুটো খপ করে চেপে ধরেছিল নিশ্চয়দত্ত।

অমনি বিদ্যাধরী বলেছিল থামের মধ্যে থেকে সুরেলা স্বরে, ও মশায়, কীরকম মানুষ আপনি? মেয়ে মানুষের হাত ধরেছেন কেন?

তোমাকে দেখব বলে।...বলেছিল নিশ্চয়দত্ত। যে রমণীর হাত এত মাখন-কোমল, তাকে দেখে চক্ষু সার্থক করার অদম্য পিপাসা জাগ্রত হয়েছিল চিত্তে।

বিদ্যাধরীও তো তাই চেয়েছিল। পিঠে সুড়সুড়ি দিলে কোনো কোনো পুরুষের কাম পিপাসা জাগত হয় না?

কিন্তু বলেছিল ন্যাকা-ন্যাকা গলায় আগে হাত ছাড়ুন, নিশ্চয়দত্ত বলেছিল, তার আগে বলো তুমি কে? তারপর ছাড়ব হাত!

তখন বলেছিল কুহকিনী বিদ্যাধরী, আমাকে দেখতে বড়ো সাধ হচ্ছে? মেয়েমানুষের হাত ধরেই খুশি নন? শরীর চাই?

আগে দেখতে চাই।

হাত ছাড়ুন। যাচ্ছি সামনে,

হাত ছেড়ে দিয়েছিল নিশ্চয়দত্ত, সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভ ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিল সূক্ষ্মশরীরী বিদ্যাধরী বিদ্যাধরী, পরমুহূর্তেই স্থূল রূপের মায়া বিস্তার করে ধরেছিল নিশ্চয়দত্তের সামনে।

চোখ ঠিকরে গেছিল মানুষটার। কী রূপ! কী রূপ! আবরণ আর আভরণ দুটোই যৎসামান্য, কিন্তু কামনার আমন্ত্রণ যে দুই বিলোল কটাক্ষে।

মুখোমুখি বসেছিল দুজনে। চোখে চোখে চেয়ে।

জিজ্ঞেস করেছিল নিশ্চয়দত্ত, কে তুমি শরীরী শ্লোক?

বিদ্যাধরী জবাব দিয়েছিল রোমাঞ্চ জাগানো স্বরে, আমার নাম অনুরাগপরা। নিবাস পুষ্করাবতী শহরে, হিমালয়ে। বিদ্যাধরের মেয়ে আমি।

বিদ্যাধরী?

হ্যাঁ। এসেছিলাম শিবের পুজো দিতে। শিবের মতো বর যেন পাই। জিরিয়ে নিচ্ছিলাম থামে ঢুকে, এমন সময়ে এলেন আপনি। যেন সাক্ষাৎ শিব। রূপমুগ্ধ এই কন্যা তখন চন্দন মাখিয়ে বরণ করেছে আপনাকে। গ্রহণ করুণ আমাকে। আর যদি মন উচাটন না হয়, ছেড়ে দিন, যাই স্বস্থানে।

নিশ্চয়দত্ত বললে, হে সুন্দরী, হরণ করেছ চিত্ত মোর, মরণ হয়েছে তৎক্ষণাৎ। তোমাকে ছাড়ব না।

কিন্তু আমি যে এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। হে পুরুষোত্তম, মরেছি আমিও। আমার সর্বস্ব আপনাকে দিতে না পারা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। কিন্তু এখানে নয়........এখানে নয়......আসুন পুষ্করাবতীতে, সেইখানে হবে আমাদের মধুর মিলন, দুই শরীরের ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণীর খেলা হবে সেখানে। এখানে নয়......এখানে নয়।

বিমুগ্ধ স্বরে নিশ্চয়দত্ত বলেছিল, তাই হবে। বিদায় বিদ্যাধরী।

মুহূর্তে শূন্যে বিলীন হয়ে গেছিল কাম-কুহকিনী অনুরাগপরা। যার নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে অনুরাগ সৃষ্টির শক্তি। নিশ্চয়দত্ত নিহত তো হবেহ, মনে মনে, শরীরে জেগেছে উদগ্র সম্ভোগ বাসনা।

ফলে, ঘুম উড়ে গেছিল বেচারির দুচোখের পাতা থেকে। রুচি রইল না আহারেও। শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে অনুরাগপরা তার বিদ্যাধরী মায়া বিস্তার করে, তা থেকে পরিত্রাণ দিতে পারবে না কোনও মানুষ্য-কন্যা, চাই শুধু ওই বিদ্যাধরী কন্যাকে। যার সারা শরীরে আশ্চর্য লাবণ্য, প্রতিটি রোমকূপে অদৃশ্য অগ্নিসম যৌনতা।

বিনিদ্র রজনী অন্তে পুবে সূর্য ওঠবার আগেই হিমালয়ের দিকে রওনা হয়েছিল মুহ্যমান নিশ্চয়দত্ত। ক্রমাগত উত্তর দিকে যেতে যেতে অনেক ভয়ংকর জঙ্গল, পাহাড়, ডাকাতদলের অঞ্চল পেরিয়ে বিতস্তা নদী অতিক্রম করে আশ্রয় নিয়েছিল এক দোকানদারের ঘরে।

সুপরামর্শ দিয়েছিল কয়েকজন কাঠুরে, আর এগোবেন না।

পথ নেই। শুধু জঙ্গল। শ্বাপদসংকুল। মাঝখানে একটা শিবমন্দির আছে বটে, কিন্তু সেখানে গেলে প্রাণটা যাবে। শৃঙ্গোৎপাদিনী খেয়ে ফেলবে।

শৃঙ্গোৎপাদিনী! মেয়েছেলে মনে হচ্ছে! আমাকে খাবে? আমার মতো ভীমজোয়ান পুরুষকে?

মেয়েছেলে তো বটেই, তবে যক্ষিণী। মন্ত্র পড়ে আপনাকে ন্যাওটা করবে, তারপর হাড়মাস পর্যন্ত চিবিয়ে খাবে। পালান, পথিক, পালান।

বলে, কাঠুরেরা নিজেরাই পালিয়েছিল।

ডাকাতদের চোখে ধুলো দিয়ে চম্পট দেওয়ার পর নিশ্চয়দত্ত চারবন্ধু পেয়েছিল পথে। চারজনেই সন্ন্যাসী। তারপর থেকেই একসঙ্গে পথ চলেছে পাঁচজনে। বিতস্তা নদীর এপারে এসে নিশ্চয়দত্তের পাশে থেকে তারাও শুনল ভয়ার্ত কাঠুরেদের সাবধানবাণী।

একযোগে তারাই বললে নিশ্চয়দত্তকে, যক্ষিণীকে কবজায় আনতে আমরা যাচ্ছি। আমরা সন্ন্যাসী। তার মন্ত্র আমাদের ওপর খাটবে না। নিশ্চয়দত্ত, তুমি যেও না।

নাছোড়বান্দা নিশ্চয়দত্ত সদুপদেশে কর্ণপাত করেনি। বিদ্যাধরী অনুরাগপরা যে তাকে চুম্বকের মতো টানছে। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে অরণ্যপ্রবেশ করেছিল সে নিজেও। যাওয়ার পথে আত্মবল বৃদ্ধির জন্যে পাঁচজনেই গায়ে ছাই মেখে আগুনের কুণ্ডের সামনে মন্ত্রতন্ত্র আউড়েছিল, সূক্ষ্ম শক্তিদের আবাহন করে গেছিল।

কিন্তু যক্ষিণীর শক্তি যে এসব শক্তিদের চেয়ে প্রবলতর, তা প্রমাণিত হয়ে গেছিল সেই করালরূপিনী ভয়ংকরীর সামনে পৌঁছতেই।

সেই সঙ্গে জানা গেছিল কেন তার নাম হয়েছে শৃঙ্গোৎপাদিনী।

শব্দটার অর্থ এমনই এক নারী যে নারী শিং সৃষ্টি করে দিতে পারে। চোখের সামনে দেখা গেল সেই কিম্ভূত কাণ্ড!

শিবমন্দিরের সামনে দাউ দাউ করে জ্বলছিল একটা অগ্নিকুণ্ড। আগুনের আভায় দেখা গেল মন্দিরের ভেতর থেকে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে বেরিয়ে আসছে যক্ষিণী। বিকটদর্শন একটা বাঁশি বাজাতে বাজাতে...

বিকটদর্শন প্রকৃতই। কেননা, সে বাঁশি তৈরি হয়েছে মানুষের কঙ্কালের হাড় দিয়ে।

তার চাইতেও বিকট সেই যক্ষিণীর চেহারা। দেখলেই গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়। কঙ্কাল-বাঁশি থেকে যে নারকীয় সুরের সৃষ্টি হয়ে চলেছে, তা গায়ের রক্ত জমিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

ফলে, নিঃসীম আতঙ্কে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল চারজনেই।

আর ঠিক সেই সময়ে উৎকট নৃত্য বন্ধ করে দিয়ে রক্তজল করা কণ্ঠস্বরে মন্ত্র পড়তে শুরু করে দিয়েছিল শৃঙ্গোৎপাদিনী যক্ষিণী।

আর যায় কোথায়! আতঙ্কে অবশ এক সন্ন্যাসীর মাথা ফুঁড়ে চড় চড় করে বেরিয়ে এসেছিল একটা শিং?

শিং-এর জাদুপ্রভাব শুরু হয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ। উদ্দাম তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছিল শিং ধারী সন্ন্যাসী। যেন এক শিং ওলা পাগলা ভেড়া। তিড়িং তিড়িং করে নাচতে নাচতে সটান ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আগুনের কুণ্ডে।

এবং, পরমানন্দে পুড়ে মরে গেছিল একটু পরেই।

অনেকদিন পরে মানুষ-পোড়া পেয়ে যক্ষিণীর পুরো পোড়ানো পর্যন্ত তর সয়নি। আধপোড়া সন্ন্যাসীকেই আগুন থেকে হিড় হিড় করে টেনে এনে কচরমচর করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছিল তৎক্ষণাৎ।

বাকি তিন সন্ন্যাসী আর নিশ্চয়দত্ত সেই বীভৎস দৃশ্য দেখছে বটে, কিন্তু নাচ থামাতে পারছে না।

ফলে, একে একে বাকি তিন সন্ন্যাসীকেও তারিয়ে তারিয়ে কখনও কোঁৎ কোঁৎ করে গিলে খেয়ে নিয়েছিল যক্ষিণী।

চার-চারটে সন্ন্যাসী ভক্ষণ চাট্টিখানি কথা নয়। চতুর্থ সন্ন্যাসীকে উদরস্থ করার সময়ে হৃষ্টচিত্ত যক্ষিণী ভয়ংকরী কঙ্কাল, বাঁশিটা নামিয়ে রেখেছিল মাটিতে।

বংশীধ্বনি স্তব্ধ হতেই স্তব্ধ হয়েছিল নিশ্চয়দত্তের নৃত্য।

প্রখর উপস্থিত বুদ্ধিকে প্রয়োগ করেছিল তৎক্ষণাৎ।

টুক করে তুলে নিয়েছিল জাদু-বাঁশি। বাজাতে শুরু করেছিল নিজেই। ফুসফুসের সমস্ত জোর দিয়ে। আরও বুককাঁপানো ভয়াল স্বর সৃষ্টি করে।

কড়মড় করে হাড় চিবোনো বন্ধ হয়ে গেল যক্ষিণীর। মায়া-বংশী হাত ছাড়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বশ করার শক্তিও যে লোপ পেয়েছে তার। উলটে প্রাণ যে যায়-যায় অবস্থায় চলে এসেছে!

কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছিল, হে বীরশ্রেষ্ঠ, এই অবলা নারীকে ক্ষমা করুন।

হুংকার ছেড়েছিল নিশ্চয়দত্ত, তুই অবলা? পাপীয়সী মানুষখেকো—

কেঁদে ফেলে বলেছিল যক্ষিণী, আমি যে মেয়েছেলে, পুরুষদের মতো সাহস তো আমার নেই। সব মেয়েদের মতো আমিও ভীতু।

তিড়িং তিড়িং করে নাচতে নাচতে সটান ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আগুনের কুণ্ডে।

পথে এস।.... মনে মনে বলেছিল নিশ্চয়দত্ত, কিন্তু বাঁশি বাজানো বন্ধ করেনি। বরং আরও জোরে ফুঁ দিয়ে গেছিল। যে মানুষ-পোড়া খায়, তাকে মেরে ফেলাই ভালো।

হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ওষ্ঠাগতপ্রাণ, যক্ষিণী বলেছিল, মারবেন না, মারবেন না, আমাকে প্রাণে মারবেন না। আপনার পায়ের জুতো হয়ে থাকব। যা বলবেন, তাই করব। শুধু বাঁশিটা ফিরিয়ে দিন। তারপর হুকুম করুন, তামিল করব।

নিশ্চয়দত্তের মাথায় বুদ্ধিটা খেলে গেছিল তৎক্ষণাৎ। অভীষ্টসিদ্ধির পথ তো সুগম। যক্ষিণীকে বাহন বানিয়ে পুষ্করাবতী যাওয়া যাক।

এই নে বাঁশি। নিয়ে চ আমাকে বিদ্যাধরী অনুরাগপরার কাছে, হিমালয়ের পুষ্করাবতী নগরে।

চাপুন.....আমার ঘাড়ে চাপুন।

সাঁই সাঁই করে উল্কাবেগে বায়ুপথে উড়ে গিয়ে রাত ফুরোনোর আগেই বিশাল এক পাহাড়ের সামনে গিয়ে পৌঁছোল যক্ষিণী।

মিনতি করে বললে নিশ্চয়দত্তকে, আজ রাত্তিরে আর না। রাত ফুরোলেই আবার শক্তি চলে যায়। দিনটা এখানে থাকুন, সন্ধ্যে হলেই ফের আসব।

বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় তো নেই। বিশাল এই পাহাড় পেরোতে হলে যক্ষিণীর কাঁধেই ফের উঠতে হবে। সুতরাং কপালে যা থাকে থাক, যক্ষিণীকে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

মুক্তি পেয়েই জঙ্গলের সেই শিব মন্দিরে ফিরে গেছিল শৃঙ্গোৎপাদিনী।

রাতের অন্ধকার চলে যেতেই ভোরের আলোয় পাহাড়ের এদিকে সেদিকে টহল দিতে শুরু করেছিল নিশ্চয়দত্ত। পাহাড়ের মাঝখানে দেখেছিল একটা চমৎকার হ্রদ। দূর থেকে টলটলে নির্মল জল দেখে কাছে গেছিল তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে।

কিন্তু কাছে যেতেই তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল সহজাত বুদ্ধি। আপাত সুন্দর জল যে বিষ বলেই মনে হচ্ছে!

তেষ্টা না মিটিয়ে পাহাড় বেয়ে কিছুটা উঠতেই দেখেছিল এক আশ্চর্য ব্যাপার। বিরাট বিবরে অর্ধপ্রোথিত রয়েছে অতিবিকট এক বানর। তার দুই চোখে যেন দুটো আগুনের মালসা বসানো, ঠিকরে ঠিকরে বেরোচ্ছে লকলকে শিখা।

অনড় হয়ে গেছিল নিশ্চয় দত্তের পদযুগল। বিলকুল স্তম্ভিত। এমন শাখামৃগ তো জীবনে দেখেনি। চেয়ে রইল একদৃষ্টে।

আর ঠিক তখনই পরিষ্কার মানুষের কথা বেরিয়ে এল ভয়ংকর বানরের কণ্ঠ দিয়ে।

সে বললে নিদারুণ হেঁড়ে আর বিটকেল কর্কশ গলায়, ঘাবড়াবেন না। আসলে আমি মানুষ।

ঢোক গিলে নিশ্চয়দত্ত বলেছিল কিন্তু এরকম অবস্থা হল কেন?

আমাকে বাঁচান। তারপর শুনবেন আমার, কাহিনী

নিশ্চয় দত্ত হতভম্ভ হয়ে গেলেও মর্কটের কাতর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিল। গর্ত থেকে তাকে টেনে হিঁচড়ে বের করে এনেছিল।
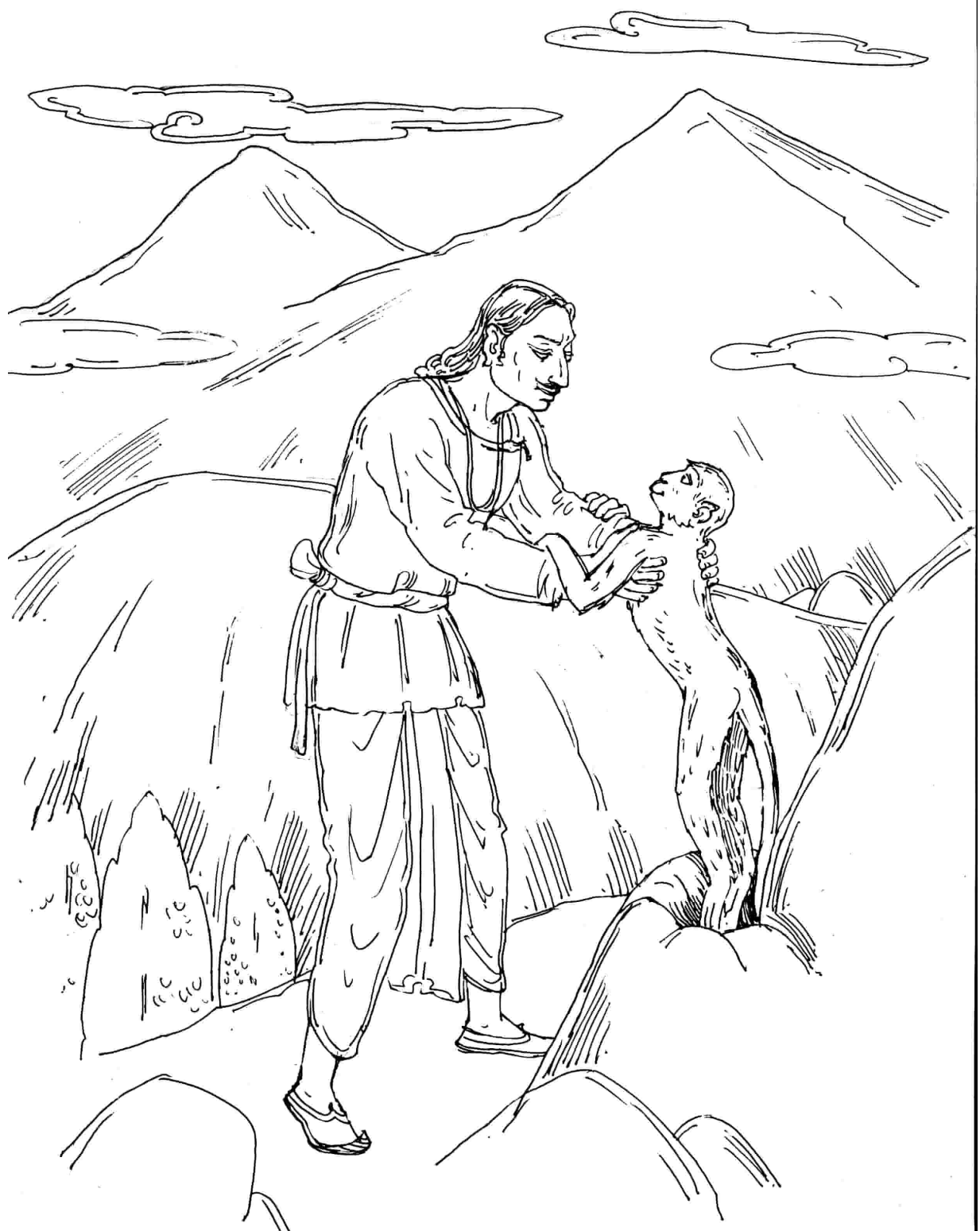
এমন শাখামৃগ তো জীবনে দেখেনি।

আপনি দয়ার অবতার।.... এই বলে নিশ্চয়দত্তের পায়ের কাছে কিছুক্ষণ পড়ে থাকবার পর বলেছিল বানর, আপনি তো দেখছি খিদে আর তেষ্টায় হেদিয়ে পড়েছেন। চলুন, আগে আপনাকে চাঙা করি।

একটু দূরেই ছিল একটা পাহাড়ি নদী। নদীর তীরে ফলের গাছ। সেই ফল খেয়ে আর নদীর জলে তেষ্টা মিটিয়ে একটা চ্যাটালো পাথরের ওপর গা এলিয়ে বসেছিল নিশ্চয়দত্ত।

কুৎসিত বানর শুরু করেছিল তার অত্যাশ্চর্য কাহিনি।

তার মনুষ্যনাম সোমস্বামী। ব্রাহ্মণ। নিবাস কাশীধামে। বাবার নাম চন্দ্রস্বামী। মায়ের নাম সুবৃত্তা।

যৌবন এসে তাকে উচ্ছৃঙ্খল করে দিয়েছিল। পরস্ত্রী গমনে মেতে গেছিল। বিশেষ এক বধূ তাকে মাতিয়ে রেখেছিল।

মেয়েটির নাম বন্ধুদত্তা। এক বাণিজ্য ব্যবসায়ীর বউ।

বণিক থাকতেন মথুরায়। বিয়ে করেছিলেন কাশীর মেয়েকে, এই বন্ধুদত্তাকে।

বন্ধুদত্তার বয়স তখন কম। বিয়েটা হয়েছিল বটে, কিন্তু স্বামীসঙ্গ কখনও হয়নি। বাপের বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। একটু একটু করে বয়স বেড়েছে। পাগল করা যৌবনের জ্বালা জুড়োতে নিয়মিত সোমস্বামীর সঙ্গে কামক্রীড়া করে গেছে। মেয়েদের এই জ্বালা যে অষ্টগুণ, পুরুষদের চেয়ে। গোটা শরীরের অদৃশ্য অনল নিভিয়ে গেছে বকাটে সোমস্বামী অতীব নিষ্ঠায়। পরের বউ যে বড়ো মধুর।

মথুরার সেই বণিক হঠাৎ একদিন কাশীতে এসে বললে বউ নিয়ে এবার যাব নিজের বাড়ি।

আকাশ ভেঙে পড়েছিল ব্যভিচারিণী বন্ধুদত্তার মাথায়। মনের কথা ব্যক্ত করেছিল এক প্রাণের বান্ধবীর কাছে। সে শ্বশুর বাড়ি যাবে না। সোমস্বামীর সঙ্গ ছাড়া বাঁচবে না। এতদিন যে মানুষটা যৌনসুখ দিয়ে এসেছে, তার কাছেই থাকবে। কী করা যায়?

যেমন বন্ধুদত্তা, তেমনি তার বান্ধবী। বরং এক কাঠি ওপরে যায়। তার নাম সুবশা, মানুষ বশ করতে পটু। বশ করার পদ্ধতিটাও অদ্ভুত।

দুটো মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছিল বন্ধুদত্তাকে। প্রথম মন্ত্রটা আউড়ে একগাছি সুতো বেঁধে দিতে হবে সোমস্বামীর গলায়। তক্ষুণি সে বানর হয়ে যাবে। বানর থেকে মানুষ করার দরকার হলেই আর একটা মন্ত্র পড়ে সুতোটা গলা থেকে খুলে দিতে হবে।

মুখ বেঁকিয়ে বন্ধুদত্তা বলেছিল বাঁদরের সঙ্গে তো কথা বলা যাবে না।

সুবশা হেসে বলেছিল যারি। বাঁদর হয়ে গেলেও তার বুদ্ধিশুদ্ধি থাকবে মানুষের মতো, কথাও বলবে মানুষের মতো। তোমার সোমস্বামী তোমারই থাকবে, শুধু বাঁদর চেহারায়, অন্য লোকের সামনে। যখনই কামযন্ত্র অস্থির হবে, তাকে মানুষ, বানিয়ে নেবে। শরীর ঠাণ্ডা হলেই আবার বাঁদর বানিয়ে রাখবে।

তোফা ফন্দি! মন্ত্র শিখে নিয়ে সোমস্বামীকে বাঁদর বানিয়ে পাশে বসিয়ে রাখল কামপিপাসু বন্ধুদত্তা।

তার নিজের বর যখন এল তাকে শ্বশুর বাড়ি নিয়ে যেতে, ছেনালি করে বন্ধুদত্তা বললে, বন্ধু বাঁদরটাকে সঙ্গে নিয়ে যাই? নিশ্চয়।...রাজি হয়েছিল তার স্বামী। বড়ো বাঁদর তো নয়, সেক্ষেত্রে পশ্বাচারের সম্ভাবনা থাকে, এতো ছোটো বাঁদর। থাকুক সঙ্গে।

এক চাকরের পিঠে উঠে বসল বাঁদররূপী সোমস্বামী। বন্ধুদত্তা আর দলবল নিয়ে রওনা হলো বণিক।

পথে পড়ল একটা বাগান। সেখানে গাছে গাছে থুকথুক করছে বাঁদর। মানুষের কাঁধে বাঁদরের বাচ্ছা দেখে তারা ধেয়ে এল দলে দলে। বাঁদরের দল যখন রণমূর্তি ধরে, তখন তাদের সঙ্গে পারা যায় না। আঁচড়ে কামড়ে অস্থির করে দেয়। চম্পট দেওয়াই শ্রেয়।

চাকর দেখলে, সামান্য একটা বাঁদর বাচ্ছার জন্যে নিজের অবস্থা কাহিল হয়ে উঠেছে। সে বাচ্ছাটাকে মাটিতে ফেলে চম্পট দিল বাগান থেকে। তার পশ্চাতে বণিক আর তার দলবল। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল বউ বন্ধুদত্তাকেও। একটা বাঁদরের বাচ্ছার জন্যে অত কান্না কীসের?

কান্নাটা কেন, বন্ধুদত্তা তা মুখ ফুটে বলতেও পারল না। ওদিকে একা সোমস্বামীকে পেয়ে, অবশ্যই মর্কট অবস্থায়, বাঁদর বাহিনি তার সারা শরীরে রক্ত ঝরিয়ে তাড়িয়ে দিল। বাগান থেকে।

হতচ্ছাড়া বাঁদররা আগন্তুক বাঁদর-বাচ্ছার গা থেকে লোম পর্যন্ত খাবলা খাবলা করে তুলে নিয়েছিল। রক্ত ঝরছিল সারা গা বেয়ে। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বানররূপী সোমস্বামী এলোমেলো ভাবে ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছেছিল একটা পাহাড়ে।

মুখোমুখি হয়েছিল আর এক আপদের। একটা মেয়ে হাতি বিকট দর্শন, লোমহীন, রক্তমাখা বানরশিশু দেখেই শুঁড়ে করে জাপাটে ধরে শূন্যে তুলেই ঘ্যাঁচ করে বসিয়ে দিয়ে গেছিল একটা গর্তের মধ্যে।

গর্তে গাঁথা বাঁদর-বাচ্ছা একার জোরে কি খালাস পেতে পারে? ডেকে গেছিল শুধু ত্রাতা ভগবানকে। তাঁরই দয়ায় খিদে তেষ্টাও এতদিন পায়নি।

মুক্তি পাওয়া গেল অ্যাদ্দিনে।

কিন্তু প্রকৃত মুক্তি পেতে হলে, মানে, বাঁদর-বাচ্ছা থেকে ফের মানুষ হতে গেলে তন্ত্রমন্ত্র জানা এক ভৈরবীকে দরকার। বন্ধুদত্তার পাপিষ্ঠা বান্ধবী যে মন্ত্রটা শিখিয়ে দিয়ে গেছিল বন্ধুদত্তাকে, সেই মন্ত্রটা উচ্চারণ করে গলার এই সুতোটা খুলে নিলেই বাঁদর সোমস্বামী ফের হবে মানুষ সোমস্বামী।

বাঁদর মহাশয়ের আশ্চর্য বৃত্তান্ত শুনে তাক লেগে গেছিল নিশ্চয়দত্তের। অদ্ভুত ব্যাপার! বাইরে সতীসাধ্বী, আড়ালে বারবণিতার অধম! পরপুরুষকে মন্ত্র পড়িয়ে নিকৃষ্ট জীব বানিয়ে রেখেছে নিছক শরীরী চাহিদা মিটানোর জন্যে!

নিজের কাহিনির সঙ্গে বানরূপী সোমস্বামীর কাহিনির সাদৃশ্য বুঝে রয়েছে আত্মকাহিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছিল নিশ্চয়দত্ত।

সে-ও তো নিদারুণ ভোগান্তির মধ্যে দিয়ে চলেছে কেবলমাত্র এক রমণীর দেহসুখ আস্বাদনের জন্যে, অবশ্যই সেই কামিনীর আত্যন্তিক পীড়াপীড়িতে।

সব শুনে বলেছিল বানররূপী সোমস্বামী, বাঃ!

আমাদের দুজনের অবস্থাই তো দেখছি একই রকম। দুজনকেই এক-একটা মেয়েছেলে নাচিয়ে কাঁদিয়ে মারছে। একই পথের পথিক যখন, তখন আজ থেকে বন্ধুত্বের বন্ধন ঘটুক দুজনের মধ্যে। শুনুন কিছু নীতিকথা।

রূপ আর রমণী, অস্থির হয় নিরবধি। কখনোই এক রকম থাকে না, পালটে যায়। রূপ কখনো চিরকাল এক রকম থাকে না, জেল্লা তার যাবেই। রমণীও কক্ষনো সতীত্ব ধরে রাখতে পারে না, বহু পুরুষের সঙ্গে উপগত হবেহ, শুধু সুযোগের অপেক্ষা। মুহূর্তে মুহূর্তে এরা পালটে পালটে যায়, এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় চলে যায়। এই এদের ধর্ম, এদের প্রকৃতি, এদের স্বাভাবিক গতি। বিদ্যুৎ যেমন আঁকাবাঁকা, সর্পিনী যেমন বিশ্বাসঘাতক, চুমো দিলেও ছোবল মারবে, স্রোতস্বিনী যেমন যাকে পায় তাকে গিলে নিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, দিনান্ত যেমন ক্ষণিক আনন্দ বিতরণ করেই নিশার আতঙ্কে পর্যবসিত হয়, রমণীরত্নকেও তেমনি বিশ্বাস করা যায় না। পারার মতো এরা পিচ্ছিল, দামিনীর মতো সর্পিল, অগ্নির মতো মুঠোর বাইরে, কিন্তু দাহিকা শক্তিময়ী।

বন্ধু হে, তাই বলি, মেয়েছেলে দেখে গলে যাবেন না। যে বিদ্যাধরীর মোহে পথে নেমেছেন, কে জানে তার মোহ কেটে গেছে কীনা? আপনাকে উন্মাদপ্রায় করে দিয়ে সে হয়তো এখন বহু বিদ্যাধরের সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলে চলেছে। স্বভাবে যারা সাপ, তাদেরকে বিশ্বাস করা তো মূর্খতা।

সুতরাং, হে প্রিয় বন্ধু, যক্ষিণী এলেই তার কাঁধে চেপে উজ্জয়িনীতে ফিরে যান। আমার এই অবস্থা দেখে আপনার আক্কেল হোক।

কিন্তু চোর না শুনে ধর্মের কাহিনি। বিদ্যাধর-কন্যার সেই কোমল করস্পর্শ, সেই কাম-কটাক্ষ যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে নিশ্চয়দত্তের শরীরে আর মনে, তার নিবৃত্তি ঘটাতে পারে শুধু সেই বিদ্যুৎবতীই যার

কটি ক্ষীণ, পয়োধর বিপুল, নিতম্ব হিল্লোলিত ঊরুসন্ধি রেখা আভাষিত। তার শরীরের সুখ-সাগরেই ডুব দিতে চায় নিশ্চয়দত্ত, যেভাবেই হোক!

সুতরাং সূর্য পাটে বসতেই আর যক্ষিণীর আবির্ভাব ঘটতেই নিশ্চয়দত্ত তার ঘাড়ে চেপে সাঁ-সাঁ করে পৌঁছে গেছিল হিমাচলের পুষ্করাবতী শহরে। দূর থেকে তাকে দেখেই দৌড়ে এসেছিল অনুরাগপরা। আবেগময় মিলন মুহূর্তে বিদায় নিয়ে সরে পড়েছিল যক্ষিণী।

তারপর কী ঘটল?

মায়ার খেলা দেখিয়ে দিল অনুরাগপরা। নিশ্চয়দত্তকে নিয়ে গেল একটা নির্জন বাগানে। মুহূর্তের মধ্যে বানিয়ে নিল একটা গোপন আলয়। নিশ্চয়দত্তকে উপভোগ করা শুরু হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। চলল রাতের পর রাত। দিনের বেলা থাকত বাপের কাছে। কাকপক্ষীও জানতে পারল না তার অভিসার বৃত্তান্ত।

এত ভোগের মধ্যে থেকেও নিশ্চয়দত্ত কিন্তু বাঁদর বন্ধুর কথা ভুলতে পারেনি। অনুরাগপরাকে একদিন অনুরোধও করেছিল, সোমস্বামীর বানরত্ব ঘুচিয়ে দেওয়া হোক।

বলেছিল অনুরাগপরা, ওই বিদ্যেটি আমার জানা নেই, যদিও আমি বিদ্যাধরী। জানে যোগসিদ্ধা কোনও ভৈরবী। কাছেই থাকেন ভদ্ররূপা। তন্ত্রমন্ত্রে যথেষ্ট দখল আছে।

আমার সঙ্গে খুব ভাব। চলো, আগে দেখি তোমার বন্ধুকে বলেই, নিশ্চয়দত্তকে কোলে নিয়ে আকাশ পথে উড়ে গিয়ে সোমস্বামীর সামনে হাজির হয়েছিল অনুরাগপরা।

সব কথা শুনে ফের আকাশে উড়েই ফিরে এসেছিল গুপ্ত অভিসার-আলয়ে।

বন্ধুপ্রিয় নিশ্চয়দত্ত এরপর থেকে রোজই অনুরোধ করে গেছে অনুরাগপরাকে, আর একদিন যাওয়া যাক বেচারা বানর-বন্ধুর কাছে।

কিন্তু আর গরজ দেখায়নি বিদ্যাধরী। সে যা পাবার পেয়ে গেছে, আর একজনের পরকীয়ার পথ প্রশস্ত করার আগ্রহ আর নেই।

নিশ্চয়দত্তও তাকে ছাড়বার পাত্র নয়। অতিশয় বন্ধু বৎসল সে। শেষকালে একদিন তাকে আকাশে ওড়ার বিদ্যে শিখিয়ে দিয়েছিল অনুরাগপরা।

আর যায় কোথায়! নিয়মিত আকাশ বিহার শুরু করে দিয়েছিল নিশ্চয়দত্ত। নারী সংসর্গ এক জিনিস, আর বন্ধুর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা আর এক জিনিস।

যদিও বন্ধুটি আকৃতিতে বাঁদর! মানুষ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে মনটা তো হালকা হত,

গুপ্তগৃহে ফিরে এসে প্রতিদিনই যোগিনী ভদ্ররূপার কাছে যাওয়ার কথা বলত নিশ্চয়দত্ত, কিন্তু সে সময় কোথায় অনুরাগপরার? রাত্রিনিশীথে আসে পরপুরুষ সংসর্গে লালসা মিটোতে, সোমস্বামীর বানরত্ব ঘুচানোর জন্যে সময় ব্যয় করতে যাবে কেন?

এইভাবেই গেল দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।

আর এই সময়ে ঘটে গেল একটা ঘটনা। ফলে, অবসান ঘটল মানুষ নিশ্চয়দত্তের সঙ্গে বিদ্যাধরী অনুরাগপরার অবৈধ্য সম্পর্কের।

একদিন দিনের বেলা প্রমোদবিলাসিনী অনুরাগপরা বিকশিত যৌবনের রূপের ছটা দেখিয়ে যখন ঢুকছে নগরের উপকণ্ঠের একটা বিলাস উদ্যানে, আকাশ থেকে তাকে দেখে নিদারুণ কামে আচ্ছন্ন হয়ে গেল এক বিদ্যাধর যুবক।

প্রথম রিপু যখন লেলিহ হয়, তখন তার নিয়ন্ত্রণ প্রকৃতই অসম্ভব।

এই ব্যাপারে মানুষ আর বিদ্যাধরের মধ্যে কোনও তফাত নেই। রমণেই সাময়িক শান্তি, উদগ্র বাসনা পরক্ষণেই।

আকাশমার্গী বিদ্যাধর যুবাপুরুষের অবস্থা হল ঠিক তাই। অনুরাগপরাকে চাই, এখুনি।

নেমে এল আকাশ থেকে। দাঁড়াল লীলাময়ী বিদ্যাধরীর সামনে।

সম্ভোগতৃষিত সেই যুবকের যৌনতা মাখানো আকৃতি দেখে টলে গেছিল অনুরাগপরা। শুধিয়েছিল স্খলিত স্বরে, কে আপনি? পথ আটকেছেন কেন?

যুবক জবাবটা দিয়েছিল এইভাবে, যথার্থ কামিনীকে দেখেছি বলে। সেই সঙ্গে জেনেছি আর একটা তথ্য।

শিহররিত স্বরে অনুরাগপরা প্রশ্ন করেছিল, কী জেনেছেন? কীভাবে জেনেছেন?

আপনি একটা মানুষকে দিয়ে যৌনপিপাসা মেটান। কীভাবে জেনেছি? হে অপরূপা, আমি যে বিদ্যাধর। আপনার কলঙ্ক কাহিনি জানবার বিদ্যে যে আমার আছে।

কটাক্ষ হেনে বলেছিল অনুরাগপরা, আপনি কি চান বলুন তো?

আপনাকে। পছন্দ নয় আমাকে?

পছন্দ হয়েছিল বইকি। কটাক্ষ বর্ষণ তো সেই কারণেই। প্রথম রিপুর আরাধনাই যার কাছে একমাত্র প্রয়াস, সে তো দেখেই মজেছে। নিশ্চয়দত্ত অতি নিকৃষ্ট এই বিদ্যাধর যুবকের তুলনায়।

মদনশরে ঘায়েল অনুরাগপরা তখন বলেছিল, খুব পছন্দ।

তাহলে বিয়ে করুন আমাকে, ওই মানুষটাকে ছাড়ুন।

নিশ্চয়, নিশ্চয়।

রতিরসে সিক্ত অনুরাগপরা কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ শৃঙ্গার পর্ব সেরে নিয়েছিল মদনাগুণে তপ্ত বিদ্যাধর যুবকের সঙ্গে। রাগমোচনের পর ফিরে গেছিল বটে গুপ্তগৃহে, কিন্তু মাথাধরার ভান করে শুয়েছিল শয্যায়, রোজকার অভ্যেস মতো নিশ্চয়দত্তের শরীরে শরীর মিলিয়ে আলিঙ্গন পর্যন্ত করেনি।

সরল মানুষ নিশ্চয়দত্ত ভেবেছিল, সত্যিই বুঝি যন্ত্রণা হচ্ছে অনুরাগপরার মাথার মধ্যে। এমতাবস্থায় শরীর নিয়ে খেলা করা অনুচিত। কিন্তু রতিরঙ্গে রাত্রিযাপন তার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে, রসবতীকে পাশে নিয়ে তার চোখে কি নিদ্রা আসে? ছটফটিয়ে কেটেছিল সমস্ত রাত। বুঝতেও পারল না মনুষ্য সংসর্গ মোহ কেটে গেছে বিদ্যাধরী অনুরাগপরার। এখন তার মুখবদল দরকার। অর্থাৎ, পুরুষ বদল। এক পুরুষ একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে না?

ভোর হল। নতুন পুরুষ সংসর্গ অভিলাষে প্রস্থান করল অনুরাগপরা। এই একটি বিষয়ে তার পিপাসা কখনও মেটে না। একে নারী, অল্প আয়াসেই বিপুল আনন্দ পায়, তার ওপর অত্যধিক যৌনলালসা। সুতরাং.....

নিশ্চয়দত্ত মুছে গেল মন থেকে,....নিমেষ মধ্যে!

নিশ্চয়দত্ত কিন্তু পাগলের মতো তৎক্ষণাৎ হাজির হয়েছিল বাঁদর-বন্ধু সোমস্বামীর কাছে। বিবৃত করেছিল রজনী-কাহিনি। অনুরাগপরা আদর করে তার অঙ্গপর্যন্ত স্পর্শ করেনি।

মুচকি হেসে বলেছিল পরমজ্ঞানী মর্কট মহাশয়, তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম, নারীর মন এইরকমই পিচ্ছিল, এক পুরুষ সেখানে বেশিদিন আটকে থাকে না।

সচমকে বলেছিল নিশ্চয়দত্ত, কথাটার অর্থ?

অতিশয় সরল। এই মুহূর্তে উপস্থিত হও অনুরাগপরা সন্নিধানে, যে অবস্থায় তাকে দেখবে, সেই অবস্থাতেই আকাশপথে উড়িয়ে নিয়ে এসে রাখ আমার সামনে।

অদ্ভুত নির্দেশ। কিন্তু মর্কট মহাশয় অলোকদৃষ্টি দিয়ে সুদূর প্রত্যক্ষ করতে পারছে মনে হয়েছিল নিশ্চয়দত্তের।

তাই আর কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ উড়ে গেছিল অনুরাগপরা যেখানে পরম সুখে নিদ্রিত, সেই পালঙ্কের পাশে।

সে আসার আগেই যা ঘটে গেছিল, যা জ্ঞানচক্ষু দিয়ে দূরে থেকেও মর্কট-দোসর দেখে নিয়েছিল, তা এই :

নিশ্চয়দত্তের কাছ থেকে অনুরাগপরা সটান চলে গেছিল কামতপ্ত সেই বিদ্যাধর যুবকের কাছে। তার লৌহ মুদগরের মতো শরীর দিয়ে নিষ্পেষিত করেছিল নিজেকে। পিষ্ট, দলিত, মর্দিত রতিরঙ্গ অবসানে অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আগে তিরস্করণী বিদ্যা প্রয়োগ করে নাগরকে লুকিয়ে রেখেছিল নিজের কোলে। এ বিদ্যা প্রয়োগে অদৃশ্য বর্ম দিয়ে কাউকে ঢেকে রাখলে তাকে কেউ দেখতে পায় না।

দুজনেই যখন রতিক্লান্ত এবং ঘুমন্ত, নিশ্চয়দত্ত উপস্থিত হয়েছিল তখন, বন্ধু-বাঁদরের নির্দেশ মতো অনুরাগপরাকে কোলে তুলে নিয়ে চলে এসেছিল তার সামনে।

অত্যধিক সঙ্গমের ফলে তখনও ঘুমিয়ে অসাড় বিদ্যাধরীর কোলে লুকোন বিদ্যাধর নাগরটিও ঘুমিয়েছিল। জ্ঞানচক্ষু দিয়ে বাঁদর-বন্ধু তা দেখে নিয়ে দিব্যচক্ষু প্রদান করেছিল নিশ্চয়দত্তকে।

ফলে, এতক্ষণ যা অদৃশ্য ছিল নিশ্চয়দত্তের কাছে, এখন তা দৃশ্যমান হয়েছিল অতিশয় সুস্পষ্টভাবে।

নিদ্রিতা অনুরাগপরার কোলে অসংযত অবস্থায় নিদ্রামগ্ন রয়েছে এক সুন্দরকায় বিদ্যাধর যুবক, যেন ঘুমন্ত অবস্থাতেও বিচ্ছিন্ন হতে চায় না কেউই।

নিশ্চয়দত্ত যখন এতাদৃশ দৃশ্য অবলোকন করে বিস্ময় বিমূঢ়, সেই সময়ে নিদ্রা পলায়ন করেছিল অসংবৃত দুই প্রেমিক-প্রেমিকার চক্ষু থেকে। ঝটিতি চম্পট দিয়েছিল বিদ্যাধর যুবক। অনুরাগপরা আস্বাদন যে এবংবিধ অবষ্ঠিধ কালঘুম চোখে নামায় তা তার জানা ছিল না। সুতরাং নরলোকের এই জীবটির প্রহার শুরু হওয়ার আগেই পলায়ন করা কর্তব্য।

প্রচণ্ড কুপিত নিশ্চয়দত্ত তখন যৎপরোনাস্তি ধমক দিয়ে গেছিল অনুরাগপরাকে। কুলটা, অসতী, ব্যাভিচারিণী; বেশ্যা ইত্যাদি বাছা বাছা গালি বর্ষণসহ বুঝিয়ে দিয়েছিল, এই ঘটনা নিশ্চয়দত্তের চোখ খুলে দিয়েছে। মেয়েদের মন যে সদাচঞ্চল, তাদের ছলনা যে মনুষ্যবুদ্ধি দিয়ে পরিমাপ করা যায় না, মুঠোর মধ্যে রাখলেও তারা গলে বেরিয়ে যায়, নিরন্তর সঙ্গম পিপাসায় তারা সম্পূর্ণ নীতিহীন, বিবেকহীন আর পাপাসক্ত, তা চোখা চোখা শব্দবানে বুঝিয়ে দিয়েছিল। সবশেষে ধন্যবাদ দিয়েছিল অনুরাগপরাকে এহেন স্ফটিক স্বচ্ছ নারীজ্ঞান দান করে যাওয়ার জন্যে।

সহস্র বল্লমের মতো সেই গালাগালির খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত অনুরাগপরা চোখের জলে বুক ভিজিয়ে সরে পড়েছিল তৎক্ষণাৎ।

হেসে বলেছিল বাঁদররূপী সোমস্বামী, সতর্ক করেছিলাম নারীজাতি সম্পর্কে, গ্রাহ্য করেনি। মোহ যখন মুদগর হয়, আক্কেলটা তখনই হয়। মেয়েছেলে আর টাকাপয়সা কখনও এক জায়গায় স্থির থাকে না, এদের চরিত্রই হল জায়গা বদল করা। বিশ্বাস করলেই মরবে। যাকগে, সবই বিধির বিড়ম্বনা বলে মেনে নাও।

সেই থেকে বানর-বন্ধুর সঙ্গে দিন কাটিয়ে গেছিল নিশ্চয়দত্ত। বীতরাগ হয়েছিল স্ত্রীলোক আর সম্পদের ওপর। বনবাস আর বানর সঙ্গ অনেক হিতকর।

এই সময়ে এক যোগিনীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছিল নিশ্চয়দত্তের, সেই জঙ্গলেই। তিনি সব শুনলেন। নিশ্চয়দত্তের মিনতি রাখলেন। বাঁদররূপী সোমস্বামীর গলা থেকে সুতোর বাঁধন খুলে নিলেন মন্ত্রপাঠ করে।

মনুষ্যদেহ ফিরে পেল সোমস্বামী।

পরক্ষণেই বিদ্যুতের মতো উধাও হয়ে গেলেন যোগিনী।

দুই বন্ধু সেই অরণ্যেই থেকে গেল। সাধনভজনের পর নরদেহ ত্যাগ করে গেল স্বর্গলোকে।

পারার মতো সদাচঞ্চল নারী চরিত্র কাহিনি শুনে সতর্ক হলেন যুবরাজ নরবাহনদত্ত।

৩৮. বিক্রমাদিত্যের কাহিনি

বৎসরাজ উদয়ন পুত্র নরবাহনদত্তকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার সময়ে বন্ধুবর্গকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে থেকেই যুবরাজের মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেছিলেন যৌগন্ধনারায়ণের ছেলে মরুভূমিকে, সেনাপতিপদে রুমন্বানের ছেলে হরিশিখকে, পৌরোহিত্য পদে ছিল বৈশ্বানর আর শান্তিসোম। প্রধান বয়স্য হয়েছিল গোমুখ।

গোমুখ-এর গল্প শেষ হতেই মুখ চুলবুল করে উঠেছিল মরুভূতির। গোমুখ শুনিয়েছিল স্ত্রীলোকের চরিত্রে স্থিরতা নেই, মরুভূতি গল্প শুরু করেছিল ঠিক উলটো প্রসঙ্গে, সব মেয়েরা চঞ্চল প্রকৃতির হয় না।

সে তো বলেই বসল, সব নারীর চরিত্র পারার মতো চঞ্চল, আমি তা মনে করি না। যে পাহাড়ের গুহায় মানুষ ঢুকতে পারে না, প্রাণান্ত হয়, সেই গুহার মধ্যে জমে থাকা ধুলোর মধ্যে দামি দামি হিরে মাণিক পাওয়া যায়। আবার সাগরের তলাতেও বিশ্রীগন্ধে ভরা শুক্তির মধ্যে এমন সুন্দর মুক্তো জন্ম নেয় যা গলায় পরলে রূপ খুলে যায়। সুতরাং সব মেয়েই খারাপ, এমন কথা বলতে পারি না।

খারাপ বলে যারা সমাজে পরিচিত, তাদের মধ্যেও এমন ভালো মেয়ে থাকে যারা সতীসাধ্বীদের লজ্জা দিতে পারে।

এক বারবনিতার কাহিনি আপনাদের শোনাচ্ছি। ত্রিগুণের শ্রেষ্ঠ সত্ত্বগুণ যার মধ্যে অতিশয় প্রবল। এ রকম শুদ্ধসত্ত্ব পরম পতিব্রতাদের মধ্যেও বিরল। বেশ্যা হয়েও সে যে পবিত্র অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়েছিল তা বিয়ে করা বউদের মধ্যেও বিরল।

বিলক্ষণ উৎসুক হয়েছিল নরবাহনদত্ত, গল্পটা তাহলে শোনা যাক।

শুরু করেছিল মরুভূতি।

বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করতেন পাটলিপুত্রে সেকালে, বড়ো দুর্ধর্ষ রাজা ছিলেন। বীরত্বে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

রাজায় রাজায় বন্ধুত্ব যেমনি থাকে, তেমনি শত্রুতাও থাকে। বিক্রমাদিত্যের পরম সুহৃদ ছিলেন হয়পতি আর গজপতি।

হয় মানে ঘোড়া, গজ মানে হাতি। দুই রাজার নামডাক ছিল এই দুই ব্যাপারে। একজন ঘোড়ার বাহিনী রেখে শ্রেষ্ঠ, আর একজন হাতির বাহিনী রেখে শ্রেষ্ঠ।

বিক্রমাদিত্যের বিষম শত্রু ছিলেন কিন্তু রাজা নরসিংহ। তাঁর ছিল মানুষ সৈন্যের শক্তি। তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠান নগরের নৃপতি।

তা জেনেও একদিন বিক্রমাদিত্য বেরোলেন নরসিংহকে কবজায় আনতে। সঙ্গে নিলেন হাতি আর ঘোড়ার শক্তিতে শক্তিমান হয়পতি আর গজপতিকে।

নরসিংহের নগর অবরোধ করা মাত্র প্রতি-আঘাত হানলেন নরসিংহ, পালে পালে সৈন্য লেলিয়ে দিলেন।

রথ, ঘোড়া, হাতি, মানুষ, এই চতুরঙ্গ বাহিনীর মরণপণ লড়াইয়ে কেঁপে গেল মাটি। ধুলোয় ছেয়ে গেল আকাশ। লড়াইয়ের বাজনা, মানুষ, আর পশুর হুংকার, রথের চাকার ঘড়ঘড়ানিতে যেন প্রলয় উপস্থিত হল। গাছ থেকে উড়ে গেল পাখি, বন থেকে পালাল জানোয়ার, মায়ের দুধ খেতে খেতে ভয়ে কেঁদে উঠল বাচ্ছারা।

জিতল কিন্তু নরসিংহ।

তখন রণকৌশল পালটালেন বিক্রমাদিত্য। সম্মুখযুদ্ধে রণসিংহকে ঘায়েল করা যাবে না বুঝে অন্তর্ঘাত-এর মতলব আঁটলেন। চতুরঙ্গ দিয়ে যা হয়নি, এবার পঞ্চম বাহিনী দিয়ে তা হোক।

চাকরির খোঁজে, সেইভাবে সাজগোজ করে, ঢুকলেন নরসিংহ নগরে। একা নয়। সঙ্গে রইল প্রধান মন্ত্রী বুদ্ধিবর অর্থাৎ বুদ্ধিতে যিনি চৌকস, রাজার একশো ছেলে আর পাঁচশো বীরপুঙ্গব।

ঢুকলেন চাকরির খোঁজে দীনহীন বেশে, গেলেন কিন্তু এক বারবনিতার বাড়ি।

তার নাম মদনমালা। শ্রেষ্ঠ নগরবধূ। বাড়িটা কিন্তু বেশ্যাবাড়ির মতো নয়। চাকরবাকর, হাতি-ঘোড়ায় অষ্টপ্রহর গমগমে বাড়ি। বাড়ি তো নয়, যেন রাজবাড়ি।

দলবল নিয়ে এই বাড়িতেই উঠলেন বিক্রমাদিত্য। অতিথি সমাদরে কোনও ত্রুটি রাখল না। মদনমালা।

দিনের শেষে শয্যাসুখ দিল বিক্রমাদিত্যকে। সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত বিরামহীন বেশ্যা সম্ভোগে যেন স্বর্গসুখ পেলেন বিক্রমাদিত্য। তিনি জানেন রণকৌশল, মদনমালা জানে রমণকৌশল। ফলে, তছনছ হয়ে গেল বিশাল পালঙ্ক।

রাজা কিন্তু আত্মপরিচয় গোপনে রাখলেন। রমণে অক্লান্ত এমন মহাবীরকে পেয়ে মদনমালাও তাকে ছাড়তে চাইল না। বারাঙ্গনা বুদ্ধি প্রয়োগ করে পাঁচশো অতিথিকে লুকিয়ে রাখল নিজের বাড়ির মধ্যে, অবশ্যই প্রমোদে মাতিয়ে রেখে, মানে, পাঁচশোটা মেয়ে লেপটে রইল পাঁচশো পুরুষের সঙ্গে। সুতরাং বাইরের লোক জানল, পাইকারি হারে কারবার চালাচ্ছে নগরবধূ। কেউ আর মাথা ঘামাল না।

মদনমালা যেন জাদু করে ফেলল বিক্রমাদিত্যকে। মন্ত্রীকে ডেকে একদিন বললেন রাজা, এতো বড়ো রঙ্গ! আমি এসেছি দেশ দখল করতে, আর এই বেশ্যাটা আমাকে দখল করে ফেলেছে। এত যত্ন তো বাড়ির মেয়েরাও করে না। খরচও করে যাচ্ছে এন্তার, অথচ খরচ করার কথার কথা আমার। দামি দামি পোশাক, সোনাদানা, মণিমুক্তো দিয়ে যাচ্ছে অথচ সেসব দেওয়ার কথা আমার। বেশ্যা তো দেখছি খদ্দেরকে মাথায় তুলে রেখেছে। আমি যেন তার মুকুটমণি।

ধড়িবাজ মন্ত্রী বললে, প্রপঞ্চবুদ্ধি নামে এক ভিখিরি তো আপনাকে ধনরত্ন দিয়ে গেছে। তা থেকে খানিকটা মদনমালাকে দিন। খাঁটি জহর কদর পাবে খাঁটি বেশ্যার কাছে।

রাজা বললেন, ওহে বুদ্ধিবর, তোমার বুদ্ধি এক্ষেত্রে খাটবে বলে মনে হয় না। জহরের জেল্লা দিয়ে এই মেয়ের জাদু কাটানো যাবে না। আমি মরেছি।

মন্ত্রী বললে, ভিখিরি আপনাকে অত অমূল্য জহর দিতে গেল কেন?

শুনতে কৌতূহল হচ্ছে?

হ্যাঁ।

তবে শোনো।

ভিখিরিটা প্রতিদিন আসত আমার কাছে একটা কাঠের কৌটো দিতে। ডালা আঁটা কৌটো, সামান্য একটা কৌটোর ডালা খুলেও কোনোদিন দেখতাম না কী আছে ভেতরে। খাজাঞ্চিকে ডাকতাম। কী রক্ষক কর্মচারীর কাজ তাকে করতে দিতাম। এত যত্ন করে যখন কাষ্ঠবাক্স দিয়ে যাচ্ছে সামান্য একটা ভিকিরি, তখন তা কাজাঞ্চিখানায় থাকুক।

একটা বছর গেল এইভাবে। রোজ একটা করে কাষ্ঠবাক্স জমা হতে লাগল কোষাগারে।

এরপর একদিন ঘটল একটা অতি অদ্ভুত ঘটনা। ভিখিরি এসে প্রতিদিনের মতো কাঠের কৌটো আমার হাতে দিয়েছিল।

আমি ছিলাম অন্যমনস্ক। হাত খসে কৌটো পড়ে গেছিল মেঝেতে। ভেঙে গেছিল তৎক্ষণাৎ, ডানা খুলে ঠিকরে যেতেই ভেতর থেকে গড়িয়ে গেছিল একটা অত্যন্ত দামি রত্ন!

আমি তো অবাক, যেসব বাক্সকে এতদিন হেলাভরে কোষাগারে পাঠিয়ে দিয়েছি, সেগুলোর মধ্যে তাহলে কী আছে?

আনালাম বাক্সগুলো। প্রত্যেকটার ডালা খোলা হল আমার সামনে। প্রতিটার ভেতর থেকে বেরোল একটা করে রীতিমত মূল্যবান রত্ন! রত্নের স্তূপ জমে গেল আমার সামনে।

পরের দিন যথাসময়ে এল দীনহীন সেই ভিখিরি। চেপে ধরলাম তাকে, রোজ রোজ একটা করে রত্ন ভেট দেওয়ার কারণটা কী?

তখন সে মুখ খুলল। বললে, আপনার সাহায্য পাওয়ার জন্যে।

কী সাহায্য?

সামনের কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী তিথিতে শ্মশানে যাব। সাধনা করব বিশেষ একটা বিদ্যে আয়ত্ত করার জন্যে। অনেক উৎপাত ঘটতে পারে। একজন মহাবীর, আপনার মতো বীরপুরুষ যদি পাশে থাকেন, তাহলে আমার কার্য সিদ্ধি হবে।

খোলামনে কথা বলেছিল ভিখিরি। কোনোরকম তঞ্চকতা নেই। রাজসাহায্য ভিক্ষা করছে এক প্রজা। আমি খুশিমনে সম্মত হয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন স্বয়ং বিষ্ণু।

ভিক্ষুকের প্রার্থনার মধ্যে ছিল ভয়ংকর শঠতা।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে শ্মশানে যাওয়ার সময়ে অকস্মাৎ কালধুম নেমেছিল চোখে। স্বপ্নে দেখা দিলেন ভগবান বিষ্ণু।

বললেন, এই ভিখিরির নাম প্রপঞ্চবুদ্ধি। তোমাকে এত রত্ন সে দিয়েছে নিজে একটা রত্নের অধীশ্বর হবে বলে। সে রত্নের নাম মণ্ডলেশ্ব। অলৌকিক ক্ষমতা এসে যাবে হাতে। চল্লিশ যোজন বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি হয়ে বসবে। রাজ চক্রবর্তী প্রপঞ্চবুদ্ধি তোমাকে নাস করেই এই কাণ্ড করবে। তুমি কখনোই তার কথামতো হুট করে কিছু করতে যাবে না। বলবে, এমনটা তো আগে কখনও করিনি। তুমি দেখিয়ে দাও, আমি করছি। সে যখন তোমাকে দেখাতে যাবে, তখন তোমার কৃপাণ দিয়ে তার মাথাটা ধড় থেকে বাদ দিয়ে দেবে। সিদ্ধিলাভ ঘটবে তোমারই।

গেলাম শ্মশানে। স্বয়ং বিষ্ণু আমার সহায়, আর ভয় কাকে? শঠশিরোমণি প্রপঞ্চবুদ্ধি আমাকে বললে, চোখ বুঁজে হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ুন, আমাদের দুজনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

কথাটা খুব সাদাসিধে ভাবে বললেও মনে মনে আমি তৈরি ছিলাম। জবাবটা মুখে ছিল। বললাম, কীভাবে ওভাবে শুতে হবে দেখিয়ে দাও, আমি যে রাজা ....চোখ বুঁজে হাত-পা ছড়িয়ে কখনও মাটিতে শুইনি।

প্রপঞ্চবুদ্ধি, যার নামের অর্থ বঞ্চনার বুদ্ধিতে অদ্বিতীয়, আমার বঞ্চনা কিন্তু ধরতে পারেনি।

সত্যিই তো, রাজা মানুষ, মাটিতে কখনও ওরকমভাবে তো শোয়নি।

তাই দ্বিরুক্তি না করে তৎক্ষণাৎ দেখিয়ে দিয়েছিল, কীভাবে দুচোখ বুঁজে হাত-পা এলিয়ে শুতে হবে মাটিতে।

নিমেষ মধ্যে খাপ থেকে তলোয়ার টেনে নিয়ে এক কোপে মুণ্ডটাকে কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম ধড় থেকে।

দৈববাণী শোনা গেছিল তৎক্ষণাৎ।

আমি কুবের বলছি। খুশি হয়েছি তোমার উপস্থিত বুদ্ধি দেখে। তোমার মনের মতো বর দিতে আসছি তোমার সামনে।

পরমুহূর্তেই দেখেছিলাম পুষ্পক রথ থেকে নামছেন যক্ষপতি। ধনাধিপতি যক্ষরাজ। যাঁর আর এক নাম একপিঙ্গল, এক চক্ষু নষ্ট, অপর চক্ষু পিঙ্গল বলে। অতিশয় কুৎসিত। তিনটে পা আর আটটা দাঁত। সমস্ত ধনের প্রদাতা আর অধ্যক্ষ কুবের দাঁড়িয়ে তাঁর সামনে। চোখে বরাভয় দৃষ্টি।

বললেন, দুরাত্মা প্রপঞ্চবুদ্ধি তোমাকে বিনাস করে যা পেতে চেয়েছিল, তুমি তাকে বিনাস করে তা পেয়ে গেলে। এখন বলো আর কী চাই।

আমি বললাম, এখন চাইব না। যখন দরকার হবে, তখন যেন মনে মনে আপনাকে ডাকলেই আপনার দেখা পাই।

কুবের চলে গেলেন। প্রপঞ্চবুদ্ধিকে বলি দিয়ে তার আকাসে ওড়ার বিদ্যে পেয়ে গেছিলাম আকাশ পথে ফিরে এলাম রাজবাড়ি।

প্রপঞ্চবুদ্ধির বুদ্ধিবিকারের কাহিনি শেষ করে বললেন রাজা বিক্রমাদিত্য, মন্ত্রী বুদ্ধিবর, তুমি প্রকৃতই বুদ্ধিমান। বেশ্যা মদনমালা যখন আমার মন আর শরীর দুটোই হরণ করেছে, তখন তার পাল্টা উপকার করার পন্থা মাথায় এনে দেওয়ার জন্যেই প্রপঞ্চবুদ্ধি ভিক্ষুকের কথা শুনতে চেয়েছিল।

এই বলে, মন্ত্রীকে বিদায় দিয়ে মদনমালার সঙ্গে শয়ন করলেন নৃপতি বিক্রমাদিত্য এবং নিঃসীম আনন্দে নিশার অবসান ঘটালেন।

প্রত্যুষে গেলেন দেবালয়ে, একা। মনে মনে ডাকলেন কুবেরকে। কুবের এলেন সামনে।

বললেন, বর চাও?

রাজা বললেন, এমন পাঁচটা সোনার পুরুষ দিন যাদের শরীর থেকে যত খুশি সোনা নিতে পারব। তাদের সোনার শরীর কিন্তু যেমন তেমনি থাকবে, একটুও সোনা কমে যাবে না।

'তাই হবে', বলে প্রস্থান করলেন কুবের। নিমেষ মধ্যে বিক্রমাদিত্যের সামনে উপস্থিত হয়েছিল পঞ্চকাঞ্চন মানব। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত নিখাদ সুবর্ণে গড়া।

বিক্রমাদিত্য কিন্তু তদ্দণ্ডে আকাশপথে ফিরে এলেন নিজের পাটলিপুত্র নগরে, মন দিলেন রাজ্য শাসনে।

মন কিন্তু ছেয়ে রইল প্রতিষ্ঠান নগরের মধুস্মৃতিতে।

ভোর হতেই মদনমালার বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে দেবালয়ে চলে গেছিলেন বিক্রমাদিত্য। মদনমালাকে বলে গেছিলেন, যাচ্ছেন কোথায়।

কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও যখন ফিরে এলেন না রাজা, তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে মন্দিরে দৌড়েছিল মদনমালা। গিয়ে দেখেছিল, রাজা নেই, কিন্তু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে পাঁচ-পাঁচটা সোনার মানুষ। দৈর্ঘ্যে এবং বিস্তারে বিলক্ষণ বিপুল।

মদনমালা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। নিজে অন্তর্হিত হয়ে পাঁচ-পাঁচখানা বিপুলাকৃতি সোনার মানুষ যিনি রেখে যেতে পারেন, তিনি মানুষ নিশ্চয় নন, অবশ্যই অতিমানুষ। ছদ্মবেশী গন্ধর্ব অথবা বিদ্যাধর বলেই তো মনে হয়।

পাঁচটা সোনার মানুষকে রেখে গেছেন নিশ্চয় মূল্যস্বরূপ, পতিতার কাজ দেহ বিক্রি করা, সুতরাং দাম রেখে গেছেন।

কিন্তু মদনমালা যে রক্তমাংসের সেই মানুষটাকে ভালোবেসে ফেলেছে। দেহজ আর দেহাতীত প্রেম একই আধারে বিরাজ করছে। বেশ্যা হলেও সে নারী। প্রকৃত পুরুষকে দিয়েছে তার সর্বস্ব শুধু নারীত্ব নয়।

সুতরাং এই পুরুষ বিহনে জীবনধারণ অসম্ভব। আত্মহননের প্রচেষ্টা কিন্তু আটকে দিয়েছিল কাছের মানুষরা।

তখন পণ করেছিল মদনমালা, ছ মাসের মধ্যে যদি মনের মানুষটা ফিরে না আসে, তাহলে যথাসর্বস্ব দান করে নিজেকে আহুতি দেবে অগ্নিগর্ভে।

দানধ্যান কিন্তু শুরু হয়ে গেল সেইদিন থেকেই। বারবিলাসিনীর ঐশ্বর্য, বিশেষ করে মদনমালার মতো প্রখ্যাত নগরবধূর সম্পদ নিতান্ত কম নয়। দু-হাতে দান করার ফলে একদিন তাও ফুরিয়ে গেল।

রইল তখন দেবালয়ে খাড়া সেই পাঁচ-পাঁচটা স্বর্ণমানব।

মদনমালা একদিন তাদের একজনের একটা হাত কেটে নিয়ে ব্রাহ্মণকে দান করে দিয়ে পরের দিন মন্দিরে গেছিল আর একটা হাত কাটবার জন্যে।

অবাক হয়ে দেখেছিল, আগের দিনের কাটা হাত রাতারাতি আবার গজিয়েছে!

হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর পাঁচ জনেরই হাতগুলো কেটে নিয়ে দান করে দিয়েছিল ব্রাহ্মণদের।

পরের দিন মন্দিরে ঢুকে দেখেছিল, রাতারাতি ফের হাত গজিয়ে গেছে পাঁচ জনেরই!

পাঁচ জনেই যে অক্ষয় সোনায় নির্মিত, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়ার পর মদনমালা সেইদিন থেকে রোজ সবকটা সোনার হাত কেটে নিয়ে পরমানন্দে বিলিয়ে গেল ব্রাহ্মণদের মধ্যে।

রোজ সোনার হাত বিলি তো কম কথা নয়। দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল আশ্চর্য দান বৃত্তান্ত। একদিন খবরটা এমন এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কানে পৌঁছোল যিনি চার বেদেই সমান পণ্ডিত। তাঁর নাম সংগ্রামদত্ত। থাকেন পাটলিপুত্র নগরে। রাজা বিক্রমাদিত্য থাকেন যে-নগরে। সোনার হাত নিতে তৎক্ষণাৎ মদনমালার কাছে চলে গেছিলেন সংগ্রামদত্ত। অত ভারী হাত তো বয়ে আনা যায় না, হাতির পিঠে চাপিয়ে নিয়ে এসেছিলেন পাটলিপুত্র নগরে। হাত চারখানা নিজের বাড়িতে নামিয়ে রেখে সটান চলে গেছিলেন বিক্রমাদিত্যের কাছে।

বলেছিলেন, বিরহজ্বালা সইতে না পেরে কীভাবে অকাতরে রোজ দান করে যাচ্ছে মদনমালা। কাটা সোনার হাত রোজ ফের গজিয়ে উঠছে ঠিকই, কিন্তু অক্ষয় সোনার মানুষদের নগরবধূ সম্ভোগের দামস্বরূপ রেখে গেছেন যে প্রেমিক পুরুষটি, তাঁকে ছ মাসের মধ্যে ফিরে না পেলে তো অগ্নিপ্রবেশ করবেন মদনমালা। বেশ্যা হয়েও যে মেয়ে এইভাবে ভালোবাসতে পারে, তার কাছে সেই পুরুষের ফিরে যাওয়া উচিত নয় কী?

ইঙ্গিতটা বুঝে সেই রাতেই আকাশপথে উড়ে গিয়ে মদনমালাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন বিক্রমাদিত্য। জীবনে অনেক রমণী সম্ভোগ তিনি করেছেন। কিন্তু বেশ্যা রমণীর প্রেম যে নিকষিত হেম হতে পারে, তা সে-ই প্রথম জানলেন।

মিলন পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি খুলে বললেন, কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন মদনমালার কাছে। ভূচর নরসিংহকে তিনি যুদ্ধে হারাতে পারেন নিজে খেচর হয়ে। কিন্তু সেটা হবে অন্যায় যুদ্ধ, তাই মদনমালার সাহায্য দরকার হয়েছিল। কিন্তু তার নিখাদ প্রেম দেখে তাঁর মন ঘুরে গেছে। বেশ্যাকে বেশ্যার মতো ছলনাময়ীর ভূমিকায় নামাতে চাননি। তাই কুবেরের বরে পাওয়া সোনার মূর্তিদের রেখে দিয়ে চম্পট দিয়েছিলেন।

মদনমালা কটাক্ষ হেনে মধুর বচনে বলেছিল, বলুন না কী করতে হবে।

গভীর গোপন সেই কর্তব্যটি নগরবধূর কানে বর্ষণ করেছিলেন বিক্রমাদিত্য, যেন আর কেউ শুনতে না পায়।

সুচকি হেসেছিল মদনমালা। ছলনা-সম্রাজ্ঞী মদনমালা। দেহ-ব্যবসায়ে অদ্বিতীয়া মদনমালা।

বলেছিল ফিসফিস করে, তাই হবে, মহারাজ, তাই হবে!

কি হবে? দেখা যাক।

প্রথমেই লোকজনদের ডেকে পাঠিয়েছিল মদনমালা। এসেছিল দারোয়ান, শান্ত্রী আর একপাল কয়েদি। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল প্রত্যেককে, সঠিক সময়ে কী করতে হবে।

এত প্রস্তুতির একটা কারণ ছিল। মদনমালা জানতো, রাজা নরসিংহ তার কাছে আসবেন। নগরবধূর কাছে নগর-অধিপতি আসবেন প্রমোদ আহরণের জন্যে, নতুন কিছু নয়। অন্তঃপুর ভর্তি মহিষীদের বিস্বাদ আর একঘেয়ে লাগে, তখনই তো রঙ্গলীলা আর রাত বৈচিত্র্যের জন্যে নগরবধূর দরকার।

কিন্তু এবার রাজা নরসিংহ আসছেন ভিন্ন কারণে। মদনমালার দানের কাহিনি তিনি শুনেছেন। রোজ পাঁচখানা খাঁটি সোনার তৈরি মানুষের হাত বিলিয়ে যাচ্ছে। অথচ ভাণ্ডার ফুরোচ্ছে না, এতো ভাভী তাজ্জব ব্যাপার। তা ছাড়া কাকে যেন মন সমর্পণ করেছে দেহব্যবসায়িনী, সেই পুরুষটাকে না পেলে আগুনে সঁপে দেবে নিজেকে, এ রকম কিম্ভূত প্রতিজ্ঞা তো কোনও দেহপশারিণী করে না।

সুতরাং পূর্ণবৃত্তান্ত জানবার জন্যে আসছেন কৌতূহলী নরপতি নরসিংহ।

তিনি এলেন। কিন্তু বাধা পেলেন তোরণমুখে। বন্দিদের কাজ সম্মানীয় অতিথি-খদ্দের এলে বন্দনা সংগীত গাওয়া। কিন্তু তারা তোরণ পেরোতেই দিল না রাজাকে। মদনমালার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে তামিল করে গেল।

রাজা রেগে টং হয়ে জোর করে তোরণ পেরিয়ে মদনমালার প্রমোদ-মহলে ঢুকতে যেতেই তারস্বরে চেঁচিয়ে গেছিল বন্দির দল, কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! রাজা নরসিংহ যে প্রণাম ঠুকতে ঠুকতে যাচ্ছেন! হে মহাবীর, অন্তঃপুরে আপনি আছেন জেনে রাজা নরসিংহ আপনাকে সংবর্ধনা জানাতে এসেছেন!

অদ্ভুত কথা বলছে তো মদনমালার লোকজন। খটকা লেগেছিল রাজার।

জিজ্ঞেস করেছিল বন্দিদের, কেউ কি আছে মদনমালার সঙ্গে?

সমস্বরে বলেছিল বন্দিরা, আছেন, আছেন, রাজা বিক্রমাদিত্য আছেন।

চমকে উঠেছিলেন নরসিংহ! বিক্রমাদিত্য! পরম শত্রু বিক্রমাদিত্য মদনমালার ভোগ মহলে! কী মতলবে?

অবশ্যই বদ মতলবে। গায়ের জোরে আমাকে খপ্পরে আনতে পারেনি। এখন বারবনিতাকে দিয়ে প্যাঁচ কষে কবজায় আনতে চান।

বললেন গলা চড়িয়ে, ধিক! ধিক! বিক্রমাদিত্য! রণাঙ্গণে পরাজিত হয়ে বেশ্যার কোলে আশ্রয় নিয়েছেন! খতম করবেন কৌশলে। অন্যায় যুদ্ধে তো আপনাকে মানায় না।

বলেই, সবেগে প্রবেশ করলেন মদনমালাক ভোগ মহলে।

দেখলেন, তাঁকে আলিঙ্গন করতে দুহাত বাড়িয়ে সহাস্যে এগিয়ে আসছেন বিক্রমাদিত্য।

এরপর আর তরবারি কোষমুক্ত করা যায় না, আলিঙ্গনের জবাব আলিঙ্গন দিয়েই দিতে হয়।

এবং তাই হল। বন্ধুত্ব স্থাপিত হল দুই বিবদমান নরপতির মধ্যে, এক বেশ্যার মাধ্যমে।

তারপর শুরু হল গল্প। নরসিংহ জানতে চাইলেন, এত সোনার হাত আসছে কোত্থেকে? বিক্রমাদিত্য শুরু করলেন প্রপঞ্চবুদ্ধি ভিখিরির শয়তানি পরিকল্পনা থেকে, শেষ করলেন কুবেরের বরে পাওয়া পাঁচটা সোনার মানুষ দিয়ে। তাদের হাত কেটে কেটেই দান করে যাচ্ছে মদনমালা, বিক্রমাদিত্যকে তার চাই, আর কিছু নয়, নইলে করবে আত্মহত্যা।

মদনমালার এহেন মহৎ প্রেম বিচলিত করে তুলেছিল নরসিংহকে। ত্রিভুবনে এমন প্রেমের নজির তো নেই। কে কবে শুনেছে বারবধূ সব বিলিয়ে দিচ্ছে শুধু একজনের গৃহবধূ হবে বলে?

এবং, তাই হয়েছিল। সব দান করে দিয়ে বিক্রমাদিত্যের বউ হয়ে পাটলিপুত্রে গিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিল মদনমালা, বেশ্যা হলেই নষ্ট হয় না নারী। আর তাই যদি হবে, ঘরের সব বউ নষ্ট নারী হয়ে যেতে পারে, এমন সিদ্ধান্ত ভুল।

শেষ হল মরুভূতির হিত-কাহিনী।

৩৯. বীরবাহুর কাহিনি

যুবরাজ নরবাহনদত্তের প্রধান বয়স্য গোমুখ-এর গল্প শেষ হতেই উলটোসুরের গল্প ধরে ছিল আর এক বয়স্য মরুভূতি। তার গল্প শেষ হতেই অপর বয়স্য হরিশিখ বললে, তাহলে শুনুন আমি একটা গল্প বলি। রাজা বীরবাহুর গল্প। তিনি ছিলেন বর্ধমান শহরের রাজা। খুব ধার্মিক। বউ ছিল একশো। সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন যাকে, তার নাম গুণবরা।

কিন্তু নিঃসন্তান প্রত্যেকেই। এক্কেবারে বন্ধ্যা।

একশোটা বউ রেখেও যখন ছেলে হল না, তখন বৈদ্যমহারাজের শরণাপন্ন হলেন রাজা বীরবাহু। তাঁর নাম শ্রুতবর্ধন।

তিনি এসে বললেন, এমন ওষুধ দেব যে সব রানিরই একটা করে ছেলে হবে। তবে একটা ছাগল দরকার। পোষা ছাগল নয়, বুনো ছাগল।

শুনে তো অবাক রাজামশায়। বন্ধ্যা বউদের মা করবে একটা বুনো ছাগল!

কিছুদিন গেল ছাগল খুঁজতে। একদিন বনের মধ্যে পাওয়া গেল ভীষণ বুনো একটা ছাগল।

শ্রুতবর্ধন সেই ছাগল কাটিয়ে রাঁধুনিকে দিয়ে খাসা মাংস বানালেন। তারপর ডেকে পাঠালেন একশো রানিকে।

এল নিরানব্বই জন। এল না শুধু গুণবরা। সে তখন রাজাকে নিয়ে পুজোয় বসেছিল। ধর্মপরায়ণ স্বামীদেবতাকে পুজো শেষ করতে না দিয়ে মাংস খেতে আসতে চায়নি।

কিন্তু তার প্রতীক্ষায় বসে থাকতে যাবেন কেন শ্রুতবর্ধন? নিরানব্বই জন তো হাজির। নিরানব্বইটা ছেলে হওয়া কি কম কথা? রাজার পুত্রের সাধ তাতেই মিটে যাবে।

অতএব একটা গুঁড়ো ওষুধ মাংসের ঝোলে মিশিয়ে নিরানব্বই রানিকে খাইয়ে দিলেন। গুণবরার জন্যে রইল না কিছু।

আর ঠিক তারপরেই গুণবরাকে নিয়ে হাজির হলেন বীরবাহু। পুজো শেষ করে তবে এসেছেন। গুনবরার পুত্র হোক, এই কামনাও করে এসেছেন।

কিন্তু এসে দেখলেন, নিরানব্বই রানি চেঁটেপুটে অব্যর্থ ওষুধ মেশানো মাংসের ঝোল সাবাড় করে দিয়েছে। গুণবরার জন্যে একটা ফোঁটাও রাখেনি।

বলা বাহুল্য, মেজাজ বিগড়ে গেছিল রাজামশায়ের।

শ্রুতবর্ধন তক্ষুনি আরও মোক্ষম একটা দাওয়াই বানিয়ে দিলেন মরা ছাগলের শিং গুঁড়ো করে। গুঁড়ো শিংয়ের ঝোল রাঁধিয়ে তাতে মিশিয়ে দিলেন বন্ধ্যাত্বমোচনের মোক্ষম চূর্ণ।

গুণবরা তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছিল সেই ছাগলের শিংয়ের ঝোল।

যথাসময়ে একসঙ্গে নিরানব্বইটা পুত্ররত্ন প্রসব করল নিরানব্বই রানি। তার একটু পরেই ছেলে হল গুনবরারও। সুলক্ষণ যুক্ত পুত্র।

উল্লাসে অধীর হয়ে তৎক্ষণাৎ একশো ছেলের নামকরণ করে ফেললেন রাজা। ছোটো ছেলের নাম দিলেন শৃঙ্গভুজ, যেহেতু শিংয়ের ঝোল থেকে তৈরি মহৌষধ খেয়ে তার জন্ম।

ভাগ্যচক্রে একশো ছেলের মধ্যে কালক্রমে সবচেয়ে গুণধর হয়ে উঠল ছোটো ছেলে শৃঙ্গভুজ। রূপে রতিপতি, গায়ের জোরে ভীম, তির ধনুক চালনায় অর্জুন।

পরিণাম? নিরানব্বই বিমাতার ঈর্ষা। শুরু হল ষড়যন্ত্র, শৃঙ্গভুজের খুঁত বের করতে হবে, কৌশলে। একই সঙ্গে সর্বনাশ করতে হবে গুণবরার। রাজার আদর একাই খাবে, তা কি হয়?

সুতরাং একদিন বীরবাহুর কাছে কাঁদতে কাঁদতে যে রানি এল, তার নাম যশোলেখা। বলাবাহুল্য, কান্নাটা মায়াকান্না।

রাজা কিন্তু কান্নার অভিনয় ধরতে পারলেন না। অস্থির হয়ে শুধোলেন, কী ব্যাপার?

যশোলেখা কান্না আরও বাড়িয়ে দিয়ে বললে, ব্যাপার গুরুতর। ব্যাপার সর্বনেশে। মহাকলঙ্কের কাণ্ড ঘটছে আপনার অন্তঃপুরে।

যেন আকাশ থেকে পড়লেন রাজা—আমার অন্তঃপুরে কেলেঙ্কারি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। মাছি গলতে পারে না যে অন্তঃপুরে, সেইখানে।

কীভাবে রানি, কীভাবে?

সর্ষের মধ্যে ভূত আছে বলে।

মানে?

সুরক্ষিতের সঙ্গে প্রেম চলছে গুণবরারর! আমার নিজের চোখে দেখা।

রেগে গেলেন রাজা, অসম্ভব! সুরক্ষিত আমার অন্তঃপুর পাহারা দেয়। সে করবে এই কুকর্ম?

যে রক্ষক, সেই ভক্ষক হয়, রাজা। গুণবরার অত্যধিক কামলালসা মিটাতে গেলে সে ছাড়া আর আছে কে? রোজ রাতে চলছে দেহ মিলন। উফ! আর সহ্য হয় না!

ঝটিতি সিদ্ধান্ত নেবার পাত্র নন বীরবাহু। তৎক্ষণাৎ তিনি বাকি আটানব্বই জন রানিকে ডেকে পাঠালেন। তাদের সাক্ষ্য নিলেন।

চক্রান্ত মতো প্রত্যেকেই বলে গেল একই কথা, গুণবরার অবৈধ প্রেম তারা স্বচক্ষে দেখেছে।

অতএব সাজা দিতেই হবে। কিন্তু রাজা অতি বিচক্ষণ। কৌশল অবলম্বন করলেন। অপরাধ সবিস্তারে বলতে গেলে তো অন্তঃপুরের কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে যাবে। ঢি-ঢি পড়ে যাবে।

সুতরাং রাজসভায় সুরক্ষিতকে ডাকিয়ে এনে চোখ রাঙিয়ে বললেন, শুনলাম তুই খুনি। খুন করেছিস একজন ব্রাহ্মণকে। মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করে আয় তীর্থভ্রমণ করে। কাশ্মীরে যা। অনেক পুণ্যতীর্থ আছে সেখানে। বিজয়ক্ষেত্র, নন্দিক্ষেত্র, বরাহক্ষেত্র, আরও অনেক। পাপক্ষয় করে ফিরবি। যা, বেরো।

রাজার আদেশ মাথায় নিয়ে নির্দোষ সুরক্ষিত চলে গেল তীর্থভ্রমণে।

আসল ব্যাপারটা কেও জানতেও পারল না।

নিরানব্বইজন রাজপুত্র জটলা করছিল নীচে। শ্রমণ তাদেরকেই বললে, বধ করো। বক নয়, ভয়ানক রাক্ষস, খেতে এসেছে তোমাদের।

রাজপুত্র শৃঙ্গভুজ ছিল না সেখানে। তার মন ভালো নয়। একা একা থাকে। নিরানব্বই ভাই তো তাকে খেলতেও ডাকে না।

সেইরাতে কিন্তু তাকেই ডেকে এনেছিল নির্বাসিতভুজ। আগে নিজেরা চেষ্টা করেছিল বাণ মেরে বক খতম করার। কিন্তু ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ এলেও এড়িয়ে গিয়ে ছোঁ মারার সুযোগ খুঁজছিল অগ্নিশিখা।

বদ মতলবটা তখনি এসেছিল নির্বাসিতভুজের মাথায়!

ডাকা যাক শৃঙ্গভুজকে। অবধ্য বক-বধ করতে গিয়ে নিজের সর্বনাশ করুক, আনা হল রাজা বীরবাহুর সোনার তির ধনুক।

শৃঙ্গভুজের তীরন্দাজি ক্ষমতা দেখা গেল তৎক্ষণাৎ। বাবার প্রিয় তির ধনুক হাতে নিয়ে প্রথম তির বর্ষণেই এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছিল মায়াবী রাক্ষসকে।

*বাবার প্রিয় তির ধনুক হাতে নিয়ে প্রথম তির বর্ষণেই এফোঁড় ওফোঁড়
করে দিয়েছিল মায়াবী রাক্ষসকে।*

বেগতিক দেখে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিল অগ্নিশিখা। উড়ে গিয়ে লুকিয়ে রইল বনে।

এইবার পাজি নির্বাসিতভুজ চেপে ধরল শৃঙ্গভুজকে, কী সর্বনাশ! বাবার সোনার তির নিয়ে পালিয়ে গেল যে। যাও, যাও এনে দাও তির! নইলে আমরা এই নিরানব্বই ভাই আত্মহত্যা করব তোমার সামনে।

সরলমতি শৃঙ্গভুজ এবার সঙ্গে নিল নিজের তির ধনুক। ধেয়ে গেল জঙ্গলে, একা, জখম রাক্ষস অন্বেষণে।

হৃষ্টচিত্তে নির্বাসিতভুজ বাড়ি ফিরে কুটিলা জননীকে দিল সুসংবাদি, শৃঙ্গভুজকে আর জ্যান্ত ফিরতে হবে না। গেছে রাক্ষসের ডেরায়, কেরামতি বেরিয়ে যাবে গভীর জঙ্গলে।

শুনে বড়ো খুশি হয়েছিল যশোলেখা। সাতানব্বইজন সতীনও আনন্দে হুল্লোড় জুড়ে দিয়েছিল ছেলেদের কাছে খবরটা পেয়ে।

শিকার করে অভ্যস্ত শৃঙ্গভুজ জানে কীভাবে জখম প্রাণীর পেছন পেছন যেতে হয়, রক্তের রেখা অনুসরণ করে। তিরবিদ্ধ বক-রাক্ষসের গা থেকেও রক্ত ঝরে পড়েছিল মাটিতে। তীক্ষ্ণ নজরে তা দেখতে দেখতে শৃঙ্গভুজ এসে ঢুকেছিল প্রকাণ্ড এক জঙ্গলে। বেশ খানিকটা ভেতরে যাওয়ার পর দেখতে পেয়েছিল বিরাট এক শহর।

এতটা হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বলে বসে পড়েছিল শহরের বাইরে এক গাছতলায়।

আচমকা এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতী নারী এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে। অত রাত্রে! তার রূপ আর লাবণ্য যেন চন্দ্রকিরণ বিকিরণ করে যাচ্ছে নিখুঁত নির্মেদ অবয়ব ঘিরে।

গহন অরণ্যে অকস্মাৎ নূপুর নিক্কণ শুনে আর অপরূপার কটাক্ষ বর্ষণ দেখে বিচলিত হয়েছিল শৃঙ্গভুজ।

প্রশ্ন করেছিল সবিস্ময়ে, কে তুমি?

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল বনবালা, আমার নাম রূপশিখা। আমার বাবার নাম অগ্নিশিখা। রাক্ষস অগ্নিশিখা। এই শহরের অধিপতি তিনি। ধুমপুর এই শহরের নাম।

তুমি রাক্ষসকন্যা কিন্তু এত রূপবতী? এত রাতে জঙ্গলে এসেছ কেন?

বেড়াতে। আপনাকে দেখে মরেছি। আমাকে গ্রহণ করুন।

বলে, ঝলকে ঝলকে কাম-কটাক্ষ বর্ষণ করে গেছিল রূপশিখা। রূপ যেন প্রকৃতই লক্ষশিখা মেলে নৃত্য করছে তার উচ্চাবচ তনু ঘিরে।

বিচলিত হয়ে বলেছিল শৃঙ্গভুজ, তার আগে শোনো আমার পরিচয়, আমি এক রাজপুত্র। বর্ধমানের রাজা বীরবাহুর শতপুত্রের কনিষ্ঠ।

রূপশিখা বললে, এত রাতে এই গহন অরণ্যে এলেন কেন?

শৃঙ্গভুজ বললে, একটা বকের খোঁজে। আমার তীর তার গায়ে বিঁধেছে। সোনার তীর। সেই তির চাই, তাকে প্রাণে মারতে চাই।

রূপশিখা নিজেই তো তখন মদনের তিরে ঘায়েল!

বিলোল চোখে বললে, হে ভদ্র, সেই বক আমারই বাবা।

সচমকে বললে শৃঙ্গভুজ, তোমার বাবা! একটা বক!

তবে যে বললে, তুমি রাক্ষসের মেয়ে।

উনি বকের রূপ ধারণ করে বিশ্ব পর্যটন করেন। ওঁকে প্রাণে মারার ক্ষমতা কারোর নেই। এমন মহাবীরের গায়ে আপনি তির বিঁধিয়েছেন?

এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছি। দেখছ না কত রক্ত ঝরেছে মাটিতে।

তাহলে তো আপনি আমার বাবার চাইতেও বড়ো বীর। বীশ্ববীর। কারণ, বিশ্বের কেউ যা পারেনি, আপনি তা পেরেছেন। হে বীর, লহ মোর প্রণাম।

শৃঙ্গভুজ মোহিনী মায়ায় ভোলবার পাত্র নয়, যদিও এমন এক বিশ্বসুন্দরীকে রাত্রি নিশীথে দেখে বিচলিত হয়েছিল বিলক্ষণ।

তাই বললে সোজাসুজি, কিন্তু আমার যে ওই সোনার তীর ফেরত চাই। তাঁকেও খতম করে যেতে চাই।

দন্তকুমুদ ঝলকিত করে বক্ষশোভার আবরণ খসিয়ে বললে রূপশিখা, হে বীর, আমার বাবা যে অবধ্য। তাঁকে তো প্রাণে মারতে পারবেন না। আপনার মারণ-বাণ তার শরীরে তিলমাত্র ক্লেশ জাগাতে পারেনি। এতটা পথ তিনি অক্লেশে উড়ে এসেছেন, তির টেনে বের করেছেন। বিশল্যকরণী ওষুধ প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।

হতবাক শৃঙ্গভূজ বেশ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত থাকার পর বলেছিল, তুমি তাহলে নিছক বন ভ্রমণে বেরোওনি? এত রাতে? তোমার বাবার গায়ে যে তির মেরেছে, তাকে দেখতে এসেছ?

দুই বিশাল নয়নে বিজলী হেনে মদির স্বরে বললে রূপশিখা, ঠিক ধরেছেন। অসম্ভব এ কাজ যিনি করেছেন তাঁকে দেখতে এসেছি। তাঁকে ভালোবাসতে এসেছি। কারণ তিনি মহাবীর, আমার বাবার চাইতেও বড়ো বীর। হে আর্যপুত্র, আপনাকে এই নামে ডাকলাম আপনার বউ হতে চাই বলে। হে বীর, গ্রহণ করুন আমাকে, আমাকে ভার্যাপদে বরণ করুন। আমার প্রতি অঙ্গে আপনার প্রতি অঙ্গ সংস্থাপন করুন।

কিন্তু তোমার রাক্ষস-পিতা তো চাইবেন না এক মানুষ তাঁর জামাই হোক, বিশেষ করে যে মানুষ তাঁর রক্ত ঝরিয়েছে, বিশল্যকরণীর মতো মহা-ওষুধের দৌলতে তিনি প্রাণ বাঁচিয়েছেন?

মধুর হেসে মধুরতর অঙ্গসঞ্চালন প্রদর্শন করে কামিনীশ্রেষ্ঠা রূপশিখা বললে, আপনি এখানে থাকুন। আমি যাচ্ছি বাবার অনুমতি নিতে, তাঁকে রাজি করিয়ে আপনাকে মেয়েমহলে নিয়ে যাব।

গাছতলায় প্রাণপুরুষকে বসিয়ে রেখে কামবিবশা রূপশিখা নিমেষে উপস্থিত হয়েছিল পিতার সমীপে।

রাজার ছেলে শৃঙ্গভুজের-রূপ-গুণ-সাহসের-ভূয়সী প্রশংসা করবার পর বলেছিল ওই ছেলের সঙ্গেই আমার বিয়ে দিন, নইলে আমি আত্মহত্যা করব।

কামজ্বর প্রবল হলে নিজের মেয়েও পর হয়ে যায়। অগ্নিশিখা অগ্নিশর্মা হলেন বটে, শৃঙ্গভুজকে নিজের এলাকাতে পেয়েও বধ করতে পারলেন না কামনাতুর কন্যার আত্মহত্যার হুমকি শুনে।

সাতপাঁচ অনেক ভেবে, মনে মনে বিস্তর প্যাঁচ-পরিকল্পনা বানিয়ে নিয়ে মুখে বললেন, ঠিক আছে, নিয়ে এসো অন্তঃপুরে।

শৃঙ্গভুজ কিঞ্চিৎ তটস্থ হয়ে প্রবেশ করেছিল অন্তঃপুরে। এই কিছুক্ষণ আগেই যাকে প্রাণে মারতে গেছিল, তার প্রতিহিংসার প্যাঁচ কী রকমের হবে, তা তো বোঝা যাচ্ছে না। মেয়ে বেঁকে বসায় বাবা রাজি হয়েছেন অথবা নিমরাজি হয়েছেন।

রক্তলিপ্সুকে এত সহজে জামাই করবেন কী?

দেখা যাক অগ্নিশিখা এই উভয় সংকটের অবসান ঘটান কী করে।

অগ্নিশিখা অবশ্য আপ্যায়ণের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দিয়েছিলেন শৃঙ্গভুজের আগমন ঘটতেই। রাজকীয় অভ্যর্থনায় ত্রুটি রাখেননি।

শৃঙ্গভুজও রাজশিক আবদকায়দায় তাক লাগিয়ে দিয়েছিল ভাবীশ্বশুর মশায়কে। বিলক্ষণ সম্মান আর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে গেছিল।

জঙ্গল ঠেঙিয়ে, এতটা পথ রক্তের অনুসরণ করে আসার ফলে কর্দমলিপ্ত হয়ে গেছিল শৃঙ্গভুজ। বর বলে কথা, চেহারাটা তো ঝকমকে থাকা দরকার।

সুতরাং রাক্ষসরাজ মেয়েকে বললেন, যাও, বরকে স্নান করিয়ে নিয়ে এস। সব বোনদের আমার সামনে আসতে বলো।

মূল অভিপ্রায়টা যে কী, তা বুঝতে দেরি হয়নি সুচতুরা রূপশিখার। সরিয়ে দেওয়া হল তাকে। কেন? দাসদাসীর তো অভাব নেই। রূপশিখাকে যেতে হল কেন?

যেতে যেতে শৃঙ্গভুজকে ব্যাপারটা প্রাঞ্জল করে দিয়েছিল বুদ্ধিমতী রূপশিখা। অম্লানবদনে বলেছিল, হে আর্যপুত্র, আমার পিতৃদেব বিশ্ববীর হতে পারেন, বাহুবলে তিনি অজেয়, কিন্তু ওঁর বুদ্ধির ঘট শূন্য।

চমকে উঠেছিল শৃঙ্গভুজ, সে কী?

আমাকে আপনার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন কেন জানেন? ওঁর বাকি নিরানব্বইটা মেয়েকে ডেকে এনে কানে মন্ত্র দেবেন বলে। হ্যাঁগো, হ্যাঁ, আমরা একশো বোন। নিরানব্বইটা ফাউ-গিন্নি পাবেন বিয়েটা হয়ে গেলেই। কিন্তু মুশকিলটা কোথায় জানেন?

মুশকিল?

হ্যাঁ, মস্ত মুশকিল। আমরা একশো বোন হুবহু একরকম দেখতে। তফাত নেই কোত্থাও। বাবা আমাদেরকে সার দিয়ে দাঁড়াতে বলবেন। আমাকে বেছে নিতে বলবেন আপনাকে।

মাথা চুলকে শৃঙ্গভুজ, সে তো ভারী মুশকিলের ব্যাপার!

হেসে গড়িয়ে পড়ে রূপশিখা বললে, মুশকিলের সমাধান আমি বাতলে দিচ্ছি। এই যে আমার গলার হারটা দেখছেন, এই হার গলায় না পরে সিঁথি-মউড় করে পরব। কণ্ঠভূষণ না হয়ে সীমন্তের গয়না হয়ে থাকবে। আমার বাবার গায়ে জোর থাকতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি অতি নিরেশ। বনফুলের মালা আমার গলায় পরিয়ে দেবেন। আমি আপনার হয়ে যাব, এই রকম আরও অনেক বর-ঠকানো ব্যাপার উনি করবেন। প্রতিবার পাশ কাটিয়ে যাওয়ার ফিকির আমি বাতলে দেব। যান, স্নান করে আসুন। আমি আপনার নিরানব্বইটা ভারী শ্যালিকাদের ডেকে আনি।

তারপর একটু চক্ষুরঙ্গ করে বললে, দেখবেন, সব কজনকেই ভালোবেসে ফেলবেন না যেন! ফাউগিন্নি তো!

বলেই দৌড় দিয়েছিল রূপশিখা নিরানব্বই বোনদের ডাকতে, ওরে তোরা আয়, আমার বর আমাকে পছন্দ করবে তোদের সামনে। আয়, আয়, আয়!

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে রূপবান রাজপুত্র শৃঙ্গভুজ উপস্থিত হল অগ্নিশিখার সামনে। একই রকম দেখতে একশো মেয়ে ততক্ষণে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে তার সামনে।

অগ্নিশিখা বনফুলের মালা নিয়ে বসেই ছিল। শত কন্যার সামনে সেই বরমাল্য শৃঙ্গভুজের হাতে দিয়ে বললে, পরিয়ে দাও রূপশিখাকে।

মালা হাতে নিয়ে শতকন্যার শত রূপের ওপর চোখ বুলিয়ে গেছিল শৃঙ্গভুজ। কী আশ্চর্য! শত রূপসীই যে সমান রূপসী, চোখ মুখ নাক কান চুল চাহনি, সব এক রকম। যেন, একই ছাঁচে ঢালা! একশো কড়াপাক সুন্দরী—তিলমাত্র তফাৎ নেই!

বিমূঢ় হবার পাত্র নয় শৃঙ্গভুজ। শত রূপসীর রূপের ঝলকে মাথা ঘুরে যায়নি। তীক্ষ্ণ চোখে অন্বেষণ করে গেছিল সেই সঙ্কেত.....

গলার হার গলায় না থেকে গয়না হয়েছে কার সীমন্তে?

ওই তো সে দাঁড়িয়ে আছে লালীয়িত ভঙ্গিমায় দুষ্টু হেসে নিরানব্বই জনের মতো। সীমন্ত জুড়ে ঝলমল করছে কণ্ঠভূষণ!

রূপশিখার গলায় বনফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছিল শৃঙ্গভুজ।

অগ্নিশিখা প্রসাদগুণে তখনকার মতো শৃঙ্গভুজকে পাঠিয়ে দিল অন্দর মহলে।

একটু পরে নিজেও গেল সেখানে, সঙ্গে দুটো ষাঁড় আর সাতটা খারী, শস্য মাপবার পাত্র। সাত খারীতেই রয়েছে তিল।

অন্তঃপুরের ভেতর থেকে দেখিয়ে দিল রাজপ্রাসাদের বাইরে রয়েছে একটা মস্ত মাঠ।

সেই মাঠ দেখিয়ে বোকা-চালাক অগ্নিশিখা বললে শঙ্গভুজকে, যাও, মাঠ চষে সমস্ত তিল মাঠে পুঁতেএস।

শৃঙ্গভুজের মাথায় বাজ ভেঙে পড়েছিল হুকুম শুনে। সাত খারী তিল কী কম কথা! এক্ষুনি চষে ফেলতে হবে মাঠে!

সোজা চলে গেল রূপশিখার কাছে। রূপশিখা তাকে অভয় দিয়ে চকিতে মাঠ চষে তিল বপন করে দিল স্রেফ মায়া-শক্তি দিয়ে।

নিশ্চিন্ত হল শৃঙ্গভুজ।

কিন্তু অগ্নিশিখা তো তাকে এত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। সব তিল বোনা হয়ে গেছে শুনেই তক্ষুনি আদেশ করেছিল, যাও, যাও, যত তিল মাটিতে বুনে এসেছ, সব এক জায়গায় জড়ো করো, একটাও না বাদ পড়ে।

ফের রূপশিখার কাছে এসেছিল শৃঙ্গভুজ।

কিন্তু এমন অসম্ভব কর্মও নিমেষে সাঙ্গ করে দিয়েছিল রূপশিখা অত্যাশ্চর্য মায়াবলে।

অগ্নিশিখা কিন্তু প্রকৃতই ডাহা বোকা, বাইরে দেখায় ভারি চালাক। একটার পর একটা অসম্ভব কাজ দিচ্ছে শৃঙ্গভুজকে, নিমেষে তা হয়ে যাচ্ছে দেখেও বুঝলনা, তার চেয়েও ধড়িবাজ তার মেয়ে আড়ালে থেকে বাপের সমস্ত বদ পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়ে যাচ্ছে।

তাই নিরস্ত না হয়ে এবার যে কাজের ভার চাপাল শৃঙ্গভুজের ওপর, তা খুবই বিপদজনক। প্রাণ সংশয়ের কাজ।

বললে, যাও দক্ষিণ দিকে। ঠিক দু-যোজন পথ পেরিয়ে দেখতে পাবে একটা জঙ্গল। ভেতরে আছে একটা শিবমন্দির। সেখানে থাকে আমার ছোটো ভাই। ধূমশিখ তার নাম। এক দণ্ডের মধ্যেই গিয়ে তাকে যদি বিয়ের নেমন্তন্নটা করে আসতে পারো, তাহলে কাল সকালেই রূপশিখাকে সঁপে দেব তোমার হাতে।

কী সর্বনেশে হুকুম! এক যোজন পথ মানে তো চার ক্রোশ রাস্তা। একদণ্ড সময় মানে মাত্র চব্বিশ মিনিট! এইটুকু সময়ের মধ্যে এতখানি রাস্তা গিয়ে ফিরে আসা তো অসম্ভব!

এহেন অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্যে ফের ছুটেছিল রূপশিখার কাছে। সে মেয়েও শুধু রূপের শিখা নয়, মায়াবিদ্যায় বিলক্ষণ বিদুষী।

তিলমাত্র টলে না গিয়ে সে চারটে বস্তু দিল শৃঙ্গভুজকে, সেই সঙ্গে একটা ঘোড়া।

জিনিস চারটে অতি মামুলি, একটু মাটি, এক কৌটো জল, খানিকটা কাঁটা, আর একটু আগুন।

আশ্বস্ত করে বলেছিল ভাবি স্বামীকে, নির্ভয়ে যান আর্যপুত্র এই ঘোড়ায় চেপে। ঝড়ের বেগে আপনাকে নিয়ে যাবে সেই জঙ্গলে। ছোটোকাকাকে বিয়ের নেমন্তন্ন করে আর দাঁড়াবেন না। তক্ষুনি ঘোড়া ছোটাবেন এদিকে। কিন্তু পেছন দিকে নজর রাখবেন। যদি দেখেন কাকা আসছে আপনার পেছনে, মানে, ধাওয়া করছে, তাহলে এই যে মাটি দিলাম, এই মাটি পেছন দিকে ছুঁড়ে দেবেন। তাতেও যদি না সে থামে, ধেয়ে আসতে থাকে, তখন কোটোর এই জল পেছনে ছিটিয়ে দেবেন। তারপরেও যদি দেখেন আটকানো যাচ্ছে না কাকাকে, এই আগুনটা আপনার পেছনে ফেলে দেবেন, তার সামনে। মুহূর্তের জন্যে না থেমে, ঘোড়াকে ছুটন্ত অবস্থায় পরপর এই চারটে কাজ যদি করে যেতে পারেন, তাহলেই আপনি সব বিপদ পেরিয়ে সটান আমার কাছে পৌঁছে যাবেন। যান, নির্ভয়ে যান। জয় হোক আপনার।

এমন কথার পর কার মনোবল না বাড়ে? দ্বিগুণ উদ্যমে তেজিয়ান ঘোড়ায় চেপে দেখতে দেখতে শৃঙ্গভুজ ঢুকে গেছিল গভীর জঙ্গলের একদম ভেতরে। শিবমন্দিরে গিয়েই দেখেছিল শিবঠাকুরের এক পাশে মা দুর্গা, আর এক পাশে গণেশ। পুজোয় রত ধূমশিখ রাক্ষসকে বিয়ের নেমন্তন্নটা করেই ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে পবনবেগে অশ্বচালনা করেছিল ধূমপুর নগরের দিকে, যেখানে রয়েছে তার রূপশিখা।

ধূমশিখ উল্কাবেগে তার পিছু নিয়েছে। মুখাকৃতি অতি ভয়ংকর।

ঘোড়া যখন টগবগিয়ে ছুটছে, তখন পেছন দিকে তাকিয়ে কী দেখেছিল শৃঙ্গভুজ?

ধূমশিখ উল্কাবেগে তার পিছু নিয়েছে। মুখাকৃতি অতি ভয়ংকর। উদ্দেশ্য মোটেই সাধু নয়।

মনে পড়ে গেছিল রূপশিখার উপদেশ।

হাতের মাটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল পেছন দিকে।

কী আশ্চর্য! ওইটুকু মাটি দেখতে দেখতে একটা বিশাল পাহাড় হয়ে পথরোধ করছিল ধূমশিখের।

অত্যাশ্চর্য সেই দৃশ্য অবলোকন করার জন্যে শৃঙ্গভুজ কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকেনি। একমুঠো মাটি দিয়ে মস্ত পাহাড় বানিয়ে দিয়েই নক্ষত্রগতিতে ফের, অশ্বচালনা করেছিল ধূমপুর নগরের দিকে।

যেতে যেতে ফের শুনেছিল পেছন দিকে ধূমশিখের রক্ত জল করা হুঙ্কার। ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছিল মস্ত পাহাড় টপকে মহাকায় রাক্ষস বায়ুবেগে তেড়ে আসছে তার দিকে।

অতএব দ্বিতীয় মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করেছিল শৃঙ্গভুজ।

কৌটোভর্তি জল ছিটিয়ে দিয়েছিল।

অবাক কাণ্ড! ওইটুকু জল তৎক্ষণাৎ রূপান্তরিত হয়েছিল কে মহানদীতে। স্রোতের যেমন টান, তেমনি বড়ো বড়ো ঢেউ।

নিশ্চিন্ত হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে গেছে শৃঙ্গভুজ।

একটু পরেই কিন্তু ফের কানে ভেসে এসেছিল ধূমশিখের হুহুংকার। নদী পেরিয়ে লম্বা লম্বা লাফ মেরে ধেয়ে আসছে শৃঙ্গভুজকে চিবিয়ে খাবে বলে।

অতঃপর কন্টকগুচ্ছ নিক্ষেপ করেছিল শৃঙ্গভুজ। চক্ষের নিমেষে ওই কটা কাঁটা গাছ বেড়ে গিয়ে কাঁটার মহারণ্য বানিয়ে ফেলেছিল। ধূমশিখ রয়ে গেল জঙ্গলের ওপারে। এপারে তুরঙ্গগতি অব্যাহত রেখে দিল শৃঙ্গভুজ।

কিন্তু ধূমশিখ কি সামান্য রাক্ষস? কাঁটার জঙ্গলও পেরিয়ে এল রক্তাক্ত দেহে, তেড়ে এল শৃঙ্গভুজকে খাবে বলে।

সবশেষে হাতের আগুন ছুঁড়ে দিয়েছিল শৃঙ্গভুজ। আকাশচুম্বী আগুন লকলকিয়ে উঠেছিল ধাবমান রাক্ষসের সামনে।

দিগন্তব্যাপী এই আগুন পেরোতে গেলে পুড়ে মরতে হবে যে। অতএব চম্পট দেওয়াই শ্রেয় মনে করেছিল দুর্দান্ত রাক্ষস ধূমশিখ।

একটা কাজ করতে পারত। আকাশ পথে উড়ে আসতে পারত। কিন্তু সে বিদ্যাও সেই মুহূর্তে সে বিস্মৃত হয়েছিল ভাইজির প্রবলতর মায়াবিদ্যার প্রভাবে।

ফলে, গুটি গুটি ফিরে গেছিল স্বস্থানে।

ধূমনগরে নক্ষত্রবেগে ফিরে এসে রূপশিখার সামনে উপস্থিত হয়েছিল শৃঙ্গভুজ। তার ভোজবাজির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল।

তারপর গেছিল অগ্নিশিখের সামনে। বলেছিল, আপনার আদেশ পালন করে এলাম।

চোখ কপালে তুলে অগ্নিশিখা বললে, সে কী! ধূমশিখকে নেমন্তন্ন করা হয়ে গেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সেখানে যে গেছিলে, তার প্রমাণ কী?

চকিতবুদ্ধি শৃঙ্গভুজ প্রমাণ হাজির করেছিল তৎক্ষণাৎ, দেউলে ঢুকে যে বিগ্রহ দেখলাম, সে রকম বিগ্রহ আর কোথাও দেখিনি। একপাশে গণেশ, আর একপাশে মা দুর্গাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শিবঠাকুর।

শুনে তো চক্ষুস্থির অগ্নিশিখের। শৃঙ্গভুজকে সামান্য মানুষ বলে তো মনে হচ্ছে না। প্রকৃতই অদ্ভুতকর্মা। অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়ে যাচ্ছে পর পর। দেবতা-টেবতা হবে মনে হচ্ছে, নররূপে আবির্ভূত হয়েছে। এমন ব্যক্তিকে আর ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। জামাই করে নেওয়া যাক।

বললে, যাও রূপশিখার কাছে। কাল হবে তোমাদের বিয়ে।

হয়ে গেল বিয়ে পরের দিন। যার ভাগ্যে যা ঘটবার তা ঘটবেই। রাক্ষস দুহিতার সঙ্গে মনুষ্য তনয়ের শুভপরিণয় কিছুতেই আটকানো গেল না। প্রবল প্রেম আর দুর্নিবার অদৃষ্ট একযোগে সম্ভব করে দিল এক্কেবারে অসম্ভবকে।

শ্বশুরবাড়িতে পরমানন্দে বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে, জামাই-আদর খেয়ে, একদিন শৃঙ্গভুজ বললে রূপশিখাকে, প্রাণেশ্বরী, এবার চল শ্বশুর বাড়ি।

বুদ্ধিমতী রূপশিখা বললে, সতীর কাছে স্বামীই বিশ্ব, যদিও আত্মীয়স্বজন আর জন্মস্থানের মায়া কাটানো কঠিন। আমি তো আপনার ছায়ায় থাকতে চাই সারাজীবন—কিন্তু আমার দুর্দান্ত বাবা যে যেতে দেবে না। না বলে পালিয়ে যাব। পেছনে তাড়া করলে আমার বিদ্যা খাটিয়ে পিছু নেওয়া বন্ধ করব।

শৃঙ্গভুজ বললে, তাহলে আমার সোনার তির ফিরিয়ে এনে দাও, বাবা তো চাইবেন।

তীর এনে দিল রূপশিখা। ভোর হতেই স্বামীসহ গেল বাগানে বেড়াতে। সেখানে খাড়া ছিল অতি দ্রুতগামী একটা ঘোড়া। তার নাম শরবেগ। নামের মানে থেকেই বোঝা যায়, সে ঘোড়া ধেয়ে যায় তিরের মতন গতিবেগে।

দুজনে উঠে বসলো সরবেগ-এর পিঠে। তির গতিতে ঘোড়া ছুটল বর্ধমান শহরের দিকে।

বহুদূর চলে যাওয়ার পর খবরটা শুনেছিল অগ্নিশিখা। এতবড়ো কথা! চম্পট দিয়েছে মেয়ে-জামাই। রাগে অগ্নিমূর্তি অগ্নিশিখা তৎক্ষণাৎ আকাশে লাফিয়ে উঠে পবনবেগে তেড়ে গেছিল পলাতকদের পেছনে।

পেছনে ঘোর গর্জন শুনেই রূপশিখা বুঝে ফেলেছিল বোকা বাবা আসছে।

তিলমাত্র ভয় না পেয়ে বলেছিল শৃঙ্গভুজকে, এইবার শুরু হবে আমার গুপ্তবিদ্যার খেলা। তিরস্করিণী বিদ্যা প্রয়োগ করব আপনার ওপর। অদৃশ্য বর্ম আপনাকে ঢেকে রাখবে, আপনি নিজেও অদৃশ্য হয়ে যাবেন।

আমার বাবা আপনাকে দেখতে পাবে না।

ঘোড়া থামিয়ে টুপ করে মাটিতে নেমেই আগে স্বামীকে অদৃশ্য বর্মে মুড়ে দিয়েছিল গুণবতী রূপশিখা। তৎপরে নিজের রমণী আকৃতি পালটে নিয়ে পুরুষদেহ ধারণ করেছিল। কাঠ কাটতে এসেছিল এক কাঠুরে। তাকে বলেছিল, চুপ করে বসে থাক। একজন রাক্ষস আসছে। কোনও কথা বলবে না।

পুরুষরূপী রূপসী রূপশিখার চোখ থেকে সত্যিই আগুনের ফুলকি ছিটকে বেরোচ্ছে দেখে ভয়ে ময়ে একদম চুপ মেরে বসে পড়েছিল কাঠুরে। হাত থেকে কুড়ুল কেড়ে নিয়ে ঝপাঝপ কাঠ কাটতে শুরু করে দিয়েছিল রূপশিখা।

লোকচক্ষে অদৃশ্য শৃঙ্গভুজ নিশ্চলদেহে বসে দেখে গেল মায়াবতী প্রাণেশ্বরীর ভোজবিদ্যা।

সাঁ-সাঁ করে উড়ে এসে অগ্নিশিখা নামল সেখানে। কাঠুরেরূপী কন্যাকে চিনতেও পারল না। সগর্জনে জানতে চাইল, একটু আগেই এখান দিয়ে একজন পুরুষ ঘোড়া ছুটিয়ে গেছে কিনা। অশ্বপৃষ্ঠে ছিল এক সুন্দরী।

অবাক চোখে কাঠুরে বললে, না তো! কাউকেই দেখিনি।

চোখ রাঙিয়ে অগ্নিশিখা বললে, এইদিক দিয়েই তো গেছে।

ছদ্মবেশিনী কন্যারত্ন বললে, তার আমি কী জানি। আমি কাঠ কাটছি একমনে, অগ্নিশিখাকে পোড়ানোর জন্যে।

শুনে তো চোখ কপালে উঠে গেল অগ্নিশিখের, কী বললে? অগ্নিশিখাকে পোড়াবে? কেন?

সে তো মরে গেছে। চিতায় কাঠের দরকার যে।

অগ্নিশিখা এমনই বুদ্ধিহীন যে কথাটা বিশ্বাস করে বসল অক্ষরে অক্ষরে। কন্যাশোকে সত্যিই হয় তো সে মরে গেছে। ভূত হয়ে ছুটছে। ধুস! মরে যে গেছে, তার ঘরে ফিরে যাওয়াই ভালো। মেয়েকে আর দরকার নেই। সে জ্যান্ত আছে, জ্যান্ত থাকুক। কিন্তু আসি হঠাৎ অক্কা পেলাম কীভাবে, সেটা বরং বাড়ি ফিরে গিয়ে সবাইকে জিজ্ঞেস করা যাক।

শূন্যে লাফিয়ে উঠে পবন বেগে স্বস্থানে প্রস্থান করেছিল মূর্খ অগ্নিশিখা।

হেসে গড়িয়ে পড়ে রূপশিখা স্বামীর অদৃশ্যকরণী বর্মা সরিয়ে দিয়ে তাকে নিয়ে উল্কাবেগে ঘোটক চালনা করে শ্বশুরবাড়ি বর্ধমানের দিকে রওনা হয়েছিল তৎক্ষণাৎ।

বোকা অগ্নিশিখা বাড়ি ফিরে আত্মীয়স্বজনকে সাড়ম্বরে বললে যেহেতু সে মরে গেছে, সুতরাং পলাতকা কন্যা চুলোয় যাক। তাকে আর ফিরিয়ে আনবে না।

হাসতে হাসতে তার ভুল ভাঙিয়ে দিয়েছিল পরিজনবর্গ। নিশ্চয় কেউ তার সঙ্গে বিষম ঠাট্টা করেছে। অগ্নিশিখা মড়া হয়নি, হলে জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে কথা বলছে কী করে?

তাই তো বটে! তাই তো বটে! তেড়েমেরে ফের আকাশ পথে ধেয়ে গেছিল বুদ্ধিহীন রাক্ষস। জামাইকে যমালয়ে পাঠাবে, ত্যাঁদোড় মেয়েটাকে আচ্ছা শিক্ষা দেবে।

কিন্তু রূপশিখা কি তা আঁচ করেনি? ঘোড়ায় বসে পেছনে চোখ রেখেছিল, যেই দেখলে আকাশ কালো করে ঝড়ের বেগে পিতৃদেব ছুটে আসছে মেঘলোক ছিন্নভিন্ন করে, নিমেষে নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। ঘোড়াশুদ্ধ স্বামীদেবতাকে আগের মতো আদৃশ্য করে দিয়ে ঝট করে নিজে হয়ে গেল একজন পুরুষমানুষ, জঙ্গলের পথে চিঠি বিলি করতে যাচ্ছিল একটা লোক। তাকে ভয় দেখিয়ে লুকিয়ে রাখল গাছের আড়ালে। নিজে সেই চিঠি আর চিঠির ঝোলা নিয়ে টুকুস টুকুস করে হেঁটে যেতে লাগল জঙ্গলের পথ বেয়ে।

হুহুংকারে রাক্ষস নেমে এল তাকে দেখে। বিষম নিনাদ ছেড়ে ততোধিক আস্ফালন করে বললে বিকট দেহী একটু আগে এখান দিয়ে একটা মেয়েকে ঘোড়ায় চাপিয়ে নিয়ে গেছে একটা ছেলে?

যেন আকাশ থেকে পড়েছিল পত্রবাহক (আসলে রূপশিখা) বলেছিল ইনিয়ে বিনিয়ে, সেকি কথা! আস্ত একটা ঘোড়া দু-দুটো সওয়ার নিয়ে গেলে নিশ্চয় দেখতে পেতাম। না হুজুর না। কেউ যায়নি। খামোকা

আমার সময় নষ্ট করবেন না। জরুরী চিঠি নিয়ে যাচ্ছি ধূমশিখ রাক্ষসের কাছে। যেতে দিন...যেতে দিন।

চমকে উঠে শুধিয়েছিল অগ্নিশিখা, ধূমশিখের কাছে যাচ্ছ? কেন? কীসের চিঠি? ধূমশিখ তো আমার ভাই?

ধূমশিখের দাদা অগ্নিশিখা যে মরতে চলেছে। লড়তে গিয়ে মারাত্মক জখম হয়েছে, পথ ছাড়ুন...পথ ছাড়ুন!

চিঠির বার্তা শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল অগ্নিশিখা। চক্ষু চড়কগাছ করে বসে রইল মাথায় হাত দিয়ে। কী সর্বনাশ! সে যে মরণাপন্ন, তাতো বাড়ির লোককে এক্ষুনি জানানো দরকার।

অতএব লম্ফদিয়ে আকাশে উঠে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল মূর্খ-সম্রাট অগ্নিশিখা।

বাড়িতে পৌঁছেই হাঁকডাক দিয়ে লোক জড়ো করে যখন তার মরণাপন্ন অবস্থার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করছে আর শ্রোতারা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ছে, সেই অবসরে ঘোড়াসহ স্বামীকে দৃশ্যমান করে তুলে উল্কাবেগে বর্ধমান অবিমুখে ধাবিত হয়েছে রূপশিখা।

বুদ্ধি যার, বল তার। বুদ্ধিমতী রূপশিখা পর পর দুবার বুদ্ধিবলে মহাপরাক্রান্ত পিতৃদেবকে প্রতারণা করার ফলে মনে খুব দুঃখ হল অগ্নিশিখের। যে কাজে এত বিঘ্ন, সে কাজে আর অগ্রসর না হওয়াই সমীচীন বোধ করে মেয়েকে আর ফিরিয়ে আনবে না, এই প্রতিজ্ঞা করে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল বাড়িতে।

ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বীর স্বামীকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে শ্বশুরবাড়ি বর্ধমানে প্রবেশ করেছিল রূপসী রূপশিখা। বিপুল অভ্যর্থনা আর বধূবরণ সাঙ্গ হয়েছিল খুব ঘটা করে। গোটা বর্ধমান উৎসবে মেতে উঠেছিল রাজকুমাররের প্রত্যাবর্তনে, অগ্নিশিখারে মতোই রূপবতী ভার্যাকে সঙ্গে নিয়ে।

আনন্দের আড়ম্বরের মধ্যে কিন্তু নিজের কর্তব্য ভোলেনি শৃঙ্গভুজ। বাবার হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিল সোনার তির। তারপর বলেছিল সমস্ত কাহিনি।

প্রখরবুদ্ধি রাজা বীরবাহু নিমেষমধ্যে বুঝতে পারলেন ঘোর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে তার কনিষ্ঠ পুত্র এবং ছোটো রানি। পরপর যা ঘটে গেছে, সেসব মনে মনে ভেবে আর বিচার করে দেখলেন, যৎপরোনাস্তি অবিচার করা হয়েছে গুণবরা-র প্রতি, হিংসুটে নিরানব্বই রানির কুমন্ত্রণায়। এর বিহিত করা দরকার।

সমস্ত দিন গুম হয়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করলেন রাজা। যে যেমন, তার সঙ্গে সেই রকম প্যাঁচের বুদ্ধি এঁটে চলতে হবে মনস্থ করে রজনীর আবির্ভাব ঘটতেই হাস্যমুখে প্রবেশ করলেন রানি যশোলেখার শয়নকক্ষে।

বিষম আহ্লাদে তূরীয় অবস্থায় পৌঁছেগেছিল যশোলেখা। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়। সপত্নী-কাঁটাকে ষড়যন্ত্রের কাঁটা দিয়ে বিদেয় করতে পেরেছে বলেই তো রাজা আজ তার দেহসুধা পান করতে এসেছেন।

অতএব নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিল যশোলেখা। মদন উৎসবকে রঙিনতর করে তোলার জন্যে মদিরা পান করেছিল মাত্রাধিক। তৎসহ পুনঃ পুনঃ স্বামী সহবাস।

পরিণাম, গভীর নিদ্রা।

কিন্তু অতিরিক্ত সুরাপান করলে নিদ্রা কখনও নিবিড় হয় না। পাতলা ঘুমের সুযোগ নিয়ে বিবিধ স্বপ্ন মনের মধ্যে নৃত্য করে যায়, মুখ দিয়ে জড়িত স্বরে অনেক কথা বেরিয়ে আসে।

কুচক্রী যশোলেখার ক্ষেত্রে ঘটেছিল ঠিক তাই, আবোল তাবোল বকুনির ফাঁকে ফাঁকে বলে গেছিল কীভাবে মিথ্যের পাকচক্র বানিয়ে বিনা অপরাধে গুণবরাকে পাতাল ঘরে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। আহা, আহা! এমন প্যাঁচ মারা হয়েছিল বলেই তো আজ সে স্বামীর আদর লুটেপুটে নিতে পারল।

রাজা ছিলেন জাগ্রত। স্বকর্ণে শুনলেন চক্রান্ত নায়িকার আত্মকথা, যা কিনা নিখাদ স্বীকারোক্তি। রাগে জ্বলে গেলেন। তৎক্ষণাৎ সে ঘর ছেড়ে চলে এলেন নিজের ঘরে। অন্তঃপুরে প্রহরিণীদের তলব করলেন, তাদের বললেন, বহুশাস্ত্রবিদ ত্রিকালদর্শী যে মহাজ্ঞানীর আদেশে গুণবরাকে পাতাল ঘরে রাখা হয়েছিল কুগ্রহের

প্রকোপ কাটানোর জন্যে, তিনি জানিয়েছেন, গ্রহশান্তি ঘটেছে। গুণবরাকে এখন পাতাল ঘর থেকে আনা যেতে পারে। যাও এখুনি, সসম্মানে তাকে নিয়ে এস এখানে।

এল গুণবরা। স্বামীর মুখে শুনল পুত্র শৃঙ্গভুজ-এর শৌর্যবীর্য আর বিয়ে করে বউ নিয়ে পালিয়ে আসার রোমাঞ্চকর ঘটনা। বহুদিন পর পেল স্বামীর আদর, ভালোবাসা, সহবাস।

পরের দিন বউকে নিয়ে পুত্র শৃঙ্গভুজ এল মায়ের সামনে। ছেলের মুখে বউমার বুদ্ধিশক্তি আর মায়াশক্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সুনল গুণবরা।

বললে প্রকৃত সতী আমার এই বৌমা। রাক্ষসের মেয়ে বলে মনে হয় না, নিশ্চয় সুরলোকের কোনও কন্যা, এসেছে তোমার কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছায়। সতী শিরোমণি বৌমা আমার আশীর্বাদ নাও।

পরের দিন তীর্থ থেকে নির্দোষ সুরক্ষিতকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করলেন রাজা, যোগ্য সম্মান যেন পায় আমৃত্যু।

কী বিধান দিলেন যশোলেখা প্রমুখ নিরানব্বই রানির ক্ষেত্রে।

নির্বাসন। পাতাল ঘরে। আমরণ।

কিন্তু বেঁকে বসল গুণবরা। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে মিনতি করেছিল রাজাকে, এতবড় দণ্ড না দেওয়াই সংগত।

ফলে, রাজা নরম হলেন বটে, কিন্তু রেগে গেলেন গুণবরার ওপর। নিরানব্বই পাপিষ্ঠ রানিদের নিজেদের সুখালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে একহাত নিলেন গুণবরাকে অপাত্রে দয়া বর্ষণের জন্যে।

গুণবরা তখন একটা কথাই বলেছিল প্রিয়তম রাজাকে শত্রুতা নিবারণের শ্রেষ্ঠতম পন্থা মহত্ত্ব প্রদর্শন। পথের কাঁটা চিরকালের মতো চলে যায়, মহৎ ব্যক্তির পায়ে আর বেঁধে না.

সে না হয় হল, নিরানব্বই পাপিষ্ঠা কুল নারীকে ক্ষমা করা গেল, কিন্তু তাদের গর্ভজাত শয়তান ছেলেদের ছাড়বেন কেন নৃপতি বীরবাহু? জ্যেষ্ঠ নিরানব্বই ভাই শলাপরামর্শ করে কনিষ্ঠ শৃঙ্গভুজকে খতম করতে গেছিল। এ তো মানুষ খুনের অপরাধ। এর সাজা হওয়া উচিত দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, ঘুরে বেড়াক তীর্থে তীর্থে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে।

কিন্তু বাদ সাধল শৃঙ্গভুজ। বাবার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে ক্ষমা করতে বললে দাদাদের।

প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন রাজা বীরবাহু।

কিন্তু নিরানব্বই দাদাদের টপকিয়ে যুবরাজ করে দিলেন কনিষ্ঠতম শৃঙ্গভুজকে। মহত্ত্বের পুরস্কার।

যুবরাজ শৃঙ্গভুজ তারপরেই বেরিয়ে পড়েছিল বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে। রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে, বিস্তর অর্থ, সম্পদ আর রত্নসামগ্রী নিয়ে ফিরে এসেছিল স্বদেশে।

প্রতাপ দেখে মাথা হেঁট করেছিল নিরানব্বই দাদা, চিরকালের জন্যে।

গল্প শেষ করে বন্ধুবর হবিশিখ বলেছিল যুবরাজ নরবাহনদত্তকে, স্বামীর সেবা একমাত্র ধর্ম কাদের কাছে? যারা সত্যিকারের সতী, তাদের কাছে। গুণবরা আর রূপশিখা, শাশুড়ি আর পুত্রবধূ, তার প্রমাণ রেখে গেছে ইতিহাসে।

৪০. তপোদত্তের উপাখ্যান

পরের দিন সকালে যুবরাজ নরবাহনদত্ত সস্ত্রীক বসেছে বন্ধুবর্গ নিয়ে, এমন সময়ে টলতে টলতে হাজির হয়েছিল তার অন্যতম পারিষদ মরুভূতি। হাতে ফুলের মালা আর চন্দন। মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি। চোখ ঢুলু ঢুলু।

হেসে ফেলেছিল তীক্ষ্ণবুদ্ধি গোমুখ, ক্ষুরধার বাক্যবাণে যে অদ্বিতীয়। টিপ্পনি কেটেছিল মধুর বচনে।

হে বন্ধু, মন্ত্রীপুত্র হয়েও এখনও সুনীতি রপ্ত করতে পারোনি? সাতসকালে সুরামত্ত হয়ে মালিকের সামনে কেউ আসে? রেগে টং হয়ে মরুভূতি বলেছিল, সে শিক্ষাটা যুবরাজের কাছেই নেব। তুমি কে হে? পাপের পিপে কোথাকার!

বন্ধুবাক্য এই রকমই হয়। ক্ষুরের ধার থাকলেও তা গায়ে লাগে না।

গোমুখ অট্টহেসে বলেছিল, বটে! বটে! আমি যদি পাপের পিপে হই, তাহলে তুমি নিশ্চয় শিং ছাড়া ষাঁড়! ষণ্ড আচরণ তোমাকেই মানায়।

শুনে তো হেসে গড়িয়ে পড়েছিল প্রত্যেকেই। আসর জমেছে ভাল। হাসিমুখেই বলে গেল গোমুখ, মরুভূতি একটা জিনিস বটে! ষাঁড়ের গুঁতোকে সবাই ভয় পায়। কিন্তু মরুভূতিকে ফুঁড়ে কথার ছুঁচ চালিয়ে দেওয়া যায়।

একটা গল্প মনে পড়ে গেল। বালুকাসেতুর গল্প। বলা যাক, সেকালের গল্প। ব্রাহ্মণ তপোদত্ত থাকতেন প্রতিষ্ঠান শহরে। লেখাপড়ায় মন ছিল না ছেলেবেলা থেকেই। বকুনি হজম করে যেত দিবারাত্র। একদিন আর হজম করতে না পেরে বিবাগী হয়ে গেল। গৃহত্যাগ করে গঙ্গার তীরে গেল সাধন ভজন করবে বলে।

তপস্যার আগুনে প্রায় সেদ্ধ করে এনেছিল দেবতাদের রাজা ইন্দ্রকে। নিজের আসন টলমল করছে দেখে তপস্যা ভণ্ডুল করার জন্যে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন তিনি, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে।

মুখে কিছু না বলে গঙ্গার তীর থেকে মুঠো মুঠো বালি নিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন গঙ্গার জলে।

কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখবার পর জিজ্ঞেস করেছিল তপোদত্ত, করছেন কী?

ছদ্মবেশী ইন্দ্র বলেছিলেন, সাঁকো বানাচ্ছি। পরলোকে যাওয়ার সেতু।

উচ্চহাস্য করে তপোদত্ত বলেছিল, হে ব্রাহ্মণ, আপনার প্রয়াস তো নিষ্ফল হবে। খরস্রোতা গঙ্গা তো বালি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেতু নির্মাণ কস্মিণকালেও হবে না। কিছু মনে করবেন না, আপনি একটা প্রকাণ্ড মূর্খ।

ছদ্মবেশী ইন্দ্র আরও জোরে হেসে বললেন, তুমিও তো একটা মূর্খ। তোমাকে তা বোঝানোর জন্যেই এই অসম্ভব কাণ্ড করছিলাম। লেখাপড়া না করে শুধু ধ্যানজপ করলে বিদ্যান হওয়া যায় না। যাও ঠাকুর, বাড়ি যাও।

নিরেট তপোদত্ত এতদিনে যা বোঝেনি, এবার তা হাড়ে হাড়ে বুঝে গেল। বাড়ি ফিরে গেল পড়াশুনো করবার মন নিয়ে। তপস্যায় সুফল হল এইটুকু।

কাহিনি শেষ করে কথার ছুরি চালিয়ে দিয়েছিল বাক্যবীর গোমুখ, যারা বোঝে, তাদের বোঝানো যায়। যারা অবুঝ, তারা রেগে যায়। যেমন, এই মরুভূতি।

গল্পের আসরে একবার গল্পের ফোয়ারার মুখ খুলে যায়, তখন উপস্থিত প্রত্যেকেরই পেটে গজগজ করতে থাকে একটা না একটা গল্প। যুবরাজের আর এক বন্ধু হরিশিখের অবস্থা হয়েছিল তাই। শোনানো যাক একটা মুখরোচক গল্প।

বললে, যার বুদ্ধি-বিবেচনা থাকে, তাকে সহজে বোঝানো যায়, নইলে ভস্মে ঘি ঢালা হয়। যেমন বিরূপ শর্মা দেখতে কুৎসিত, ট্যাঁকে কানাকড়িও থাকত না। নিবাস ছিল বারানসীতে, অনেক কাল আগে। এই দুটো যাতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ ধনদৌলত আর রূপযৌবন, সেই মতলবে গেল এমন এক জঙ্গলে যেখানে ঈশ্বরচিন্তা করেন মুনি ঋষিরা। তাঁদের সঙ্গে সাধন ভজনে বসে গেল বিরূপ শর্মা। নামেও বিরূপ, চেহারাতেও কুরূপ। এমন একটা মনুষ্যকে ধ্যান জপ করতে দেখে হাসি চেপে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু স্বরূপে অর্থাৎ দিব্যরূপে নয়, অতিশয় কদাকার রোগজীর্ণ এক শেয়ালের চেহারা নিয়ে।

একে তো শেয়াল, তার ওপর সারা শরীরে ঘা, এমন একটা জীবের করুন চাউনি দেখে দিব্যচক্ষু খুলে গেল বিরূপ শর্মার। অন্তরের অন্তস্তল থেকে উঠে এল পরম সত্য, সবই তো কর্মফল। ঈশ্বরের অমোঘ নিয়মাধীন। সুতরাং দুঃখে কষ্ট পাওয়া আর সুখে আহ্লাদে আটখানা হওয়া স্রেফ বোকামি। অতএব কর্মক্ষয় ঘটছে ঘটুক, মুখ বুঁজে সয়ে গেলে পুণ্যসঞ্চয়ও ঘটবে। তাহলে আর সাধনভজনে কী প্রয়োজন? ঘরে ফেরা যাক।

হরিশিখ গল্পের মাধ্যমে আসলে নিবেদন করল এমন একটা সন্দর্ভ, যার ছত্রে ছত্রে রয়েছে নীতি।

গোমুখ তো শুনে খুব খুশি। কিন্তু আগুনে নুন আর চিনি ছিটিয়ে দিলে আগুন যেমন চড়বড় করে ওঠে, মাতাল মরুভূতির হল সেই অবস্থা।

বললে তেড়েমেড়, গোমুখ-এর মুখ তো গোরুর মুখের মতো, মুখ নাড়াতেই জানে-কাজের বেলা কাজ।

কথার যুদ্ধে যতি টেনে দিয়েছিল যুবরাজ হাসিমুখে। আর গল্প নয়—এবার বাড়ি গিয়ে সবাই শুরু করুক কর্ম।

পরের দিন ফের এল বয়স্যরা। মরুভূতি কিন্তু লজ্জায় মাথা হেঁট করে বসে রইল গতকালের আচরণের জন্যে। মুখ টিপে হেসে গেল অন্য বন্ধুরা।

আড্ডা জমছে না দেখে হেমপ্রভাউসকে দিয়েছিল নিজের স্বামীদেবতাকেই, আপনার প্রত্যেক মন্ত্রীর মন ভালো, স্বভাব সুন্দর, চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। পূর্বজন্মে পুণ্য সঞ্চয় করেছিলেন বলেই এমন মন্ত্রীসভা পেয়েছেন।

শুনে পুলকিত চিত্তে বললে বন্ধু তপন্তক, তাতো বটেহে, তা তো বটেই। আগের জন্মে কর্মফল উত্তম ছিল বলেই তো সেই আকর্ষণে আমরা এ জন্মে একসঙ্গে মিলেছি। একটা কাহিনি বলতে ইচ্ছে করছে, পূর্বজন্মের সুকৃতি সম্বন্ধে, শুনুন।

পুরাকালে বিলাসশীল নামে এক রাজা থাকতেন বিলাসপুর নামে এক শহরে। সেই দেশের নাম ছিল শ্রীকণ্ঠাখ্য। তাঁর রানির নাম কমলপ্রভা। গভীর প্রণয় ছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। কিন্তু একটা সময় এল যখন শরীর জীর্ণ হল রাজার, জরার আবির্ভাবে। বাগড়া পড়ল স্ত্রী উপভোগে। জরা-আকীর্ণ মুখ নিয়ে সুরূপা রানির সমীপে যেতে মন কি চায়?

কাজেই মনমরা হলেন রাজা। জরাগ্রস্ত শরীর নিয়ে উদ্দাম স্ত্রী উপভোগ আর সম্ভবপর নয় বুঝে আত্মহত্যা করবেন ঠিক করলেন। তারপর অবশ্য ভাবলেন, শেষ চেষ্টা করা যাক। জরা জয় করার চিকিৎসা চালানো যাক। হারানো যৌবনকে ফিরিয়ে আনা যাক।

ডাকলেন বৈদ্য তরুণচন্দ্র কে। যাঁর নামের মধ্যেই রয়েছে চিকিৎসা ক্ষমতার বিজ্ঞাপন। অর্থাৎ, তিনি দাওয়াই দিয়ে তারুণ্য বজায় রেখে যেতে পারেন। রমণী প্রিয় পুরুষদের কাছে তাই তাঁর দারুণ পশার।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন সোজাসুজি, আমার এই বার্ধক্য উড়িয়ে দেওয়ার কোনও চিকিৎসা জালা আছে কি?

তরুণচন্দ্র কিন্তু মহাধড়িবাজ। পশার জমিয়েছে এই ধড়িবাজি দিয়েই। নিজের নামকরণের মধ্যেও সেই ধূর্ততার আভাস রেখেছেন। তারুণ্য কে না চায়? রমণীপ্রিয়দের কাছে তাই তিনি নয়নের মণি।

কিন্তু রমণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ওষুধে সম্ভব হয়, জরা তাড়ানো যায় না। জরা অমোঘ। জন্মালেই জরা আসবে।

ধূর্ত তরুণচন্দ্র তা জানে। জরা নিবারণের ক্ষমতা তার নেই, কিন্তু সম্পদ লোভ যে আছে। রাজাকে চিকিৎসার অছিলায় দোহন করে নেওয়ার এই তো সুযোগ।

তাই সাড়ম্বরে বাগবিস্তার করে বললে, আছে, আছে, এমন উপায় আছে যার প্রয়োগ ঘটলে জরা চম্পট দেবে। উৎসুক রাজা জিজ্ঞেস করলেন, কি উপায়?

তরুণচন্দ্র বললে, বড়ো কঠিন উপায়। কিন্তু নির্ঘাত প্রক্রিয়া।

যথা?

শুধু ওষুধ সেবনে কিন্তু কাজ হবে না।

তবে?

আপনাকে পাতাল ঘরে থাকতে হবে। টানা ছ-মাস। ওষুধ তখনই কাজ দেবে। যে-যৌবন হারিয়েছেন, সেই যৌবন ঊর্ধ্বশ্বাসে এসে ফের আপনাকে আশ্রয় করবে। প্রতিটি রমণক্রিয়া আপনার রমণশক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে যাবে। জরাগ্রস্ত মুখভাব পলায়ন করবে, দিব্যকান্তি অর্জন করবেন।

নিদান বিলক্ষণ দুরূহ বটে কিন্তু পুনরায় যৌবনপ্রাপ্তির আশায় উদ্দীপ্ত হলেন রাজামশায়। প্রথম শ্রেণির বোকা বলেই ধূর্তশিরোমণির বাক চাতুরির শিকার হলেন।

অনেক খরচপত্র করে পাতালে বানালেন রাজপ্রাসাদ।

বুদ্ধিমান মন্ত্রীদের সদুপদেশে কর্ণপাত করলেন না। কবিরাজের কথামতো রাজপোশাক গা থেকে খুলে ফেলে ঢুকলে না পাতাল প্রাসাদে। সেবাযত্নের জন্যে রাখলেন শুধু কবিরাজের লোকজনকে।

ছ-মাস রইলেন সেখানে।

একে তো জরায় কাবু, তার ওপর ভূগর্ভে বাস। লম্ফ দিয়ে দিয়ে জরা তাঁকে মুমূর্ষু করে আনল ছমাসেই।

এই তো চাই! বৈদ্য মহারাজ ঠিক এই অভিলক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্যেই তো এহেন অপূর্ব নিদান বাতলে ছিলেন। নিজের অনুগত লোকজন দিয়ে এমন সব দাওয়াই রাজাকে গিলিয়েছিলেন, যাতে জরা তাঁকে কাবু করে ফেলে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ বেগে। ঠিক ছমাস পরে বৈদ্য মহারাজ গম্ভীর বদনে নেমে এলেন পাতাল প্রাসাদে। সে এক নারকীয় প্রাসাদ বললেই চলে।

দেখলেন, ওষুধ ধরেছে। বিপুলতর বেগে জরা-আচ্ছন্ন রাজাকে আর চেনা যাচ্ছে না।

সন্তুষ্ট হয়ে ধূর্তশিরোমণি বেরিয়ে এলেন বাইরে। বিস্তর অনুসন্ধান করে সংগ্রহ করলেন এমন এক যুবাপুরুষকে যাকে দেখতে অবিকল রাজার মতো। রাজত্ব পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখাতেই সে হাতে চলে এল, কথা দিল, কবিরাজ যা বলবে, তাই করবে।

তারপর, খুব গোপনে লোকজন লাগিয়ে একটা সুড়ঙ্গ বানালেন কবিরাজ। পাতাল প্রাসাদ থেকে মাটির ওপর পর্যন্ত।

গভীর রাতে সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে নেমে গেলেন পাতাল ঘরে ঘুমন্ত রাজার কাছে। আগে থেকেই একটা পাতাল কুয়ো-ও বানিয়ে রেখেছিলেন। মুমূর্ষু রাজাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গিয়ে ঝপাং করে ফেলে দিলেন সেই কুয়োর মধ্যে।

রাজার মতো দেখতে সেই লোভী যুবককে রাজার বিছানায় শুইয়ে রেখে বেরিয়ে এলেন বাইরে। সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে দিলেন এমনভাবে যাতে কেউ না খুঁজে পায়।

পরের দিন সকাল হতেই হাসি হাসি মুখে রাজসভায় বৈদ্য মহারাজ বলেছিল অবিশ্বাসী মন্ত্রীদের, কি বলেছিলাম? ছমাসের মধ্যেই রাজাকে যুবক করে দেব? যান, গিয়ে দেখে আসুন। কিন্তু কাছে যাবেন না, কথা বলবেন না, ওষুধের কাজ এখনও চলছে, ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

হুড়মুড় করে মন্ত্রীরা দৌড়েছিল যৌবন-ফিরে-পাওয়া রাজাকে দেখতে। দেখতে হয়েছিল কিন্তু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, দূর থেকে, পাছে হিতে বিপরীত হয়।

প্রত্যেকেরই চোখ কপালে উঠেছিল নকল রাজাকে দেখে। জরার চিহ্নমাত্র নেই! এক্কেবারে আগের মতো! ইয়া তাগড়াই চেহারা, অতি মনোরম আকৃতি, সত্যিই জরা বিদায় নিয়েছে, যৌবনের পুনঃ অভিষেক ঘটিয়ে গেছে!

হতভম্ব মন্ত্রীদের বিদেয় করে দিয়েই ভেজাল ভিষগরত্ন শুরু করেছিল জোচ্চুরির দ্বিতীয় পর্ব।

মন্ত্রীরা দরজার কাছে কে কোথায় কীভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, তা দেখে নিয়েছিল জাল রাজা। এখন তাদের নাম কী, কে কী কাজ করে ইত্যাদি সবই শুনে নিল প্রতারক কবিরাজের মুখে। শিক্ষাগ্রহণের মধ্যে রইল অন্তঃপুরে যারা রয়েছে, তাদের বৃত্তান্তও। তাদের নাম, তাদের কাজ। রাজমহলের কিছুই আর অজানা রইল না জাল রাজার।

গেল আরও তিনটে মাস। উত্তম খাদ্য আর নিয়মিত পরিচর্যায় জাল রাজার শরীর হল নধর। ভণ্ড তরুণচন্দ্র তখন তাকে নিয়ে এল রাজসভায়, মন্ত্রীদের সামনে।

হতবাক প্রত্যেকেই। কোথায় সেই জরা-আকীর্ণ রাজা বিলাসশীল? এ যে যুবক বিলাসশীল। হারানো যৌবন টলমল করছে গোটা শরীরে। অসম্ভবকে সম্ভব করেছে বৈদ্য তরুণচন্দ্র।

উল্লাস স্তিমিত হওয়ার পর যুবক রাজার নতুন নাম দেওয়া হল রাজসভায়। অজর। অর্থাৎ, জরারহিত।

সার্থক নামকরণের পর সিংহাসনে বসল জাল রাজা। বড়ো ধূর্ত। যৌবনের ভেলকি দিয়ে আগে বশ করল রানিকে। তারপর রাজনীতির কূটকৌশলে বন্ধুত্ব বজায় রাখল সর্বস্তরে। প্রজাদের মোহিত করল সুশাসনের

সন্তুষ্টি দিয়ে।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতক বলে বৈদ্য তরুণচন্দ্রকে রেখে দিল তফাতে। রাজা বিলাসশীল তাকে বিশ্বাস করেছিলেন। সেই বিলাসশীলকে নিষ্ঠুরভাবে বধ করেছে যে পাপিষ্ঠ, তাকে আর বিশ্বাস করা যায়? কদাপি না।

সুতরাং তরুণচন্দ্রের তোয়াক্কা না রেখে যা খুশি তাই করে যেতে লাগল অজর রাজা। মুরুব্বি হিসেবে তরুণচন্দ্রকে পাত্তাই দিল না।

একদিন আর সইতে না পেরে তরুণচন্দ্র একহাত নিয়েছিল জাল রাজা অজর, কে-ব্যাপার কী? অকৃতজ্ঞ! আমার কৃপায় রাজা হয়ে আমাকেই তাচ্ছিল্য?

অজর জবাবটা দিয়েছিল প্রকৃত বিজ্ঞের মতো, আমি যা পেয়েছি, তা আমার পূর্বজন্মের কর্মের ফলে, তোমার কৃপায় নয়। প্রমাণ তোমাকে দেব, যথাসময়ে।

সুগম্ভীর স্বল্প বচনের জবাবটা শুনেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছিল প্রবঞ্চক বৈদ্য মহাশয়ের। কী সর্বনাশ! জাল রাজার হাতে যে এখন অনেক ক্ষমতা! ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক এই আমিকে এখন যদি খতম করে দেয়? উপাংশু হত্যা অর্থাৎ গুপ্তহত্যার কৌশলে? প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করতে গেলে সেটাই স্বাভাবিক। তার চাইতে বরং জালরাজার পদলেহন করে থাকা যাক। প্রাণটা তো বাঁচবে।

রাজা অজর কিন্তু বৃথা আস্ফালন করেনি। গতজন্মের সুকৃতির ফলেই যে এজন্মে রাজত্ব প্রাপ্তি, তা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে ছেড়েছিল।

বৈদ্য তরুণচন্দ্রকে নিয়ে একদিন নদীর তীরে গেছিল অজর। রাজার সঙ্গে ছিল অন্যান্য রাজ অনুগতরা।

ঠিক সেই সময়ে পাঁচটা সোনার পদ্ম ভেসে যাচ্ছিল নদীর জলে। রাজার হুকুমে পাঁচটা পদ্মই জল থেকে তুলে আনল রাজভৃত্যরা।

বৈদ্যকে বললে রাজা, দেখুন তো এই পদ্মের উৎস কোথায়?

বলে, সদলবলে ফিরে গেল রাজভবনে।

পদ্ম যেদিক থেকে ভেসে এসেছিল, কবিরাজ তরুণচন্দ্র তৎক্ষণাৎ রওলা হয়েছিল সেইদিকে। নদীর তীর ধরে যেতে যেতে বেশ কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেয়েছিল একটা শিবঠাকুরের মন্দির। মন্দিরের সামনে একটা প্রকাণ্ড দীঘি। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। দীঘির পাড়ে একটা বিশাল বটের গাছ।

বটগাছের ডাল থেকে ঝুলছে একটা নরকঙ্কাল।

গাছতলায় বসে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়েছিল পরিশ্রান্ত কোবরেজ। তারপর স্নান সেরে নিয়েছিল সরোবরে।

পুজো করেছিল মহাদেবকে।

এরপর কী করা যায়?

ভাবনার মাঝেই নামল বৃষ্টি। কঙ্কালের গা বেয়ে বৃষ্টির জল টপ টপ করে সরোবরের জলে পড়তে না পড়তেই এক-একটা ফোঁটা পালটে গিয়ে হয়ে গেল এক-একটা সোনার পদ্ম।

কোবরেজ তো অবাক।

তারপর মাথায় এল একটা বুদ্ধি। কঙ্কালের গা বেয়ে বৃষ্টির জল যদি সরোবরে পড়েই সোনার পদ্ম হতে থাকে, এক-এক ফোঁটার এক-একটা স্বর্ণকমল, তাহলে আস্ত কঙ্কালটাকেই দীঘিতে ফেলে দেওয়া যাক। অভিনব ব্যাপার একটা ঘটবে। অগুন্তি সোনার পদ্ম জন্ম নেবে।
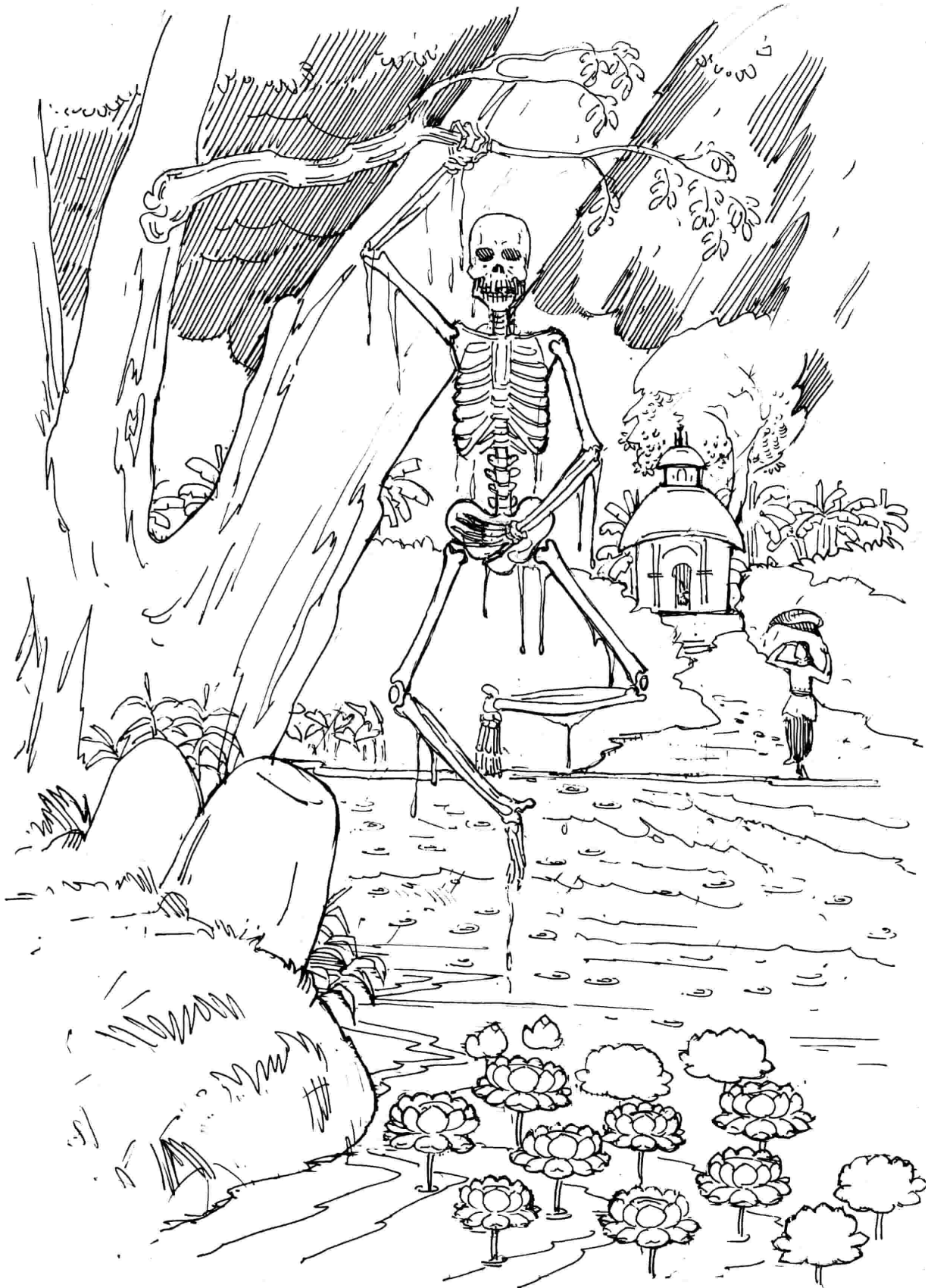
বটগাছের ডাল থেকে ঝুলছে একটা নরকঙ্কাল।

তাই করেছিল কোবরেজ। সেইদিন মন্দিরে কাটিয়ে পরের দিন বিলাসপুরে ফিরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল অজর রাজার সামনে, সবিনয়ে। নিবেদন করেছিল স্বর্ণকমল বৃত্তান্ত।

সব শুনে অজর রাজা বৈদ্যকে ডেকে নিয়ে গেল আড়ালে।

বললে, যে কঙ্কাল তুমি দেখে এসেছ, মনে হচ্ছে তা আমারই কঙ্কাল, আগের জন্মের। তপস্যা করেছিলাম, সিদ্ধিলাভ করেছিলাম, দেহত্যাগ করেছিলাম। সেই সিদ্ধির ফলেই আমার কঙ্কালের জল সোনা হয়ে যাচ্ছে সরোবরে পড়েই। আমি এজন্মে জাতিস্মর পূর্বজন্মের পুণ্যের ফলে। আমি জানি, আগের জন্মে তুমি আমার প্রকৃত হিতকামী বন্ধু ছিলে, এজন্মেও তাই হয়েছ। পূর্বজন্মের পুণ্যের ফলেই এজন্মেও তোমাকে বন্ধুরূপে পেয়েছি, সেই সঙ্গে পেয়েছি এই বিরাট সাম্রাজ্য। হে বন্ধু, সুতরাং তোমার মধ্যে যে অহং ভাব এসেছে, আমিই সব করেছি, এই অহঙ্কারে ফেটে পড়ছ, তা ত্যাগ করো। ভালো যা কিছু ঘটে, তা আগের জন্মের পুণ্যের ফলে। কর্মফল ভোগ করতেই হবে, সব প্রাণীকেই, সু অথবা কু।

বৈদ্যরাজের মনে আর কোনও ক্ষোভ থাকেনি এই কথা শোনবার পর।

কাহিনি শেষ করে তপন্তক বলেছিল রাজা নরবাহনদত্ত কে, মহারাজ, সবই পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে ঘটে চলেছে। আপনি রাজা হয়েছেন, আমরা আপনার প্রিয় বন্ধু, এর মূলে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকের আগের জন্মের ভালো কাজের পুরস্কার।

৪১. চিরায়ু কাহিনি

পরেরদিন রত্নপ্রভা আর মন্ত্রীদের সঙ্গে বসে গল্পগুজব করছে নরবাহনদত্ত, এমন সময়ে বাড়ির বাইরে শোনা গেল পুরুষের কান্না।

কে কাঁদছে?

রাজবাড়ির এক চাকর এসে বললে, ধর্মাগিরির ভাই ধর্মমিত্র। ধর্মগিরি ছিলেন বিচক্ষণ বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ। তীর্থ করতে গিয়ে মারা গেছেন। তাই শুনে কান্না জুড়েছিল ধর্মমিত্র। আত্মীয় স্বজন এসে এখুনি তাকে বাড়ি নিয়ে গেল।

যুবরাজের মন খুব নরম। বিমর্ষ হয়ে গেছিল খবরটা শুনে।

সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল রত্নপ্রভা, জন্ম নিলে একদিন মরতেই হবে। এজন্যে শোক কেন? ভগবান তো মানুষকে অমর করে সংসারে পাঠাননি।

বলে উঠল মরুভূতি পারিষদ, কথাটা ঠিক। কিন্তু শোক না করে থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

বলে, একটা চমৎকার গল্প বলে গেল মরুভূতি।

একটা নগর ছিল। নগরের নাম চিরায়ু, নগর অধিপতির নামও চিরায়ু। অর্থাৎ, মরণ নেই।

চিরায়ুর মন্ত্রী ছিলেন নাগার্জুন। দানবীর হিসেবে খ্যাত।

রসায়ন শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি থাকায় ওষুধ প্রয়োগে রাজার আর নিজের আয়ু প্রলম্বিত করেছিলেন নাগার্জুন।

কিন্তু নিজের প্রাণপ্রিয় ছেলে যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন নাগার্জুন রসায়ন দিয়ে অমৃত বানাতে গেছিলেন। বানানো শেষ করেও এনেছিলেন। শুধু একটা জ্যোতি নিক্ষেপ করা বাকি ছিল।

বলা বাহুল্য, তা স্বর্গীয় জ্যোতি। দেহে প্রবিষ্ট হবে লতার রূপ নিয়ে।

নাগার্জুনের এই কাণ্ড দেখে আঁৎকে উঠেছিলেন ইন্দ্র। তিনি তৎক্ষণাৎ তলব করেছিলেন স্বর্গের চিকিৎসক দুই অশ্বিনীকুমারকে। পাঠালেন মর্ত্যে, নাগার্জুনের বাড়িতে।

তাঁরা এসে বললেন নাগার্জুনকে, কী আশ্চর্য! মানুষ অমর নয়, অথচ অম্পনি তাকে অমর করতে যাচ্ছেন? মরণশীল মানুষ যদি অমর হয়ে যায়, তাহলে দেবতা আর মানুষে তফাৎ থাকবে কোথায়? দেবপুজো বন্ধ

হবে, দেবতারা আপনার ওপর খাপ্পা হবেন। বিধির বিধান উল্টোতে যাবেন না। আর এগোবেন না। আপনার ছেলে এখন স্বর্গে।

চৈতন্য হল নাগার্জুনের। বললেন ভাগ্যিস আপনারা এলেন। আর পাঁচদিন পরে এলে অমৃত তৈরি হয়ে যেত। যাক, ছেলে যখন স্বর্গে, তখন আর অমৃত প্রস্তুত করবো না।

এই বলে সমস্ত সরঞ্জাম পুঁতে ফেললেন মাটির মধ্যে।

দুই অশ্বিনীকুমার তৎক্ষণাৎ স্বর্গে ফিরে গিয়ে সুসংবাদটা দিলেন ইন্দ্রকে। নিশ্চিন্ত হলেন ইন্দ্র। কী সর্বনাশই করতে যাচ্ছিলেন নাগার্জুন। অমৃত বানিয়ে ফেললে স্বর্গে আর মর্ত্যে তফাৎটা থাকত কোথায়? দেবদেবীদের লম্ফঝম্প তো আর থাকত না। অমর মানুষদের ছেলেমেয়েরাও অমর হয়ে জন্মাত। অমরে অমরে ছেয়ে যেত মর্ত্য। কী সর্বনাশটাই না হতে যাচ্ছিল!

এদিকে রাজা চিরায়ু নিজের ছেলে জীবহরকে যুবরাজ করে দেওয়ার পর তার মা ধনপরা বললে ছেলেকে, যুবরাজ তো হলে, রাজা হবে কবে? তোমার বাবার বয়স এখন আটাশ বছর, আরও কত বছর বাঁচবেন, কেউ জানে না। তোমার রাজা হওয়া কবে ঘটবে, সেটাও কেউ বলতে পারবে না।

এখন উপায়? গালে হাত দিয়ে বসে পড়েছিল যুবরাজ। তার মা তখন একটা বিষম বুদ্ধি দিয়েছিল কানে কানে, নাগার্জুন যখন খেতে যান, তখন যে যা চায়, তাই দান করেন। তুমি গিয়ে চাও ওঁর মাথা। উনি তা দেবেন। আর, মরবেন। মহাশোকে রাজাও নিশ্চয় অক্কা পাবেন, নইলে বনে চলে যাবেন। তুমি হয়ে যাবে রাজা।

যেমন মা, তার তেমনি ছেলে! সেইদিনই নাগার্জুনের বাড়ি চলে গেল জীবহর, বসে রইল খাবার জায়গায়।

নাগার্জুন খেতে আসতেই চাইল তার মাথা।

নাগার্জুন তো অবাক। বললেন, কী আর্শ্চর্য! আমার রক্তাক্ত মাথা নিতে এতই যখন তোমার ইচ্ছে, তখন নিজেই কেটে নাও।

বলে, মুণ্ড বাড়িয়ে দিলেন নাগার্জুন।

কৃপাণের কোপ মারল জীবহর।

অত্যাশ্চর্য ব্যাপারটা দেখা গেল তখনই।

রসায়নের গুণে অতি-শক্ত নাগার্জুনের ঘাড়ে কৃপাণ লাগতেই খান খান হয়ে গড়িয়ে গেল মাটিতে!

জীবহর পরাস্ত হবার পাত্র নয়। এল নতুন কৃপাণ। ভাঙল সেটাও। এইভাবে পরপর নতুন নতুন কৃপাণ নাগার্জুনের ঘাড় কাটতে না পেরে যুবরাজের চোখ হল ছানাবড়া!

খবরটা ততক্ষণে পৌঁছে গেছে রাজার কানে। তিনি ছুটে এসেছেন। ধমক দিচ্ছেন ছেলেকে।

নাগার্জুন কিন্তু হাসি মুখে বললেন রাজাকে, রাজা, আমি জাতিস্মর। এর আগে নিরানব্বইটা জন্মে মুণ্ড দান করে এই অমৃত-রসায়ন প্রস্তুত প্রণালী অবগত হয়েছি। শততম মস্তক দান করার জন্যে আমি তৈরি, আপনাকে শেষ দেখা না দেখে যেতে পারছিলাম না। এইবার আমার মাথা কাটা যাবে।

বলে, একটা গুঁড়ো মাখিয়ে দিলেন যুবরাজের কৃপাণে।

বললেন, মারো কোপ!

রাজ্যলোভী রাজপুত্র কোপ মেরেছিল গায়ের সমস্ত জোর দুহাতে জড়ো করে।

নাগার্জুনের কাটা মুণ্ড গড়িয়ে গেছিল মাটিতে।

কান্নার রোল শোনা গেছিল অন্তঃপুরে।

মন্ত্রী-ই যখন চলে গেলেন, রাজার বেঁচে থাকার আর কী প্রয়োজন?

নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে যেই উদ্যোগী হলেন রাজা, অমনি তাঁকে নিরস্ত করার জন্যে শানা গেল আকাশবাণী, "আপনার মন্ত্রী সুকৃতির দৌলতে নবজন্মে নব কলেবরে মানুষের সেবা করে যাবেন, সুতরাং আপনি অযথা দেহত্যাগ করবেন না।''

ক্ষান্ত হলেন রাজা। কিছুদিন পরেই রাজ্য দিয়ে দিলেন রাজ্যলোভী পুত্রকে। নিজে চলে গেলেন অরণ্যে, মুনি আশ্রমে। তপস্যা অন্তে স্বর্গারোহণ করলেন।

কিন্তু কিছুদিন পরেই যা ঘটবার তা ঘটে গেল। জীবহর নিজের হাতে গলা কেটেছিল নাগার্জুনের। নাগার্জুনের ছেলেরা বদলা নিল জীবহরকে শমনসদনে পাঠিয়ে।

সংবাদ পেয়ে জীবহরের কুমন্ত্রণা-দেওয়া জননীও রওনা হয়ে গেল পরলোকে, পুত্রশোকে।

অনবদ্য এই কাহিনি শেষ করে বললে মরুভূতি, এই তো জীবন। অন্যায় পথে গেলে কখনোই কারও মঙ্গল হয় না। তাছাড়া, মৃত্যুকে এড়ানোও যায় না। মৃত্যুঞ্জয়ী রসায়ন স্রষ্টা নাগার্জুনও মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন। অতএব, মরণের বশ সকলেই।

৪২. পরিত্যাগসেনের কাহিনি

তারপর একদিন মৃগয়ায় বেরোল যুবরাজ নরবাহনদত্ত, রত্নপ্রভাকে প্রাসাদে রেখে। সঙ্গে গেল বাবা আর মন্ত্রীরা। আর, সৈন্যবাহিনী। রাজারাজরাদের শিকার করা মানেই তো এলাহি ব্যপার। যেন যুদ্ধজয় করতে যাওয়া হচ্ছে।

বুনো জন্তুদের তাড়া করে করে একসময়ে হেদিয়ে পড়েছিল যুবরাজ। বন্ধুবর গোমুখের সঙ্গে ঘুঁটি খেলা শুরু করেছিল এক জায়গায়। মহা উল্লাসে রাজকীয় কায়দায় ঘুঁটি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে দূরে দূরে। খেয়াল ছিল না একটু দূর দিয়ে গাছপাতার আড়ালে নিজেকে ঢেকে রেখে যাচ্ছেন এক যোগিনী। দীর্ঘ তপস্যার ফলে যাঁর বাকসিদ্ধি ঘটেছে। মুখ দিয়ে যে কথা বেরোয়, তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়। যুবরাজের হাত থেকে ছোঁড়া ঘুঁটি গিয়ে লেগেছিল তাঁর গায়ে।

হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, ওহে রাজতনয়, দেখছি বৈভব তোমাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন করে তুলেছে। তোমার বিয়ে হোক কর্পূরিকার সঙ্গে।

দুই বন্ধু ঘুঁটি খেলছিল ঘোড়ার পিঠে বসেই, ঠাটবাট বজায় রেখে। সাধারণ মানুষ মেঝেতে বসে ঘুঁটি চালে। সিদ্ধতাপসী তাই দেখেই আশীর্বাদ আর তিরস্কার যুগপৎ নিক্ষেপ করে গেছিল যুবরাজের দিকে।

তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে যোগিনীর কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়েছিল নরবাহনদত্ত।

মন যাঁদের উচ্চে, তাঁরা ক্ষমা করেন সহজে। যোগিনী তাই করলেন। আশীর্বাদ করলেন।

তখন জানতে চেয়েছিল নরবাহনদত্ত, কর্পূরিকা কে?

সন্ন্যাসিনী বললেন, কর্পূরসম্ভব রাজ্যের রাজকন্যা। তার বাবার নাম কর্পূরক।

কোথায় আছে এই রাজ্য?

সমুদ্রপারে।

কর্পূরিকা কী সুন্দরী?

অসাধারণ সুন্দরী। কিন্তু ভয়ানক নারীবাদী। পুরুষ জাতটাকে একদম সহ্য করতে পারে না। বিয়ের কথা শুনলেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। তাই, বর আর জুটছে না। তোমাকে দেখে মনে হল, তাকে বশে আনতে পারবে তুমি। আশীর্বাদটা করেছি ওই জন্যে। তাকে তুমি পাবেই।

ললনা যদি অপরূপা হয়, তাহলে এক লহমাও লাগে না তার পেছনে ধাবিত হতে, তা সে যত কুঁড়ের বাদশাই হোক না কেন। এবং সেই নারীরও পুরুষের ওপর যত বিদ্বেষই থাকুক না কেন।

সুতরাং কর্পূরিকার জন্যে উতলা হয়েছিল নরবাহন দত্ত।

তাই দেখে বলেছিল বন্ধু গোমুখ, ঘরে যার অমন দেবীর মতো স্ত্রী, তাকে ছেড়ে কোথাকার কে এক মেয়েছেলের নাম শুনেই সমুদ্র পেরিয়ে তার কাছে যাওয়ার এই তীব্র আকাঙ্খা অতিশয় অনুচিত।

যুবরাজের মাথায় তখন ভূত চেপেছে। যে নারী পুরুষ দেখলেই জ্বলে ওঠে, তাকে অঙ্কশায়িনী করার নেশায় আচ্ছন্ন হয়েছে।

সুতরাং সৎবাক্য সিকেয় তুলে রেখে তৎক্ষণাৎ ঘোড়া হাঁকিয়েছিল সমুদ্রপারের কর্পূর নগরের দিকে?

নিরুপায় গোমুখ, অভিন্নহৃদয় বন্ধু বলেই গেছিল যুবরাজের পেছন পেছন। প্রকৃত বন্ধুত্ব এমনই বস্তু, বন্ধুর মঙ্গলের জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দেওয়ার জন্যে মন প্রস্তুত থাকে।

রাজা কিছুই জানতে পারলেন না। ছেলে যে দৌড়েছে আর এক বউ অর্জনের অভিলাশে, তা তাঁর অজ্ঞাতই রইল। অনেকক্ষণ পরে যখন পুত্ররত্নের প্রত্যাবর্তন ঘটল না, তখন সসৈন্যে ফিরে এলেন কৌশাম্বিনগরে।

যুবরাজ নিখোঁজ, খবরটা কানে যেতেই ধ্যানে বসে গেছিল যুবরানি রত্নপ্রভা। অবগত হয়েছিল সমস্ত বৃত্তান্ত।

শ্বশুরকে জানিয়েছিল পুত্রের কীর্তি।

রত্নপ্রভা সাধারণ নারী ছিল না। স্বামী অন্য নারী সংগ্রহে ছুটছে জেনেও ঈর্ষায় জ্বলে মরেনি। বরং স্বামীর সাহায্যের জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছিল এক সহায়িকাকে। তার নাম মায়াবতী। বহু বিদ্যার অধিকারিণী।

যুবরাজের পেছন ধরে ফেলেছিল মায়াবতী, অক্লেশে, যুবরাজ যখন গোমুখসহ এক নিবিড় ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করেছে, মায়াবতী তখন এক কুমারীর রূপ ধারণ করে তার সামনে গিয়ে বললে, নির্ভয়ে এগোন। আমি আছি আপনার সঙ্গে। আমি মায়াবতী। জানি অনেক বিদ্যা। আমাকে পাঠিয়েছে আপনার প্রতিব্রতা স্ত্রী।

বলেই, অদৃশ্য হয়ে গেছিল মায়াবতী।

তার বিদ্যার প্রভাবে যুবরাজের ক্লান্তি চলে গেল, খিদে তেষ্টাও আর রইল না। মন নির্ভয়, শরীর মজবুত।

সবই রত্নপ্রভার পতিপ্রেমের প্রভায়। বিমুগ্ধ হয়েছিল যুবরাজ।

সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছে, দুই বন্ধু এসে পৌঁছোল এক সরোবর পাড়ে। জিরিয়ে নিয়ে, গাছের ফল খেয়ে, ঘুমিয়ে পড়ল গাছের ডালে।

ঘুম ভেঙে গেল একটু পরেই ঘোড়ার চেঁচামেচিতে।

সিংহ খাচ্ছে একটা ঘোড়াকে। প্রাণের ভয়ে চেঁচাচ্ছে আর একটা ঘোড়া।

গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে নেমে এসেছিল নরবাহনদত্ত, বন্ধুর নিষেধে কান দেয়নি। ছুরি মেরেছিল সিংহকে। ছুরি খেয়েও বনের রাজা বধ করেছিল অপর ঘোড়াটাকেও। তারপরেই নিহত হয়েছিল নরবাহনদত্তের দ্বিতীয় ছুরিকাঘাতে।

গাছে উঠে ফের ঘুমিয়ে পড়েছিল অমিতবিক্রম যুবরাজ।

পরের দিন ভোর হতেই ফের শুরু হয়েছিল কর্পূরিকা অভিযান, এবার পায়ে হেঁটে।

যেতে যেতে একটা গল্প বলেছিল গোমুখ।

রাজা পরিত্যাগসেন রাজত্ব করতেন ইরাবতী নগরে। তাঁর দুই বউ। একজন ছিল রাজমন্ত্রীর মেয়ে। তার নাম অধিকসঙ্গমা। আর একজন এক রাজার মেয়ে। তার নাম কাব্যালঙ্কারা।

দুজনেই নিঃসন্তান।

বিষণ্ণ পরিত্যাগসেন পুত্রকামনায় অম্বিকাদেবীর আরাধনা করেছিলেন। তিনি সশরীরে রাজার সামনে এসে তাঁকে দুটি ফল দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, দুই বউ একটা করে ফল খেয়ে নিক। ছেলে হবেই।

আনন্দে নেচে নেচে রাজা পরিত্যাগসেন সেই রাতেই একটা ফল অধিকসঙ্গমাকে খাইয়ে দিলেন। অন্য ফলটা বালিশের নীচে রেখে অধিকসঙ্গমার পাশে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ধড়িবাজ অধিকসঙ্গমা সেই ফল নিজেই খেয়ে নিল। উদ্দেশ্য : সতীন হোক বন্ধা, নিজে হোক দুই ছেলের মা!

সকাল হল। বালিশের তলা হাতড়ে ফল পেলেন না রাজা। একগাল হেসে অধিক সঙ্গমা তাঁকে বললেন, এক সঙ্গমেই দুদুটো ছেলে পাবে তুমি আর আমি। দুঃখ কীসের?

অধিকসঙ্গমার সঙ্গে অধিক কথা বলা বাঞ্ছনীয় নয়। বিষাদমগ্ন রাজা মহিষী কাব্যালঙ্কারাকে গিয়ে সব বললেন।

গম্ভীর হয়ে গেল কাব্যালঙ্কারা।

যথা সময়ে যমজ পুত্র হল অধিকসঙ্গমার।

বড়ো ছেলের নাম রাখা হল ইন্দিবরসেন।

ছোটো ছেলের নাম হল অনিচ্ছাসেন। কেন এমন অদ্ভুত নাম? নামকরণের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রইল অধিকসঙ্গমার কুকর্মের ইতিহাস। রাজার অনিচ্ছায় ফল চুরি করে খেয়েছিল যে!

এদিকে বিকার দেখা দিল কাব্যালঙ্কারার মনের মধ্যে। সতীনের দুইছেলে যতই বড়ো হচ্ছে, ততই ঈর্ষা বাড়ছে তার মনের মধ্যে, এমনকি ছেলে দুটিকে প্রাণে মেরে দেওয়ার ইচ্ছেও রইল মাথায়।

ছেলেদের গায়ে যখন বেশ জোর হয়েছে, অহঙ্কারে ফেটে পড়ছে, তখন একদিন দুজনেই রাজার কাছে গিয়ে বললে, এবার যুদ্ধে বেরোন যাক, দিকে দিকে যুদ্ধ চালিয়ে পরদেশ জয় করা যাক।

অনুমতি দিলেন রাজা। সেইসঙ্গে বলেছিলেন, যখনই কোনও সংকটে পড়বে, অম্বিকাদেবীকে স্মরণ করবে। তোমরা তাঁর ইচ্ছায় ধরায় এসেছ।

অধিকসঙ্গমার বাবাকে বললেন, নাতিদের সঙ্গে যেতে। তিনি তো তাঁরই প্রধানমন্ত্রী। নাম, সঙ্গমক।

পুবদিক জয় করা হয়ে গেল। এবার দক্ষিণদিক। দেশের পর দেশ জয় করতে করতে যাচ্ছে দুই ছেলে। সেই খবর যতই শুনছেন রাজা আর তাঁর অধিকসঙ্গমা রানি, ততই তাঁরা আহ্লাদে ফেটে পড়ছেন। কিন্তু সমান অনুপাতে বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে বিমাতা কাব্যালঙ্কারা।

বিমাতার মন তো! ঈর্ষার তুষানলে দগ্ধ হতে হতে একদিন ঠিক করল, মেরেই ফেলা যাক ছেলে দুটোকে। রাজার সীলমোহর মেরে গুপ্ত চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিল সৈন্য শিবিরে। সেনাপতিদের জানানো হয়ে গেল, অবিলম্বে যেন ছেলে দুটোকে খতম করে দেওয়া হয়। কেননা, ওদের মতলব ভালো নয়। দেশজয় সাঙ্গ করার পর ধরাধাম থেকে সরাবে বিমাতা কাব্যালঙ্কারকে, তৎসহ স্বয়ং রাজা'কে।

কিন্তু বিধি বাম হলে সব ষড়যন্ত্রই বিফলে যায়। চিঠিখানা সেনাপতিদের হাতে গেল বটে, তারাও দুই রাজপুত্রকে যমালয়ে পাঠাবার জন্যে যখন আঁটঘাট বাঁধছে, খবরটা চলে গেল দুই রাজপুত্রের কানে, তাদের এক বিশ্বস্ত অনুচর মারফৎ।

ভয়ার্ত দুই রাজপুত্র সেই রাতেই চম্পট দিল সৈন্যশিবির থেকে, দাদামশাইকে সব জানিয়ে, তার পরামর্শ নিয়ে, তাকে সঙ্গে নিয়ে।

গভীর রাতে ঢুকল বিন্ধ্য-জঙ্গলে। ভোর হল, আরও ঢুকে গেল অরণ্য মধ্যে, প্রানের ভয়ে।

দুপুর নাগাদ মারা গেল বুড়ো দাদু, খিদে আর তেষ্টা সইতে না পেরে। হেদিয়ে পড়ল ঘোড়াগুলোও।

ক্লান্ত ছেলেদুটি তখন স্মরণ করেছিল অম্বিকাদেবীকে, বিন্ধ্যের অরণ্যে যাঁর অধিষ্ঠান, সংকটকালে যাঁকে স্মরণ করতে শিখিয়েছিল পিতৃদেব।

মনে মনে তাঁকে ডাকতেই খিদেতেষ্টা দূর হয়ে গেল ছেলে দুটির। কিন্তু আরাধনায় নিবৃত্তি রইল না।

রাজার নামাঙ্কিত পত্র পেয়ে সেনাপতিরা দুই রাজপুত্রকে নিকেশ করার জন্যে তাদের তাঁবুতে ঢুকে দেখতে পেয়েছিল, কেউ নেই, লম্বা দিয়েছে দুজনেই।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দল বেঁধে গেছিল রাজার কাছে। তারা তো জানে, পুত্র দুজনকে হত্যা করবার হুকুম দিয়েছেন রাজা স্বয়ং।

সব শুনে তো আকাশ থেকে পড়লেন রাজা পরিত্যাগসেন। এ তো জাল চিঠি। তিনি তো লেখেননি!

প্রচণ্ড রেগে গিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দিলেন পত্রবাহককে, আর কুচক্রী পত্নীকে ফেলে দিলেন একটা পাতালঘরে। যারা যারা ষড়যন্ত্র করেছিল রাজপুত্রদের খতম করার, তাদেরকে প্রাণে মেরে দিলেন। তারপর রানি অধিকসঙ্গমাকে সঙ্গে নিয়ে বিরাট সৈন্যবাহিনী সমেত বেরোলেন দুই রাজপুত্রের অন্বেষণে।

ইতিমধ্যে রাজপুত্র দুজনের আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিলেন অম্বিকাদেবী স্বপ্নের মধ্যে। একটা খাঁড়াও দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ধারালো এই খাঁড়ার প্রভাবে দুজনেই সবকাজেই সফল হবে।

ঘুম ভেঙে গেছিল রাজকুমার ইন্দিবরসেনের। হাতের মুঠোয় ঝকমকে খড়্গ দেখে তো স্তম্ভিত। বিন্ধবাসিনী অম্বিকাদেবী কৃপা করে গেছেন!

ছোটো ভাই-অনিচ্ছাসেনকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেখাল সেই খাঁড়া।

তারপর, ফলমূল খেয়ে বেরিয়ে পড়ল দুই ভাই। বহু হেঁটে, পৌঁছোল সোনা দিয়ে তৈরি এক শহরে। কিন্তু তোরণে দাঁড়িয়ে যে এক রাক্ষস প্রহরী।

অকুতোভয় দুই ভাই সটান তাকেই জিজ্ঞেস করে বসল, নাম কী এই সোনা-শহরের? রাজাই বা কে? শহরে ঢোকবার পথ কোনখানে?

প্রহরী বললে, মৌলপুর এই স্বর্ণনগরীর নাম, রাজার নাম যমদংষ্ট্র। ঢোকবার পথ এই তোরণ।

কালবিলম্ব না করে ইন্দিবরসেন খড়্গ চালনা করেছিল তৎক্ষণাৎ। প্রহরীকে কচুকাটা করে ঢুকেছিল নগরে। রাজপ্রাসাদে গিয়ে দেখেছিল ভীষণদর্শন যদদংষ্ট্র আয়েশ করে বসে সিংহাসনে, দুই পাশে অপরূপা রমণী। ইন্দিবরসেন খড়্গ চালিয়ে যমদংষ্ট্রের মুণ্ড কেটে মাটিতে যতবার ফেলে দিয়েছে, ততবারই মুণ্ড নিজে থেকে লাফিয়ে উঠে যমদংষ্ট্রের ঘাড়ে লেগে যাচ্ছে দেখে যখন হতভম্ব হয়েছে ইন্দিবরসেন, তখন যমদংষ্ট্রের ডান পাশে আসীন কুমারী কন্যা ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়েছিল, মাটিতে কাটা মুণ্ড ছিটকে গেলেই যেন এক কোপে দুটুকরো করে ফেলা হয়।

তাই করেছিল ইন্দিবরসেন।

এবং, অক্কা পেয়েছিল যমদংষ্ট্র।

ইন্দিবরসেন তখন শুধিয়েছিল সুন্দরী সেই কন্যাকে, কে তুমি? যমদংষ্ট্র নিধনের উপায় বাতলে দিলে কেন?

কুমারী কন্যা বললে, ওই ওদিকে যে বসে আছে, ও হল গিয়ে আমার দিদি। ওর নাম মদনদংষ্ট্রা। এই নগরের বীরভুজ রাজার বউ। বদমাস যমদংষ্ট্র জামাইবাবুকে খতম করে, আমার দিদিকে বউ বানিয়ে রেখেছিল। আমার নাম খড়্গাদংষ্ট্রা। আপনার প্রেমে পড়েছি। জামাইবাবু বেঁচে থাকলে আপনাকে বিয়ে করতে দিত না। তাই মরণ-পন্থা বাতলে দিয়েছি। এবার আমাকে বিয়ে করুন।

মালাবদল করে তৎক্ষণাৎ সুন্দরীকে বিয়ে করে নিয়েছিল ইন্দিবরসেন এবং পরমসুখে থেকে গেছিল সোনাশহরে।

দিন কয়েক পরে খড়্গ দংষ্ট্রাকে তুষ্ট করে বিমান শক্তি বানিয়ে ছোটোভাই অনিচ্ছাসেনকে বাবা আর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল ইন্দিবর সেন, সুসংবাদ শুনিয়ে তাঁদের নিশ্চিন্ত করার জন্যে।

ইন্দিবরসেন বিয়ে করে সোনার শহরে সুখে আছে শুনে খুশি হয়েছিল তার বাবা আর মা। অনিচ্ছাসেন থেকে গেছিল সেখানেই।

কিছুদিন পরেই কিন্তু দেখল একটা দুঃস্বপ্ন। বাবাকে বললে, দাদাকে আনা দরকার, এখানে। তার মহাবিপদ চলছে।

বাবা তৎক্ষণাৎ আকাশ পথেই অনিচ্ছাসেনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সোনাশহরে। সেখানে গিয়ে ছোটোভাই দেখেছিল, বড়দা অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে রয়েছে, দুপাশে বসে ছোখের জল ফেলছে দুই বোন। খড়্গ রয়েছে অগ্নিকুণ্ডে।

ব্যাপারটা জানা গেল অচিরে। খড়্গাদংষ্ট্রা তো ইন্দিবরসেনের বিয়ে করা বউ। সেই সম্পর্কে মদনদংষ্ট্রা ইন্দিবরসেনের শ্যালিকা। ফাউগিন্নি। একদিন এই দুজনকে পাশাপাশি বসিয়ে সরস আলাপে রেখে মদনদংষ্ট্রা গেছিল স্নান করতে। ফিরে এসে দেখেছিল, দিদির সঙ্গেই সঙ্গম করছে স্বামী, দিদির প্ররোচনায়।

ভীষণ রেগে গিয়ে মদনদংষ্ট্রা বুদ্ধি নিয়েছিল ঈর্ষারাক্ষসীর কাছে। দেবী অম্বিকার দেওয়া খড়্গ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল আগুনে। তৎক্ষণাৎ জ্ঞান হারিয়েছে ইন্দিবরসেন, কিন্তু মরেনি। এখন মদনদংষ্ট্রার অনুতাপ হয়েছে। নিজেই নিজেকে মারবে ঠিক করেছে। কিন্তু অনিচ্ছাসেন যখন এসে গেছেন, তখন প্রাণ যাক স্বামীর হাতে।

এই সময়ে শোনা গেল দৈববাণী। বলছেন দেবী অম্বিকা, খড়্গাদংষ্ট্রা নির্দোষ। ও তো জানে না, আগের জন্মে ইন্দিবরসেনের দুই বউ ছিল, মদনদংষ্ট্রা আর খড়্গাদংষ্ট্রা! ইন্দিবরসেনের জ্ঞান ফিরে আসবে আগুন থেকে খড়্গ তুলে নিলে।

দেবী অম্বিকার দেওয়া খড়্গ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল আগুনে। তৎক্ষণাৎ জ্ঞান হারিয়েছে ইন্দিবরসেন, কিন্তু মরেনি।

আগুন থেকে খড়্গ তুলে নিয়েছিল অনিচ্ছাসেন। তারপর দাদা আর দুই বৌদিকে নিয়ে ফিরে এসেছিল ইরাবতী নগরে বাবা আর মায়ের কাছে।

কিছুদিন পরে পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে গেছিল ইন্দিবরসেনের। বাবা আর মাকে বলেছিল, আমি ছিলাম বিদ্যাধর। বিয়ে করেছিলাম বিদ্যাধরী সূর্যপ্রভা আর তার সহচরী পদ্মাসেনকে। কিন্তু এত কোঁদল করতদুজনে যে আমি বনে চলে যেতে চেয়েছিলাম। আমার বাবা রেগে গিয়ে বলেছিলেন, তার চাইতে মর্ত্যে যা। এই দুই বউ নিয়ে সেখানেও সংসার কর। তারপর ফের হবি বিদ্যাধর, ওরাও হবে বিদ্যাধরী। সময় হয়েছে, এখন আমরা চললাম।

বলেই, ইন্দিবরসেন আর তার দুই বউ নবকলেবর ত্যাগ করে বিদ্যাধরদেহ গ্রহণ করে চলে গেল স্বস্থানে।

কাহিনী শেষ করে গোমুখ বললে, যুবরাজ, দুই বউ যার, সে যত ভালো মানুষই হোক না কেন, কষ্ট পায় বিলক্ষণ। সতীনরা বড়ো জ্বালায়। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে দেখছি বিপরীত ব্যাপার। বউ নিজেই সতীন লাভের পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে।

৪৩. কর্পূরিকা কাহিনি

পরের দিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই যুবরাজ বললে গোমুখকে, হে বন্ধু, কাল রাতে এক দেবকন্যা স্বপ্নে দেখা দিয়েছিল। বললে, রাজকুমারী কর্পূরিকাকে পেতে আর দেরি নেই।

খুশি হল গোমুখ, দেবলোক থেকে যখন আপনাকে অভয় দিয়ে যাচ্ছে, তখন অভীষ্ট সিদ্ধি হবেই।

স্বপ্নদর্শনের দিনকয়েকের মধ্যে সমুদ্রের ধারে পৌঁছে গেছিল যুবরাজ। আশ্চর্যসুন্দর এক নগর সেখানে।

পায়ে পায়ে ঢুকেছিল ভেতরে। দেখেছিল একটা সাততলা সোনার রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের ভেতরে মণিমাণিক্যে ঝলমলে সিংহাসনে বসে এক পুরুষ।

যুবরাজকে দেখেই শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে অনুরূপ আর একটা মণিময় সিংহাসনে যুবরাজকে বসতে দিয়েছিল সেই সুন্দর পুরুষ।

জিজ্ঞেস করেছিল যুবরাজকে, কী আশ্চর্য! এখানে মানুষ আসতে পারে না। আপনি এলেন কী করে?

সবিস্তারে আপন কাহিনি নিবেদন করে যুবরাজ সবিনয়ে বক্তার পরিচয় আর এই সুবর্ণনগরী নির্মাণের বিশদ বিবরণ জানতে চেয়েছিল।

সুন্দর পুরুষ তখন বলেছিল, কাঞ্চীপুর নামে একটা নগর আছে। বাহুবল ছিলেন সেখানকার রাজা। আমরা দুভাই থাকতাম সেখানে। জাতে আমরা ছুতোর। কাজ করি ময়দানবের মতো দক্ষতা নিয়ে। আমর বড়দা বড্ড বেশি বারনারী বিলাসী হয়ে উঠেছিল। তার নাম প্রাণধর। আমার নাম রাজ্যধর। বারনারীর পেছনে নিজের সব টাকা উড়িয়ে দিয়ে আমার রোজগার করা টাকাপয়সাও শেষ করে দেওয়ার পর ফতুর হয়ে গেছিল দাদা। অথচ বেশ্যা আসক্তি যায় না। চাই টাকা.....আরও টাকা। তখন মাথা খাটিয়ে দুটো কাঠের হাঁস বানিয়েছিল। দড়ি ধরে টেনে সেই হাঁস যুগলকে যা খুশি করানো যায়। রাত্রি নিশীথে হাঁস দুটোকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল রাজার অন্তঃপুরে, জানলার ভেতর দিয়ে, দড়ির টানে ডানা নেড়ে নেড়ে তারা ভেতরে ঢুকে অন্তঃপুর থেকে দামি দামি গয়না ঠোঁটে করে তুলে এনে দিয়েছিল দাদাকে। এইভাবে জড়োয়া গয়না লুঠ চলেছিল প্রতি রাতে। দাদা সব বেচে দিয়ে বারাঙ্গনা আরাধনা করে চলেছিল। আমার কথায় কর্ণপাত করেনি।

রাজভাণ্ডারে গয়না কমে যাচ্ছে দেখে ভাণ্ডার-রক্ষক গোপনে তদন্ত করেছিল। কিন্তু হদিশ পায়নি। রত্নভাণ্ডারের দরজা বন্ধ বাইরে থেকে, অথচ ভেতরের অলঙ্কার যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

বিমূঢ় ভাণ্ডার-রক্ষক বিষয়টা রাজাকে জানিয়েছিল।

রাজা বিশেষ প্রহরী মোতায়েন করলেন ভাণ্ডারে। তারা সারারাত জেগে রইল। সবিস্ময়ে দেখল, গভীর রাতে দুটো কাঠের হাঁস জানলা দিয়ে উড়ে এসে ভেতরে ঢুকল। দরি ধরে টেনে টেনে তাদের ওড়ানো হচ্ছে, ঠোঁটে করে দামি দামি গয়না তুলছে, দড়ির টানে জানলা দিয়ে উড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

তৎপর গোয়েন্দারা একেবারে বেরিয়ে যেতে কিন্তু দিল না হাঁস-যুগলকে। দড়ি কেটে দিয়ে দুই কাষ্ঠ-হংসকে বগলদাবা করে পরের দিন সকালে নিয়ে গেল রাজার কাছে।

কাটা দড়ি ঢিলে হয়ে খসে পড়তেই দাদা দৌড়ে এসেছিল আমার কাছে।

শশব্যস্তে বলেছিল, কাল সকালেই নিশ্চয় রাজার লোক এসে গ্রেপ্তার করবে তোকে আর আমাকে। চল, পালাই এখুনি। কাঠের উড়ুক্কু যন্ত্র তো বানিয়েই রেখেছি। তুইও একটা বানিয়েছিস। এক-এক রাতে চারশো বত্রিশ ক্রোশ উড়ে যাবে। তুই আয়, আমি চললাম।

বলে, আমাকে ফেলে রেখেই দাদা উড়ে গেল উড়ুক্কু যন্ত্রে চেপে।

গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে আমিও আমার কাঠের বিমানে চেপে চম্পট দিলাম আকাশ পথে।

একটানা আটশো ক্রোশ উড়ে এসে, একটু জিরিয়ে নিয়ে ফের উড়ে গেলাম আরও আটশো ক্রোশ।

এলাম একটা সমুদ্রের তীরে। একটু হাঁটতেই দেখতে পেলাম এই রাজবাড়ি। নগরে কেউ নেই, রাজবাড়িতেও কেউ নেই। এ তো বড়ো আশ্চর্য। এত ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত ছিলাম যে ওই নিয়ে আর ভাবিনি। রাজ দীঘিতে স্নান করে, রাজবাগান থেকে ফল পেড়ে নিয়ে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম রাজশয্যায়।

ঘুমের মধ্যে দেখলাম ময়ূরে চেপে স্বয়ং কার্তিক এসেছেন আমার কাছে। বলছেন, এখানেই থাকো, আর কোথাও যেও না। খিদে পেলে মাঝের বাড়িতে যাবে, খাবার পাবে।

ঘুম ভেঙে গেল। ভেবে দেখলাম, এই আশ্চর্য শহর আর অত্যাশ্চর্য রাজপ্রাসাদ নিশ্চয় কার্তিক নিজে বানিয়েছেন।

খিদে পেতেই চলে গেলাম মাঝের বাড়িতে। কী আশ্চর্য! সোনার থালা ভর্তি ভালো ভালো খাবার উড়ে এল আমার সামনে।

এইভাবে চলল রোজ। কিন্তু দাসদাসী তো দরকার, সেবার জন্যে। তাই কলের মানুষ বানিয়ে নিলাম দেদার। খুব ক্লান্ত আপনি। অনেকটা পথ উড়ে এসেছেন। এখন জিরোন। এইখানেই থাকুন। আর কোথাও যেতে হবে না।

যুবরাজ বন্ধুবরগোমুখকে নিয়ে বাগানে গেল রাজ্যধরের সঙ্গে। দীঘিতে স্নান সেরে নিয়ে গেল মাঝের বাড়িতে। সোনার থালাভর্তি খাবারদাবার উড়ে এল তিনজনের জন্যেই। খেয়েদেয়ে নিপাট নিদ্রা দেওয়ার জন্যে শয্যাগ্রহণ করেও ঘুমোতে না পেরে কর্পূরিকা প্রসঙ্গ তুলেছিল যুবরাজ।

রাজ্যধর বলেছিল, তাহলে একটা গল্প শুনুন।

কাঞ্চীপুরের রাজা বাহুবলের এক দ্বারপাল ছিল। তার নাম অর্থলোভ। স্বভাবের দিক দিয়েও সে প্রচণ্ড অর্থলোভী। আরও টাকাপয়সার জন্যে বাণিজ্য শুরু করেছিল। ব্যবসা সংক্রান্ত কেনা বেচার সমস্ত দায়িত্ব দিয়েছিল স্ত্রী মানপরাকে। তার মিষ্টি কথা আর মিষ্টি রূপে বেশি রোজগার হবে বলে। ভালো লাগতো না মানপরার। তবুও করে যেত স্বামীকে সুখী করার জন্য। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। রোজগার বেড়েই চলেছিল অর্থলোভের।

ঘরের বউকে রোজগারের পথে নামালে একটা না একটা অঘটন ঘটে। অর্থলোভের কপালেও পড়ল শনির ছায়া।

সুখধর নামে এক ব্যবসায়ী বিশ হাজার ঘোড়া আর বিস্তর চৈনিক বস্ত্র নিয়ে এসেছিল কাঞ্চীপুরে। অর্থলোভে বউকে বললে, যাও, যাও, সুখধরের কাছে যাও। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ঢং-টং দেখিয়ে পাঁচ হাজার ঘোড়া আর দশ হাজার চৈনিক কাপড়ের দাম জিজ্ঞেস করো। সে বেটা নিশ্চয় দাম কমিয়ে বলবে তোমাকে, কম দামে কিনে নিয়ে বেশি দামে বেচে দেব রাজাকে।

কী আর করে মানপরা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সওদা করতে গেল ধুরন্ধর বণিক সূত্রধরের কাছে।

সূত্রধর ঝানু ব্যবসাদার। কিন্তু মানপরাকে দেখে নিতান্তই কামার্ত হয়ে লাভ-লোকসানের ব্যাপারটাই উড়িয়ে দিল মগজ থেকে।

সটান বললে মানপরাকে, দাম দিতে হবে না, যা চাচ্ছ তাই পাবে, কিন্তু একরাত কাটিয়ে যাও আমার সঙ্গে।

মানপরা বললে মধুর বচনে, আমি তো স্বামীর অধীন। সে পয়সা পিশাচ। তবু তার অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন।

অর্থলোভ বণিকের কুপ্রস্তাব শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললে, যাও, যাও, এখুনি যাও। একটা রাত তাকে রতিসুখ দাও, সকাল হলেই চলে এসো ঘোড়া আর বস্ত্র নিয়ে।

এই স্বামী! অর্থলোভে পরপুরুষের কোলে ঠেলে দেয়!

আর ওই বণিক! হেলায় বাণিজ্যের ক্ষতি করতে চায় শুধু তাকে ভালো লেগেছে বলে।

তুলনায় তো এই বণিকই শ্রেষ্ঠ, অধম পুরুষ তার স্বামী।

চলে গেল মানপরা বণিকের কাছে। সঙ্গমসুখ পাওয়ার আগেই বণিক মূল্যবাবদ ঘোড়া আর চিনা-বস্ত্র পাঠিয়ে দিল অর্থলোভকে।

পরের দিন সকালে অর্থলোভ চাকর পাঠাল বউকে নিয়ে আসার জন্যে।

বউ এল না।

টাকার জন্যে যে তাকে বিক্রি করেছে, তার কাছে আর সে যাবে না। টাকা দিয়ে যে তাকে কিনেছে, তার কাছেই থাকবে, তার বউ হয়ে।

মাথা হেঁট করে চাকর ফিরে এসে প্রভুপত্নীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করল অর্থলোভকে।

রেগে টং অর্থলোভ যখন গায়ের জোরে মানপরাকে ফিরিয়ে আনার মতলব আঁটছে, তখন তার বন্ধু হরবল বললে, ভুল করছো। বউ পাঠিয়ে বাণিজ্য করতে গিয়ে এমনিতেই হীন কাজ করেছো। লোকসমাজে হেয় হয়েছো। শক্তিময়ী বউ শক্তিমান বণিকের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে বণিকের শক্তি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। বউকে বিক্রি করে আবার ছিনিয়ে আনতে গেলে ধনেপ্রাণে মরবে। রাজা তোমাকে শেষ করবেন।

ঘাড়ে ভূত চাপলে সুবাক্য মাথায় ঢোকে না। সৈন্যসামন্ত নিয়ে অর্থলোভ বণিক-আবাস ঘিরে ফেলেছিল।

কিন্তু হেরে ভূত হয়ে গেছিল সুখধরের সৈন্যবলের সামনে।

তাতেও সুবুদ্ধি হয়নি অর্থলোভের। নালিশ ঠুকেছিল রাজার কাছে। রাজা বিশ্বাসী লোক পাঠিয়ে তদন্তের হুকুম দিলেন।

রাজদূত সূত্রধরের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলতেই বণিক সূত্রধর তৎক্ষণাৎ মানপরাকে ফিরে যেতে বললে স্বামীর কাছে। রাজাকে সে চটাতে চায় না।

কিন্তু মানপরা গেল না। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল রাজদূতের সামনে। যে-মানুষটা বউ বিক্রি করেছে, তার কাছে বেচে-দেওয়া বউ আর যাবে না। যে কিনেছে, তার কাছেই থাকবে।

রাজদূতের মুখে সব শুনে রাজা নিজে গেলেন মানপরাকে দেখতে। অবাক হলেন তার রূপের ছটা দেখে।

মানপরার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। থাকুক সে বণিকের বউ হয়ে।

অর্থলোভ বললে, তাহলে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হোক আমার সঙ্গে বণিকের। যে জিতবে, মানপরা তার ভোগে লাগবে।

হল যুদ্ধ, ঘোড়ার পিঠে চেপে। হেরে গেল অর্থলোভ।

রাজা রায় দিলেন। মানপরা থাকবে বণিকের কাছে।

সেইসঙ্গে কেড়ে নিলেন অর্থলোভের সমস্ত বিষয়সম্পত্তি টাকাপয়সা। পথের ফকির করে দিলেন পয়সা পিশাচকে।

গল্প শেষ করে বললে রাজ্যধর, তাহলেই দেখুন, রমণীরা দুর্বলকে ত্যাগ করে, সবলকে আঁকড়ে ধরে। আপনিও পাবেন কর্পূরিকাকে, নিজের জোরে।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই রাজ্যধরের বায়ুবিমানে চেপে যুবরাজ রওনা হল কর্পূরিকা অন্বেষণে। সাগর পেরিয়ে এল একটু পরেই। পৌঁছে গেল কর্পূরসম্ভব নগরে। গোমুখকে নিয়ে বিমান থেকে নেমে নগরে ঢুকে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে পৌঁছে গেল রাজবাড়ির সামনে।

কিন্তু রাজবাড়িতে ঢুকল না। গেল কাছেই এক বুড়ির বাড়িতে। একটু জিরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো রাজভবন-বৃত্তান্ত।

যুবরাজের সুন্দর চেহারা দেখে বুড়ির ভালো লেগেছিল। বললে, দ্যাখো বাবা, এই নগরের রাজা কর্পূরসেন নিঃসন্তান ছিলেন। মহিষী বুদ্ধিকার্যাকে নিয়ে মহাদেবের উপাসনা করেছিলেন। শিবের বরে তাঁদের একটি কন্যা সন্তান হয়। তার নাম কর্পূরিকা।

বিয়ের বয়সে এসে কর্পূরিকা বিয়েই করতে চাইল না।

আমার মেয়ে একদিন তাকে কারণটা জিজ্ঞেস করেছিল। পতি পাওয়া সব নারীরই পরম পাওয়া। সে পতি চায় না কেন?

কর্পূরিকা বলেছিল, আমি যে জাতিস্মরা। বিয়েতে তাই অনিচ্ছা। শোনো আমার পূর্বজন্ম কাহিনি।

এই সাগরের তীরে আছে একটা বিরাট চন্দন গাছ। কাছেই আছে একটা পদ্ম-সরোবর। আমি সেখানে হাঁস হয়েছিলাম। কর্মফলে। আমার স্বামী ছিল, চন্দনগাছের বাসায় সুখে ছিলাম। বেশ কয়েকটা বাচ্ছাও হয়েছিল। একদিন সমুদ্রের বিরাট ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গেল সব কটা বাচ্চাকে।

শাবক-শোকে আমি অধীর হয়েছিলাম। কাঁদছিলাম একটা শিবলিঙ্গের সামনে। আমার রাজহংস স্বামী এসে বললে, কেন কাঁদছো? আমরা বেঁচে থাকলে এরকম আরও কত বাচ্ছা হবে।

পুরুষ এত নিষ্ঠুর? পেটের বাচ্ছার জন্যেও কাতর হয় না?

পরজন্মে যেন আর বিয়ে না করতে হয়, এই ইচ্ছে মনে নিয়ে সমুদ্রে ডুবে আত্মহত্যা করেছিলাম।

এজন্মে তাই পুরুষের ওপর আমার এত বিদ্বেষ। বিয়ে আর নয়।

কাহিনি শেষ করে বুড়ি বললে, আগের জন্মের রাজহংসী এজন্মের রাজকন্যা, ওই কর্পূরিকা। কিন্তু বিয়ে তার হবেই, সেই রকমই দৈববানি আছে, সেরা বিদ্যাধরের সঙ্গে। আপনার শ্রীঅঙ্গে সেরা বিদ্যাধরের সমস্ত লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। ঈশ্বরই আপনাকে আনিয়েছেন, আর এ বিয়ে হবেই। আপনি এখানেই অবস্থান করুন, আমার বাড়িতে।

পরের দিন সকালে বন্ধু গোমুখকে সঙ্গে নিয়ে, রাজবাড়ির সামনে গিয়ে, 'হায় রাজহংসী হায় রাজহংসী' বলে বিলাপ করতে লাগল নরবাহনদত্ত।

ভিড় জমে গেল তৎক্ষণাৎ। কর্পূরিকার সখীরাও বেরিয়ে এল রাজবাড়ি থেকে। কন্দর্পকান্তি নরবাহন দত্ত কে দেখে মোহিত হল প্রত্যেকেই। অবাক হল 'হায় রাজহংসী' বিলাপ শুনে।

অন্তঃপুরে ফিরে গিয়ে বর্ণনা দিল নরবাহনদত্তের অপূর্ব কান্তি আর অদ্ভুত বিলাপের, 'হায় রাজহংসী' ছাড়া মুখে কোনও কথা নেই। এ আবার কী? এমন সুন্দর মানুষটা এক রাজহংসীর জন্যে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে কেন?

খটকা লাগল রাজকন্যার। আগের জন্মে সে ছিল রাজহংসী। তার বর ছিল এক রাজহংস। এ জন্মে মানুষ হয়ে আগের জন্মের রাজহংসীকে খুঁজছে নাকি, শাবক-শোকে অধীর হয়ে যে করেছিল আত্মহত্যা?

গোমুখ আর নরবাহনদত্তকে রাজবাড়ির মধ্যে ডাকিয়ে আনল এক সখীকে দিয়ে...

এবং, মোহিত হল যুবরাজের অনিন্দ্য রূপ দেখে। স্মরণে এল দৈবাদেশ, বিয়ে তার হবেই সেরা বিদ্যাধরের সঙ্গে। কেঁদে আকুল এই মানুষটাই তাহলে আগের জন্মের স্বামী দেবতা?

কিন্তু নরবাহনদত্তের মুখে 'হায় রাজহংসী' ছাড়া তো আর কথা নেই। অতএব তার সখা গোমুখকেই কান্নাকাটির কারণটা জিজ্ঞেস করল কর্পূরিকা।

তখন সাড়ম্বরে নরবাহনদত্তের পরিচয় দিয়ে গেল গোমুখ। নরবাহনদত্ত যে জাতিস্মর। আগের জন্মে রাজহংস, এজন্মে রাজপুত্র। সে যে সেরা বিদ্যাধর হবে, জন্মের সময়েই হয়েছিল সেই আকাশবাণী। দুই বউ মদনমঞ্চুকা আর হেমপ্রভা থাকা সত্ত্বেও আগের জন্মের বউকে তার চাই। একদিন শিকারে বেরিয়ে এক সন্ন্যাসিনীর কাছে পেয়েছে রাজকন্যা কর্পূরিকার ঠিকানা, আগের জন্মে যে ছিল তার রাজহংসী বউ। তাই এসেছে এখানে এক ছুতোর বন্ধুর তৈরি আকাশ-যন্ত্রে চেপে। কাঁদছে আপনার জন্যে।

কামরিপু সমস্ত প্রতিজ্ঞা তছনছ করে দেয়। আগের জন্মের স্বামীকে দেখে সেই অবস্থা হয়েছিল কর্পূরিকার, সেইসঙ্গে উথলে উঠেছিল প্রেম।

সুতরাং শুভলগ্নে বিয়ে হয়ে গেল তার, নরবাহন দত্তের সঙ্গে।

শ্বশুরবাড়িতে কিছুদিন থাকবার পর সস্ত্রীক স্বস্থানে ফিরে যেতে চেয়েছিল নরবাহনদত্ত।

রাজি হয়েছিল কর্পূরিকা। শ্বশুরের ভিটে সব নারীর কাছেই প্রিয়।

বলেছিল, যে আকাশযন্ত্রে চেপে এখানে এসেছেন, তার চেয়ে বড়ো একটা যন্ত্র আমি বানিয়ে আনছি। বলেই, খবর পাঠাল বিদেশি সেই ছুতোরের কাছে, কিছুদিন ধরে যে রয়েছে এখানে। কর্পূরিকার ফরমাশমতো সে বানিয়ে আনল একটা বিরাট বিমান।

দেখেই খটকা লেগেছিল নরবাহনদত্তর। এমন কেরামতি যার আছে, সে নিশ্চয় রাজ্যধরের ভাই, প্রাণধর।

জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেল, অনুমান তার সঠিক। প্রাণধর রাজ্যধরের সহোদর বটে।

যথাসময়ে বিমানে আরোহণ করে সাগর পেরিয়ে রাজ্যধর শীপে চলে এল নরবাহনদত্ত, নতুন বউকে নিয়ে সঙ্গে প্রাণধর।
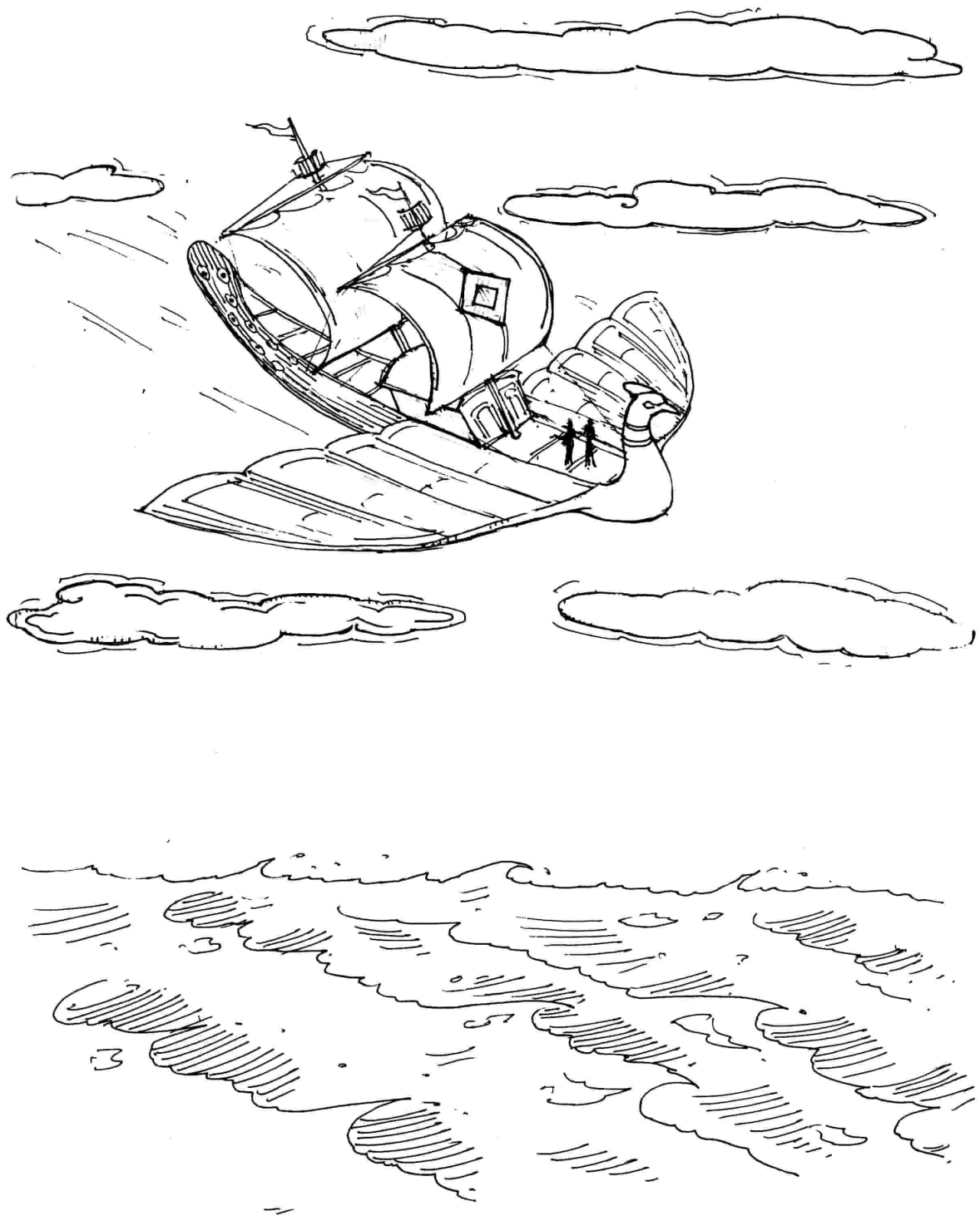
C-তারপর, সবাই চাপল আকাশ যানে, পৌঁছে গেল কৌশাম্বীনগরে।

বিমান থেকে প্রাণধর নামতেই চমকে উঠে রাজ্যধর দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল তাকে, মিলন ঘটল দুই ভাইয়ের।

তারপর, সবাই চাপল আকাশ যানে, পৌঁছে গেল কৌশাম্বীনগরে। বৎসরাজ বিষম খুশি হলেন ছেলে আর বউমাকে পেয়ে। খুশি হল আগের দুই স্ত্রী-ও। প্রাণধর আকাশযান নিয়ে ফিরে গেল কর্পূরসম্ভব নগরে রাজা কর্পূরসেনকে খবরটা দিতে।

৪৪. বিদ্যাধর কাহিনি

যুবরাজ নরবাহনদত্তকে নিয়ে একদিন রাজসভায় বসে আছেন রাজা বৎসরাজ, এমন সময়ে আকাশ থেকে নেমে এল এক বিদ্যাধর। আত্মপরিচয় দিল এইভাবে, আমার বাড়ি হিমালয়ের বজ্রকূট নগরে। নাম, বজ্রপ্রভ। আমি অপরাজেয় শিবের বরে। আমার বিস্তর বিদ্যা আছে বলেই আমি বিদ্যাধর। আজ এসেছিলাম শিবকে প্রণাম জানাতে। তখনই জানলাম, যুবরাজ নরবাহনদত্ত শিবের প্রসাদধন্য, লক্ষ্মীপুত কামদেবের অংশ থেকে তাঁর সৃষ্টি এবং ওঁর রাজত্ব বিস্তৃত হবে স্বর্গমর্ত্যের দুই লোকেই। কিন্তু বিরোধ লাগবে বিদ্যাধর সিংহাসনের সময়ে। কারণ সূর্যপ্রভ দখল করেছে সিংহাসনের ডানদিক, আর শ্রুতশর্মা নিয়েছে বাঁদিক। দক্ষিণদিক আর উত্তরদিক।

উৎসুক হলেন বৎসরাজ নাম দুটো শুনে। জানতে চাইলেন তাদের ক্ষমতা দখলের, ঐশ্বর্যলাভের পন্থা, শুনুক নরবাহন, তার কাজে লাগবে সিংহাসন দখলের সময়ে।

বজ্রপ্রভ বললে।

অনেকদিন আগে মদ্রজনপদের রাজধানী ছিল শাকলে শহর। রাজা চন্দ্রপ্রভ থাকতেন সেখানে। রানি ছিলেন কীর্তি। সূর্যপ্রভ তাঁদেরই ছেলে, মহাদেব নিজে গড়ে দিয়েছিলেন। সূর্যপ্রভসহ একদিন রাজসভায় বসেছিলেন রাজা চন্দ্রপ্রভ, এমন সময়ে ওঁদের সামনেই মেঝে ফাটিয়ে পাতাল থেকে উঠে এল ময়দানব। তাকে পাঠিয়েছেন খোদ মহাদেব। যুবরাজকে গড়েপিটে দেওয়ার জন্যে। শ্রুতশর্মার সঙ্গে লড়াই লাগলে কাজে লাগবে। সিংহাসন দখল করবেই, পথের কাঁটা না রেখে। ময়দানবের কথায় বিশ্বাস করে রাজা চন্দ্রপ্রভ ছেলেকে গড়েপিটে দেওয়ার ভার দিলেন তার হাতে। ময়দানব রাজপুত্রকে নিয়ে চলে গেল পাতালে। শিখিয়ে দিল সমস্ত বিদ্যে। তার পর তাকে নিয়ে উঠে বসল একটা গগনবিহারী যন্ত্রে। সেই যন্ত্রের নাম ভূতাসন। পৌঁছে দিয়ে গেল রাজার কাছে।

ভূতাসন অতিশয় আশ্চর্য আকাশযান। ময়দানবের হাতে গড়া। যত্রতত্র উড়ে যেতে পারে চোখের নিমেষে। সুতরাং তিন মন্ত্রীপুত্র বন্ধুদের নিয়ে রাজপুত্র সূর্যপ্রভ উড়ে গেল নানা দেশে। অপহরণ করে গেল পরপর নয়জন রাজকন্যাকে। তাদের নিয়ে বাগানে বাগানে চালিয়ে গেল মদনোৎসব।

তারপর অবশ্য বিয়ে হল প্রত্যেকের সঙ্গে, স্বদেশে ফিরে আসার পর, পিতার উদ্যোগে।

৪৫. সুনীথ-সুমন্তীক কাহিনি

এরপর একদিন অদ্ভুতকর্মা ময়দানবকে স্মরণ করলেন রাজা চন্দ্রপ্রভ।

তৎক্ষণাৎ সভাস্থল ফাটিয়ে পাতাল থেকে উঠে এল ময়দানব, সুগন্ধে ভরে গেল চারদিক। বুদ্ধিমান রাজা নিজের সিংহাসনে বসালেন ময়দানবকে। খুশি হয়ে যুবরাজ সূর্যপ্রভকে নতুন বুদ্ধি দিয়ে গেল ময়দানব, শ্বশুরদের আসতে বলুন সৈন্যসামন্ত নিয়ে। বিরাট বাহিনী নিয়ে চলে যান বিদ্যাধর-অধিপতি সুমেরুর কাছে। সুমেরু আপনাকে জামাই করে নেবেন। তাঁর সাহায্য নিয়ে যুদ্ধে হারিয়ে দিন শ্রুতশর্মা কে, অধিপতি হয়ে যান আকাশলোকের।

চন্দ্রপ্রভ তৎক্ষণাৎ খবর পাঠালেন নয় বেয়াইদের। তারপরেই একদিন নারদ এসে হাজির রাজসভায়, ময়দানব তখন সেখানে বসে।

নারদ হুমকি দিয়ে গেলেন এইভাবে, দেবতাদের রাজা ইন্দ্র রুষ্ট হয়েছেন আপনার মতলব শুনে। শ্রুতশর্মাকে বিদ্যাধর সিংহাসনে বসিয়েছেন দেবতারা। আপনি শুধু শিবপুজো করেই তাকে হটাতে চান? যোগ্যতার দিক দিয়ে সূর্যপ্রভ শ্রুতসেনার ধারেকাছেও আসতে পারে না। অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, ইন্দ্রের আদেশ।

অট্টহেসে বললে ময়দানব, শিবের আরাধনাই করব আমরা, অশ্বমেধ নয়। ইন্দ্র যা পারে করুক।

নারদ তো ঘোট পাকিয়ে দিয়ে সরে পড়লেন, কিন্তু দুশ্চিন্তায় আকুল হলেন রাজা চন্দ্রপ্রভ। ইন্দ্র ক্ষেপেছেন! সর্বনাশ!

অভয় দিয়ে বললে ময়দানব, কীসের ভয়? পাতালের সব দানবরা আপনার সহায়।

যথাসময়ে এসে গেল নয় বেয়াইদের সৈন্যসামন্ত।

পুজো করা হল শিবের। অনুচরদের নিয়ে নন্দী চলে এল যজ্ঞভূমিতে। বললে, দেবাদিদেব শিব বলে পাঠিয়েছেন, একশো ইন্দ্রকেও ভয় পাওয়ার কারণ নেই।

সূর্যপ্রভই হবে বিদ্যাধরদের অধিপতি।

বলেই, অন্তর্হিত হল নন্দী, অনুচরদের নিয়ে।

পরের দিন রাজসভায় বসে ময়দানব একটা চমকপ্রদ গল্প শোনাল রাজা চন্দ্রপ্রভকে।

আপনি রাজা চন্দ্রপ্রভ, আর আপনার ছেলে যুবরাজ সূর্যপ্রভ, দুজনেই ছিলেন আমার ছেলে, দুই ভাই, এখন জন্মেছেন পিতাপুত্র হয়ে। আপনারা মারা গেছিলেন দেবতা-দানবের লড়াইয়ের সময়ে।

আমি আপনার দেহ ম্যমি বানিয়ে রেখে দিয়েছি পাতালে, ঘি আর নানারকম দেব-ওষুধ মাখিয়ে। চলুন আমার সঙ্গে পাতালে, আমি বলে দেব কীভাবে প্রবেশ করতে হয় আগের শরীরে, ঢুকে পড়ুন। সেই শরীর পেলে আপনার তেজ আর শক্তি বেড়ে যাবে। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে অনায়াসেই তাদের হারিয়ে দিতে পারবেন।

আমার ছেলে যখন ছিলেন, তখন আপনার নাম ছিল সুণীথ। আপনার তখনকার ভাইয়ের, এখনকার ছেলের নাম ছিল সুমন্তীক।

আপনাকে যেমন আপনার পূর্ব শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেব, সূর্যপ্রভকে তেমনি আকাশমার্গে বিহারের ক্ষমতা দেব।

সুতরাং চিন্তা করবেন না। চলুন পাতালে আমার সঙ্গে, আসব পান করুন, রোগ-জরা কাছে ঘেঁষতে পারবে না, দিব্য শরীর লাভ করবেন।

ময়দানবের মুখে অদ্ভুত এই রহস্যকাহিনি শুনে ভয়মুক্ত হলেন চন্দ্রপ্রভ আর সূর্যপ্রভ। পরের দিন দুজনে ময়দানবের সঙ্গে গেলেন চন্দ্রভাগা আর ইরাবতী নদীর সঙ্গমের জায়গায়। সেখানে একটা লুকোনো গুহায় ঢুকলেন। রসাতলে পৌঁছে গেলেন।

রানি আর মন্ত্রীরা এল সঙ্গে।

শ্রুতশর্মার বিদ্যাধর সৈন্যরা ওৎ পেতে ছিল আকাশে। ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল সূর্যপ্রভর নয় বউকে, আর আগে অবশ্য মায়াজাদু দিয়ে নিশ্চল করে রেখে দিল সব রাজাদের।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল হুংকার, আকাশে!

পামর শ্রুতশর্মা! সূর্যপ্রভ, মহিষীদের ধর্মনষ্ট করলেই সৈন্যসমেত ধ্বংস হয়ে যাবি। কারণ আছে বলেই এখুনি তোদের খতম করলাম না।

আকাশবাণী এরপর অভয় দিয়ে গেল নীচের রাজাদের ভয় পেও না। মেয়েদের ফিরে পাবে—এদের গায়ে আঁচ লাগবে না।

আকাশ-বাক্য আকাশেই 'ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির রেশ তুলে মিলিয়ে যেতে না যেতেই আতঙ্কে সিঁটিয়ে গিয়ে চম্পট দিয়েছিল আকাশচারী বিদ্যাধর-পুঙ্গবরা।

সূর্যপ্রভ পরে জেনেছিল চোরের ওপর বাটপারির এই কাহিনি। সে যাদের হরণ করেছিল, তাদেরকেই হরণ করেছে শ্রুতশর্মন!

ময়দানব রাজা চন্দ্রপ্রভকে নিয়ে গেল প্রথম রসাতলের মধ্যিখানের দেবদেউলে। এক দেহ ছেড়ে আর এক দেহে ঢুকতে গেলে কী কী করণীয়, সেইসব উপদেশ দিয়ে সেখানে থেকে নিয়ে গেল দ্বিতীয় রসাতলে।

স্বজনসহ রাজা সেখানে ঢুকলেন। দেখলেন, সেখানে ঘুমিয়ে আছে সকলেই। ঘুম-রসাতল বললেই হয়।

একটা বিছানায় শুয়ে রয়েছে বিরাট এক পুরুষ। আকৃতি তার ভয়ানক। তাকে ঘিরে বসে রয়েছে বেশ কয়েকজন সুরূপা দানব-যুবতী।

বললে ময়দানব, রাজা চন্দ্রপ্রভ, এই অতিকায় বপুতেই আগের জন্মে অবস্থান করেছিলেন আপনি। এই যে রমণীরা, এরা আপনারই অর্ধাঙ্গিনী। দেহ থেকে দেহে প্রবেশের যে বিদ্যা এইমাত্র আপনাকে শিখিয়ে এলাম, প্রয়োগ করুন এবার সেই বিদ্যে। প্রবেশ করুন পূর্ব অবয়বে।

পূর্ব ভার্যাদের অবলোকন করে পরম প্রীত রাজা চন্দ্রপ্রভ বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ সবেগে প্রবেশ করলেন দৈত্যাকার অবয়বে। উঠে বসলেন আড়মোড়া ভেঙে। সপ্রেম চাহনি নিক্ষেপ করলেন দানবী বউদের দিকে।

তারা যখন হর্ষ-পুলকিত, ময়দানব তখন বলে যাচ্ছে, এখন থেকে আপনি সুনীথ নামধারী হয়ে গেলেন, চন্দ্রপ্রভ নাম আর রইল না।

মনমরা হয়ে গেল কিন্তু রাজকুমার চন্দ্রপ্রভ, এ জন্মের বাবার প্রাণশূন্য পিঞ্জর দেখে।

ময়দানব সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বললে সুনীথকে, পূর্বজন্মের সব কথা মনে পড়ছে? এই জন্মের কথাও কি মনে আছে?

সুনীথ ওরফে চন্দ্রপ্রভ বললেন, অবশ্যই আছে।

ধুরন্ধর ময়দানব তখন চন্দ্রপ্রভের নিষ্প্রাণ দেহপিঞ্জরকে যথাযথ সুরক্ষার ব্যবস্থা করে দিল, যাতে ভবিষ্যতে কাজে লাগে। এরপর, সদলবলে যাওয়া হল তৃতীয় রসাতলে। বসা হল একটা সুরম্য সরোবরের পাশে। সুনীথের দানবী-বধূরা এনে দিল অতি আশ্চর্য অতি-সুপেয় অপূর্ব স্বাদের পাতাল মদিরা। সুরা তো নয়, যেন অমৃত। প্রত্যেকেই নিমেষে মত্ত-প্রমত্ত প্রবল বলবান হয়ে উঠল সেই মদিরা পান করার সঙ্গে সঙ্গে।

এরপর, সূর্যপ্রভকে নিয়ে চন্দ্র ও প্রভ (সুনীথ) গেলেন চতুর্থ রসাতলে। সেখানে সুরম্য-নিকেতনের মধ্যে দেখলেন আপন অসুর-জননীকে। তাঁর নাম লীলাবতী।

বললে ময়দানব, লীলাবতী, এরা তোমার আগের জন্মের দুই ছেলে, এখন জন্মেছে বাপ বেটা হয়ে। ছিল সুনীথ, সুমন্তীক, হয়েছে চন্দ্রপ্রভ, সূর্যপ্রভ।

সস্নেহে লীলাবতী বললে সূর্যপ্রভকে, তোমার আর দানব-দেহ গ্রহণের দরকার নেই। মানব-শরীরে অপূর্ব শোভা হয়েছে।

এই বলে ডেকে পাঠালেন নিজের ছেলে আর মেয়ে, বিভীষণ আর মন্দোদরীকে।

বললেন, যুদ্ধ আসন্ন, দেবতা বনাম দানব। তোমরা লেগে পড়ো।

তাদের জবাব এই, অসুররা মরেছে নিজেদের দোষে। মরেননি বলি, আরও অনেকে। তাঁরা সদাসর্তক বলে। সুতরাং ফের যুদ্ধ লাগলে যেন হুঁশিয়ার থাকা হয়।

বলেই, সরে পড়ল মন্দোদরী আর বিভীষণ। খামোকা যুদ্ধে তারা নেই, গা বাঁচিয়ে চলাই ভালো!

কিন্তু যে ইঙ্গিত দিয়ে গেল, তা বুঝে নিয়ে ময়দানব তৎক্ষণাৎ গেল তৃতীয় রসাতলেই বলি-ভবনে, সঙ্গে সুনীথ আর সুমন্তীক।

বলি হল গিয়ে দৈত্যদের অধিপতি। বিষম বিক্রমশালী। কৌশলী ময়দানব তাঁকে দলে ভেড়াবার জন্যে যা-যা বলবার তা বলে গেল, বিলক্ষণ প্রশস্তি বাক্য সহ। পা জড়িয়ে ধরে।

বলি পরম প্রীত হয়ে জড়িয়ে ধরল ঠাকুর্দা প্রহ্লাদের পা, যিনি কিনা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য নামেও পরিচিত। তিনি গলে গিয়ে বললেন, সাত রসাতলের সমস্ত অসুর থাকবে তোমার বাহিণীতে, এই আমার হুকুম।

ঠিক তখুনি নারদ চলে এল বলির সামনে।

বললে, দেবতাদের দূত হয়ে বলতে এলাম, ঝামেলা বাড়াবেন না। শ্রুতশর্মার গায়ে আঁচড় কাটতে যাবেন না।

বলি ওরফে শুক্রাচার্য ওরফে প্রহ্লাদ সপেটা বলে দিলেন, এ লড়াই হবেই, স্বয়ং মহাদেব আমাদের সঙ্গে আছেন। ইন্দ্র যেন সাবধান হয়।

সরে পড়লেন নারদ, কলহ বাঁধাতে যিনি ওস্তাদ।

যাবার আগে অবশ্য বিস্তর নিন্দে করে গেলেন ইন্দ্রের!

আসন্ন লড়াইয়ের আটঘাট বেঁধে নিয়ে সুনীথ (চন্দ্রপ্রভ) গেল মায়ের কাছে। শেষ হল খাওয়া দাওয়া। স্নেহময়ী জননী তিন পুত্রবধূকে এনে দিলেন ছেলের সামনে।

তাদের একজন কুবেরের মেয়ে। নাম, তেজস্বতী।

দ্বিতীয় জন তুম্বুর-দুহিতা। নাম, মঙ্গলাবতী।

তৃতীয় বধূ প্রভাস-কন্যা, নাম, কীর্তিমতী।

এ ছাড়াও, আরও বউ আছে (ছিল) সুনীথের। এই-তিনজন তার সবচেয়ে প্রিয়।

বড়োবউকে নিয়ে প্রথমেই শোবার ঘরে সুনীথ। (সূর্যপ্রভর আগের জন্মের ভাই) ঢুকে যেতেই সূর্যপ্রভও দেরি করল না। অন্যান্য পরিজনদের নিয়ে প্রবেশ করল শয়নকক্ষে।

নিদ্রায় অচেতন যখন সকলেই, বিনিদ্র শুধু সূর্যপ্রভ।

ঠিক সেই সময়ে ঘরে ঢুকল তার এক সখী, সঙ্গে এক অনিন্দ্যসুন্দরী কামিনী। রূপে অপ্সরা সমান, অথচ পাতালবাসিনী।

ঘুমের ভান করে শুয়ে রইল সূর্যপ্রভ।

কাছে এল অপরূপা। বললে সখীকে, এঁর পা ছুঁয়ে জাগিয়ে দাও।

হুকুম তামিল করেছিল বিনয়াবনত সখী।

সূর্যপ্রভ তো জেগেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে বলেছিল, তোমরা আবার কে? এখানে কী মতলবে?

সখী বললে, ইনি কলাবতী। হিরণ্যাক্ষর ছেলে অমীল-এর মেয়ে। আপনাকে দেখতে এসেছেন। কলাবতীর বাবার ইচ্ছে, আপনি এঁকে বিবাহ করুন।

শুনেই, ফের মিথ্যে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল সূর্যপ্রভ। এবার কলাবতীর কথা শোনা দরকার।

কলাবতী গেল রাক্ষস-সেনাপতির কাছে। সখীকে দিয়ে বলাল নিজের ইচ্ছের কথা। সেনাপতি সটান চলে গেল জেগে ঘুমন্ত সূর্যপ্রভর কাছে।

বললে, জেগে আছেন নাকি?

তক্ষুনি চোখ খুলে সূর্যপ্রভ বললে, তাতো আছিই। রূপসী এক কন্যা এসে দেখা দিয়েই চলে গেল কোথায়? তাকে চাই।

সেনাপতি বাইরে গিয়ে কলাবতীকে ডেকে আনল সূর্যপ্রভর সামনে।

সূর্যপ্রভ তৎক্ষণাৎ তাকে বিয়ে করে নিল গান্ধর্বমতে, মালাবদল করে। আগে ছিল নয় বউ। এখন হল দশ বউ! পরের দিন অসুরদের মিলন মহোৎসবে গিয়ে প্রহ্লাদের মেয়ে মহল্লিকাকেও দেখে মোহিত হয়ে বিয়ে করল তাকে তৎক্ষণাৎ। আশমিটলনা তারপরেও। অসুর-দুহিতারা যে অপ্সরাদেরও হার মানিয়ে দিতে পারে, তা দেখে স্থির থাকতে না পেরে বিয়ে করে ফেল্ল কুমুদাবতী, মানাবতী, সুভদ্রা, সুন্দরী, সুমায়া নাম্নী অসুর-মেয়েদের। এছাড়াও আরও অনেককে অর্থাৎ ষোলজনেরও অধিক পত্নীসহ পরমসুখে রইল পুরুষ প্রবর সূর্যপ্রভ।

তাতেও সুখ নেই। সেই রাতেই বিয়ে করল বধূমহল্লিকার বারোজন সখীকে, স্বর্গ থেকে হরণ করে আনা হয়েছে প্রত্যেকেই।

মোট 24 জনেরও অধিক কন্যার স্বামী হয়ে গেল সূর্যপ্রভ!

পাতালে অনেক মজা!

সারারাত পরমানন্দে কাটিয়ে সকাল হতেই এল প্রহ্লাদের সভায়। সেখানে ঘটল এক কাণ্ড।

ভূতাসন বিমানে চেয়ে সেখান থেকে সব্বাই গেছিল কশ্যপের আশ্রমে। কশ্যপের ছেলে দেবরাজ ইন্দ্রও এসেছিল বাবাকে দেখতে। সূর্যপ্রভকে দেখেই টিটকিরি দিয়েছিল, আরে ছিঃ। এই ছেলে হবে বিদ্যাধর অধিপতি!

জবাব দিয়েছিল ময়দানব এইভাবে, ভগবান যেমন খুশি হয়ে আপনাকে দেবরাজ করেছেন, একেও আকাশমার্গের অধীশ্বর করার কথা দিয়েছেন। শ্রুতশর্মা যদি বিদ্যাধর-অধিপতি হওয়ার যোগ্যতা রাখে, সূর্যপ্রভও তেমনি ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তির যোগ্যতা রাখে।

আর যায় কোথা! তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বজ্র হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল ইন্দ্র।

দেখেই চোখ লাল হয়ে গেছিল ইন্দ্র-পিতা কশ্যপের। এক হুংকার দিতেই ভয়েমেয়ে বজ্র নামিয়ে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলেছিল ইন্দ্র, সূর্যপ্রভ যে অন্যায়ভাবে শ্রুতশর্মার বিদ্যাধর-রাজ্য কেড়ে নিতে যাচ্ছে!

বেশ করছে, বলেছিলেন কশ্যপ। শ্রুতশর্মাকে যেমন তোমার ভালো লাগে, সূর্যপ্রভকেও তেমনি মহাদেবের ভালো লাগে। চোখের আগুনে ছাই করে দেব তোমাকে যদি সূর্যপ্রভর পেছনে লাগো।

মাথা হেঁট করে বসে রইল ইন্দ্র।

শ্রুতশর্মাকে আনা হল সেখানে।

কশ্যপ-পত্নীরা সূর্যপ্রভ আর শ্রুতশর্মাকে পাশাপাশি নিরীক্ষণ করে নিয়ে জানতে চেয়েছিল কশ্যপের কাছে, এই দুজনের মধ্যে রূপগুণে কে সেরা?

কশ্যপ বললেন, সূর্যপ্রভ। শুধু বিদ্যাধর-রাজ্যের যোগ্য নয়, দেবরাজ্যেরও যোগ্য।

বলেই, অভয় দিলেন সূর্যপ্রভকে, তুমি উদ্যত বজ্রের সামনে নির্ভয় ছিলে। ভবিষ্যতেও বজ্র তোমাকে ছুঁতে পারবে না। শত্রুপক্ষ তোমাকে জয় করতে পারবে না, সুনীথকেও পারবে না।

সভা ভেঙে গেল। ফিরে গেল যে যার জায়গায়।

সূর্যপ্রভ কিছুদিন পাতালে থেকে গুহাপথে ফিরে এসেছিল মর্ত্যে

চন্দ্রপ্রভকে দেখতে না পেয়ে কেঁদে ফেলেছিল আত্মীয় স্বজন।

তখন সমস্ত ব্যাপার খুলে বলেছিল সূর্যপ্রভ। চন্দ্রপ্রভ বহাল তবিয়তে আছে পাতালে। সুনীথ নামক দানবের কলেবরে।

৪৬. যুদ্ধের আয়োজন

তারপরেই রেগে টং হয়ে গেল সূর্যপ্রভ যখন শুনল, শ্রুতসেন তার বউদের হরণ করেছে!

এতবড়ো স্পর্ধা! সাতদিন পরেই শুরু হোক যুদ্ধ।

খবরটা পেয়েই ময়দানব চলে এল পাতাল থেকে। বললে, চলো পাতালে, তোমার সব বউদের শ্রুতশর্মা রেখেছে পাতালে।

ময়দানবের সঙ্গে পাতালে গিয়ে প্রাণপ্রিয় বধূদের ফিরিয়ে এনে ঠাণ্ডা হয়েছিল সূর্যপ্রভ।

তার পরেই গেছিল প্রহ্লাদের কাছে। প্রহ্লাদ প্রথমে সূর্যপ্রভকে বকাবকি করেছিলেন, তাঁর ভাই যে বারোজন দেবকন্যাকে এনে রেখেছিল নিজের কাছে, তাদের লুঠ করে নিয়ে যাবার জন্যে।

নির্ভীক সূর্যপ্রভ সবিনয়ে ক্ষমা চেয়ে নিতেই প্রহ্লাদ এমনই প্রীত হয়ে গেলেন যে নিজের দ্বিতীয় দুহিতাকেও দান করে দিলেন সূর্যপ্রভকে।

বউভাগ্য তার সত্যিই ভাল। কেননা, প্রহ্লাদের কাছ থেকে অমীল-এর কাছে প্রণাম করতে যেতেই তিনিও খুবই খুশি মনে নিজের দ্বিতীয় দুহিতা সুধাবতীকে সমর্পণ করলেন সূর্যপ্রভকে!

মোট 30 জন প্রধান মহিষী পেয়ে গেল সূর্যপ্রভ। এছাড়াও, অন্তঃপুর রত্নখনির মতোই উজ্জ্বল হয়ে রইল আরও অনেক পরমাসুন্দরী অর্ধাঙ্গিনীদের রূপের আলোয়। তাদের হাসি আর গানে, নাচে আর মজার মজার কথায় মেতে গেল অন্তঃপুর।

বিচক্ষণ ময়দানব তখন চন্দ্রপ্রভের যে ছেলে তখনও শৈশব পেরোয়নি, তাকে রাজা করে দিল। রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

আটঘাট বেঁধে চলে গেল বিদ্যাধর নৃপতি সুমেরুর তপোবনে, গঙ্গার তীরে। ভূতাসন নামক অসাধারণ আকাশযানে চেপে। সুমেরুকে সব কথা বলা হয়ে যাওয়ার পর দূত পাঠিয়ে সূর্যপ্রভকে আনিয়ে নিল সেখানে, পুরো বাহিনী সমেত।

সাত পাতাল থেকে এল মহাকায় মহাবীর দানবরা। রথ, হাতি, ঘোড়া আর সৈন্য নিয়ে।

কিন্তু এই বিশাল বাহিনী থাকবে কোথায়? তপোবনে তো তিলধারণের জায়গা নেই!

কশ্যপকে মনে মনে ডেকেছিল ময়দানব। অগতির গতি তিনি। স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হলেন। উপায় বাতলে দিলেন।

তপোবন থেকে এক যোজন দূরে আছে একটা ডাল-খেত। বিরাট জায়গাজুড়ে। সবাই যাক সেখানে।

সুতরাং সৈন্য সাজানো হল ডাল-খেতে।

এবার, সুমেরুর প্রস্তাবমতো পুরো বাহিনীকে নিয়ে যাওয়া হল হিমালয় পাহাড়ের সানুদেশে, বাল্মীকি প্রদেশে সেখানে আগে থেকেই এসে হাজির হয়েছে বিদ্যাধর-বাহিনী, মহাষ্টমী তিথি উপলক্ষ্যে, ওই সময়ে পুজো দিলে রাজা হওয়া যায়, বিদ্যাধররা তাই আসে প্রতিবছর।

সূর্যপ্রভর সৈন্যবাহিনী দেখে টিটকিরি দিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন। সুমেরুকে ব্যঙ্গ করেছিল, মানুষের অনুগত হওয়ার জন্যে। দানব কখনও মানুষের সেবা করে? ছিঃ!

সেই বিদ্যাধরের নাম ব্রহ্মগুপ্ত। জিভের ধার ভয়ানক।

সুমেরু তার জবাব দিল এইভাবে।

প্রথমে বলে নিল টিটকিরি-রাজ বিদ্যাধরের জন্মবৃত্তান্ত। ভীম নামক এক বিদ্যাধরের বউয়ের সঙ্গে সহবাস করেছিলেন ব্রহ্মা। জন্ম হয় যার তাকে সর্বদা রক্ষা করে চলেছেন ব্রহ্মা, তারনাম ব্রহ্মগুপ্ত।

এখন দেখা যাক, কার তেজ বেশি। ব্রহ্মগুপ্তের, না সুমেরুর।

কাঠ জড়ো করে অলৌকিক শক্তি নিক্ষেপ করে আগুন জ্বলিয়ে ফেলেছিল সুমেরু। এ বিদ্যে বিদ্যাধররাও জানে। স্ফুলিঙ্গ বানাতে পারে শূন্য থেকে। সুমেরুও এই বিদ্যায় বিদ্বান দেখে তাদের চক্ষু তো চড়কগাছ।

সেই অগ্নিকুণ্ডে হোম শুরু করেছিল সুমেরু। আর, সূর্যপ্রভ।

দুজনের হোমকুণ্ড থেকে বেরিয়ে এসেছিল ভয়ানক দর্শন এক অজগর। রসাতল থেকে। প্রবল ফুঁ নিক্ষেপ করেছিল মুখগহ্বর থেকে, মুহূর্তে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ব্রহ্মগুপ্ত!

তৎক্ষণাৎ অজগরের দিকে রে-রে করে তেড়ে গেছিল শ্রুতশর্মার বেশ কয়েকজন মহাবীর বিদ্যাধর।

আবার ফুঁ দিয়েছিল অজগর। উড়ে গিয়ে দূরে পড়েছিল প্রত্যেকেই।

এই মহাবীরদের সেরা মহাবীরের নাম তেজঃপ্রভ। সে ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তেড়েমেড়ে ধেয়ে এসেছিল অজগরের দিকে। ফের ফুঁ দিয়ে তাকে উড়িয়ে নিয়ে অনেকদূরে আছড়ে ফেলেছিল অজগর। তাই দেখে অন্যান্য বীরপুঙ্গবরা ফের তেড়ে আসতেই একই হাল হয়েছিল প্রত্যেকেরই।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এসেছিল স্বয়ং শ্রুতশর্মা।

একই অবস্থা হয়েছিল তারও।

ফের চেষ্টা করতে যেতেই অজগর তাকে উড়িতে নিয়ে গিয়ে এতদূরে আছড়ে ফেলেছিল যে ভেঙে গেছিল শ্রুতশর্মার হাড়গোড়।

তখন পালিয়েছিল দলবল নিয়ে, লজ্জায় মাথা হেঁট করে।

শুধু ফুঁ দিয়ে গতর একদম না নাড়িয়ে, যে অজগর এমন কাণ্ড করতে পারে, সূর্যপ্রভ পারবে তাকে বাগে আনতে? সুমেরুর প্রশ্ন।
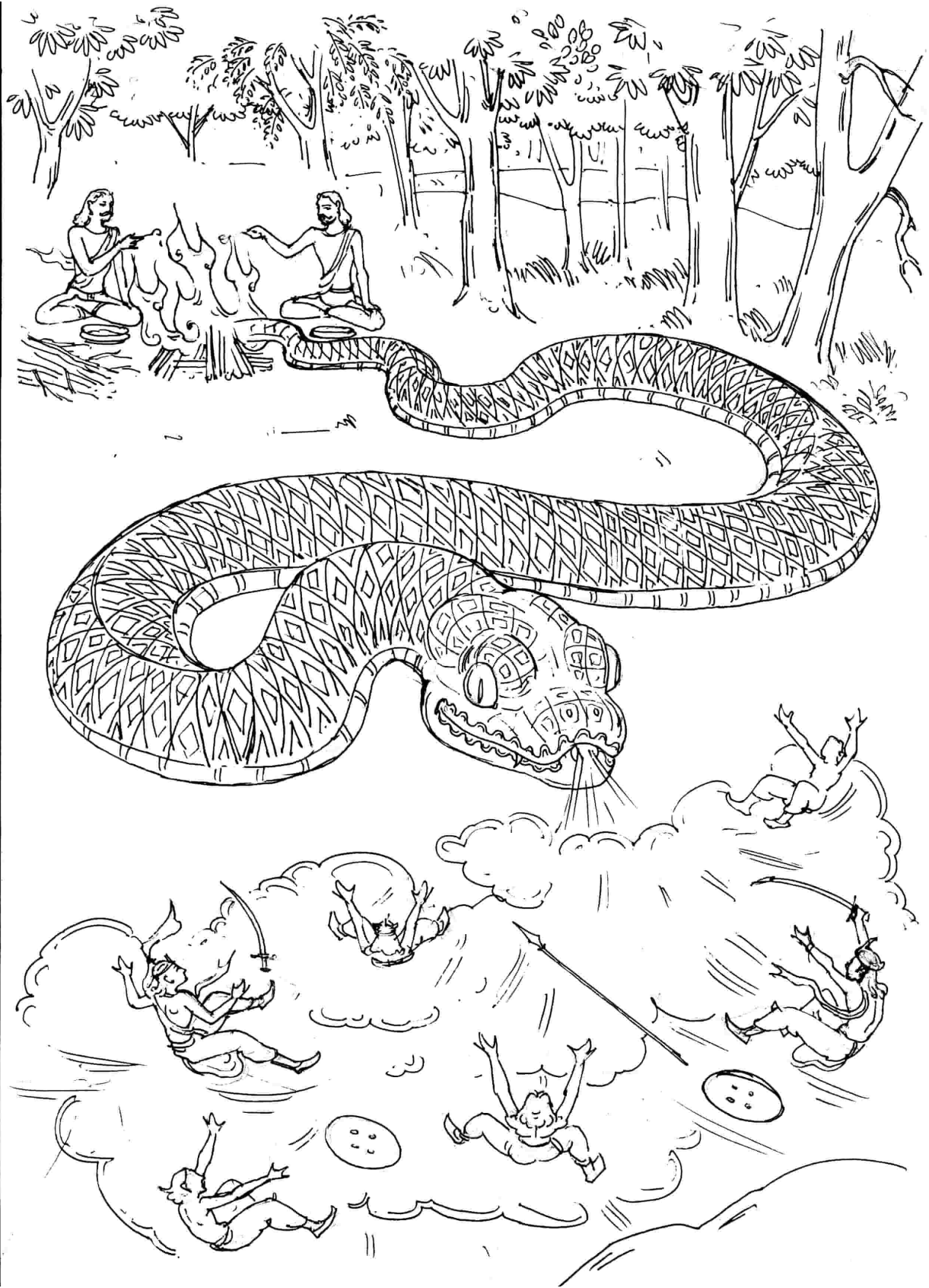
আবার ফুঁ দিয়েছিল অজগর। উড়ে গিয়ে দূরে পড়েছিল প্রত্যেকেই।

সূর্য প্রভ শুধু হেসেছিল। পায়ে পায়ে অজগরের কাছে গিয়ে তাকে অনায়াসে টেনে বের করেছিল বিবর থেকে। ঝুলিয়ে রেখেছিল কাঁধে। যেন, তির ভরা তূণ!

ধন্য ধন্য রব শোনা গেছিল আকাশে, সেই সঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি!

তারপরেই আকাশবাণী, সূর্যপ্রভ, এই তূণ অক্ষয়। সব কাজে সিদ্ধিলাভ ঘটাবে। সঙ্গে রাখবে।

মুখ চুন বিদ্যাধরদের। উল্লসিত সূর্যপ্রভ-বাহিনী।

দূত পাঠাল শ্রুতশর্মা, সূর্যপ্রভ যেন তূণ দেয় দূতকে, নইলে মরবে।

দূতকে খেদিয়ে দিল সূর্যপ্রভ এই বলে, শ্রুতশর্মার শরীরটাকে তির ঢুকিয়ে তূণ বানিয়ে দেব শীগগিরই!

এবার দরকার উপযুক্ত একটা ধনুক, এই তূণের উপযুক্ত।

সূর্যপ্রভ দলবল নিয়ে গেল মানস সরোবরে।

শ্রুতশর্মাও দলবল নিয়ে হাজির হল সেখানে। আড়ালে লুকিয়ে থেকে দেখল এক অত্যাশ্চর্য কাণ্ড।

সরোবর থেকে সোনার পদ্ম তুলে নিয়ে হোম করতেই মেঘ জমল আকাশে, শুরু হল তুমুল বৃষ্টি। বৃষ্টির জলের সঙ্গে মেঘ থেকে নেমে এল একটা বিরাট সাপ। ঝপাং করে পড়ল সরোবরে। সুমেরুর কথায় সূর্যপ্রভ সেই সাপ ধরে পারে তুলে আনতেই সাপ হয়ে গেল একটা অপরূপ ধনুক!

আবার একটা সাপ খসে পড়ল মেঘ থেকে। সূর্যপ্রভ সেই সাপকেও মুঠোয় বন্দি করতেই দ্বিতীয় সাপ হয়ে গেল ধনুকের ছিলে।

উড়ে গিয়ে সরে গেল মেঘ। শুরু হল আগুন বৃষ্টি। মারা গেল বিস্তর আকাশচারী।

তারপরেই পুষ্পবৃষ্টি, সেই সঙ্গে আকাশবাণী, সূর্যপ্রভ, এই ধনুক তোমার। গ্রহণ করো। এর ছিলে কখনও ছিঁড়বে না।

মুখ চুন শ্রুতশর্মার।

উল্লসিত ময়দানবেরা।

সুমেরুকে ঘিরে ধরল তার দলবল, বলতেই হবে এমন অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে কী করে। আশ্চর্য ধনুকের উৎপত্তি রহস্য শোনাতেই হবে। সুমেরু নিশ্চয় জানে।

তা জানে। তাই বলে গেল, ধনুক রহস্য।

এই অঞ্চলেই একটা বাঁশগাছের জঙ্গল আছে। গুণধর বাঁশ। তাদের ভেতরে হাওয়া ঢুকে অষ্টপ্রহর বাঁশি বাজিয়ে যায়। প্রকৃতির বাঁশি।

সেই বাঁশবনের বাঁশ এনে এই সরোবরে ফেলে দিলেই তা হয়ে যাবে দৈবধনু। দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর আর কিন্নর, এরা এই ভাবেই ধনুক বানিয়ে নিয়ে যায়।

সব ধনুক অবশ্য সমান শক্তিসম্পন্ন নয়। যে ধনুক হাতে এলে রাজাধিরাজ হওয়া যায়, তার জন্যে দরকার ভগবানের স্নেহদৃষ্টি। পুণ্যবান হওয়া চাই।

সূর্যপ্রভ যখন এতকাণ্ড না করেই এমন ধনুক পেয়েছে, তার অনুচররাও পাবে তার পুণ্যের জোরে। কিন্তু মেহনত করতে হবে।

শুনেই সূর্যপ্রভর দলবল হৈহৈ করে ছুটে গেছিল বাঁশবনের দিকে।

কিন্তু আশ্চর্য সেই বাঁশবন তো রাজার দখলে। সে রাজার নাম চন্দ্রদত্ত। তার রাজধানীর নাম বেণুনগর।

সূর্যপ্রভর অনুচরেরা চন্দ্রদত্তকে হেলায় হারিয়ে দিল যুদ্ধে। বাঁশবন কেটে বাঁশ এনে ফেলল সরোবরে। উঠে এল হাজার হাজার ধনুক। সময় লাগল মোটে সাতদিন।

এরপর ময়দানব বললে সূর্যপ্রভকে, এবার যাও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে। তাঁকে সন্তুষ্ট করো। দুটো পরমাশ্চর্য বিদ্যা উনি নিশ্চয় শিখিয়ে দেবেন তোমাকে। একটা বিদ্যার নাম মোহিনী, আর একটার নাম

পরিবর্তিনী। নাম শুনেই বুঝেছো, এ বিদ্যা জানা থাকলে দুটো ক্ষমতা লাভ করা যায়। এক, সম্মোহন, দুই, নিজের শরীর পরিবর্তন।

সূর্যপ্রভ তৎক্ষণাৎ দৌড়েছিল মহর্ষির কাছে।

নাছোড়বান্দা সূর্যপ্রভকে দুটো ভয়ানক তপস্যা করতে আদেশ করেছিলেন মহর্ষি। সাতদিন থাকতে হবে সাপ-সরোবরে, সাপেদের সঙ্গে, চারদিকে কিলবিল করবে সাপ, জড়িয়ে ধরবে, ছোবলও মারতে পারে, তারপরেও যদি প্রাণটা টিকে যায়, তিনটে দিন ধ্যানে বসে থাকতে হবে আগুনের মধ্যে। পুড়ে ছাই হয়ে গেলে চলবে না!

দুটো পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হয়ে সশরীরে মহর্ষির সামনে উপস্থিত হতেই বিষম প্রীত হয়ে দুটো মহাবিদ্যাই শিখিয়ে দিলেন সূর্যপ্রভকে।

তারপরেই বললেন, ফের ঢোকো আগুনে!

নির্বিকার সূর্যপ্রভ তৎক্ষণাৎ হেঁটে ঢুকে গেছিল হু-হু অগ্নিকুণ্ডে। কিন্তু আগুনের আঁচ তার গায়ে লাগেনি, একটা লোমও পুড়ে যায়নি।

ঘটেছিল একটা অভাবনীয় ঘটনা।

শূন্যপথ থেকে নেমে এসেছিল জহর দিয়ে তৈরি একটা রথ। আকাশ বাক্য গমগম করে উঠেছিল শূন্যে, সূর্যপ্রভ, এই হল চক্রবর্তী বিমান। তুমি উপহার পেলে কৃচ্ছসাধনের পুরস্কারস্বরূপ। তোমার অন্তঃপুরের সমস্ত মেয়েদের এই বিমানে রেখে দিও, শত্রুরা কক্ষনো তাদের ধর্ষণ করতে পারবে না!

যার এত বউ আর বউ-সহচরী, তার কাছে এহেন বর প্রাপ্তি যেন আকাশ কুসুম লাভের সমান। যুদ্ধ লাগলেই যে পক্ষ হারবে, সেই পক্ষের রমণীদের তৈরি থাকতে হয় ধর্ষিতা হওয়ার জন্য। নিষ্ঠুর এই প্রথা চলে আসছে পুরাকাল থেকেই।

সূর্যপ্রভ তাই নিশ্চিন্ত হয়েছিল সুরক্ষা-রথ পেয়ে।

এবং, সেই রথে চেপেই চলে এল ময়দানব প্রমুখ বিশিষ্ট প্রধানদের সামনে। এবার কী করতে হবে?

দূত পাঠাতে হবে শত্রুপক্ষকে, যা নিয়ম।

প্রহস্ত নির্বাচিত হল এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে, কারণ, সে কথার প্যাঁচে বড়ো ওস্তাদ।

তাকে পাঠানো হল শ্রুতশর্মার কাছে।

সেই রাতে সূর্যপ্রভ দেখল এক অদ্ভুত স্বপ্ন।

সদলবলে সূর্যপ্রভ নৃত্য করছে। অকস্মাৎ সবাই মিলে পড়ে গেল একটা নদীর জলে, কিন্তু ডুবে গেল না, ভেসে গেল স্রোতের টানে। হঠাৎ হু-হু হাওয়ার মধ্যে দিয়ে উড়ে এসে অগ্নিসমান এক মহাপুরুষ সবাইকে ধরে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আগুনের কুণ্ডের মধ্যে। কিন্তু পুড়ে গেল না কেউই। হঠাৎ মেঘ ঘনাল আকাশে, শুরু হল টকটকে লাল রক্তবৃষ্টি।

সূর্যপ্রভ বললে, এই পর্যন্ত দেখবার পর ঘুম ভেঙে গেল। মানে কি এই আশ্চর্য স্বপ্নের?

সুবাসকুমার বুঝিয়ে দিল স্বপ্নের অর্থ, সহজে কার্যসিদ্ধি হবে না। স্বপ্নের শেষের ওই রক্তমেঘ আমাদের মধ্যের কোনও বীরপুরুষ। স্বপ্ন সত্যি হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে। সত্যি স্বপ্ন দেরিতে ফলে, ভোররাতের স্বপ্ন চট করে ফলে যায়।
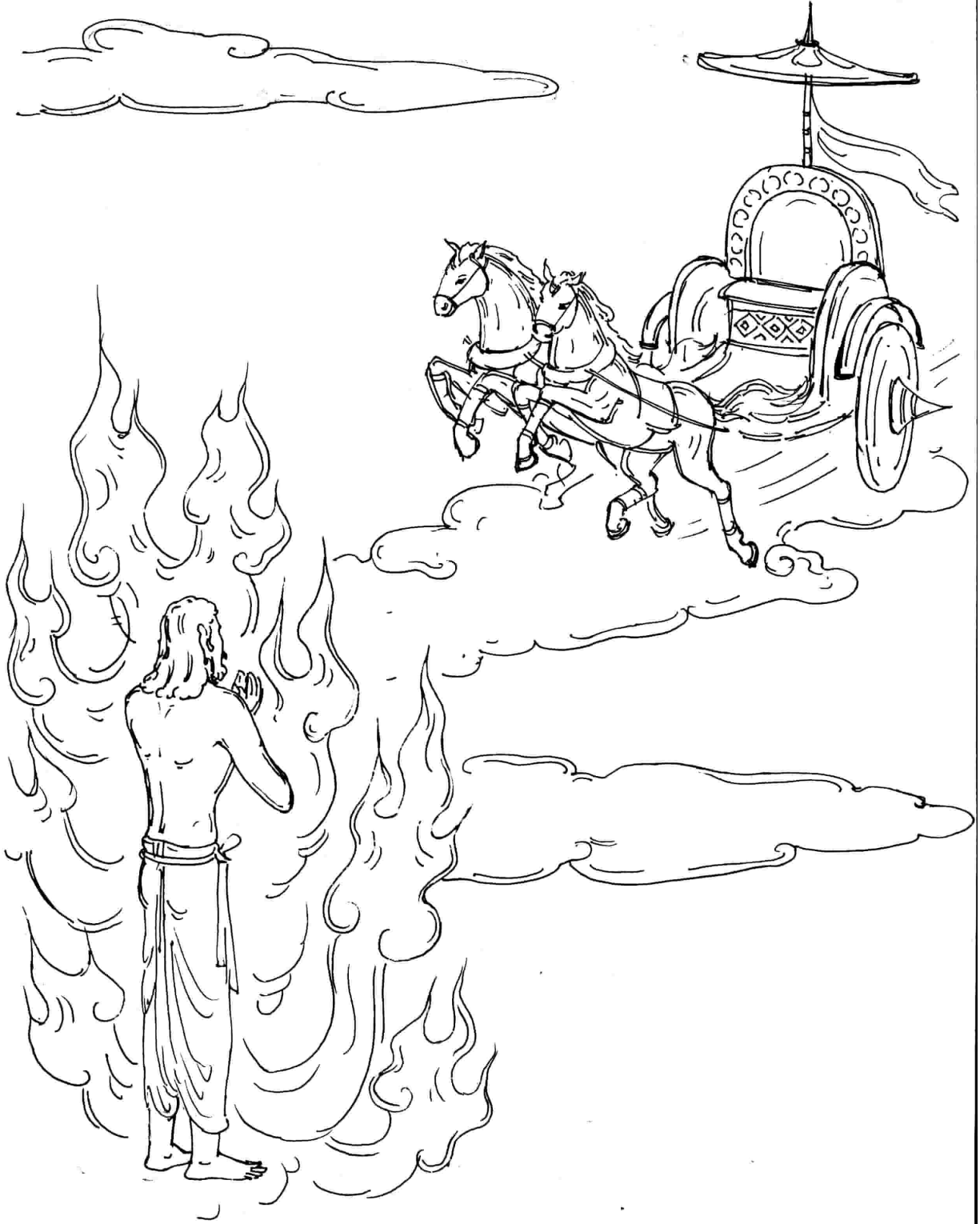
শূন্যপথ থেকে নেমে এসেছিল জহর দিয়ে তৈরি একটা রথ।

সূর্যপ্রভর বুক থেকে যেন একটা পাষাণ নেমে গেল।

রাজদূত প্রহস্ত কাজ শেষ করে ফিরে এসে পেশ করল দীর্ঘ প্রতিবেদন।

সারকথা এই : শ্রুতশর্মা হাঁকিয়ে দিয়েছে তাকে। যুদ্ধ সে করবেই।

হোক যুদ্ধ। শুতে গেল সবাই।

সুমেরুর ভাইঝি বিলাসিনী এল সূর্যপ্রভর শোবার ঘরে। সে প্রকৃতই রুপসী। তাকে দেখেই ঘুমের ভান করে শুয়ে রইল সূর্যপ্রভ।

বিলাসিনী একা আসেনি, সঙ্গে এনেছিল এক সখীকে। এখন দুজনের এমন ফিসফিস কথাবার্তা আরম্ভ হয়ে গেল যাতে সব কথা কপটনিদ্রিত সূর্যপ্রভর কানে যায়।

সখী বললে, বিলাসিনী, তুমি এই বীরপুরুষেরই বউ হবে। সুপ্রভাও হবে, তোমরা দুজনেই যে জন্মেছ একই বংশে।

বিলাসিনী বললে, কিন্তু ইনি তো এখনও ওষধি সিদ্ধি লাভ করতে পারেননি। চন্দ্রপাদ পাহাড়ের গুহাতেই আছে এইসব সর্বরোগহর গুল্ম, বিনা আয়াসে তা লাভ করা যায় না, এঁর উচিত সেখানে গিয়ে সাধনা করা।

আর কি চোখ বন্ধ করে থাকা যায়। ধড়মড় করে উঠে বসে বললে সূর্যপ্রভ, হে সুন্দরী, কে তুমি?

সখী বললে, ইনি সুমেরুর ছোটো ভাইয়ের মেয়ে।

সলাজ বিলাসিনী সখীকে টেনে নিয়ে প্রস্থান করল তৎক্ষণাৎ।

সূর্যপ্রভ আর থাকতে পারেনি। তৎক্ষণাৎ ঘুম থেকে জাগিয়েছিল সেনাপতি প্রভাসকে। বলেছিল ওষধি-সাধন বৃত্তান্ত। তারপর তা ময়দানবের কানেও তোলা হল।

সবুর আর সইছে না যখন, তখন সেই রাতেই দলবল নিয়ে যাওয়া হলা চন্দ্রপাদ পাহাড়ে। সেখানকার গুহার সামনে আসতে গেলেও বাধা অনেক। কিন্তু সূর্যপ্রভ যে সিদ্ধবিদ্যায় পটু। অসাধারণ সেই বিদ্যার জোরে হটিয়ে দিল গুহারক্ষকদের।

কিন্তু বাধা সেখানেও। এতক্ষণ মায়ার বশীভূত করা গেছে, মান, বোধি, যক্ষ আর গন্ধর্বদের। এবার লড়তে হবে খোদ শিবের অনুচরদের সঙ্গে। তাদের বিকট বিকৃত মুখ দেখলেই যে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়!

তখন শুরু হল শিব-স্তব। শিব প্রীত হলেন। গুহার ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হল শুধু প্রভাসকে।

ঘুটঘুটে আঁধার বিরাজ করছিল গুহার মধ্যে। কিন্তু প্রভাস ভেতরে ঢুকতেই....কী আশ্চর্য!

মিলিয়ে গেল অন্ধকার। আলো ঝলমলিয়ে উঠল গুহায়, সে আলো আসছে কোত্থেকে, তা বোঝা যাচ্ছে না।

শুধু দেখা যাচ্ছে রাশি রাশি লতাগুল্ম, দিব্য ওষধি।

প্রভাস সংগ্রহ করে নিল সাত রকমের ওষধি। বেরিয়ে এসে সূর্যপ্রভকে নিয়ে ফিরে এল সুমেরুর আশ্রমে।

কিন্তু প্রভাসকে প্রবেশ করতে দেওয়া হল গুহায়, সূর্যপ্রভর প্রবেশ নিষেধ করা হল কেন?

কারণ ব্যাখ্যা করে দিল সুবাসকুমার। দুটো কারণে প্রভাসকে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে গুহার মধ্যে। প্রথম কারণ, সে সূর্যপ্রভর প্রাণের বন্ধু, দ্বিতীয় কারণ, আগের জন্মে প্রভাস এই গুহা নিজের অধিকারে রেখেছিল বিপুল বীরত্ব দেখিয়ে।

আগের জন্মে প্রভাস ছিল মস্ত যোদ্ধা, এই গুহার অধিপতি? সে কাহিনি শুনতে উৎসুক হয়েছিল সব্বাই।

গল্প শুনিয়েছিল সুবাস কুমার।

নমুচি নামে ছিল এক প্রখ্যাত দানব। বীরপুরুষ তো বটেই, দুহাতে দান করতেও কখনও কার্পণ্য করেনি। অনেক আগে বিষ্ণুপূজো করেছিল সে দশ হাজার বছর ধরে অতি অদ্ভুত উপায়ে, স্রেফ ধূমপান করে।

একটানা এত বছর ধূমপান করার ক্ষমতা দেখে পরম প্রীত হয়ে বিষ্ণু তাকে বর দিতে চেয়েছিলেন।

নমুচি চেয়েছিল একটাই বর, লোহা, কাঠ বা পাথর দিয়ে তাকে প্রহার করলেও তার যেন মৃত্যু না হয়। অর্থাৎ তৎকালীন যাবতীয় অস্ত্রাঘাতে সে যেন অবধ্য থাকে।

সেই বরই তাকে দিয়েছিলেন শ্রীবিষ্ণু। এমনই বর যে নমুচির পরাক্রমে স্বয়ং ইন্দ্রকেও চম্পট দিতে হয়েছে।

পরে অবশ্য কশ্যপের কথায় ইন্দ্রের সঙ্গে সন্ধি করে নেয় নমুচি।

কিছুদিন গেল এইভাবে। তারপর মন্থন করা হল ক্ষীরসমুদ্র দেবতা আর অসুরদের যৌথ উদ্যোগে। উঠে এল বিস্তর রত্ন। লক্ষ্মীর উত্থান ঘটতেই ভগবান নারায়ণ তাঁকে নিলেন, নমুচি নিল উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়াকে। রত্ন ভাগাভাগি করা হল দেবতা আর অসুরদের মধ্যে।

এরপর উঠল অমৃত। দেবতারা অম্লানবদনে তা চুরি করে চম্পট দিতেই বিষম লড়াই লেগে গেল দেবতা আর অসুরদের মধ্যে।

কিন্তু মজা এই যে, অসুররা পটাপট করে মরতে না মরতেই উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব ফটাফট করে তাদের মরা ধড়ে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়ে গেল!

এররকম লড়াইয়ে অসুররা তো জিতবেই। জিতেও গেল।

মরেও যারা বেঁচে ওঠে, তাদের সঙ্গে লড়াই চলে কী?

ধুন্ধুমার এই কাণ্ড দেখে বুদ্ধি দিলেন দেবগুরু বৃহস্পতি। ইন্দ্রকে বললেন, কী বোকা তুমি! নমুচি মহা দানবীর, তার কাছে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়, কাউকে ফেরায় না, তোমাকেও ফেরাবে না। যাও, গিয়ে চাও।

ইন্দ্র বললে, কী চাইব?

উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব।

দানবীর নমুচি যাচঞামাত্র উচ্চৈঃশ্রবাকে দান করেনি, অনেক ভেবেছিল। গুরু শুক্রাচার্যও অশ্বদান করতে বারণ করেছিলেন।

কিন্তু খ্যাতির মোহ পেয়ে বসেছিল নমুচিকে। অশ্বদান না করলে যে তার দানবীর খ্যাতি নাশ পাবে।

সুতরাং, উচ্চৈঃশ্রবাকে পেয়ে গেল চতুর ইন্দ্র।

তারপরেই খতম করে দেওয়া হল নমুচিকে। কীভাবে? তাকে তো লোহা, কাঠ বা পাথর দিয়ে মারলে মরবে না।

তাহলে?

গোরুর শিঙ দিয়ে তৈরি বজ্র দিয়ে বিনাশ করা হল বেচারা নমুচি-কে। চতুর্থ রিপু মোহকে জয় না করতে পারার শাস্তি, হাতে হাতে।

কিন্তু এ যে বিরাট অন্যায়! এ তো যথা যুদ্ধ নয়, কৌশল যুদ্ধ এবং অন্যায় ভাবে শত্রুনিধন।

ঢি-ঢি পড়ে গেছিল ত্রিভুবনে। দানবদের জননী দনু চাইলেন, নমুচি ফের আসুক তার গর্ভে।

তাই হয়েছিল। নতুন জন্ম নিয়ে নতুন নাম নিয়েছিল নমুচি, প্রবল। প্রবল নামেই সে বারবার হারিয়ে গেছিল ইন্দ্রকে।

কিন্তু দেবতাদের চালাকির কাছে ফের ভুল করে বসেছিল প্রবল তথা নমুচি। তার শরীর চেয়েছিল দেবতারা এক নরমেধ যজ্ঞে, অর্থাৎ, মানুষ মারার যজ্ঞে। জন্মান্তরেও নমুচি তথা প্রবল দানবীর হিসাবে যশ লাভ করেছিল। যশের মোহে পয়লানম্বর শত্রু দেবতাদের দান করেছিল নিজের কলেবর।

আর কী দেরি করে! তৎক্ষণাৎ সেই শরীরকে কেটে একশোটা টুকরো বানিয়ে ফেলেছিল ধুরন্ধর দেবতারা!

সেই মোহগ্রস্ত দানবীরই মর্ত্যে জন্মেছে প্রভাস নাম নিয়ে। আগের জন্মের অধিকৃত এই ওষধি-গুহা আজও অধিকারে রেখে দিয়েছে তার দাস-বাহিনী। গুহার নীচে, পাতালে, আজও রয়েছে তার সুরম্য প্রাসাদ, বারোজন স্ত্রী, বহু রত্ন আর অস্ত্রশস্ত্র। নমুচির অবতার প্রভাসকে তাই তো গুহায় প্রবেশ করতে দিয়েছে তার আগের জন্মের কিঙ্কর আর অনুচরেরা।

আশ্চর্য এই কাহিনি শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছিল সূর্যপ্রভ। তারপরে নিজেই ধেয়ে গেছিল গুহামধ্যে, রত্নসংগ্রহের মতলবে।

বাধা দিয়েছিল প্রভাস। দুর্ধর্ষ কিঙ্কর আর অনুচর বাহিনী তার আজ্ঞাবহ, আর কারও নয়। সূর্যপ্রভ প্রাণে বাঁচবে না।

তাই তাকে রুখে দিয়ে নিজেই গেল গুহার ভেতরে। প্রথমেই জুটিয়ে নিল আগের জন্মের সেরা বউ চিন্তামণিকে, অন্যান্য বউদেরও অবশ্যই বাদ দিলেন না, তারপর ঘোড়সওয়ার অসুর সৈন্যদের দিয়ে পাতালের সমস্ত রত্নগুহা থেকে সব রকমের দামি দামি পাথর সংগ্রহ করে নিয়ে সদলবলে বেরিয়ে এল গুহার বাইরে।

সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। প্রতিটি ঘোড়ার পিঠে শুধু রত্ন আর রত্ন। জহরের স্তূপ রচিত হয়ে গেল সূর্যপ্রভর পায়ের কাছে। বন্ধুত্বর চাইতে দামি আর কিছু হয় না। তাই মুক্ত মনে হাসিমুখে সমস্ত রত্ন-ঐশ্বর্য দিয়ে দিল প্রিয় বন্ধুকে।

সসম্মানে শিবিরে ফিরে এল সূর্যপ্রভ।

৪৭. লড়াই! লড়াই! লড়াই!

রাত ভোর হতেই তপোবন থেকে সসৈন্যে বেরিয়ে পড়ল সূর্যপ্রভ, গেল ত্রিকুট-এর দিকে, যেখানকার রাজাশ্রুতশর্মা।

খবরটা পেয়েই শ্রুতশর্মা দূত পাঠাল সুমেরুর কাছে।

বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে আমন্ত্রণ। সবাইকে নিয়ে কাছে আসুন, যোগ্য সমাদর জানাই, দূরে থাকলে তা করতে পারছি না।

আমন্ত্রণ পেয়ে সুমেরু গেল শ্রুতশর্মার রাজ্যে।

সেই ফাঁকে শত্রুসৈন্যদের ব্যূহ রচনা দেখবার জন্যে রণকুশল সূর্যপ্রভ উঠে গেল পাহাড়ের উঁচু জায়গায়।

ময় বুঝিয়ে গেলেন পুত্র সুনীথকে, শ্রুতশর্মারসৈন্য অনেক, দেবগণ তাকে সাহায্য করে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় যুদ্ধজয় বেশ কঠিন হবে।

ঠিক এই সময়ে এল শ্রুতশর্মার দ্বিতীয় দূত। রণক্ষেত্র তো বীরপুঙ্গবদের উৎসব করার জায়গা। কিন্তু এইটুকু জায়গায় সে রকম উৎসব তো জমবে না। আসা হোক কলায়গ্রামে। সেখানে জায়গা অনেক। আশ মিটিয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করা যাবে।

কথাটা মন্দ নয়। দলবল নিয়ে সূর্যপ্রভ গেল কলায়গ্রামে। শ্রুতশর্মাও সৈন্যসামন্ত এনে শিবির স্থাপন করল সেখানে।

সূর্যপ্রভ রচনা করলো আধখানা চাঁদের মতো ব্যূহ, নিজে রইল মাঝে, দুপাশে দুই বিশ্বস্ত সহযোগী।

বেজে উঠল রণভেরী।

দেবতা আর মুনিদের ভিড় জমে গেল আকাশে। এসেছে অপ্সরা আর মুনিদের পত্নীরাও। এমন একটা ধুন্ধুমার লড়াই না দেখলেই যে নয়। দানবরাও আকাশে উঠে গিয়ে উৎসুক হয়ে চেয়ে রইল যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চের দিকে।

ভয়ানক যুদ্ধ চলেছিল সারাদিন। মুণ্ডহীন কবন্ধরা ছুটোছুটি করেছিল যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে!

সন্ধ্যা হল। উভয় পক্ষেরই অর্ধেক সৈন্য সাবার হয়ে গেল।

সুতরাং, তখনকার মতো বিরতি দিয়ে ফিরে যাওয়া হল শিবিরে।

৪৮.

দ্বিতীয় আর তৃতীয় দিনের লড়াইয়ের রণভূমি রক্ত আর কাটা মড়ায় ভরে গেল। জয়লাভ করতে পারলনা কোনও পক্ষই।

মজা এই যে সেই রাতে সূর্যপ্রভর বউরা একটাই আলোচনায় মেতে রইল। সে আলোচনা যুদ্ধ সংক্রান্ত নয়, কীভাবে কামাতুরা সূর্যপ্রভকে উপযুক্ত কামিনী সরবরাহ করে তাকে সুখী করা যায়।

মেয়েদের স্বভাবই যে তাই। জীবনে সুখদুঃখ তো আছেই, হালকা আলোচনায় সবই লঘুভাবে দেখতেপারে।

পরের দিন যুদ্ধ চলল সারাদিন। চতুর্থ দিনের শেষেও দেখা গেল শ'য়ে শ'য়ে কবন্ধ নেচে বেড়াচ্ছে রণক্ষেত্রে।

যুদ্ধে জিতে যাচ্ছে সূর্যপ্রভ, হারতে চলেছে শ্রুতশর্মা। বিমর্ষবদনে সে ফিরে গেল শিবিরে, সৈন্যসামন্তনিয়ে।

সেই রাতেই একটা খবর পেল সূর্যপ্রভ। শত্রু শ্রুতশর্মার দুই সেনাপতি এক তাপসীর মুখে শুনেছে আশ্চর্য এক ভবিষ্যৎবাণী। দেবতাদের সঙ্গে মানুষের লড়াইয়ে জিতবে মানুষ। জিতবে সূর্যপ্রভ।

প্রীত সূর্যপ্রভ তৎক্ষণাৎ শ্রুতশর্মার সেই দুই সেনানায়ককে টেনে নিয়েছিল নিজের দলে।

তারপর ঢুকেছিল শোবার ঘরে।

৪৯.

কিন্তু ঘুমোতে পারেনি। বন্ধু বীতভীতিকে বলেছিল, গল্প শোনাও, সে গল্প, যেন হয় বীররসের।

শুরু হয়েছিল ফরমায়েসি গল্প।

মহাসেন নামে এক রাজা ছিলেন উজ্জয়িনীতে। তাঁর মহিষীর নাম অশোকবতী। প্রিয় অনুচর ছিল গুণশর্মা নামক এক ব্রাহ্মণ যুবক, যার ছিল অশেষ গুণ। রাজাকে সবসময়েই আনন্দে রেখে দিত বিবিধ কায়দায়।

একদিন রাজার ইচ্ছে হল, গুণশর্মার নাচ দেখবে।

একই ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল রানি অশোকবতীও।

নিরুপায় গুণশর্মা তখন দেখিয়েছিল তার নাচ। নিছক নাচ নয়, পূর্ণাঙ্গ নাচ। সর্বাঙ্গ দিয়ে নাচ। কত রকমের হাত আর আঙুলের মুদ্রা, কত রকমের পদবিক্ষেপ, কত রকমের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন।

অবাক হয়ে গেলেন রাজা। চক্ষুস্থির রানির, বিমুগ্ধও বটে। এমন আশ্চর্য নৃত্যকলা যে জানে, না জানি সে আরও কত গুণের অধিকারী। নামটাই যে গুণশর্মা।

সুতরাং বাজিয়ে নেওয়ার জন্যে তাকে বাজাতে বলা হল বীণা।

এত আচ্ছা বিড়ম্বনা। কিন্তু রাজাকে যে হাতে রাখা দরকার। তাই আর একখানা গুণপনা দেখিয়ে দিল গুণশর্মা।

বীণা হতে নিয়ে বললে, অসম্ভব। এ বীণায় কখনও রাগরাগিণী বাজে? এর তারে আছে কুকুরের লোম।

কুকুরের লোম! বীণার তারে!

তৎক্ষণাৎ তলব করা হয়েছিল বীণা প্রস্তুতকারককে। মাথা চুলকে সে বলেছিল, গুণশর্মা যথার্থ বলেছে। সত্যিই কুকুরের লোম আছে বীণার তারে।

তৎক্ষণাৎ আনা হয়েছিল আর এক বীণা।

বীণাবাদন কাকে বলে, ঝঙ্কারে টঙ্কারে কঙ্কারে তা দেখিয়ে দিয়েছিল গুণশর্মা। সুরের ঝর্না বইয়ে দিয়েছিল রাজসভায়। এমন মানুষকে কি নিছক রাজ অনুচর রাখা সঙ্গত? হোক সে রাজমন্ত্রী।

এবং, তাই হয়ে গেল গুণশর্মা।

রানি অশোকবতীও মজে গেল গুণশর্মার গুণপনায়। এমন গুণের আধার যদি হয় শয্যা সহচর, আহা, না জানি কী গুণ দেখাবে সম্ভোগকালে!

কিন্তু এক্ষেত্রে কৌশল প্রয়োগ প্রয়োজন। তাই হেলেদুলে রকমারি ছলনা দেখিয়ে রাজার সমীপে এসে রানি বললে, আমি বীণা শিখবো, গুণশর্মার কাছে।

তৎক্ষণাৎ সেই কাজে বহাল হয়ে গেল গুণশর্মা।

এবং, কিছুদিন পরেই খেল শুরু হয়ে গেল রানির। বীণা শিক্ষা তো অছিলা, রমণের রাগরাগিণী সত্বর শুরু করা দরকার। সেক্ষেত্রে আগে সরাতে হবে রাজাকে।

অতএব, বিষ মিশিয়ে দিল রাজার খাবারে।

গুণশর্মার আর এক গুণ দেখা গেল তখনই। রাজাকে সেই খাবার খেতে দিল না। সোজা বলে দিল, খাবারে বিষ আছে. কাউকে খেতে দিন, নির্ঘাৎ সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। ভয় নেই। আমার আর এক গুণ তখন দেখাবো। মানুষটাকে বাঁচিয়ে দেব।

আশ্চর্য! আশ্চর্য! সত্যিই আধ-মড়াকে বাঁচিয়ে দিল গুণশর্মা। রাঁধুনিকে বিষাক্ত খাবার খেতে দিয়েছিলেন রাজা। সে বেচারা জ্ঞান হারাতেই গুণশর্মা তাকে সজ্ঞানে এনে দিয়েছিলেন তৎক্ষণাৎ! স্রেফ মন্ত্রের জোরে!

তখন রাঁধুনিকে জেরা শুরু করেছিলেন রাজা, কে তোকে বলেছে আমার খাবারে বিষ দিতে?

নুন খেলে গুণ তো গাইতেই হবে। অন্ততঃ তার পাপাচারের কথা না বলাই ভালো। সুতরাং বাজ্ঞী অশোকবতীর নাম এক্কেবারে চেপে গিয়ে বেমালুম মিথ্যে বলে গেল পাচক ঠাকুর, গৌড়ের রাজা। বিষ দিয়ে আপনাকে মারবার জন্যেই তো আমাকে ঢুকিয়েছে আপনার রন্ধনশালায়।

সুতরাং কারাগারে ঢোকানো হল পাচক মহাশয়কে। বহাল তবিয়তে রয়ে গেল রানি অশোকবতী, রইল তক্কে তক্কে গুণশর্মার রতি-গুণপনার আস্বাদ না পাওয়া পর্যন্ত শরীরে যে আগুন ছুটছে।

অবশেষে একদিন ধৈর্য রাখতে না পেরে মনোরথ ব্যক্ত করেই ফেলল অশোকবতী।

ছিঃ ছিঃ করে উঠেছিল গুণশর্মা। কিন্তু মনের আগল একবার ভেঙে গেলে নারীর আর রইল কী? ছলনা মিনতি, অন্তে শুরু হল ভয় দেখানো। রানি নিজে তো মরবেই, তার আগে মারবে গুণশর্মাকে।

নষ্ট মেয়ের অসাধ্য কিছু নেই। গুণশর্মা তা জানত। তাই তৎক্ষণাৎ সুর পালটে মিথ্যে স্তোক দিল রানিকে, আরও কটা দিন সবুর করা যাক না, তারপর দোঁহে মিলে ভাসা যাবে সুখের সাগরে।

সুতরাং, অনাস্বাদিতপূর্ব মদনানন্দ লাভের আশায় বিভোর হয়ে রইল রানি।

কিছুদিন পর। রাজ্যবিস্তারের মতলবে রাজা মহাসেন সোমেশ্বরের রাজধানী ঘিরে ধরতেই রেগে টং হয়ে দৌড়ের রাজা বিক্রমশক্তি এসে চড়াও হলেন মহাসেনের সৈন্যসামন্তের ওপর।

মহা ফ্যাসাদে পড়লেন রাজা মহাসেন। এক্কেবারে বিমূঢ় অবস্থা। চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে যাবেন যে!

অভয় দিয়েছিল মন্ত্রী গুণশর্মা।

নিশীথ রাতে দেখিয়েছিল নিজের আর এক যোগশক্তি। চোখে কাজল দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছিল। অদৃশ্য অবস্থার সটান ঢুকে গেছিল রাজা বিক্রমশক্তির শিবিরে। ফের দৃশ্যমান হয়েছিল। রাজাকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে জাগিয়েছিল।

বলেছিল, আমি এক বিষ্ণুভক্ত দেবদূত। বিষ্ণুর ইচ্ছা আপনাকে জানাতে এসেছি। রাজা মহাসেনের সঙ্গে লড়তে যাবেন না, সন্ধি করুন। উনি রাজি হবেন।

সুরক্ষিত শিবিরে আচমকা একজনকে দেখে বিহ্বল হয়ে গেছিলেন রাজা বিক্রমশক্তি। মানুষ এখানে ঢুকবে কী করে? নিশ্চয় দেবদূত এসেছে ভগবানের নির্দেশ বহন করে।

অতএব সন্ধির পরামর্শে রাজি হয়ে গেলেন রাজা।

চোখে ফের কাজল দিয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল গুণশর্মা।

রাজা বিক্রমশক্তির প্রত্যয়ের আর বাকি রইল কী?

সকালে হতেই সাঙ্গ হল সন্ধিস্থাপন পর্ব। সসৈন্যে স্বরাজ্যে প্রস্থান করলেন রাজা বিক্রমশক্তি।

সোমেশ্বরকে একা পেয়ে তার রাজ্য জয় করে নিয়ে উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন রাজা মহাসেন।

কিন্তু রাগ রইল বিক্রমশক্তির ওপর। রইলেন সুযোগের প্রতীক্ষায়।

সে সুযোগ আসবার আগেই ঘটে গেল একটা অঘটন। কালো সাপের ছোবল খেয়ে মৃতপ্রায় হলেন মহাসেন।

সাপ ছোবল মেরেছিল নদীর তীরে। মন্ত্রী গুণশর্মাকে নিয়ে নদীর হাওয়া খেতে গিয়ে মরতে বসেছিলেন।

কিন্তু গুণশর্মা তো ছিল সঙ্গে। বিষ নামিয়ে দিয়েছিল তৎক্ষণাৎ।

আর তারপরেই একদিন বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে অতর্কিতে বিক্রমশক্তির ওপর চড়াও হলেন মহাসেন, সন্ধির কথা শিকেয় তুলে রেখে।

অপ্রস্তুত বিক্রমশক্তি হকচকিয়ে গিয়েও কিন্তু নিজের বীরত্ব দেখিয়ে গেলেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন মহাসেনকে।

একে একে মহাসেনের সমস্ত অস্ত্র কেড়ে নিয়ে প্রাণটাকেও বের করে করে দিলেন শরীর থেকে।

কিন্তু অনুগত গুণধর গুণশর্মা তৎক্ষণাৎ দেখিয়ে দিল তার আর এক গুণ। প্রাণ ফিরিয়ে আনল মহাসেনের নিষ্প্রাণ কলেবরে। তারপর এমন মহাশক্তি সঞ্চার করে দিল মহাসেনের ভেতরে যে পালটা আক্রমণ চালিয়ে বিক্রমশক্তির সমস্ত রাজ্য কেড়ে নিলেন মহাসেন।

দূর হল রাজ্যবিস্তারের জবর কাঁটা। পরম সুখে রইলেন মহাসেন।

সবই গুণশর্মার প্রসাদে।

এদিকে কিন্তু স্বয়ং গুণশর্মার বিপদ ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে চলেছে রাজঅন্তঃপুরে। অশোকবতীর সারা শরীরের কামানল দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। কামদেবের কৃপায় অশোকবতী অস্থির হয়ে অবশেষে একদিন ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল। গুণশর্মা সে স্তোকবাক্য দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রেখেছে, সম্রাজ্ঞী হয়েও কাম-ভিখারিণী হয়ে থাকতে বাধ্য করেছে, এই নিষ্ঠুর সত্যটা একদিন হৃদয়ঙ্গম করে রেগে টং হয়ে চলে গেল সটান রাজা মহাসেনের কাছেই। তখন সে বাঘিনী।

ইনিয়ে বিনিয়ে মিথ্যে অভিযোগের সাতকাহন রচনা করে বিষ ঢেলে গেল মহাসেনের কানে।

কী বললে?

বললে, গোপনসূত্রে বিশেষ একটা খবর এসেছে অশোকবতীর কানে। গুণশর্মা একটা মহাপাতক। টাকার লোভে সে দূত পাঠিয়েছিল গৌড়-রাজার কাছে। তাকে কারাগারে রাখা হয়েছে। কিন্তু রাজা মহাসেনকে বিষ দিয়ে মারবার জন্যে পাঠানো হয়েছিল সেই পাচককে। এই সময়ে গুণশর্মার দূত পালিয়ে আসে কারাগার থেকে। বিষ প্রয়োগের চক্রান্ত জানায় গুণশর্মাকে। গুণশর্মা রেগে গিয়ে সেই পাচককে প্রাণে মেরে দিয়েছে। কিন্তু আজই সেই পাচকের খবর নিতে এসেছিল তার মা, বউ আর ছোটো ভাই। গুণশর্মা খবর পেয়েই কারাগারে আটকেছে মা আর বউকে, পারেনি ছোটো ভাইকে, সে পালিয়ে এসেছে অশোকবতীর কাছে। সব কথা যখন বলছে, তখন গুণশর্মা দৌড়ে এসেছিল অন্তঃপুরে, তাকে দেখেই পাচকের ছোটো ভাই পালিয়েছে, কোথায় গেছে, তা জানা নেই অশোকবতীর। কিন্তু গুণশর্মার পরবর্তী আচরণ অতীব বিস্ময়কর, অপমানজনক এবং ক্ষমার অযোগ্য। সে অশোকবতীর সঙ্গে সঙ্গম করতে চেয়েছিল। অশোকবতীকে সবলে জাপটে ধরেছিল। কিন্তু সতীত্ব নাশ করার আগেই সেখানে এসে যায় পল্লবিকা নামে এক দাসী। পালিয়ে যায় গুণশর্মা।

মহান মানুষরাও বিশ্বাস করে নারীর মিথ্যা বচনে, যে নারীকে সেই পুরুষ প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। শোনা বিষয়টা নিয়ে ভাবনাচিন্তার শক্তিও লোপ পায়। নারী যদি কুহকিনী হয়, সতীত্বের ছদ্ম বচনে পুরুষকে দিয়ে, আপন পুরুষ অথবা পরপুরুষ, গর্হিত কাজ করিয়ে নিতে পারে। আর রাজারা তো কানে শুনেই বিশ্বাস করে নেয়।

সুতরাং তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন রাজা মহাসেন। গুণশর্মার অশেষ গুণের দৌলততেতিনি যে আজও জীবিত আছেন, তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলেন। অশোকবতীকে অভয় দিয়ে রাজসভায় গেলেন।

কটমট করে চেয়ে রইলেন গুণশর্মার দিকে। দেখেই বুঝেছিল গুণশর্মা, একটা কিছু অঘটন ঘটতে চলেছে। লক্ষণ সুবিধের নয়।

আচমকা সিংহাসন থেকে এক লাফে রাজা চেপে বসলেন গুণশর্মার কাঁধে।

গুণশর্মা কিন্তু সবিনয়ে বললে রাজাকে, আপনি রাজা, আমি আর এই সভার সবাই আপনার চাকর। চাকরের কাঁধে কি রাজা বসেন? আপনি রাজসিংহাসনে বসে হুকুম দিন, আমরা তামিল করব।

বিন্দুমাত্র উষ্মা অথবা লাঞ্ছনা প্রকাশ পেল না গুণশর্মার কণ্ঠস্বরে।

সিংহাসনে গিয়ে বসলেন মহাসেন। তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ভীষণ রাগত কণ্ঠে সভার সবাইকে বললেন রানি অশোকবতী যা-যা বলেছে। শুধু বললেন না, গুণশর্মা নাকি অশোকবতীকে জাপটে ধরে তার সঙ্গে সহবাস করতে চেয়েছিল।

অর্থাৎ, বলা হল শুধু বিষপ্রয়োগের চক্রান্ত। এ খবর রানির মুখে শুনেছেন, তাও চেপে গেলেন।

আর ঠিক সেই প্রশ্নেই চলে গেল গুণশর্মা, শুনলেন কার মুখে?

সরাসরি জবাব না দিয়ে মহাসেন বললেন, খাবারে যে বিষ দেওয়া ছিল, তুমি জানলে কী করে?

সে জ্ঞান আমার আছে বলেই জেনেছি।

রাজার ধামাধরা মন্ত্রীরা এই জবাব হেসেই উড়িয়ে দিল।

গুণশর্মাকে রাজা মন্ত্রী করেছিলেন তাদের সঙ্গে যুক্তিপরামর্শ না করেই। সুতরাং বদলা নেওয়ার এই তো সময়।

গুণশর্মা কিন্তু জবাবটা দিল ঠাণ্ডা মাথায়। বললে, আসল ব্যাপার নিয়ে খোঁজখবর না করে হঠাৎ কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত নয়। বিশেষ করে রাজাদের উচিত এই সুনীতি অনুসরণ করা।

এ যে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন অকৃতজ্ঞ রাজা মহাসেন। লাফিয়ে নেমে এলেন সিংহাসন থেকে। ছোরা মারলেন গুণশর্মাকে।

অতঃপর রাজার অনুচরদেরও সেই পথ অনুসরণ করা বিধেয়। তারাও দল বেঁধে বেদম প্রহার করে গেল গুণশর্মাকে।

অশেষ গুণবান গুণশর্মা দেখিয়ে দিল তার আর এক গুণ। ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে, সমস্ত প্রহার সহ্য করে, নিমেষে নিরস্ত্র করে ফেলল প্রত্যেককেই, তারপর একজনের চুলের সঙ্গে আর একজনের চুল গিঁট দিয়ে বেঁধে, হিড়হিড় করে টেনে আনল রাজসভার বাইরে, এবং নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল চোখে কাজল দিয়ে, যে-কাজল সব সময়ে সে সঙ্গে রেখে দিত কাপড়ের আঁচলে গিঁট দিয়ে।

নিরাপদ জায়গায় এসে ভেবে নিল চকিতে, রাজার এই মূঢ়তার মূলে নিশ্চয় রয়েছে রানি অশোকবতীর চক্রান্ত। যে কন্যা চরিত্র হারিয়েছে, তার স্বামী রাজা হলেও সেই রাজার সেবা করা আর উচিত নয়।

এইসব ভেবে হাঁটতে হাঁটতে একটা গ্রামে এসে পৌঁছেছিল গুণশর্মা। সেখানে দেখেছিল বটগাছের তলায় বসে এক ব্রাহ্মণ ছাত্র পড়াচ্ছেন। তাঁর সৌম্য আকৃতি দেখে মুগ্ধ হয়েছিল গুণশর্মা। প্রণাম করেছিল পায়ে মাথা ঠেকিয়ে।

বিমুগ্ধ ব্রাহ্মণ গুণশর্মার পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন।

সেই প্রথম আত্মপরিচয় প্রকাশ করেছিল গুণশর্মা।

এবার বর্ণিত হোক সেই বিচিত্র কাহিনি।

গুণশর্মা প্রথমে জ্ঞাপন করেছিল তার অধীত বিদ্যাসমূহ। সে অধ্যয়ন করেছে সামবেদ-এর বারোটি শাখা, ঋগবেদ-এর দুইটি শাখা, যজুর্বেদ-এর সাতটি শাখা এবং অর্থববেদ-এর একটি শাখা।

শুনে স্তম্ভিত হয়েছিলেন বটতলার সেই অধ্যাপক।

এবং, গুণশর্মাকে দেবসম মনে করেছিলেন। মানুষ নয় গুণশর্মা, নিশ্চয় দেবতা।

জানতে চেয়েছিলেন তার প্রকৃত পরিচয়।

সেই পরিচয়ই দিয়েছিল গুণশর্মা, সে এক আশ্চর্য উপাখ্যান।

আদিত্যশর্মা নামক এক ব্রাহ্মণের নিবাস ছিল উজ্জয়িনী নগরে। ছেলেবেলাতেই হারিয়েছিলেন বাবা আর মা-কে। মামার বাড়িতে থেকে বেদ আর চৌষট্টিকলার পাঠ নিয়েছিলেন। তারপর তিনি বন্ধুরূপে পেলেন নিত্য ভ্রমণকারী এক সন্ন্যাসীকে, তিনি জয় করার ব্রত নিয়ে সাধনা করেন এবং জয় করে তবে ছাড়েন।

আদিত্যশর্মাকে নিয়ে তিনি শ্মশানে গিয়ে যক্ষীদের তুষ্ট করার আরাধনা আরম্ভ করেছিলেন। অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে হোম করে গেচ্ছিলেন।

ফলে, আকাশ থেকে নেমে এসেছিল এক সোনার বিমান। বিমান থেকে পৃথিবীর মাটিতে পা রেখেছিলেন অসাধারণ এক যক্ষী। তাঁর সারা অঙ্গে বিচিত্র সোনার গয়না। সঙ্গে সখীর দল।

মধুর বচনে সুন্দরী যক্ষী বলেছিলেন নিত্যভ্রমণকারী সন্ন্যাসীকে, আমি যক্ষী বিদ্যুৎ-মালা, এরা আমার কিঙ্করী। এদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে হয়, তাকে ভোগ করো। কিন্তু আমাকে পাবে না, কারণ, তোমার হোম-পদ্ধতি দিয়ে শুধু আমার কিঙ্করীদের লাভ করা যায়, আমাকে পাওয়া যায় না, কেননা, আমার মন্ত্রসাধন আর পূর্বজন্মের পুণ্যের ফল অন্যরকম। সুতরাং, আর মেহনত করো না, যা পাচ্ছো, তাই নাও।

যক্ষীর যুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর এক পরিচারিকাকে গ্রহণ করেছিলেন নিত্যভ্রমণকারী সন্ন্যাসী।

তৎক্ষণাৎ সোনার বিমানে চেপে আকাশে মিলিয়ে গেছিলেন অপরূপা সেই যক্ষিণী বিদ্যুৎমালা।

কিছুদিন পর আদিত্যশর্মা জিজ্ঞেস করেছিলেন অনিন্দ্যসুন্দরী সেই যক্ষীকে, বিদ্যুৎমালার চাইতে সেরা যক্ষী আর আছে নাকি?

যক্ষীর জবাব এই, সেরা যক্ষী তিনজন, বিদ্যুৎমালা, চন্দ্রলেখা আর সুলোচনা, তিন সেরা যক্ষকন্যার মধ্যে সবসেরা কিন্তু সুলোচনা।

এই বলেই অন্তর্হিত হয়েছিল সেই যক্ষী। যাবার সময়ে অবশ্য বলে গেছিল, আবার আসব।

এবং সে আসত প্রতিদিন। নানারকম ভোগসামগ্রী দিয়ে সেবা করে যেত নিত্যভ্রমণকারী সন্ন্যাসী আর গুণশর্মাকে।

দুজনেই অবশ্য তদ্দিনে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন।

একদিন যক্ষীর সামনেই নিত্যভ্রমণকারী সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আদিত্যশর্মা, সুলোচনাকে পেতে গেলে কি মন্ত্র জপ করতে হয়?

যক্ষী বলেছিল, সে মন্ত্র জানেন শুধু ভ্রদন্ত নামে এক যক্ষী। তিনি থাকেন দক্ষিণের সমুদ্রের উপকূলে অবিতুক্ত নামে একটা বাগানে।

আদিত্যশর্মা তখন চলে এলেন ভদন্তের আশ্রমে, যক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে। তিন বছর একটানা সেবা করে গেল ভদন্তের যক্ষী সহ।

প্রীত হয়ে সুলোচনাকে লাভ করার মন্ত্র আদিত্যশর্মাকে শিখিয়ে দিল ভদন্ত।

আদিত্যশর্মা চলে এলেন এক বিজন অরণ্যে। মন্ত্র উচ্চারণ করে হোম করে গেলেন। সোনার বিমানে চেপে আকাশ থেকে নেমে এলেন সবসেরা যক্ষী সুলোচনা।

বললেন, তোমার মন্ত্রে আমি বশ্যতা স্বীকার করছি। কিন্তু একটা শর্তে। ছমাস আমাকে অক্ষতযোনি রাখো। তারপর সহবাসে প্রবৃত্ত হবে। তখন আমার গর্ভে আসবে তোমার পুত্র। সে হবে মন্ত্রবীর। সব রকম সুলক্ষণযুক্ত।

আদিত্যশর্মা রাজি হয়ে গেলেন সাধু প্রস্তাবে। সুলোচনার সঙ্গে সুবর্ণ বিমানে চেপে চলে গেলেন তাঁর সুরম্য নিকেতনে।

ছমাস পরে সুলোচনার গর্ভে এল কে?

গুণশর্মা!

বললে গুণশর্মা, আমার ভেতরে অনেক গুণের সমাবেশ ঘটবে, সেই সুলক্ষণ দেখেই আমার নামকরণ হয়েছিল গুণশর্মা। আমার শিক্ষাদীক্ষা অলকায়, যে যক্ষপতির কাছে, তাঁর নাম মণিবরাখ্য। চতুর্বেদ আর

চৌষট্টি কলা অধ্যয়ন করেছিলাম তাঁরে কাছেই।

এই সময়ে একটা অঘটন ঘটে গেল। আমার দাদামশাই যক্ষরাজ কুবেরের কাছে এসেছিল দেবতাদের রাজা ইন্দ্র। তৎক্ষণাৎ সবাই দাঁড়িয়ে উঠেছিল, সংবর্ধনা জানিয়েছিল।

আমার বাবা তা করেননি, তিনি অন্যমনস্ক ছিলেন।

ভীষণ রেগে গিয়ে শাপ দিয়েছিল ইন্দ্র, যাও, মর্ত্যে গিয়ে জন্মাও।

আমার মা সুলোচনা রাগ কমিয়ে এনেছিল ইন্দ্রের।

রাগ কমলেও মুখ দিয়ে যে কথা বেরিয়ে গেছে, সেকথা তো ফলবেই। এবং তা ফলুক বিকল্পভাবে।

বাবা আর ছেলের মধ্যে যখন কোনও প্রভেদ নেই, তখন আদিত্যশর্মার বদলে মর্ত্যে যাক তাঁর ছেলে গুণশর্মা।

অভিশাপের রূপান্তর ঘটিয়ে উধাও হয়ে গেলেন ইন্দ্র। আমার বাবা আমাকে নিয়ে এলেন উজ্জয়িনীতে, সেখানে আমার থাকার ব্যবস্থা করে চলে গেলেন অলকায়।

ভাগ্যকে টপকে যাওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। উজ্জয়িনীতেই ঘনিষ্ঠ হলাম রাজার সঙ্গে।

তারপর গুণশর্মা বলে গেল বেইমান রাজার কাহিনি।

সব শুনে ব্রাহ্মণ বললেন, চলো আমার বাড়ি। আমার নাম অগ্নিদত্ত।

গুণশর্মা অমত করেনি। অগ্নিদত্তর বাড়িতে গেল তৎক্ষণাৎ। সেখানেও তাকে দেখাতে হল তার আর এক অত্যাশ্চর্য গুণ।

অগ্নিদত্ত তাঁর মেয়েকে নিয়ে এলেন গুণশর্মার সামনে, সুলক্ষণা কিনা জানবার জন্যে। মেয়েটির নাম সুন্দরী। নামে সুন্দরী, রূপেও তাই।

কিন্তু গুণশর্মা তার অতীন্দ্রিয় নয়ন দিয়ে নিমেষে দেখে নিয়েছিল মেয়েটির নাক আর দুই উরুতে রয়েছে অনেকগুলো তিল।

বলেওছিল তৎক্ষণাৎ, এই মেয়ের শরীরে যতগুলো তিল আছে, সতীন হবে ততগুলো।

অগ্নিদত্ত তিল পরীক্ষা করিয়ে ছিলেন ছেলেকে দিয়ে। দিদির নাকে আর উরুতে দেখেছিল বেশ কয়েকটা তিল!

ব্রাহ্মণ অধ্যাপক অগ্নিদত্তর মাথা ঘুরে গেছিল গুণশর্মার গুণপণা দেখে। বলে ফেলেছিল, বাবা গুণশর্মা, তুমি আমার ঘর জামাই হও।

গুণশর্মা তখন একটা দামি কথা বলেছিল, হে ব্রাহ্মণ, যে মেয়ে নিজে ভালোবেসে পতি নির্বাচন করে, সে কখনও ভ্রষ্টা হয় না। কিন্তু যে মেয়ে বাবার পছন্দে বিয়ে করে, সে ব্যাভিচার করে বেড়ায়। যেমন, অশোকবতী। এই গেল এক নম্বর আপত্তি। দু-নম্বর আপত্তিটা এই কারণে : আপনার এই বাড়ি উজ্জয়িনীর খুব কাছেই। এখানে ঘর-জামাই হয়ে আছি শুনলে রাজা মহাসেন কি আমাকে ছেড়ে দেবে? তাই ঠিক করেছি, তীর্থ করে বেড়াবো, পাপক্ষয় করবো, তারপর দেহত্যাগ করবো।

অগ্নিদত্ত ব্রাহ্মণ তখন দিলেন প্রকৃতই সুপরামর্শ। বলে নিলেন, মূর্খ যদি অপমান করে, জ্ঞানী ব্যক্তি সে অপমানে অবিচল থাকেন। আকাশে ঢিল ছুঁড়লে, সে ঢিল নিজের মাথাতেই পড়ে। উজবুক মহাসেনও যথাসময়ে বুঝবেন, কি ভুল তিনি করেছেন। তা ছাড়া, এক অশোকবতীর উদাহরণ দিয়ে সব নারীকে বিচার করা অসঙ্গত। তাঁর কন্যা যখন সুলক্ষণা, গুণশর্মার বিচারে, তখন তাকেই বধূ করা হোক? আর, এই বাড়িতেই থাকা হোক, পাতাল ঘরে, সেখানকার হদিশ পাবে না পাপিষ্ঠ মহাসেন। আর তীর্থযাত্রা? কেনা জানে, সংসার ধর্মই সবচেয়ে বড়ো ধর্ম? গৃহ সংসার ত্যাগ করে তীর্থবাসী হওয়া কোনমতেই বৈধ নয়, দেহত্যাগ করাও মহাপাপ নরকে যেতে হয়।

অগ্নিদত্তর সুবচন গুণশর্মার মন আর বিবেক স্পর্শ করে গেছিল। পাতালঘরে সুন্দরীকে নিয়ে ঘরসংসার করার আগে অগ্নিদত্তের কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে দেবকুমারের আরাধনা করেছিল। সেই আরাধনায় সর্বপ্রকারে

সাহায্য করে গেছিল সুন্দরী। প্রীত হয়েছিলেন ভগবান কুমার। আবির্ভূত হয়েছিলেন। বর দিয়েছিলেন, মহাসেন তোমার হাতে টিট হবে, তার রাজ্য তোমার রাজ্য হবে।

বিয়ে হয়ে গেল সুন্দরীর সঙ্গে গুণশর্মার।

যথাসময়ে সসৈন্যে উজ্জয়িনী গিয়ে আগে হাটে হাঁড়ি ভাঙল গুণশর্মা, ফাঁস করে দিল কুলটা অশোকবতীর কুকীর্তি।

তারপর যুদ্ধ করে খতম করল মহাসেনকে। নিজে বসলো সিংহাসনে।

অদ্ভুত এই উপাখ্যান শুনেই রাত ভোর করে দিয়েছিল সূর্যপ্রভ। মনে বল পেয়েছিল। সৎ ব্যক্তির কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারে না।

৫০.

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই লেগে গেল ধুন্ধুমার যুদ্ধ। সূর্যপ্রভ এল মানব ও দানব সৈন্য নিয়ে, শ্রুতবর্মা এল বিদ্যাধির সৈন্য নিয়ে। দেবতা আর অসুররা আকাশে ভিড় করে দেখে গেল হৈ হৈ-রৈ রৈ যুদ্ধ। অক্কা পেল অনেক ঘোড়া আর হাতি, মুণ্ড গড়িয়ে গেল বহু বীরপুঙ্গবের, রক্তে ভিজে গেল রণক্ষেত্রের মাটি। শেষকালে, এল পাশুপত অস্ত্র আর সুদর্শন অস্ত্রও। কিছু ধ্বংস-টংস করার পরে দুই ভয়ানক অস্ত্রকেও থামিয়ে দেওয়া হল মীমাংসার মাধ্যমে। হয়ে গেল সন্ধি। শর্ত অনুসারে সূর্যপ্রভ বসে গেল একাই সিংহাসনের দক্ষিণ দিকে, শ্রুতশর্মা সিংহাসনের উত্তর দিকে।

ডাইনে বাঁয়ে পাশাপাশি বসে যখন দুজনেই বিলক্ষণ পুলকিত, তখন সিদ্ধি নামে দনুর এক সহচরী এসে বলেছিল, কী চমৎকার দৃশ্য! ধুন্ধুমার লড়াইয়ের পর এখন পাশাপাশি বসে দুই যোদ্ধা। এই রকমই যেন হয় চিরকাল, বিবাদ যেন আর না বাঁধে দেবতা আর দানবে।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিলেন দেবগুরু, বিবাদ তো আমরা করি না, শুরু করে দানবরা।

পালটা জবাব দিল ময়দানব এইভাবে, দানবরা বিরোধ সৃষ্টি করে না, করে দেবতারা, প্রমাণ, দেবরাজকে উচ্চৈঃশ্রবা আর মৃতসঞ্জীবন দিয়েছিল নমুচি, বিষ্ণুকে ত্রৈলোক্য দিয়ে নিজে পাতালে ঠাঁই নিয়েছিল বলি, বিশ্বকর্মাকে নিজের শরীর দান করেছিল অয়োলাহ। দেবতারাই ঠকায় দানবরা শুধু ঠকে।

কড়া কথায় সভা যখন গরম, সহচরী সিদ্ধি তখন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে সবার মন ভিজিয়ে দিয়েছিল।

সিংহাসনে পাশাপাশি বসে বাক্যযুদ্ধ উপভোগ করে গেছিল সূর্যপ্রভ আর শ্রুতশর্মা।

তারপর সুমেরুর কন্যা কামচূড়ামণিকে বউ হিসেবে পেয়ে গেল সূর্যপ্রভ। লড়ে যাওয়ার উপহার।

তার মোট পত্নী সংখ্যা দাঁড়াল ৩১।

বিয়ের দিন কামচূড়ামণি উপহার পেয়েছিল অনেক। নজর কেড়েছিল একটা ফুলের মালা, যা কোনদিন শুকিয়ে যাবে না, একটা মণিময় মালা, যা গলায় দিলে খিদে তেষ্টা থাকবে না, একটা বড়ি যা খেলে যৌবন চলে যাবে না, সব কাজে সিদ্ধিলাভ ঘটবে।

কামচূড়ামণিকে পাটরানি করে নিয়ে সূর্যপ্রভ প্রবেশ করেছিল ফুলশয্যা কক্ষে।

কপাল বটে কামচূড়ামণির। সবার শেষে এসে বসে গেল সবার আগে!

কাহিনি সমাপ্ত হতেই তিরোধান ঘটেছিল বজ্রপ্রভর।

৫১. পৃথ্বীরাজ কাহিনি

আশ্চর্য কাহিনি শুনে অবাক হয়ে বন্ধুবর গোমুখকে নিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকেই নিরবাহন দত্ত শুনতে পেয়েছিল খুব মিষ্টি বীণার বাজনা। শুনে যেন মোহাবিষ্ট হয়ে গেছিল নরবাহনদত্ত। শব্দের উৎস খুঁজতে খুঁজতে চলে গেছিল এক শিবমন্দিরে। দেখেছিল, মন্দিরের মধ্যে সহচরীদের নিয়ে বীণা বাজিয়ে যাচ্ছে অনিন্দ্যসুন্দরী এক যুবতী, সেই স্বরে সঙ্গে সুললিত স্তব করে যাচ্ছে ভগবান মহাদেবের।

চোখাচোখি হয়েছিল দুজনের। প্রথম দর্শনেই প্রেমশরে বিদ্ধ হয়েছিল দুজনেই।

ফলে থেমে গেছিল গানবাজনা।

আর ঠিক সেই সময়ে আকাশ থেকে নেমে এসে মন্দিরে ঢুকেছিল আর এক পরমাসুন্দরী বয়স্কা রমণী। গাইয়ে মেয়েটির মা। মন্দিরে ঢুকেই আশীর্বাদ করেছিল মেয়েকে, নরবাহনদত্তকে শুনিয়ে শুনিয়ে, ''তোমার স্বামী হোক বিদ্যাধরদের অধিপতি।''

খটকা লেগেছিল নরবাহনদত্তের। জিজ্ঞেস করেছিল রমণীকে ''কে আপনি?''

''আপনি?''

''আমি?'' হেসে বলেছিল সুরূপা ''আমি এক বিদ্যাধরী'' আমরা নাম কাঞ্চনপ্রভা। আমি হিমালয়ের মেয়ে, সুন্দরপুর নগরের অলঙ্কারশী রাজার স্ত্রী। আমার ছেলে হওয়ার পর একটি মেয়ে হয়, এই সেই মেয়ে। এরনাম অলঙ্কারবতী। আকাশবাণী হয়েছিল এর জন্মমুহূর্তে, এর বর হবে নরবাহনদত্ত, তুমি। আমার ছেলে বিষয়নির্লিপ্ত। সে বনে যেতে চাইলে আমার স্বামীও তার সঙ্গে বনে চলে যায়। যাবার সময়ে এই মেয়েকে বড়ো করার ভার আমার ওর দিয়ে যায়। আর বলে যায়, মেয়ের বিয়ের সময়ে এসে জামাই নরবাহনদত্তকে আশীর্বাদ করে যাবে, নিজের রাজত্বও যৌতুক দিয়ে যাবে। অলঙ্কারবতী যৌবনে পা দিয়ে গেছিল কাশ্মীরে, প্রজ্ঞপ্তি নামে এক বিদ্যার নির্দেশে, সেখানকার মাটি ফুঁড়ে ওঠা শিবলিঙ্গ পুজো করলে নরবাহনদত্তের সঙ্গে বিয়ে হবে খুব তাড়াতাড়ি। আমিই ওকে নিয়ে গেছিলাম কাশ্মীরে। ফিরেছি আজকে। কাল তোমাদের বিয়ে, অপেক্ষা করো শুধু আজ রাতটা।

এই বলে মেয়ে অলঙ্কারবতীকে নিয়ে আকাশে উড়ে গেছিল কাঞ্চনপ্রভা, সখীগণসহ।

প্রেমে পাগলপ্রায় নরবাহনদত্ত ফিরে এসেছিল কৌশাম্বী নগরে। বন্ধু গোমুখ দেখলে, এ তো মহা ফ্যাসাদ। প্রেমজ্বরে এক্কেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে নরবাহনদত্ত। ঘুমোতেও পারছে না। সুতরাং একটা গল্প বলে বন্ধুর উৎকণ্ঠা নিবারণ করা যাক।

দাক্ষিণাত্যে পৃথ্বীরাজ নামে এক রাজা ছিলেন। দারুণ রূপবান। একদিন তাঁর সভায় এলেন দুই অতিথি, দুজনেই সন্ন্যাসী প্রজ্ঞাবান।

তাঁরা পৃথ্বীরাজের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে বললেন, আপনার মতো সুন্দর মানুষ পৃথিবীর কোথাও তো দেখলাম না। আপনার উপযুক্ত বউ হতে পারে একজনই, মুক্তিধর রাজ্যের রাজা রূপধরের মেয়ে রূপলতা।

সুন্দরী বউ পাওয়ার কথা শুনলে সব সুন্দর পুরুষই নেচে ওঠে। রাজা পৃথ্বীরাজ তক্ষুনি শিল্পীকে ডাকিয়ে এনে নিজের একখানা ছবি আঁকিয়ে দুই প্রজ্ঞাবান সাধুর হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন মুক্তিধর রাজ্যের রাজাকে।

যে শিল্পী পৃথ্বীরাজের অপরূপ ছবি এঁকেছিল, তার নাম কুমারীদত্ত। সেও গেল ভিক্ষুক দুজনের সঙ্গে।

মুক্তিপুর একটা দ্বীপ। সমুদ্র পেরিয়ে যেতে হয় সেখানে। জাহাজে লাগে পাঁচদিন।

পাঁচদিন পরে জাহাজ থেকে নেমে কায়দা করে চিত্রশিল্পী কুমারীদত্ত হাওয়ায় ছড়িয়ে দিল তার অসামান্য চিত্রঅঙ্কনের ক্ষমতার খ্যাতির বর্ণনা।

শুনেই রাজা তাকে ডেকে আনলোন রাজসভায়। হুকুম দিয়ে আঁকালেন নিজের অপরূপা কন্যার প্রতিকৃতি। ছবি তো নয়, ছবির মধ্যে যেন জ্যান্ত মেয়ে বসে আছে।

মুগ্ধ রাজা তখন জিজ্ঞেস করেছিলেন, এমন মেয়ের উপযুক্ত বর কোথায় পাওয়া যায় খোঁজ দিতে পারো?

শিল্পীতো এই প্রশ্নের প্রতীক্ষাতেই ছিল। তৎক্ষণাৎ চোখে চোখে ইশারা হয়ে গেল সঙ্গী দুই সন্ন্যাসীর সঙ্গে।

সাড়ম্বরে বললেন দুই সন্ন্যাসী, রাজা পৃথ্বীরাজ ছাড়া এমন কন্যার স্বামী হওয়ার উপযুক্ত মানুষ তো কোথাও দেখলাম না।

শিল্পী কুমারীদত্ত সঙ্গে সঙ্গে রাজা পৃথ্বীরাজের ছবিখানা বের করে দেখিয়ে দিল মুক্তিধরের রাজা রূপধরকে।

মুগ্ধ হয়ে গেলেন রূপধর। নিজের মেয়ের ছবি পাশে রেখে দেখলেন, হ্যাঁ, মানিয়েছে বটে।

সেই ছবি পাঠিয়ে দিলেন মেয়ে রূপলতার কাছে। ছবি দর্শনেই প্রেমের সূত্রপাত ঘটে গেল। বিয়ে যদি করতে হয়, এমন সুন্দর পুরুষের গলাতেই মালা দেবে, আর কারও গলায় নয়।

রাজা রূপধর তখন মেয়ের ছবি পাঠিয়ে দিলেন রাজা পৃথ্বীরাজের কাছে, শিল্পী মারফত, যে কিনা এঁকেছে দুজনেরই ছবি।

ছবি দেখে মুগ্ধ পৃথ্বীরাজ সাগর পেরিয়ে চলে এলেন মুক্তিপুর দ্বীপে রূপলতাকে বিয়ে করলেন। দশদিন শ্বশুরবাড়ির আদরযত্ন পেয়ে আবার ফিরে এলেন নিজের দেশে, আটদিন সমুদ্রযাত্রা করে, মুক্তিপুর দ্বীপ তো খুব কাছে ছিল না।

কাহিনি শেষ করে বললে বন্ধু গোমুখ, মনের মতো বউ পেতে গেলে একটু বিরহ সইতে হয়। পৃথ্বীরাজ এতদিন ছটফট করেছে, আর এই বিয়ে তো রাত পোহালেই।

বন্ধুবর মরুভূতিও সুযোগ বুঝে একটু জ্ঞান দিয়ে দিল নরবাহন দত্তকে, কন্দর্প কাহিল করতে পারে না শুধু তিনজনকে। এক, স্বরস্বতী; দুই, দেবকুমার; তিন, জিন। কন্দর্প ঘায়েল করে বিশ্বের সবাইকে, এই তিনজনকে ছাড়া।

যাই হোক, এইসব ঠাট্টাতামাসার মধ্যে দিয়ে রাত হল ভোর। আকাশ থেকে নেমে এ অলঙ্কারা কন্যা অলঙ্কারবতীকে নিয়ে কাঞ্চনপ্রভা। বিস্তর সোনাদানা হিরে জহরত নিয়ে বহু বিদ্যাধরও নেমে এল আকাশ থেকে। এল কন্যার বাবা অলঙ্কারশীল আর নরবাহনদত্তের বাবা বৎসররাজ।

হয়ে গেল বিয়ে।

৫২. অশোকমালা কাহিনি

কিছুদিন পর কাঞ্চনপ্রভা কৌশাম্বীতে এসে মেয়ে আর জামাইকে নিয়ে আকাশপথে চলে এল হিমালয়ের কোলে সোনা দিয়ে গড়া গ্রামে।

পরের দিন তাদের নিয়ে গেল গঙ্গাসর তীর্থে, স্বামী নির্মিত অতি সুন্দর উপবনে, যেখানে আছে স্বামীর হাতে গড়া শিব মন্দির। সঙ্গে এল গোমুখ আর মরুভূতি, নরবাহনদত্তের প্রাণপ্রিয় দুই দোসর।

পুজোর পর স্রেফ হাসি-তামাসায় একমাস জমিয়ে রাখল মরুভূতি, হাসির গল্পে পেটের খিল খুলে দিতে সে ওস্তাদ।

তারপরে বিমানে চেপে সবাই ফিরে এল কোশাম্বীতে। সঙ্গে কাঞ্চনপ্রভা, নরবাহনদত্তের শাশুড়ি।

এসেছিল মেয়েকে শ্বশুরের বাড়িতে মানিয়ে নেওয়ার নানারকম উপদেশ দিতে।

তার মধ্যে একটা উপদেশ ছিল এই :

রেগে গিয়ে অথবা মনের মধ্যে ঈর্ষা পুষে রেখে স্বামীকে কক্ষনো অতিষ্ঠ করবে না। ফল ভালো হবে না। ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে আমি নিজে তোমার বাবার মনে অনেক কষ্ট দিয়েছিলাম। তিনি বনে চলে গেছিলেন। সেই অনুতাপে আজও আমি কষ্ট পাচ্ছি।

কাঞ্চনপ্রভা চলে গেলেন হিমালয়ে।

পরের দিন সভা করে বসে যুবরাজ যখন সস্ত্রীক আর সপারিষদ হাস্যপরিহাসে মশগুল কাঁদতে কাঁদতে এক রমণী এল সভায়, অলঙ্কারবতীর সামনে।

কী ব্যাপার? এত কান্না কীসের? অলঙ্কারবতীর প্রশ্ন।

রমণী বললে, সে বড়ো দুঃখের কাহিনি। আমার নাম অশোকমা, ক্ষত্রিয় কন্যা। ব্রাহ্মণ হঠশর্মা আমার পানিপ্রার্থী হয়েছিল বাবার কাছে, কারণ আমার রূপ ছিল, স্থির যৌবন ছিল। কিন্তু অত্যন্ত কুরূপ ছিল সেই ব্রাহ্মণের, উপরন্তু শরীর ছিল বিকৃত। এত রূপযৌবন কি জলে ঢেলে দেব? কিন্তু সেই কুদর্শন ব্রাহ্মণের ছিল টাকার জোর। সেই ভয়ে সেই বিকৃতদেহীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন আমার বাবা। কিন্তু তাঁর সঙ্গে রতিবিহারে আমার মন সায় দেয়নি। পালিয়ে গেলাম এক ক্ষত্রিয় যুবকের কাছে, বিয়ে করা স্বামী ত্যাগ করে পরপুরুষের আশ্রয় নিলাম? আমার স্বামী সেখানে চড়াও হতেই আমি পালিয়ে চলে গেলাম আর এক যুবকের কাছে। আমার স্বামী সেখানেও উৎপাত শুরু করতে আবার পালালাম, আবার এক যুবকের ঘরে উঠলাম। আমার স্বামী সেখানে যখন তেড়ে গেল আমাকে, তখন আমি পরিচারিকা হয়ে গেলাম এক রাজকুমারের,

তার নাম বীরশর্মা। এইবার ঢিট হয়ে গেল আমার স্বামী। কিন্তু নিয়ত উদ্বেগ তার শরীর নষ্ট করে দিল, হাড়জিরজিরে হয়ে গেল। অনেকদিন পর আজ যেই রাস্তায় বেরিয়েছি, তলোয়ার খুলে আমাকে কাটতে এসেছিল আমার ব্রাহ্মণ স্বামী, তাই এসেছি আপনার আশ্রয়ে। এখান থেকে বেরোলেই আমারে মেরে ফেলবে, নিশ্চয় দাঁড়িয়ে আছে তোরণে শান্ত্রীর সামনে।

শুনে তো অলঙ্কারবতীর মন গলে গেল। দুরাচার স্বামীকে ডাকিয়ে আনল সভায়। চোখ পাকিয়ে তার দিকে তাকাতেই সে বললে, এই মেয়েটা আমার বিয়ে করা বউ। স্ত্রী কুলটা হলে কোনও স্বামীকি তাই সইতে পারে?

যুবরাজ নরবাহনদত্ত এবার মুখ খুলল, স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে যাদের আশ্রয়ে গেছিলে, বিনিময়ে তাদেরকে তোমার দেহ দিয়েছিলে?

ঠিক এই সময়ে আকাশ থেকে শোনা গেল দৈবস্বর।

এই রমণী, এখন যার নাম অশোকমালা, আগে ছিল এক বিদ্যাধরের মেয়ে। সেই বিদ্যাধরের নাম অশোকবর। বড়ো রূপের দেমাক ছিল সেই মেয়ের। বিয়ের বয়স হতেই বাবা এনে দিত যোগ্য পাত্র, কিন্তু মেয়ে নাকচ করে দিত সমস্ত প্রস্তাব। তখন রেগে গেছিলেন অশোকবর। শাপ দিয়েছিলেন মেয়েকে, তুই মানুষ হয়ে জন্মাবি। বদলোকের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে। স্বামীকে ছেড়ে পালাবি, দেহ বিক্রি করবি নানা পুরুষের কাছে। তোর স্বামী তোকে বধ করতে আসবে, রাজভবনে গিয়ে রাজার পায়ে পড়বি। সেইদিন এই শাপ ঘুচে যাবে। আবার ফিরবি বিদ্যাধরলোকে, বিয়ে করবি অভিরুচি বিদ্যাধরকে।

স্তব্ধ হল আকাশবাণী।

তৎক্ষণাৎ মানব কলেবর ফেলে রেখে বিদ্যাধরী রূপ ফিরে পেল অশোকমালার। প্রস্থানও ঘটল নিমেষমধ্যে, বিদ্যাধরলোকে, পেয়েও গেল মনের মতো বর, অতি মনোহর এক যুবককে।

রাগ জল হয়ে গেল হঠশর্মা ব্রাহ্মণের। মনে পরে গেছিল পূর্বজন্মের কথা। সে নিজেও তো ছিল বিদ্যাধর, তখন নাম ছিল স্থূলভূজ। রূপগর্বে স্ফীত হয়ে পিতার পছন্দ করা পাত্রীকে বিয়ে করতে চায়নি, সেই মেয়ের নাম ছিল সুরভিদত্তা। বাবা রেগে গেছিলেন। অভিশাপ দিয়েছিলেন। সেই অভিশাপের ফলেই কদাকার দেহ নিয়ে মানুষ হয়ে তাকে জন্মাতে হয়েছে, বিয়ে করা বউ তাকে দেহ না দিয়ে পালিয়ে গিয়ে একাধিক পরপুরুষকে দিয়ে রতিসুখ উপভোগ করেছে। এ সবই পিতৃ-অভিশাপে ঘটেছে, নিজের রূপের অহংকারের পরিণাম। কিন্তু এহেন ভয়ংকর অভিশাপ শুনে কাতর হয়েছিল সুরভিদত্তা, যাকে সে বিয়ে করতে চায়নি। তারই করুণ প্রার্থনা শুনে মন গলে গেছিল রাগী বাবার। ছেলেকে বলেছিলেন, তুই সেইদিনই শাপমুক্ত হবি যেদিন অশোকমালা শাপমুক্ত হবে, মন পড়ে যাবে পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত, ফিরে আসবি বিদ্যাধরলোকে. বিয়ে করবি এই সুরভিদত্তাকে।

কথা শেষ হল হঠশর্মার। সঙ্গে সঙ্গে কদাকার দেহ ভেদ করে বেরিয়ে এল দিব্যদর্শন এক যুবক। হাসিমুখে ধেয়ে গেল আকাশে, সেখানেই তার বিয়ে হয়েছিল আগের অপছন্দ পাত্রী সুরভিদত্তার সঙ্গে, ঘরসংসার করেছিল সুখে।

শূন্যমার্গে ধেয়ে যাওয়ার আগে অবশ্য একটা কথা বলে গেছিল বিদ্যাধর স্থূলভুজ। অহংকার বড়ো জঘন্য রিপু। বড়ো কষ্ট দেয়।

হোক কষ্টদায়ক, কিন্তু উচিত শিক্ষা তো দেয়। অত্যাশ্চর্য এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর যখন সভার সবাই বিস্ময়ে বোবা, তখন বয়স্য গোমুখ যুবরাজকে শুনিয়ে দিল আর একটি অত্যাশ্চর্য কাহিনি।

রূপসী অনঙ্গরতি ছিল রাজা মহাবরাহর মেয়ে। বিয়ের বয়স হলে বললে বাবাকে—এমন বর চাই যার আছে রূপ, জ্ঞান আর বীরত্ব।

ডিণ্ডিম বাজিয়ে মেয়ের অভিপ্রায় দেশে দেশে জানিয়ে ছিলেন রাজা। এল অনেক রাজা কিন্তু কাউকেই পছন্দ হল না। অনঙ্গরতির। অবশেযে এল দক্ষিণ ভারত থেকে চারজন যুবাপুরুষ।

প্রথম জন বললে, জাতে আমি শূদ্র। আমার নাম পঞ্চপট্টিক। নাম থেকেই আমার গুণ বুঝতে পারছেন? রোজ পাঁচজোড়া কাপড় বোনবার বিদ্যে আমার আছে।

দ্বিতীয় যুবক বললে, জাতে আমি বৈশ্য। ভাষাখ্য আমার নাম। পশুপাখিদের ভাষা আমি বুঝতে পারি।

তৃতীয় যুবাপুরুষ বললে, আমি ক্ষত্রিয় পুরুষ। নাম খড়্গধর। কৃপাণ চালনায় সিদ্ধহস্ত। ত্রিভুবনের কেউ আমাকে হারাতে পারবে না।

চতুর্থ জন বললে, আমি বামুনের ছেলে। জীবদত্ত আমার নাম। মরাকে বাঁচতে পারি। বলতে পারেন, জীবনদত্ত।

চারজনেই যখন গুণবান, তখন তাদের অতিথি শালায় রেখে মেয়েকে খবর দিলেন। অনঙ্গরতি চারজনেরই বউ হতে চাইল। কামিনীর কাম যে ধিকিধিকি আগুনের সমান।

পরের দিন যখন শহর দেখতে বেরিয়েছে চার যুবক, রাজার হাতি বাঁধন ছিঁড়ে রাস্তায় উপদ্রব শুরু করে দিয়েছিল। খড়্গধর তখন কৃপাণ চালনা করেছিল, মাত্র দুবার। খতম হয়ে গেছিল পাগলা হাতি।

পরের দিন চারজনকে নিয়ে শিকারে বেরোলেন রাজা। প্রাণ গেল অনেক বাঘসিংহের চার যুবকের পরাক্রমে কিন্তু অসিবীর খড়্গধরকেই শ্রেষ্ঠ বীর বিবেচনা করলেন রাজা। ঠিক করলেন, তাকেই জামাই করবেন। ফিরে এলেন রাজভবনে।

মেয়েকে ডেকে প্রকাশ করলেন মনের ইচ্ছে। রাজি হয়ে গেল অনঙ্গরতি। মনের ইচ্ছে যদিও চারজনকে স্বামী বানানো।

তলব করা হল গণককে। সে সাফ বলে দিলে, এই মেয়ের বিয়ে মর্ত্যে হবে না, সে যে দেবলোক থেকে মর্ত্যে জন্মেছে শাপ পেয়েছিল বলে। শাপ কেটে যাবে ঠিক তিন মাস পরে। তখন হোক বিয়ে।

রাজার অতিথিশালায় থেকে গেল চার যুবক।

তিনমাস পর ফের গণক ডাকা হল। রাজা যখন তাকে জিজ্ঞেস করছেন এখন কী করা উচিত, ঠিক সেই সময়ে অনঙ্গরতি দেহত্যাগ করে গেল, তার শাপ কেটে গেছে।

সুতরাং জীবদত্তের ক্ষমতার পরীক্ষা নিলেন রাজা। বললেন, তুমি নাকি মরাকে বাঁচাতে পারো। বাঁচাও আমার মরা মেয়েকে তারপর করো বিয়ে।

কিন্তু বৃথা গেল জীবদত্তের মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা। অনঙ্গরতি মরেই রইল। হতাশ জীবদত্ত যখন নিজেই নিজের গলা কেটে মরতে যাচ্ছে....

শোনা গেল আকাশবাণী, অনঙ্গরতি তো এখন স্বর্গে। মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা যিনি তোমাকে দিয়েছেন, সেই বিন্ধ্যদেবীর পুজো করো। তাঁর ইচ্ছে যদি হয়, অনঙ্গরতি তোমার বউ হবেই।

দাহ করা হল মৃতদেহ। জীবদত্ত চলে গেল বিন্ধ্যপর্বতে, বাকি তিন প্রার্থী যে যার জায়গায়।

বিন্ধ্যঠাকুরানী প্রসন্ন হয়েছিলেন জীবদত্তের আকুল কামনায়। বলেছিলেন, চলে যাও বীরপুর শহরে, হিমালয়ে। সেখানে আছে সমর, এক বিদ্যাধর। তাঁর মেয়ে অনঙ্গপ্রভা যৌবন আগমনে বড়ো রূপসী হয়ে উঠেছিলেন। রূপের অহংকারে ফেটে পড়ত। কাউকে বিয়ে করতে চায়নি, কেউ নাকি তার যোগ্য স্বামী নয়। তার শিক্ষার দরকার হয়েছিল।

তাই মা-বাবার অভিশাপে তাকে মর্ত্যে জন্মাতে হয়, স্বামীমুখ কপালে জোটেনি। সে এখন মনুষ্যযোনি ত্যাগ করে ফের দেবযোনি পেয়েছে, অনঙ্গপ্রভা নামে দশদিক আলো করে আছে। তুমি বীরপুরে গিয়ে তার বাবাকে যুদ্ধে হারিয়ে অঙ্গপ্রভাকে বিয়ে করো। এই দিচ্ছি একটা তলোয়াড়, এই নিয়ে লড়ে যাবে অনঙ্গপ্রভার বাবার সঙ্গে, সে তো হারবেই, আকাশবিহারী কোনও দেবশক্তিও তোমাকে হারাতে পারবে না।

দেবী বিন্ধ্যবাসিনী আর একটা কাহিনি শুনিয়ে গেছিলেন জীবদত্তকে। বড়ো চমকপ্রদ কাহিনি।

অতীতে খড়্গসিদ্ধ নামক এক মহাবীরকে পতিত্বে বরণ করতে চেয়েছিল এক দেবর্ষি কন্যা, তীব্র কামনার প্রকোপে। রেগে গেছিল খড়্গসিদ্ধ। শাপ দিয়েছিল এই বলে, মানুষকে বিয়ে করতে বড়ো সাধ হয়েছে? যা,

মানুষ হয়ে জন্মা। মানুষকে বিয়ে কর। সেই মানুষ আগের আটটা পূর্বজন্মে আটবার পরস্ত্রী হরণ করেছিল। সেই পাপে এই এক জন্মেই সে আটবার কষ্ট পাবে, তার নিজের স্ত্রী তাকে আটবার ছেড়ে গিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে সহবাস করবে। তুই হবি সেই স্ত্রী তোর প্রবল কামরিপুর এই হল শাস্তি। পরনারী হবি আটবার।

যাই হোক, কাম যখন বলগাছাড়া হয়, তখন দেবতা আর মানুষ উভয়েই পাপের ফল ভোগ করে, গল্পের ছলে সেই শিক্ষা দিয়ে দেবী বিন্ধ্যবাসিনী অন্তর্ধান করেছিলেন। বলেননি, জীবদত্তই সেই পুরুষ, পূর্বজন্মে যে ছিল খড়্গসিদ্ধ।

জীবদত্ত তাঁর দেওয়া তরবারি নিয়ে ব্যোমপথে বীরপুরে উড়ে গিয়ে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিল অনঙ্গপ্রভার বাবাকে। বিয়ে করেছিল অনঙ্গপ্রভাকে। কিন্তু বেঁকে বসেছিল নতুন বউ। সে কিছুতেই যাবে না মর্ত্যের মাটিতে, হিমালয়ের আকাশচুম্বী আলয় ছেড়ে। তখন বলপ্রয়োগ করেছিল জীবদত্ত। বউকে কোলে তুলে নিয়ে রওনা হয়েছিল আকাশপথে। সদ্য পরিণীতা স্ত্রীর এভাবে স্বামী গৃহে যাওয়া অভিনব বইকি। বিস্তর কান্নাকাটি করেছিল অনঙ্গপ্রভা। তখন এক পাহাড়ের মাথায় নেমে জীবদত্ত নতুন বউকে খোশামোদ করাতে সে শুরু করেছিল ভারি মিষ্টি শিবের গান। ঘুম পাড়ানি গান। ঘুমিয়ে পড়েছিল রণক্লান্ত এবং বিয়ের পর বউকে বয়ে আনার ফলে পথক্লান্ত জীবদত্ত।

আর ঠিক সেই সময়ে একটা হরিণের পেছন নিয়ে মৃগয়া-বিলাসী এক রাজা এসেছিল সেখানে। তার নাম হরিবর। গান শুনে ছুটে এসে অপরূপাকে দেখে কামজ্বালায় জ্বলে গেছিল। একই অবস্থা ঘটেছিল অনঙ্গপ্রভারও। ঘুমন্ত স্বামীকে ফেলে পালিয়েছিল হরিবর রাজার সঙ্গে।

পালাতে গেছিল আকাশপথে। সে যে বিদ্যাধরী। এ ক্ষমতা তার আছে জেনেই পরপুরুষকে বিনা দ্বিধায় তুলে নিয়েছিল কোলে।

কিন্তু উড়তে পারেনি আকাশে। পতিত্যাগের পাপে লোপ পেয়েছিল সেই ক্ষমতা।

তাই বলে তো দেরি করা যায় না। জীবদত্তকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে ভ্রষ্টা অনঙ্গপ্রভাকে নিজের রথে চাপিয়ে রাজা হরিহবর। রাজা হরিবর ফিরে এসেছিল নিজের রাজধানীতে।

সেই হল শুরু। দু-নম্বর। পতি অভিশাপ ফলছে। রতিরঙ্গ চলল দিবানিশি।

আর, এই পরকীয়া পর্ব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিক শক্তিবলে দেবী-খড়্গ ফিরে গেল দেবীর কাছে।

ঘুম ভাঙল জীবদত্তর। দেখতে পেল না দুটি জিনিস, তার কৃপাণ, তার বউ!

পাগলের মতো হয়ে গেছিল জীবদত্ত। পাহাড় থেকে হেঁটে নেমেছে, তেরোদিন উপবাসে থেকেছে তারপরে এক ধনী ব্রাহ্মণের বাড়িতে ঠাঁই পেয়েছে। ব্রাহ্মণীর নাম প্রিয়দত্তা।

ধড়ে প্রাণ ফিরে পেয়েছিল জীবদত্ত, ব্রাহ্মণীর সেবায়। একটু সুস্থ হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি কি আমার সবব্যাপার অবগত আছেন? জানেন কি আমার সদ্য পরিণীতা স্ত্রী আর কৃপাণ গেল কোথায়?

ব্রাহ্মণী বললে, আমি সব জানি। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ আমার চোখের সামনে ভাসে। কারণ, পতি ভিন্ন আমার মনে কেউ ঠাঁই পায় না। অন্য পুরুষকে আমি মায়ের পেটের ভাই বলে মনে করি, তাই আমি জানি, দেবী খড়্গ ফিরে গেছে দেবীর কাছে তোমার স্ত্রী পরপুরুষ সংসর্গে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। সে এখন হরিবর রাজার কোলে বসে আছে। তার বিদ্যাধরী বিদ্যাও লোপ পেয়েছে। সেই পাপীয়সীকে মন থেকে তাড়াও। তাকে ফিরে পাওয়ার আশা ত্যাগ করো, কেননা রাজা হরিবর ক্ষমতাবান পুরুষ।

ব্রাহ্মণীর উপদেশ মাথা পেতে নিয়ে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে গেল জীবদত্ত। ফের বসে গেল বিন্ধ্যবাসিনীর তপস্যায়। তুষ্ট হয়ে দেবী দেখা দিলেন।

বললেন, একটা অতীত কাহিনি শোনো। গঙ্গায় স্নান করছিল শাপলেখা, কপিলজট মুনির মেয়ে। শিবের চার অনুচর এসে তাকে কামনা করেছিল। তাদের নাম পঞ্চচূড়, চতুর্বক্ত, সহোদর আর বিকৃতানন। শাপলেখার ধমকে তিনজন নিরস্ত হয়। কিন্তু একজন শাপলেখার হাত ধরে টানাটানি করেছিল। শাপলেখার চিৎকার শুনে কপিলজট ছুটে এসে শাপ দিয়েছিলেন চারজনকেই, যা নীচলোকে! প্রথম তিনজন কান্নাকাটি

করে বলেছিল, আমরা তো আপনার মেয়ের গা ছুঁইনি। কপিলজট বলেছিলেন, সেক্ষেত্রে তোরা আমার শাপমুক্ত হবি সেইদিনই যেদিন চতুর্থ শিব-অনুচর, যে আমার মেয়ের হাত ধরে টেনেছিল, সে রাজকুমারী অনঙ্গরতিকে পেয়েও হারাবে, যে অনঙ্গরতি অতীতে ছিল অনঙ্গপ্রভা। শুধু হারাবে নয়, আরও কষ্ট পাবে। শাপ যখন দিয়েছি, তখন তোদের চারজনকেই জন্ম নিতে হবে দক্ষিণ ভারতে। চারজনের সেই জন্মের নাম হবে পঞ্চকুটিক, ভাষাঙ্গ, খড়্গধর আর জীবদত্ত। প্রথম তিনজন ফের শিবানুচর হয়ে গেছে অনঙ্গরতির মৃত্যুর পর। বাকি ছিলে তুমি, আরও কষ্ট ভোগের জন্যে, কেননা তুমিই তো শাপলেখার হাত ধরে টানাটানি করেছিলে অতীব কামনায় অধীর হয়ে। অনেক কষ্ট পেয়েছ, পাপশূন্য হয়েছ। এখন আগুনে দেহত্যাগ করো, ফের শিবের অনুচর হয়ে যাও।

তাই হয়েছিল। দেবলোকেও মেয়েদের কামনা করে পাপ করলে ফলভোগ করতে হয়। মানুষ কোন ছার! অশেষ কষ্ট পেয়ে শেষে ফের শিবের সেবার অধিকার ফিরে পেয়েছিল জীবদত্ত।

পাপিষ্ঠ রাজা হরিবর বৃত্তান্তে ফিরে আসা যাক। পরের বউ চুরি করে এনে দিবারাত্র সে মেতেছিল তাকে নিয়ে, রাজ্যপাট মন্ত্রীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে। এই সময়ে এক নামী নাটকগুরু এসেছিল রাজবাড়িতে। তার নাম লব্ধবর।

রাজা তাকে অন্তঃপুরের মেয়েদের নাচ আর নাটক শেখানোর ভার দেয়। তখন দেখা গেল ভ্রষ্টা অনঙ্গপ্রভা নাচ আর নাটকে ছাড়িয়ে গেল সবাইকে। তারপর একদিন পালিয়ে গেল নাটক গুরুর সঙ্গে বিয়োগপুরনগরে।

এই গেল তিন নম্বর পরপুরুষ সঙ্গম। এখনও বাকি পাঁচ দফা!

নাটকের তৃতীয় অধ্যায়ে দেখা গেল, বিয়োগপুরে নাটকগুরু পাশাখেলায় হেরে গেল একজন পাকা পাশা খেলোয়াড়ের সঙ্গে। তার নাম সুদর্শন।

পথের ভিখিরি হয়ে গেল নাটকগুরু।

অনঙ্গপ্রভা তাকে ছেড়ে শয্যাসঙ্গিনী হল সুদর্শনের। চার নম্বর পরপুরুষ এল তার জীবনে! পতিরূপে।

চোরে সব নিয়ে গেল সুদর্শনের। নিঃস্ব সুদর্শন টাকা ধার চাইতে গেল মহাজন হিরণ্যগুপ্তের কাছে, সঙ্গে ছিল অনঙ্গপ্রভা। তার চোখের ইশারা বুঝেই তাকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিল মহাজন। বাইরের ঘরে সুদর্শনকে বসিয়ে রেখে নিজেও গেল অন্তঃপুরে এবং বিরামবিহীন সহবাস চালিয়ে গেল কুলটার সঙ্গে। সুদর্শন অনেকক্ষণ বসে থাকার পর খোঁজ নিতে যাওয়ার চেষ্টা করতেই তাকে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হল বাড়ি থেকে।

শুরু হল কুলটার পঞ্চমবার পরপুরুষ-বিহার।

সোনার দ্বীপে বাণিজ্য করতে গেল হিরণ্যগুপ্ত, জাহাজে সর্বস্ব নিয়ে, কুলটা অনঙ্গপ্রভার সঙ্গে সাগরের হাওয়ায় রতিবিলাসে নিমজ্জ থেকে। জাহাজ এল সমুদ্রতটে, বন্ধুত্ব জন্মে গেল সেখানকার জেলেদের রাজা সাগরবীর-এর সঙ্গে। গলায় গলায় বন্ধুত্ব। তারপর একদিন সাগর বিহারে বেরল তিনজনেই। এক রঙ্গিলা-নারী, দুই কামবিলাসী পুরুষ। উঠল ঝড়। ডুবল জাহাজ।

সাঁতার কেটে, ভাগ্যক্রমে ছোট্ট একটা নৌকায় উঠে তীরে পৌঁছলো হিরণ্যগুপ্ত, সঙ্গে নেই সেই ললনা যে ক্রমশ হাতবদল হয়ে পৌঁছেছিল তার কাছে, ভাগ্যের ফেরে। এবারও সে হাত বদল হয়ে চলে গেল ধীবররাজ সাগরবীরের বাহুবন্ধনে, কেন না সেই পুরুষই তো তাকে নিয়ে জল থেকে উঠে ঘরে ফিরতে পেরেছে।

অতএব সে কি মাল্যবদলের অভিনয় করে বিয়ে নামক প্রক্রিয়া সেরে নিয়ে ফের পরপুরুষ সহবাসে বাধা কোথায়?

ষষ্ঠবার পাপাচার! মনের দিক দিয়ে কিন্তু কোনও গ্লানি নেই অনঙ্গপ্রভার। হোক জেলেদের রাজা, টাকার পাহাড় তো আছে! সুতরাং দাও ঢেলে নিজেকে!

কামিনী আর কাঞ্চন, তফাৎ আছে কি? নেই।

একদিন ছাদে বেড়াতে বেড়াতে অনঙ্গপ্রভার চোখে পড়ল এক অসাধারণ সুন্দর যুবাপুরুষকে (ক্ষত্রিয় পুরুষ) এতদিন জেলে রাজার সহবাসে নিশ্চয় কিঞ্চিত অরুচি জন্মেছিল, তাই দৌড়ে ছাদ থেকে নেমে গিয়ে কৃপাণধারীর কণ্ঠলগ্না হবার বাসনা প্রকাশ করেছিল।

তাই, সপ্তমবার নকল পতি পেয়েছিল অনঙ্গপ্রভা। মতলব একটাই, উদগ্র কামনাকে বহু বৈচিত্র্যের মাধ্যমে নিবারণ!

এরপর সেখানকার রাজাকেই কামনা করে বসল অনঙ্গপ্রভা। সে দাঁড়িয়েছিল জানলায়। নীচ দিয়ে হাতির পিঠে চেপে যাচ্ছিল রাজা। পরের বউ দেখে ছটফটিয়ে উঠেছিল রাজা।

অনঙ্গপ্রভার চোখের বিদ্যুৎও রাজাকে অস্থির করেছিল। ফলে পাঁচজনের সামনেই জানলা থেকে ডেকেছিল রাজাকে, দৌড়ে নেমে এসেছিল রাস্তায়, হাতিকে উঠে রাজার কোলে বসে সবাইকে অবাক করে দিয়ে অষ্টমবার পতিবদল করেছিল কেলেঙ্কারির তোয়াক্কা না রেখে।

এরপরেই গর্ভসঞ্চার ঘটল অনঙ্গপ্রভার। ছেলে হল যথাসময়ে। তার নাম দেওয়া হল সাগরবর্মা। ছেলে বড়ো হলে তার বিয়েও দেওয়া হল। তারপর ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে অনঙ্গপ্রভাকে নিয়ে গেল প্রয়াগে।

সেইখানে রাত শেষে স্বপ্নে মহাদেব দেখা দিলেন তাকে। বললেন, আগের জন্মে তুমি আর তোমার স্ত্রী দুজনেই ছিলে বিদ্যাধর। অভিশাপের ফলে জন্মেছিলে মর্ত্যে। এখন শাপ কেটে গেছে।

ঘুম ভাঙতেই স্বপ্নের কথা অনঙ্গপ্রভাকে বলেছিল রাজা সাগরদত্ত।

শুনেই অনঙ্গপ্রভার মনে পড়ে গেছিল নিজের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত। সেইসঙ্গে বলে গেল এই জন্মে তার পরপর আটবার পতি বদলের কাহিনি। বিদ্যাধরী হয়েও লোপ পেয়েছে তার আকাশে উড়ে যাওয়ার বিদ্যে প্রথমবার পতি পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে। ভুলেও গেছিলাম আমি আসলে বিদ্যাধরী।

কথা শেষ হতে না হতেই অনঙ্গপ্রভার বাবা সমর নেমে এল আকাশ থেকে। মেয়েকে বললে, এক জন্মেই আট জন্মের কষ্ট পেলে তুমি আর তোমার প্রথম স্বামী দেবদত্ত। এবার শেষ হয়েছে কষ্টভোগ, চল ঘরে।

জামাই সাগরদত্তকে বললে, রূপের অহংকারে তোমাকেও বর হিসেবে নিতে চায়নি আমার এই মেয়ে। গর্ব খর্ব হল এই মর্ত্যে এসে, বিয়ে করতে হল তোমাকেই। চলো ঘরে ফিরে।

এই কাহিনি শোনার সঙ্গে সঙ্গে দেহ পরিবর্তন করে সাগরদত্ত ফিরে পেল মদনপ্রভের জ্যোতির্ময় দেহ, আবার হয়ে গেল বিদ্যাধর।

অনঙ্গপ্রভাকে বিদ্যাধরী বিদ্যা দান করেছিল পিতা সমর। ঘরে ফিরে গেছিল স্বামী-স্ত্রী, বিদ্যাধর লোকে।

কাহিনি শেষ করে বললে গোমুখ, পাপ করলে পরিত্রাণ নেই। দেবতাকেও জন্মাতে হবে মানুষ হয়ে। সঞ্চিত পাপের ফল ভোগ করতে হবে একজন্মেই।

৫৩. বিক্রমভুজ কাহিনি

পরের দিন।

সস্ত্রীক রাজসভা আলো করে বসে আছে যুবরাজ নরবাহন দত্ত, এমন সময়ে বন্ধু মরুভূতি এসে বললে, রাজবাড়ির তোরণে বসে আছে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী। তার পরনে শুধু পশুচর্মের পোশাক। শীতকালের ঠাণ্ডা, গরমকালের গরম আর বর্ষাকালের জল তাকে ওই জায়গা থেকে নড়াতে পারেনি। ঠায় বসে রয়েছে একই জায়গায়, নড়াচড়ার লক্ষণও নেই, যেন প্রস্তরমূর্তি। এমন মানুষকে সাহায্য করা উচিত যুবরাজের, বেচারা মরে যাওয়ার আগে।

যুবরাজের আর এক প্রাণপ্রিয় বন্ধু গোমুখ তৎক্ষণাৎ বললে, মরুভূতি ঠিকই বলেছে। তবে দানধ্যান করা সম্পর্কে আমার জানা আছে একটা কাহিনি। শুনুন।

লক্ষপুর নগরের রাজা ছিলেন লক্ষদত্ত। লক্ষ টাকার কম টাকা কাউকে দান করতেন না। লক্ষদত্ত নামে বিখ্যাত হন এই কারণেই।

এঁর তোরণের সামনে দিনরাত বসে থাকত একজন গরিব মানুষ। উদ্দেশ্য, রাজার দান পাওয়া। কিন্তু এত বড় দাতা লক্ষদত্ত কক্ষনো তাকে একটা টাকাও দিতেন না।

একদিন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শিকার করতে গেলেন লক্ষদত্ত। তোরণের সেই ভিখিরি হাতে একটা লাঠি নিয়ে গেল রাজার পেছন পেছন। শুধু লাঠি চালিয়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়ে দিল বহু পশুর, রাজা আর তাঁর লোকজন কোনও পশু বধ করবার আগেই।

রাজা বুচঝলেন, লোকটা মস্ত বীর। তা সত্ত্বেও তাকে কানাকড়িও দান করলেন না। সে বেচারা ফিরে এসে ফের নীরবে দাঁড়িয়ে রইল সিংহতোরণে শীত গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে।

এরপরেই একদিন রাজার জ্ঞাতিশত্রুরা দলবল নিয়ে তেড়ে এল রাজা লক্ষদত্তকে যমের দুয়ার দেখিয়ে দিতে। রাজাও সৈন্যসামন্ত নিয়ে ধেয়ে গেলেন জ্ঞাতি বধ করতে। পেছন পেছন গেল সেই ভিখিরি, হাতে শুধু একটা লাঠি। বনবন করে লাঠি ঘুরিয়ে প্রাণে মেরে দিল বহু জ্ঞাতি শত্রুর সৈন্য।

যুদ্ধে জিতে হৃষ্টচিত্তে রাজধানীতে ফিরে এলেন রাজা লক্ষদত্ত। কিন্তু একটি মুদ্রাও পুরস্কার দিলেন না ভিক্ষুককে।

ভিক্ষুক কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সিংহতোরণে, টানা পাঁচ বছর।

তখন মন ভিজল রাজার। ঠিক করলেন, এহেন ধৈর্য যার, তাকে কিছু দান করা উচিত। কিন্তু তার আগে দেখা দরকার, মা লক্ষ্মী এই ভিখিরির ওপর কৃপা করতে চান কিনা।

সুতরাং বেশ বড়ো সাইজের একটা বাতাবি লেবুর ভেতর থেকে সব শাঁস বের করে নিয়ে ভেতরে ঠেসে দিলেন দামি দামি হিরে জহরত। ভিখিরিকে ডাকিয়ে আনলেন রাজসভায় যে-কোনও বিষয়ে একটা আবৃত্তি শোনাতে বললেন, সে উদাত্ত স্বরে শুনিয়ে দিল একটা শুভঙ্করীর আর্যা, ছড়ার আকারে অঙ্কের সূত্র।

ছড়ার মানে এই : নদীরা যেমন ভরাট সাগরেই জল ঢেলে যায়, শুকনো মরু প্রান্তরের দিকে ভুলেও যায় না, ঠিক তেমনি মা লক্ষ্মীও শুধু ধনীদের অর্থভাণ্ডার বাড়িয়ে যান, ধনহীনদের দিকে ফিরেও তাকান না।

ছড়ার মধ্যে দিয়ে রাজা লক্ষদত্তকে কটাক্ষ করে গেল সেই ভিক্ষুক।

রাজা কিন্তু প্রীত হলেন। ছড়াটি আর একবার শুনলেন। তারপর মণিমাণিক্যে ভরা সেই মস্ত বাতাবি লেবুটা ভিক্ষুকের হাতে তুলে দিলেন।

বিলক্ষণ আশাহত হয়েছিল ভিক্ষুক। পাঁচ বছর ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখে ডেকে এনে, আবৃত্তি শুনে, শেষকালে লক্ষদত্ত দিলেন একটা বাতাবি লেবু।

মনে কষ্ট পেয়েও লেবু হাতে বেরিয়ে এসেছিল ভিক্ষুক। কিন্তু লেবু খাওয়ার বদলে তার দরকার ছিল একখানা পরনের কাপড়। একজনকে লেবু দিয়ে বিনিময়ে তার কাছ থেকে নিয়েছিল পরবার কাপড়।

লেবুর মধ্যে দিয়ে হাতবদল হয়ে গেল বিস্তর জহরত। সহায় হলেন না ভাগ্যলক্ষ্মী।

ভাগ্যচক্র এণনই যে রত্নঠাসা লেবু ফিরে এল রাজারই হাতে, লেবু যে পেয়েছিল, সে নিজে এসে উপহার দিল লক্ষদত্ত রাজাকে, ভেতরে কী আছে তা না জেনে।

রাজা তো অবাক। জিজ্ঞেস করেছিলেন, এ লেবু পেলে কোত্থেকে?

লোকটি বললে, একটা কাপড়ের দাম হিসেবে এক ভিখিরির কাছ থেকে। আহা, বেচারার পরনের কাপড় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ঝুলছিল।

রাজা বুঝলেন ভিখিরির পাপের দশা এখনও কাটেনি।

পরের দিন ভিখিরিকে ফের ডেকে এনে আবার একটা ছড়ার আবৃত্তি শুনে পুরস্কার স্বরূপ সেই একই রত্নবোঝাই লেবু তাকে দিলেন।

বেরিয়ে এসে দুখানা কাপড়ের বিনিময়ে লেবু যার হাতে তুলে দিল ভিখিরি, সে তারপরেই লেবু উপহার দিয়ে গেল রাজাকে অন্যান্য উপহারের সঙ্গে।

রাজা বুঝলেন, লক্ষ্মীর কৃপা থেকে আজও বঞ্চিত হতভাগ্য ভিক্ষুক।

পরের দিন আবার তাকে ডেকে এনে আর একবার আর একটা ছড়া-আবৃত্তি শুনে তৃতীয়বার সেই একই লেবু তাকে উপহার দিলেন রাজা।

এবার রত্নভর্তি বাতাবি লেবু কাকে দিল ভিক্ষুক? রাজা লক্ষদত্ত বাঁধা বারবনিতাকে! বিনিময়ে পেল একটু সোনা। তাতেই মহাখুশি হলো ভিক্ষুক।

বাতাবি লেবুটা দেখতে এত সুন্দর যে রক্ষিতা এসে দিল রাজাকেই!

ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে গেলেন রাজা। ফের ডাকলেন হতভাগ্য ভিক্ষুককে, ফের তার হতে তুলে দিলেন বাতাবি লেবু, এই নিয়ে চতুর্থবার।

আর এইবারেই হাত থেকে লেবু মেঝেতে পড়ে গেল ভেঙে, ভেতরকার রত্নরাশি ছড়িয়ে গেল চারদিকে।

সভাসদরা স্তম্ভিত! এতদিন তারা বিরূপ ধারণা পোষণ করেছিল রাজার ওপর। ভিখিরিকে বারবার একই বাতাবি লেবু দেওয়ার প্রহসন তাদের ভালো লাগেনি।

সেদিন হল চক্ষুস্থির, প্রত্যেকের।

তখন বললেন রাজা লক্ষদত্ত, কদ্দিনে এর পাপক্ষয় হয়, কদ্দিনে এর ওপর সৌভাগ্যক্ষ্মী প্রসন্ন হন, তা দেখবার জন্যেই পরপর চারবার একই নাটক করে গেছি। আজ বুঝলাম, ভাগ্যের চাকা ঘুরেছে এই ভাগ্যহীনের কপালে।

কাহিনি শেষ করে গোমুখ বললে, যুবরাজ, কপালের দশা কেউ খণ্ডাতে পারে না। দাতার দানেও কিছু হয় না। যাই হোক, এই সন্ন্যাসীকে কিছু দান করুন। এর কপাল নিশ্চয় ফিরেছে।

তাই করেছিল বন্ধুবৎসল যুবরাজ নরবাহনদত্ত।

এরপরেই ঘটল একটা চমকপ্রদ ঘটনা। দক্ষিণ ভারত থেকে এক বীরপুরুষ এল যুবরাজের কাছে। জাতে সে ব্রাহ্মণ। রোজ একশো মুদ্রা মাইনের চাকরি চায়।

তৎক্ষণাৎ তাকে চাকরিতে বহাল করেছিল যুবরাজ। বিচক্ষণতার প্রশংসাও পেয়েছিল গোমুখ প্রমুখ বন্ধুদের কাছে।

তারপর একটা গল্প শুনিয়েছিল গল্পবাজ গোমুখ।

বিক্রমপুর রাজ্যে ছিলেন রাজা বিক্রমভুজ। তাঁর এক চাকরের নাম ছিল বীরবর। বীরবরের সংসার ছোট্ট। বউ, ছেলে আর মেয়ে। কিন্তু প্রতিদিন মাইনে নিতো পাঁচশো সোনার টাকা। বীরবরের অনেকগুণ আছে জেনেই এত মাইনে রোজ দিতেন রাজা। কিন্তু কৌতূহল জেগেছিল, এত টাকা নিয়ে করে কী বীরবর? সংসার তো ছোট্ট।

তাই নিয়োগ করেছিলেন গুপ্তচর।

যথাসময়ে গুপ্তচর এসে বললে, বীরবর বড় অদ্ভুত লোক। পাঁচশো সোনার টাকার মধ্যে একশো দেয় বউকে, সংসারের খরচ হিসেবে, দুশো দিয়ে দেবপুজোর সামগ্রী কেনে, বাকি দু'শ বামুন, গরিব আর অনাথদের দেয়, তারপর এসে বসে থাকে রাজার সিংহতোরণের সামনে, প্রায় চব্বিশ ঘন্টা।

তৃতীয়বার সেই একই লেবু তাকে উপহার দিলেন রাজা।

অবাক হলেন রাজা। চাকর বলে জাহির করে নিজেকে, কিন্তু দেবত্ব রয়েছে ভেতরে।

একদিন এই মহৎপ্রাণ ভৃত্য দেখিয়ে দিল দৈনিক পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে রাজার জন্যে সে কী-কী করতে পারে। অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য।

ঝড় উঠেছিল। আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেছিল। অনবরত বাজ পড়ছিল। সেইসঙ্গে জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টি। জল দাঁড়িয়ে গেল গোটা রাজ্যে। প্লাবন এসে গেছে দেখে শঙ্কিত হলো জনগণ। প্রলয় একেই বলে। এখন উপায়?

কিন্তু কী আশ্চর্য! রাজার বাড়ির সামনে ফটকে নিশ্চল দেহে বসে রয়েছে বেতনভোগী ভৃত্য। রাজপ্রাসাদের গবাক্ষ সেই দৃশ্য দেখলেন রাজা। বিস্মিত হলেন।

ঠিক এই সময়ে, অমন প্রলয়ংকর ঝড়জল বজ্রপাতের মধ্যে দিয়েও রাজার কানে ভেসে এসেছিল দূরায়ত কান্নার আওয়াজ। কাঁদছে একটি মেয়ে।

বিচলিত হয়েছিলেন রাজা। বীরবরকে ডেকে বলেছিলেন, দেখে এস কে অমন আকুল কান্না কাঁদছে, কেন কাঁদছে।

কান্নার উৎসে পৌঁছে গেছিল বীরবর। দেখেছিল, দীঘির পাড়ে বসে বিলাপ করছে এক রমণী। কেঁদে কেঁদে বলছে, ওগো আমার স্বামীদেবতা, তুমি চলে গেলে আর কি তোমার মতো স্বামী পাবো?

বিস্মিত বীরবর তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, কে তোমার স্বামী?

রমণী উত্তরে বলেছিল, রাজা বিক্রমভুজ, যে তোমাকে মোটামাইনে দিয়ে রেখেছে। আজ থেকে ঠিক তিন দিন পরে দেহাবসান ঘটবে অসামান্য এই নৃপতির, তখন আমার কী হাল হবে?

বীরবর জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কি গণৎকার? ভবিষ্যতের কথা জানছ কী করে?

রমণী বললে, আমি যে স্বয়ং বসুন্ধরা 'ত্রিকালজ্ঞ পৃথিবী' অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সুস্পষ্ট আমার চোখের সামনে।

বীরবর শুধালো, রাজার মৃত্যু রোধ করা যায় কী ভাবে?

পৃথিবী বললে, খুব সহজে।

বলে, বলে গেল বীরবরের করণীয় কি। এবং, কাজটা সহজ নয় মোটেই।

রাজার কোনও ভৃত্য যদি নিজের ছেলেকে নিজের হাতে বলি দেয় দেবী চণ্ডিকার সামনে, রাজা প্রাণে বেঁচে যাবেন।

এই বলে উধাও হয়ে গেল বসুন্ধরা, রাতের অন্ধকারে।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফিরে বীরবর তার নৈশ অভিযানের বৃত্তান্ত খুলে বলল বউ, ছেলে আর মেয়েকে। খুশি মনে ছেলে বললে, তাই হোক। আমাকে বলি দাও, রাজাকে প্রাণে বাঁচাও।

ছেলেকে কাঁধে বসিয়ে, বউ আর মেয়েকে পিঠে ঝুলিয়ে দেবী চণ্ডিকার মন্দিরে গেল বীরবর, যূপকাষ্ঠের সামনে।

কিন্তু চারজনের কেউই জানত না, রাজা স্বয়ং তাদের পেছন নিয়েছেন, আড়ালে থেকে সব দেখছেন, সব শুনছেন।

ছেলের মাথা কেটে দেবীকে উপহার দিল বীরবর, নিজের হাতে।

তৎক্ষণাৎ শোনা গেল আকাশবাণী, সেই রাত্রি নিশীথে ওই ঝড়জল বজ্রপাতের মধ্যে, দিগবিদিক কাঁপিয়ে, ধন্য বীরবর, ধন্য তুমি। অন্নদাতার প্রাণরক্ষার জন্যে তুমি এখুনি যা করলে, তা এই ধরায় নজিরবিহীন।

কিন্তু ঘটনার পরিসমাপ্তি এখানেই নয়। ভাইয়ের কাটামুণ্ড হাতে তুলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শোকে প্রাণত্যাগ করল বীরবরের আদরের মেয়ে। তাই দেখে বউ বললে, তাহলে আমিও যাই ছেলেমেয়ের কাছে। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে নিজের হাতে চিতা সাজিয়ে দিল বীরবর অমন ঝড়জলের মধ্যেও, সতী উঠল জ্বলন্ত চিতায়। চোখের পাতা না কাঁপিয়ে বীরবর দেখে গেল স্ত্রীর জীবন্ত পুড়ে মরা।

রাজার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেছিল এই দৃশ্য দেখে, কিন্তু এখনও দেখার বাকি ছিল।

নিজের হাতে নিজের মুণ্ড কেটে দেবী চণ্ডিকাকে উপহার দিতে গেছিল বীরবর, প্রভুর প্রাণ যখন রক্ষে পেয়েছে, ভৃত্যের বেঁচে থেকে আর দরকার নেই।

কিন্তু তা হয়নি। ফের শোনা গেছিল সুগম্ভীর আকাশবাণী, ক্ষান্ত হও বলো কী চাই।

বীরবর বললে, রাজার দীর্ঘ আয়ু, আমার বউ, ছেলে আর মেয়ে।

সেই বর দিয়ে গেল আকাশবাণী।

তৎক্ষণাৎ ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল বীরবরের বউ, ছেলে আর মেয়ে। পরমানন্দে চারজনে ফিরে এল বাড়িতে। পরক্ষণেই রাজার সিংহতোরণে গিয়ে চুপচাপ বসে রইল বীরবর—ভৃত্যের কাজ করে গেল নিষ্ঠার সঙ্গে যেন কিছুই হয়নি।

হতভম্ব রাজা সবার চোখ এড়িয়ে প্রাসাদে ঢুকলেন। একটু ধাতস্থ হলেন। তারপর গবাক্ষে দাঁড়িয়ে হেঁকে জানতে চাইলেন, সিংহতোরণে এখন আছে কে?

বীরবর বললে স্বাভাবিক গলায়, আজ্ঞে আমি আছি। যে মেয়েটার কান্না শুনে আমাকে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিলেন, আমাকে দেখেই সে পালিয়ে গেছে।

বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলেন রাজা। এ কী রকম মানুষকে তিনি ভৃত্যপদে বহাল করেছেন? এত কাণ্ড করে এল, কিন্তু কণ্ঠস্বর কাঁপছে না, এমন কী লোমহর্ষক কাণ্ডকারখানাও এক্কেবারে চেপে গেল। অমন বিরাট সমুদ্র, অত জল সত্বেও যে সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয় ঝড়ের দাপটে, সেই সমুদ্রও তো এই মানুষটার কাছে গোষ্পদসমান, এক্কেবারে অবিচল এত ঘটনা ঘটিয়ে আমার পরেও। আমাকেও চিরঋণী করে গেল পরিবারের প্রত্যেকের প্রাণের বিনিময়ে আমার প্রাণরক্ষা করার অভূতপূর্ব ঘটনা পরম্পরা ঘটিয়ে। এঋণ শোধ করতেই হবে, যেভাবেই হোক।

এইসব ভাবতে ভাবতে ভেতর মহলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন রাজা।

পরের দিন রাজসভা শুরু হতেই, সবার সামনে বীরবরকে ডাকিয়ে আনলেন রাজা। বললেন গত রাতের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলি।

শিহরিত হল প্রত্যেকেই। শতমুখে প্রশংসা করে গেল বীরবরের।

রাজা নিজের মাথা থেকে উষ্ণীষ খুলে পরিয়ে দিলেন বীরবরের মাথায়। এর চাইতে বাড়ো রাজসম্মান আর হয় না। বাকি জীবনটা যাতে রাজার মতোই থাকতে পারে, সে ব্যবস্থাও করে দিলেন; দ্বিতীয় রাজা হয়ে আমৃত্যু ছিল মহাপ্রাণ ভৃত্য বীরবর।

কাহিনি শেষ করে বললে গোমুখ, প্রলম্ববাহুকে আপনি রোজ একশো মুদ্রা মাইনে দিয়ে বহাল করেছেন। হয়তো সে-ও বীরবরে মতো কোনও মহাপুরুষ। তাকে দেখে আমার সেই রকমই মনে হয়েছে।

৫৪. সমুদ্রশূর কাহিনি

একদিন বন্ধু গোমুখকে নিয়ে শিকার করতে গেল যুবরাজ রথে চেপে, বীর ব্রাহ্মণ প্রলম্ববাহুও গেল সঙ্গে, কিন্তু পায়ে হেঁটে। সবার আগে আগে, ঘোড়াদের চাইতে বেশি বেগে।

শুধু তাই নয়। রথে চেপে তির ছুঁড়ে বাঘ-সিংহ ইত্যাদি হিংস্র প্রাণী নিধন করে গেল যুবরাজ, কিন্তু প্রলম্ববাহু পায়ে হেঁটে আর স্রেফ তরবারি চালিয়ে খতম করে গেল বাঘ-সিংহের মতো ভয়ানক জানোয়ারদের।

অবাক নরবাহনদত্ত অবশেষে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিয়েছিল এক সোনার পদ্মে সুশোভিত সরোবরের পাশে।

ঠিক সেই সময়ে চারপুরুষ এসেছিল যুবরাজের সামনে।

যুবরাজ তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল।

তারা বললে, সাগরের মাঝে আছে নারকেল দ্বীপ। সেই দ্বীপে আছে চারটে পাহাড়। তাদের নাম মৈনাক, বৃষভ, চক্র আর বলাহুক। আমাদের নিবাস সেই পাহাড়ে। আমাদের নাম, রূপসিদ্ধি, প্রমাণসিদ্ধি, জ্ঞানসিদ্ধি আর দেবসিদ্ধি। অনেক রকম রূপ ধরতে পারে যে, তার নাম রূপসিদ্ধি। যে-কোনও সূক্ষ্ম-জটিল সমস্যার

প্রমাণ যে হাজির করতে পারে তার নাম প্রমাণসিদ্ধি। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ যার তৃতীয় নয়নের সামনে প্রোজ্জ্বল, তার নাম জ্ঞানসিদ্ধি। সব দেবতাকেই আরাধনা করে যে সিদ্ধিলাভ করেছে, তার নাম দেবসিদ্ধি। আমরা পুজো করি শ্বেতদ্বীপের ভগবান বিষ্ণুকে। তাঁরই কৃপায় আমরা এই চার পাহাড়ের অধিপতি। বিষ্ণুপুজোর জন্যে এখানে এসেছি সোনার পদ্ম নিতে, বিমানে চেপে। যদি ইচ্ছে করেন, আমাদের সঙ্গে গিয়ে বিষ্ণু দর্শন করতে পারেন।

নরবাহনদত্ত উঠে বসল বিমানে বন্ধুদের রেখে গেল দীঘির পাড়ে। শ্বেতদ্বীপে এসে দেখল বিষ্ণুপুজো করতে এসেছে স্বয়ং নারদ, অন্যান্য ভক্ত, সিদ্ধ, গন্ধর্ব আর বিদ্যাধররা।

শুরু করেছিল বিষ্ণুস্তব, অন্তরের ভক্তি উজার করে দিয়ে। দেখা দিয়েছিলেন বিষ্ণু। নারদকে বলেছিলেন, ইন্দ্রকে বলবে, ক্ষীরসাগর মন্থন করে যেসব অপ্সরা উঠেছিল, যাদের গচ্ছিত রেখেছি ইন্দ্রের কাছে, তাদের যেন ঝটিতি পাঠিয়ে দেয় আমার কাছে।

নারদ তৎক্ষণাৎ ঢেঁকি বাহনে চেপে চলে গেলেন ইন্দ্রপুরীতে।

বিষ্ণু বললেন নরবাহনদত্তকে, এই অপ্সরারা তোমারই পত্নী হবে—তুমিই এদের যোগ্য পতি।

বিষ্ণুর আদেশ শুনে তড়িঘড়ি চার পরমাসুন্দরী অপ্সরাকে নিজের রথে চাপিয়ে ইন্দ্র বলে দিলেন সারথি মাতলিকে, শ্বেতদ্বীপে এখুনি যাও। নরবাহনদত্তকে দেবে এই চার সুরসুন্দরীকে। তারপর সবাইকে নিয়ে রথে করে তার বাড়িতে পৌঁছে দেবে, যে-যে পথে যেতে চাইবে, সেই-সেই পথে যাবে।

নরবাহনদত্ত অপরূপা চার অপ্সরাকে নিয়ে প্রথমেই গেল নারকেল দ্বীপে। ঘুরে ঘুরে দেখল চার পাহাড়ের নানান অদ্ভুত দর্শনীয় জায়গা। তারপর, চার সিদ্ধ পুরুষের কাছে বিদায় নিয়ে ইন্দ্রের রথে চেপে এল দীঘির পাড়ে। বন্ধুদের বললে, তোমরা ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে যাও রাজধানীতে, আমি যাচ্ছি দেবরাজের এই রথে চেপে। কৌশাম্বীতে পৌঁছে, অন্দরমহলে চার অপ্সরাকে রেখে ছুটে গেল বাবা আর মায়ের কাছে। সব শুনে বড়ো খুশি হলেন জনক-জননী।

বন্ধু গোমুখ পরে এল কৌশাম্বী নগরে, জঙ্গল থেকে, সঙ্গে প্রলম্ববাহু। শুরু হল রাজ্য জুড়ে উৎসব।

এরপর একদিন বন্ধুবান্ধব আর বধূ অলঙ্কারবতীকে নিয়ে যখন হাস্যপরিহাসে মত্ত যুবরাজ, ঠিক সেই সময়ে শোনা গেল তূর্যনিনাদ।

সচকিত যুবরাজ বন্ধু হরিশিখকে বলেছিল, দ্যাখো তো, অসময়ে এমন তূর্যধ্বনি কে করছে।

খোঁজ নিয়ে ফিরে এসে হরিশিখ বললে, তূর্য বাজাচ্ছে এক বণিক। তার নাম রুদ্র। অতি বদমাশ লোক। নীচ। সুবর্ণদ্বীপে বাণিজ্য করতে গেছিল, ফেরবার সময়ে জাহাজ ডুবেছে, সর্বস্বান্ত হয়েছে। কোন মতে প্রাণ নিয়ে ডাঙায় উঠে বাড়ি ফিরেছিল। পায়চারি করছিল বাগানে, এমন সময়ে ফিরে গেল কপাল। বাগানের মধ্যেই পেয়ে গেল গুপ্তধন। জ্ঞাতিরা ঈর্ষায় জ্বলে গিয়ে খবরটা দিয়েছিল মহারাজাকে, কানুন অনুসারে গুপ্তধনে অধিকার শুধু দেশের রাজার। রুদ্র বণিক ভীষণ ভয় পেয়ে সমস্ত গুপ্তধন নিজে থেকে দিয়ে গেল মহারাজাকে। কিন্তু মহারাজা বড়ো দয়ালু। বাণিজ্য করতে গিয়ে সব হারিয়েছে শুনে রুদ্র বণিককে দিয়ে দিয়েছেন সমস্ত গুপ্তধন। তাই, আহ্লাদে আটখানা হয়ে তূর্যধ্বনি করতে করতে বাড়ি ফিরছে রুদ্র, জ্ঞাতিশত্রুদের মুখ চুন করে দিয়ে।

পিতৃদেবের এহেন মহানুভবতর কাহিনি শুনে খুশি হয়েছিল যুবরাজ। অবাকও হয়েছিল বিধাতার অপার করুণা দেখে। এক হাতে নিলেন, আর এক হাতে দিলেন। নিমেষে ধননাশ, নিমেষে ধনপ্রাপ্তি। বিধাতার খেলা বড়ো বিচিত্র।

যুবরাজের বিষ্ময়-বচন শোনবার পর, গল্প-গুরু গোমুখের মুখ চুলবুল করে উঠেছিল। তৎক্ষণাৎ শুনিয়ে দিয়েছিল চক্ষুস্থিরকরা একটা উপাখ্যান।

এ গল্পও এক বণিকের গল্প। তার নাম সমুদ্রশূর। নিবাস হর্ষনগরে। ধনী তো বটেই, ধর্মপ্রাণও বটে। সে-ও একদিন সুবর্ণদ্বীপে বাণিজ্য করতে যাওয়ার অভিলাষ নিয়ে উঠে বসেছিল জাহাজে। তারপরেই উঠল দামাল

ঝড়। জাহাজ গেল ভেঙে। সমুদ্রে ঝাঁপ দিল বণিক। হাতের কাছে যে বস্তুটা পেয়েছিল, প্রাণ রক্ষার তাগিদে আঁকড়ে ধরেছিল সেইটাই।

কিন্তু সেটা ছিল একটা মড়া। মানুষের মড়া। ভেসে যাচ্ছিল মাতাল ঢেউ-এর ওপর নেচে নেচে। খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতোই সেই মড়াকে জাপটে ধরে কোনমতে সুবর্ণদ্বীপের বালুতটেই পৌঁছেছিল সমুদ্রশূর। একটু জিরিয়ে নেওয়ার পর হাতে পেল একটা রত্নখচিত স্বর্ণহার।

মূল্যবান জিনিসটা ঝুলছিল মড়ার গলায়। এখন তা হাতিয়ে নিয়ে রওনা হল কলসনগর অভিমুখে। পথে পড়ল একটা মন্দির। ক্লান্ত বণিক মন্দিরের সামনের বটগাছের তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেছিল কলসনগরের রাজ পরিবারে। রাজকুমারী চক্রসেনার গলার হার চুরি হয়ে গেছিল। রাজার গোয়েন্দারা চোরাই হার খুঁজতে বেরিয়ে, ঘুমন্ত বণিকের মুঠোর মধ্যে ঠিক সেই রত্নমালা দেখে, তাকেই ধরে বেঁধে নিয়ে গেল রাজার কাছে।

নির্দোষ বণিক যা সত্যি, তা বলেছিল। কিন্তু একবর্ণও বিশ্বাস হয়নি রাজার। ঠিক এই সময়ে ঘটে গেল একটা আশ্চর্য ব্যাপার।

রাজার হাত থেকে ছোঁ মেরে হার তুলে নিয়ে শূন্যপথে চম্পট দিল একটা শকুনি।

বণিকের চোখে তখন জল এসে গেছিল। শরণ করেছিল অগতির গতি ভগবান মহাদেবকে।

অগ্নিশর্মা রাজা যেই আদেশ দিলেন, ঘাতক! প্রাণ নাও এই চোরটার!

অমনি আকাশ যেন চৌচির হয়ে গেল দৈববাণীর ধমকে, খবরদার! নির্দোষের প্রাণ নি-ও না। হারচোর রাজভয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল সমুদ্রে। মরে গিয়ে যখন ভেসে যাচ্ছে, এই ব্যক্তি সেই হার উদ্ধার করেছে। বাণিজ্য করা এর পেশা, চুরি করা নয়। তোমার রাজ্যেই আসছিল জাহাজ নিয়ে। সেই জাহাজ ডুবে যায় ঝড়ে। প্রাণটা নিয়ে, চোরের মড়াকে জাপটে ধরে উঠেছে বালুকাবেলায়। এর দৌলতেই ফিরে পেলে চোরাই হার। সুতরাং প্রাণহরণ না করে একে ধনদান করো, পুরস্কার স্বরূপ।

দৈবধমক শুনে ঘাবড়ে গিয়ে রাজা তৎক্ষণাৎ সমুদ্রশূরকে মুক্তি তো দিলেনই, দু হাত ভরে দিলেন বিবিধ ধনরত্নে।

সব হারিয়েই তারও বেশি পেয়ে বণিকের কাজ করে গেছিল সমুদ্রশূর। সেই টাকায় নানা রকম বাণিজ্য দ্রব্য কিনে ঘরে ফেরার পথ ধরেছিল। সমুদ্রও পেরিয়ে গেছিল নির্বিঘ্নে। তারপর বাড়ি ফেরার পথে একটা গভীর জঙ্গলে একা না ঢুকে একদল বণিকের সঙ্গে ঢুকেছিল।

গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে কাদা, তখন হানা দিল ডাকাত দল। প্রাণে মেরেছিল সব্বাইকে, সমুদ্রশূর কিন্তু প্রাণ বাঁচিয়ে নিল একটা বটগাছে উঠে, জিনিসপত্র ফেলে রেখে।

সকাল বেলা গাছ থেকে নামতে গিয়ে দেখতে পেল কণ্ঠমাল্য, সোনা আর রত্নখচিত সেই হার, একটা পাখি এবার হার চুরি করেছে, এনে রেখেছে নিজের কোটরে!

একেই বলে দৈব!

গল্প শেষ করে উপসংহারের উপদেশটাও শুনিয়ে দিয়েছিল গোমুখ, তার সব গল্পের শেষেই তো একটা করে হিতবাক্য থাকে, এই গল্পের হিতকথা এই :

পুণ্যের জোর যাদের আছে, তারা হাড়হিম করা কষ্টভোগ করার পরে সুখী হয়।

পরের দিন নতুন গল্প শুরু করেছিল গোমুখ।

হস্তিনাপুরের রাজা সমরবান একবার জ্ঞাতিশত্রুদের চক্রান্তে পড়ে বিষম কষ্টভোগ করেছিলেন। সমরবান শক্তিমান পুরুষ ছিলেন, সুতরাং তাঁকে সম্মুখ যুদ্ধে সহজে হারানো যাবে না। কূট-প্যাঁচ দরকার। গণকরা বলে দিক যাত্রার দিন। জ্যোতিষ শাস্ত্র যা বলবে, তাই করা যাবে।

এল জ্যোতিষীর দল। তারা বললে, খবরদার, এই বছরে যুদ্ধযাত্রা কক্ষনো করবেন না।

এই বলে অকাট্য গণনার প্রমাণ স্বরূপ তারাও একটা গল্প শুনিয়ে দিল জ্ঞাতিশত্রু সামন্ত রাজাদের।

গল্পটা এই :

বহুসুবর্ণ নামে এক রাজা ছিলেন কৌতুকপুর নামে এক দেশে। তাঁর এক চাকরের নাম ছিল যশোদা মা। জাতে ক্ষত্রিয়। মাইনে পেত না এক পয়সাও। মাইনে চাইলেই সূর্যকে দেখিয়ে কৌতুকপুর-নৃপতি বলতেন সকৌতুকে, ওই উনি বারণ করছেন তোমাকে মাইনে দিতে। ইচ্ছে থাকলেও দিতে পারছি না।

কৌতূকপূর্ণ এহেন প্রবঞ্চার অবসান ঘটানোর একটা সুযোগ একদিন এল যশোবর্মার হাতে। সেদিন ছিলপূর্ণ সূর্যগ্রহণের দিন। রাজাকে বললে, আজ মাইনেটা দিয়ে দিন। সূর্য বারণ করবেন না। তাঁকে দেখাই যাচ্ছে না।

বোকার বুদ্ধি দেখে হেসে ফেললেন রাজা। আর তামাসা করলেন না। অনেক বস্ত্র, অনেক টাকাকড়িদিলেন যশোবর্মাকে।

কিছুদিন পরে ফের অভাবে পড়ে রাজার কাছে মাইনে চাইতেই আগের মতো সূর্য দেখিয়ে হাঁকিয়ে দিলেন রাজা।

এর কিছুদিন পরেই মারা গেল যশোবর্মার বউ। মন ভেঙে গেল বেচারার। বিন্ধ্যের জঙ্গলে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে শুরু করল বিন্ধ্যদেবীর উপাসনা।

চঞ্চলা হলেন দেবী স্বপ্নে দর্শন দিলেন যশোবর্মাকে, বললেন, কি চাও? অর্থলক্ষ্মী, না, ভোগলক্ষ্মী, কী পছন্দ?

বোকা যশোবর্মা সরলভাবেই বললে, এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎ কী?

দেবী বললেন হর্ষণপুর দেশে দুজন বণিক আছে। একজনের নাম ভোগবর্মা, আর একজনের নাম অর্থবর্মা। দুজনের সুখ দু-রকমের। দেখে এসে বলো কোন সুখ চাই, তাই পাবে।

হষর্ণপুর যশোবর্মার স্বদেশ। সেখানে আগে গেল অর্থবর্মার কাছে। তার অর্থের সীমা-পরিসীমা নেই। অর্থলক্ষ্মী শব্দটার মানে বোঝা গেল। কিন্তু দুজনে একসাথে যখন খেতে বসল, তখন দেখা গেল, অর্থবর্মা কিছুই হজম করতে পারে না। যশোবর্মা খেয়ে গেল চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়। আকণ্ঠ। কিন্তু সামান্য একটু ঘি আর ছাতু খেয়েই পেট আইঢাই করছে বলে উঠে পড়ল অর্থবর্মা।

যশোবর্মা বুঝেগেল, অর্থবর্মার অর্থ আছে, কিন্তু ভোগ করার ক্ষমতা নেই। এরকম অর্থ রেখে লাভ কী?

শুতে গেল দুজনে পাশাপাশি। মাঝরাতে অর্থবর্মা পেটের ব্যথায় ছটফট করতে করতে বমি করে ভাসিয়ে দিল সামান্য পরিমাণ ঘিমাখা ছাতু!

রেগেমেগে যশোবর্মাগেল ভোগবর্মার বাড়ি। তার বাড়িটা সুন্দর, জিনিসপত্র পরিচ্ছন্ন। কিন্তু টাকাপয়সা নেই। আছে সামাজিক সম্মান। যার অভাব আছে, তাকে টাকা পাইয়ে দেয় অন্যের টাকা এনে। তাইতেই যেটুকু পাওয়া যায়, হাত পেতে তাই নেয়। যশোবর্মা তার বাড়ি যেতেই 'কি খাওয়াবে, কি খাওয়াবে' এই রকম যখন ভাবছে তখন তার এক বন্ধু এসে সংকটমুক্ত করল ভোগবর্মাকে, দুজনকেই নিজের বাড়িতে নিয়ে পেট ভরে খাইয়ে দিল নানা রকম সুখাদ্য। বাড়ি ফিরে পাশাপাশি শুয়ে ঘুমিয়েও পড়ল দুজনে, বমি করে গৃহস্বামী অতিষ্ঠ করল না অতিথিকে।

যশোবর্মা বুঝল, ভোগলক্ষ্মী কী জিনিস। ভোগই ভালোনিছক অর্থের চাইতে।

পরের দিন সেই আর্জিই জানালো বিন্ধ্যদেবীকে। ভোগলক্ষ্মীই ভালো কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ নিয়ে যদি ভোগ করতেই না পারলাম, তাহলে সেই অর্থলক্ষ্মী আমার চাই না।

তাই পেয়েছিল যশোবর্মা, ভোগ করার সামর্থ্য।

গল্প শুনিয়ে বিদায় নিল গণকরা।

গল্পের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সারমর্ম কিন্তু বুঝতে পারল না বিদ্রোহী ঈর্ষাকাতর সামন্ত রাজারা। যা পেয়েছ, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাক এই নীতি তাদের ভালো লাগেনি। এক বছর বসে থাকা কি যায়? রে-রে করে তেড়ে গেছিল সমরবান রাজাকে।

শক্তিমান সমরবান সম্মুখ সমরে প্রত্যেককে হারিয়ে দিয়ে কারারুদ্ধ করেছি তো বটেই, এক সামন্তরাজার খুব সুন্দরী বউকে গায়ের জোরে ধরে এনে তুলেছিল নিজের অন্দর মহলে।

গল্প শেষ করে নীতিবাক্যটা আর মুখে বলেনি গোমুখ। বুঝে নিয়ে মুচকি হেসেছিল যুবরাজ।

আর একদিন।

৫৫.

যুবরাজ বসে আছে যুবরানি অলঙ্কারবতী আর যুবমন্ত্রীদের নিয়ে। এমন সময়ে যুবমন্ত্রী মরুভূতির সামনেই যুবরাজকে নালিস করলে একটা লোক মরুভূতির বিরুদ্ধে!

লোকটা মরুভূতির অন্যতম ভৃত্য। কিন্তু বুকের পাটা আছে। মনিবের বিরুদ্ধে নালিশ মনিবের কাছে।

সে নাকি দুবছর ধরে কাজ করে আসছে। স্ত্রী-কে নিয়ে। শুধু খেতে পরতে দেয় মরুভূতি, মাইনে চাইলেই বেদম পেটায়।

মরুভূতির সরস সাফাই এই, টাকা থাকলে তো দেব!

যুবরাজের এক ধমকে তক্ষুনি বাড়ি গিয়ে টাকা এনে চাকরের মাইনে মিটিয়ে দিল মরুভূতি।

চাকর বিদেয় হতেই গোমুখ বললে, ব্যাপারটা নিন্দনীয় বটে, কিন্তু নিন্দেটা ভগবানের প্রাপ্য, মরুভূতিরনয়।

এ আবার কী কথা?

সুতরাং একটা গল্প শুনিয়ে দিল গল্পের জাহাজ গোমুখ।

চিরদাতা ছিলেন চিরপুর দেশের রাজা। সৎ মানুষ, কিন্তু আত্মীয়রা ছিল বজ্জাৎ, প্রসঙ্গ নামে এক চাকরকে পাঁচ বছর ধরে খাটিয়ে মেরেছে, মাইনে দেয়নি এক পয়সাও।

তারপরেই হঠাৎ মারা গেল রাজার ছেলে, ছোট্ট বয়সে। রাজা যখন শোকাচ্ছন্ন, প্রসঙ্গ মুখ খুলল রাজার সামনেই, পাঁচ বছর খাটাচ্ছেন, এক পয়সাও দেননি। আপনার এই ছেলে বুঝিয়েছিল, সে যখন রাজা হবে, মাইনে মিটিয়ে দেবে। কিন্তু তা তো হল না। রাজপুত্র এখন মৃত। তাহলে চলি? খালি হাতে?

রাজা চিরদাতা তৎক্ষণাৎ প্রচুর টাকাপয়সা দিলেন প্রসঙ্গকে, আরও অনেককে, যারা আত্মীয় পরিজনের দুঃশাসনে এতদিন মাইনে পায়নি, কিন্তু বদনাম হয়েছে রাজার।

গল্পপটু গোমুখ নীতি বাক্যটাও শুনিয়ে দিল তৎক্ষণাৎ, দরকারের সময়ে কোনও রাজা কিসসু দেন না, কিন্তু অসময়ে দেন প্রাপ্যের অধিক অর্থ।

যুবরাজ প্রসন্ন হয়ে বললে গোমুখকে, তাহলে আর একটা গল্প শোনাও।

গোমুখ গল্পের ভাঁড়ার থেকে তক্ষুনি বের করল আর একটা গল্প।

কনকপুর নামে অতি সুন্দর একটা দেশ ছিল গঙ্গার তীরে। সেখানে সব ভালো। কথার মারপ্যাঁচ ছাড়া প্রকৃত বন্ধুত্ব ছিল না, চিঠিপত্তর ছাড়া সত্যি কিছু ছিল না। মেয়েদের চুলের গোছা-ই কেবল নড়েচড়ে যেত, কিন্তু কাজের নড়চড় হত না। কাপট্য ছিল যারা ওষুধ বানায়, তাদের মধ্যে, আর কারও মধ্যে ছিল না। সাধুপুরুষ এরা, খল কেউ নয়, এরা বাদে।

দেশের রাজা ছিলেন কনকবর্ষ। তাঁর মা ছিলেন নাগরাজ বাসুকির মেয়ে যশোদনা। বড়ো গুণবান রাজা। টাকার লোভ ছিল না, শত্রুদের ভয় পেতেন না, কিন্তু পাপ কাজ করতে ভয় পেতেন, লোকনিন্দা করতে জানতেন না, কিন্তু সব শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, রাগতে জানতেন না, কারও দান গ্রহণ করতেন না, কেউ চাপ দিয়ে তাঁকে নোয়াতে পারত না কিন্তু দানধ্যানে কৃপণ ছিলেন না। রূপ ছিল অদ্ভুত। কোনো মেয়ের দিকে তাকাতেন না। মেয়েরাই তাঁকে দেখে প্রেমে পড়ে যেত।

শরৎকালে একদিন বন্ধুদের নিয়ে হাতির পিঠে চেপে গেলেন ছবি-প্রাসাদে, রাজবাড়ি চত্বরে।

সেই সময়ে বিদর্ভদেশ থেকে এক চিত্রশিল্পী এল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তার নাম রোলদেব। রাজা তখন বারবনিতাদের উন্নত বুকে মাথা দিয়ে শুয়েছিলেন।

শিল্পী বললে, রাজা আমাকে আদেশ করুন যে-কোনও ছবি এঁকে দিচ্ছি।

রাজার বয়স্যরা বললে, খোদ রাজার ছবি এঁকে দেখাও।

তৎক্ষণাৎ আঁকা হয়ে গেল ছবি। বয়স্যরা হলো মুগ্ধ।

বললে, এবার আঁকো দেওয়ালে দেওয়ালে আঁকা রানিদের ছবির মধ্যে সেরা রানিকে। আঁকবে রাজার ছবির ঠিক পাশে।

শিল্পী বললে, রাজার পাশে আঁকবার মতো কোনও নারীর ছবি দেওয়ালে দেখছি না। দেখেছি এই পৃথিবীর একজনকেই। সে এক রাজকুমারী। শুনুন তার কাহিনি।

রাজা দেবশক্তি ছিলেন বিদর্ভদেশে কুণ্ডিন নগরের রাজা। তাঁর বউ অনন্তবতীর কোল আলো করেজন্মেছে মদনসুন্দরী। নাগরাজ বাসুকিও তাঁর দুহাজার জিভ খেলিয়ে মদনসুন্দরীর রূপের বর্ণনা দিতে অক্ষম। এক হাজার যুগেও স্রষ্টা আর এক মদনসুন্দরী সৃষ্টি করতে পারবেন না। এই রাজার সঙ্গে মানায় শুধু সেই রাজকন্যাকেই।

আমাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়ে এনে মদনসুন্দরী নিজে এঁকে দেখিয়েছিল এক রাজপুরুষের ছবি। যাঁকে মনে মনে ধ্যান করছে, তাঁর ছবি। ফলে, কামজ্বরে আক্রান্ত হয়ে এলিয়ে পড়েছে, সখীরা সাজাচ্ছে, সেবা করে যাচ্ছে। সখীদের মুখেই শুনলাম, মদনসুন্দরী আপনার প্রেমে পড়েছে। আপনাকে একবার দেখেই।

সেই কাঁচা ছবিটাকে ভালো করে এঁকে দিয়ে চলে এসেছি আপনার কাছে, খবরটা দিতে।

রাজা দেবশক্তি বললেন, বটে! দেখাও মদনসুন্দরীর ছবি।

সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে সেই ছবি এঁকে দিয়েছিল চমৎকার চিত্রকর। ছবি দেখেই মদনসুন্দরীর প্রেমে পড়ে গেলেন রাজা। চম্পট দিল চিত্রকর।

কাহিল করে গেল রাজার অবস্থা। তার আঁকা মদনসুন্দরীর ছবি চোখের সামনে মেলে মদনানন্দের কল্পনায় ত্যাগ করলেন রাজকার্য।

অবশেষে সঙ্গমস্বামী নামে এক ঘটক গেল মদনসুন্দরীর বাবার কাছে। বিয়ে দিয়ে সঙ্গম করিয়ে দেয়, তাই তার নাম সঙ্গমস্বামী। মদনসুন্দরী তার সামনে দারুণ নাচ নেচে দেখিয়ে দিল রাজা দেবশক্তিকে শয্যাবন্দি করার ক্ষমতা তার আছে।

ফলে, বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। রাজা দেবশক্তি আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাজির হলেন বিয়েবাড়িতে। মদনসুন্দরীকে বউ বানিয়ে ফিরে এলেন নিজের বাড়িতে। তাঁর বউ ছিল অনেক, কিন্তু নতুন বউ হল সেরা বউ। বিভোর হয়ে রইলেন তাকে নিয়ে।

তারপর একরাতে মদনসুন্দরীকে বিলক্ষণ সম্ভোগ করার পর ঘুমিয়ে পড়ে এক বিশ্রী স্বপ্ন দেখলেন রাজা।

সকালে উঠেই এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, বিশ্রী এই স্বপ্নের মানে কী হতে পারে।

উত্তর পেলেন এই : রাজা হারাবেন স্ত্রী আর পুত্রকে। ফের ফিরে পারেন। রাজা বললেন, পুত্রই হল না হারাবো কাকে? আগে জন্মাক ছেলে, তার পরে দেখা যাবে।

বললেন বটে, কিন্তু মনে পড়ে গেছিল রামায়ণ কাহিনি। পুত্র জন্মানোর আগেই পুত্র বিয়োগের শাপ পেয়েছিলেন রাজা দশরথ।

সারাদিন উন্মনা রইলেন। রাতে শুলেন একা, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! গভীর রাতে ঘরের মধ্যে দেখা গেল এক রমণীকে।

সে বললে, আমি তোমার মাসি, তোমার মায়ের দিদি, নাগরাজ বাসুকির মেয়ে। তোমাকে অদৃশ্যভাবে সবসময়ে রক্ষা করে যাই। তোমার কাছে থাকি, আজ দেখা দিলাম মনে কষ্ট পাচ্ছ দেখে। ছেলে চাও তো? যাও, কার্তিককে পুজো করো। সে-ই তো ছেলে দেওয়ার দেবতা।

তাই করলেন রাজা। রাজ্যপাট ছেড়ে দিয়ে শুধু কার্তিক নয়, গণেশেরও উপাসনা করে গেলেন। দুই ভাই দুরকম লটঘট বাঁধায় তো, তাই!

কিন্তু নাগকন্যা মাসি রইল তাঁর দেহ আশ্রয় করে, সব রকম বিঘ্ন নিবারণ করার জন্যে।

নিবারণ করেও গেল। সব বিঘ্ন কেটে গেল। পুত্রলাভের বর পেলেন রাজা। তারপরেই কার্তিক ধরে ফেললেন, রাজাকে শক্তি জুগিয়ে গেছে নাগকন্যা মাসি।

তবে রে! রেগে আগুন হয়ে শাপ দিলেন কার্তিক, বিচ্ছেদ ঘটবে বউ আর ছেলের সঙ্গে।

কিন্তু ধুরন্ধর রাজার অতিসুন্দর ব্যবহার আর স্তবপাঠে গলে গিয়ে বললেন, ঠিক আছে এক বছর পরেই ফিরে পাবে বউ আর ছেলেকে।

মদনসুন্দরীর ছেলে হল তার পরেই। কিন্তু পাঁচ দিন বয়সী ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে গেল এক রাক্ষসী, গভীর রাতে মদনসুন্দরী ছুটল পেছন পেছন।

রাজা এসে দেখলেন আঁতুরঘর শূন্য, গেলেন বিন্ধ্যবাসিনীর পুজো দিতে। কেটে গেল পরপর তিনটে মারাত্মক বিপদ। দেবীর কৃপায় ফিরে পেলেন ছেলে আর বউকে, ঠিক এক বছর পর, লুকিয়ে রেখেছিল নাগকন্যা মাসী, নিজের কাছে।

বাড়ি ফিরে মদনসুন্দরীকে করলেন পাটরানি।

শেষ হল গোমুখ-এর টান-টান কামকথা কাহিনি।

৫৬. কমলবর্মা কাহিনি

মরুভূতি কিন্তু ঈর্ষায় জ্বলে যাচ্ছিল বন্ধু গোমুখ একাই গল্প শুনিয়ে যুবরাজের প্রিয়তম পাত্র হয়ে উঠছে দেখে। যুবরাজ তা বুঝতে পেরে বললে মরুভূতিকে, এবার শোনাও তোমার গল্প, টেক্কা মেরে দাও গোমুখকে।

খুশি হল মরুভূতি। শুরু হল তার সুদীর্ঘ গল্পের মধ্যে গল্প।

রাজা কমলবর্মার রাজধানী কমলপুরে এক ব্রাহ্মণ থাকতেন। তাঁর নাম চন্দ্রস্বামী। তাঁর স্ত্রী-র নাম দেবমতী। প্রকৃতই যেন দেবী। যথাসময়ে তার গর্ভে প্রথমে এল ছেলে, তারপর মেয়ে। ছেলের নাম রাখা হল মহীপাল, মেয়ের নাম চন্দ্রাবতী। দুজনেই সুলক্ষণযুক্ত।

কিছুদিন পর খরায় দেশের শস্য জ্বলে গেল। রাজা হলেন অত্যাচারী। চন্দ্রস্বামী ছেলে আর মেয়েকে তাদের মামার বাড়িতে রেখে আসবার জন্যে রওনা হলেন। দেবমতী রইল বাড়িতে।

পথে যেতে হচ্ছিল গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। তেষ্টা পেয়েছিল ছেলে আর মেয়ের। তাদেরকে গাছতলায় বসিয়ে রেখে জলের খোঁজে বেরিয়েছিলেন চন্দ্রস্বামী। কিন্তু বনের ব্যাধরাজা তাকে ধরে নিয়ে গেল বনদেবীর উদ্দেশ্যে বলি দেবার জন্যে।

অসহায় চন্দ্রস্বামী তখন সূর্যস্তব শুরু করেছিলেন সূর্যের দিকে চেয়ে।

—তোমার প্রকোপে দেশে এল খরা। তোমার প্রকোপে তৃষ্ণা পেল আমার ছেলে আর মেয়ের। তুমি আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও আমার ছেলে আর মেয়েকে।

তৎক্ষণাৎ শোনা গেল আকাশবাণী। স্বয়ং সূর্য অভয় দিলেন চন্দ্রস্বামীকে, তাই হবে। ফিরে পাবে ছেলে আর মেয়েকে।

ঠিক সেই সময়ে সার্থধর নামে এক বণিক যাচ্ছিল জঙ্গলের পথে। সুলক্ষণযুক্ত ছেলেমেয়ে দুটিকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল। বাবা জল আনতে গিয়ে আর ফিরছে না শুনে তাদের নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে।

ব্রাহ্মণের ছেলে মহীপাল সেখানেই লেগে গেল অগ্নিপুজোর কাজে।

সার্থধর বণিকের এক ব্রাহ্মণ বন্ধু একদিন এলেন। মহীপাল আর তার বোনকে দেখে ভালোবেসে ফেললেন। নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। তারাপুরে। সেই ব্রাহ্মণের নাম অনন্তস্বামী। রাজার মন্ত্রী।

এদিকে জঙ্গলের মধ্যে ঘটে গেছে আর এক নাটক, ব্যাধরাজাকে ধমকে দিয়েছেন স্বয়ং সূর্যদেব। তাঁর হুকুমে চন্দ্রস্বামীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বিস্তর উপহার সমেত।

কিন্তু ছেলে আর মেয়ে যেখানে ছিল, সেখানে তো নেই! চন্দ্রস্বামীর মাথায় যেন বাজ পড়েছিল। পাগলের মতো তাদের খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছিলেন সমুদ্রের ধারে। সেখানে খবর পেলেন, সুলক্ষণযুক্ত একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নারকেল দ্বীপে, কিন্তু তাদের নাম তো জানা নেই!

চন্দ্রস্বামী তখন বন্ধুত্ব করলেন এক বণিকের সঙ্গে। তাঁর নাম বিষ্ণুবর্মা। তাঁর জাহাজে চেপে পৌঁছোলেন নারকেল দ্বীপে। সেখানে গিয়ে খবর পেলেন, হ্যাঁ, জঙ্গলে পাওয়া একটি ছেলে আর মেয়েকে এখানে এনেছিলেন কনকবর্মা নামে এক বণিক। কিন্তু এখন তাদের নিয়ে গেছেন কটাহ দ্বীপে।

চন্দ্রস্বামী কটাহ দ্বীপে গেলেন আর এক বণিকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে। সেখানে গিয়ে শুনলেন, ছেলে আর মেয়ে সেখান থেকে গেছে কর্পূর দ্বীপে।

লেগে রইলেন চন্দ্রস্বামী, নতুন নতুন বণিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে গেলেন। কর্পূর দ্বীপে, সুবর্ণ দ্বীপে সিংহল দ্বীপে, পেলেন না ছেলে আর মেয়েকে। কিন্তু লেগে রইলেন। সেখান থেকে সমুদ্র পেরিয়ে গেলেন চিত্রকূটে। পেলেন কনকবর্মা বণিককে। কনকবর্মা একটি মেয়ে আর একটি ছেলেকে এনে বললেন, এদেরকে পেয়েছি জঙ্গলের মধ্যে।

কিন্তু এরা তো তাঁর ছেলেমেয়ে নয়। এক্কেবারে ভেঙে পড়লেন চন্দ্রস্বামী। কিন্তু ধৈর্য ধরলেন পরক্ষণেই। ফের বেরোলেন ছেলেমেয়ের খোঁজে। ঢুকলেন একটা মহাবনে। রাত কাটানোর জন্যে উঠে বসলেন একটা বড়ো গাছে।

গভীর রাতে দেখলেন এক আশ্চর্য দৃশ্য। গাছতলায় জড়ো হয়েছে নারায়ণী ভৈরবীরা। রয়েছে নারায়ণ ভৈরব-এর প্রতীক্ষায়। কিন্তু তাঁর আসতে দেরি হচ্ছে দেখে ভৈরবীরা জিজ্ঞেস করেছিল নারায়ণী ভৈরবীকে, প্রভুর এত বিলম্ব হচ্ছে কেন?

ফিক করে হেসে নারায়ণী ভৈরবী বললেন, সে বড়ো লজ্জার কথা।

মেয়েদের পেটে কোনও কথাই গোপন থাকে না। আর এই নারীজাতিই পেট থেকে কথা টেনে বের করতে বড় ওস্তাদ। বিশেষ করে বিষয়টি যদি মুখরোচক হয়।

সুতরাং লজ্জাজনক ব্যাপারটা বলতেই হল নারায়ণী ভৈরবীকে। গাছের ডালে বসে কানখাড়া করে বিষ্ণুশর্মা শুনে গেলেন মেয়েদের নিগূঢ় কথা চালাচালি।

গল্পটা বাস্তবিকই হাস্যকর এবং লজ্জাজনক।

রাজা সুরসেন রাজত্ব করেন সুরপুর দেশে। তাঁর কন্যার নাম বিদ্যাধরী। রূপেও সে প্রকৃত বিদ্যাধরীর মতো। তার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল রাজা বিমল-এর ছেলে প্রভাকর-এর সঙ্গে। কিন্তু ফুলশয্যার রাতেই বিদ্যাধরী জেনে গেল, তার স্বামী হিজড়ে!

পরের দিনই চিঠি লিখে বাবাকে খবরটা জানিয়েছিল বিদ্যাধরী।

চিঠি পেয়েই ক্রোধে অগ্নিশর্মা রাজা সুরসেন চিঠি লিখলেন বেয়াই বিমলকে, তুমি প্রতারক। অচিরেই পাবে শাস্তি। ধ্বংস করবো তোমাকে।

চিঠি পেয়েই ভয়ে আধমরা হয়ে গেছিলেন রাজা বিমল।

পরামর্শ করেছিলেন মন্ত্রীদের সঙ্গে।

সুপরামর্শ দিয়েছিল যে মন্ত্রী, তার নাম লিঙ্গদত্ত। অর্থাৎ, লিঙ্গ দান করার ক্ষমতা যার আছে!

বলেছিল, স্থুলশিরা যক্ষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার মন্ত্র আমি জানি। তার লিঙ্গ বড়ো শক্তিশালীশিরা, উপশিরা ধমনীর জোরে। তাকে কবজায় আনার মন্ত্র আপনাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। মন্ত্র জপ করলেই সে আসবে। তখন চাইবেন তার লিঙ্গ, সে না দিয়ে পারবে না।

মন্ত্রে কাজ হল। যক্ষ এল। নিজের লিঙ্গ দিয়ে পুরষ বানাল প্রভাকরকে। নিজে হয়ে গেল হিজড়ে।

সেই রাতে রাত বিলাসে পরমানন্দ লাভ করেছিল বিদ্যাধরী।

কিন্তু দ্বন্দ্ব জেগেছিল মনে। গতরাতে যে ছিল নপুংসক, আজ রাতে সে দেখিয়ে দিল লিঙ্গের জোর! ঠিক যেন পাথরের শিবলিঙ্গ। ভুল দেখেছিলাম কি ফুলশয্যার রাতে?

ব্যাপারটা খোলাখুলিই জানাল বাবাকে, চিঠি লিখে।

শান্ত হলেন রাজা সুরসেন।

কিন্তু প্রচণ্ড রেগেছেন নারায়ণ ভৈরব, সব জানতে পেরে। লিঙ্গদান করা ঘোরতর পাপ। স্থূলশিরাকে শাপ দিয়েছেন, চিরকাল হিজড়ে হয়েই থাক। আর, প্রভাকর তোর লিঙ্গ নিয়ে আমৃত্যু ফুর্তি করে যাক, ও-লিঙ্গ তো নিস্তেজ হতে জানে না।

এইসব কারণেই আজ নারায়ণ ভৈরব-এর দেরি হচ্ছে আসতে। তাঁর নিজের লিঙ্গ-প্রসাদেই তো যক্ষ স্থূলশিরা এমন রমণীলোভন লিঙ্গের অধিশ্বরী হয়েছিল। তাই মেজাজ গেছে খিঁচড়ে। যোগিনী ভৈরবীদের যথারীতি তিনি মুখ দিয়ে যাবেন, বিবিধ বিচিত্র আসঙ্গ ক্রীড়ার মাধ্যমে।

কামোত্তেজক এহেন কাহিনি শুনে গাছের ডালে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা চন্দ্রস্বামীর লিঙ্গ উত্তেজিত হয়েছিল, বীর্য স্খলিত হয়ে নীচে পড়েছিল। পড়েছিল কার মাথায়?

নারায়ণী ভৈরবীর এক দাসীর মাথায়। সে তো ভৈরবী নয়, নিছক দাসী। এই মিলন মেলায়, তন্ত্রের বিবিধ খেলায়, তার কোনও অংশ নেই, শুধু জোগাড়ে হয়ে থাকতে হয়। তাই একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিল।

চন্দ্রস্বামীর স্খলিত বীর্য পড়ল তারই মাথায়। ছিটকে এসে গড়িয়ে গেল উন্নত কুচ-যুগলের ওপর দিয়ে। উষ্ণ রেতঃ-র গন্ধ কাম জাগিয়েছিল দাসীর। যৌবন-ঠাসা দেহমন্দিরে। ওপরে আড়চোখে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেছিল চন্দ্রস্বামীর সঙ্গে।

মদনদেবতার প্রথা বড়ো বিস্ময়কর। একজনের কাম জ্বর সঞ্চারিত করে দিতে পারে আরেকজনের মধ্যে সেই চোখোচোখির মধ্যে দিয়ে যেন কাম-বিদ্যুৎ বিনিময় ঘটে যায়।

এক্ষেত্রেও ঘটল তাই। শুরু হল দাসীর সঘন নিঃশ্বাসের তালে তালে বাতাবি বুকের উত্থান পতন।

নারায়ণী ভৈরবীর অজানা কিছু থাকে না। এক্ষেত্রেও রইল না। তিনি দেখলেন কাম-উপবাসী চন্দ্রস্বামীর কাণ্ড, বুঝলেন দাসীর সঙ্গম-অভিলাষ, মুখে কিন্তু কিছু বললেন না।

মদনশর যখন এই কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে গাছের ওপর থেকে আর নীচ থেকে ওপরে কামার্ত চাহনি বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে, ঠিক তখনই হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন নারায়ণ ভৈরব। তিনি ক্রোধী বটে, কিন্তু অতীব দয়াপরবশ। এতগুলি যোগিনী ভৈরবীর মিলনমেলায় তাঁর ভূমিকা তিনি পালন করে গেলেন বিবিধ ক্রীড়া-কৌতুকের মাধ্যমে, শরীর মন জুড়িয়ে গেল তন্ত্রমতে, চকিত চমক সৃষ্টি করে প্রত্যেককেই তূরীয় অবস্থায় পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলেন যোগিনী পরিবৃত হয়ে।

দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু নারায়ণী ভৈরবী আর সেই বিবশা দাসী। শুক্র সৌরভ যাকে মাতিয়ে দিয়েছে।

চন্দ্রস্বামীকে গাছ থেকে নেমে আসতে বললেন নারায়ণী ভৈরবী। ধরা পড়ে গেছে বুঝে নেমেই এলেন ব্রাহ্মণ। দাসী সতৃষ্ণ সয়নে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। চন্দ্রস্বামীও কৃষ্ণকায়া যৌবনবতীর কষ্টিপাথরের মতো শরীরের দিকে ঘন ঘন তাকাতে লাগলেন। পুরুষ মানুষ তো, ব্রাহ্মণীর সঙ্গ পাননি অনেকদিন।

মুচকি হেসে বললেন নারায়ণী ভৈরবী, তোমরা দুজনে দুজনকে চাও তো ইচ্ছে মিটিয়ে নাও।

অমনি ব্রহ্মতেজ জাগ্রত হল খাঁটি ব্রাহ্মণ চন্দ্রস্বামীর। কামদেবের মোহপাশ কেটে গেল চকিতে।

বললেন দৃঢ়স্বরে, কক্ষনো না। ঘরে বউ আছে। পরকীয়া মানে পাপ। চন্দ্রস্বামীর সংযম খুশি করেছিল নারায়ণী ভৈরবীকে। তিনি অন্তর্যামী।

অভয়-বর দিলেন ব্রাহ্মণকে, ফিরে পাবে ছেলে আর মেয়েকে, খুব শিগগির। এই নাও পদ্মএ পদ্ম কখনও শুকোয়, না। যথাসময়ে এ পদ্মের মহিমা বুঝবে। শুধু সৌরভ শোঁকাবে।

দাসীসহ উধাও হলেন নারায়ণী ভৈরবী।

ভোর হতেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারাপুর পৌঁছে গেলেন চন্দ্রস্বামী, যেখানে আছে তাঁর ছেলে আর মেয়ে। শুনলেন, মন্ত্রী অনন্তস্বামীর সুখ্যাতি। অতিথিবৎসল পুরুষ। অতিথি হলেন তাঁর বাড়িতে। স্নান করতে গেলেন অনন্ত হ্রদ নামে দীঘিতে। স্নান সেরে ফেরবার সময়ে কানে ভেসে এল কান্নাকাটির শব্দ।

শুনলেন, মন্ত্রী অনন্তস্বামীর পালিত পুত্র-কন্যাকে সাপে কেটেছে।

শুনেই দৌড়েছিলেন চন্দ্রস্বামী। চিনতে পেরেছিলেন নিজের ছেলে আর মেয়েকে। দুজনেই তখন মৃতুপথের পথিক।

চন্দ্রস্বামীর হাতে ছিল সেই আশ্চর্য পদ্ম, যা কখনও শুকোয় না। পদ্ম ধরেছিলেন ছেলের নাকের কাছে।

পদ্মগন্ধ তৎক্ষণাৎ প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিল মহীপালের অসাড় দেহে। উঠে বসেছিল। একইভাবে পদ্মের গন্ধ শোঁকাতে তার বোনও চোখ মেলে চেয়েছিল।

চন্দ্রস্বামী পদ্ম ধরেছিলেন ছেলের নাকের কাছে। পদ্মগন্ধ তৎক্ষণাৎ প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিল মহীপালের অসাড় দেহে।

তারা চিনেছিল বাবাকে। বাবা কিন্তু নির্বাক। ছেলেমেয়েও নির্বাক। বাকসংযমে অভ্যস্ত তিনজনেই। অসময়ে কথা বলে না সংযমী মানুষরা।

যথাসময়ে জানা গেল, মন্ত্রী অনন্তস্বামী বণিক সার্থধরের কাছ থেকে এই ছেলে আর এই মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর নিজের ছেলেমেয়ে নেই বলে। সার্থধর এদের উদ্ধার করেছিল গভীর জঙ্গলের মধ্যে থেকে।

তারাপুর দেশের রাজা তারাবর্মা সব শুনলেন। মহীপালের সুখ্যাতি শুনলেন। তাকে জামাই করে নিয়ে নিজের সিংহাসনে বসিয়ে গোটা রাজ্যটা তাকে দিয়েদিলেন। রাজা মহীপালও আর দেরি না করে মনের মতো পাত্র খুঁজে নিয়ে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিল বোনের।

তারপর একদিন চন্দ্রস্বামী বললেন ছেলেকে, এখন তুমি রাজা। তোমার মা রাজমাতা। তাকে আনতে যাই, নইলে সে কষ্ট পারে। আর মা যদি কষ্ট পায়, কপালে অনেক দুঃখ লেখা হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প বলছি শোনো।

ধবল নামক নগরে এক বণিক ছিল। তার ছেলের নাম চক্র। সে একদিন গোঁ ধরে বাণিজ্য করতে গেছিল দ্বীপে দ্বীপে, মা-বাবার ইচ্ছা ছিল না। মা-বাবার মনে কষ্ট দিলে পরিণাম যে সুখের হয় না, তারই দৃষ্টান্ত রয়েছে জেদি চক্রের জীবনে।

একটানা পাঁচ বছর জলে আর ডাঙায় দুর্দান্ত বাণিজ্য করে গেছিল গোঁয়ার ছেলেটা। নারকেল দ্বীপ, কটাহ দ্বীপ, কর্পূর দ্বীপ, সুবর্ণ দ্বীপ, সিংহল দ্বীপ, উৎস্থল দ্বীপ, রত্নকূট দ্বীপ, চিত্রকূট দ্বীপ, শ্বেত দ্বীপ, হংস দ্বীপ, ধীবর দ্বীপ; মোট এগারোটা দ্বীপে একটানা পাঁচ বছর ধরে টহল দিয়ে, বহু অর্থ কামিয়ে, বিস্তর বারনারী আর পরনারী উপভোগ করে বাড়ি ফেরার পথ ধরেছিল।

কিন্তু বাড়ি ফেরা হল না। অদৃষ্ট ফলে গেল। বাড়ির কাছাকাছি এসেও প্রবল ঝড়ে জাহাজ ডুবে গেল। লোকজন গেল হাঙর কুমিরের পেটে, ধনরত্ন গেল সমুদ্রের তলায়, ঢেউ চক্রকে টেনে নিয়ে গিয়ে আছড়ে ফেলে দিল সমুদ্রসৈকতে।

যখন সে প্রায় বেহুঁশ, তখন দেখল ঘোর কালো দৈত্যাকার ভীষণদর্শন একটা লোক এসে তাকে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ফেলল একটা লোহার ঘরে। দরজা বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে।

ভয়ানক এক কাণ্ড চলছিল সেই ঘরে। একটা আগুনে গরম লাল লোহার চাকা বন বন করে ঘুরছিল একটা হাত-পা বাঁধা লোকের ঠিক মাথার ওপর। সে দরদর করে কাঁপছে, ঠকঠক করে কাঁপছে, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে কোটর থেকে ঠায় ঘূর্ণ্যমান অগ্নিময় চাকার দিকে চেয়ে থাকার ফলে।

দেখে তো চক্র নিজেই ঘেমে গল। চিঁ-চিঁ করে জিজ্ঞেস করেছিল ঘর্মাক্ত কলেবর লোকটাকে, কে তুমি? এমন শাস্তি পাচ্ছন কেন? নিশ্চয় কোও খারাপ কাজ করেছিলে?

ভাঙা গলায় ঊর্ধ্বনেত্র অবস্থায় লোকটা জবাব দিয়েছিল, হ্যাঁ, করেছিলাম। জাতে আমি বণিক। নাম আমার খড়্গ। বাবা-মাকে অগ্রাহ্য করতাম। তাঁরা অভিশাপ দিয়েছিলেন, ঘুরন্ত চাকার মতো ধারাল কথায় আমাদের অনেক কষ্ট দিলি, ফল পাবি এইভাবেই।

ভয়ের চোটে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। মা-বাবা বলেছিলেন, বুঝতে যখন পেরেছিস, তখন একমাস কষ্ট পেয়েই খালাস পাবি।

নিশীথ রাতে ভীষণ দর্শন একটা দৈত্যকার লোক ঢুকল আমার ঘরে। বেঁধে এনে ফেলল এই লোহার ঘরে। আগুন-রাঙা চাকা ঘুরিয়ে দিল মাথার ওপর। আজ নিয়ে হবে একমাস, মুক্তি পাবো বাবা-মায়ের অভিশাপ থেকে।

কথা শেষ হতে না হতেই ঘর গমগম করে উঠেছিল আকাশবাণীতে, খড়্গ, তোমার শাপ কেটেছে। এখন চক্রের শাপ শুরু হবে। ঘুরন্ত চাকা বসিয়ে দাও ওর মাথায়।

ঘড়গকে বসাতে হল না, চাকা নিজেই সরে এসে ঘুরতে লাগল চক্রের মাথার ওপর, যেন একটা অদৃশ্য হাত খুব সহজেই সরিয়ে আনল গনগনে বনবনে চাকাকে।

খড়্গ ফিরে গেল বাড়ি, আর বাবা-মায়ের কথার অবাধ্য হয়নি।

চক্র কিন্তু মাথার ওপর ঘুরন্ত চাকার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ঘোরো, ঘোরো, আমার শাপ কাটাও, এই পৃথিবীর আমার মতো শাপগ্রস্তদেরও শাপ কাটাও।

বলার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেছিল ঘূর্ণ্যমান চাকা। মাথার ওপর পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল স্বর্গ থেকে। সেইসঙ্গে শোনা গেছিল দৈববাণী, তুমি মুক্ত, যাও বাড়ি।

ঘরে এল এক বিদ্যাধর। সমুদ্রতল থেকে তুলে এনেছে চক্রের সমস্ত ধনরত্ন। চক্রকে কোলে তুলে নিয়ে রেখে গেল বাবা-মায়ের কাছে, ধবল নগরে।

গল্প শেষ করে পরিশেষের উপদেশটাও শুনিয়ে দিয়েছিলেন চন্দ্রস্বামী। ছেলে মহীপালকে বলেছিলেন, মা আর বাবাকে বাদ দিয়ে যে রোজগার, সে রোজগার তো অনেক পাপের ফল। কিন্তু মা আর বাবাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে গেলে সব পাওয়া যায়। শোনো তাহলে আর একটা কাহিনি।

প্রসিদ্ধ মুনি মহাতপা বসেছিলেন গাছতলায়, মাথার ওপরের ডালে বসেছিল চোট্ট একটা বক। সে বিষ্ঠা ত্যাগ করেছিল। বিষ্ঠা পড়েছিল মুনির মাথায়।

রেগে গেছিলেন মহাতপা। রক্তলোচনে চেয়েছিলেন খুদে বকের দিকে। চোখের আগুনে তৎক্ষণাৎ পুড়ে ছাই হয়ে গেছিল পুঁচকে বক।

দেখে অহংকারে ফুলে উঠেছিলেন মহাতপা। তপস্যার জোর আছে বটে, চোখের আগুনে ভস্ম তো করে দিলেন।

তারপর একদিন এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে ভিক্ষে চাইতে গেলেন মহাতপা। ব্রাহ্মণী বললেন, একটু সবুর করুন। স্বামীকে সেবা করছি।

প্রচণ্ড রেগে গেলেন মহাতপা। কটমট করে চাইলেন ব্রাহ্মণীর দিকে, চোখের আগুনে পুড়িয়ে দেবেন বলে।

কিন্তু হেসে ফেলেছিলেন ব্রাহ্মণী। বলেছিলেন, আমি কিন্তু ছোট্ট বক নই। ভস্ম হবো না।

বসে পড়লেন মহাতপা, বিস্ময়ে বিমূঢ়। বক পুড়িয়েছিলেন ভস্মলোচন হয়ে বনের মধ্যে, এত দূরে বসে ব্রাহ্মণী তা জানলেন কী করে?

স্বামীসেবা করে মহাতপাকে ভিক্ষে দিতে এলেন ব্রাহ্মণী। করজোড়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন মহাতপা, বক ভস্ম করার বৃত্তান্ত আপনি জানলেন কী করে?

স্বামী সেবা করে। সেই আমার ধর্ম, সেই আমার কর্ম। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা অর্জন করেছি শুধু এর জোরে, স্বামীর আশীর্বাদে।

মহাতপার মুখে কথা নেই। বলেন কী ব্রাহ্মণী? শুধু স্বামীসেবার জোরে দূরদর্শন ক্ষমতা লাভ করা যায়?

হেসে বলেছিলেন ব্রাহ্মণী, ধর্মের কথা যদি শুনতে চান, যান ধর্মব্যাধ-এর কাছে।

সে কে?

মাংস বিক্রি করে পেট চালায়, কিন্তু ধর্ম কাকে বলে, তা জানে। শুনলে আপনার কল্যাণ হবে। দর্পচূর্ণ হবে।

অনেক খুঁজে ধর্মব্যাধকে পেয়েছিলেন মহাতপা, তখন সে দোকানে বসে মাংস বিক্রি করছে।

কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলার আগেই সে নিজে থেকে বললে, আপনি তো মহাতপা মুনি? ব্রাহ্মণী আপনাকে পাঠিয়েছে?

মহাতপা এক্কেবারে থ!

তারপর বলেলেন, জানলে কী করে?

ব্যাধ বললেন, মা আর বাবার সেবা করে, উদয়াস্ত। মাংস বেচি পেট চালানোর জন্যে। জ্ঞান সঞ্চয় করি সেবা করে, যেমন করেছেন সেই ব্রাহ্মণী। আপনি তা করুন, অহংকার চলে যাবে। মঙ্গল হবে।

তাই করেছিলেন মহাতপা। অষ্টসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন, শুধু সেবার মাধ্যমে।

কাহিনি শেষ করে পুত্র মহীপালকে বলেছিলেন বিষ্ণুশর্মা, চলো, মায়ের মন কাঁদছে। সামনে গিয়ে পুণ্যসঞ্চয় করো।

সেই রাতেই বাবার সঙ্গে মায়ের কাছে চলে গেছিল মহীপাল, স্ত্রীকে কিছু বলে যায়নি, জানিয়ে গেছিল শুধু মন্ত্রী অনন্তস্বামীকে।

যে ছেলে হারিয়ে গেছিল গভীর জঙ্গলে, সেই ছেলে যখন ফিরে এসেছিল রাজা হয়ে, মায়ের আনন্দ তখন দেখে কে!

সুতরাং, বাবা আর মায়ের কাছেই কিছুদিন থেকে গেল মহীপাল।

এদিকে তারাপুর রাজবাড়িতে হুলস্থুল শুরু হয়ে গেল সক্কাল হতেই। চোখ রগড়ে ঘুম থেকে উঠে মহাপালের বউ দেখল স্বামী নেই পাশে।

ছুটে এলেন মন্ত্রী অনন্তশর্মা। বুঝিয়ে বললেন রাজকন্যাকে। মহীপাল তো বলে গেছে, মা আর বাবার সঙ্গে দিনকয়েক কাটিয়েই ফিরে আসবে। এত অস্থিরতা কি সমীচীন?

কিন্তু বিরহ সব মানুষকেই অস্থির করে তোলে। বিশেষ করে যেখানে আছে নিখাদ প্রেম! সুতরাং রাজকন্যা বন্ধুমতী ছটফট করে গেল দিবারাত্র, বিদেশ থেকে কেউ এলেই ছুটে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতো স্বামীর খবর।

একদিন এলেন এক বিদেশি ব্রাহ্মণ। তাঁর নাম সঙ্গমদত্ত। রাজকন্যা তাঁর কাছেই জানতে চাইল মহীপালের খবর।

সঙ্গমদত্ত বললেন, না গো কন্যা, তাকে আমি কক্ষনো দেখিনি। তার খবরও রাখি না। ধৈর্য ধরো, মানুষের মঙ্গল করে যাও, দেখা হবেই। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা শোনাই। ভারি আশ্চর্য ব্যাপার।

শুরু হল আশ্চর্য ব্যাপারের বিবরণ।

হিমালয় পাহাড়ে মানস সরোবরে গেছিলাম। দেখলাম অতি আশ্চর্য একটা বাড়ি। কাঁচের মতো স্বচ্ছ এক রকম মাণিক দিয়ে তৈরি। তারপর দেখলাম এক রমণীমোহন পুরুষকে। অপরূপা কন্যা পরিবৃত। প্রত্যেকের নিবাস যেন দেবলোকে। একহাতে কৃপাণ নিয়ে যুবতী পরিবেষ্টিত সেই পুরুষ দীঘির পাড়ে এসে সুরাপানে মেতে গেছিল সুন্দরীদের সঙ্গে। সেই সঙ্গে চলল নানারকম আমোদপ্রমোদ। আমি দূর থেকে এই দৃশ্য দেখছি, এমন সময়ে অকস্মাৎ আর একজন অতীব সুন্দর পুরুষ এসে গেল আমার পাশে। আঙুল তুলে আমি দেখালাম সামনে ক্রীড়া কৌতুকের দৃশ্য, বললাম যা-যা দেখেছি।

তখন সেই সুন্দর মানুষটা বলে গেল নিজের কাহিনি।

আমি ছিলাম রাজা, ত্রিভুবনপুরের। একজন শিব-উপাসক আমার সেবা করে যেত নিরন্তর। কারণটা আমি জানতে চেয়েছিলাম।

সে বলেছিল, আপনার সাহায্য পাওয়ার জন্যে এত সেবা করে যাচ্ছি। সিদ্ধ কৃপাণের জন্যে সাধনা করে যাচ্ছি, সে কৃপাণ সর্বশক্তিবান, অসাধ্যসাধন করে।

সাহায্য করতে আমি রাজি হয়েছিলাম। সে আমাকে রাত্রি নিশীথে নিয়ে গেছিল এক গভীর জঙ্গলে। একটা বিবর দেখিয়ে বলেছিল, প্রতিজ্ঞা করুন, এই বিবরে ঢুকে প্রথমেই যে কৃপাণটা হাতে পাবেন, তা নিয়ে বেরিয়ে এসে আমার হাতে তুলে দেবেন, তারপরেই আমাকে ঢুকিয়ে দেবেন সেই বিবরে।

অদ্ভুত প্রস্তাব। কিন্তু আমি রাজি হয়েছিলাম, তাকে সাহায্য করতেই তো এসেছি, এই কারণে।

বিবরে ঢোকবার পর দেখলাম, গুহাটা ক্রমশ বড়ো হতে হতে বিরাট হয়ে গেল। ছাদ দেখা যায় না, এত উঁচু। মণিমাণিক দিয়ে গড়া একটা অত্যাশ্চর্য প্রাসাদও দেখলাম। হঠাৎ এক অপরূপা বেরিয়ে এল প্রাসাদ

থেকে। সপ্রেম চাহনি মেলে নিবিড় বাহুবন্ধনে আমাকে টেনে নিয়ে গেল প্রাসাদের মধ্যে। হাতে তুলে দিল একটা ভারী সুন্দর কৃপাণ।

মুখে বললে, সর্বশক্তিমান এই কৃপাণ তোমাকে আকাশেও উড়িয়ে নিয়ে যাবে। কাছে রাখবে সবসময়ে, সযত্নে।

বলেই, আমাকে নিয়ে মেতে গেল প্রমোদ বিহারে। উল্লাসে মত্ত হয়ে আমিও থেকে গেলাম বিবরে বেশ কিছুদিন। রমণীরত্ন হাতে ধরা দিলে কেউ ছাড়ে না। সুন্দরী-সঙ্গ এতোই নিবিড়ভাবে উপভোগ করেছিলাম যে বিস্মৃত হয়েছিলাম প্রতিজ্ঞা।

হঠাৎ একদিন তা মনে পড়তেই তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এলাম বিবরের বাইরে। হাতে কৃপাণ নিয়ে। প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাকে বিবরের মধ্যে নিয়ে গেলাম, কৃপাণ রাখলাম আমার কাছে।

মেতে রইলাম সেই পাতাল-সুন্দরীর সঙ্গে যে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল কৃপাণ, রতিরঙ্গে মেতেছিল আমাকে নিয়ে।

শিব-উপাসক পেল আর এক পাতাল-সুন্দরীকে। কিন্তু রইল তক্কে তক্কে। একদিন যখন আমি মদ খেয়ে মত্ত, কৃপাণ ছিনিয়ে নিল আমার হাত থেকে। তৎক্ষণাৎ কৃপাণ প্রভাবে সর্বশক্তিমান হয়ে আমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল বিবরের বাইরে। নিজে ঢুকে গেল ভেতরে। আমি বসে হইলাম, বেরোলেই ধরবো বলে।

এইভাবে বসেছিলাম বারো বছর।

আজ সেই প্রতারককে দেখছি চোখের সামনে, পাতাল-কন্যাদের বিহারে মত্ত।

আশ্চর্য এই কাহিনি যখন শুনছি, ঠিক সেই সময়ে মদের নেশায় ঘুমিয়ে পড়েছিল শিব-উপাসক।

তৎক্ষণাৎ ধেয়ে গেছিল ত্রিভুবনপুরের রাজা। ছিনিয়ে নিয়েছিল দিব্য কৃপাণ, তৎক্ষণাৎ লাভ করেছিল দৈবশক্তি। লাথি মেরে ঘুম ভাঙিয়েছিল শিব-উপাসকের। কিন্তু প্রাণে মারল না।

পাতাল-কন্যাকে জড়িয়ে ধরে ঢুকে গেল সুন্দর সেই প্রাসাদে, স্বচ্ছ মাণিক দিয়ে গড় প্রাসাদে।

দৈবশক্তি হাতে পেয়েও হারিয়ে মনোকষ্টে গুম হয়ে বসে রইল শৈব-উপাসক।

এই রকমই হয়। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি দৈবশক্তি হাতে পেয়েও হারায়। কিন্তু পুণ্য সঞ্চয় যে করে, সে কখনও অবসাদ আর হতাশায় ভোগে না। ত্রিভুবনপুরের রাজা যেমন বারো বছর ধৈর্য দেখিয়ে ফিরে পেয়েছিল প্রিয়সঙ্গমের কন্যাকে, তুমিও তেমনি পাবে তোমার স্বামীকে।

এই বলে বিদায় নিয়েছিল সঙ্গমদত্ত।

আক একদিন। বিদেশ থেকে এল এক ব্রাহ্মণ। বন্ধুমতী তাকে বিস্তর আপ্যায়ন করার পর জিজ্ঞেস করলো স্বামী সংবাদ।

ব্রাহ্মণের নাম সুমনা। অর্থাৎ, উত্তম মনের অধিকারী। যোগবলে।

সে বললে, তাকে আমি দেখিনি ঠিকই, কিন্তু আমার মন বলছে, খুব শিগগিরই তোমার বিরহের অবসান ঘটবে। উদাহরণ স্বরূপ একটা গল্প বলি, শোনো।

নল ছিলেন প্রাচীন বন্যজাতি নিষাদদের রাজা। যারা বিশেষ ব্যাধ, তাদের বলা হয় নিষাদ। আশ্চর্য সুন্দর মানুষ ছিলেন।

নল বিয়ের পাত্রী খুঁজছিলেন। শুনলেন, বিদর্ভের রাজা ভীম-এর অতিসুন্দরী অতি গুণবতী এক কন্যা আছে। তার নাম দময়ন্তী।

রাজা ভীম নিজেও দময়ন্তীর যোগ্য বর খুঁজছিলেন। খোঁজও পেয়েছিলেন। তামাম দুনিয়ায় দময়ন্তীর সঙ্গে মানায় শুধু রাজা নলকে।

এই দময়ন্তী একদিন দীঘির জলে নেমে স্নান করবার সময়ে ধরে ফেললে এক রাজহাঁসকে। সঙ্গে সঙ্গে খাঁটি সংস্কৃত ভাষায় রাজহাঁস দময়ন্তীকে বললে, আমাকে যদি ছেড়ে দাও, তাহলে তোমার মস্ত উপকার

করবো। নিষাদরাজা নলই তোমার যোগ্যতম স্বামী হতে পারে। তোমার পাশে তাঁকেই শুধু মানায়। শুধু রূপ নয়, বহু গুণের আধার তিনি। আমি তোমাদের বিয়ের ঘটক হতে চাই। তাঁর কথা এনে দেব তোমাকে, তোমার কথা নিয়ে যাব তাঁর কাছে। প্রেমের মালা গাঁথা হোক আকাশ পথে আমার দুতালি মারফৎ।

সোজা কথায়, কামদূত হতে চাইল রাজহংস।

অভিনব এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে রাজহাঁসকে মুক্তি দিয়েছিল দময়ন্তী। তখনই বলে দিয়েছিল, বিয়ে করব এই নল রাজাকেই, আর কাউকে নয়।

ছাড়া পেয়ে উড়ে গিয়ে সোজা নল রাজার সামনে দীঘির জলে নেমে পড়েছিল রাজহাঁস, নল তখন স্নান করছিলেন, ধরে ফেললেন রাজহাঁসকে।

রাজহাঁস বললে, আমি তো এসেছি আপনারই মঙ্গলের জন্যে। আমাকে ছেড়ে দিন।

মঙ্গলটা কী ধরনের, তা জানতে চেয়েছিলেন রাজা নল। বেশ গুছিয়ে যা বলেছিল রাজহাঁস, তা এই :

বিদর্ভ রাজার মেয়ে দময়ন্তীকে বলা যায় ধরার তিলোত্তমা, সে চায় আপনার বউ হতে, সেই বার্তা নিয়েই আমি এসেছি।

শুনেই প্রেমে পড়ে গেছিলেন নল। সেই খবর দময়ন্তীর কানে পৌঁছে দিয়েছিল রাজহাঁস-দূত। ফিরে গেছিল নিজের জায়গায়।

দময়ন্তী বাবা আর মা-কে বললে, স্বয়ংবর সভা হোক, রাজা নল আসবেন। সবার সামনে তাঁকে বরমাল্য দেব।

আমন্ত্রণ চলে গেল ধরণীর সমস্ত বরণীয় নৃপতিদের কাছে। তাঁরা দলে দলে রওনা হলেন স্বয়ংবর সভা অভিমুখে। রথে চেপে রাজা নলও রওনা হলেন।

এদিকে হইচই পড়ে গেচে স্বর্গে। দময়ন্তী রূপ গুণ কাম জাগিয়েছিল ইন্দ্র, বায়ু, যম, অগ্নি আর বরুণ, এই পাঁচ দেবতার মধ্যে। তারা শলাপরামর্শ করে এল রাজা নলের কাছে, যখন তিনি রথ হাঁকিয়ে চলেছেন স্বয়ংবর সভার দিকে।

পাঁচ দেবতা একটা কথাই বলে গেল নলকে, আমাদের বর তোমাকে অদৃশ্য করে দেবে। কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না, অন্তঃপুরে ঢুকে যাবে। দময়ন্তীর সামনে গিয়ে ফের দৃশ্যমান হবে। তাকে বলবে, মানুষ তো একদিন না একদিন মরে যায়, তখন বিধবা হতে হয় বউকে। নলকে বিয়ে করলেও দময়ন্তীর কপাল পুড়বেই। তার চাইতে বরং ইন্দ্র, বায়ু, যম, অগ্নি আর বরুণ, এই পঞ্চদেবতার একজনকে স্বামী করুক দময়ন্তী, আখেরে লাভ হবে।

দেবতাদের কথা ঠেলতে পারেননি সদাশয় নল। অন্তঃপুরে ঢুকে গেছিলেন হন হন করে, রক্ষকরা তাকে দেখতে পায়নি।

দময়ন্তীর সামনে গিয়ে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, পাঁচ দেবতার বিবাহ প্রস্তাব।

পাঁচজনের আবেদনই বাতিল করেছিল দময়ন্তী। বলেছিল, রাজা নল ছাড়া কেউ আমার স্বামী হবে না, স্বয়ংবর সভায় তা দেখিয়ে দেব।

এতক্ষণ পর্যন্ত দময়ন্তী জানতো না, রাজা নল স্বয়ং তার সামনে দাঁড়িয়ে। যাওয়ার সময়ে জানিয়ে গেলেন নিজের পরিচয়।

পঞ্চদেব নল-এর মুখে শুনল দময়ন্তীর প্রতিজ্ঞা বৃত্তান্ত।

খুশি হল রাজা নল-এর নিঃস্বার্থ দূতালিতে। বর দিল তৎক্ষণাৎ যখনই মনে করবে নল, পঞ্চদেবতা উপস্থিত হবে তার সামনে।

এরপর নল গেল বিদর্ভে। পঞ্চদেবও গেল বিদর্ভে। দময়ন্তীর মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনবার জন্যে। কিন্তু ফিচলেমি করতে ছাড়লেনা। পাঁচজনেই হুবহু নল-এর রূপ ধারণ করে বসে রইল আসল নল-এর পাশে। কে আসল, কে নকল, বোঝবার উপায় রইল না।

শুরু হল স্বয়ংবর সভা। নিজের বর নিজেই বেছে নেওয়ার সভা। এক-একজন রাজার কাছে ভাইয়ের সঙ্গে যাচ্ছে দময়ন্তী, ভাই সে রাজার নাম ধাম গুণ গরিমার বৃত্তান্ত বলে যাচ্ছে। রূপ দেখে নিচ্ছে স্বচক্ষে এবং ফলাও করে দেখাচ্ছে সেই রাজা। কিন্তু দময়ন্তীর পছন্দ হচ্ছে না কাউকেই। বহু রাজাকে নিরাশ করার পর এসে দাঁড়াল এক নল নয়, ছয় নল-এর সামনে!

হুবহু একই রকম দেখতে ছ-জনকে। যেন একই ছাঁচে ঢালা ছয়টি মূর্তি।

এদের মধ্যে আসল নল একজনই। বাকি পাঁচজন জাল নল, সেই পাঁচ কামপীড়িত দেবতা, ইন্দ্র, পবন, যম, অগ্নি, বরুণ, ছায়া-মায়া দিয়ে গড়া শরীর হুবহু নল-এর মতো, জালিয়াতির চূড়ান্ত!

ধোঁকায় পড়েছিল বেচারা দময়ন্তী। ছয় নল-এর মধ্যে আসল নলকে চিনবে কী করে?

সব ছায়ামায়ার ধোঁকা কেটে যায় সূর্যের আলোয়। তাই সূর্যবন্দনা শুরু করেছিল অসহায় দময়ন্তী, সূর্যের দিকে চেয়ে।

পরমুহূর্তেই চোখ নামিয়েছিল ছয় নলের দিকে, সকৌতুকে ছজনেই তাকিয়ে তার দিকে।

দময়ন্তী বলেছিল শুভ্র-সুন্দর কণ্ঠস্বরে, হে দেবগণ, আপনারা জানেন, কুমারী রমণী যখন কোনও পুরুষকে মনে মনে পতি রূপে বরণ করে, তখন সে নিজেকে সেই পুরুষের পত্নীরূপে মনে করে। অন্য পুরুষকে বরমাল্য দান তখন তার কাছে অসতী হওয়া, পরকীয়া করা। হে প্রজ্ঞাবান পঞ্চদেবতা, আমার সতীত্ব রক্ষা করুন। আমার প্রতি আপনাদের অসমীচীন কামনা ত্যাগ করুন।

কথাগুলো বজ্রশলাকার মতো বিদ্ধ করেছিল মোহাবিষ্ট পঞ্চদেবতাকে। তৎক্ষণাৎ ছায়ামায়ার ছদ্মবেশ ত্যাগ করে স্বরূপে ফিরে গেছিল পঞ্চদেবতা।

আসল নল হাসিমুখে চেয়ে রইলেন দময়ন্তীর চোখে চোখে চেয়ে।

তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিল সজলচক্ষু দময়ন্তী। তৎক্ষণাৎ পুষ্পবৃষ্টি হল আকাশ থেকে।

শেষ হল স্বয়ংবর সভা, অনেক সমারোহে। বর হতে যারা এসেছিলে, তারা খুশি মনে রওনা হলেন যে-যার রাজ্য অভিমুখে।

পাঁচ দেবতাও ফেরার পথে দেখতে পেল কলি আর দ্বাপর হন্তদন্ত হয়ে চলেছে দময়ন্তীর বরমাল্য গলায় পরার আশায়। একটু যা দেরি হয়ে গেছে, তাহলেও...

পঞ্চদেবতা রঙ্গ করে তাদের বলেছিল, আর ছুটে লাভ নেই। দময়ন্তী এখন নল-এর বউ। মানিয়েছে বেশ।

শুনেই তো রেগে আগুন কলি আর দ্বাপর, এতবড়ো স্পর্ধা! দেবতাদের বিমুখ করে মানুষকে বরণ করা। দেখাচ্ছি মজা!

যথাসময়ে এক ছেলে আর এক মেয়ের মা হয়ে গেল দময়ন্তী। ছেলের নাম ইন্দ্রসেন, মেয়ের নাম ইন্দ্রসেনা।

দুরাত্মা কলি তক্কে তক্কে ছিল এতদিন, কিন্তু অনিষ্ট সাধনের ছেঁদা খুঁজে পাচ্ছিল না। নল-এর পেছনে লেগেছিল ছায়ার মতো।

পেয়ে গেল একদিন।

সেদিন নল শাস্ত্রের বিধান অনুসরণ করতে ভুলে গেছিলেন। পা না-ধুয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক না করে, সন্ধ্যের সময়ে শুয়ে পড়েছিলেন।

ছিদ্র পেয়ে গেছিল কলি, অনাচার হেতু ছিদ্র।

তৎক্ষণাৎ সেই ছিদ্রপথে ঢুকে গেছিল নল-এর শরীরের মধ্যে। সুস্থ জ্ঞান লোপ করে দিয়ে যত্তোসব অপকর্মের দিকে নলকে টেনে নিয়ে গেছিল। অধর্মের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন নল। যা খুশি তাই করতে আরম্ভ করেছিলেন, কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেলে যা হয়। পাশাখেলা, ঝি-মৈথুন, মিথ্যা কথন, দিবানিদ্রা, নিশাজাগরণ, শুধুমুধু বিষম রাগে চণ্ডালমূর্তি ধারণ, অসৎপথে টাকা রোজগার, সাধুসজ্জনদের হেয় করা, অসাধুদের মাথায় তোলা, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

দ্বাপরও এই সুযোগ ছাড়েনি, রাজা নল-এর ছোটো ভাই পুষ্করাক্ষের দেহে ঢুকে দিবানিশি তাঁকে অসৎপথে নিয়ে গেছিল।

পুষ্করাক্ষের বাড়িতে ছিল একটা ভারি সুন্দর সাদা ষাঁড়। দেখে লোভ হয়েছিল রাজা নল-এর। চেয়েছিলেন পুষ্করাক্ষের কাছে।

পুষ্করাক্ষ দেননি, দিতে দেয়নি তাঁর ভেতরের দ্বাপর।

সাফ বলে দিয়েছিলেন দাদাকে, পাশা খেলে জিতে নাও।

শুরু হয়েছিল অতিশয় পাপকর্ম, পাশাখেলা।

পুষ্করাক্ষের তো ওই একটা মাত্র শ্বেতষণ্ড, তাকে জিতে নেওয়ার জন্যে রাজা নল বাজি রেখে গেলেন নিজের হাতি, দামি দামি মণিরত্ন, সৈন্যসামন্ত, নিজের মাথার মুকুট, রাজ্য, সব গেল। একটানা তিনদিন ধরে খেলা চলল। রাজা নল কলির প্রভাবে আচ্ছন্ন অবস্থায় খেলেই চলেছেন। হেরেই চলেছেন, বন্ধুরা কেউ তাঁকে থামাতে পারছে না, সর্বস্ব যে গেল!

হুঁশ নেই রাজা নল-এর। দময়ন্তী প্রমাদ গুণে ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিলে বাপের বাড়ি।

আর ঠিক তার পরেই কুটিল হেসে দ্বাপর-প্রভাবিত পুষ্করাক্ষ বললে, সবই তো গেল তোমার। এক্কেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলে। এখন বাজি ধরো বৌদিকে।

অর্থাৎ, দময়ন্তীকে।

এইবার কিন্তু তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন রাজা নল। এতবড়ো স্পর্ধা! বৌদির দিকে কুনজর!

তিনি জানবেন কী করে, কুনজরটা পুষ্করাক্ষের নয়, ভেতরে যে রয়েছে, সেই দ্বাপরের।

দময়ন্তীকে বাজি ধরলেন না রাজা নল।

পুষ্করাক্ষ সগর্জনে বললেন, তাহলে বেরোও, এ রাজ্য এখন আমার। বউ নিয়ে বিদেয় হও!

ধিক! ধিক পাশাখেলাকে!

দময়ন্তীর হাত ধরে রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে বনে বনে টহল দিয়ে গেলেন রাজা নল। একদিন বেজায় ক্লান্ত হয়ে একটা দীঘির পাড়ে বসে দেখলেন একজোড়া হাঁস নাগালের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনের পেটেই তখন খিদের আগুন জ্বলছে। রাজা নল-এর পরনে ধুতি ছাড়া ছিল গায়ের একটা মাত্র উরুনি, রাজবেশ তো আর নেই। তরবারি পর্যন্ত বাজিতে হেরেছেন। তাই গায়ের উরুনি চাপা দিয়ে হাঁস দুটোকে ধরতে গেছিলেন।

কী আশ্চর্য! উরুনি-চাপা অবস্থাতেই ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে চোখের সামনে দিয়ে উড়ে গেছিল দুটো হাঁসই!

অবাক হয়ে যখন এই অসম্ভব দৃশ্য দেখছেন রাজা নল, ঠিক সেই সময়ে শোনা গেছিল আকাশবাণী, অবাক হচ্ছ? এ সবই কলি আর দ্বাপরের কীর্তি। দময়ন্তীকে বিয়ে করতে না পেরে ঝাল মেটাচ্ছে। ওরাই তো উড়িয়ে নিয়ে গেল মুখের খাবার!

বিমর্ষ হলেন রাজা নল। বনের মধ্যে দিয়ে যে রাস্তাটা দময়ন্তীর বাপের বাড়ির দিকে গেছে, সেই রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেন বউকে।

অর্থাৎ, বিদেয় হও।

মুখ শুকিয়ে গেছিল দময়ন্তীর। গাছের ফল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল অঘোরে, পথের ক্লান্তিতে।

ঘুম ভাঙার পর দেখলে, রাজা নল-এর আর এক কুকীর্তি। অথবা, শনির কীর্তি!

দময়ন্তীর গায়ের কাপড় নেই! সে অর্ধনগ্না! গায়ের কাপড় খুলে নিয়ে নিজের গায়ে দিয়ে চম্পট দিয়েছেন নল!

তখন মাঝরাত। ঊর্ধাঙ্গ অনাবৃত রেখে কাঁদতে কাঁদতে বনের সেই পথ ধরেছিল দময়ন্তী, যে পথ দিয়ে বাপের বাড়ি যাওয়া যায়। সতীত্ব ছাড়া তার আর কোনও অস্ত্র নেই। এই সতীত্বের তেজেই প্রাণ নিল এক

সাপের, ছোবল মারতে এসেছিল তাকে। ছাই হয়ে গেল এক ব্যাধ, কামের আগুনে পুড়ে, দময়ন্তীকে ভোগ করতে এসে, সতীর সতীত্ব তখন লেলিহান আগুন হয়ে ছুটে গেছিল।

এরপর দেখা হয়েছিল বনপথে একদল বণিকের সঙ্গে। অর্ধনগ্না দময়ন্তীকে দেখে সযত্নে তারা নিয়ে গেছিল সুবাহু রাজার দেশে, সুবাহু তাকে সসম্মানে রাজপ্রাসাদে রেখে দিলেন। এইখানেই একদিন দময়ন্তীর বাবার পাঠানো মন্ত্রী এল মেয়ে-জামাইয়ের খোঁজে। দেখা হয়েগেছিল দুজনায়। দময়ন্তী ফিরে এসেছিল বাপের বাড়ি। কিন্তু দিবানিশি চোখের জল ফেলে গেছে, স্বামী বিরহে।

নল তাকে কোলে তুলে নিয়ে দাবানল থেকে অনেক দূরে রেখে দিতে যাচ্ছেন।

তার বাবা তখন চর পাঠালেন দেশে দেশে, খুঁজে আনুক মতিচ্ছন্ন নলকে। বলে দিলেন, মনে রেখো, আমার জামাইয়ের দুটো মস্ত গুণ আছে। ভালো রাঁধে, ভালো রথ চালায়। খুঁজে যদি বের করতে পারো,

বলবে, ওহে নিঠুর শিরোমণি, জঙ্গলে ঘুমন্ত বউয়ের গায়ের কাপড় চুরি করে পালালে কেন? এই কি তোমার স্বামীত্ব?

এবার ফিরে আসা যাক রাজত্বহীন রাজা নল-এর কাণ্ডকারখানায়। বউয়ের গায়ের কাপড় চুরি করে নিজের গায়ে দিয়ে একটু এগিয়েই পড়লেন দাবানল-এর সামনে। নলকে আটকে দিল দাবানল, বন জ্বলছে হু-হু করে!

এবং, স্পষ্ট শুনতে পেলেন একটা কণ্ঠস্বর। দাবানল-এর হু-হু আওয়াজের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হু-হু শব্দে কে যেন বলছে, বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! এই দাবানল থেকে আমাকে বাঁচাও!

কণ্ঠস্বর যে দিক থেকে আসছে, সেই দিকে ছুটে গেছিলেন নল। দেখেছিলেন একটা অদ্ভুত সাপকে!

তার মাথার মণির আলোতেই জায়গাটা ঝলমল করছে। কুণ্ডলী পাকিয়ে দাবানলের আঁচ থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে।

নল তাকে কোলে তুলে নিয়ে দাবানল থেকে অনেক দূরে রেখে দিতে যাচ্ছেন।

কিন্তু অদ্ভুত সাপ তাকে বলেছিল, এখানে নয়, এখানে নয়, গুনে গুনে দশ পা গিয়ে আমাকে মাটিতে নামিয়ে দিও। তাই করলেন নল। দশ পা গিয়ে হেঁট হয়ে অদ্ভুত সাপকে যেই কোল থেকে নামাতে যাচ্ছেন, সাপ বিষ দাঁত বসিয়ে দিল তাঁর কপালে।

সঙ্গে সঙ্গে চেহারা পালটে গেল নল-এর। ছিলেন গৌরবর্ণ, হয়ে গেলেন আলকাতরার মতো কালো; আজানুলম্বিত বাহু হু-হু করে ছোট্ট হয়ে গেল, যেন বেঁটে বামনের হাত; ছিলেন সুদর্শন, হয়ে গেলেন অতীব কুদর্শন।

কোল থেকে সাপকে মাটিতে নামিয়ে নল বলেছিলেন, তুমি এত অকৃতজ্ঞ?

সাপ বললে, আমি সাপেদের রাজা, নাগরাজ কর্কোটক। তোমাকে কামড়েছি উপকার করবার জন্যেই। কী উপকার, তা যথা সময়ে জানতে পারবে। একটা কথা মনে রেখো, গুহ্য শক্তিকে কাজে লাগাতে গেলে বেঁকাপথে যেতে হয়, বৈরীভাব দেখাতে হয়।

দুটো কাপড় দিচ্ছি, এ কাপড় আগুনে পুড়ে যাবে না। পরে নাও, কদর্যতা ঘুচে যাবে, সুন্দর চেহারা ফিরে পাবে।

কাপড় দুখানা নল হাতে নিতেই অদৃশ্য হয়ে গেল অদ্ভুত সাপ, সাপেদের রাজা কর্কোটক।

নল সোজা চলে গেলেন কোশল রাজ্যে। সেখানকার রাজা ঋতুপর্ণের হেঁসেলে চাকরি নিলেন, রন্ধন বিদ্যার গুণ দেখিয়ে। যেহেতু হাত তাঁর খাটো হয়ে গেছে, তাই নিজের নাম বললেন 'বেঁটে হাত'।

দুদিনেই খ্যাতি অর্জন করলেন দুটো ব্যাপারে। রান্নাবান্না আর রথচালনা।

এর পরেই বিদর্ভ রাজ্যের গুপ্তচর এল কোশল রাজ্যে। কানে গেল 'বেঁটে হাত'-এর সুখ্যাতি। সে-নাকি দাঁরুণ রাঁধে, দারুণ রথ চালায়।

এই গুণ তো আছে রাজা নল-এর!

গেল তাঁর কাছে। বললে, হে নিষ্ঠুর শিরোমণি, ঘুমন্ত কন্যাকে জঙ্গলে ফেলে পালালে কোথায়? যাবার সময়ে তার গায়ের কাপড়টাও হাতিয়ে নিয়ে গেলে? কী রকম নির্লজ্জ, নৃশংস তুমি?

ঘুরিয়ে জবাব দিয়েছিলেন নল, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়লে তাকে কি আর দেখা যায়? দুঃসময় অনেক কিছুই উড়িয়ে নিয়ে যায়।

শুনেই গুপ্তচর বুঝে গেছিল, কদর্যদেহী এই পাচকই রাজা নল।

খবর পৌঁছে গেল বিদর্ভে। দময়ন্তী বললে বাবাকে, দূত যাক রাজা ঋতুপর্ণের। বলুক, যেহেতু রাজা নল নিরুদ্দেশ, তাই দময়ন্তী ফের স্বয়ংবরা হবে কাল সকালেই। আমার স্বামীর কানে খবরটা গেলেই রাতারাতি চলে আসবে এখানে, রথ চালনায় তার মতো দক্ষ আর কেউ নেই।

হলও তাই। ঋতুপর্ণ রাজা ছদ্মবেশী নলকে ডেকে বললেন, ওহে বেঁটে হাত, তুমি নাকি বেগে রথ চালাও? আজ রাতেই পৌঁছে দাও আমাকে বিদর্ভ রাজ্যে, কাল সকালে দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় হাজির থাকতেই হবে।

শুনেই নল বুঝে নিয়েছিলেন, এ সবই দময়ন্তীর বুদ্ধি। ফের বিয়ে করার ভয় দেখিয়ে নলকে টেনে আনতে চায় নিজের কাছে।

তাই রথ চালিয়েছিলেন হাওয়ার বেগে। উড়ে গেছিল ঋতুপর্ণ রাজার গায়ের কাপড়। তিনি রথ থামাতে বলেছিলেন নলকে, কাপড় খুঁজে আনবেন বলে। নল বলেছিলেন আপনার কাপড় এখন একশো যোজন পেছনে পড়ে আছে। ঋতুপর্ণ বলেছিলেন, তোমার রথচালনা বিদ্যে আমাকে শিখিয়ে দাও, আমি তোমাকে সংখ্যাজ্ঞান শিখিয়ে দেব। তোমার সামনের ওই যে গাছটা, ওতে যতগুলো ফল, যতগুলো পাতা আছে, তা তোমাকে বলে দিচ্ছি। রথ থামিয়ে মিলিয়ে নাও।

চক্ষের নিমেষে ফল-সংখ্যা আর পাতা-সংখ্যা বলে গেছিলেন ঋতুপর্ণ রাজা। গাছের নীচে রথ দাঁড় করিয়ে নল গুণে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। সঠিক সংখ্যাই বলেছেন ঋতুপর্ণ, শুধু দেখে, তাও অনেক দূর থেকে!

বিদ্যা বিনিময় ঘটলো তৎক্ষণাৎ। ঋতুপর্ণ পেলেন রথ চালানোর বিদ্যে, নল পেলেন গণনা বিদ্যে।

সদ্য শেখা মহাবিদ্যার পরীক্ষাও নিলেন নল, নিজেই। আর একটা গাছের ফলের সংখ্যা আর পাতার সংখ্যা সঠিক জেনেছেন কিনা, তা পরীক্ষা করে নিলেন হাতে গুণে, চমৎকৃত হলেন।

খুশিমনে ঋতুপর্ণ আর একটা আশ্চর্য বিদ্যা শিখিয়ে দিলেন নলকে? পাশা খেলার বিদ্যে। কক্ষনো হারবেন না।

আর ঠিক সেই সময়ে একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল। আনন্দে আটখানা নল-এর শরীর থেকে ফুস করে বেরিয়ে এল মিশমিশে কুৎসিত এক পুরুষ।

অবাক নল তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কে হে তুমি?

কালো কুচ্ছিত লোকটা বললে, কলি। তোমার শরীর আশ্রয় করেছিলাম দময়ন্তী তোমাকে বিয়ে করেছিল বলে। তোমার বুদ্ধিনাশ করেছিলাম, তোমার সর্বনাশ করে যাচ্ছিলাম, সেই সঙ্গে দময়ন্তীর। কিন্তু জঙ্গলের ওই, সাপটা তোমাকে কামড়াতেই আমি জ্বলে যাচ্ছিলাম, তোমার কিন্তু কিছু হয়নি। শুধু মুধু কারও ক্ষতি করলে কেউ কি সুখী হয়? চললাম। কল্যাণ হোক তোমার।

অদৃশ্য হয়ে গেল কলি। সুবুদ্ধি ফিরে পেলেন নল।

ঝড়ের বেগে রথ চালিয়ে রাজা ঋতুপর্ণকে নিয়ে এলেন শ্বশুর বাড়ি বিদর্ভ রাজ্যে।

ধূলিধূসরিত রথ, ঘর্মাক্তকলেবর ঘোড়া আর অস্থির পঞ্চানন ঋতুপর্ণকে দেখে প্রজারা কৌতূহলী হয়েছিল। দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় এসেছেন শুনে অট্টহেসে চলে গেছিল।

হতভম্ব ঋতুপর্ণ বাকি রাত কাটানোর জন্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন রাজপ্রাসাদের কাছের এক প্রাসাদে, রান্নাঘরে ঢুকে গেছিলেন নল রাঁধতে।

মূর্তিমান প্রভঞ্জনের মতো একটা রথ মাটি কাঁপিয়ে নগরে ঢুকতেই সেই আওয়াজ শুনে চমকে উঠেছিল দময়ন্তী। এ আওয়াজ যে সে চেনে! তার স্বামী যখন উল্কাবেগে রথ চালায়, মেদিনী যে এইভাবেই থর থর করে কাঁপে!

খবর নিয়েছিল তৎক্ষণাৎ, দাসীকে পাঠিয়ে।

দাসী এসে বলেছিল, দেখে এলাম এক অদ্ভুত ব্যাপার। মিথ্যে স্বয়ংবর সভায় এসেছেন এক রাজা। কিন্তু তার পাচক আর রথচালক অতিশয় কিম্ভুতকিমাকার। যেমন কালো, তেমনি কদাকার। হাত দুটো খাটো, ঠিক যেন একটা মর্কট। কিন্তু রাঁধে অদ্ভুত। পায়েসে জল না দিলেও পায়েস ফুটে উঠলো উনুনে কাঠ না দিলেও আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। রান্নাবান্না হয়ে গেল চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে।

নিশ্চিন্ত হয়েছিল দময়ন্তী। নলই এসেছেন।

পাঠিয়ে দিয়েছিল ছেলে আর মেয়েকে, নিজে যায়নি।

তাতেই ওষুধ ধরেছিল। ছেলেমেয়েকে কোলে নিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন নল। দাসীর মুখে বৃত্তান্ত শুনে দময়ন্তী আর এক প্যাঁচ কষেছিল পরের দিন সকালে। দাসীকে দিয়ে নলকে বলিয়েছিল, আপনার মতো গুণবান পাচক নাকি আর কেউ নেই? ভালো ভালো খাবার রেঁধে দিন আমাদের রূপকন্যার জন্যে, অনেকদিন তিনি উত্তম আহার করেননি।

ঋতুপর্ণের অনুমতি নিয়ে দময়ন্তীর কাছে গেলেন কদর্যদেহী নল।

দময়ন্তী সোজা বললে, সত্যি বলো, তুমি নল? মুক্ত করো অহর্নিশ দুশ্চিন্তা থেকে।

কেঁদে ফেলেছিলেন নল। বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমিই সেই অধম নল, এখন হয়েছি অনল, মহাপাপে।

বললেন, কীভাবে কর্কোটক তাঁকে কামড়েছিল, ফলে বজ্জাৎ কলি শরীর থেকে বেরিয়ে গেছিল।

কর্কোটকের দেওয়া কাপড় দু-খানা তখন পড়লেন দময়ন্তীর সামনে।

তৎক্ষণাৎ, শরীর হয়ে গেল আগের মতো। রূপবাণ, কান্তিমান।

আনন্দে কেঁদে ফেলেছিল দয়মন্তী।

উৎসব শুরু হয়ে গেল বিদর্ভরাজ্যে। ঋতুপর্ণ সব শুনে লজ্জায় মাথা হেঁট করেছিলেন। কিন্তু বিলক্ষণ সমাদৃত হয়ে তিনি খুশিমনে স্বদেশে ফিরে গেলেন।

নল নিজের রাজ্য নিষধে এলেন। পাশা খেলায় পুষ্করাক্ষকে হারিয়ে দিলেন। যা-যা হারিয়েছিলেন, সব জিতে নিলেন।

পুষ্করাক্ষের শরীর থেকেও পলায়ন করেছিল দ্বাপর। দাদার প্রতি সমীহ ফিরে পেয়েছিল ছোটো ভাই।

নল-দময়ন্তীর কাহিনি সমাপ্ত করে সুমনা ব্রাহ্মণ বলেছিল রাজকুমারী বন্ধুমতীকে, মন যাদের উচ্চে, মহান যারা সব দিকে দিয়ে, তারা সাময়িক বিপদে পড়েও কাটিয়ে ওঠে, নাম যশ ফিরে পায়। যেমন, এই সূর্য। অস্ত যাচ্ছেন, আবার উদিত হচ্ছেন। তাই বলি তোমাকে। স্বামীকে ফিরে পাবেই, সহিষ্ণু হও।

তাই করেছিল বন্ধুমতী। দেখিয়ে গেছিল ধৈর্য, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা।

যথাসময়ে স্বামী মহীপাল বাবা আর মাকে নিয়ে ফিরে এসেছিল শ্বশুরবাড়ি, মন দিয়েছিল শ্বশুরের দেওয়া রাজ্যশাসনে।

বন্ধুমতীর সুখ তখন দেখে কে!

মরুভূতি বর্ণিত আশ্চর্য এই কাহিনি শুনে যৎপরোনাস্তি প্রীতিলাভ করেছিল যুবরাজ নরবাহনদত্ত। সস্ত্রীক।

৫৭. শুভদত্ত কাহিনি

রাজা উদয়নের কাছে এসেছিল রত্নদত্ত নামে এক বণিক।

বললে, এই শহরে একজন আশ্চর্য মানুষ আছে। তার নাম বসুধর। ছিল মোটবাহক, খুব গরিব, হঠাৎ হয়ে গেছে বেজায় বড়োলোক। পানাহার চলছে পুরোদমে সেই-সঙ্গে দু-হাত দানধ্যান। কারণটা কৌশলে তার পেট থেকে বের করেছি। রাজবাড়ির একটা মণিমুক্তোর বালা তার হাতে আসে।

তা থেকে একটা মাত্র মাণিক খুলে নিয়ে বেচে দেয় হিরণ্যগুপ্ত জহুরিকে। পায় এক লক্ষ সোনার টাকা। তাইতেই এত ফুর্তি। রত্নখচিত সেই বালা আমি নিজের চোখে দেখে এলাম। বসুধরই দেখাল। দেখলাম, বালায় খোদাই করা রয়েছে মহারাজার নাম।

তৎক্ষণাৎ বসুধরকে রাজসভায় আনালেন রাজা উদয়ন। দেখলেন সেই বালা। বললেন, এ বালা তো আমার হাত থেকেই খুলে পড়ে গেছিল। তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলে না কেন?

বসুধর বললে, আমি তো অক্ষর পড়তে পারি না। মহারাজার নামও পড়তে পারিনি।

হিরণ্যগুপ্তকে ডেকে আনা হল রাজসভায়। সে বললে, আমাকে কাছে একটা জহর আনা হয়েছিল, তাতে তো রাজার নাম খোদাই করা ছিল না। থাকলে নিশ্চয় চলে আসতাম রাজসভায়।

মুখ্যমন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ তখন বললে, দুজনেই নির্দোষ।

রাজা উদয়ন ছেড়ে দিলেন দুজনকেই। গরিব বসুধরকে দিলেন উপহার, জহুরী হিরণ্যগুপ্তকে ফিরিয়ে দিলেন এক লক্ষ সোনার টাকা। কিন্তু ঈর্ষাকাতর রত্নদত্তকে বিলক্ষণ ভুগিয়ে মুক্তি দিলেন। পরশ্রীকাতর তার শিক্ষা।

তারা চলে গেলে যুবরাজের বন্ধু বসন্তক একটা চমৎকার গল্প শুনিয়ে দিল রাজাকে।

মন্দকপাল বসুধর-এর ভাগ্য ফিরে এসে চলে যাওয়ার মতো একটা ঘটনা ঘটেছিল অতীতে, পাটলিপুত্র নগরের শুভদত্ত নামে এক কাঠুরের জীবনে। সে রোজ কাঠ কেটে আনত। সেই কাঠ বেচে সংসারের খরচ জোগাত। একদিন সে বনের মধ্যে দেখতে পেয়েছিল গয়নাগাটি পরা চারজন যক্ষকে।

শুভদত্ত ভয় পেয়েছিল। যক্ষরা তাকে অভয় দিয়েছিল, অতিশয় গরিব দেখে। বলেছিল, আমাদের সেবা করো। তাহলেই এমন ব্যবস্থা করে দেব যাতে তোমার সংসারে স্বচ্ছলতা আসে।

কাঠুরে শুভদত্ত তাই শুনে চার যক্ষের স্নান করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। খাবার জায়গা করে দিয়েছিল। আসন পেতে দিয়েছিল।

কিন্তু খাবার কোথায়?

সমস্যার সমাধান করে দিল চার যক্ষ। একটা খালি কলসি দিল শুভদত্তকে। বললে, খাবার বের করো এর মধ্যে থেকে।

হতভম্ব হয়ে গেছিল বেচারা শুভদত্ত। এ কিরকম রসিকতা! কলসি তো খালি! খাবার কোথায়?

চক্ষুস্থির শুভদত্তকে তখন চার যক্ষ বলেছিল হাসিমুখে, ভেতরে হাত ঢোকাও, তাহলেই খাবার পাবে হাতের মধ্যে। এর নাম ইচ্ছাকলসি। যা চাইবে এর কাছে, যে খাবার খুশি, তাই পাবে।

শুভদত্ত খালি কলসির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিতেই দেখলে দুহাত ভরে গেছে রকমারি খাবারে। তাজ্জব ব্যাপার তো!

সুতরাং অফুরন্ত কলসির কৃপায় চার যক্ষকে পেট ভরে খাইয়ে নিজেও খেয়ে গেল খুশিমতো খাবার, যেসব খাবার চোখেও দেখেনি তো কত দিন!

যক্ষসেবা চলল এইভাবে, বেশ কিছুদিন। এদিকে তার বাড়ির লোকজন না খেয়ে রয়েছে। শুভদত্ত জঙ্গলে গিয়ে মরে গেল কিনা, সে দুশ্চিন্তাও হয়েছে।

যক্ষরা তখন স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাদের বলেছিল, ভয় নেই। শুভদত্ত বহাল তবিয়তে আছে। শিগরিই ফিরবে।

এক মাস একনাগাড়ে শুভদত্তর সেবা নেওয়ার পর যক্ষরা বললে, এবার বাড়ি যাও, কী চাও বলো।

শুভদত্ত বললে, এই কলসিটা।

যক্ষরা বললে, কিন্তু এই ইচ্ছা-কলসি তো তুমি রাখতে পারবে না। ভেঙে গেলেই পালিয়ে যাবে। অন্য কিছু চাও।

একগুঁয়ে শুভদত্ত কলসি ছাড়া আর কিছুই নিল না। কলসি নিয়ে বাড়ি এল। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন, সবাইকে মহাভোজ খাইয়ে দিল।

কাজকর্ম যখন আর করতে হয় না, তখন আলসেসির সঙ্গে মদ খাওয়ার বদ নেশাও ঘাড়ে চাপল শুভদত্তর। ভালো ভালো মদ তো কলসিই দিয়ে যাচ্ছে।

কৌতূহলী বন্ধুরা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, এত মদ-মাংস, মিষ্টি সে পাচ্ছে কোত্থেকে?

মদের নেশায় কলসি নিয়ে নেচে নেচে শুভদত্ত বলেছিল, এই ইচ্ছা-কলসির কৃপায়।

স্খলিতচরণ অবশদেহ শুবদত্তর হাত থেকে দেবদত্ত কলসি ঠিকরে গিয়ে আছড়ে পড়েছিল মেঝেতে, খান খান হয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ।

আশ্চর্য কাণ্ডটা ঘটে গেল চোখের সামনেই। ভাঙা কলসি আস্ত হয়ে গেল নিমেষ মধ্যে, শূন্যপথে চম্পট দিল তৎক্ষণাৎ!

শুভদত্তর সংসারে ফিরে এল আগের টানাটানি।

এই গল্প থেকেই পাওয়া যায় একটা শিক্ষা : মদ বুদ্ধিনাশ করে। তখন অনটন দেখা যায়। খুশি হলেন রাজা উদয়ন।

সেইদিনই রাত্রে যুবরাজ নরবাহনদত্তকে অনুরূপ একটা উপাখ্যান শুনিয়েদিল বন্ধুবর মরুভূতি।

বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিল নরবাহন দত্ত। ঘুম আসছিল না চোখে। মুচকি হেসে বলেছিল মরুভূতি, হে বন্ধু, তোমার চোখে ঘুম নেই কেন, আমি তা জানি। অন্দরমহলে শুতে আজ যাওনি কেন? ইচ্ছে ছিল যুবরানির এক যুবতী পরিচারিকাকে মদনানন্দ দেবে, নিজেও দাসী-রমণের সুখ পাবে।

কিন্তু বন্ধু, তা হয়নি, সেই রঙ্গিলা অন্তঃপুর থেকে বেরোতে পারেনি। বারবনিতাদের স্বভাবচরিত্র কখনোই ভালো হয় না, তা তোমার অজ্ঞাত নয়। তা জেনেও সেই বারাঙ্গনাকে তুমি মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছ না, হে বন্ধু, পাঁচজনকে দেহ বেচে যারা উপায় করে, তাদের মনকি কখনও নির্মল হয়? হয় না। কুভাবে ভরাট থাকে মনের কলসি, এই সম্পর্কে একটা কহিনি মনে পড়ে গেল, শোনো।

এই দেশে একটা সমৃদ্ধ শহর আছে। নাম, চিত্রকূট। একসময়ে সেখানে থাকতো লক্ষ্মীপ্রসাদ ধন্য এক সওদাগর। নাম, রত্নবর্মা। ছেলে হলে তার নাম রাখা হয়েছিল ঈশ্বরবর্মা।

ঈশ্বরবর্মা অতিশয় মেধাবি, ছোটো থেকেই চটপট বহু বিদ্যা অর্জন করে ফেলছিল, তাই দেখে বাবা রত্নবর্মা ঠিক করলেন, এ ছেলেকে বেশ্যাদের ছলনা বিদ্যা কী ভয়ংকর বিদ্যা, সেটাও শিখিয়ে রাখা দরকার। তবেই তো কুহকিনীদের খপ্পর এড়িয়ে যেতে পারবে।

এক ধুরন্ধর বেশ্যার বাড়িতে গেল রত্নবর্মা, তাকে বেশ্যা-রানি বললেও চলে। বেশ্যা-বিদ্যার সব কিছুই সে রপ্ত করেছে। বেশ্যা-বিদ্যালয় চালায় বাড়ির মধ্যে। যদিও তাকে দেখতে অতি কুৎসিত, ফুলো গাল, লম্বা দাঁত, বেঁকা নাক।

রত্নবর্মা গিয়ে দেখলে বুড়ি বেশ্যা তার যুবতী মেয়ে বেশ্যাকে শেখাচ্ছে, যার টাকা থাকে, সে সবার পুজো পায়। তার সমাদর সর্বত্র। বিশেষ করে বেশ্যাদের আদর সব জায়গায়। বেশ্যারা কাউকে ভালোবাসে না, কিন্তু দেখায় যেন কতোই না ভালোবাসে। ভাল যারা বাসে, তাদের টাকা হয় না। বেশ্যারা ওই ভুল করে না। মিথ্যে প্রেম দেখায়। টাকা কামায়। টাকা থাকলেই বেশ্যা নির্মমভাবে খদ্দেরকে দুইয়ে নিতে পারবে, না থাকলে দুর্বল হয়ে প্রেমে পড়ে যাবে। তাই, বেশ্যার কাজ মেকি ভালোবাসা দেখিয়ে খদ্দেরকে পথে বসিয়ে তাকে ছেড়ে যাওয়া, দয়ামায়া ভালোবাসা নেই আসল বেশ্যাদের মধ্যে। এক ধনীকে ছেড়েই আর এক ধনীকে ধরবে। তার ধনরত্ন থাকলেই হল, রূপ যৌবন নাই থাকুক, টাকাই আসল, টাকা নিয়ে বাচ্ছা ছেলে অথবা বুড়ো হাবড়া যদি আসে, তাদেরকেও ছাড়বে না। ঋষিরা যেমন সবাইকে সমান চোখে দেখে, বেশ্যারাও সব পুরুষকে স্রেফ খদ্দের হিসেবে দেখবে।

শুনে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছিল সওদাগর রত্নবর্মার। কিন্তু হিসেবি মনে বুঝে গেছিল, ব্যভিচারের দূতীএই কুটনিকেই দিয়েই কাজ হবে। খারাপ পথে যে নামাতে জানে, সে পথে না যাওয়ার মতলবও সে দিতে পারবে।

সেই কথাই বলেছিল ব্যভিচারের দূতীকে। হাজার টাকা বেতন দেওয়া হবে, বেশ্যার বিদ্যা সম্মোহিত না হওয়ার বিদ্যা শিখিয়ে দেওয়া হোক ছেলেকে।

কুটনির নাম যমজিহ্বা। সে তৎক্ষণাৎ নিয়ম করে রোজ শিখিয়ে গেল বালক ঈশ্বরব মাকে কী করে বেশ্যাদের হাতে ধরা না দিতে হয়, অথবা বেশ্যা ধরে ফেললেও কীভাবে ফসকে বেরিয়ে যেতে হয়, সে এক বিশাল বিদ্যা, চৌষট্টি কলাবিদ্যা কোথায় লাগে!

শিখে-টিখে বাপের কাছে ফিরে এসেছিল ছেলে। রীতিমতো পরিপক্ক হয়ে।

ষোল বছর বয়েসে বাপের কাছ থেকে পাঁচকোটি সোনার টাকা নিয়ে বাণিজ্য সফরে বেরিয়ে গেল কিশোর ঈশ্বরবর্মা।

গেল স্বর্ণ দ্বীপে। যাওয়ার পথে ঢুকলো কাঞ্চনপুর শহরের এক সুরম্য কানন সংলগ্ন মন্দিরে। সেখানে দেখল অপরূপা একটি মেয়ে মোহননৃত্য নেচে চলেছে, রূপের আগুন ছিটিয়ে দিচ্ছে নৃত্যের তালে তালে, নাচিয়ে দিচ্ছে রক্ত, পলকে পলকে সঞ্চারিত করে দিচ্ছে আদিম কামনার সর্বনাশা বহ্নি।

মরণ হল কিশোর ঈশ্বরবর্মার। বেশ্যাদের মোহন বিদ্যার কাটান-বিদ্যে শিখে এসেও জবাই হয়ে গেল চকিত চক্ষুর চমকে।

ব্যর্থ হল কুটনির শেখানো সমস্ত বিদ্যে!

শেষ হল নাচনির-নাচ। কিশোর ঈশ্বরবর্মা একজন ইয়ার-বন্ধুকে পাঠিয়ে দিল তার কাছে, প্রেম নিবেদন করতে।

বঁড়শি-গাঁথা ঈশ্বরবর্মার পাণে কটাক্ষ হেনে মদির স্বরে নর্তকী বললে, ধন্য হলাম। চরধুলো কখন পাবো? আজ রাতে?

নিশীথ সমাগমে নর্তকী-আলয়ে গেছিল ঈশ্বরবর্মা। বারাঙ্গনার মা তাকে বিপুল অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। যেন জামাই এল ঘরে। রাত আর একটু গভীর হলে নাচনির শোবার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। হিরেজহরত বসানো, চাঁদোয়া খাটানো পালঙ্কে আরামে বসে নর্তকীর উদ্দাম নগ্ননৃত্য দেখেছিল ঈশ্বরবর্মা। কামনা যখন বাগ মানছে না, তখন তাকে বারোয়ারি দেহ সমর্পণ করেছিল বারবনিতা, উপর্যুপরি বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর রমণে ঈশ্বরবর্মাকে যেন ঈশ্বরের স্বদেশ সুখস্বর্গে নিয়ে গেছিল। রাতভোর হয়ে গেলেও ঈশ্বরবর্মার সুরত-লালসা যায়নি। কাটিয়েছিল আরও একটা দিবস আর রজনী।

দক্ষিণা দিয়েছিল পাঁচ লক্ষ সোনার টাকা।

কিন্তু নিতে চায়নি প্রেমখেলায় পাকা সুন্দরী। বলেছিল, জীবনে অনেক টাকা পেয়েছি। কিন্তু আপনার মতো নিখাদ পুরুষ পাইনি। যে আনন্দ দিয়েছেন, তাতেই ডুবিয়ে রাখুন সারাজীবন।

ছলনা শিল্পে আরও বড়ো শিল্পী তো তার মা। তার নাম মকরকটী। খদ্দের দোহননে পাকা ব্যবসায়ী বলেছিল, আহা! আহা! আজ আমাদের যা কিছু আছে সবই তো আমার এই ছেলের। ছেলের টাকা সেখানেই থাকুক।

শুনে যেন চোখের জল চাপতে চাপতে পাঁচ লাখ সোনার টাকা হাত পেতে নিয়ে মায়ের হাতে তুলে দিয়েছিল বারাঙ্গনা।

মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ ঈশ্বরবর্মা ধরতেই পারল না কী নিপুণ অভিনয় করে যাচ্ছ মা আর মেয়ে। থেকে গেল বারাঙ্গনার বাড়িতে পুরো দুটি মাস। কামিনী কাঞ্চনের হাতে তুলে দিল দু-কোটি কাঞ্চন মুদ্রা!

ঈশ্বরবর্মার সেই ইয়ারবন্ধু আর সহ্য করতে পারল না। তার নাম অর্থদত্ত। একদিন নিরালায় পেয়ে সৎবুদ্ধি দিয়েছিল বন্ধুকে, পালাও! কুটনি যমজিহ্বা তোমাকে যা কিছু শিখিয়েছে, সব ভুলে মেরে দিয়েছ। বেশ্যা কখনও ভালোবাসে? কপট প্রেমে মজে আছো? পালাও, পালাও, বাকি আছে এখনও তিন কোটি সোনার টাকা, তাও যাওয়ার আগে চম্পট দাও।

আত্মবিস্মৃত ঈশ্বরবর্মা বলেছিল প্রিয় সখা অর্থদত্তকে, ভুল! ভুল! প্রকাণ্ড ভুল করছো তুমি। আমি মরীচিকায় মজে নেই, প্রকৃত প্রেমের স্বাদ পেয়েছি। আমাকে চোখের আড়াল করতে পারে না যে সুন্দরী, তাকে ছেড়ে কোত্থাও যাবো না, বলতেও পারবো না। তুমিই বলে দেখো না

প্রকৃত বন্ধুই বিপদে দাঁড়ায়। অর্থদত্ত সেই প্রকৃতির বন্ধু। সটান চলে গেল নাটক-নিপুণা নর্তকীর কাছে।

বললে, এবার বিদায় দেওয়া। হোক ঈশ্বরবর্মাকে। তাকে যেতে হবে সুবর্ণদ্বীপে, বাণিজ্য করতে। অনেক অর্থ রোজগার করে ফের আসবে তোমার কাছে। টাকা তো দরকার!

শুনে ঝরঝর করে কেঁদেই ফেলেছিল নর্তকী। নিপুণ নকল কান্নার জলে বুক ভাসিয়ে দিয়ে বলেছিল, সবই আমার কপাল! মনের মানুষকে পেয়েও হারাচ্ছি।

অমনি অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দিয়েছিল তার মা, বেশ্যাগিরি করে যে চুল পাকিয়েছে, কত ধনীকে নির্ধন করে ছেড়েছে। কপট বেদনায় ম্লান মুখে সান্ত্বনা দিয়েছিল কন্যাকে, কাঁদিসনি। তোর টানে ও আবার ফিরে আসবে।

ব্যস, মুক্তি পেয়ে গেল ঈশ্বরবর্মা। অর্থদত্ত হাঁফ ছেড়ে ভাবল, যাক, বাঁচানো গেল বন্ধুকে।

কিন্তু দুজনের কেউই কল্পনাতেও ভাবতে পারেনি শাঁসালো খদ্দেরকে আটকে রাখার জন্যে অন্য কৌশল নিয়েছে বারাঙ্গনা-জননী।

শহরে বাইরে ছিল একটা কুয়ো। পরিত্যক্ত। কেউ সেখানে যেত না। গভীর রাতে বেশ্যার ধড়িবাজ মা সেখানে গেল। কুয়োর ভেতরে একটা জাল খাটিয়ে রাখল, জলে ডুবিয়ে, ওপর থেকে দেখে যাতে বোঝা না যায়।

সকাল হতেই কাঁদতে কাঁদতে যুবতী বেশ্যা গেল ঈশ্বরবর্মার সঙ্গে, নগরের বাইরে, তারপরেই 'মরণ হোক আমার' বলেই ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুয়োর মধ্যে।

আটকে রইল কিন্তু জলে-ডোবা জালে, নাক তুলে নিশ্বাস নিয়ে গেল স্বচ্ছন্দে।

কিন্তু শোকের বন্যা বইয়ে দিল বারবনিতা, জননী। শুরু হয়ে গেল রোদনের ঐকতান, দাসদাসী সমেত। হায়-হায়-হায় বিলাপে আকাশ যেন চৌচির হয়ে গেল।

ঈশ্বরবর্মা তো থ! তাকে এত ভালোবাসে এই বাজারি বনিতা? বিরহ বেদনা সইতে পারবে না বলে আত্মাহুতি দিল কুয়োর জলে?

চাকরবাকরদের শেখানোই ছিল, নাটকের এই পর্যায়ে কী করতে হবে। তারা হুড়মুড় করে কুয়োয় নেমে গেল দড়ি ঝুলিয়ে। হেঁইও হেঁইও করে তুলে আনল যেন মরা বারবনিতাকে। অনেকক্ষণ পরে অনেকজনের চেষ্টায় যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। অতিকষ্টে চোখের পাতা খুলে গাঢ় নিবিড় স্বরে প্রেমমধুর বাক্য শুনিয়ে গেল ঈশ্বরবর্মাকে।

এরপর কী আর বাণিজ্যে যাওয়া যায়?

অসম্ভব বন্ধু আর বারবনিতা সমেত ফিরে এল মূর্খ ঈশ্বরবর্মা।

বন্ধু অর্থদত্ত কিন্তু নির্বোধ নয়, সে বুঝিয়েছিল ঈশ্বরবর্মাকে, কুটনি তোমাকে যে বেশ্যা-শাস্ত্র শিখিয়েছে, তা বর্ণে বর্ণে সত্যি। কে কবে শুনেছে বাজারি মেয়ে খদ্দেরের প্রেমে পড়েছে? এ সবই তোমাকে পথে বসানোর চক্রান্ত।

কথা কানে তোলেনি ঈশ্বরবর্মা। সে গণিকা প্রেমে অন্ধ। থেকে গেল আরও দুটো মাস। বাকি সোনার টাকাও তুলে দিল বেশ্যার মায়ের হাতে। যখন আর কিছুই দেবার রইল না, গণিকা-জননী তাকে মারতে মারতে দূর করে দিল বাড়ি থেকে।

অর্থদত্ত তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল বাপের কাছে। কিন্তু অধোবদন কিশোর ঈশ্বরবর্মা একটা কথাও বলতে পারল না বাবাকে।

বলল অর্থদত্ত, সমস্ত।

পরের দিনই কুটনি যমজিহ্বার কাছে গেল পিতা রত্নবর্মা। বললে, কী শিক্ষা দিলে আমার ছেলেকে? কুটনি মকরকটী তোমার চাইতেও বড়ো কুটনি। ঈশ্বরবর্মার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে মেরে বের করে দিয়েছে বাড়ি থেকে।

যমজিহ্বা নেচে নেচে বললে, তবে রে! পাঠাও তোমার ছেলেকে আমার পাঠশালায়, এবার শেখাবো বেশ্যা ঠকানোর বিদ্যে, যমজিহ্বাকে পথে বসিয়ে ফিরে আসবে তোমার কাছে।

এল ঈশ্বরবর্মা বেশ্যা-শিক্ষিকার কাছে। সে বললে, আমারই ভুলে তোমাকে চক্রান্তভেদি শিক্ষাটাই শুধু দেওয়া হয়নি। যদি দিতাম, তাহলে বুঝতে, কুয়োর জলে পড়ে গিয়েও একটা মেয়ে বেঁচে থাকে কী করে। এবার শিখে যাও সেই বিদ্যে।

শিক্ষিত বাঁদর টপাটপ হাজার স্বর্ণমুদ্রা চালান করে দিল নিজের পেটে।

বলে, যমজিহ্বা কুটনি ঈশ্বরবর্মার সামনে আনালো তার পোষা বাঁদরকে। তার নাম আল।

আল-য়ের সামনে এক হাজার সোনার টাকা রাখল কুটনি। বললে, গিলে ফ্যাল।

শিক্ষিত বাঁদর টপাটপ হাজার স্বর্ণমুদ্রা চালান করে দিল নিজের পেটে। পেট ফুলে জয়ঢাক, সে কিন্তু নির্বিকার।

যমজিহ্বা এবার দফায় দফায় সোনার টাকা উগড়ে দেওয়ার হুকুম দিয়ে গেল বাঁদরকে। কাউকে পঁচিশ, কাউকে পঞ্চাশ, কাউকে একশো।

গুণে গুনে টপাটপ তাই করে গেল তালিম দেওয়া বাঁদর। যাকে যতগুলো স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার হুকুম দিচ্ছে কুটনি, ঠিক ততগুলো একটার পর একটা উগড়ে দিয়ে থেমে যাচ্ছে শিক্ষিত মর্কট।

ঈশ্বরবর্মাকে বললে কুটনি, দেখলে? এবার যাও সেই ছেনালি বারবনিতার বাড়ি, এই বাঁদরকে সঙ্গে নিয়ে। আগে থেকে মেয়েটাকে লুকিয়ে কিছু সোনার টাকা খাইয়ে দেবে, মেয়েটার সামনে দরকার মতো মোহর বের করে খরচ করে যাবে। সেই মেয়ে তখন লোভে পড়ে নিজের সবকিছু তোমাকে দিয়ে বিনিময়ে এই বাঁদরকে চাইবে।

তুমি দেবে। দিয়েই, তার সর্বস্ব নিয়ে, পালিয়ে যাবে।

বাঁদর সঙ্গে নিল ঈশ্বরবর্মা, বাবা রত্নবর্মা দিল আবার দু-কোটি সোনার টাকা। বন্ধু অর্থদত্তকে সঙ্গে নিয়ে গেল সেই ছলনাময়ীর বাড়িতে। সঙ্গে এত মোহর দেখে প্রেম উথলে উঠল সুন্দরীর। ঈশ্বরবর্মা এবার দু-কোটি স্বর্ণমুদ্রাই তার হাতে দিয়ে অর্থদত্তকে বললে বাঁদরটাকে সামনে আনতে।

কুটনি যমজিহ্বার নির্দেশ মতো অর্থদত্ত তাকে আগে থেকেই বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা গিলিয়ে রেখেছিল।

সামনে আনতেই হুকুম দিয়েছিল ঈশ্বরবর্মা আজ আমার খানাপিনার জন্যে দরকার তিনশো সোনার টাকা, পান-তামাক-মদের জন্যে একশো সোনার টাকা, মা মকরটির হাতখরচ বাবদ একশো সোনার টাকা, ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্যে একশো মোহর বের করো।

আল মর্কট হড়াৎ হড়াৎ করে উগড়ে দিল গুনে গুনে দফায় দফায় সুবর্ণ মুদ্রা। চার দফায় চারশো।

চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল বারাঙ্গনা আর তার জননরী।

তাজ্জব ব্যাপার তো! এ যে মোহরময় মর্কট! সাধারণ মর্কট নয়, ছদ্মবেশি দেবতা নিশ্চয়, কুবেরের চেলা, অথবা, কুবের স্বয়ং!

আড়ালে গিয়ে মায়ে-ঝিয়ে পরামর্শ করে নিয়ে ন্যাকামি শুরু করল ঈশ্বরবর্মার সামনে এসে।

ইনিয়ে-বিনিয়ে ছলনাময়ী বললে, ওগো আমার জীবন দেবতা, কুগ্রহের কোপে পড়ে পৈশাচিক নিগ্রহ চালিয়ে ছিলাম তোমার ওপর।

তুমি মানুষ নও, দেবতা। ক্ষমা করো আমাকে।

দুই চোখে বরাভয় ফুটিয়ে তুলে নিমেষে ক্ষমার অবতার হয়ে গেল ঘা-খাওয়া ঈশ্বরবর্মা। হাজার হোক, সে বংশপরম্পরায় সওদাগর, কখনও ঠকে, কখনও জেতে। প্রতারণা থেকেই আসল শিক্ষা লাভ করে। ঠকতে ঠকতে ঠগবাজ দেখলেই চিনে ফেলে। তাই রূপের আগুনে নিয়ে এবার খেলতে বসল, নিজে আর পুড়ল না।

মূর্তিমান দয়া হয়ে গিয়ে বললে ঈশ্বরবর্মা, সবই তো তোমার, আমি তোমার, আমার যা কিছু, সব তোমার!

অমনি বলে বসল বিসুন্দরী বারাঙ্গনা, তাহলে দাও অদ্ভুতকর্মা এই বাঁদরটাকে। আহা, আহা, কী ভেলকিই দেখিয়ে গেল!

অমনি যেন মুখ চুন হয়ে গেল ঈশ্বরবর্মার। চুপসে গিয়ে বললে, হে মোর প্রিয়া, তা তো হবে না। আমার বাবার নয়নের মণি যে এই বাঁদর। বাবার যত কুবেরের বিষয়-আশয়, সব কিছুর মূলে এই বাঁদর। বাবার সর্বস্ব এই বাঁদর, একে তো দেওয়া যাবে না।

নাছোড়বান্দা বেশ্যাতনয়া বললে, পাঁচ কোটি সোনার টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছি। বিনিময়ে চাই এই বাঁদর।

শুনে যেন দোটানায় পড়ে গেল ঈশ্বরবর্মা। অসাধারণ অভিনয় করে গেল অভিনয় পটিয়সীর সামনে।

তারপর ঘাড় নেড়ে নেড়ে বললে, তা হয় না। পাঁচ কোটি মোহর কেন, তোমার সমস্ত কিছুর বিনিময়েও এ বাঁদর দিতে পারবো না।

ঈশ্বরবর্মার পায়ে আছড়ে পড়ল অপরূপা, নাও আমার সব কিছু দাও শুধু এই মর্কটকে। আমি তোমার সেবাদাসী হয়ে থাকব সারা জীবন।

দেখেশুনে যেন সুপরামর্শ দিচ্ছে, এই রকম ভাবগম্ভীর স্বরে বললে প্রিয় বন্ধু অর্থদত্ত, ঈশ্বরবর্মা, প্রিয়ার প্রীতি বর্ধনের জন্য ত্রিভুবনও উপহার দেওয়ার যায়, এমনকি নিজের জীবনও। সামান্য একটা বাঁদর দিতে এত দ্বিধা? ছিঃ দাও, এখুনি দাও, পরিণাম যা হবার হবে।

বাঁদর দিতে রাজি হয়ে গেল ঈশ্বরবর্মা। নিমরাজি নয়, সানন্দে। সহর্ষে উপভোগ করে গেল অপরূপাকে সমস্ত রাত। বিনা দক্ষিণায়। পরের দিন সকালে পাক্কা প্রবঞ্চক সম্রাটের মতোই আগে নিল বহুবল্লভার সবকিছু, বাড়ি থেকে ধনরত্ন কিছু বাদ দিল না। তারপর আল মর্কটকে গছিয়ে দিল রূপসী রূপাজীবার হাতে। তৎক্ষণাৎ রওনা হল সোজা সুবর্ণদ্বীপ অভিমুখে।

বাঁদরের পেটে ঢোকানো ছিল দু-হাজার সোনার টাকা। দু-দিনেই তা উগড়ে দিল। খালি হয়ে গেল পেট।

আহ্লাদে আটখানা হয়ে রূপানর্তকী তৃতীয় দিবসে হুকুমের পর হুকুম ঝেড়ে গেছিল মর্কটের ওপর। সে শুধু দাঁত খিঁচিয়েই গেছে, একখানা মোহরও বের করতে পারেনি। রেগেমেগে তাকে তুলে আছাড় মেরেছিল রেগে লাল রূপসী।

বাঁদর তখন বাঁদরের কাজ করেছিল। কামড়ে আঁচড়ে ফালা ফালা করে দিয়েছিল মেরে আর মায়ের মুখ।

অগত্যা লাঠি দিয়ে পেটানো ছাড়া আর উপায় ছিল না। তাইতেই গতায়ু হল বেচারা বাঁদর।

হাসি আর টিটকিরির বন্যা বয়ে গেল শহরময়। শঠের সঙ্গে উচিত শঠতা করে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে গেছে বুদ্ধিমান বণিকপুত্র।

আর সহ্য করতে পারেনি মেয়ে আর মা। দুজনেই যে তখন পথের ভিখিরি।

অগত্যা আত্মহত্যা করতে হয়েছিল দুজনকেই।

ঈশ্বরবর্মা তখন কোথায়?

সুবর্ণ দ্বীপে। প্রচুর অর্থ উপার্জন করে যথাসময়ে ফিরে গেল বাবার কাছে। বিয়ে করল যথাসময়ে।

বহুবল্লভার বিচিত্র ছলনা তাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে গেছিল। ঘরের বউয়ের চাইতে আপনজন হতে পারে না বহুবল্লভা। সেখানে সব দিয়েও সব পাওয়া যায়... আরও বেশি পাওয়া যায়.... কিছুই হারিয়ে যায় না।

কাহিনি শুনে সার কথাটা মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েছিল যুবরাজ নরবাহনদত্ত

৫৮. কুমুদিকা কাহিনি

বারবনিতাদের অন্তর যে কখনোই নির্মল নয়, তা গল্পের মধ্যে দিয়ে শুনিয়ে দিয়েছিল মরুভূতি। তাদের মন আর মুখ কখনোই এক নয়, ভেতরের ইচ্ছে ভেতরেই থাকে, বাইরে দেখায় অন্য ইচ্ছে।

শুনে, বন্ধু গোমুখ শুনিয়ে দিয়েছিল আর এক বেশ্যার কাহিনি। সার কথা একই, বারবনিতাদের অন্তর অতিশয় অসৎ, সেখানে গুপ্ত থাকে অন্য আকাঙ্ক্ষা, বাইরে দেখায় সতীপণা, খদ্দের যখন শাঁসালো হয়, যখন কার্যসিদ্ধির উপায় হয়।

যেমন ছিল কুমুদিকা।

বিক্রমসিংহ ছিলেন প্রতিষ্ঠান নামক দেশের রাজা। খুবই শক্তিমান পুরুষ। তাঁর স্ত্রী ছিলেন শশিলেখা। প্রকৃতই সতী।

রাজত্ব থাকলেই শত্রুতা বাড়ে। বিশেষ করে যে রাজ্যের শ্রী আর সমৃদ্ধি আছে। ঈর্ষায় ফেটে পড়ে পরশ্রীকাতর প্রতিবেশী রাজারা।

এই রকম পঞ্চাশজন রাজা একজোট হয়ে আক্রমণ করেছিল বিক্রমসিংহের রাজ্যকে।

মন্ত্রী বলেছিলেন, সন্ধি করে নিতে। শত্রপক্ষ বড়ো প্রবল।

কর্ণপাত করেননি বিক্রমসিংহ। যুদ্ধে গেছিলেন। তাঁর সৈন্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিপাত হয়েছিল মারের চোটে।

মন্ত্রীর পরামর্শে হাতির পিঠ থেকে নেমে ঘোড়ায় চেপে অন্য রাজ্যে পালিয়েছিলেন বিক্রমসিংহ, বেঁচে থাকা দরকার, বদলা নেওয়ার জন্যে।

গেলেন উজ্জয়িনীতে উঠলেন সেরা বেশ্যার বাড়িতে। তার নাম কুমুদিকা। আত্মগোপনের শ্রেষ্ঠ উপায় সর্বকালে সর্বদেশে একই। বেশ্যাবাড়ি।

এই বেশ্যা কিন্তু সাধারণ বেশ্যা নয়। দেদার টাকাপয়সা তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে একশো হাতি, বিশ হাজার ঘোড়া, আর হিরেজহরতে ঠাসা একটা ঘর। এক কথায়—সশস্ত্র আর ধনবতী।

বেশ্যার এত সৈন্যবাহিনী কেন? এ প্রশ্ন জাগেনি বিক্রমসিংহের মনে। কারণটা চমকপ্রদ। জেনেছিলেন পরে।

কমুদিকা যেন বর্তে গেছিল শক্তিমান বিক্রমসিংহকে হাতে পেয়ে। কেন, সে কারণও জানা যাবে পরে।

মন্ত্রীও চম্পট দিয়েছিল রাজার সঙ্গে। উঠেছিল কমুদিকার বাড়িতেই। একজন বেশ্যার এত আদিখ্যেতা দেখে সন্দেহও হয়েছিল। বলেছিল রাজাকে, আশ্চর্য ব্যাপার! বেশ্যা জাতটাই হচ্ছে লুঠের জাত। খদ্দেরকে দুয়ে নেয়। অন্তরে সদিচ্ছা থাকে না। তা সত্ত্বেও এই কুমুদিকা আপনাকে মাথায় তুলে রাখছে কেন? মতলবটা কী?

রাজা তখন ছলনাময়ীর ছলনায় একেবারেই মজেছেন। এক দাবড়ানি দিলেন মন্ত্রীকে। বললেন, সব বেশ্যাই কী কুলটা হয়? বিশেষ কাউকে ভালোবাসতে পারে না? ভালোবাসার সেই মানুষটার জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে না? তোমার যাতে প্রত্যয় হয়, সেই ব্যবস্থা করছি।

অসুখের ভান করে শুয়ে রইলেন রাজা। দিনে দিনে শুকিয়ে গেলেন। তারপর নিষ্প্রাণ মড়ার মতো পড়ে রইলেন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল শ্মশানে, দাহ করার জন্যে।

কুমুদিকা উঠে বসল একই চিতায়—সহমরণের জন্যে। আগুন লাগানো হল চিতার কাঠে।

এইবার উঠে বসলেন রাজা। নিজের চোখে দেখলেন, অবিশ্বাসী মন্ত্রীকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন, কুমুদিকা তাকে কত ভালোবাসে। নইলে জীবন্ত পুরে সতী হতে চায়? ফিরে এলেন বেশ্যার বাড়িতে কুমুদিকাকে নিয়ে।

নিরালায় বললেন মন্ত্রীকে, দেখলে তো?

মন্ত্রী বললে, দেখলাম বটে। তবে স্বেচ্ছায় সতী হতে চাওয়ার পেছনে নিশ্চয় অন্য কারণ আছে।

ঠিক এই সময়ে হন্তদন্ত হয়ে এল রাজার গুপ্তচর। খুঁজে খুঁজে সে বের করেছে রাজার গুপ্তনিবাস। গুপ্তচররা সব পারে।

এনেছে খুবই খারাপ খবর। রাজার শত্রুরা রাজাকে হাতে না পেয়ে রাজধানী আক্রমণ করেছিল, রানিকে ভোগ করবার জন্যে, পালা করে। এক রানি, পঞ্চাশ স্বামী!

রানি শশিলেখা জহরব্রত করে আগুনে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন।

কুমুদিকা খবর শুনে চোখ কপালে তুলে বললে, সে কী! রাজা, আপনি আগে বলেননি কেন? যান, এখুনি যান, সৈন্যসামন্ত বাহন-টাহন নিয়ে শত্রুনিপাত করুন।

তাই করেছিলেন রাজা, নিজের ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের জড়ো করে, বেশ্যার সৈন্যদের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে মার-মার করে তেড়ে গিয়ে উদ্ধার করেছিলেন নিজের রাজ্য, পঞ্চাশ শত্রু রাজাকে হটিয়ে দিয়ে।

তারপর বললেন কুমুদিকাকে তোমার বুদ্ধি আর শক্তির জোরে রাজ্য ফিরে পেলাম। বিনিময়ে কী চাও, বলো।

কুমুদিকা বিনা ভূমিকায় বললে, একটা কাঁটা তুলে দিন, বুকে বিঁধে আছে।

রাজা অবাক!

বুঝিয়ে বলেছিল কুমুদিকা, আমি যাকে ভালোবাসি, সেই মানুষটাকে কারাগারে আটকে রেখেছেন এই উজ্জয়িনীর রাজা। তাকে মুক্ত করে দিন। আপনাকে দেখেই বুঝেছিলাম, এ কাজ আপনিই পারবেন। তাই আপনাকে মাথায় তুলে রেখেছিলাম, আপনি মারা গেলেন দেখে ইচ্ছাপূরণ হবে না জেনে চিতায় উঠে মরতে গেছিলাম। এত সৈন্যসামন্ত পুষছি সেই কারণেই।

অবাক রাজা বলেছিলেন, বেশ, বেশ, তোমার মনস্কামনা আমি পূরণ করবো।

তারপর ভেবেছিলেন, মন্ত্রী তাহলে খাঁটি কথাই বলেছিল। বেশ্যারা উদ্দেশ্য ছাড়া কাজ করে না।

যাই হোক, উজ্জয়িনীর রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে কারাগার থেকে কুমুদিকার মনের মানুষকে উদ্ধার করে কুমুদিকার পাশে তাকে বসিয়ে গেছিলেন রাজা বিক্রমসিংহ।

কাহিনি শেষ, করে গোমুখ বলেছিল, তাই বলছিলাম, বেশ্যারা কখনও উদ্দেশ্য বিনা সদ্ভাব দেখায় না, সতী সাজে না।

তারা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলে।

হেসে বলেছিল যুবরাজ, তোমার কাহিনি থেকে জানা গেল আর একটা সত্যি, বেশ্যারাও বিশেষ কাউকে ভালোবেসে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে।

গোমুখকে টেক্কা দেওয়ার জন্যে যুবরাজের আর এক বন্ধু তপন্তক বললে, তাহলে আমি একটা কাহিনি শোনাই।

অস্থিরমতি মেয়েদের পদস্খলন ঘটলেও কখনও সখনও দেখা যায়, মনের সংগোপনে অম্লান হয়ে রয়েছে সতীত্বের বীজ। নারী-মন বড়োই দুর্জ্ঞেয়।

এই শহরেই থাকত বলবর্মা বণিক। বউয়ের নাম চন্দ্রশ্রী, বড়ো চপলা, চঞ্চলা। জানলায় দাঁড়িয়ে একদিন সে দেখলে, নীচ দিয়ে যাচ্ছে ভারি সুন্দর এক তরুণী। নাম তার শূলকর। সে-ও এক বণিকের ছেলে। চরিত্রহীন। নীচে দাঁড়িয়ে চোখের ইসারা করে যাছিল চন্দ্রশ্রী-কে।

সুন্দরীদের উত্যক্ত করা যুগে যুগে ঘঠে। কিন্তু সব সুন্দরী ফাঁদে পায় দেয় না। চন্দ্রশ্রী দিয়ে ফেলেছিল। কামনা নিবারণ করেছিল রাস্তার সেই বণিকপুত্রকে দাসীকে দিয়ে ঘরে ডেকে এনে। একদিন নয়, রোজ। উপপতি রমণের উগ্র স্বাদ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেনি। রতিপতির রহস্য বোঝে কে?

চন্দ্রশ্রীর স্বামী দুশ্চরিত্রা স্ত্রী-কে কিছু বলতে না—সব জেনেও। প্রেম মানুষকে এইভাবেই অন্ধ করে দেয়। প্রেমের বাণ মেরে রতি লোভিনীরা অবৈধ সঙ্গম চালিয়ে যায়। স্বামীর বন্ধুরা পর্যন্ত জেনে গেছিল চন্দ্রশ্রীর ব্যভিচারিতা, কিন্তু স্বয়ং স্বামী যখন নির্বিকার, তারা কেন কথা বাড়াবে?

কিন্তু ভেতরে ভেতরে পুড়ে নিশ্চয় খাক হয়ে যাচ্ছিল চন্দ্রশীর স্বামী। তাই আক্রান্ত হল মারণ জ্বরে। গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। মৃত্যু আসন্ন দেখে চম্পট দিয়েছিল পরস্ত্রী লোভী সেই উচ্ছৃঙ্খল বণিক-তনয়।

মারা গেল চন্দ্রশ্রীর স্বামী, অসীম সহ্য-আগুনে পুড়ে। সহমরণে গেল পাপিষ্ঠা চন্দ্রশ্রী, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়।

তাই তো বলি, নারী-হৃদয় এক অতল জলাশয়, রহস্যময়, কী ইচ্ছে কী খেলা খেলছে সেখানে, কে জানে?

তপন্তকের ছোট্ট গল্প শেষ হতেই মুখ চুলবুল করে উঠেছিল আর এক বন্ধুর। তার নাম হরিশিখ। গল্পের গুরু। সে বললেই তাহলে শোনাই দেবদাসের কাহিনি।

দেবদাস গ্রামের মানুষ। ছাপোষা গেরস্ত। তার বউ নামেও দুঃশীলা, চরিত্রেও তাই। পরপুরুষ গমন ছিল তার প্রিয় ব্যসন। গাঁয়ের সবাই জানতো।

একদিন কাজ নিয়ে রাজার বাড়ি গেছিল দেবদাস। দুঃশীলা তার উপপতিকে এনে লুকিয়ে রাখল মাচায়। স্বামী বাড়ি ফিরলেই তাকে দিয়ে পতি-হত্যা করানোর জন্যে।

বাড়ি ফিরে, খেয়েদেয়ে দেবদাস ঘুমিয়ে পড়তেই রাত্রি নিশীথে মাচা থেকে নেমে এল দ্বিচারিণীর লালসা মেটানোর পুরুষ, খুন করল দেবদাসকে, চম্পট দিল বাড়ি থেকে।

রাতভোর হতেই বাইরে বেরিয়ে মড়াকান্না শুরু করে দিয়েছিল দুঃশীলা। গভীর রাতে স্বামী-স্ত্রী যখন অকাতরে ঘুমোচ্ছে, তখন নাকি ডাকাত এসে মেরে রেখে গেছে দেবদাসকে।

ভিড় জমে গেল তক্ষুণি। করুণ চোখে সব কিছু দেখে নিয়ে তারা বললে, তাজ্জব ব্যাপার! ডাকাত কিছু না নিয়েই শুধুশুধু মেরে রেখে গেল দেবদাসকে!

নাকিকান্না কেঁদে দুঃশীলা বলেছিল, তাই তো! তাই তো! এ কী রকম ডাকাত!

সন্দেহ হয়েছিল গ্রামের লোকেদের। জিজ্ঞেস করেছিল দেবদাসের বালক পুত্রকে, সে কিছু জানে কিনা।

সরলমতি ছেলে বলেছিল তৎক্ষণাৎ, একটা লোক দিনের বেলায় এসে মাচায় উঠে বসেছিল। মা আমাকে বলেছিল, বাবাকে কিছু বলিসনি। সেই লোকটাই বাবাকে মেরে পালিয়ে যাবার পর মা আমাকে পাশের ঘর থেকে এনে দেখিয়েছিল বাবা রক্তগঙ্গায় ভাসছে।

খুনিকে তখন সাজা দিয়েছিল গ্রামবাসীরাই, তাকে খুঁজেপেতে ধরে এনে, দুঃশীলাকে দূর করে দিয়েছিল গ্রাম থেকে।

কাহিনি শেষ করে উপসংহার টেনেছিল হরিশিখ এইভাবে, পরপুরুষ যে রমণীর কাছে পতির চেয়ে প্রিয়, সে রমণী মানবীরূপে ভুজঙ্গিনী। ছোবল মেরে বসে নিজের স্বামীকেই। কালসাপের যা স্বভাব।

গোমুখ আর একখানা গল্প পেশ করবার জন্যে উন্মুখ হয়েছিল। হরিশিখ থামতে না থামতেই বললে, যুবরাজ, স্ত্রীচরিত্র যে কতখানি নীচ হতে পারে, তা জানবার জন্যে বেশিদূর যেতে হবে না, এই রাজবাড়িতেই অতীব রোমাঞ্চকর সেই ঘটনা আছে। হাসির ব্যাপারও বটে। বজ্রসারকে তো চেনেন? রাজা উদয়নের খাস চাকর। তার প্রাণপ্রিয় বউ ছিল মালব দেশের মেয়ে। একদিন বউকে নিয়ে গেল শ্বশুরবাড়ি। বউ রইল বাপের বাড়ি, নিজে ফিরে এল রাজসেবা করতে। গেল কয়েকটা দিন। তারপর বজ্রসারের এক বন্ধু এসে একটা খবর দিল। সেই বন্ধুর নাম ক্রোধন।

বললে, ওহে বজ্রসার, বউকে বাপের বাড়িতে রেখে আসাটা ভালো কাজ করোনি। সে সেখানে লটকে গেছে মনের মানুষের সঙ্গে। জোর পিরিত চলছে, নিত্য দেহসেবা চলছে। অহো! অহো! নারী যখন নরকে যায়, তখন তার শরীরের অলিগলির মধ্যে দিয়েই যায়। বন্ধু বজ্রসার, তুমি আবার বিয়ে করো। ভ্রষ্টা স্ত্রী-কে ত্যাগ করো। সে এখন এঁটো।

স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল বজ্রসার। খবরটা দিয়েই তো সরে পড়েছে ক্রোধন, সুতরাং ভাবতে হচ্ছে তাকে একাই। ভেবে দেখল, ক্রোধন খাঁটি খবরই এনেছে। উপপতি নিয়ে নিত্য রাসলীলা চলছে বলেই নষ্ট বউ আসতে চায়নি, লোক পাঠিয়েছিলাম, তাকে হাঁকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কানে শুনে বিশ্বাস করা সমীচীন নয়। বউ বলে কথা, শোনা কথায় কি তাকে ত্যাগ করা যায়? যাই, নিজে গিয়ে দেখে আসি।

সুতরাং কোমর বেঁধে নিজেই মালব-এর শ্বশুরবাড়িতে চলে গেল বজ্রসার। বউ বিহনে তার রাত কাটছে না বুঝে শ্বশুর মেয়েকে পাঠিয়ে দিল জামাইয়ের সঙ্গে। পথে পড়ল একটা গভীর জঙ্গল।

এইভার শুরু হল এক আশ্চর্য প্রহসন। বজ্রসার বউকে বসাল একটা গাছের তলায়। বললে, লোক পাঠিয়ে ছিলাম, তুমি আসোনি। তারপর শুনলাম তুমি শরীরের জালা জুড়োচ্ছো পরপুরুষ দিয়ে। কথাটা সত্যি কিনা বলো, নইলে তোমাকে পিটিয়ে তক্তা বানাবো।

নাকের পাটা ফুলিয়ে ভ্রষ্টা বউ বললে, তাই নাকি? উড়ো খবরে এত বিশ্বাস? যা খুশি করতে পারো।

এত তাচ্ছিল্য! বজ্রসারের মাথায় খুন চেপে গেল। গাছের লতা কেটে এনে বউকে কষে বাঁধলো গুঁড়ির গায়ে। তার আগে উলঙ্গ করে দিয়েছিল। এখন ন্যাংটো বউকে কয়েক ঘা পিটিয়েই তার বাসি কাম উদগ্র করে উঠল। উলঙ্গ অবস্থাতেই, গাছে বাঁধা অবস্থাতেই বউয়ের সঙ্গে সঙ্গম করতে গেল। এও এক ধরনের রতি-বিলাস, ধর্ষণ। বউকে একটু মারধর না করলে শিশ্ন লোলুপ হয় না।

ধুরন্ধর বউ বললে, আরে আরে করছো কী! আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে কি আদর করা যায়? আমার সারা শরীর এখন তোমাকে চাইছে। চুমু খাও। দলাইমলাই করো, নিংড়ে নাও। কিন্তু দড়িতে বাঁধা থাকলে সে সুখ পাচ্ছি না।

তাই তো বটে। রমণ-পাগল বোকা বজ্রসার তখন দড়ি খুলে দিয়ে বউকে দলাইমলাই আরম্ভ করে দিয়েছিল নির্জন বনে।

একটু পরেই কামজড়িত স্বরে বউ বলেছিল, আঃ! কি আরাম! কি আরাম! এতদিন পরে সত্যি আরাম পেলাম! সত্যি, তোমার মতো পুরুষ হয় না। হ্যাঁ গো, চরমানন্দ পাবো যদি তোমাকে এবার গাছে বেঁধে রমণ করি। সে ভারি মজা হবে।

গর্দভ বজ্রসার নিজেই তখন রেতঃপাতের পূর্ব অবস্থায় এসেছে। গাছে বন্ধনাবস্থায় স্ত্রী সঙ্গমের বৈচিত্র্য কল্পনা করে নিয়ে জড়িত স্বরে বলেছিল, তাই করো। বাঁধো আমাকে। তারপর করো রমণ, পরমানন্দে।

চতুরা বউ তখন বজ্রসারের হাত আর পা গুড়িতে বেঁধে কেড়ে নিয়েছিল কোমরের ছোরা, উপর্যুপরি রমণ করে নিয়ে আগে নিজের শরীরকে শান্ত করেছিল, কেননা, মার খেয়ে তার রমণেচ্ছা বৃদ্ধি পেয়েছিল বহুগুণ।

তারপর, বজ্রসারের ছোরা দিয়েই তার শিশ্ন, নাক আর কান কেটে দিয়ে, বজ্রসারের পোশাক নিজে পরে পুরুষ সেজে পালিয়ে গেছিল আগের পরপুরুষের কাছে।

বজ্রসারের কপাল ভালো। একজন কবিরাজ ঠিক সেই সময়ে বনে এসেছিলেন স্বহস্তে ওষধি সংগ্রহ করতে। রক্তাপ্লুত বজ্রসারের বাঁধন খুলে তাকে নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে। সেবা করে প্রাণে বাঁচালেন, একটু চাঙা করলেন। তারপর তাকে ফিরিয়ে দিলেন রাজবাড়িতে। ভ্রষ্টা বউয়ের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। মূর্খ বজ্রসার রয়েছে এই রাজবাড়িতেই। শিশ্নহীন বলে মৈথুন সঙ্গিনী আর পায় না।

মরুভূতির মুখ চুলবুল করে উঠেছিল গোমুখ-এর গল্প শেষ হতেই।

বলেছিল, পারদ-এর মতোই মেয়েদের মন চঞ্চল। মুঠোর মধ্যে ধরেও ধরে রাখা যায় না। প্রমাণ স্বরূপ নিবেদন করছি আমার একটা গল্প।

সিংহবল ছিলেন দক্ষিণ দেশের রাজা। মালব রাজার মেয়ে ছিল তাঁর বউ। তার নাম কল্যাণবতী। রাজার চোখের মণি ছিল এই কল্যাণবতী।

অকস্মাৎ শক্তিশালী শত্রুর আক্রমণে একদা রাজত্ব হারালেন সিংহবল। সাধারণ এক বস্ত্রে শুধু একখানা হাতিয়ার সম্বল করে বউকে নিয়ে পালালেন শ্বশুরবাড়ির দিকে।

বনের মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছেন, তেড়ে এসেছিল একটা সিংহ। সিংহবল তরবারির তিন কোপে অতি সহজে তাকে তিন টুকরো করে দিলেন। একটু পরেই এক পাগলা হাতির পাগলামিও ছুটিয়ে দিলেন তাকে প্রাণে মেরে। তারপরেই তেড়ে এল একদল বনের ডাকাত। সুদর্শন চক্রের মতো তরবারি চালনা করে তাদেরকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিলেন, একা।

পৌঁছলেন শ্বশুরবাড়িতে। বাড়িতে ঢোকবার আগে বউকে বললেন, রাস্তায় যা-যা ঘটেছে, তা চেপে যাবে, কাউকে বলবে না।

এই শিক্ষা দিয়ে সস্ত্রীক ঢুকলেন বাড়ির মধ্যে। আচমকা তাঁকে এই অবস্থায় দেখে শ্বশুর তো অবাক। তারপর সব শুনে নিজের সৈন্যবাহিনী দিলেন জামাইকে। রাজত্ব উদ্ধারে রওনা হলেন সিংহবল।

এরপরেই চঞ্চল হল কামিনী মন। একদিন জানলায় দাঁড়িয়ে কল্যাণবতী দেখল এক পরম পুরুষকে। সুপুরুষও বটে। কামজ্বালায় জ্বলে গেল তৎক্ষণাৎ। দাসীর সঙ্গে পরামর্শ করে দড়ি ঝুলিয়ে দিল জানলা দিয়ে। রাস্তারসেই লোকটা উঠে এল দড়ি বেয়ে। কিন্তু সসঙ্কোচে বসল তফাতে—রানির সঙ্গে পালঙ্ক বিহারে যেতে যেন ভয় পাচ্ছে।

খটকা লেগেছিল কল্যাণবতীর। তাগড়াই জোয়ান সম্ভ্রান্ত রমণী দেখে যখন কাছে আসতেও ভয় পাচ্ছে, তখন নিশ্চয় নীচ বংশের পুরুষ। এর সঙ্গে সহবাস কি সুখপ্রদ হবে? শরীরে শরীর মেলোনো কি সমীচীন?

ঠিক এই সময়ে ঘরে ঢুকেছিল একটা সাপ। লম্ফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে তির ছুঁড়ে সাপের ফণা কেটে দিয়ে বিজয়দর্পে ঘরময় নৃত্য শুরু করেছিল সেই পথচারী।

এইবার রেগেছিল কল্যাণবতী। সামন্য একটা সাপ মেরে এত উল্লম্ফন? ছিঃ ছিঃ! এই পুরুষ আমার খিদে কী করে মেটাবে?

দাসীকে ডেকেছিল। তাকে দিয়ে লোকটাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল, দড়ি বেয়ে উঠেছে, দড়ি বেয়ে নেমে যাক।

তারপর বলেছিল দাসীকে, আমার স্বামী ডাকাত তাড়িয়ে, সিংহ আর হাতি মেরেও কাউকে তা জানাতে চায় না, এত বীরপুরুষ। আর এই লোকটা ক্ষীণ বীরত্ব নিয়ে একটা সাপ মেরে নেচে নেচে পৌরুষ দেখাচ্ছে আমাকে? আমার শরীরের দাবানল এ মেটাবে? অসম্ভব। পারে শুধু আমার মহাবল স্বামী। ধিক্কার জানাই নিজেকেও, যে কিনা সামান্য মাছির মতো কর্পূর ছেড়ে পুরীষ-এর দিকে ধেয়ে গেছিল। বিষ্ঠালোভী নারী, ধিক তোমাকে!

রাজা সিংহবল যথাসময়ে শত্রুনিপাত করে, হারানো রাজ্য উদ্ধার করে ফিরে এসে রানির কামানল নিভিয়ে দিয়েছিল উপর্যুপরি দেহমিলন ঘটিয়ে, রাজার মতো।

কাহিনি শেষ করে সমাপ্তি টেনে বলেছিল মরুভূতি, মেয়েছেলে জাতটাই এইরকম। মাঝে মাঝে বিবেকবুদ্ধি ঘুলিয়ে যায়। আবার জেগে ওঠে, বিবেক যাদের সদা উন্নত থাকতে চায়, এরকম নারী এই পৃথিবীতে খুব কমই আছে। তাই, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাশ টেনে থাকা দরকার, হুশিয়ার থাকা দরকার, কাছে কাছে রাখা দরকার; তাদের অষ্টগুণ অধিক রমণ তৃষ্ণা অষ্টবিধ উপায়ে মিটিয়ে যাওয়া দরকার।

৫৯.

পরের দিন অতি প্রত্যুষে বাগানে বেড়াতে গেছিল যুবরাজ নরবাহনদত্ত, বন্ধুদের নিয়ে। দেখল এক অদ্ভুত ব্যাপার। আকাশ থেকে দলে দলে নেমে আসছে পরমাসুন্দরী বিদ্যাধরীরা।

সুন্দরী দেখলেই সব পুরুষেরই চোখ গোল গোল হয়ে যায়। আর যদি সুন্দরীদের হাট বসে যায়, তাহলে পুরুষদের অবস্থা একটু কাহিল হয় বইকি?

সুতরাং যুবরাজ নরবাহনদত্তের দোষ দেওয়া যায় না। আচমকা পালে পালে মেলাই মেয়েদের দেখে সে যতটা চমক খেয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি স্তম্ভিত হয়েছিল সেরা সুন্দরী মেয়েটিকে দেখে।

আরও থ হয়ে গেছিল সেই মেয়েটির চোরা চাহনি দেখে। দেখছে নরবাহনদত্তকে, সলাজ চাহনি নিক্ষেপ করেই যাচ্ছে, আশ যেন মিটছে না। সে চাহনিতে রয়েছে সুগভীর প্রেম।

সপ্রতিভ যুবক নরবাহনদত্ত তখন সটান এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল সেই অপরূপাকে, কে তুমি? কেন এসেছ এখানে? অমন করে লুকিয়ে লুকিয়ে বার বার কেন দেখছ আমাকে?

সুন্দরী তখন বলে গেল তার কাহিনি।

আমি হিমালয়ের মেয়ে। আমার বাবার নাম স্ফটিক যশা, মায়ের নাম হেমপ্রভা। আমার নাম শক্তিযশা। আমরা বিদ্যাধর। আমাদের বাড়ি সোনা দিয়ে তৈরি। বাড়ির নাম কাঞ্চনশৃঙ্গ।

আমি গৌরীপুজো করি। তিনিই আমাকে বর দিয়েছেন, যুবরাজ নরবাহনদত্ত হবেন আমার স্বামী। আকাশেও তাঁর সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়বে। গতরাতে দেবী গৌরী আমাকে দেখা দিয়ে বললেন, যাও, যুবরাজের সঙ্গে আলাপ করে, এসো। সে কাল সকালে বাগানে আসবে। তোমার সঙ্গে তার বিয়ে হবে ঠিক এক মাসের মধ্যে।

তাই আমি আজ ভোরেই এসেছি হিমাচল থেকে। দেখলাম আমার ভাবী বরকে। এখন চললাম।

বলেই, এক ঝাঁক প্রজাপতির মতো সুন্দরী সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে আকাশে উড়ে হাসতে হাসতে মিলিয়ে গেল শক্তিযশা।

কাহিল করে দিয়ে গেল নরবাহনদত্তের অবস্থা। মদনশর বড়ো মারাত্মক জিনিস।

একটা মাস যেন এক যুগের মতো মনে হচ্ছিল নরবাহনদত্তের কাছে। অতএব তার বিরহবেদনা লাঘবের জন্যে ফের গল্পের ধামা উপুড় করেছিল বন্ধুবর্গ। প্রথমেই গল্প ফেঁদেছিল গোমুখ।

কাঞ্চনপুরী শহরে সুমনা নামে এক রাজা ছিলেন। পরাক্রম ছিল তাঁর। সব শত্রুদের দমন করেছিলেন।

একদিন তাঁর সভায় এল এক ব্যাধকন্যা। পরমাসুন্দরী। খাঁচায় ভরে এনেছে একটা টিয়াপাখি। মেয়েটির ভাইও এসেছে সঙ্গে।

অসাধারণ রূপবতী সেই ব্যাধকন্যা রাজাকে প্রণাম করে বললে, এই টিয়াপাখির নাম শাস্ত্রগঙ্গা। চার বেদ কণ্ঠস্থ। ভালো কবি, বিদ্বান, চৌষট্টি কলায় পারঙ্গম। আপনাকে উপহার দিতে এনেছি। আপনি পরীক্ষা নিন এর অসাধারণ মেধার।

বলেই, টিয়াকে এগিয়ে দিল রাজার সামনে। সঙ্গে সঙ্গে সুললিত স্বরে একটা শ্লোক আবৃত্তি করে গেল বিদ্বান টিয়া।

সংক্ষেপে, শ্লোকটার মানে এই : হে রাজা, আপনি শত্রুদমন করে যশস্বী হয়েছেন। কিন্তু সেই শত্রুদের অর্ধাঙ্গিনীদের হাহুতাশ, অভিশাপ আর বিষনিশ্বাসে আপনি এখনও জ্বলে যাননি, এইটাই বড়ো আশ্চর্যের ব্যাপার।

অবাক হলেন রাজা। শত্রু জায়াদের হাহুতাশের ব্যাপারটা তো কোনও দিনই তিনি ভাবেননি।

মন্ত্রী বললে, মনে হচ্ছে, এই টিয়া আগের জন্মে দেবলোকের ঋষি ছিল। শাপগ্রস্ত হয়ে কলেবর পালটেছে, কিন্তু জ্ঞান যায়নি।

রাজা তখন জিজ্ঞেস করলেন টিয়াকে, তোমার নিজের কথা বলো। কে তুমি? এত শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে কীভাবে? কোথায় তোমার জন্ম?

এইবার টিয়ার চোখে জল দেখা গেল।

বললে, হিমালয়ের কাছে আছে একটা মহাবট। সেখানে বাসা বেঁধে ছিল এক টিয়া আর টিয়ানি। আমি তাদেরই ছেলে। আমাকে জন্ম দিয়েই আমার মা মারা যায়। আমার বুড়ো বাবার ডানায় জোর ছিল না। অন্য টিয়াদের এঁটো এনে আমাকে খেতে দিত, নিজেও খেত।

একদিন শ্বাপদদের তাড়া খেয়ে বন তোলপাড় করতে থাকে একদল চমরি গাই, তিব্বতী গাই, যাদের ল্যাজে ঝোলে চামর। সুযোগ বুঝে শিকারে মেতে গেছিল ব্যাধরা। তারা রাশি রাশি মাংস নিয়ে চলে যাওয়ার পর দেখা গেল এক বুড়ো ব্যাধ সন্ধ্যের দিকে খিধের জ্বালায় ছটফট করছে। কোনও জন্তুই সে মারাতে পারেনি।

উঠে পড়েছিল মহাবটে। নিরীহ টিয়াদের বাসা থেকে টেনে এনে প্রাণে মেরে ফেলে দিচ্ছিল মাটিতে। আমাদের বাসার দিকে তাকে আসতে দেখেই আমি প্রাণভয়ে লুকিয়েছিলাম বাবার ডানার তলায়। বুড়ো ব্যাধ বাবার ঘাড় মটকে মাটিতে আছড়ে ফেলেছিল বটে, আমি ডানার মধ্যে থেকে গুটি গুটি বেরিয়ে লুকিয়ে পড়েছিলাম শুকনো পাতার তলায়। ব্যাধ নেমে এসে কিছু মরা টিরা আগুনে ঝলসে খেয়ে নিয়ে বাকি পাখি পোঁটলায় বেঁধে চলে গেল বটে, আমি ভয়ে সিঁটিয়ে রইলাম সকালের সূর্য না ওঠা পর্যন্ত। ডানা নেই যে উড়ে যাব, তাই টলেটলে হেঁটে পৌঁছেছিলাম এক পদ্মদীঘির পাড়ে। সেখানে দেখেছিলাম মরীচি মুনিকে। তিনি আমার মুখে পাতায় ভরে ফোঁটা ফোঁটা জল খাইয়ে আমাকে নিয়ে গেছিলেন তাঁর আশ্রমে।

আমাকে দেখে অট্টহাস্য করেছিলেন পৌলস্ত মুনি। তিনিই সেই আশ্রমের প্রধান ঋষি। অন্যান্য মুনিরা অবাক হয়ে হাসির কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন। পৌলস্ত বলেছিলেন, পুজো শেষ করে এস, তারপর বলবো এই ছোট্ট টিয়ার কাহিনি। শুনলেই তো জাতিস্মর হয়ে যাবে।

পুজো আর জপ-তপ শেষ হওয়ার পর পৌলস্ত মুনি বলে গেলেন আশ্চর্য এক কাহিনি।

রত্নপুরনগরে জ্যোতিষ্প্রভ নামে এক রাজা ছিলেন শক্তিমান পুরুষ। আসমুদ্র হিমাচল নিজের দখলে এনেছিলেন। তাঁর স্ত্রী হর্ষবর্তী ছিলেন শৈব-উপাসক। একদিন স্বপ্নে দেখলেন। চাঁদ আকাশ থেকে নেমে তাঁর শরীরে প্রবেশ করছে।

তারপরেই তিনি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। সেই ছেলের নাম রাখা হল সোমপ্রভ। অর্থাৎ, চাঁদের কিরণ।

ছেলে বড়ো হয়ে যখন যুবরাজ হল, ইন্দ্রের সারণি মাতলি স্বর্গ থেকে নিয়ে এল উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়ার ছেলেকে, তার নাম আশুশ্রবা ঘোড়া।

সোমপ্রভকে বললে, আপনি ছিলেন ইন্দ্রের প্রিয় বন্ধু, বিদ্যাধর। তাই দেবরাজ এই ঘোড়া পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার জন্যে। এই ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধে গেলে, কেউ আপনাকে হারাতে পারবে না।

পরের দিনই সোমপ্রভ সেই ঘোড়ায় চেপে সৈন্যসামন্ত নিয়ে বেরিয়ে গেল যুদ্ধ করতে। যেসব দেশ এখনও বাবার নজরে পড়েনি, খুঁজে খুঁজে সেই দেশগুলো আক্রমণ করে নিজের দখলে নিয়ে এসেছিল।

তারপর জিরেন নিতে গেছিল হিমালয়ের কাছে এক জঙ্গলে, মৃগয়ার মতলবে। হঠাৎ চোখে পড়েছিল মণিমাণিক্যের গয়না পরা এক কিম্পপুরুষ, পুরানে যাদের নাম কিন্নর, দেবগায়ক। ধরবার জন্যে ধাওয়া করেছিল দেবদত্ত ঘোড়ায় চেপে। কিন্নর ঢুকে গেছিল একটা গুহার মধ্যে। আর তাকে দেখা গেল না।

ক্লান্ত যুবরাজ এদিক-সেদিক ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছেছিল এক মস্ত দীঘির পাড়ে। ঘোড়া থেকে বিশ্রাম নিচ্ছে। এমন সময়ে শুনেছিল দূরে ভারি মিষ্টি মেয়েলি গলার গান।

ছুটে গিয়ে দেখেছিল এক পরমাসুন্দরী কন্যা শিবলিঙ্গের সামনে বসে গান করছে।

গানে মুগ্ধ আর রূপে মুগ্ধ যুবরাজ জিজ্ঞেস করেছিল, কে তুমি?

মেয়েটি তখন ছলছল চোখে শুনিয়েছিল নিজের কাহিনি।

রাজা পদ্মকুট বিদ্যাধরদের অধিপতি। হিমালয়ের নীচের দিকে কাঞ্চনপুর দেশে ছিল তাঁর রাজত্ব। আমি তাঁর মেয়ে। আমার মায়ের নাম মনোরথপ্রভা।

বান্ধবীদের নিয়ে আমি সারাদিন টোঁটোঁ করে ঘুরি। পাহাড়, জঙ্গল, আশ্রম, দ্বীপ, তপোবন, সর্বত্র টহল দিই, হুল্লোড় করি। প্রথম প্রহর আর দ্বিতীয় প্রহর কাটে এইভাবে, হুল্লোড়বাজিতে।

তৃতীয় প্রহরে কিন্তু ফিরে আসি বাড়িতে, বাবার খাবার সময়ে।

একদিন এই দীঘির পাড়ে হাওয়া খাওয়ার সময়ে দেখতে পেলাম এক ঋষিপুত্রকে। সঙ্গে ছিল আরও অনেক মুনিপুত্র বন্ধু। অতিশয় রূপবান সেই ঋষিপুত্রকে দেখেই ভালোবেসে ফেলি।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছিলাম তাঁর দিকে। তিনি আমাকে দেখেছিলেন। ভালোবেসে ফেলেছিলেন, আমার প্রতি তাঁর আকাঙ্ক্ষা চোখে প্রকাশ পেয়েছিল। প্রেমবন্ধনে বাঁধা পড়েছিলাম দুজনে।

আমি বসে পড়েছিলাম সেইখানেই।

আমার এক বান্ধবী বুঝে ফেলেছিল, প্রেমশরে এফোঁড় ওফোঁড় দুজনেই। মুনিপুত্রের বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিল, কে এই অপূর্বকান্তি যুবক?

সে বলেছিল, একটু দুরেই আছে একটা তপোবন। দীধিতি ঋষি সেখানে থাকেন। তিনি ব্রহ্মচারী। জীবনে নারীসান্নিধ্য করেননি। নারী তাঁর কাছে বিষবৎ।

কিন্তু কী আশ্চর্য! একদিন তাঁকে শুধু চোখের দেখা দেখেই গর্ভবতী হয়ে গেছিল এক দেবী। নাম তার কমলা। সে এসেছিল এই দীঘির হাওয়া খেতে। স্নান করছিলেন ব্রহ্মচারী দীধিদতি। তাঁর ব্রহ্মতেজ কমলার চোখ ঝলসে দিয়েছিল, বিনা সঙ্গমে গর্ভসঞ্চার ঘটে গেছিল।

প্রসব করেছিল এক পুত্রসন্তান। মনের কামনায় জাত সেই ছেলেকে দীধিতি মুনির কোলে ফেলে দিয়ে বলেছিল, শুধু তোমাকে দেখেই পেটে ছেলে এনে ফেলেছিলাম। সেই ছেলের বাবা তুমি। ছেলে রাখো তোমার কাছে।

বলেই হাওয়া হয়ে গেল দেবী কমলা। ব্রহ্মচারীর বীর্যর জোর এই রকমই হয়। মনে মনে সেই পুরুষকে কামনা করলেই সূক্ষ্ম বীর্য রমণীর গর্ভাধান ঘটিয়ে বসে। শারীরিক মিলনের দরকার হয় না।

দীধিতি ছেলের নাম দিলেন রশ্মিমান। বীর্যরশ্মি থেকে যার জন্ম। পৈতে দিলেন। বহু বিদ্যার বিদ্বান করে দিলেন।

এই সেই ছেলে, রশ্মিমান।

বন্ধুর পরিচয় দিয়ে রশ্মিমান, সখা জিজ্ঞেস করেছিল আমাকে, তুমি কে?

প্রথামাফিক আমার এক সখী পরিচয় দিয়েছিল। আমি মাথা নীচু করেছিলাম। প্রেমে পড়লে যা হয়। দুজনেই দুজনকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম, শুধু একবার দেখেই।

তাড়া লাগিয়েছিল আমার এক বান্ধবী, প্রেমে পড়ে একেবারে নেতিয়ে পড়লে যে! এবার ওঠো, তোমার বাবার খাবার সময় হয়েছে, তৎক্ষণাৎ শূন্যপথে ফিরে এসেছিলাম বাবার কাছে, বিদায় নেওয়ার সময়ে রশ্মিমানকে বলে এসেছিলাম, আবার আসব।

বাবার সঙ্গে বসে খাওয়া সেরে যেই বাড়ি থেকে বেরোতে যাচ্ছি, আমার এক প্রিয় বান্ধবী বললে কানে কানে, রশ্মিমানের বন্ধু এসে বসে আছে দরজায়। রশ্মিমান তাকে আকাশ-বিহার বিদ্যা শিখিয়ে পাঠিয়েছে। তোমাকে দেখে ইস্তক তার অবস্থা কাহিল। চলো এখুনি।

আকাশপথে তৎক্ষণাৎ গেছিলাম প্রাণপুরুষের কাছে। গিয়ে দেখলাম দেরি করে ফেলেছি। বিরহ করাল রূপ ধারণ করে তার প্রাণ হরণ করেছে।

আমি তার মৃতদেহ কোলে নিয়ে আগুনে পুড়ে মরতে গেছিলাম, কিন্তু আকাশ থেকে তেজোময় একপুরুষ নেমে এসে সেই মৃতদেহ আমার কোল থেকে তুলে নিয়ে আকাশে চলে গেছিলেন। একাই পুড়েমরতে যখন যাচ্ছি আকাশবাণী ভেসে এল কানে। দেবকণ্ঠে বললে, ধৈর্য ধরো। মিলন হবেই ঋষিপুত্রের সঙ্গে।

সেই থেকে বসে আছি রশ্মিমানরে বন্ধুর প্রতীক্ষায়।

গালে হাত দিয়ে মনোরথপ্রভার দুঃখের কাহিনি শোনবার পর জিজ্ঞেস করেছিল সোমপ্রভ, তোমার সেই বান্ধবী গেল কোথায়?

মনোরথপ্রভা বললে, বসে আছি তার ফিরে আসার পথ চেয়ে। সে গেছে আমার আর এক বিদ্যাধর-বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে। তার নাম মকরন্দিকা। আমার দুঃখের কাহিনি শুনে ডেকে পাঠিয়েছে আমার এখানকার বান্ধবীকে।

কথা শেষ হতে না হতেই আকাশ থেকে নেমে এল সেই সখী, যাকে মনোরথপ্রভা পাঠিয়েছিল সখী মকরন্দিকার কাছে।

রাত্রে সোমপ্রভর শোবার ব্যবস্থা করে দিল সেই সখী, গাছের পাতার বিছানা। স্বর্গের ঘোড়ার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল সে।

ভোর হতেই আকাশ থেকে নেমে এল আর এক বিদ্যাধর। তার নাম দেবজয়।

সে বললে, আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার বান্ধবী মকরন্দিকার বাবা সিংহবিক্রম। যেহেতু তোমার বিয়ে আটকে গেছে, তাই সে কুমারী থাকবে পণ করেছে। তোমার বিয়ে হলে তবে সে বিয়ে করবে। সিংহবিক্রম বলে পাঠালেন, তুমি নিজে গিয়ে তাকে বোঝাও যেন সে বিয়েটা করে নেয়, তোমার বিয়ের প্রতীক্ষায় বসে না থেকে।

শুনেই উঠে পড়েছিল মনোরথপ্রভা। এখুনি যাবে বিদ্যাধর লোকে।

বায়না ধরেছিল সোমপ্রভা, আমাকে নিয়ে যাবে? আমি তো কখনও বিদ্যাধরলোক দেখিনি, দেখতে সাধ হয়েছে। ঘোড়া থাকুক এখানে।

খুশিমনে মনোরথপ্রভা সঙ্গে নিয়ে গেছিল সোমপ্রভাকে বান্ধবীসহ।

গোলমালটা লাগল তারপরেই।

সোমপ্রভাকে দেখেই ভালোবেসে ফেলেছিল মকরন্দিকা।

মকরন্দিকাও দখল করে বসেছিল সোমপ্রভর মন।

ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছিল মনোরথপ্রভা। বলেছিল সখী মকরন্দিকাকে, সোমপ্রভকে তুমি ভালোবাসো?

চোখ নামিয়ে মকরন্দিকা মনে মনে শরীর পর্যন্ত দিয়ে ফেলেছি। কামজ্বরে জ্বলছি।

মুচকি হেসে মনোরথপ্রভা বলেছিল, তবে আর বিলম্ব কেন? সখী, আমার তো বিয়ে হয়েই গেছে, মনে মনে। এবার তুমি দেহমনে বিয়ের পাট চুকিয়ে দাও। কর্তব্যসচেতন সোমপ্রভ কিন্তু তক্ষুনি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চাইল না।

বললে, ঘোড়া যেখানে রেখে এসেছি ঘোড়ার খুরের ছাপ অনুসরণ করে আমার সৈন্যসামন্ত এখুনি সেখানে আসতে পারে। আমাকে না দেখতে পেলে চিন্তায় পড়বে। এখন যাই, সৈন্যদের খবর নিয়ে ইফরে এসে বিয়ে করব মকরন্দিকাকে।

কথাটা ঠিক। দেবজয়কে সঙ্গে নিয়ে মনোরথপ্রভা দীঘির পাড়ে ফিরিয়ে আনল সোমপ্রভকে। এসে দেখলে, সত্যিই সেখানে হাজির হয়েছে সোমপ্রভর সৈন্যদল, সেইসঙ্গে তার যুবমন্ত্রী প্রিয়কর।

প্রিয়কর একটা চিঠি এনেছে সোমপ্রভর বাবার কাছ থেকে। বাবা লিখেছেন, এখুনি যেন স্বদেশে ফিরে আসে সোমপ্রভ।

তাই করেছিল সোমপ্রভ।

দেবজয় বিদ্যাধরলোকে গিয়ে মকরন্দিকাকে বলেছিল সমস্ত বৃত্তান্ত।

ফল হল খুবই খারাপ। বিরহ সইতে না পেরে আহার-নিদ্রা-সংগীত-সখী সমস্ত ত্যাগ করে কাঠির মতো শুকিয়ে গেছিল মকরন্দিকা, বাবা আর মায়ের কথা কানে তোলেনি।

শেষকালে তাঁরা রেগে গেছিলেন। অভিশাপ দিয়েছিলেন, যা, ব্যাধ-মেয়ে হয়ে থাক, ব্যাধদের সঙ্গে, এই রূপ নিয়ে, কিন্তু স্মৃতি লোপ পাবে, ব্যাধকন্যা বলেই নিজেকে জানবি।

তাই হয়েছিল, বিদ্যাধরী মকরন্দিকা ভুলে গেছিল সে কে, নিজেকে মনে করেছিল ব্যাধ-মেয়ে।

শাপ যে দেয়, অনুতাপের অনল তার মধ্যেও জাগে। মকরন্দিকার বাবা আর মা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল প্রাণপ্রিয় কন্যাকে ব্যাধ-কন্যা করে দিয়ে। সেই অনুতাপের দহনে নিজেরাও নেমে এসেছিল মর্ত্যে, টিয়া আর টিয়ানি হয়ে। মরণও হয়েছিল ব্যাধ-শিকারিদের হাতে।

তাদের ছেলে ছোট্ট টিয়া কিন্তু আগের জন্মে ছিল বিদ্যাধরলোকের এক মহাপণ্ডিত। টিয়া-জন্মে তার বিদ্যাধরত্ব মনে নেই, মনে আছে অগাধ পাণ্ডিত্য।

খাঁচার টিয়া বললে, পৌলস্ত মুনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, আমি কে।

পাখা গজানোর পর যখন উড়তে শিখলাম, ব্যাধদের হাতে ধরা পড়লাম। তারা আমার জ্ঞানের বহর দেখে রেখে দিল খাঁচায়, রাখতে দিল যে পরমাসুন্দরী ব্যাধ-কন্যার কাছে, এই সেই বিদ্যাধরী মকরন্দিকা।

সোমপ্রভ এখন শিবের আরাধনা করছে, মকরন্দিকাকে বিয়ে করার জন্যে। এখন সে পাবে সেই মেয়েকে ব্যাধকন্যারূপে। মুনির ছেলে রশ্মিমান এখন সুমনা রাজা হয়ে জন্মেছে। মনোরথপ্রভার সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

এই বলে, অভিশাপগ্রস্ত টিয়া-কলেবর ত্যাগ করে বিদ্যাধর-পণ্ডিত প্রস্থান করেছিল নিজের লোকে।

কাহিনি শেষ করে বলেছিল গোমুখ, যুবরাজ, কর্মফল বড়ো বিচিত্র। দেহান্তর ঘটলেও অন্য দেহে পাবে মনের মানুষকে। আপনিও পাবেন শক্তিযশাকে। ধৈর্য ধরুন।

৬০. শূরবর্মা কাহিনি

দুই বিদ্যাধরীর প্রেমের গল্প শোনানোর পর গোমুখ দেখেছিল, নরবাহনদত্তের বিরহ-অনল কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয়েই ফের হু-হু করে জ্বলতে শুরু করে দিয়েছে। কামিনীর চোখের বিদ্যুৎ চিরকালই এইভাবে পুরুষকে দগ্ধায়, সেই পুরুষের একাধিক ঘরনী থাকলেও নতুন কামিনী রমণ-তৃপ্ত পুরুষের দেহের প্রতিটি কোষে যেন একটি করে চুম্বক পাথর সৃষ্টি করে ফেলে। জিতেন্দ্রিয় পুরুষও তখন ঘায়েল হয়।

যেমন হয়েছে যুবরাজ নরবাহনদত্ত। শক্তিযশা সম্ভোগ না করা পর্যন্ত অস্থির হয়েই রয়েছে।

তাই দেখে স্পষ্টবাদী প্রধান যুবমন্ত্রী গোমুক একদিন তো বলেই বসল, সর্বসাধারণের মঙ্গল যাদের শুভবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে, সেই জ্ঞানী পুরুষরাও বিশেষ কামিনীর কাম কশাঘাতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। অন্যান্য ব্যাপারে সহ্যশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েও লালসার লাগাম টেনে ধরতে পারে না।

গোমুক বড়ো স্পষ্টবাদী। অপ্রিয় সত্য যে কতখানি নিষ্ঠুর সত্য, তার প্রমাণ স্বরূপ বলে গেল পরপর তেরোটি গল্প, মনে হবে ছেলেভুলানো ছোটোদের গল্প, কিন্তু প্রত্যেকটির মধ্যে নিহিত রয়েছে একই সত্য, সহ্য, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা, জগতের মহাশক্তি এই তিন শক্তি।

রাজা কুলধর-এর এক পার্শ্বচর ছিল। তার নাম শূরবর্মা। বড়ো বংশের মানুষ। পুরুষের মতো পুরুষ। যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ।

একদিন এক যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ী হয়ে বাড়ি ফিরে দেখল এক জঘন্য দৃশ্য। তার অবর্তমানে তার আত্মাস্বরূপ স্ত্রী সঙ্গম করছে শূরবর্মারই এক বন্ধুর সঙ্গে! মিলনানন্দে মত্ত দুজনে খেয়াল করল না, স্তম্ভিত শূরবর্মা স্বচক্ষে দেখছে তাদের অবৈধ রতিক্রিয়ার উৎকট উল্লাস।

খুনে রাগকে রুখে দিয়েছিল শূরবর্মা। কারণ, সে ক্রোধের ক্রীতদাস নয়। ক্রোধ রিপুকে সংযমের শেকল পরিয়ে রাখতে জানে।

বেরিয়ে গেছিল বাড়ি থেকে। পাপ যাদের আশ্রয় করেছে, তাদেরকে খুন করে লাভ কী? পাপের শাস্তি যথাসময়ে পাবে, গর্হিত কর্ম প্রসব করে যায় নিদারুণ কর্মফল। নিমিত্ত হতে চায়নি শূরবর্মা।

এইসব ভেবে ফিরে এসে বলেছিল নিজের বউ আর বন্ধুকে, পালাও আর যেন না দেখি। দেখলেই মরবে।

চম্পট দিল দুই দূষিত চরিত্রের মানব-মানবী।

নির্মল পরিবেশে ঘরে নতুন বউ নিয়ে এল শূরবর্মা। সুখী হল।

গল্প শেষ করে বললে গোমুখ, ক্রোধকে যে বাগে রাখতে পারে, তার কপালে কখনও দুঃখ লেখা থাকে না। বিপদে পড়ে না, ক্রোধ দমনই প্রকৃত বুদ্ধি। মানুষের ক্ষেত্রে তো বটেই, পশুপাখিদের ক্ষেত্রেও কথাটা খাটে। জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে যে কাজ হয় বাহুবলে তা হয় না। যেমন, এই সিংহ আর ষাঁড়-এর কাহিনি।

বাণিজ্য করতে বেরিয়েছিল কে সওদাগর তনয়। বলদ-টানা গাড়ি নিয়ে। কিছুদূর যেতেই ঘটল দুর্ঘটনা। গাড়ির জোয়াল গেল ভেঙে, ঝর্নার কাদা আর পাথরে আটকে গিয়ে। ভাঙা জোয়ালের চাপে চোট খেল বলদের হাড়। যন্ত্রণায় কাৎরাতে লাগল কাদা আর পাথরে আছড়ে পড়ে।

এমন বলদকে দিয়ে তো আর কাজ হবে না। সুতরাং তাকে ওই অবস্থায় ফেলে রেখে ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে গেল সওদাগরপুত্র।

বলদটার নাম সঞ্জীবক। সঞ্জীবনী শক্তি যেন প্রচ্ছন্ন ছিল তার শিরায় উপশিরায়। তাই অমন হাড়ভাঙা অবস্থা নিয়েও টলে টলে খাড়া হয়েছিল। নরম নরম ঘাস চিবিয়ে বল সঞ্চয় করেছিল। অতিকষ্টে যমুনা নদীর ধারে গিয়ে টাটকা সবুজ ঘাস চিবিয়েছিল। শক্তি ফিরে এসেছিল শরীরে, পেয়েছিল মনের জোর, সহজভাবেই ঘুরতে বেরিয়েছিল বনেবাদাড়ে।

এক সিংহ থাকত সেই জঙ্গলে। তার নাম পিঙ্গনক। বনের রাজা যখন, তখন তার মন্ত্রী তো থাকবেই। পিঙ্গনকের মন্ত্রী দুজনের নাম দমনক আর করটক। দুটো শেয়াল।

তেষ্টার জল খেতে সিংহ পিঙ্গনক একদিন এসেছিল যমুনার তীরে। ঠিক সেই সময়ে সহর্ষে গুরুগম্ভীর ডাক ছাড়ছিল স্বাধীন সঞ্জীবক। গলা ছেড়ে গান গাওয়ার মতো ব্যাপার বলা যায়! গুরুগম্ভীর সেই ডাক ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির রেশ তুলেছিল দিকে দিকে। ঠিক যেন দিগন্ত কাঁপানো হুহুংকার।

অশ্রুতপূর্ব সেই নিনাদ-লহরী শুনে থমকে গেছিল বনের রাজা সিংহ মহাশয়। ভয় পেয়েছিল। ভেবেছিল, নিশ্চয় কোনও রাক্ষুসে জানোয়ার বনে ঢুকেছে, আমাকে খুঁজছে খতম করার জন্যে।

সুতরাং লুকিয়ে থাকা যাক। যমুনার জল খাওয়া আর হয়নি। গভীর বনে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়েছিল গাছপাতার আড়ালে, শেয়াল মন্ত্রীরাও যেন তাকে দেখতে না পায়।

চিন্তায় পড়েছিল দুই শেয়াল মন্ত্রী। দমনক বললে করটককে, জল খেতে গিয়ে হুড়মুড় করে পালিয়ে গেল কেন রাজা?

করটক বললে, অত ছটফট করবে না। কিলোৎপাটি বাঁদরের গল্প জানা নেই মনে হচ্ছে?

দমনক গল্পের গন্ধ পেয়ে জমে গিয়ে বললে, কিরকম গল্প?

করকট বললে, ছুতোররা একটা মন্দির তৈরি করবার বায়না পেয়েছিল। কাঠ চিরে মাঝে খোঁটা গেঁথে রেখে গেছিল। এক বোকা বাঁদর তার ওপর লাফালাপি করবার সময়ে সেই খোঁটা টেনে খুলে ফেলেছিল। তৎক্ষণাৎ করাত দিয়ে চিরে ফাঁক করে রাখা কাঠ দমাস করে আগের জায়গায় ফিরে এসেছিল। বাঁদরের ল্যাজ ঝুলছিল ফাঁক দিয়ে, ল্যাজের ওপর চেপে বসছিল দু-দিকের কাঠ। যন্ত্রণায় মারা গেছিল বোকা বাঁদর। কীল মানে খোঁটা। কীল উৎপাটন করে মরেছিল বলে তার নাম হয়ে যায় কীলোৎপাটি বাঁদর। গল্পটা বললাম এই কারণে যে, যার যা কাজ নয়, তা করতে গেলে, আর কাজ হাসিল করতে না পারলে খামোকা প্রাণ যেতে পারে। আমাদের সিংহরাজা জল খেতে গিয়ে চম্পট দিয়েছে কেন, এত খবরে আমাদের দরকার কী?

দমনক বললে, প্রভুসেবা করতে গেলে প্রভুর মনের ভেতর পর্যন্ত দেখতে হয়, শুধু পেটপুজোর জন্যে প্রভুসেবা ঠিক নয়।

করটক বললে, গায়ে পড়ে প্রভুর মনের ইচ্ছে জানা অনুচিত।

দমনক বললে, যার যেমন মন, সে তেমনটা চায়। কুকুর হাড় পেলেই খুশি, সিংহ ধেয়ে যায় হাতির দিকে।

করটক বললে, প্রভু যদি তাতে রেগে যায়? প্রভুরা তো পাহাড়ের মতোই বিরাট, বিষম, কর্কশ, কালা হয়। ভালোকথায় তারা কান দেয় না।

দমনক বললে, তা ঠিক। তবুও মনের অন্দরে ঢুকতে চায় বুদ্ধিমানেরা।

করটক বললে, তাহলে তাই করা যাক।

দমনক গেল সিংহের কাছে। প্রণাম ঠুকে বললে, হে প্রভু, আমি চাই আপনার মঙ্গল হোক। চিরকাল তা চেয়েছি।

কেশর ফুলিয়ে সিংহ বললে, তা বটে, তা বটে।

দমনক ইনিয়ে-বিনিয়ে বললে, যে অনাত্মীয় মঙ্গল করতে চায়, সে-ই প্রকৃত আত্মীয়। যে আত্মীয় অমঙ্গল চায়, সে অনাত্মীয়।

হুহুংকারে সিংহ বললে, তা ঠিক, তা ঠিক।

দমনক ভনিতা চালিয়ে গেল আর একটু, গেরস্ত অন্য জায়গা থেকে পয়াস দিয়ে বেড়াল পোষে কেন? ঘরের ইঁদুরকে মারবার জন্যে, সে ইঁদুর গেরস্তর অনিষ্ট করে বলে।

ঘাড় বেঁকিয়ে সিংহ বললে, খুব সত্যি, খুব সত্যি।

দমনক এবার আসল কথায় চলে এল, চাকরবাকরের কথা শোনা উচিত, কেননা তারা মনিবের মঙ্গল চায়। যদি আমাকে বিশ্বাস করেন, আর ধাঁ করে রেগে না যান, তাহলে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

প্রীত হয়ে সিংহ বললে, জিজ্ঞেস করো, নির্ভয়ে।

দমনক বললে, যমুনার জল না খেয়ে চলে এলেন কেন?

সিংহ তখন দোটানায় পড়ে গেল। সত্যি কথা বললে হেয় হতে হবে, না বললে মন্ত্রীর মান থাকবে না।

ভেবেচিন্তে বললে, গুরু গম্ভীর একটা হুংকার শুনে পালিয়ে এসেছি। নিশ্চয় আমাকে খতম করতে এসেছে অজানা কোনও অতিকায়। চম্পট দেব ভাবছি।

দমনক বললে, আওয়াজ শুনে ঘাবড়ে যায় না কোনও জ্ঞানী-পুরুষ। শুনুন এক শিয়ালের গল্প।

জঙ্গলে ছিল এক শিয়াল। খিদের খাবার খুঁজছিল। চমকে উঠল বিকট আওয়াজ শুনে। সে আওয়াজ আসছিল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। ঘাবড়ে গিয়ে পালাল জঙ্গল ছেড়ে। যেতে যেতে দেখল একটা বিরাট ঢাক। পড়ে রয়েছে মাটিতে। ভাবল, নিশ্চয় এই জানোয়ারটাই অমন পিলে-চমকানো ডাক ছেড়েছে।

কাছে গিয়ে দেখল, জানোয়ার নয়, একটা যন্ত্র। জোর হাওয়ায় ভুতুড়ে আওয়াজ ছাড়ছে। চামড়া কাঁপছে বলে।

ভয় কেটে গেল শিয়ালের। ফিরে এল নিজের জঙ্গলে।

দমনক বললে সিংহকে হুকুম করুন, দেখে আসি কে অমন পিলে-চমকানো আওয়াজ ছাড়ছে।

সিংহ বললে, সাহস থাকলে যাও।

যমুনার ধারে গিয়ে দমনক দেখল, একটা মস্ত বলদ ঘাস খাচ্ছে আর গাঁ-গাঁ করছে।

চতুর দমনক নিমেষে আলাপ জমিয়ে নিল সঞ্জীবক বলদের সঙ্গে। ফিরে এসে সিংহকে বললে, যদি ইচ্ছে করেন বলদটাকে নিয়ে আমি আপনার সামনে, আপনার ভয় কেটে যাবে।

সিংহ বলে কথা। রাজি হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। কিন্তু বেঁকে বসল বলদ। ভয়ে। সিংহের সামনে কী যাওয়া যায়? বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে সিংহের সামনে নিয়ে এল দমনক।

বন্ধুত্ব হয়ে গেল খাদ্য আর খাদকে। বলদ থেকে গেল সিংহের কাছে, নির্ভয়ে।

বন্ধুত্ব এত নিবিড় হয়ে গেল যে পশুরাজ অন্য পশুর দিকে ফিরে তাকানোও ছেড়ে দিল। বলদ হয়ে গেল সিংহের অষ্টপ্রহরের মিতা।

শেয়াল মন্ত্রীরা দেখল, এ তো আর এক জ্বালা! বলদ-বন্ধুর কথায় চলছে পশুরাজ সিংহ, একাই সব মাংস খেয়ে নিচ্ছে, আমাদের ছিটেফোঁটাও দিচ্ছে না। তাহলে এবার বলদ-বধের উপায় করা যাক।

দমনক শিয়াল সেই দায়িত্ব নিল। একটা গল্প তৎক্ষণাৎ শুনিয়ে দিল বন্ধু করটক শিয়ালকে। বক-বিনাশক মকর-এর গল্প।

সরু লম্বা মুখওয়ালা কুমিরকে বলে মকর। আবার যখন তার শুঁড় থাকে, তখন তা পুরাণের এক জলজন্তু, মা গঙ্গার বাহন।

বক-বিনাশক মকর স্রেফ একটা কুমির। আকারে ছোটো, নিবাস একটা দীঘিতে। দেদার মাছ ছিল সেই দীঘিতে। আর ছিল একটা পেটুক বক। তাকে দেখলেই পালিয়ে যেত মাছেরা। ফলে অনাহারে কাটছিল বকের দিনের পর দিন।

একদিন একটা বদবুদ্ধি এল বকের মাথায়। মাছেদের ডেকে বললে, খুব শিগগিরই তোমরা ভীষণ বিপদে পড়বে। জাল নিয়ে এক জেলে আসছে। জাল ফেলে তোমাদের ধরবে। আমি তোমাদের বাঁচাতে পারি। একটু দূরেই আছে একটা বড়ো দীঘি। জেলে তার ঠিকানা জানে না। আমি তোমাদের একজনকে একজনকে ঠোঁটে করে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব দীঘির জলে। তোমরা প্রাণে বেঁচে যাবে।

রেগে গেল মকর। বললে, বেশ, বেশ, তাহলে আমাকেও নিয়ে চল।

রাজি হয়ে গেল মাছেরা। রোজ একটা করে মাছ ঠোঁটে ধরে উড়ে যেত বক। একটু দূরে গিয়ে তাকে খেয়ে ফেলত।

রোজ রোজ একটা করে মাছের উড়ে যাওয়া দেখে মকর জিজ্ঞেস করল বককে, ব্যাপারটা কী?

বক শুনিয়ে দিল সেই মিথ্যে গল্প। রেগে গেল মকর। বললে, বেশ, বেশ, তাহলে আমাকেও নিয়ে চল।

বক তাকে নখে ধরে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে মাটিতে ফেলে যেই খেতে যাবে, মকর মেরে দিল বককে।

তারপর ফিরে এল দীঘিতে। মাছেদের ডেকে বললে, পাষণ্ড বকের কাণ্ড।

এই থেকেই শেখা যায়, বুদ্ধিই সব প্রাণীর আসল শক্তি।

দমনক শিয়াল বললে, আর একটা গল্প শোনাই। শুনলেই বুঝবে, আসল শক্তি বুদ্ধি।

জঙ্গলে ছিল এক সিংহ। খুব দাপুটে। খুব হিংস্র। সামনে কোনও জন্তু দেখলেই তক্ষুনি মেরে দিত।

খুনে সিংহকে ভয় পেত জঙ্গলের সব জানোয়ার।

কিন্তু তাকে ঢিট করবার মতো গায়ের শক্তি তো কারও নেই। সে যে বনের রাজা।

সুতরাং রাজার সঙ্গে একটা রফা করা দরকার।

জঙ্গলের সব জন্তু একদিন দল বেঁধে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এল সিংহের সামনে।

সিংহ হুংকার ছেড়ে বললে, কী চাই?

নিরীহ জন্তুরা বললে, মহারাজ, আপনার খিদে মেটাতে রোজ তো একটা করে জন্তু দরকার।

ল্যাজ আছড়ে সিংহ বললে, নইলে আমার পেট ভরে না।

জন্তুরা বললে, তা ঠিক, তা ঠিক। তাহলে এক কাজ করা যাক। রোজ একটা করে জন্তু আপনার সামনে পাঠিয়ে দেব। আপনি তাকে পেট ভরে খাবেন। রোজ রোজ অত জন্তু মারবেন না। জঙ্গল জন্তুশূন্য হয়ে গেলে খাবেন কী?

সিংহ দেখলে, কথাটা ঠিক। রাজি হয়ে গেল।

এরপর থেকে রাজ একটা করে জন্তুকে পাঠিয়ে দেওয়া হল পশুরাজের সামনে। বন্ধ হল খামোকা নিরীহ পশুহত্যা।

একদিন পালা এল এক ভিতু খরগোশের। কিন্তু বুদ্ধি ছিল তার মাথায়। সে ইচ্ছে করে অনেক দেরিতে এল সিংহের সামনে, খিদের জ্বালায় পশুরাজের পেট যখন জ্বলছে।

খরগোশকে দেখেই মাটিতে ল্যাজ আছড়ে বন কাঁপানো হুংকার ছেড়ে বললে সিংহ, এত দেরি করলি কেন?

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে খরগোশ বললে, দেরি করিয়ে দিল যে।

কে দেরি করিয়ে দিল?

আর একটা সিংহ।

সঙ্গে সঙ্গে বড়ো কাঁপানো গর্জন ছেড়ে কুয়োর ভেতরে উঁকি দিয়েছিল সিংহ।

এত বড়ো কথা। এই বনে আর একটা সিংহ রাজা হতে এসেছে। এখুনি তাকে তাড়িয়ে দেওয়া দরকার।

গর্জন করে পশুরাজ বললে, কোথায় সে?

খরগোশ বললে, আসুন, দেখাচ্ছি।

কিছুদূর গিয়ে একটা কুয়ো দেখিয়ে খরগোশ বললে, আপনাকে দেখে ওই কুয়োর ভেতরে লুকিয়ে পড়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে বড়ো কাঁপানো গর্জন ছেড়ে কুয়োর ভেতরে উঁকি দিয়েছিল সিংহ। দেখেছিল নিজেরই প্রতিবিম্ব। দাঁত খিঁচোচ্ছে আর গজরাচ্ছে। ওপরের সিংহের গজরানিই প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসছে। বোকা সিংহ ভাবছে নীচের সিংহ গর্জন ছাড়ছে।

সুতরাং আর দেরি না করে বোকা সিংহ তখুনি লাভ দিয়েছিল কুয়োর জলে। ডুবে মরেছিল।

এইভাবেই বুদ্ধির জোরে বেঁচে গেছিল সেই খরগোশ। বাঁচিয়ে দিয়েছিল বনের সব জন্তুদের। দেখিয়ে দিয়েছিল, বুদ্ধি যার বল তার। আসল শক্তি মগজের শক্তি গায়ের শক্তি নয়।

কিছুদিন ধড়িবাজ শিয়াল-মন্ত্রী দমনক খুব মনমরা হয়ে বসে রইল পশুরাজের সামনে।

সিংহ বললে, মন খারাপ কেন?

দমনক বললে, আপনার রাজত্ব আর বেশিদিন থাকবে না, তাই মন খারাপ।

গর্জন ছেড়ে সিংহ বললে, আমার রাজত্ব নেবে কে? কার এত হিম্মত?

সবিনয়ে দমনক বললে, পাছে রেগে যান, তাই এতদিন বলিনি। আপনার এই বলদ বন্ধুই বনের রাজা হবে, আপনাকে সরিয়ে।

ভীষণ রেগে গিয়ে সিংহ বললে, আমাকে সরাবে বলদ? আমার প্রাণের সখা? বাজে বকবে না।

দমনক বললে, মহারাজ, কে কবে দেখেছে বলদ সিংহের বন্ধু হয়? কিন্তু এই বলদ আপনার বন্ধু হয়েছে। সে ভেবেছে, আপনি তাকে ভয় পান বলেই বন্ধুত্ব পাতিয়ে বাঁচতে চাইছেন। তাই অত জোরে শিং ঝাঁকায়, আপনাকে শিং-হাতিয়ার মেরে ঘায়েল করার মহড়া দিয়ে যাচ্ছে। বনের সব জানোয়ারকে দলে টেনেছে। তাদের বলেছে, আমি ঘাস খাই, মাংস খাই না, আমি বনের রাজা হলে তোমাদের কাউকে মারবো না। কিন্তু এই সিংহটাকে খতম করবো তোমাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে।

সিংহ বললে, দমনক, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। বলদ আমার কী করবে? সে ঘাস খায়, আমি মাংস খাই। অভয় দিয়েছি বলেই আমার আশ্রয়ে আছে।

শিয়াল মন্ত্রী বললে, মা লক্ষ্মী বড়ো চঞ্চলা। একই সঙ্গে দু-জায়গায় থাকতে পারে না। ভালো কথা যে শোনে না, তাকে ছেড়ে চলে যায়। তখন সে বিপদে পড়ে। সিংহ আর বলদে বন্ধুত্ব হয়, কে কবে শুনেছে? আপনি দুর্বল বলেই আপনার সামনে মলত্যাগ করে যায়, সেই মলের পোকা আপনার গায়ে ওঠে। পাগলা হাতির সঙ্গে লড়তে গিয়ে আপনার গা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছিল, এখন সেই কাটাছেঁড়া ঘা হয়ে গেছে কেন? মল-এর পোকা পড়েছে বলে। আপনার কষ্ট হচ্ছে। একটু একটু করে মরছেন। তবুও প্রতিকার করছেন না। ফলে, যার জন্যে মরতে চলেছেন, সে আরও জাঁদরেল হয়ে উঠছে। এই কারণেই যারা জ্ঞানী, তারা বদ প্রাণীকে বাড়তে দেয় না। প্রমাণ স্বরূপ বলছি একটা কাহিনি।

এক রাজার বিছানায় ঢুকেছিল একটা উকুন। সে একাই টুকটুক করে রোজ রাজার রক্ত খেত। একদিন এল একটা মশা।

উকুন বললে, কী জ্বালা! তুমি আবার উড়ে এলে কেন? আমাকে একা রক্ত খেতে দাও।

মশা বললে, দ্যাখো ভাই, আমি তো কখনও রাজরক্ত খাইনি। একটু খেতে দাও।

উকুন বললে, কিন্তু যখন তখন রাজাকে কামড়াবে না। যখন ঘুমোবে, তখন হুল ফোটাবে।

মশা তাই করেছিল। এমন হুল ফুটিয়েছিল যে রাজার ঘুম ভেঙে গেছিল মাঝরাতে। চাকর-বাকররা বিছানা ঝেড়ে উকুনকে বের করে মেরে ফেলেছিল।

মশা পালিয়ে ছিল অনেক আগেই।

দমনক বললে, তাহলেই দেখুন, বলদ কেন এত শিং নেড়ে নেড়ে অভ্যেস করছে। আপনার বুকে ঢোকাবে বলে। এরকম বন্ধুর সঙ্গে থাকা উচিত নয়।

শিয়াল মন্ত্রীর যুক্তি মনে ধরেছিল পশুরাজের। ঠিক করেছিল, বিশ্বাসঘাতক বলদকে বধ করবে তবে ছাড়বে।

বোকা পশুরাজের মতলব বুঝে নিয়ে চালাক শিয়াল ধীরেসুস্থে গেল বলদ-এর সামনে, খুব মনমরা ভাব দেখিয়ে।

বলদ বললে, এত মুষড়ে আছো কেন?

শিয়াল বললে, আমাদের গায়ে জোর কম। তাই শক্তিমানদের মন জুগিয়ে চলতে হয়। কাঁহাতক তা করা যায়? মন তাই খারাপ।

বলদ বললে, ব্যাপারটা কী?

শিয়াল আরও ভনিতা করে গেল, সব সময়েই কি রাজার মনের মতো থাকা যায়? ভাগ্যকে কি এড়ানো যায়?

শেয়াল বললে, তা পড়েছি। কাউকে বলা যায় না, তোমাকে বলছি। তোমাকে যে বড্ড ভালোবাসি। আমাদের এই মাথামোটা রাজা ঠিক করেছে তোমাকে মেরে ফেলে খেয়ে নেবে।

শুনে মন খারাপ হয়ে গেল বেচারা বলদ-এর।

শিয়ালকে বললে, একটা গল্প মনে পড়ে গেল। শোনো।

বনে এক সিংহ ছিল। তার ছিল তিন বন্ধু। একটা চিতাবাঘ, একটা কাক, আর একটা শেয়াল। তিন বন্ধুকে নিয়ে সিংহ সব সময়ে টহল দিত জঙ্গলে।

একদিন দেখতে পেল দলছাড়া একটা উট জঙ্গলে ঘুরছে। আগে উট কখনও দেখেনি সিংহ। তাই অবাক হয়ে বলে ফেলেছিল, এটা আবার কিরকম জন্তু?

কাক সব জায়গায় উড়ে বেড়ায়, অনেক কিছু দেখে। সে বললে, এই জন্তুর নাম উট।

সিংহ মিতা পাতিয়ে নিল অদ্ভুত সেই উটের সঙ্গে। ছিল তিন বন্ধু, এখন হল চার। চার সহচর নিয়ে রাজা টহল দিয়ে গেল জঙ্গলে।

একদিন টক্কর লাগল একটা বুনো হাতির সঙ্গে। দাঁতালো হাতি। ক্ষতবিক্ষত করে ছেড়ে দিল সিংহকে। প্রাণটা বেঁচে গেল কোনও মতে। কিন্তু দুর্বল শরীরে শিকার করে মাংস জোটাতে না পেরে অনাহারে কাহিল হয়ে পড়ল দুদিনেই। সিংহের উচ্ছিষ্ট না পেয়ে কাক, শিয়াল আর চিতাবাঘেরও দিন কাটছে অনাহারে।

একদিন চিঁ-চিঁ করে সিংহ জিজ্ঞেস করল তিন মাংসাশী বন্ধুকে, কী করা যায় বলো তো?

সঙ্গে সঙ্গে তিনজনেই বললে একসঙ্গে, উটের সঙ্গে সিংহের বন্ধুত্ব হয় নাকি? উট ঘাস খায়, আমরা মাংস খাই। সুতরাং উট আমাদের খাদ্য। জ্ঞানী মানুষরা তো বলেই রেখেছেন, অনেকের মঙ্গলের জন্যে একজনকে বধ করা যেতে পারে। তাতে দোষ নেই।

সিংহ দোটানায় পড়ে বললে, কিন্তু উট যে আমার বন্ধু। তার ভয় কাটিয়ে বন্ধুত্ব পাতিয়েছি। এখন বন্ধু-বধ করব কী করে?

তিন মাংসাশী বন্ধু বললে, সে ব্যবস্থা আমরা করছি। সে নিজেই নিজের জীবন দেবে আপনার জীবন রক্ষার জন্যে। তাহলে তো দোষ নেই।

রাজি হল সিংহ।

তিন ধুরন্ধর মাংসাশী গেল উটের সামনে। কাক বললে, প্রভু সিংহ খিদের জ্বালায় ছটফট করছেন চল, আমরা গিয়ে সবাই মিলে বলি, আমাদের খান, নিজেকে বাঁচান।

রাজি হল উট। চারজনে গেল সিংহের সামনে। প্রথমে কাক বললে, আজ আমাকে খেয়ে ফেলুন।

সিংহ বললে, ধুস! তুমি বড্ড ছোটো। তোমাকে খেলে আমার পেট ভরবে না।

শেয়াল বললে, তাহলে আমাকে খান।

সিংহ বললে, তুমিও তো রোগাপটকা। পেট ভরবে না।

চিতাবাঘ বললে, তাহলে খান আমাকে।

সিংহ বললে, নখ তোমার অস্ত্র। তোমাকে খাওয়াস যায় না, শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

উট বললে, তাহলে আমাকে খেয়ে ফেলুন।

বলার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে গিয়ে সিংহ তাকে মেরে ফেলল। চার মাংসাশী পেট ভরে খেয়ে নিল উটের মাংস।

গল্প শেষ করে ম্লান মুখে বলদ বললে, ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি হয়, তাহলে সিংহের পেটেই যাবো আমি। হাঁস আর বাজপাখি দুজনে দুজনের বন্ধু হতে পারে। রাজা কিন্তু আদর করে বাজপাখিকে, খিদে পেলে খায় হাঁসকে।

প্যাঁচালো বুদ্ধি দমনক বললে, এত সহজে ভেঙে পড়লে কি চলে? ধৈর্য ধরো। কাজ হাসিল করতে গেলে ধৈর্য দরকার। শোনো একটা গল্প।

বউকে নিয়ে এক টিটিভ পাখি থাকত সমুদ্রের ধারে। সেই বউ যখন মা হতে চলেছে, তখন বলল বরকে, চলো অন্য কোথাও। এখানে থাকলে জলের ঢেউ আমার বাচ্ছাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

টিটিভ স্বামী বললে, আরে দূর! সমুদ্র আমাদের পেছনে লাগতে আসবে না। অত সাহস হবে না।

বউ বললে, সমুদ্রের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে যেও না। শোনো একটা গল্প।

দীঘির পাড়ে থাকতো একটা কচ্ছপ। তার নাম কম্বুগ্রীব। অর্থাৎ, গলা যার শাঁখের মতো। তার দুজন বন্ধু ছিল। দুটো হাঁস। তাদের নাম বিকট আর সংকট।

একসময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় দীঘির জল কমে গেছিল। হাঁস দুজন ঠিক করলে, উড়ে যাবে অন্য দীঘিতে।

কচ্ছপ বললে, তাহলে আমাকেও নিয়ে চল।

হাঁস দুজন বললে, বেশ। তাই হবে। এই লাঠির মাঝখানটা দাঁতে কামড়ে ঝুলে থাকবে। আমরা দুজনে দুদিক ধরে উড়ে যাব, দীঘির পাড়ে নামিয়ে দেব।

এইভাবেই যখন শূন্যপথে যাচ্ছে তিন বন্ধু, নীচের মানুষরা হেঁকে হেঁকে বললে, কী যায়? কে যায়? কেন যায়?

এইভাবেই যখন শূন্যপথে যাচ্ছে তিন বন্ধু, নীচের মানুষরা হেঁকে হেঁকে বললে,

হল্লা শুনে ব্যাপারটা কী জানবার জন্যে যেই মুখ খুলেছে কচ্ছপ, কামড় আলগা হতেই ধপাস করে পড়ে গেছে নীচে।

আকাশ থেকে পাওয়া কচ্ছপকে তক্ষুনি মেরে ফেলে খেয়ে নিয়েছিল মানুষরা।

গল্প শেষ করে টিটিভ-বউ বললে, বুদ্ধি না থাকলে বোকারা এইভাবেই মরে।

টিটিভ বর বললে, তাহলে আমিও একটা গল্প বলি, শোনো।

এক সরোবরে থাকতো তিনটে মাছ। একদিন জেলেরা ঠিক করল, জাল ফেলে মাছ ধরবে। পাড়ে দাঁড়িয়ে এই কথা যখন বলছে, তখন তা মাছেরা শুনে ফেলেছিল। একজন ভয়ের চোটে পালিয়ে গেল নদীর স্রোতে গা ভাসিয়ে, অন্য দীঘিতে।

জাল পড়তেই একজন নিজে থেকেই লাফিয়ে উঠে পাড়ে পড়ে মড়ার মতো শুয়ে রইল। জেলেরা ভাবলে, মরেই যখন গেছে, তখন থাক পড়ে। অন্য মাছ ধরা যাক।

জালে পড়ে তিন নম্বর মাছটা তিড়িংমিড়িং করে লাফিয়েছিল বলে জেলেরা তাকে আছড়ে মেরে দিয়েছিল।

সেই ফাঁকে নদীর স্রোতে ঠিকরে পালিয়ে গেছিল বুদ্ধিমান মাছটা।

গল্প শেষ করে টিটিভ বর বললে, বিপদ এলে কাটিয়ে উঠবো, পালাবো কেন?

বড়ো অহংকারের কথা। শুনে ফেলেছিল সমুদ্র। ওৎ পেতে রইল টিটিভ-বউ ডিম না পাড়া পর্যন্ত। তারপর ভাসিয়ে নিয়ে গেল সমস্ত ডিম। মজা করার জন্যে।

কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিল টিটিভ-বউ।

টিটিভ চলে গেছিল পাখিদের রাজা গড়ুর-এর কাছে। গরুড় সব শুনে রেগে টং হয়ে নালিশ জানিয়েছিল নারায়ণকে। নারায়ণ আগুন-হাতিয়ার ছুঁড়ে শুকিয়ে দিয়েছিল সমুদ্রকে। ভয়ের চোটে ডিম ফিরিয়ে দিয়েছিল সমুদ্র।

কাহিনি সমাপ্ত করে দমনক বললে বলদকে, সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ তোমার হবেই। তখন তুমি চার পা ছুঁড়ে ল্যাজ তুলে দাঁড়িয়ে যাবে। বিপদের সময়ে সাহস দেখাতে হয়, বুঝলে?

বলে, চলে গেল শিয়াল বন্ধু করটক-এর কাছে।

বললে, কাজ হাসিল হয়েছে।

বলদ কিন্তু দূর থেকে সিংহের ইচ্ছেটা জানবার জন্যে এসেছিল একটু পরেই। লুকিয়ে। দেখেছিল, সিংহ পা জুড়ে ল্যাজ খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে।

বলদকে দেখেও ফেলেছিল সিংহ। ভয় পেয়ে মাথা উঁচু করে রয়েছে দেখে আর দেরি করেনি। একলাফে গিয়ে পড়েছিল বলদের ঘাড়ে।

তুমুল যুদ্ধ লেগে গেছিল সিংহ আর বলদে। বলদের শিংয়ের গুঁতোয় সিংহের প্রাণ যায়-যায় দেখে করটক শেয়াল বলেছিল দমনক শেয়ালকে, কাজটা ভালো করলে না। রাজায় প্রজায় মারপিট লাগিয়ে দিলে? কেনা জানে, প্রজা যদি কষ্ট পায়, রাজার রাজত্ব থাকে না।

তুমুল যুদ্ধ লেগে গেছিল সিংহ আর বলদে।

বন্ধুর সঙ্গে প্রতারণা করলে সে বন্ধুত্ব টেকে না। নারীর সঙ্গে কর্কশ ব্যবহার করলে সেই নারী চিরকাল কাছে থাকে না। ভালো কথা বললে যারা সেই উপদেশকে তাচ্ছিল্য করে, তাদের অবস্থাটা দাঁড়ায় সরুমুখ পাখির মতো।

এই বলে সাধু করটক একটা ছোট্ট গল্প শুনিয়ে দিল কুটিল দমনককে।

একদল বাঁদর ছিল বনে। শীতে কাঁপছিল। এমন সময়ে তাদের চোখে পড়ল একটা জোনাকি জ্বলছে দপ দপ করে। ওরা ভাবলে, এই তো পাওয়া গেছে আগুনের ফুলকি। তাড়াতাড়ি জোনাকির ওপর চাপা দিল শুকনো ঘাসপাতা। তারপর সেটা ঘিরে বসে গেল গা সেঁকতে। ফুঁ দিয়ে গেল আগুন ধরাতে।

গাছে ছিল একটা পাখি। তার নাম সরুমুখ। সে বললে বোকা বাঁদরদের, ওহে, ওটা আগুন নয়, জোনাকি পোকা। খামোকা কষ্ট করছো কেন?

বাঁদরের দল কথায় কান না দিয়ে আরো জোরে ফুঁ দিচ্ছে দেখে গাছ থেকে নেমে এল সরুমুখ। সরু ছোঁটে করে জোনাকিকে ধরে দেখিয়ে দিল তার চঞ্চুতে আগুন লাগছে না।

কিন্তু বোকা বাঁদররা গেল রেগে। গায়ে পড়ে ভালো কথা বলতে গেলে যা হয়। পিটিয়ে মেরে ফেলল বাঁদরের দল।

গল্প শেষ করে বললে করটক, তাই তো বলছিলাম। ভালো কথায় যে কান দেয় না, তাকে তা বলা বৃথা। তোমার বদমায়েশি বুদ্ধির জন্যেই কষ্ট পাচ্ছে দুজনে। মারামারি লেগেছে দুই বন্ধুতে। অথচ দেখবে, এর পরিণামটা হবে ভালো। একটা গল্প শুনলেই তা বুঝবে।

ধর্মবুদ্ধি আর দুষ্টুবুদ্ধি নামে দুই বন্ধু ছিল জাত ব্যবসায়ী। বিদেশে গিয়ে তারা রোজগার করলো দু-হাজার সোনার টাকা। বাড়ি ফিরে দু-হাজার থেকে একশো সোনার টাকা বের করে সমান ভাগাভাগি করে নিল

দুজনে। বাকি স্বর্ণমুদ্রা পুঁতে রাখল একটা গাছের গোড়ায়।

তারপর একদিন দুষ্টুবুদ্ধি একা এসে, গাছের গোড়া খুঁড়ে, তুলে নিয়ে গেল বাকি স্বর্ণমুদ্রা।

একমাস পরে বললে ধর্মবুদ্ধিকে, চলো, গাছের গোড়া খুঁড়ে মোহরগুলো তুলে আনা যাক। আমার দরকার।

কিন্তু সোনার টাকা পাওয়া গেল না গাছের তলায়। সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে উঠল দুষ্টুবুদ্ধি। বললে ধর্মবুদ্ধিকে, চোর কোথাকার! সব নিয়ে নিলি? দে, আমাকে অর্ধেক দে।

ধর্মবুদ্ধি বললে, নিয়েছিস তো তুই।

দুষ্টুবুদ্ধি ধর্মবুদ্ধিকে টেনে নিয়ে গেল রাজার কাছে।

রাজা বললেন, দুজনেই তো দুজনকে চোর বলছ। সাক্ষী আছে?

দুষ্টুবুদ্ধি সটান বলে দিলে, আছে। স্বয়ং গাছ দেবতা।

রাজার কর্মচারিরা অবাক হয়ে বললে, বেশ, বেশ, কাল সকালে গিয়ে শুনবো সাক্ষী কী বলেন।

বাড়ি ফিরে দুষ্টুবুদ্ধি বললে নিজের বাবাকে, আজ রাতে গিয়ে গাছের কোটরে লুকিয়ে থাকো। কাল সকালে রাজার লোক গেলেই কোটরের মধ্যে থেকে গাছ-সাক্ষী সেজে কথা বলে যাবে। গাছ দেবতার ভড়ং দেখাবে।

বদ ছেলের কথায় সায় দিয়ে সেই রাতেই গাছের কোটরে গিয়ে লুকিয়ে রইল শঠের পিতা শঠ।

সকালবেলা রাজার লোকজন এসে জিজ্ঞেস করল গাছকে, হে গাছদেবতা, বলো তো কে নিয়েছে সোনার টাকা?

কোটরের মধ্যে গমগমে গলায় বললে দুষ্টুবুদ্ধির দুষ্টু বাবা, ধর্মবুদ্ধি।

বিশ্বাস হল না রাজার লোকজনের। গাছ কখনও মানুষের তরফে সাক্ষী দাঁড়ায়? অসম্ভব। নিশ্চয় এই বৃক্ষ-বাণীর মধ্যে রয়েছে প্রতারণা। নিশ্চয় কেউ লুকিয়ে আছে কোটরে।

ধোঁয়া ঢুকিয়ে দেওয়া হল কোটরে। কাশতে কাশতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে এল দুষ্টুবুদ্ধির বাবা। দম আটকে এসেছিল বলে প্রাণেও বাঁচল না। মারা গেল তৎক্ষণাৎ।

দুষ্টুবুদ্ধির কাছ থেকে সব সোনার টাকা কেড়ে নিয়ে দিয়ে দেওয়া হল ধর্মবুদ্ধিকে। দুষ্টুবুদ্ধির হাত আর জিভ কেটে তাড়িয়ে দেওয়া হল দেশ থেকে।

এই গল্প শেষ করেই উপদেশ বাক্যটাও শুনিয়ে দিল সাধু করটক, অন্যায় করলে সাজা পেতেই হবে। সৎকাজের ফল ভালো হবেই। শোনো বক আর সাপের গল্প।

একটা সাপ একটা বকের বাচ্ছা জন্মালেই খেয়ে ফেলত। কষ্ট পেত বক। ভয়ে কিছু করতে পারত না। একদিন একজন একটা বুদ্ধি দিয়ে গেল তাকে। এক বেঁজির বাসা থেকে চুরি করে আনল মাছ, এনে রেখে দিল সাপের গর্তে। হাতের কাছে মাছ পেয়ে কপাকপ খেয়ে ফেলল সাপ। তারপরেই হানা দিল বেঁজি। প্রাণে মেরে দিল সাপকে।

এই গল্প শেষ করেই করটক শেয়াল আর একটা গল্প শুনিয়ে দিল দমনক শেয়ালকে।

এক ব্যবসায়ীর ছেলে বাবা মারা যাওয়ার পর বিষয়সম্পত্তির মধ্যে পেয়েছিল একটা দশ সের ওজনের ভারী সুন্দর লোহার দাঁড়িপাল্লা।

বিদেশে ব্যবসা করতে যাওয়ার সময়ে দাঁড়িপাল্লাটা রেখে গেল আর এক ব্যবসায়ীর কাছে।

ফিরে এসে শুনল, ইঁদুরে খেয়ে নিয়েছে দাঁড়িপাল্লা।

মনে মনে একচোট হেসে নিয়ে মুখে বললে দাঁড়িপাল্লার মালিক, তা বটে! তা বটে! ভারি মিষ্টি আর নরম তো লোহার দাঁড়িপাল্লা, তাই লোভ সামলাতে পারেনি! যাকগে, আজ কিন্তু তোমার এখানে খেয়ে যাবো।

দাঁড়িপাল্লা-চোর রাজি হল সানন্দে।

তারই ছোটো ছেলেকে নিয়ে স্নান করতে গেল দাঁড়িপাল্লার আসল মালিক। ছেলেটাকে লুকিয়ে রাখল এক বন্ধুর বাড়িতে।

ফিরে এল একা।

ছেলের বাবা বললে, ছেলে কোথায়?

দাঁড়িপাল্লার মালিক মুখ চুন করে বললে, তাকে ছোঁ মেরে উড়িয়ে নিয়ে গেল একটা বাজপাখি।

ছেলের বাবা দাঁড়িপাল্লার মালিককে ঘাড় ধরে নিয়ে গেল রাজার কাছে, মহারাজ, আমার ছেলেকে চুরি করেছে এই বদমাশ বণিক। বলছে কিনা, বাজপাখি ছোঁ মেরে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। অসম্ভব! অসম্ভব!

দাঁড়িপাল্লার মালিক সপেটা জবাব দিল রাজাকে শুনিয়ে, অসম্ভব তো বটেই! ইঁদুরে দাঁড়িপাল্লা খেয়ে নেওয়ার মতো অসম্ভব!

তারপরেই ফাঁস করে দিল চোরের কীর্তি।

রাজার রদ্দা খেয়ে দাঁড়িপাল্লা ফিরিয়ে দিল চোর, ছেলে ফিরিয়ে দিল দাঁড়িপাল্লার মালিক।

কাহিনি শেষ করে সৎ উপদেশটা শুনিয়ে দিল সাধু করটক, চালাকি চিরকাল গোপন থাকে না, ফাঁস হবেই, অতি চালাকও পস্তাবে।

হেসে জবাব দিয়েছিল দমনককে কবে শুনেছে বলদ সিংহের সঙ্গে লড়তে এসে জিতেছে? জিতবে সিংহ, মরবে বলদ।

সত্যিই তাই হল। বলদ খতম করে দিল সিংহ।

পশুরাজের পাকাপাকি মন্ত্রী হয়ে গেল দমনক শিয়াল।

নিঃশঙ্ক সিংহ ফের দাপিয়ে বেড়াতে লাগল গোটা জঙ্গলে। আখেরে লাভ হল সিংহ আর দমনক, দুজনেরই।

মুচকি হেসে সভাভঙ্গ করে বিশ্রাম নিতে গেল যুবরাজ নরবাহনদত্ত। তখনকার মতো ভুলে রইল শক্তিযশার বিরহজ্বালা।

৬১. মুগ্ধবুদ্ধি কাহিনি

কিন্তু সুন্দরী আকাঙ্ক্ষা বড়ো সর্বনাশা। নরবাহানদত্ত ফের উন্মনা হয়ে যাচ্ছে দেখে আবার এক বস্তা গল্প এনে ফেলল গোমুখ। বললে, যুবরাজ এতক্ষণ বলে গেলাম জ্ঞানবুদ্ধির গল্প এবার শোনাই বোকামির গল্প।

এক বড়োলোক ব্যবসায়ীর ছেলের নাম ছিল মুগ্ধবুদ্ধি। সে গেছিল কটাহ দ্বীপে বাণিজ্য করতে। নিয়ে গেছিল অগুরু, ভাঁড় ভর্তি। উজ্জ্বল হলুদ রং আর সুগন্ধের জন্যে যা চন্দনের সঙ্গে গায়ে লাগায় সৌখিন পুরুষ। খুবই মূল্যবান জিনিস।

কিন্তু বোকা ছেলেটা অগুরুর মর্ম বোঝেনি। কত দাম হওয়া উচিত, তাও জানত না। খদ্দের পাচ্ছে না দেখে সমস্ত অগুরু পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে বিক্রি করে দিল ছাইয়ের দামে।

নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে ফলাও করে বলেছিল তার বুদ্ধির গল্প। মূল্যবান অগুরুকে ছাই বানিয়ে বেচে দিয়ে এত আহ্লাদ! ছিঃ ছিঃ করেছিল সবাই।

এবার শোনাই তিল চাষির গল্প। এক মূর্খ চাষার তিল ভাজা খাওয়ার সাধ হয়েছিল। কতকগুলো তিল ভেজে নিয়ে গিয়ে খেতে পুঁতে চাষ করেছিল। ভাজা তিল থেকে কখনও তিলগাছ জন্মায় না। তারও তিলভাজা খাওয়ার সখ মিটে গেছিল। লোকে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল।

এরপর শোনাই জলে আগুনে ছুঁড়ে পুজো করার গল্প। মাথামোটা একটা লোক ঠিক করেছিল ভোররাতে দেবপুজো করবে। ভোরে যাতে স্নানের জন্যে জল গরম আর পুজোর জন্যে ধূপ জ্বালানো, দুটো কাজ একসঙ্গে হয়ে যায়, তাই জলের কলসির মধ্যে আগুন আর ধূপ রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে উঠে দেখল আগুন তো জ্বলেইনি, উল্টে ধূপের নোংরায় জল নোংরা হয়ে গেছে। শুনে, হেসে গড়িয়ে পড়েছিল সবাই—চাঁটি মেরে গেছিল বুদ্ধির ঢেঁকির মাথায়।

এবার শোনাই নাক বসানোর গল্প। এক মহাবোকার বউয়ের নাক ছিল চ্যাপ্টা, কিন্তু গুরুদেবের নাক ছিল খাঁড়ার মতো। তাই, একদিন ঘ্যাঁচ করে গুরুর নাক কেটে নিয়ে, বউয়ের চ্যাপ্টা নাক চেঁচে ফেলে দিয়ে, কেটে আনা খাড়া নাক সেখানে বসাতে গেছিল। নাক তো জোড়া লাগলই না, উল্টে দুজনেই নাকহীন হয়ে নাকি গলায় কথা বলে গেল সারা জীবন।

জঙ্গলে ছিল এক হাঁদা। তার কাজ পশুপালন, গোরু মোষ ছাগল ভেড়া চরিয়ে রোজগার করত। মহাকিপটে। শুধু সঞ্চয় করেই গেছিল, বিয়ে করবে বলে।

তাই শুনে একদিন জনাকয়েক ধড়িবাজ জোচ্চোর এসে তাকে বললে, ওহে, অমুকরাজা তাঁর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন ঠিক করেছেন।

আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাঁদা জমানো টাকাপয়সার অর্ধেক দিয়ে দিল জোচ্চোরদের।

দিন কয়েক পরে তারা এসে বললে, সুখবর! তোমার একটা ছেলে হয়েছে। টাকা দাও। ফুর্তি করবো।

বাকি টাকাও দিয়ে দিল জোচ্চোরদের। চম্পট দিল তারা। হাঁদারামের খটকা লাগল পরের দিন, এই কদিনে ছেলে জন্মায় কী করে?

একটা গেঁয়ো লোকের হঠাৎ একদিন কপাল খুলে গেল। রাজবাড়ি থেকে চুড়ি যাওয়া গয়নাগাটির সন্ধান পেয়ে গেল। চোরের দল পুঁতে রেখে গেছিল গাছের গোড়ায়। সেই গাছটারই গোড়া খুঁড়ে ফেলেছিল গেঁইয়া। আহ্লাদে নাচতে নাচতে রাশি রাশি গয়না এনে বউকে সাজাতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু গয়না তো কখনও দেখেনি। কোথায় কোন গয়না পরাতে হয়, তা জানত না। তাই মাথায় পরাল মেখলা (যা পরা হয় কোমরে- কটিভূষণ), গলার হার ঝোলাল, কোমরে পায়ের নূপুর পরালো হাতে, আর হাতের বালা পরালো কানে।

দেখে, হেসে গড়িয়ে পড়েছিল পাড়ার লোক। মুখে মুখে খবর চলে গেছিল রাজার কাছে, রাজা এসে কেড়ে নিয়েছিলেন সমস্ত গয়না। ছেড়ে দিয়েছিলেন গেয়ো বোকাকে, সে একটা গর্দভ বলে।

এক বোকা বাজারে গেছিল তুলো বেচতে। খদ্দের পেল না তুলো খারাপ বলে। সে দেখেছিল স্যাকরারা খারাপ সোনা পুড়িয়ে খাঁটি সোনা বানায়। সুতরাং সেও পুড়িয়ে দিল সমস্ত তুলো। খাঁটি তুলো পাবে বলে।

তুলোর আগুন দেখে টিটকিরি মেরে গেছিল বাজারের সমস্ত লোক। তুলো উড়ে গেছিল ছাই হয়ে!

এক বড়োলোকের সখ হয়েছিল রাজবাড়ির খেজুর বাগানের মতো খেজুর বাগান বানাবে নিজের বাগানে। ভার দিল কয়েকজন মূর্খকে। তারা গিয়ে দেখল, মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে একটা খেজুর গাছ। সহজে পাওয়া গাছটাকে নিয়ে এল বড়োলোকের বাগানে, টুকরো টুকরো করে কেটে বাগানের নানান জায়গায় পুঁতে দিল বটে, কিন্তু কাটাগাছ থেকে গোটা গাছ একটাও হল না। উলটে রাজবাড়ি থেকে গাছ চুরি করার জন্যে রাজা তাদের নাকখত দিয়ে ছাড়লেন।

এক দেশের রাজা খুঁজে পেতে একজন গুপ্তধন সন্ধানীকে জোগাড় করলেন। শুধু মাটি দেখে সে বলে দিত, কোথায় মাটির তলায় পোঁতা আছে ধনরত্ন। কিন্তু তার অতি চালাক মহাবোকা মন্ত্রী গুপ্তধন সন্ধানীর দুটো চোখই উপড়ে ফেলল, যাতে এত গুণবান কোথাও পালাতে না পারে। ফলে, সে আর জমি দেখতে পেল না, সেই জমির তলায় গুপ্তধন আছে কিনা, তাও জানতে পারল না। সব্বাই টিটকিরি দিয়ে গেল মূর্খ মন্ত্রীকে।

এক বোকা থাকত গ্রামের এক গর্তের মধ্যে। নুন খায়নি জীবনে। নুনের স্বাদ কী রকম, তা জানা ছিল না। একদিন শহরের এক বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন পেয়ে তৃপ্তি করে খেয়েছিল, নুন দিয়ে রান্না করা খাবার।

জিজ্ঞেস করেছিল, এমন আশ্চর্য স্বাদ হল কী করে। নুন দিয়ে রান্না করা হয়েছে শুনে এক মুঠো শুধু নুন মুখে পুরে দিয়েছিল, খেতে আরও খাসা হবে মনে করে। মুখতো জ্বলে গেছিলই, সেইসঙ্গে গুঁড়ো নুনে ঠোঁট আর গোঁফ সাদা হয়ে যাওয়ায় হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছিল বাড়ির সমস্ত লোক।

পাড়াগাঁয়ের এক বোকা গয়লার ছিল একটা মাত্র গোরু। দুধ দিতো রোজ পাঁচ সের। একদিন শুনল, তার বাড়ির সামনে হবে একটা বিরাট উৎসব, ঠিক একমাস পরে। দুধ লাগবে অনেক। চালাক-বোকা গয়লা ঠিক

করল, রোজ দুধ না দুয়ে এক মাস দুইবে, একদিনেই পাওয়া যাবে অনেক দুধ।
কিন্তু তা হল না।
হেসে গড়িয়ে পড়েছিল নিমন্ত্রিত মানুষরা।
গাছের গোড়ায় বসেছিল একটা লোক, তার মাথা জোড়া টাক, ঠিক যেন একটা চকচকে তামার কলসি। একদল ছেলে যাছিল সেখান দিয়ে, তাদের পেট জ্বলছে খিদেতে, হাতে রয়েছে কতবেল। মস্তটাক দেখে মজা করার জন্যে একটার পর একটা বেল ভেঙে গেছিল টেকোর-এর মাথায় ঠুকে। টেকো মানুষটা চোট পেয়ে সহ্য করে গেছিল। রক্ত পর্যন্ত বেরিয়েছিল।
ছেলের দল মজা করে নিল বটে, কিন্তু চলে যেতে হল পেটের খিদে, পেটে নিয়ে।
বোকা টেকোও বাড়ি গেল মনকে সান্ত্বনা দিয়ে মিষ্টি ফলের চোট তো সয়ে গেলাম! আমার মাথা জ্বলছে জ্বলুক, বোকাগুলোর পেটও তো জ্বলছে।
কে বেশি বোকা?
গল্পমালা শেষ করে গোমুখ বললে হাস্যমুখর যুবরাজকে এইভাবেই বোকা লোক নিজে হাসে কষ্টে, পরকে হাসায় মজা দিয়ে।
শুনে হাসতে হাসতে সকালের আড্ডা থেকে উঠেছিল যুবরাজ। শক্তিযশার চিন্তা তখনকার মতো উড়ে গেছিল মন থেকে।
কিন্তু রাতের আড্ডায় জমায়েত হতেই বুজে ফেলেছিল গোমুখ ফের শক্তিযশার চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে যুবরাজের মাথায়।
সুতরাং শুরু করেছিল আর এক গল্পমালা, এবার জ্ঞানবুদ্ধির গল্প, যাতে অকারণ উৎকণ্ঠা উবে যায় মন থেকে।
বনে ছিল একটা মস্ত শিমূল গাছ। গাছে থাকত একটা কাক। তার নাম লঘুপাতী। একদিন সে নিজের উঁচু বাসায় বসে গাছের তলায় দেখতে পেল, ভয়ানক দর্শন একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে হাতে জাল আর লাঠি নিয়ে। একটু পরেই হাতের ছাল মাটিতে ছড়িয়ে দিল সেই লোকটা, তার ওপর ছড়িয়ে দিল খুদ, মানে, ভাঙা চাল। নিজে রইল আড়ালে।
ঠিক এই সময়ে সেখানে এসেছিল পায়রাদের রাজা চিত্রগ্রীব, সঙ্গে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব। মাটিতে ছড়িয়ে থাকা চালের কণা দেখে খুঁটে খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল।
দলবল নিয়ে নেমেও পড়েছিল পেতে রাখা জালের ওপর। তৎক্ষণাৎ আটকে গেছিল জালে।
তখন বলেছিল চ্যালাচামুণ্ডাদের, ঠোঁটে জাল ধরো, জোরে উড়ে যাও।
তাই করেছিল পায়রার দল। সদলবলে জালবন্দি রাজা চিত্রগ্রীবকে উড়িয়ে নিয়ে চলল আকাশ পথে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দৌড়ে ধাওয়া করেছিল পাখি শিকারি।
চিত্রগ্রীব হুকুম দিয়েছিল চ্যালাদের, চলো হিরণ্য ইঁদুরের কাছে। সে আমার বন্ধু। জাল কেটে দেবে দাঁত দিয়ে।
একটু পরেই জালবন্দি অবস্থায় নেমে পড়েছিল হিরণ্য ইঁদুরের গর্তের সামনে। হেঁকে বলেছিল, বেরোও গর্ত থেকে, আমি এসেছি, তোমার বন্ধু, পায়রা-রাজা চিত্রগ্রীব।
হাঁকডাক শুনে শুরুৎ করে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে হিরণ্য ইঁদুর ধারালো দাঁত দিয়ে জাল কেটে মুক্ত করে দিয়েছিল ডানা-ঝটপট পায়রাদের। খুশি হয়ে পায়রা-রাজা উড়ে গেছিল নিজের জায়গায় দলবল নিয়ে।
লঘুপাতী মজা দেখবার জন্যে উড়ে গেছিল উড়ন্ত জালের পেছন পেছন। জাল টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার পর পায়রার দল ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে যেতেই গিয়ে দাঁড়াল হিরণ্য ইঁদুরের গর্তের সামনে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দৌড়ে ধাওয়া করেছিল পাখি শিকারি।

হেঁকে বললে, কা-কা! আমি লঘুপাতী কাক। তোমার মতো বন্ধুবৎসল ইঁদুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে এসেছি।

গর্তের বাইরে না এসে, উঁকি মেরে কাককে দেখে নিয়ে তেড়ে উঠেছিল হিরণ্য ইঁদুর, সরে পড়ো। তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হতেই পারে না। কাক ইঁদুর খায়। ইঁদুর কাকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে না।

মিষ্টি মিষ্টি করে কাক বললে, আহা, আহা, চটো কেন? তোমাকে খেলে খুশি হবো সামান্য সময়ের জন্যে।

কিন্তু যদি বন্ধুত্ব পাতাই, তুমি আমার জীবন রক্ষে করে চলবে অনেক.....অনেক দিন।

বিস্তর কাকুতি-মিনতির পর অসম্ভবও সম্ভব হল, বন্ধুত্ব হয়ে গেল খাদ্য আর খাদকে। গর্তের মধ্যে থেকে জমিয়ে রাখা মাংস আর ভাঙা চাল এনে কাক-বন্ধুকে খেতে দিল ইঁদুর, নিজেও খেয়ে গেল নতুন বন্ধুর মুখোমুখি বসে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! কাক খাচ্ছে না ইঁদুরকে, ইঁদুর খাওয়াচ্ছে কাককে!

এইভাবে গেল কিছুদিন। তারপর একদিন কাক বললে ইঁদুরকে, অনেক দূরে জঙ্গলের মধ্যে একটা নদী আছে। সেই নদীতে থাকে আমার এক প্রাণের বন্ধু, এক কচ্ছপ। তার নাম মন্থর। চলো সেখানে গিয়ে থাকি। সেখানে নদী আছে, মাছ আর মাংস দুটোই পাওয়া যাবে। এখানে তো পাখি-ধরার ভয়ে দিনরাত কাঠ হয়ে থাকতে হয়।

ইঁদুর বললে, যা বলেছো। আমারও এখানে থাকতে ভালো লাগছে না। কেন ভালো লাগছে না, তা নদীর ধারে গিয়ে বলবো।

তখন, কাক ঠোঁটে করে ইঁদুরকে নিয়ে গেল নদীর ধারে। সেখানে দেখা হয়ে গেল মন্থরক-এর সঙ্গে। সুখে রইল কাক, ইঁদুর আর কচ্ছপ।

তারপর একদিন কচ্ছপ জিজ্ঞেস করল ইঁদুরকে, এখানে চলে এলে কেন?

ইঁদুর বললে, আগে আমি থাকতাম একটা বিরাট শহরের একটা মস্ত গর্তের মধ্যে। রাজবাড়ি থেকে একটা রত্নহার পেয়ে রেখেছিলাম সেই গর্তের মধ্যে। আশ্চর্য রত্ন। আলো ঠিকরে আসত। সেই আলোয় আমার গায়ের জোর বেড়ে গেছিল। খাওয়া বেড়ে গেছিল। অন্য ইঁদুররা হিংসেতে জ্বলে যাচ্ছিল।

এই সময়ে এক সন্ন্যাসী একটা মন্দির বানিয়েছিল আমার গর্তের কাছে। ভিক্ষের খাবার এনে কিছু নিজে খেত, বাকি খাবার একটা ভাঁড়ে রেখে দিত, সকালে খাবে বলে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ত।

আমি রাত্রে গর্তের মধ্যে ঢুকতাম, সেইসব খাবার খেয়ে শেষ করে দিতাম।

এইভাবে গেল কিছুদিন। তারপর একদিন সেই সন্ন্যাসী আর এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে যখন গল্প জুড়েছে, আমার আর সয়নি। ভাঁড়ে ঢুকে কটকটাস করে এঁটো খাবার খাচ্ছিলাম।

আওয়াজ শুনে আমাকে ভয় দেখানোর জন্যে প্রথম সন্ন্যাসী একটা ভাঙা বাঁশ দিয়ে টুকটুক করে টোকা দিচ্ছিল ভাঁড়ে।

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী বলেছিল, আমার কথায় কান দিচ্ছ না কেন?

প্রথম সন্ন্যাসী বলেছিল, ইঁদুরকে ভয় দেখাচ্ছি। এত উঁচু ভাঁড় থেকেও রোজ খাবার খেয়ে যায়।

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী বলেছিল, সব জীবই মরে একটা দোষে, অতি লোভে। তাহলে শোনো একটা কাহিনি।

অনেক তীর্থ ঘুরে পৌঁছেছিলাম এক শহরে। অতিথি হয়েছিলাম এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে। ব্রাহ্মণ বললেন ব্রাহ্মণীকে, খিচুড়ি বাঁধো, ঘরে অতিথি এসেছেন। ব্রাহ্মণী বললে, তোমার তো টাকাপয়সা নেই, রাঁধবো কী দিয়ে?

ব্রাহ্মণ জবাব দিলেন এইভাবে, টাকাপয়সা বেশি জমিয়ে রাখার বুদ্ধি কিন্তু ভালো নয়। শোনো একটা গল্প।

জঙ্গলে ছিল এক ব্যাধ। একদিন সে ধনুকের গুণ টেনে, তাতে তির লাগিয়ে, ধনুকের ওপর মাংসের টুকরো ছড়িয়ে রেখে, ওৎ পেতে বসেছিল দূরে।

এমন সময়ে দেখেছিল একটা শূকর ধনুক বাণফেলে রেখে ধাওয়া করেছিল তাকে। মেরেও ফেলেছিল একটু দূরে গিয়ে।

দূর থেকে এই সবই দেখছিল একটা শেয়াল মরা শূকরের অনেক মাংস পরে খাব, এখন জমা থাক, এই ভেবে ব্যাধের ফেলে যাওয়া তির-ধনুকের ওপর ছড়িয়ে রাখা মাংসের টুকরো খেতে গেছিল। ছিলার টানে

ধনুকের তির ছিটকে গিয়ে ঢুকে গেছিল তার শরীরে। প্রাণ গেছিল তৎক্ষণাৎ।

তাই তো বলি, বেশি জমিয়ে রাখা ভালো নয়।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে ব্রাহ্মণী রোদে শুকিয়ে নিয়েছিল কিছু তিল। সেই তিল দিয়ে রেঁধে দিয়েছিল খিচুড়ি। কিন্তু কোত্থেকে একটা কুকুর এসে খিচুড়িতে মুখ দিয়ে সব নষ্ট করে দিয়েছিল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, লোভ সুখ দেয় না, কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অতিথি সন্ন্যাসী বলেছিল তার পরেই, দাও একটা খন্তা, বন্ধ করে দিচ্ছি ইঁদুরের উৎপাত।

খন্তা দিয়ে মাটি খুঁড়ে আমার তৈরি সব গর্ত বন্ধ করে দিয়েছিল সেই সন্ন্যাসী। আমি পালিয়েছিলাম আশ্চর্য দ্যুতিময় সেই রত্নহার ফেলে। চুরি করেছিল সেই লোভী অতিথি সন্ন্যাসী। দ্যুতির অভাবে আমিও তেজহীন হয়ে পড়েছিলাম। চোখে অন্ধকার দেখছিলাম। শুনতে পেলাম, বদমাস সন্ন্যাসী বলছে মন্দিরের সন্ন্যাসীকে, ইঁদুর এখন আসল ইঁদুর হয়েছে, স্বজাতি ফিরে পেয়েছে। চলো, এবার ঘুমোনো যাক।

রত্নহার মাথার তলায় রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল দুজনে। আমি চুরি করতে গেছিলাম হার। বদমাস সন্ন্যাসীটা লাঠি মেরেছিল আমার মাথায়।

মরলাম না বটে, কিন্তু মাথায় চোট পেয়ে সেই থেকে আমি নির্জীব হয়ে পড়েছি। তাই দেখে আমার সহচররাও পালিয়ে গেল অন্য জায়গায়। এই রকমই হয়। যার শক্তি নেই, তার কেউ নেই। তখন চাকর টেঁকে না। ফুলে মধু না থাকলে মৌমাছি আসে না দীঘিতে জল না থাকলে হাঁস সেখানে থাকে না।

ভাই কচ্ছপ, এই কাককে প্রকৃত বন্ধু পেয়ে এসেছি তোমার কাছে। সুখ অনেকটা ফিরে পেয়েছি, বাকিটা পাবো তোমার সঙ্গে থেকে।

কচ্ছপ বললে, আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু। মনে করবে, তোমার নিজের জায়গায় আছো। গুণীর কাছে সব দেশই স্বদেশ, বিদেশ নয়, সে সদা সন্তুষ্ট, সে সদা সুখী। যে ধীর স্থির, তার জীবনে বিপদ আসে না। যারা ব্যবসা করে, কোনও কাজেই তারা পিছিয়ে আসে না, তাদের কাছে সব সম্ভব।

এই কথা যখন হচ্ছে, ঠিক তখন একটা হরিণ পালিয়ে এল সেখানে, অন্য জঙ্গল থেকে, ব্যাধের ভয়ে। কচ্ছপ, কাক আর ইঁদুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিয়ে থেকে গেল একসঙ্গে। পরম সুখে রইল চার রকমের চার প্রাণী।

একদিন দলে ফিরে এল না হরিণ। উদ্বিগ্ন হয়ে গাছের মগডালে উঠে গেছিল কাক। দেখতে পেল তাকে। অনেক দূরে ছটফট করছে জালে পড়ে, নদীর ধারে।

নেমে এসে বলল ইঁদুর আর কচ্ছপকে।

কাক ঠোঁটে করে ইঁদুরকে নিয়ে গেল হরিণের কাছে। জালের দড়ি দাঁত দিয়ে কেটে দিল ইঁদুর। মুক্ত হল হরিণ।

কচ্ছপ বন্ধুর বিপদ দেখে নদীর মধ্যে না গিয়ে ডাঙা দিয়ে গুটি গুটি হেঁটে গেছিল হরিণ বন্ধুর কাছে। ব্যাধ এসে দেখলে, হরিণ পালাচ্ছে, কিন্তু একটা কচ্ছপ রয়েছে।

তাকেই ধরে ফেলল ব্যাধ। জালে ঢুকিয়ে রেখে দৌড়োল হরিণের পেছনে, জাল বন্দি কচ্ছপ রইল পড়ে। ইঁদুর বন্ধু গিয়ে জাল দিল কেটে। কচ্ছপ নেমে গেল নদীর জলে।

কাক উড়ে গিয়ে বুদ্ধি দিল হরিণকে, ছুটোছুটি না করে মড়ার মতো পড়ে থাকো, নইলে তির ছুঁড়ে ব্যাধ তোমাকে মারবে।

তাই করেছিল হরিণ। ব্যাধ কাছে এসে দেখল, হরিণ তো মরে গেছে। একটা কাক তার মাথায় বসে চোখ ঠোকরাচ্ছে।

থাক পড়ে হরিণ। জালে পড়া কচ্ছপটাকে এবার আনা যাক। এইভাবে নদীর ধারে গিয়ে দেখলে, জালকাটা রয়েছে, কচ্ছপ নেই!

ফিরে এসে দেখল, হরিণও নেই, পালিয়েছে।

গাছের ডালে বসে একটা কাক কা-কা করে ডেকে যেন টিটকিরি দিয়ে যাচ্ছে।

কাহিনি শেষ করে গোমুখ বললে যুবরাজকে, পণ্ডিতরা এই জন্যেই বলেন, বন্ধুই বন্ধুকে বাঁচায়, পশুপাখিরাও তা জানে, বিপদে বন্ধুত্যাগ করে না। যে মেয়েদের মধ্যে দ্বিচারিণী প্রবণতার বিষ থাকে, তাদের প্রতি আসক্তি কখনোই শুভ হয় না। এ জাতের মেয়েদের নজরবন্দি করে রাখলেও পরপুরুষ গমন করবেই।

এই সম্পর্কে একটা গল্প বলা যাক।

বলেই, গল্প-রসিক গোমুখ চলে গেল ভিন্ন প্রসঙ্গে।

এক শহরে পরমাসুন্দরী বধূকে নিয়ে বাস করত এক পুরুষ। সে সব সময়ে আগলে রাখতো রূপসী ভার্যাকে, যাতে অন্য পুরুরে নজর সেদিকে না যায়।

কিন্তু একদিন তাকে যেতে হল বিদেশে। বউকে বাড়িতে একা না রেখে, নিয়ে গেল নিজের সঙ্গে। ভয় পেল একটা জঙ্গলের সামনে গিয়ে। সে জঙ্গলে থাকে আদিম মানুষরা, ভিল জাত। বড়ো দুর্ধর্ষ, বড়ো নৃশংস।

তাই, কাছের এক গ্রামে গিয়ে এক বুড়ো ব্রাহ্মণের কাছে রেখে গেল রূপসী বউকে।

কিন্তু যে ভয় করেছিল, ঘটল ঠিক তাই।

ব্রাহ্মণের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক ভিল যুবক। তার তাগড়াই চেহারা আর লোলুপ চাহনি দেখে সঙ্গম লালসায় অস্থির হয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সুন্দরী কামিনী। অন্তরে যে বারবধূ, বাঁধন দিয়ে তাকে আটকানো যায় না। রতিসুখ যে রমণীর কাছে পরম পাওয়া, সতীত্ব তার কাছে নিছক গালভরা কথা। নীচ জাতিতেও আপত্তি নেই—কৃষ্ণকায় ভিল জুড়িয়ে দিক শরীরের জ্বালা, সে যে বড়ো জ্বালা—কামপ্রিয় কামিনীর কাছে।

অতএব, বিনা দ্বিধায় ভিল যুবকের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল মাথায় সিঁদুর দেওয়া সাত পাকে বাঁধা বউ। ঘুরে বেড়াতে লাগল যত্রতত্র, যাযাবরের মতো। ছিল ঘরের বধূ, হয়ে গেল জঙ্গলের মেয়ে।

বিদেশ থেকে ফিরে তার স্বামী শুনল ব্রাহ্মণের কাছে, স্ত্রী এখন পরস্ত্রী!

গেল জঙ্গলে, ভিল গ্রামে। বউ তাকে দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে, আমি কী করবো। আমাকে যে জোর করে নিয়ে এল।

কথাটা সর্বৈব মিথ্যা!

তার স্বামী বললে, তবে চলো, পালাই।

কুলটা বললে, এখন লুকোও এই গুহায়, নইলে রাস্তায় মরবো দুজনেই দুর্দান্ত সেই ভিল-এর হাতে। সে এখন জঙ্গলে। শিকার করছে। গুহায় থাক। কেউ জানবে না। রাত্রে যখন ভিল জোয়ান ঘুমোবে, তুমি তাকে খতম করবে, তারপর পালাবো দুজনে।

তাই হল। গুহায় ঢুকলো বউ-বিশ্বাসী মানুষটা। ডানাকাটা পরীর মতো রূপসী বউ যখন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, সব পুরুষই তা বিশ্বাস করে। বিবেচনা শক্তি হারায়।

অপাত্রে বিশ্বাসের দাম দিতে হল সেই রাতেই।

ভিল জোয়ান বাড়ি ফিরতেই কুলটা কামিনী দেখিয়ে দিল গুহা।

তাগড়াই ভিল লোকটাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখল সে চণ্ডিকা দেবীর সামনে, ভোর হলেই নরবলি দেবে।

বাকি রাতটা কাটাল সুন্দরী সেই মেয়েটাকে সম্ভোগ করে, কামিনীর কাম যে হুহু করে জ্বলে উঠত জোয়ান ভিলকে দেখলেই।

এবং, এই সুরত-ক্রিয়া সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল দড়ি দিয়ে বাঁধা মানুষটার সামনেই। উৎকট উল্লাসসহ।

সঙ্গম-ক্লান্ত দুই নরনারী পরস্পরকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়তেই দেবী চণ্ডিকাকে স্মরণ করেছিল অসহায় সেই মানুষটা, মাগো, আমাকে বাঁচাও।

দেখা দিলেন দেবী। তিনি যে দুর্গতের আকুতি শোনেন। বিহিত করেন।

দেবীর ইচ্ছায় নিমেষে বাঁধন খসে গেল অসহায় মানুষটার। দেবীর খড়্গ নিয়ে এক কোপে কাটল ভিল যুবকের গলা, বউকে বললে, এবার চলো আমার সঙ্গে।

রমণীর মোহ মানুষের জ্ঞানচক্ষু বন্ধ করে দেয়। চোখের সামনে যে মেয়ে সোল্লাসে সুরত ক্রিয়া করেছে এক জংলীর সঙ্গে, তাকেই ফের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে চলল প্রেমান্ধ পুরুষ!

পাপিষ্ঠ সেই মেয়েটা কিন্তু সঙ্গে নিয়ে গেল উপপতির কাটা মুণ্ড, পতি মহাশয়কে লুকিয়ে।

সকালে শহরে ঢুকেই হাউমাউ করে কেঁদে লোক জড়ো করে ফেলল। কাটামুণ্ড দেখিয়ে বললে, এই আমার স্বামীর মুণ্ড। কেটেছে এই লোকটা। এখন আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে বিয়ে করবে বলে।

তাদের নিয়ে যাওয়া হল রাজার সামনে। তিনি বিচক্ষণ পুরুষ। জেরা করে বের করে ফেললেন আসল ব্যাপার। সুন্দরী কুলটার নাক-কান কেটে নগর থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

যুবরাজ, এই জন্যেই বলি, নারীর রূপ ধীমান পুরুষেরও জ্ঞানবুদ্ধি লোপ করিয়ে দেয়। শুনুন আর একটা কাহিনি। এই কাহিনি থেকেই বুঝবেন, নারীকে কখনও বিশ্বাস করতে নেই। গোপন কথা তাদের কাছে বললে কথা গোপন থাকে না, বিপদ বাড়ে, প্রাণ পর্যন্ত যেতে পারে।

সাপেদের রাজা গরুড়ের ভয়ে এক মহাসর্প মানুষের রূপ ধারণ করে আশ্রয় নিয়েছিল এক বেশ্যাবাড়িতে।

ধড়িবাজ বারাঙ্গনা তাকে বলেছিল, আমার দাম অনেক। এক রাত আমোদের জন্যে পাঁচশো হাতি। পারবে দিতে?

মহাসর্পের অসাধ্য কিছুই ছিল না। অলৌকিক শক্তি খাটিয়ে রোজ পাঁচশো হাতি আনিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল বারবনিতাকে।

খটকা লেগেছিল বারাঙ্গনার। রোজ পাঁচশো হাতি এনে দিচ্ছে, কে এই ব্যক্তি?

জিজ্ঞেস করেছিল ছলনা-গলায়, বলতেই হবে আমাকে, রোজ এত হাতি পাও কীভাবে? কে তুমি?

সুরত-লিপ্সায় অধীর মহাসর্প বলে ফেলেছিল, আমি যে মহাসাপ। আমি সব পারি। কিন্তু প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে আছি তোমার এখানে। গরুড় আমার খোঁজ পেলেই মারবে আমাকে।

কুটনি জননীকে কথাটা বলে দিল বেশ্যা।

আর ঠিক তার পরেই পলাতক মহাসর্পকে খুঁজতে খুঁজতে বেশ্যার বাড়ি চলে এল গরুড়। জিজ্ঞেস করল কুটনিকে, মহাসর্প এখানে আছে?

কুটনি বললে, আমার মেয়েকে একজন ভোগ করে রোজ পাঁচশো হাতি ভাড়া দিয়ে। তুমি পারবে?

গরুড় বুঝে গেল, রোজ পাঁচশো হাতি এনে দেওয়ার ক্ষমতা আছে কার। গুরুড়ের।

মুখে বললে, তোমার মেয়েকে তো ভাড়া চাই না। মেয়েমানুষ আমার সয় না। ভাড়া দেওয়ার মুরোদও নেই। শুধু চাই আতিথ্য, এক রাতের জন্যে।

তাই পেয়েছিল গরুড়। অতিথিকে বেশ্যারাও তাড়িয়ে দেয় না।

গরুড় কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকেই আগে খতম করে দিল মহাসর্পকে।

যুবরাজ, এই জন্যেই বলছিলাম, রমণীর কাছে গোপন কথা জমা রাখতে নেই, তাদের পেট আলগা।

শুনুন আর একটা মনোহর কাহিনি।

এক টেকো ছিল রামবোকা। কিন্তু টাকার কুমির। তার বড়ো ইচ্ছে, টাকে চুল গজাক।

এক ধড়িবাজ ঠগ তাকে বললে, আমি এক কবিরাজকে চিনি। সেটাকে চুল গজিয়ে দেয়।

টেকো বললে, আনো সেই কবিরাজকে।

ধড়িবাজ বললে, তাহলে দাও কিছু টাকা।

দিল মূর্খ টেকো। একবার নয়, একদিন নয়, বহুবার, বহুদিন।

তারপর সেই ধূর্ত একদিন নিয়ে এল মাথায় পাগড়ি বাঁধা এক কবিরাজকে। সে-ও ধূর্ত শিরোমণি, এক নম্বর প্রতারক।

টাকে চুল গজাবে নির্ঘাৎ, এই আশ্বাস দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অর্থ দোহন করে গেল।

তারপর একদিন মাথার পাগড়ি খুলে দেখাল নিজের মাথাজোড়া টাক।

একগাল হেসে বললে, টাকে চুল গজানোর ওষুধ যদি জানতাম, তাহলে আমার মাথায় টাক থাকে কী করে?

যুবরাজ, বোকারা এইভাবেই ঠকে চালাকদের কাছে।

এবার শুনুন আর এক বোকার গল্প।

এক ভদ্রলোকের এক চাকর ছিল রামবোকা। মাথায় বুদ্ধি ছিল না এক ফোঁটাও।

তাকে একদিন তেল আনতে পাঠানো হল তেলির বাড়িতে। ভাঁড়ভর্তি তেল নিয়ে যখন আসছে, রাস্তার একটা লোক বললে, তেল যে পড়ে যাচ্ছে, ঠিক করে ধরো।

বোকা চাকর ভাবল, ভাঁড়ে ফুটো আছে। ভাঁড় উলটে দেখতে গেল, ফুটো আছে কোথায়। সব তেল গেল পড়ে।

এমন চাকরকে কি আর কাজে রাখা যায়? মারতে মারতে তাকে দূর করে দিল মনিব ভদ্রলোক।

এক গণ্ডমূর্খের ছিল এক অতিশয় চরিত্রহীন বউ। বরকে বোকা দেখে পরকে শরীর দিয়ে বড়ো সুখ পেত।

একদিন কাজ নিয়ে বিদেশে গেল বোকা বর। অসতী বউ বাড়ির ঝিকে বুঝিয়ে দিল সংসারের কাজকর্ম, নিজে গিয়ে রইল উপপতির বাড়িতে। অবৈধ সুরতক্রিয়া চলল অবাধে।

কিছুদিন পর বিদেশ থেকে বাড়ি ফিরল বউ-প্রিয় সেই বোকা। বউ কোথায় গেল জিজ্ঞেস করতেই ঝি বললে ছলছল চোখে, সে তো মরে গেল। পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

বলে, বোকাকে নিয়ে গেল শ্মশানে। খানকয়েক হাড় দেখিয়ে বললে, এই সেই সতীর হাড়।

কেঁদে ভাসিয়ে দিল গণ্ডমূর্খ। মরা বউয়ের তর্পন শেষ করে শ্রাদ্ধের আয়োজনে মন দিল। নেমন্তন্ন করল সেই লোকটাকেই যার বাড়িতে রয়েছে তার স্ত্রী। যেহেতু এই উপপতি জাতে, ব্রাহ্মণ, সুতরাং ব্রাহ্মণ ভোজনে সে এল। সেজেগুজে সঙ্গে এল তার বউ। বসে গেল খেতে।

চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছিল গণ্ডমূর্খের। যার শ্রাদ্ধ, সে এসে চেঁটেপুটে খাচ্ছে।

ঝি বললে কানে কানে, স্বর্গ থেকে এসেছে, সতী মেয়ে যে!

গণ্ডমূর্খ বর্তে গেল 'মরা' বউয়ের খাওয়া দেখে!

এইভাবেই যুগে যুগে বোকা স্বামীরা ঠকে এসেছে ব্যাভিচারিণী বউদের কাছে।

এক যে ছিল রূপসী, কিন্তু সে চণ্ডালের মেয়ে। তার রূপ আর যৌবনের ঝলক দেখে আকাশের পাখিরও মাথা ঘুরে যেত। মনে ছিল বড়ো অহংকার। এত রূপ নিয়ে সে হবে রাজার বউ। রাস্তায় রাজাকে দেখেই ইচ্ছেটা জেগেছিল মনে।

সুতরাং সে চলল রাজার পেছন পেছন, রাজাই যেন তার স্বামী। রাজা যে হাতিতে বসে!

পথে আসছিল এক ঋষি। রাজা হাতির পিঠ থেকে নেমে প্রণাম করেছিল ঋষিকে।

চণ্ডালের মেয়ে দেখলে, রাজা যাকে প্রণাম করে, তাকেই স্বামী করা উচিত। সুতরাং, রাজাকে ছেড়ে চলল ঋষির পেছন পেছন।

ঋষি এক শিবমন্দিরে ঢুকে শিবলিঙ্গকে প্রণাম করে চলে যেতেই চণ্ডালের মেয়ে ভেবে দেখল, ঋষির চাইতেও বড়ো এই শিবলিঙ্গ, সুতরাং একেই স্বামী করা যাক।

এমন সময়ে একটা কুকুর ঢুকল মন্দিরে। শিবলিঙ্গের মাথায় দুপা তুলে কুকুরের কাজ করে, অর্থাৎ প্রস্রাব ত্যাগ করে, বেরিয়ে গেল মন্দির থেকে।

চণ্ডালের মেয়ে ভাবল, তাই তো, তাই তো, শিবলিঙ্গের মাথায় যে প্রস্রাব করে, সে তো অনেক........অনেক বড়ো.....তাহলে এই কুকুরকেই স্বামী করা যাক।

চলল কুকুরের পেছন পেছন। কুকুর যেন তার স্বামী।

কুকুর এল এক চেনা চণ্ডালের বাড়িতে। চণ্ডাল জোয়ানের পায়ে লুটিয়ে পড়তেই চণ্ডালের মেয়ে ভাবল তাই তো, তাই তো! এই মানুষটাই তাহলে সব চাইতেই বড়ো। একেই বিয়ে করা যাক।

হয়ে গেল বিয়ে।

এবং জানা গেল, শুধু রূপযৌবন নয়, বুদ্ধি থাকা চাই, অহংকার ত্যাগ করা দরকার, তবেই মেলে ভালো বর। নইলে উড়ো পাতার পেছনে ঘুরে মরতে হয়।

এইবার বলা যাক এক বোকা রাজার গল্প।

দেদার টাকার মালিক ছিল এই রাজা, কিন্তু ঘটে বুদ্ধি ছিল না এক ফোঁটাও। এবং ছিল মহা কিপটে।

মন্ত্রীরা একদিন সুবুদ্ধি দিয়েছিল, বেঁচে থাকতে থাকতেই কিছু দানধ্যান করে নিন, পরকালের মঙ্গল হবে।

কিপটে রাজা সপেটা জবাব দিয়েছিল, আগে মরি, দেখি কতটা অমঙ্গল হচ্ছে, তখন আত্মার সদগতির জন্যে না হয় কিছুটা দান করা যাবে!

বোকা যারা, তারা এইভাবেই টাকা জমিয়ে যায় পরকালের কথা না ভেবে।

এইবার হোক দুই বন্ধুর গল্প।

ধবলমুখ ছিল কান্যকুব্জের রাজা চন্দ্রাপীড়-এর পরিচারক। সে প্রায় রোজই বাইরে খেয়ে দেয়ে বাড়ি ফিরত। তার বউ একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, রোজ রোজ কোথায় এত খেয়ে আসো?

ধবলমুখ বললে, কল্যাণবর্মার বাড়িতে। সে আমার বন্ধু। আমাকে খাইয়েই তার সুখ। আমার আর এক বন্ধু আছে। তার নাম বীরবাহু। সে আমার জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে।

বউ বললে, চলো, দুই বন্ধুর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দাও।

পরের দিনই ধবলমুখ বউকে নিয়ে গেল কল্যাণবর্মার বাড়িতে। পেট ভরে খেয়ে এল দুজনে।

তার পরের দিন গেল বীরবাহুর বাড়িতে। সে তখন পাশা খেলছিল। শুধু জিজ্ঞেস করল—ভালো আছো তো? ধবলগিরি বললে, খুব ভালো আছি। শুনেই চোখ নামিয়ে পাশায় মেতে রইল বীরবাহু। খাওয়ানোর ব্যাপারেই গেল না।

বাড়ি ফিরে মুচকি হেসে বউ বললে ধবলমুখকে, আশ্চর্য ব্যাপার। যে খাওয়ায়, সে না হয় প্রাণের বন্ধু হতে পারে। কিন্তু যে শুকনো কথা শুনিয়েই বিদেয় করে, সে কী করে প্রাণপ্রিয় সখা হয়?

ধবলগিরি বললে, কী করে হয়, তা নিজে গিয়ে যাচাই করে এস। দুজনকেই বলবে একই কথা, রাজা খাপ্পা হয়েছেন আমাদের ওপর।

বউ চলে গেল কল্যাণবর্মার কাছে। রাজা রেগে টং হয়েছেন শুনে সে বললে, রাজা রাগলে আমার কিছু করার নেই।

বউ গেল বীরবাহুর কাছে। রাজা খেপেছেন শুনেই ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে মারতে গেল খোদ রাজাকেই।

রাজা জানতেন বীরবাহু কী রকম মানুষ, তাই তাকে একটু বকে দিলেন। ধবলমুখও তাকে ঠাণ্ডা করে বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

তারপরে বললে বউকে, দেখলে? দুজনেই আমার প্রাণের বন্ধু। কিন্তু দুজনের মন দুরকম।

এই রকমই হয়। উপকার নানা ভাবে করা যায়। কেউ প্রাণ পর্যন্ত দিতে তৈরি থাকে। তবুও তফাত থেকে যায়। তেল আর ঘি দুটোই তো স্নেহজাতীয় পদার্থ। তা সত্ত্বেও দুটোর জাত আলাদা, চরিত্র আলাদা।

আর এক বোকার কথা বলা যাক। অনেক হেঁটে মস্ত জঙ্গল পেরিয়ে, সে নদীর ধারে পৌঁছোল বটে, কিন্তু তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাওয়া সত্ত্বেও জলে চুমুক দিল না। শুধু চেয়ে রইল, নদীর দিকে।

একটা লোক তা দেখে বলেছিল, তেষ্টায় মরে যাচ্ছ। চুমুক দিচ্ছ না কেন?

রামবোকা বললে, এত জল তো খেতে পারবো না। তাই খাচ্ছি না।

সেই লোকটা জবাব শুনে হেসে বলেছিল, না পারলেও রাজা তোমাকে মারবেন না।

টিটকিরি গায়ে না মেখে ফ্যালফ্যাল করে নদীর দিকে চেয়ে রইল গণ্ডমূর্খ।

এইরকম বোকা আছে দুনিয়ায়। পুরো কাজ শেষ করতে অক্ষম বলে কাজে হাত দিতেই চায় না।

এবার বলা যাক পুত্রঘাতক বোকার গল্প।

দুই ছেলের বাবা হয়েছিল এই মূর্খ। এক ছেলে গেল মরে। আর এক ছেলে একা-একা রাস্তাঘাটে হাঁটতে পারবে না, এই ভেবে তাকেও দিল মেরে, নিজের হাতে।

গ্রামের লোক পুত্রঘাতক মূর্খকে মেরে বের করে দিল গ্রাম থেকে।

এবার হোক ভাই-ভীতুর গল্প।

আড্ডা বসেছে এক জায়গায়, জনাকয়েক মিলে। পাশ দিয়ে গেল খানদানি চেহারার এক ব্যক্তি।

আড্ডাধারীদের একজন বললে, আমার দাদা যাচ্ছে। টাকার কুমির। সেই জন্যেই ওকে এত ভয়। অথচ, ও মরলে আমিই তো সব টাকা পাবো, আমার সব দেনা মিটে যাবে।

বড়োলোক বলে দাদাকে এত ভয়! রাস্তার পাথর পর্যন্ত হেসে ফেলেছিল বোকার কথায়। স্বার্থ ছাড়া কি মায়ের পেটের ভাইকে ভালোবাসা যায় না? এ এক আশ্চর্য বোকা!

এবার বলা যাক এক জ্ঞানহীন গণকের গল্প। লোক ঠকিয়েই সে রোজগার করে যেত। নামও করেছিল। একদিন সে নিজের ছেলেকে কোলে নিয়ে কেঁদে কেঁদে লোক জড়ো করে ফেলল। কাতারে কাতারে মানুষ এসে গেছে দেখে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে সবাইকে, কেন এত কাঁদছি জানো? আজ থেকে ঠিক সাতদিনের মাথায় আমার এই ছেলে মারা যাবে।

শুনে তো লোকে থ! মস্ত গণৎকার তো! নিজের ছেলের মৃত্যুদিবস পর্যন্ত গুণে বের করে ফেলেছে!

কী আশ্চর্য! ছেলে মারাও গেল ঠিক সাতদিনের মাথায়!

মরল কিন্তু গণৎকারের হাতেই!

কিন্তু গণনা তো সত্যি হল। হৈ হৈ পড়ে গেল চারদিকে। গণিত-অজ্ঞ গণৎকারের নামযশ বৃদ্ধি পেল সহস্রগুণ।

এইরকমই হয়। গণক লোক ঠকায়। ঠকে শুধু বোকা লোকে।

এবার বলি এক ব্রহ্মচারির ছেলের কথা। সে ছেলে এমনই রামবোকা যে হাটে-ঘাটে-মাঠে সব্বাইকে জোর গলায় বলে বেড়াত, জানো, আমার বাবা মস্ত ব্রহ্মচারি। আমি তার ছেলে!

মূর্খের বারফট্টাই শুনে একদিন এক ব্যক্তি হেসে হেসে তাকে বলে গেল, ওহে বোকা চন্দ্র, তোমার বাবা যদি ব্রহ্মচারিই হন, তাহলে তো জীবনে স্ত্রী-সঙ্গম করেননি। তাহলে তুমি পয়দা হলে কী করে?

এই গেল মহামূর্খের প্রলাপ কাহিনি। এবার হোক—

এক রাগী বোকার গল্প। সে বসেছিল ঘরের বাইরে। ঘরের মধ্যে তাকে নিয়েই কথা হচ্ছিল কয়েকজনের মধ্যে।

একজন খুব প্রশংসা করে যাচ্ছিল তার। কান খাড়া করে শুনছিল আর খুশিতে ডগমগ হচ্ছিল রাগীবোকা।

ঠিক এই সময়ে কানে ভেসে এল আর একজনের কথা। সে বলছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি বলছ ঠিকহ, খুবই সাহসী ও। এটা একটা গুণ। কিন্তু একটা দোষও আছে। মহাদোষ। রাগলে এক্কেবারে চণ্ডাল!

শুনেই ভীষণ রাগে ফুটতে ফুটতে ধাঁ করে ঘরে ঢুকে বক্তার গলা টিপে ধরে বললে রাগী বোকা, এত বড়ো স্পর্ধা! আমার নিন্দে, চোখের আড়ালে!

হেসে উঠল ঘরের সবাই।

বললে, কথাটা যে সত্যি, তা প্রমাণ করে ফেললে। সাহস আর রাগ, দুটোই সবাইকে দেখিয়ে দিলে।

বোকা যারা, তারা এই রকমই হয়। জাহির করে বেড়ায় নিজেদের দোষ।

এবার বলা যাক এক বোকা রাজার গল্প। ফুটফুটে একটি মেয়ে হয়েছিল তার। মনে বড়ো সাধ হয়েছিল, ঝটপট বড়ো হয়ে যাক মেয়ে, ধুমধাম করে তখন তার বিয়ে দেওয়া যাবে।

ইচ্ছেটা প্রকাশ করেছিল একদল কবিরাজকে ডেকে।

তারা বললে, এ আর এমন কথা কী? মেয়েকে বাড়িয়ে দেব, কিন্তু তাকে একদম চোখের আড়ালে রাখতে হবে। কেউ যেন তাকে দেখতে না পায়।

সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হয়ে গেল রাজার। মেয়েকে কেউ যেন দেখতে না পায়। অর্থাৎ, একরকম অদৃশ্য ভাবেই রইল কন্যা।

ওষুধপত্র চলল 'অদৃশ্য' কন্যার ওপর। সবই মিথ্যে ওষুধ। ওষুধ দিয়ে কারও বয়স বাড়ানো যায় না। সে আপনিই বেড়ে উঠল। যুবতী হয়ে গেল। তখন তাকে রাজার সামনে আনা হল। রাজা আহ্লাদে আটখানা হল। কচিকন্যা এতো বড়ো হয়ে গেছে!

সে তো হবেই। এতগুলো বছর পার করে দিলে কোনো মেয়ে কচি খুকি থাকে?

কিন্তু বোকা রাজার মাথায় সে বুদ্ধি তো নেই। দেদার টাকাপয়সা দিয়ে দিল ধূর্ত কোবরেজদের।

এই রকমই হয়। চালাক যারা, তারা চিরকাল বোকা ধনবানদের ঠকিয়ে খায়।

পাণ্ডিত্যের বড়ো অহংকার ছিল একটা লোকের। সারাবছর একজনকে খাটিয়ে নিয়ে তার গাঁয়ে ফেরবার সময়ে পাওনা মিটিয়ে দিল কড়ায় গণ্ডায়। গরিব মানুষটা বাড়ির গিন্নির সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার সময়ে নিয়ে গেল আধপণ কড়ি। নামমাত্র বকশিশ।

কিন্তু পণ্ডিত মানুষটার তা সহ্য হল না। দৌড়োল চাকরকে ধরতে। গেল নদীর ধার পর্যন্ত, চাকর বেচারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল নৌকোয় উঠবে বলে।

আধপণ কড়ি কেড়ে নিল তার কাছ থেকে। বাড়ি ফিরে সালংকারে বর্ণনা করে গেল গিন্নির কাছে কীভাবে প্যাঁচ মেরে ঘরের অর্থ ঘরে ফিরিয়ে এনেছে। মুখটিপে হেসে ব্যঙ্গ করে গেল বউ।

বড়াই করতে গেল পাড়ার লোকেদের কাছে, তারা দিল টিটকিরি। হাসির রোল পড়ে গেল, সেই সঙ্গে ঢিঢি পড়ে গেল চারিদিকে, জ্ঞানমূর্খর ব্যয় নৈপের বহর, শুনে!

এই রকমই হয়। যাদের অনেক টাকা, তাদের থাকে না কাণ্ডজ্ঞান। হাসির খোরাক হয়ে ওঠে শেষ পর্যন্ত।

শোনাই এবার এক ব্যক্তির বোকামির গল্প।

নিজের জ্ঞানবুদ্ধির বড়াই ছিল তার বিলক্ষণ। একদিন জাহাজে চেপে সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময়ে তার হাত থেকে খসে পড়ে গেল রুপোর থালা, খাবার থালা, ঠিকরে গেল সমুদ্রে। তৎক্ষণাৎ ঝুঁকে পড়ে সে সমুদ্রের কাছে বড়াই করে গেল নিজের গুপ্ত জ্ঞানবুদ্ধির, ধমক দিয়ে বললে থালা ফিরিয়ে দিতে।

সমুদ্র কর্ণপাত করেনি। তীরে ফিরে এসে জলের ধারে সমানে তর্জ গর্জন করে গেছিল পরমজ্ঞানী ভীষণ বোকা সেই পুরুষ, সমুদ্রের তলাতেও যদি পৌঁছে যায় রুপোর থালা, ঢেউ তা তুলে এনে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। কিন্তু বিবিধ গুহ্য জ্ঞানশক্তি প্রয়োগ করেও ঢেউকে শাসনে আনতে পারেনি, রুপোর থালা-ও ফিরে আসেনি।

হাস্যাস্পদ হয়েছিল সবার কাছে।

এবার হোক এক নিরেট রাজার গল্প। সুবিচার করার জন্যে তার ছিল অহংকার, আদপে সেসব বিচারের মাথামুণ্ড ছিল না।

যেমন, একদিন ছাদে দাঁড়িয়ে রাজা দেখল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা লোক আর একটা লোকের গা থেকে কুড়ি তোলা মাংস কেটে নিল, হোম করবে বলে। যন্ত্রণায় অস্থির অন্য জনকে দেখে তৎক্ষণাৎ রাজা সুবিচারের হুকুম দিল শান্ত্রীকে, যাও, যতটা মাংস কেটেছে ওই বদমাস, তার বেশি মাংস বদমাসের গা থেকে কেটে নিয়ে ফিরিয়ে দাও যে যন্ত্রণায় কাঁদছে, তাকে।

শান্ত্রী বললে, হুজুর, যার মুণ্ড কাটা গেছে, তাকে আর একটা কাটা মুণ্ড ফিরিয়ে দিলে সে কি প্রাণ ফিরে পায়? এখানে কাটা মাংস ফিরিয়ে দিলে সেই মাংস কি গায়ে জোড়া লাগবে?

এই বলে, বাইরে গিয়ে হেসে হেসে পাঁচজনকে বলে গেল রাজার বোকামির গল্প। শুধু তো বোকা নয়, অতিশয় নিষ্ঠুর।

এবার বলা যাক এক মূর্খ মায়ের গল্প। একটি ছেলে ছিল তার। ইচ্ছে ছিল আর একটি ছেলে হোক যে হবে প্রথম ছেলের চাইতেও সেরা। এমন ছেলে পাওয়ার পন্থা জানতে গেছিল এক সন্ন্যাসিনীর কাছে। কুচুটে সন্ন্যাসিনী বললে, কোলের ছেলেটাকে বলি দিলেই আরও ভালো ছেলে পাবে। বোকা মা যখন তাই করতে যাচ্ছে, এক বুড়ি এসে তাকে আচ্ছা করে বকে দিলে। যে ছেলে এখনও জন্মায়নি, তার জন্যে কোলের ছেলেকে কেউ মেরে ফ্যালে? আর যদি ছেলে না জন্মায়?

রামবোকা জননীকে এই ভাবেই মহাপাপ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল সহজ জ্ঞানের খনি সেই বৃদ্ধা।

এবার বলি এক অতি-বুদ্ধি চাকরের গল্প, আসলে সে ডাহা বোকা। কর্তা তাকে বলেছিল, যা, বাগান থেকে খেতে খাসা আমলকি নিয়ে আয়। চাকর মহাপ্রভু এক-একটা আমলকি গাছ থেকে পেড়ে চেখে চেখে দেখে নিল খেতে খাসা কোনগুলো, নিয়ে এল এঁটো আমলকি মালিকের কাছে। ফলে, তার চাকরিটাই গেল।

এবার শোনাই দুই ভাইয়ের গল্প। দুজনেই ছিল বাবার টাকায় বেজায় ধনী। বড়ো ভাইয়ের নাম যজ্ঞসোমর, ছোটো ভাইয়ের নাম কীর্তিসোম। কীর্তিসোম ব্যয়নিষ্ঠ পুরুষ। অযথা অপব্যয় করে না। সুতরাং তার ধনবৃদ্ধি ঘটে গেল।

উল্টোটা ঘটল বড়ভাই যজ্ঞসোমের ক্ষেত্রে। সে দু-হাতে খরচ করে নির্ধন হয়ে গেল।

বউকে বললে, চলো যাই অন্য দেশে। গরিব হয়ে গেছি তো, এখানে থাকা আর সমীচীন নয়।

বউ বললে, পকেটে পাথেয় না থাকলে বিদেশে যাওয়া যায় না। ছোটো ভাইয়ের কাছে হাত পাত।

ছোটো ভাই স্ত্রৈণ পুরুষ। স্ত্রী-র বুদ্ধিতে চলে। স্ত্রী বললে, পাগল! এই ভাবে যে মানুষটা টাকাপয়সা উড়িয়ে দেয়, তাকে টাকা দিও না।

বড়ো ভাইকে বিমুখ করল ছোটো ভাই।

ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে বউকে নিয়ে বেরিয়ে গেল বড়োভাই যজ্ঞসোর।

পথে পড়ল এক জঙ্গল। যজ্ঞসোমকে আস্ত গিলে ফেলল এক অজগর। যজ্ঞসোমের বউ কাঁদতে কাঁদতে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

অজগর বললে মানুষের ভাষায়, কী আশ্চর্য! এত কান্নাকাটি কেন?

সাপ কথা বলছে মানুষের গলায়! অবাক বউ বললে, তবে কি হাসব? ভিক্ষে করতে যাচ্ছে আমার স্বামী, তুমি তাকে গপ করে গিলে ফেললে?

অজগরের তখন দয়া হল। হাঁ করে পেট থেকে উগড়ে দিল একটা সোনার থালা।

বললে, এই নাও ভিক্ষে করার থালা। থালা পাতবে, ভিক্ষে পাবে। যজ্ঞসোমের বউ বললে, সোনার থালায় কে দেবে ভিক্ষে? অজগর বললে, যে না দেবে, তার মাথা চৌচির হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে থালা বাড়িয়ে দিয়ে যজ্ঞসোমের বউ বললে, তাহলে তাও আমার স্বামীকে।

অক্ষতশরীরে যজ্ঞসোম বেরিয়ে এল অজগরের পেট থেকে। সঙ্গে সঙ্গে অজগর আর অজগর রইল না, হয়ে গেল দিব্যকান্তি এক বিদ্যাধর।

বললে, মুনির শাপে অজগর হয়েছিলাম। সতী সাক্ষাতে সেই শাপ কেটে গেল। এই নাও মণিমাণিক্য।

বলে, সোনার থালা ভরিয়ে দিল হিরেজহরতে। উড়ে গেল আকাশে।
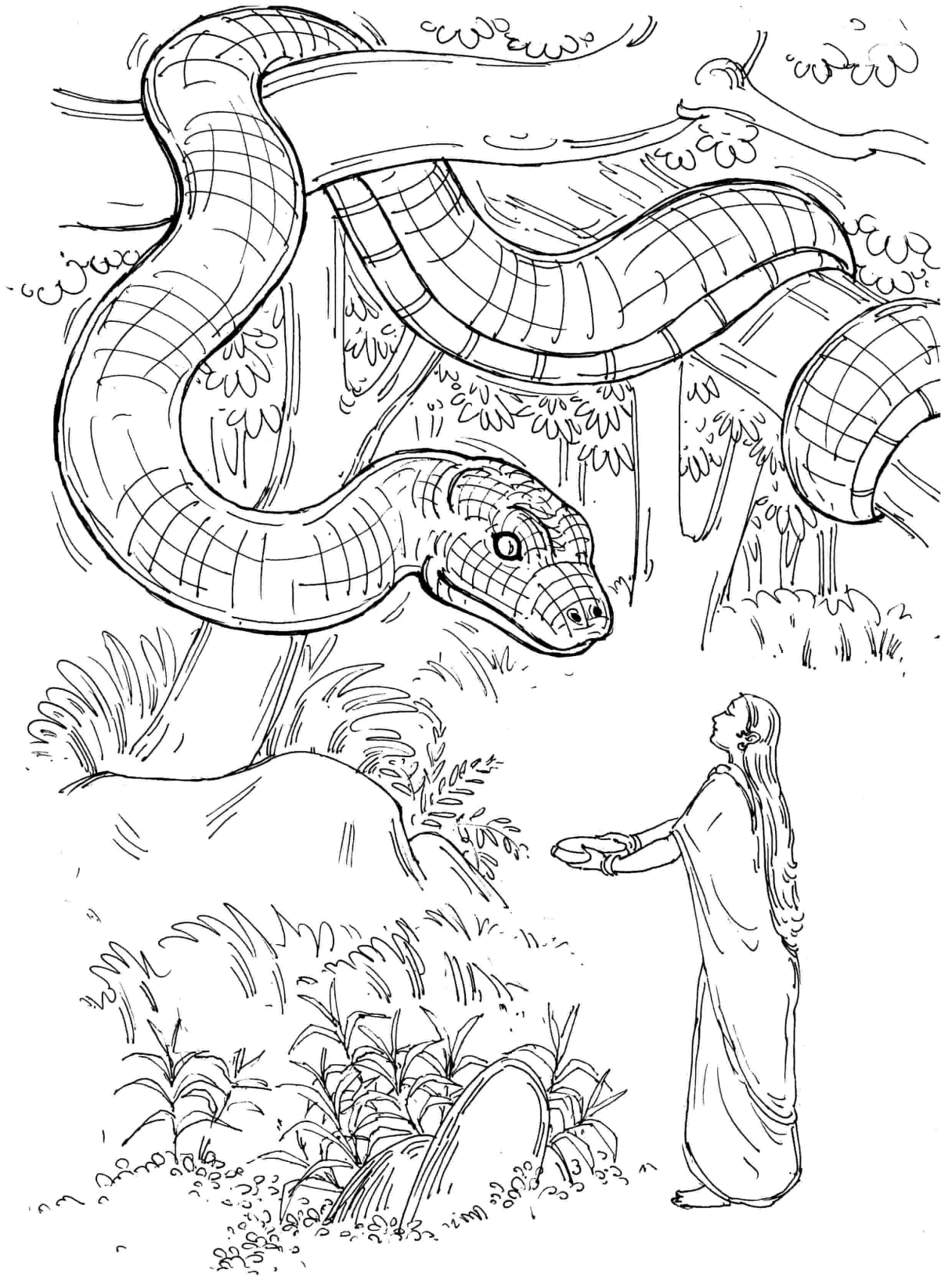
অজগর বললে মানুষের ভাষায়, কী আশ্চর্য! এত কান্নাকাটি কেন?

বিশাল ধনী হয়ে নিজের বাড়ি ফিরে এল যজ্ঞসোম।

এই রকমই হয়। মানুষ ভালো থাকলে ভালো ফল পায়, মন্দ থাকলে মন্দ ফল পায়।

তাহলে হোক এখন এক মহাস্বার্থপর নাপিতের গল্প। যুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়েছিল সে। রাজা তাকে পুরস্কার দিতে চাইলে সে চাইল কী?

একজন নপুংসক!

যে যেমন, সে তাই চায়।

সবশেষে শোনাই এক রামবোকার কাহিনি। সে যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, এক গাড়োয়ান তাকে বললে, ভাই, আমার এই গাড়িখানা ঠিক চলছে না, ঠিক করে দেবে?

রামবোকা বললে, ঠিক করে দিলে কী দেবে?

গাড়োয়ান বললে, কিচ্ছু না।

গাড়ি ঠিক করে দিয়ে রামবোকা বললে, এবার দাও।

হাসতে হাসতে গাড়ি নিয়ে চলে গেল গাড়োয়ান, কিচ্ছু না দিয়ে।

বোকা কাহিনিমালা শেষ করে গোমুখ বললে, শুনলেন তো যুবরাজ? জগতে কত রকমের বোকা আছে?

হাসতে হাসতে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুমিয়েই পড়ল যুবরাজ নরবাহনদত্ত।

মনেই রইল না বিদ্যাধর তনয়া শক্তিযশার কথা।

৬২. মেঘবর্ণ কাহিনি

বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিশিযাপন করে ভোর হতেই নরাবাহনদত্ত গেল বাবার সঙ্গে দেখা করতে। সেখানেই দেখা হয়ে গেল পদ্মাবতীর ভাই সিংহবর্মার সঙ্গে। তিনি মগধের রাজা। তাঁর সঙ্গে বিবিধ কথায় কেটে গেল সারাদিন। রাত ঘনিয়ে আসতেই খাওয়াদাওয়া সেরে ফিরে এল বন্ধুদের আড্ডায়, নিজের খাসমহলে। কিন্তু শক্তিযশা-বিরহে আকীর্ণ অবস্থায়। চতুর বন্ধু গোমুখ তার মুখাবয়ব নিরীক্ষণ করেই বুঝে ফেলেছিল, ফের শুরু হয়েছে বিরহ-ব্যথা। অযুত অদৃশ্য আকর্ষণ-রশ্মি দিয়ে শক্তিযশা যেন নরবাহনদত্তকে টেনে রেখেছে দিবস-রজনীর প্রতিটি মুহূর্তে।

তাই বন্ধু করেছিল বন্ধুর কর্তব্য। শুরু করেছিল আবার মনোগ্রাহী গল্পমালা, এ ব্যাপারে সে যে অফুরন্ত!

মস্ত এক বটগাছে থাকত অনেক পাখি। কাকলি দিয়ে পথিকদের নেমন্তন্ন জানিয়ে যেত ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, এস বন্ধু এস, একটু জিরিয়ে যাও।

একটা কাকও ছিল সেই গাছে। তার নাম মেঘবর্ণ। অর্থাৎ, গায়ের রং যার মেঘের মতো কালো। তার পরম শত্রু ছিল এক প্যাঁচা। তার নাম অপমর্দ। রাত্রি নিশীথে সে হানা দিত বটবৃক্ষে, খতম করে যেত বহু বায়সকে।

রোজ রোজ এভাবে কাক-নিধন কি সহ্য করা যায়? একদিন ভোর হতেই মেঘবর্ণ সাঙ্গপাঙ্গদের জড়ো করে বললে, নিশীথ রাতের হত্যাকারী এই প্যাঁচাটাকে খতম করতে হবে। কী করা যায়?

একটা কাক বললে, পালিয়ে যাওয়া যাক, অন্য দেশে।

আর একটা কাক বললে, কক্ষনো না। শত্রুর শক্তি যাচাই করে নিয়ে তারপর যা হয় করা যাবে।

তৃতীয় বায়স বললে, যুদ্ধ করা যাক প্যাঁচার সঙ্গে। তারপর হোক সন্ধি।

চতুর্থ কাক বললে, সন্ধিটা করবে কে? কাক আর প্যাঁচার শত্রুতা সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে হয়ে আসছে। তা ছাড়া, প্যাঁচার কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যাবে কোন কাক? কার এমন বুকের পাটা আছে?

মেঘবর্ণ কাক বললে, ধুস! সাহস থাকলেই তা করা যায়।

আর একটা কাক বললে, অসম্ভব। কাক আর প্যাঁচায় সখ্যতা কোনও দিন হবে না।

মেঘবর্ণ বললে, কেন হবে না?

কথার দোষের জন্যে—বললে একটা কাক।

বলে, শুনিয়ে দিল এক গাধার গল্প।

গাধাটা ছিল বড়ো রোগা। তাকে খাইয়ে দাইয়ে মোটা করবার জন্যে তার মালিক ধোপা তাকে বাঘের চামড়া দিয়ে মুড়ে শস্যখেতে পাঠিয়ে দিত। মনের সুখে সে খেয়ে যেত, চাষিরা দূর থেকে বাঘের চামড়া দেখে কক্ষনো কাছে আসত না।

একদিন ঘটে গেল একটা অদ্ভুত কাণ্ড। অন্যমনস্ক হয়ে এক চাষা চলে এসেছিল খুব কাছে। তার হাতে ছিল তির আর ধনুক।

হঠাৎ দেখেছিল বাঘের চামড়া মোড়া গাধাকে খুব কাছেই। ভয়ের চোটে নিজেকে কম্বল দিয়ে মুড়ে যেই চম্পট দিতে যাচ্ছে, গাধা দেখে ফেলেছিল তাকে। ভেবেছিল, নিশ্চয় আর একটা গাধা এসেছে ছদ্মবেশে, শস্যখেতে।

অতএব, গলা চিরে ছেড়েছিল গাধার ডাক।

সেই প্রথম ফাঁস হয়ে গেল আসল ব্যাপারটা। শস্যচোর তাহলে বাঘ নয়, একটা গাধা!

অতএব মারো তাকে, শনশন করে তির ছুটে গেল ধনুক থেকে। অক্কা পেল গাধা।

কথার দোষেই মারা গেল গর্দভ মহাশয়।

গল্প শেষ করে বুদ্ধিমান সেই কাক বললে, আমাদের কথাও তো কর্কশ, মার্কামারা। প্যাঁচার সঙ্গে শত্রুতা এই কারণেই। অনেক আগে পাখিরা কেউ কাউকে মানতো না, যা খুশি করে বেড়াত। তাই ঠিক করা হয়েছিল রাতের রাজা প্যাঁচা হোক পাখিদের রাজা। তাকে যখন সিংহাসনে বসানোর তোড়জোড় চলছে, বিশ্রী বিকট চেঁচিয়ে একটা কাক বলেছিল, কী বোকা! কী বোকা! হাঁস আর কোকিলের মতো সেরা পাখি থাকতে প্যাঁচাকে রাজা করা হবে কেন?

এইটুকু বলেই বুদ্ধিমান সেই কাক চলে গেছিল মজাদার একটা গল্পে ...

মস্ত এক দীঘি ছিল। সেই দীঘির নাম চন্দ্রসর। তীরে থাকত অনেক খরগোশ।

একদিন দেশের ছোটো ছোটো সরোবরগুলো শুকিয়ে গেল বৃষ্টি না হওয়ায়। চন্দ্রসর শুকোলো না, বড়ো দীঘি বলে।

এক হাতি সন্ধান পেল চন্দ্রসর দীঘির। সে এল, জল তোলপাড় করল, তীরের বহু খরগোশকে পায়ে পিষে মেরে রেখে গেল।

মহাবিপদ দেখে বললে এক খরগোশ—এতবড়ো দীঘির সন্ধান যখন পেয়েছে গুণ্ডা হাতি, সে আবার আসবে। পালে পালে আমরা মরবো তার পায়ের তলায়। বন্ধুগণ, কী করে তার আসা বন্ধ করা যায়?

হাতির গায়ে বেশি জোর। খরগোশের গায়ে তত জোর নেই। কিন্তু বুদ্ধি ছিল এক খরগোশের মাথায়। সে উঠে গেল এক পাহাড়ের চুড়োয়। সেখান থেকে হেঁকে হেঁকে বললে দাঁতালো হাতিকে, আমি চাঁদের দূত। তিনি তোমাকে বলতে বলেছেন, চন্দ্রসর দীঘি তাঁর দীঘি। চন্দ্র মানে চাঁদ। চাঁদের দীঘি। চাঁদের আর এক নাম শশাঙ্ক, শশকদের প্রভু বলে। দীঘির পাড়ে তাই অত শশক থাকে। শশাঙ্ক তাদের দেখাশুনো করেন। তুমি এসে চাঁদের দীঘি তোলপাড় করে তাঁর অনেক শশক-প্রজাকে মেরেছ। তিনি রেগেছেন। ওই দ্যাখো, দীঘির জল থেকে তিনি তোমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছেন।

হাতি দেখল, দীঘিতে পড়েছে চাঁদের ছায়া। হস্তিবুদ্ধি দিয়ে মনে করে নিল, খোদ চন্দ্র দীঘিতে নেমেছেন। ভয়ের চোটে বললে, না, না, আমি আর শশাঙ্কর প্রজা শশকদের বিনষ্ট করব না, ওই দীঘির ছায়া মাড়াবো না।

স্রেফ চালাকি দিয়ে কাজ উদ্ধার হয়ে গেল। প্রকাণ্ড দীঘির পাড়ে পরমানন্দে রয়ে গেল শশকবৃন্দ।

বুদ্ধিমান কাক চাতুরি দিয়ে কাজ উদ্ধারের গল্পটা শুনিয়ে দিয়ে বললে, কাজ হাসিল করতে হবে এইভাবেই। বুদ্ধির প্যাঁচ মেরে, শক্তি দিয়ে নয়। প্যাঁচা দিনে অন্ধ, তার ওপর এইটুকু শরীর। খুদে প্রাণীদের

অনেকেই বিশ্বাস করে না। সুতরাং প্যাঁচা কখনও পাখিদের রাজা হতে পারে না। শোনাই তাহলে একটা গল্প, এই বিষয় নিয়ে।

একসময়ে আমি বাসা করেছিলাম একটা গাছে। আমার বাসার ঠিক নীচেই থাকত কপিঞ্জল নামে একটা পাখি। সে কখনও বাসায় থাকত, কখনও উড়ে উড়ে দূরে চলে যেত, বাসা খালি পড়ে থাকত।

এই রকম একসময়ে, যখন সে বাসা ফাঁকা ফেলে নিরুদ্দেশ, একটা খরগোশ এসে গ্যাঁট হয়ে বসে গেল তার শূন্য বাসায়।

অনেকদিন পরে ফিরে এল কপিঞ্জল। খরগোশকে দেখে রেগে লাল হয়ে বললে, দূর হ!

শুরু হয়ে গেল বিবাদ, খরগোশের সঙ্গে কপিঞ্জল পাখির।

ঝগড়া যখন তুঙ্গে, নিষ্পত্তি হচ্ছে না কিছুতেই, তখন দুজনে গেল এক বিড়াল, তপস্বীর কাছে, মধ্যস্থতার জন্যে।

বিড়াল অতি ধুরন্ধর। সে কপট সাধু সেজে বসেছিল দীঘির পাড়ে। পাখি আর খরগোশ, দুটোই তো তার খাদ্য। দুই খাদ্য তার কাছে আসছে দেখে বসে রইল চোখ মিটমিট করে, যেন গভীর তপস্যায় মগ্ন।

দেখে খুব ভক্তি হয়েছিল খরগোশ আর কপিঞ্জল পাখির। দুজনেই হাউমাউ করে বললে, দুজনের ঝগড়ার কথা। বিড়াল সব শুনেও না শোনার ভান করে বললে, বুড়ো হয়েছি, কানে শুনি কম। কাছে এসে বলো বাছাধন।

দুজনেই এল কাছে। বেড়াল খেয়ে নিল দুজনকেই।

বুদ্ধিমান কাক গল্প শেষ করে বললে, এই জন্যেই বলি, বদমাসকে কখনও বিশ্বাস করা যায় না। এই যে প্যাঁচা, এটাও একের নম্বরের বদমাস। একে রাজা করা যায় না।

শুনে, কাকেরা সরে পড়ল যে যার বাসায়। রেগে আগুন হয়ে প্রস্থান করল প্যাঁচাও। কটুকথার ফলে সেই থেকে শক্রতা

জন্মে গেছে কাক আর প্যাঁচা-য়।

এক কাক তখন বললে, তাহলে আমি একটা গল্প শোনাই। শুনলেই বোঝা যাবে, গায়ে যাদের জোর বেশি, তাদেরকেও জয় করা যায়, কিন্তু কুমতি প্যাঁচাদের আয়ত্তে আনা যায় না কক্ষনো। তবে হ্যাঁ, জোট বেঁধে তাকেও কুপোকাৎ করা যায়।

ছাগল কাঁধে নিয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক ব্রাহ্মণ। নধর ছাগল। দেখে লোভ হয়েছিল জনাকয়েক ধড়িবাজের।

একজন আগে এল ব্রাহ্মণের পাশে। বললে, ছিঃ ছিঃ! আপনি সৎ ব্রাহ্মণ, একটা কুকুর কাঁধে নিয়ে যাচ্ছেন! ফেলে দিন, ফেলে দিন!

কথায় কান না দিয়ে ব্রাহ্মণ মহাশয় কুকুর কাঁধে আরও কিছুদূর যেতেই এবার এল দুজন ধড়িবাজ। বললে, কী আশ্চর্য! আপনি ব্রাহ্মণ, কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছেন একটা নোংরা কুকুর! ফেলে দিন, ফেলে দিন!

ব্রাহ্মণ তাদের কথাতেও যখন কান দিল না, তখন এল তিনজন ধড়িবাজ, পৈতে যে অশুদ্ধ হয়ে গেল! নোংরা কুকুর আর পৈতে, ছি! ছি! ছিঃ! তুমি ব্রাহ্মণ না কচু, নিশ্চয় ব্যাধ, পৈতে ঝুলিয়ে চলেছ! কুকুর লেলিয়ে হরিণ মার, তাই কুকুরের এত আদর। এক্কেবারে কাঁধে চড়িয়েছি!

ধোঁকায় পড়ে গেল ব্রাহ্মণ। মনে মনে ভাবলে, নিশ্চয় চোখের দোষ হয়েছে। ছাগল মনে করে কুকুর কাঁধে নিয়ে চলেছি। এত জনে বলে গেল, সব্বাই কি মিথ্যে বলছে? দূর ছাই ....

বলে, ছাগলকে কুকুর জ্ঞান করে রাস্তায় ফেলে দিল। নদীতে স্নান করে শুদ্ধ হল। বাড়ি চলে গেল।

ধড়িবাজের দল হাসতে হাসতে ছাগল নিয়ে বাড়ি গিয়ে কেটে খেয়ে ফেলল।

গল্প শেষ করে বললে সেই কাক, তাই তো বলি; বদমাস যদি শক্তিশালী হয়। তাহলে তাকে কৌশলে ঘায়েল করতে হয়। আমার ওপর ভার দেওয়া হোক। বুদ্ধির প্যাঁচ কষে আমি যা করবার করবো।

কাকের দল রাজি হয়ে গেল। বুদ্ধিমান কাককে একা রেখে গাছ ফাঁকা করে দিয়ে তারা অন্য জায়গায় উড়ে গেল।

গভীর রাতে এল রাতজাগা প্যাঁচা। দলবল নিয়ে। তারা অন্ধকারেও দেখতে পায়। কিন্তু গোটা গাছে একটা কাকও দেখতে পেল না। শুধু একটা কাক যেন ধুঁকছে গাছের তলায়।

প্যাঁচা কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল সেই কাককে, কে হে তুমি? তোমার স্যাঙাতগুলো গেল কোথায়?

ইচ্ছে করে চিঁ-চিঁ গলায় কাক বললে, আমাকে ফেলে পালিয়েছে। আমি যে ভালো কথা বলেছিলাম। শক্তিমানের সঙ্গে লড়তে নেই বলেছিলাম। তাই রেগেমেগে আমাকে ফেলে গেছে, যাতে আমি যাই আপনার পেটে। ওরা লড়বে আপনার সঙ্গে।

শুনে প্যাঁচারা বললে, তাইতো! তাইতো! শত্রুপক্ষ যদি বিশ্বাসঘাতককে ফেলে রেখে যায়, সে তো আমাদের বন্ধু।

প্যাঁচারাজের মন্ত্রীর নাম দীপ্তনয়ন। সে বললে, ঠিক! ঠিক! ঠিক! উপকারী শত্রুকে বন্ধু করে নিতে হয়, সাজা দিতে নেই। এই প্রসঙ্গে শোনাই একটা গল্প।

বুড়ো বয়েসে বিয়ের সখ হয়েছিল এক বণিকের। টাকার জোরে বউ এনেছিল এমন একজনকে, যার বয়স খুবই কম।

এত বয়সের ফারাক থাকলে যা হয়, তাই হয়েছিল। ফুলশয্যার দিন সুখ নেয়নি যুবতী বউ। উপোসি রইল প্রতি রাতে।

তারপরেই একদিন চোর ঢুকল ঘরে। ভয়েময়ে জাপটে রাখল বুড়োকে। ধরল বড়ো বরকে।

সে বড়ো সুখ। বুড়ো বণিক চোরকে বললে, অনেক উপকার করলে আমার। যাও, বাড়ি যাও, লোক ডেকে পেটাব না।

চোর গেল, কিন্তু বউ পেল বুড়ো বণিক। প্রতি রাতে।

দীপ্তনয়ন প্যাঁচা ছোট্ট গল্প শেষ করে বললে, ঠিক সেইভাবে এই কাক এখন থেকে আমাদের বন্ধু। শুনে, আর এক প্যাঁচা, তার নাম বেঁকানাখ, বললে, এই কাক ধার্মিক। একে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে আমারও একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

এক ব্রাহ্মণ পেয়েছিল দুটো গোরু, দান হিসেবে। দেখে লোভ হয়েছিল এক চোরের, যে ভাবেই হোক চুরি করতে হবে দুই গোরুকে।

জিভে জল ঝরছিল এক রাক্ষসেরও। তার ইচ্ছে নধর ব্রাহ্মণকে খাওয়ার।

দুজনেই দু-রকম মতলব নিয়ে যখন যাচ্ছে ব্রাহ্মণের বাড়ির দিকে, মুখোমুখি হল রাস্তায়। বিনিময় ঘটল দুজনের দুরকম ইচ্ছের!

তখন চোর বললে, আগে আমি গোরু দুটো চুরি করে নিই, তারপর তুমি খেও ব্রাহ্মণকে। কেননা, ব্রাহ্মণকে যেই তুমি ধরবে খাওয়ার জন্যে, তক্ষুনি তার ঘুম ভেঙে যাবে, তাহলে আর তার গোরু চুরি করা আমার দ্বারা হবে না।

রাক্ষস বললে, তাই কী হয়? তুমি যেই গোরু চুরি করবে, গোরুর খুরের আওয়াজে ব্রাহ্মণের ঘুম ভেঙে যাবে। তাকে আর খাওয়া হবে না।

লেগে গেল ঝগড়া, চোরে আর রাক্ষসে।

চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেছিল ব্রাহ্মণের। সে কৃপাণ নিয়ে 'রক্ষা করো' মন্ত্র জপ করতে করতে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। চম্পট দিয়েছিল চোর আর রাক্ষস।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, চোরে-রাক্ষসের ঝগড়া মঙ্গল করেছিল গৃহস্বামীর। ঠিক তেমনি, কাকেদের শত্রু এই কাক এখন থেকে আমাদের মিত্র।

আর এক প্যাঁচা, তার নাম চওড়া-কান, সে বললে, কথাটা ঠিক। শরণাগতকে রক্ষে করার জন্যে শিবি রাজা নিজের মাংস কেটে দান করেছিল।

নিষ্ঠুরচক্ষু যে প্যাঁচার নাম, সে-ও রাজি হয়ে গেল শরণাগতকে বন্ধু করে নেওয়ার প্রস্তাবে। লালচক্ষু প্যাঁচা বললে, এই যে এরা এত বুদ্ধি দিয়ে গেল, এরা সব পেচক-মূর্খ। নীতিশাস্ত্র জানে না। এদের কথা শুনলে বিপদ অনিবার্য। এরা তোষামোদ করতে জানে, জ্ঞান দিতে জানে না। তাহলে শোনাই একটা গল্প।

এক ছুতোর বড়ো ভালোবাসতো তার বউকে। কিন্তু বউ ছিল ব্যাভিচারিণী। স্বামীকে সোহাগে রেখে লুকিয়ে লুকিয়ে উপপতি নিয়ে মজা মেরে যেত। সব্বাই তা জানতো। স্বামীকে তা বলাও হয়েছিল। কিন্তু স্ত্রীর ছলনায় মুগ্ধ ছুতোর তা বিশ্বাস করেনি।

স্ত্রীর নিন্দে শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে যেতে একদিন ঠিক করল, সতীর সতীত্ব পরীক্ষা করবে।

বউকে বললে, প্রিয়তমা, রাজার কাজ নিয়ে দূর দেশে যাচ্ছি। তুমি আমাকে একটু ছাতু দাও।

তাই দিল কুলটা ছলনাময়ী। মনে মনে ঠিক করে নিল, আজ রাতেই উদ্দাম কামক্রিয়া চালাবে নিজের ঘরেই।

জানতেও পারল না, স্বামীরত্ন লুকিয়ে পড়েছে খাটের তলায়, সঙ্গে এক বন্ধুকে নিয়ে।

উপপতিকে নিয়ে ঘরে ঢুকে ছুতোরের বউ শুয়ে পড়ল সেই খাটে। তারপর শুরু হয়ে গেল ঘাট মচমচিয়ে রতিক্রিয়া, সেই সময়ে ছুতোরের বউয়ের পা ঝুলে পড়েছিল খাট থেকে, সেই পা ঠেকে গেছিল ছুতোরের পিঠে। তৎক্ষণাৎ ধুরন্ধর বউ বুঝে ফেলেছিল, স্বামী লুকিয়ে আছে খাটের তলায়।

সুতরাং সিঁটিয়ে গেছিল একটু। হাজার হোক মেয়েমানুষ তো।

বোকা ছুতোর তখন লম্ফ দিয়ে বাইরে এসে উদগ্রীব হয়ে বললে বউকে, হ্যাঁ গো, কাকে তোমার বেশি ভালো লাগে? আমাকে, না, এই লোকটাকে?

মওকা বুঝে অমনি ছেনালি গলায় বললে কুলটা কামিনী, তোমাকে! তোমাকে! তোমাকে!

রমণী এমনই প্রাণী। কপট হওয়ার প্রবণতা রয়েছে প্রতিটি শোণিত বিন্দুতে।

গলে গেল ছুতোর, বন্ধুকে টেনে বের করল খাটের তলা থেকে। বললে বিষম উল্লাসে, শুনলে তো? একেই বলে সাধ্বী স্ত্রী, তার কাছে পতি পরম গুরু। উপপতির চাইতেও! এমন মেয়ে যখন আমাকে বশ করেছে, তখন সে মাথায় থাকুক।

এই বলেই, খাটশুদ্ধ কুলটা আর তার উপপতিকে মাথায় তুলে ধেই ধেই নাচ জুড়ে দিল ঘরময়।

দেশের লোক হেসে কুটিপাটি হয়েছিল মাথামোটার কাণ্ড শুনে।

কাহিনি শেষ করে নিষ্ঠুরচক্ষু প্যাঁচা বললে, এই জন্যেই বলছি, বউয়ের উপপতি যেমন মনেপ্রাণে উপপতিই থাকে, প্যাঁচার চিরশত্রু কাকও তেমনি ধরা দিয়েও চিরকাল শত্রুই থাকবে। এ হচ্ছে আকাশের মেঘেরমতো। ধরা দেয় না, কিন্তু মাথায় জল ঢেলে দিয়ে যায়, গাছপালা উপড়ে ফেলে। আমাদেরকেও শেষ করে দেবে।

সর্দার প্যাঁচা সব শুনে বললে, ধুস! আমাদের মঙ্গল করতে গিয়েই এই বেচারি বিপাকে পড়েছে। এর মঙ্গল তো আমাদেরকেই করতে হবে। ও একা, আমরা অনেক। ইচ্ছে করলেও আমাদের সর্বনাশ করবে কী করে?

সাহসী কাকটার নাম চিরজীবী। প্যাঁচাদের শলাপরামর্শ শোনবার পর সে বললে রাজা প্যাঁচাকে—বিপাকে যখন পড়েছি, তখন আমার মরণ হওয়াই ভালো। দয়া করে একটা চিতা বানিয়ে দিন, আগুনে পুড়ে মরবো। মরবার সময়ে অগ্নিদেবতার কাছে একটাই বর চাইব। সামনের জন্মে যেন প্যাঁচা হয়ে জন্মাই, প্যাঁচা রাজার সেবা করতে পারি।

রক্তচক্ষু প্যাঁচা হো-হো করে হেসে বললে, খামোকা আগুনে পুড়ে মরতে যাবে কেন? আমরা তো তোমাকে চাঙা করে দিয়েছি। যতদিন কাক থাকবে, ততদিন বেড়ে থাকবে, ভগবান যাকে যেভাবে গড়েছেন,

সেইভাবেই সে ভালো থাকে। মূল বৈশিষ্ট্য কক্ষনো পালটায় না। শোনো একটা গল্প।

সেকালের কথা। এক সাধু বসেছিলেন গাছতলায়। ডাল থেকে খসে পড়ল একটা ইঁদুর-মেয়ে, তাঁর সামনে। দেখে সাধুর মন গলে গেল। অলৌকিক শক্তি খাটিয়ে ইঁদুরের মেয়েকে পরমাসুন্দরী মানুষের মেয়ে করে দিলেন। মুনির আশ্রমেই রইল সেই মেয়ে। বড় হল। এমন মেয়ের বর হওয়া উচিত শক্তিমান কোনও পুরুষ। সূর্যদেবের চাইতে শক্তিমান আর কে হতে পারে?

মুনির ডাকে সূর্য নেমে এলেন আকাশ থেকে।। মুনির কথা শুনলেন। অপরূপা কন্যাকে বউ করতে হবে। কারণ, সূর্যর চাইতে শক্তিমান আর কে আছে?

সূর্য বললেন, মেঘ আমার চেয়ে শক্তিমান। চক্ষের নিমেষে আমাকে ঢেকে দেয়।

মেঘকে ডাকা হল। সে বললে, বাতাস আমার চেয়ে শক্তিমান। চক্ষের নিমেষে আমাকে টুকরো টুকরো করে ছিটকে ছিটকে ফেলে দেয়।

বাতাসকে ডাকা হল। সে বলে, পাহাড় আমার চেয়ে শক্তিমান। সে আমাকে আটকে দেয়।

পাহাড়কে ডাকা হল। সে বললে, ইঁদুর আমার চেয়ে শক্তিমান। আমার গায়ে ফুটো বানায়।

ইঁদুরকে ডাকা হল। সে বললে, এ মেয়ে ফুটোয় ঢুকবে কি করে?

মুনি তখন সুন্দরী মেয়েটাকে ফের ইঁদুর বানিয়ে দিলেন।

ইঁদুরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

গল্প শেষ করে রক্তচক্ষু প্যাঁচা বললে, ওহে কাক, এই জন্যেই বললাম, তুমি হাজার চেষ্টা করলেও কক্ষনো প্যাঁচা হতে পারবে না।

চিরজীবী কাক ভাবনাচিন্তা করে অন্য মতলব ঠিক করে নিল। প্যাঁচারাজ রক্তচক্ষু মন্ত্রীর কথা শুনে চিরজীবীকে নিজের জায়গায় নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দাইয়ে গায়ে গতরে বেশ মোটা করে দেওয়ার পর চিরজীবী বললে প্যাঁচারাজকে, এবার যাই, কাকরাজাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ডেকে আনি। আপনারা বাসায় লুকিয়ে থাকবেন। খুব ভয় পেয়েছেন, এই রকম ভাব দেখিয়ে বাসায় ঢোকবার মুখ শুকনো পাতা দিয়ে ঢেকে রাখবেন। সে এলেই আমার ডাক শুনে বেরিয়ে এসে তাকে খতম করবেন। চিরশত্রু বধ হয়ে যাবে।

তাই করেছিল প্যাঁচারাজা। চিরজীবী উড়ে গিয়ে ডেকে নিয়ে এল কাকরাজাকে। জ্বলন্ত চিতা থেকে আগুন আনল ঠোঁটে করে। আগুন লাগিয়ে দিল প্যাঁচাদের বাসায়। নিপাত হয়ে গেল চিরশত্রু, সবংশে।

খুশি মনে কাকরাজা বললে মেঘবর্ণকেসাপ যেভাবে ব্যাঙ মেরেছিল দলবলসমেত ছলনা করে, আমরাও সেইভাবে মারলাম প্যাঁচাদের।

কিন্তু ব্যাঙ বধের কাহিনীটা কী?

এই সেই গল্প...

অনেক আগের গল্প। বুড়ো হয়েছিল এক সাপ। শিকার ধরে খাওয়ার শক্তি চলে গেছিল। দীঘির পাড়ে নড়াচড়া না করে শুয়ে থাকত দিবারাত্র।

দূর থেকে সেই দৃশ্য রোজ দেখত ব্যাঙেরা। একী রকম সাপ? নড়ে না। ব্যাঙ ধরে খাওয়া তো দূরের কথা, ব্যাঙের পেছনে ধেয়েও যায় না। ব্যাপারটা কী?

দূর থেকে সেই কথাই অনড় সাপকে জিজ্ঞেস করেছিল ব্যাঙের দল।

এই সুযোগের প্রতীক্ষা করে যাচ্ছিল অনড় সাপ। এখন ইনিয়ে বিনিয়ে বললে, অভিশাপের ফল গো, অভিশাপের ফল। অনেক দিন আগে আমি তাড়া করেছিলাম একদল ব্যাঙকে। সামনে পড়েছিল এক ব্রাহ্মণের ছেলে। ভুল করে ছোবল মেরে দিয়েছিলাম তাকেই। মারা যায় সে তৎক্ষণাৎ। ভীষণ রেগে আমাকে অভিশাপ দিয়েছিল তার বাবা, বিনা দোষে প্রাণে মারলি আমার ছেলেকে ব্যাঙদের তাড়া করতে গিয়ে। ব্যাঙদের বাহন হয়ে থাকবি বাকি জীবন। সেই থেকে আমার ব্যাঙ-খিদে চলে গেছে। ব্যাঙ-বাহন হওয়ার জন্যে পড়ে আছি।

শুনে মহাখুশি হয়ে ব্যাঙরাজা বললে, তাই নাকি? তাই নাকি? আজ থেকে আমার বাহন হয়ে যাও তুমি।

বুড়ো সাপের পিঠে চেপে বেশ কিছুদিন পরমানন্দে বেড়িয়ে নিল ব্যাঙরাজা।

তারপর ধড়িবাজ সাপ বললে মিন মিন করে, আর তো বইতে পারছি না! কতদিন খাইনি। কিছু খেতে দেবে? কাহিল হয়ে গেছি যে!

সেকি কথা! বাহনের পেটে খিদে রাখলে তো চলবে না! এখুনি তাকে খাওয়ানো দরকার।

বললে ব্যাঙরাজা, আমার এত ব্যাঙ-প্রজা! যাকে পছন্দ, তাকে খাও। খিদে পেলেই খাবে। তারপর আমাকে পিঠে নিয়ে ঘুরবে।

সেই থেকে সেই ব্যবস্থাই বহাল হয়ে গেল। রাজার হুকুমে প্রজারা রোজ একজন করে গেল সাপের পেটে। শক্তিমান বুড়ো সাপের পিঠে বসে হাওয়া খেয়ে গেল ব্যাঙরাজা।

এই রকমই হয়। রাজা যদি বোকা হয়, প্রজাদের প্রাণ যায়। রাজ্য থেকে লক্ষ্মী চলে যায়, তিনি যে বড়ো চঞ্চলা, কোথাও গ্যাঁট হয়ে বসে থাকতে পারেন না।

গল্প শেষ করে বললে ধূর্ত চিরজীবী কাক, প্যাঁচারাজ বিষম বোকা বলেই পুড়ে মরল। বুদ্ধিই আসল শক্তি, গায়ের জোর নয়।

বন্ধু গোমুখ বললে যুবরাজ নরবাহনদত্তকে, এইভাবেই হীন জাতিও রাজা হয়ে থাকতে পারে, স্রেফ বুদ্ধির জোরে। তখন, জ্ঞানবুদ্ধির অভাবে রাজাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ সহ্য করে যেতে হয়। উদাহরণ দিচ্ছি আরও কয়েকটা গল্প শুনিয়ে।

এক বড়োলোকের ছিল এক বোকা চাকর। সে গা টিপতে জানত না, কিন্তু 'জানি' বলে ভান করে যেত। আনাড়ি যদি গা টেপে, তাহলে অবস্থা তো কাহিল হবেই। রেগেমেগে মালিক তাকে দূর করে দিল বাড়ি থেকে। গা গতর টাটিয়ে গেছিল যে!

অবন্তী দেশে এক ব্রাহ্মণের ছিল দুই ছেলে। ব্রাহ্মণ মারা গেলে সম্পত্তি ভাগ করা নিয়ে ঝগড়া লাগল দুই ভাইয়ের মধ্যে। একজন মাতব্বর মধ্যস্থ হয়ে পরামর্শ দিল চুলচেরা দু-ভাগ করার। অর্থাৎ সব কিছুই হোক অর্ধেক অর্ধেক। সেইভাবেই দু-ভাগ করা হল বাড়িকে, বিছানাকে, ঘটিবাটি থেকে আরম্ভ করে সবকিছুকে, এমনকি কেটে দু-টুকরো করে নেওয়া হল ঘরে পোষা জন্তুজানোয়ারকেও, বাকি রইল এক চাকরানি, তাকেও চিরে দু-ভাগ করে ভাগাভাগি করে নিল দুই মূর্খ ভাই।

মূর্খ তো সেই দুই ভাই নয়, মধ্যস্থতা যে করেলি, সেই লোকটাও। রাজার কানে এহেন আজব ভাগাভাগির বৃত্তান্ত যেতেই তিনি ভয়ানক শাস্তি দিলেন তিনজনকেই।

এ থেকেই শেখা যায় একটা মূল্যবান নীতি। মূর্খের কথায় কান দিতে নেই। মূর্খের কথায় সিদ্ধান্ত নিতে নেই। গুণিজনের উপদেশ শুনে চলাই শ্রেয়।

যা পাওয়া যায়, তাতেই যে সন্তুষ্ট, সে-ই প্রকৃত সুখী আর সুস্থদেহী।

যেমন ছিল কয়েকজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। ভিক্ষে করে যা পেত, তৃপ্তি করে খেত। শরীর স্বাস্থ্য ছিল চমৎকার, দেখে লোকের ঈর্ষা হত।

একদিন এই প্রসঙ্গ আলোচনা হচ্ছিল কয়েকজন বন্ধুর মধ্যে। যা-পাওয়া-যাচ্ছে তাই খেয়ে এরা এত নধরকান্তি হয় কী করে?

রগড় করার জন্যে ফিচেল, বুদ্ধি এক ছোকরা বললে, তাহলে দেখো কীভাবে এদের রোগা প্যাঁকাটি বানাতে হয়।

এই বলে এক-একজন ভিক্ষুক-সন্ন্যাসীকে রোজ বাড়ি নিয়ে চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খাইয়ে ছেড়ে দিতে লাগল। রোজ ভালো ভালো খেতে পেয়ে ভালো খাওয়াতেই যখন তাদের অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেল, তখন সেই ফিচেল ছোকরা হঠাৎ একদিন তাদের খাওয়ানো বন্ধ করে দিল।

আবার শুরু হল ভিক্ষে করে পেট ভরানো। কিন্তু সেই তৃপ্তি তো নেই, আগে যা ছিল। অল্পে সন্তুষ্ট মনোবৃত্তি ছিল বলেই শরীর হয়েছিল নধরকান্তি, ভিক্ষের খাবারে রুচি চলে গেছিল ভালো ভালো খাবার খেয়ে।

ফলে, দিনে দিনে শুকিয়ে গিয়ে রোগা প্যাঁকাটি হয়ে গেল অল্পে অসন্তুষ্ট সন্ন্যাসীরা!

সরোবরে জল খেতে গেছিল এক যুবক। সেখানে দেখেছিল এক ভারি সুন্দর সোনালি পাখি। তার পুরো গা সোনা-সোনা রঙের, কিন্তু সোনা অবশ্যই নয়।

বোকাবকের কিন্তু তাক লেগে গেছিল সোনা রং দেখে। মনে করেছিল, আগাগোড়া খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি সেই আশ্চর্য পাখি। সুতরাং তাকে পাকড়াও করা দরকার। শুরু হল পাখির পেছনে ধাওয়া। পাখি উড়ে উড়ে চলে গেল বহুদূরে। তারপর চলে গেল চোখের আড়ালে। সোনালোভী বোকা ছেলেটার মন ভেঙে গেল। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে ফিরিয়ে আনা হল বাড়িতে।

মূর্খ ব্যক্তির দুর্দশা হয় এই রকমই। নিজে কষ্ট পায়, লোকে হেসে মরে।

এবার হোক আর এক রকম মহামূর্খদের গল্প।

তারা ছিল এক বণিকের চাকর। উটের পিঠে বাক্স বোঝাই দামি দামি কাপড়চোপড় নিয়ে বাণিজ্য করতে বেরিয়েছিল বণিক। বোঝা অনেক। একটু গিয়েই ছেদিয়ে পড়েছিল উট। বণিক বললে চাকরদের, আর একটা উট আনতে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে যদি বৃষ্টি আসে, তোমরা দেখবে যাতে বাক্সের মধ্যে জল না ঢোকে। চামড়ার বাক্স যেন ভিজে না যায়।

বণিক চলে যেতেই নামল তুমুল বৃষ্টি। বণিকের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেল চাকরেরা। বণিক বলেছিল, যাতে বাক্সের মধ্যে জল না ঢোকে, বাক্সের চামড়া যেন ভিজে না যায়, সেই রকম ব্যবস্থা যেন করা হয়। সুতরাং তারা বাক্স খুলে কাপড়চোপড় বের করে, তাই দিয়ে বাক্স মুড়ে রাখল, যাতে বাক্সের মধ্যে জল না ঢোকে। বাক্সের চামড়া যেন ভিজে না যায়।

একেই বলে অক্ষরে অক্ষরে হুকুম মেনে চলা।

কিন্তু বুদ্ধি না খাটানোর ফলে জলে ভিজে বরবাদ হয়ে গেল দামি দামি কাপড়গুলো।

বণিক ফিরে এসে সেই অবস্থা দেখে রেগে আগুন হয়ে দূর করে দিল মহামূর্খ ভৃত্যদের।

ধার করে আটটা পিঠে কিনেছিল এক রামবোকা। ছ-টা খেয়ে পেট ভরেনি। সপ্তম পিঠে পেটে যেতেই এমন আইঢাই অবস্থা দাঁড়াল, অষ্টম পিঠেটা আর খাওয়া গেল না। মনের দুঃখে সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে গেল, কী বোকা, কী বোকা আমি! সপ্তম পিঠেটা সবার আগে খেলাম না কেন, তাহলেই তো পেট দমসম হয়ে যেত, এতগুলো পিঠে বেঁচে যেত?

আশপাশের লোক হেসে গড়িয়ে পড়েছিল বোকার আক্ষেপ শুনে।

এক দোকানদারের ছিল এক বিশ্বাসী কিন্তু বুদ্ধির ঢেঁকি চাকর। দোকানেই থাকত দোকানদার। একদিন তারবাড়ি যাওয়ার দরকার হল। যাবার সময়ে বলে গেল বোকা চাকরকে, দোকানের দরজাটা সব সময়ে চোখে চোখে রাখবি।

দরজাকে চোখে চোখেই রেখে গেল চাকর, আক্ষরিক অর্থে। একদিন ইচ্ছে হল নাচের আসরে যাবে। দরজাকে চোখে চোখে রাখা যায় কী করে?

খুব সহজে। পুরো দরজাটা খুলে নিয়ে ঘাড়ে করে নাচের আসরে চলে গেল রামবোকা চাকর। চোখেচোখে রইল দরজা, সেই সঙ্গে চলল নাচ দেখা।

বাড়ির কাজ শেষ করে যখন দোকানে ফিরছে দোকানদার, দেখল কপাট কাঁধে করে নাচের আসর থেকে ফিরছে চাকর!

মালিক তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেই সপেটা বললে চাকর, কী আশ্চর্য! বকছেন কেন? কপাটকে চোখে চোখে রাখতে বলেছিলেন, চোখে চোখেই তো রেখেছি!

এই গেল একধরনের বোকা যারা কথার আসল মানে ধরতে পারে না। ঝামেলা পাকায়।

এবার শোনাই এক মিথ্যুক বোকার কাহিনি।

রাজার কাছে এসে নালিশ করল মোষের খাটালের এক মালিক। গ্রামের লোকেরা নাকি তার খাটাল থেকে একটা মোষ চুরি করে খেয়ে নিয়েছে।

গ্রামবাসীদের তলব করা হল রাজসভায়। মোষের মালিক তাদের সামনে বললে, মহারাজ, পুকুর পাড়ে বটগাছের তলায় এই এরা আমার মোষকে মেরেছে, তারপর খেয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে বললে এক বোকা চালাক বুড়ো, তা কী করে হয়? আমাদের গ্রামে পুকুর নেই, বটগাছও নেই।

মোষের মালিক বললে, আছে বইকি। গ্রামের পুবদিকে আছে পুকুর আর বটগাছ। অষ্টমী তিথিতে সেখানে মেরেছ আমার মোষ।

বুড়ো মিথ্যুক সটান বলে দিল, মহারাজ, আমাদের গ্রামে পূবদিক নেই, অষ্টমী তিথিও নেই!

মজা পেলেন রাজা। উৎসাহ দিলেন বোকা বুড়োকে, খাঁটি কথা বলেছ। সত্যি ছাড়া মিথ্যে তোমার মুখ দিয়ে বেরোয় না। এবার বলো তো বাপু, সত্যিই সেই মোষটাকে মেরে পেটে পুরেছ কীনা।

সোৎসাহে বললে বুড়ো, ঠিক ধরেছেন। জীবনে মিথ্যে বলিনি আমি। কেন বলব? আমি যে জন্মেছি আমার বাবা মারা যাওয়ার তিন বছর পর! অর্থাৎ, সে অবৈধ সন্তান!

অতিকষ্টে হাসি চেপে রাজা বললেন, মোষটা? গেল কোথায়?

বুড়ো বললে, আমাদের পেটে। এইটাই শুধু সত্যি, বাকি সব মিথ্যে!

হেসে গড়িয়ে পড়ল রাজসভার প্রত্যেকেই।

বিচার হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। মোষের মালিককে দেওয়া হল একটা মোষ। মোষচোরেরা পেল শাস্তি।

বোকা চালাকরা এই ভুলই করে। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেয় গুপ্ত বিষয়ের, আর সবার জানা বিষয়কে গুপ্তরাখে।

এবার বলি আর এক ধরনের বোকার গল্প। এই বোকা ছিল খুব গরিব। তার বউ ছিল ভয়ানক বদরাগী। একদিন রাগী বউ বললে বরকে, আজ আমার নেমন্তন্ন আছে। বিরাট উৎসব হবে সেখানে। আমি গলায় পড়ে যাব পদ্মের মালা। এনে দাও যেখান থেকে হোক। আনতে যদি না পারো, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক থাকবে না।

বোকা বর ভয়ের চোটে সন্ধ্যে হতেই পদ্মফুল চুরি করতে গেল রাজ দীঘিতে।

সজাগ শান্ত্রীরা তাকে দেখতে পেয়েছে, বুঝতে পেরেই অবিকল চকা পাখির মতো ডাক ডেকে গেল।

শান্ত্রীরা তাকে ক্যাঁক করে ধরে জিজ্ঞেস করল, কে হে তুমি?

বোকা বললে, দেখতেই তো পাচ্ছ। আমি এক চকা পাখি।

শান্ত্রীরা তাকে বেঁধে নিয়ে গেল রাজার কাছে।

সেখানেও সে অবিকল চকা পাখির ডাক ডেকে গেল, রাজাকে শুনিয়ে শুনিয়ে।

হেসে খুন রাজা তখন জিজ্ঞাসা বাদ করে তার পেট থেকে পের করলেন আসল ব্যাপার!

বেচারা! দীঘি থেকে পদ্ম আনিয়ে তাকে দিলেন বউকে খুশি রাখার জন্যে!

বোকা বদ্যির গল্প বলি।

এক ব্রাহ্মণ তাকে বলেছিল, আমার ছেলের পিঠের কুঁজ শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। যা চাও, তাই পাবে।

বদ্যি বললে, এখন দাও দশ পণ। যদি না পারি, তাহলে তোমাকে দেব একশো পণ।

তাই দিতে হয়েছিল। কুঁজ কি পিঠে ঢোকানো যায়? যা অসম্ভব, তাই নিয়ে বড়াই করলে এই দশাই হয়।

গল্পমালা শেষ হল। নরবাহনদত্ত খুব খুশি গোমুখের ওপর। শক্তিযশার চিন্তা মাথা থেকে পালিয়ে যাওয়ায় ঘুমটা হল ভালোই, বন্ধুদের সঙ্গে।

৬৩. শ্রীধর কাহিনি

কিন্তু পরের দিন ঘুম ভাঙতেই ফের মুষড়ে পড়ল নরবাহনদত্ত, প্রেম এমনই বস্তু, কুরে কুরে খায়। ফের সেই অনলসম চিন্তা, সক্তিযশা! শক্তিযশা! শক্তিযশা!

পিতৃদেব বৎসরাজের অগোচর নেই কিছুই। প্রতিদিনের সংবাদ তার কানে ঢেলে দিয়ে আসে যুবরাজ-সখা গোমুখ।

সকালের সংবাদ শুনে বৎসরাজ ঠিক করলেন, প্রেমজ্বরে আক্রান্ত ছেলের মনে কিঞ্চিৎ সুখ উৎপাদনের জন্যে নিজের মন্ত্রী বসন্তককে পাঠানো যাক।

কিন্তু রাজার মন্ত্রী তো গুরুদেব স্থানীয়। সুতরাং তার সামনে মুখে চাবি দিয়ে বসে রইল নরবাহনদত্ত।

ধড়িবাজ গোমুখ তা দেখল। ব্যাপারটা বুঝে নিল। বললে বসন্তককে, গল্প শোনান, গল্প।

গল্পই যেন সর্বরোগহর দাওয়াই!

শুরু হল রাজার মন্ত্রীর গল্প।

অবন্তীদেশে অনেক আগে থাকতেন এক ব্রাহ্মণ। তাঁর নাম শ্রীধর। তাঁর যমজ ছেলে হয়েছিল। বড়ো ছেলের নাম যশোধর, ছোটোর নাম লক্ষ্মীধর।

বড়ো হলে দুজনেই রওনা হল বিদেশ অভিমুখে, পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্যে।

পথে পড়ল একটা তেপান্তরের মাঠ। গরম বালিতে পা রাখা দায়। সন্ধ্যে নাগাদ পাওয়া গেল একটা গাছ। তাতে ফল ঝুলছে, কিন্তু পাতা নেই বললেই চলে। সুতরাং ছায়া না পড়ায় গাছতলার বালি তেতে আগুন। অবশ্য কাছেই রয়েছে একটা সরোবর। সেখানকার জল ঠাণ্ডা। ভাসছে পদ্ম।

দীঘির জলে স্নান সেরে, গাছের ফল খেয়ে দুই ভাই বসল একটা পাথরের ওপর।

সন্ধ্যা-বন্দনা শেষ করে উঠে গেল গাছের ডালে, জন্তুজানোয়ারের ভয়ে।

রাত একটু গভীর হতেই দেখা গেল এক আশ্চর্য দৃশ্য।

দীঘির জল থেকে উঠে এল বেশকিছু পুরুষ মানুষ। চাকরবাকর শ্রেণির পুরুষ। কেউ পরিষ্কার করে দিল গাছতালা, কেউ আঁকল আলপনা, কেউ সেই আলপনার ওপর ছড়িয়ে দিল লাল রঙের ফুল। চেহারা খুলে গেল জায়গাটার।

এইবার একজন নিয়ে এল একটা সোনার পালঙ্ক, রাখল ছড়ানো ফুলের ওপর। একজন বিছানা বালিশ চাদর দিয়ে সাজিয়ে দিল খাট। আর একজন তার ওপর ছড়িয়ে দিল ফুল, ছিটিয়ে দিল সুগন্ধি। রাখা হল নানারকম খাবার আর পানীয়।

অত্যাশ্চর্য কাণ্ডটা ঘটল তার পরেই।

দীঘির জল থেকে উঠে এল অসাধারণ সুন্দর পুরুষ। হাতে কৃপাণ নিয়ে। এসে বসল সোনার খাটে।

তৎক্ষণাৎ কাজের লোকেরা ঢুকে গেল সরোবরের জলে। অমনি ঢেকুর তুলল কৃপাণধারী অপূর্বসুন্দর সেই বীরপুরুষ। পর পর দুটো ঢেকুরের সঙ্গে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল পরমাসুন্দরী দুই রমণী।

দুই কামিনীই তার স্ত্রী। দ্বিতীয় ঢেকুরের সঙ্গে যার আবির্ভাব সে মেয়েটি বড়ো বুদ্ধিমতী আর চটপটে। স্বামী তাকে নিশ্চয় বেশি ভালোবাসে। ভালোবাসা এমনই জিনিস। ঢেকে রাখা যায় না। চোখেমুখে কিরণ ছড়ায়।

স্বামীদেবতার শ্রীমুখে যেন হাজার চাঁদের রোশনাই দেখা গেল।

তাই নিশুতি রাতেও সমস্ত দৃশ্য দেখে গেল গাছের ডালে বসা দুই ভাই, চক্ষুস্থির অবস্থায়।

বুদ্ধিমতী ছোটো বউ ঝটপট খাবার সাজিয়ে দিল স্বামী আর সপত্নীর সামনে। খানাপিনা শেষ হলে সুন্দর পুরুষ খাটে শুয়ে পড়ল ছোটো বউকে নিয়ে এবং বড়ো বউয়ের সামনেই সঙ্গম করে গেল ছোটো বউয়ের সঙ্গে রকমারি আসনে।

নির্বিকার বড়ো বউ পায়ের কাছে বসে দেখল কাম-জাগানো রতিক্রিয়া। ক্লান্ত স্বামী সতিনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়তেই স্বামীর পা টিপে গেল বড়ো বউ।

এরকম পতিভক্তি তো দেখা যায় না। দুই চক্ষু ছানাবড়া করে গাছের ডালে বসে সব দেখল দুই ভাই।

তারপর আর কৌতূহল চাপতে না পেরে গাছ থেকে নেমে এল বড়ো ভাই যশোধর।

তক্ষুনি স্বামীর পদসেবা ছেড়ে খাট থেকে নেমে এল বড়ো বউ। তার নিশ্বাসে তখন কামের হলকা, চোখে কামের স্ফুলিঙ্গ, স্খলিত বসনের এদিক সেদিক দিয়ে ঝলকিত হচ্ছে কামের জোয়ারে উচ্ছসিত দেহভঙ্গিমা। রূপসীদেহে এহেন রূপতরঙ্গ দেখলে কোনও পুরুষ স্থির থাকতে পারে না, মদনানন্দেই উপশম ঘটায় দুই শরীরের চাহিদার।

যশোধর কিন্তু সে ছেলেই নয়। সে বিবেকবান পুরুষ। তাই সংযত রাখল নিজেকে।

কিন্তু রাত্রি নিশীথে এই নারী যে সম্পূর্ণ নিলাজ। সে মদির চোখে যশোধরের দিকে তাকিয়ে ঘষা গলায় বললে, আমাকে সুখ দাও।

রেগে গেল যশোধর। চাপাগলায় ধমক দিল, কুলটা কোথাকার! ঘুমন্ত স্বামী-সতিনের সামনেই সহবাস করতে চাস পরপুরুষের সঙ্গে।

কটাক্ষ হেনে অসতী বড়োবউ বললে, ওগো, তুমিই প্রথম নও। তোমার আগেও একশো পুরুষ আমাকে নিংড়ে নিয়েছে, আমারই ইচ্ছায়। বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখো।

বলে, আঁচলের গিঁট খুলে দেখাল একশটা আংটি।

বললে, একশো পরপুরুষের আংটি। এক-একজনকে দিয়ে সহবাস করিয়েছি, চিহ্ন স্বরূপ তাদের আঙুলের আংটি খুলে নিয়েছি। তুমি হবে একশো এক নম্বর। এস, সঙ্গত হও। আমি যে আর পারছি না।

জিতেন্দ্রিয় যশোধর কিন্তু টলে গেল না। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে, একশো কেন, এক হাজার অথবা এক লক্ষ পরপুরুষও যদি তোমাকে লুটেপুটে কামসুখ নেওয়া-দেওয়া করে যায়, তাহলেও তুমি আমার কাছে মায়ের সমান।

কাম-জ্বলন্ত কামিনীর শরীরের আগুন না নেভালে সে তখন বাঘিনী হয়ে যায়। চক্ষের নিমেষে চেহারা পালটে গেল বড়ো বউয়ের। ধাক্কা মেরে ঘুম ভাঙাল স্বামীর। দুই চোখে গঙ্গা-যমুনা বইয়ে দিয়ে বললে, দ্যাখো, দ্যাখো, কত সুখে তোমার পা টিপছিলাম। এই লোকটা আমাকে খাট থেকে টেনে নামিয়ে ধর্ষণ করেছে। আমার ধর্মনষ্ট করেছে। এর প্রাণ নাও।

যশোধরের গলা দু-টুকরো হয়ে যেত তৎক্ষণাৎ। অগ্নিশর্মা স্বামীদেবতা কৃপাণ বাগিয়ে তার দিকে তেড়ে যেতেই রমণক্লান্ত ছোটো বউ স্বামীর পা জড়িয়ে ধরে বললে, অসতী তো তোমার এই বড়ো বউ। এর আগে একশো পরপুরুষকে দিয়ে শরীরের আগুন মিটিয়েছে। ঘুমের ভান করে আমি সব দেখেছি। প্রমাণ পাবে আঁচলে। একশোটা আংটি বাঁধা আছে। একশো অবৈধ সহবাসের চিহ্ন।

পাওয়া গেল একশোটা আংটি। হতভম্ব স্বামীদেবতা বললে, কিন্তু কখন? এত রমণ হয়েছে কখন?

ছোটো বউ বললে, তুমি যখন মড়ার মতো ঘুমোও, তখন। রোজ রাতে। আশপাশে পথিক পুরুষ দেখলেই তাকে দিয়ে সঙ্গম করায়। দাম নেয় একটা আংটি।

রেগে গেল কৃপাণধারী, আগে বলোনি কেন?

ছোটো বউ বললে, তাহলে তো সতিনকে ঈর্ষা করা হয়। তুমি তাকে সুখ দাওনা, সে সুখ জুটিয়ে নেয়। আজ না বললে তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান হত্যা করে পাপ করতে।

মুখ ঝামটা দিয়ে বড়ো বউ বললে, সব মিথ্যে!

প্রদীপ্ত নয়নে ছোটো বউ বললে, আমি যদি মিথ্যে বলি, তাহলে আমি সতী নই। আর আমি যদি সতী হই, তাহলে আমার চোখের আগুনে এই গাছ পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারি।

ব্যঙ্গের স্বরে বড়ো বউ বললে, ওঃ! অমন সতীপনা অনেক দেখেছি। তোর মতো ঢলানি...

ব্যাস! চোখ জ্বলে উঠল ছোটো বউয়ের। বিপদ আসন্ন বুঝে গাছ থেকে লাফিয়ে নেমে এসেছিল লক্ষ্মীধর, তাই প্রাণে বেঁচে গেল।

চক্ষের নিমেষে চোখের আগুন আতীব্র আকারে পুড়িয়ে ছাই করে দিল অতবড়ো গাছটা।
পরমুহূর্তেই চোখ থেকে সঞ্জীবনী রশ্মি ঠিকরে দিয়ে ছাইয়ের গাদা থেকে ফের ফিরিয়ে আনল গোটা গাছটাকে!
স্তিমিত চোখে স্নিগ্ধ স্বরে বললে ছোটা বউ, স্বামীই আমার দেবতা। সতীত্বই আমার শক্তি। দিলাম সেই প্রমাণ।
তারপর?
কুলটা বড়ো বউয়ের নাককান কাটা গেল কৃপাণের পর পর কোপে। লাথি মেরে তাকে দূর করে দিয়ে যশোধরকে বললে কৃপাণধারী, আমার বড়ো বউয়ের মতিগতি কোনকালেই ভালো ছিল না বলেই অষ্টপ্রহর তাকে চোখে চোখে রাখতাম। তা সত্ত্বেও তার কাণ্ডটা স্বচক্ষে দেখলেন। কামাতুরা কামিনী যে বিদ্যুতের মতো, চঞ্চলা স্ত্রী হরিণের মতো। এই দুই ধরনের রমণীকে বাগে রাখতে পারে না ধরণীর কোনও পুরুষ। যাক সে কথা, আপনাদের পরিচয় তো পেলাম না।
যশোধর আর লক্ষ্মীধর পরিচয় দিল নিজেদের।
তারপর শুধালো যশোধর, কিন্তু আপনি কে? জলের মধ্যে নিবাস রচনা করেছেন কেন?
জলনিবাসী মানুষটা তখন বলে গেল নিজের কাহিনি।
আগের জন্মে আমি ছিলাম ভূস্বর্গ কাশ্মীরের এক ব্রাহ্মণ। আমার ছিল দুই বউ। শাস্ত্রমতে ব্রত উদ্যাপন করছিলাম নিষ্ঠার সঙ্গে। শেষের দিকে আমার ব্রতভঙ্গ ঘটায় আমার এক বউ। এক শয্যায় শুয়ে রাতের চতুর্থ প্রহরে সঙ্গম করে আমার সঙ্গে। আমি তখন ঘুমের ঘোরে ছিলাম। অপকর্ম যে করছি, সেই কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। সহবাস সমাপ্ত হতেই টনক নড়েছিল। নিয়মবিরুদ্ধ কর্মের ফলে ব্রতভঙ্গ হয়ে গেছিল। কিছুটা পুণ্যসঞ্চয়ের ফলে জলপুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলাম এই জন্মে। এ জন্মের দুই বউ হয়ে এল গতজন্মের দুই বউ। গতজন্মের কামাতুরা এই জন্মেও কামানলে জ্বলে মরে অষ্টপ্রহর। তাই তাকে আমি চোখে চোখে রাখি। অসময়ে রতিসুখ দিয়ে আমাকে সাধনোচিত পুণ্য থেকে বঞ্চিত করেছে বলে তাকে এ জন্মে রতিসুখ দিই না। তার জন্যেই আমি যে আরও পুণ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এই জন্মে আমার এই যে ঐশ্বর্য আর ক্ষমতা তারও অধিক পেতাম যদি এই নারী আমাকে সাধনচ্যুত না করত। আমি জাতিস্মর এই জন্মে, কেন? এই সতী স্ত্রীর পুণ্যের ফলে।
তক্ষুনি হাঁটু পেতে মাটিতে বসল সতী বউ। আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে করজোড়ে বললে, প্রকৃতই যদি আমি সতী হই, তাহলে সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য হোক। আমার স্বামীর জলবাস ঘুচে যাক, শুরু হোক স্বর্গবাস।
অত্যাশ্চর্য ব্যাপারটা ঘটে গেল দুই ভাইয়ের চোখের সামনে।
আকাশ থেকে নেমে এল আলোঝলমলে এক আকাশযান। স্বামী-স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেল স্বর্গে।
অবাক হয়ে চেয়ে রইল দুই ভাই। জানল, সতীসাধ্বী ইচ্ছে করলে অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে।
রাত ভোর হতেই ফের রওনা হল দুই ভাই। সন্ধ্যায় পৌঁছল এক গভীর জঙ্গলে। প্রকাণ্ড একটা গাছের তলায় বসে যখন ভাবছে, খাবার জল পাওয়া যায় কোথায়, গাছের ওপর থেকে ভেসে এল গভীর গমগমে কণ্ঠস্বর, আজ রাতে তোমরা আমার অতিথি। এই আমার বাড়ি।
অরণ্য কেঁপে উঠেছিল স্বরমাধুর্যের ধ্বনি আর প্রতিধ্বনিতে। রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই দুই ভাইয়ের চোখের সামনে মাটি সরে গিয়ে সৃষ্টি করেছিল এক সরোবর। তৃষ্ণা মেটাতে না মেটাতেই দীঘির পাড়ে কোত্থেকে উড়ে এল ভালো ভালো খাবার। খেয়েদেয়ে গাছতলায় ফিরে এল বিস্ময়বিমূঢ় দুই ভাই।
অমনি গাছ থেকে নেমে এল অতিসুন্দর এক পুরুষ। আত্মপরিচয় দিল এইভাবে :
আগের জন্মে আমি ছিলাম ব্রাহ্মণ সন্তান। খুব গরিব। জনাকয়েক সাধুর সান্নিধ্যে উপবাস ব্রত করেছিলাম। কিন্তু ব্রত সম্পূর্ণ করতে পারিনি এক প্রতারকের পাল্লায় পড়ে। সন্ধ্যের সময়ে এসে সে আমাকে ছলেবলে

খাইয়ে দিয়েছিল। খণ্ডিত পুণ্য সঞ্চয়ের ফলে এ জন্মে জন্মালাম যক্ষ হয়ে। নইলে দেবযোনি পেতাম। যক্ষপতি কুবেরের ধনরক্ষক হয়ে থাকি তরুবরে।

আত্মকাহিনি সমাপ্ত করে যক্ষ জিজ্ঞেস করেছিল দুই ভাইয়ের পরিচয়। সব শোনবার পর বলেছিল, বিদ্যা শিক্ষা করবার জন্যে দূর দেশে যাওয়ার দরকার নেই। বিদ্যাদান করছি আমি, এইখানে।

সমাপ্ত হল বিদ্যাদান পর্ব। সর্ব বিদ্যায় বিদ্বান হয়ে গেল দুই ভাই।

এইবার বললে যক্ষ, দাও গুরুদক্ষিণা। একাগ্রমনে এই প্রার্থনা জানাও পরম পুরুষের কাছে যেন আজ রাতেই আমার যক্ষত্ব ঘুচে যায়, দেবত্ব পাই।

বক্তব্য সমাপ্ত করে বৃক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছিল যক্ষ।

মন সংযত করে সারারাত যক্ষের উর্ধ্বগতি কামনা করে বাড়ি ফিরে এসেছিল দুই ভাই। বাড়ি ফিরেও ব্রত-অনুষ্ঠান থামায়নি। কায়মনে যক্ষের দেবত্বপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে গেছিল ঈশ্বরের কাছে।

তারপরেই ঘটল সেই আশ্চর্য ঘটনা।

আকাশ থেকে নেমে এল অপূর্ব এক বিমান। এক দেবপুরুষ নেমে এলেন বিমান থেকে।

বললেন, আমিই সেই যক্ষ। তোমাদের ঐকান্তিক কামনায় এখন দেবলোকবাসী। আজ থেকে ঠিক এইভাবে ব্রত উদ্যাপন করে যাও নিজেদের জন্যে, পাবে স্বর্গ। হবে দেবতা। যতদিন মানুষ হয়ে থাকবে, ততদিন টাকাপয়সার অভাব আর থাকবে না। এই আমার বর।

আকাশে বিলীন হল বিমান। অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হয়ে গেল দুই ভাই।

এই রকমই হয়। ধর্মাচরণ করে গেলে শত দুঃখকষ্টও পরিশেষে উবে যায়। স্বর্গসুখ পাওয়া যায়। দেবতারা তাদের আগলে রাখে।

গল্প শেষ হল। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বাবার কাছে গিয়ে খেয়েদেয়ে যুবরাজ ফিরে এল আড্ডাখানায়।

গোমুখ শুরু করল নতুন এক গল্প।

বাঁদরদের রাজা বলিমুখ দলছাড়া হয়ে থাকত সমুদ্রের ধারে একটা যজ্ঞডুমুর গাছে। মনের সুখে খেয়ে যেত গাছের ফল যজ্ঞডুমুর।

একদিন তার হাত ফসকে একটা ফল পড়ে গেছিল সাগরের জলে। জলে ছিল একটা শুশুক। টপ করে খেয়ে নিয়েছিল যজ্ঞডুমুর।

জলের জীব, ডাঙার ফলের আস্বাদ যে এত ভালো হয়, তা জানত না। ফলের লোভে জল থেকে মুখ তুলে কাউমাউ করে গেছিল। গাছের ডালে বসে বেশ কয়েকটা ফল জলে ফেলে দিয়েছিল বলিমুখ বাঁদর। টপাটপ খেয়ে নিয়েছিল শুশুক।

কিন্তু সেই হল শুরু। প্রতিদিন জল থেকে মুখ তুলে হাঁকডাক করে যেত শুশুক। প্রতিদিন টপাটপ ফল ফেলে তার আহার জুগিয়ে যেত বলিরাজ।

এইভাবেই বন্ধুত্ব জন্মে গেল দুজনের মধ্যে। ফলের লোভে সারা দিনটাই জল থেকে মুখ বাড়িয়ে থাকত শুশুক। সন্ধ্যে হলে খানকয়েক ফল মুখে নিয়ে যেত জলের মধ্যের বাড়িতে।

তার বউ সব জেনেশুনে একদিন অসুখের ভান করে মটকা মেরে পড়ে রইল।

শুশুক বললে, কী হয়েছে তোমার?

শুশুক বউ কোনও জবাব দিল না। মুখ হাঁড়ি করে রইল মিথ্যে করে বললে তার বান্ধবী, তোমার বউ-এর যে অসুখ হয়েছে, তা সারবে শুধু বাঁদরের হৃৎপিণ্ডের ঝোল খেলে। তোমার বন্ধু তো বাঁদর, তাই তোমাকে বলতে পারছে না কথাটা।

বোকা শুশুক উতলা হল বউ-এর ব্যায়রাম শুনে।

বললে এই কথা। আজই আনছি একটা বাঁদর।

গেল বাঁদরের গাছতলায়। জল থেকে মুখ বাড়িয়ে বললে, হে বন্ধু। বন্ধুত্ব তখনই স্থায়ী হয় যখন পরিবারের সঙ্গে আলাপ জমে যায়। চলো, আমার বউয়ের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করবে।

বন্ধুর বউয়ের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করতে কে না চায়। পুলকিত বাঁদর নেমে পড়ল জলে। কিন্তু সে বিলক্ষণ চতুর। জলের মধ্যে দিয়ে শুশুকের পিঠে চড়ে, যেতো যেতে জিজ্ঞেস করেছিল শুশুক বন্ধুকে, আজকে তোমার মুখটা থমথম করছে কেন?

থমথম করছিল দোটানায় পড়ে। একদিকে বন্ধুর সঙ্গে প্রতারণা, আর একদিকে স্ত্রীর-মানভাঙা না, অসুখ সারানো। ছলনায় অভ্যেস নেই। মুখে সেই ছাপ পড়েছে।

অনেক ভাবল শুশুক। ডাঙা থেকে অনেক দূরে যখন আনা গেছে, তখন সত্যিকথাটা বলা যাক। বলেও ফেলল।

ধড়িবাজ বাঁদর সঙ্গে সঙ্গে ভেবে দেখল প্রাণে বাচবার পথ একটাই। এই শুশুকের পিঠে চেপেই ফিরতে হবে ডাঙায়।

মুখখানা করুণ করে বললে শুশুক, এই কথাটা আগে বলতে হয়। আমি তো আমার হৃৎপিণ্ড গাছে রেখে এসেছি। বাঁদরদের হৃৎপিণ্ড গাছে থাকে, বুকে থাকে না। ফিরে চলো, ফিরে চলো, গাছ থেকে পেড়ে আনি হৃৎপিণ্ড।

বোকা শুশুক তাকে ফিরিয়ে আনল গাছতলার সমুদ্রে। লাফ মেরে ডালে উঠে গিয়ে বললে বাঁদর, ওরে মূর্খ, প্রাণীদের হৃৎপিণ্ড বুকেই থাকে, গাছে থাকে না। শুনে যা বোকা গাধার গল্প...

বনে ছিল এক সিংহ। তার ছিল এক শেয়াল মন্ত্রী। বড়ো ধূর্ত মন্ত্রী। সিংহ পশু মারত, শেয়াল সেই মাংস একটু করে খেয়ে নিত। নিজের শিকার করত না।

একদিন এক শিকারি তির ছুঁড়ে জখম করে দিল সিংহকে। ঘা এমনই বেড়ে গেল যে গুহার মধ্যেই থাকতে হলো সিংহকে। শিকার ধরে খাওয়ার ধকল নেওয়ার ক্ষমতা তো শরীরে নেই।

ফলে, শিয়ালেরও খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

বললে একদিন পেটের জ্বালায়, পশুরাজকে, খাওয়া-দাওয়া না করলে শরীর কাহিল হয়ে পড়বে যে।

সিংহ বললে, তির মেরে শরীরে ঘা করে দিয়েছে বজ্জাত ব্যাধ। যদি একটা গাধার কান আর হৃৎপিণ্ড খেতে পাই, তাহলে ঘা সারবে, বুকে জোর পাব, কানে ভালো শুনব, ফের শিকারে বেরোব। যাও, আনো একটা গাধা।

শিয়াল গেল এক ধোপাখানায়। সেখানকার গাধাকে বললে, এত রোগা কেন হে তুমি?

গাধা বললে, ধোপা যে এন্তার ওজন বওয়ায়, মারে, খেতে দেয় না।

শিয়াল বললে, তোমার গাধী কোথায়?

গাধা বললে সে পালিয়েছে। আমার জোর কোথায়?

শিয়াল বললে, চলো আমার সঙ্গে এমন এক জঙ্গলে সেখানে গাধী আছে অনেক, গাধা নেই একটাও। তোমাকে তারা দিনরাত ঘিরে থাকবে, অতিষ্ঠ করে মারবে।

অতিষ্ঠ হতেই তো চায় গাধা। সে চম্পট দিল শেয়ালের সঙ্গে। শেয়াল তাকে নিয়ে এল সিংহের ডেরায়। খিদের জ্বালায় ধৈর্য হারিয়ে সিংহ থাবা চালালো তাকে লক্ষ্য করে। থাবা গিয়ে পড়ল গাধার পিঠে। ছাল-চামড়া মাংস উঠে যেতেই যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে গাধা ঠিকরে বেরিয়ে গেল গুহা থেকে, লাফাতে লাফাতে চলে গেল ধোপার আস্তানায়।

খিদের জ্বালায় ধৈর্য হারিয়ে সিংহ থাবা চালালো তাকে লক্ষ্য করে।

সিংহ তার পেছনে ধাওয়া করতে পারেনি, শরীর কাহিল থাকায়। কিন্তু শিকার ফসকে যেতেই শিয়াল গেল খেপে। ঝাল ঝেড়ে নিল সিংহের ওপর।

মুখ চুন করে সিংহ বললে কী করি বলো, শরীরে যে জোর নেই। যাকগে, এবার আর পালাতে দেব না। নিয়ে এস ভুলিয়ে ভালিয়ে।

শিয়াল গিয়ে বললে গাধাকে, চম্পট দিলে কেন?

গাধা বললে, গাধী কোথায় সেখানে? অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একটা জানোয়ার এমন মার মারল আমাকে...

অট্টহেসে শিয়াল বললে, রামবোকা তুমি। সেরকম ভয়ানক জানোয়ার সেখানে থাকলে আমি বেঁচে আছি কী করে? চলো, চলো, কত গাধী তোমার পথ চেয়ে রয়েছে।

গাধীদের লোভে আনন্দে লাফাতে লাফাতে সটান গুহার মধ্যে ঢুকে গেল গাধা। ওৎ পেতেই ছিল সিংহ। মোক্ষম মার মেরে শেষ করে দিল গাধাকে।

দিয়ে, স্নান করতে গেল দীঘিতে।

সেই ফাঁকে গাধার লম্বা লম্বা কান আর শক্তিশালী হৃৎপিণ্ডটা খেয়ে নিল শিয়াল।

স্নান সেরে ফিরে এসে সিংহ দেখল গাধার কান নেই, হৃৎপিণ্ডও নেই।

জিজ্ঞেস করল শেয়ালকে, গেল কোথায় কান আর হৃৎপিণ্ড?

শিয়াল বললে, কোনোকালেই ছিল না। থাকলে কি আপনার থাবার মার ভুলে গিয়ে ফিরে আসে। আপনাকে স্বচক্ষে দেখবার পর?

তা বটে, তা বটে, বলে, মরা গাধার বাকি মাংস খেতে বসে গেল সিংহ, ভাগ দিল শেয়ালকেও।

গল্প শেষ করে বাঁদর বলে শুশুককে, আমাকে গাধা পাওনি যে মেয়েছেলের লোভে প্রাণ দিতে যাব।

মজার গল্প শেষ করে গোমুখ বললে, এইজন্যেই লোকে বলে, কালসাপ আর বদমাসকে কক্ষনো বিশ্বাস করতে নেই।

পরক্ষণেই একটা গল্প শুরু করে দিল বন্ধুবৎসল গোমুখ, নরবাহনদত্তের মন প্রসন্ন রাখবার অভিপ্রায়ে, তার বিষণ্ণ মনে শক্তি আর সংকল্প সঞ্চারের সুউদ্দেশ্যে...

গানবাজনা শুনে পরিতুষ্ট এক বড়োলোক তার ধনরক্ষককে ডেকে হুকুম দিল, ওহে একে এক হাজার মুদ্রা দাও, গেয়েছে ভালো।

অপব্যয় পছন্দ করে না কোষাধ্যক্ষ। সে কাণাকড়িও দিল না। সরে পড়ল। মালিকের দরাজ হুকুমের মানে তার বোঝা হয়ে গেছিল।

টাকাপয়সা না পেয়ে গাইয়ে লোকটা এসে নালিশ করেছিল ধনী ব্যক্তির কাছে।

মুচকি হেসে বলেছিল সেই ধড়িবাজ ধনী, কী আশ্চর্য! দেনাপাওনা তো মিটেই গেছে। তুমি গান শুনিয়ে আমার কান-কে সুখ দিয়েছিলে, আমি তোমার কান-কে সুখ দিলাম টাকাপয়সা দেওয়ার হুকুম দিয়ে।

এক গুরুমশায়ের ছিল দুই শিষ্য। দুটোই নিরেট বোকা। গুরুর ডান পায়ে তেল মাখাত একজন, বাঁ পায়ে আর একজন।

ভুল হয়ে গেছিল একদিন। ডান পায়ের সেবক তেল মালিশ করে দিয়েছিল বাঁ পায়ে।

গুরু বললে বাঁ পায়ের সেবককে, ওরে, আজ তুই ডান পায়ে তেল মাখা। সে বেটা দেশে গেছে।

সে বললে, তা কী করে হয়? ডান পায়ের সেবক যে অমুক।

গুরু জেদ ধরেছিল। মূর্খ সেবক পাথর মেরে ভেঙে দিল গুরুর ডান পা। ককিয়ে উঠল গুরু। লোকজন এসে তাড়িয়ে দিল সেই নিত্যসেবককে।

দেশ থেকে ফিরে এসে ডান পায়ের সেবক যখন দেখল, ডান পা ভেঙে দিয়ে গেছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী সেবক, রেগেমেগে পাথর মেরে ভেঙে দিল গুরুর বাঁ পা! কারণ, ও নাকি প্রতিপক্ষের দখলে!

বিতাড়িত হল তৎক্ষণাৎ।

ঈর্ষা এমনই বিষ। বোকাদের মাথা বিগড়ে দেয়। আশ্রয়দাতার অনিষ্ট করে বসে নিজেদের মধ্যে লড়তে গিয়ে।

এবার হোক দুমুখো সাপের গল্প। তার মাথা ছিল দু-দিকে। মাথার দিকে, আর ল্যাজের দিকে। মাথার দিকের মাথায় চোখ ছিল, ল্যাজের দিকের মাথার চোখ ছিল না।

আমি-ই মাথা, এই অহংকার ছিল দুই মাথারই। সাপ কিন্তু এগিয়ে যেত আসল মাথা যেদিকে, সেই দিকে।

কিন্তু একদিন চক্ষুহীন মাথার জেদ রাখতে যেতে হয়েছিল ল্যাজের দিকে। রাস্তায় জ্বলছিল একটা কাঠ। অন্ধ পশ্চাৎপ্রদেশ সেদিকে কিলবিলিয়ে উঠে পড়তেই আগুনে ঝলসে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হল তৎক্ষণাৎ।

চাল খেতে ভালোবাসত এক বোকা। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দেখেছিল ধবধবে সাদা চাল, শাশুড়ি রেখে দিয়েছে ভাত করবে বলে।

লোভে পড়ে, আশেপাশে কেউ নেই দেখে, একটু চাল মুখে ফেলেছিল।

ঠিক সেই সময়ে শাশুড়ি এসে যাওয়ায় বোকা জামাই সেই চাল গিলতেও পারল না, উগড়োতেও পারল না, রেখে দিল গলায়।

ফলে, বন্ধ হয়ে গেল কথা বলা।

শাশুড়ি ভাবল, ভারি অসুখ হয়েছে জামাইয়ের। বললে শ্বশুরকে। তড়িঘড়ি বৈদ্য নিয়ে এল শ্বশুর। বৈদ্য এসে তার মাথা চেপে ধরে গলা টিপে ধরতেই হড়াৎ করে চালের ডেলা বেরিয়ে এল গলা থেকে।

হাসির রোল উঠল বাড়িতে।

এই হল এক রকমের অজ্ঞ মূর্খ। না জেনে অকাজ করে, চাপতে গিয়ে লোক হাসায়।

গোরুর দুধ দোওয়ানো দেখে একদল বোকা ছেলে একটা গাধার দুধ দুইতে গেছিল। একজন ভাঁড় রেখেছিল নীচে, আর একজন ধেই ধেই করে নেচে গেছিল দুধের প্রত্যাশায়।

দুধ পাওয়া যায়নি। খুব হেসেছিল গাঁয়ের লোক।

অকর্ম করতে গিয়ে এইভাবেই হাসির খোরাক জোগায় একশ্রেণির বোকা।

আর এক রকমের বোকা আছে, যারা একটু শুনেই কাজে নেমে যায়, বাকিটুকু না শোনার ফলে ব্যর্থ হয়।

যেমন, বাপ বললে ছেলেকে, কাল সকালে তুই গ্রামে যাবি।

পরের দিন সকাল হতেই গ্রামে গিয়ে সারাদিন টোঁ-টোঁ করে ছেলে ফিরে এল বাড়ি।

বাপ বললে, মূর্খ কোথাকার? যে কাজের জন্যে গ্রামে যেতে বলেছিলাম, সেইটাই তো শুনে গেলি না। কাণ্ডজ্ঞান হবে কবে?

গল্পমালা শেষ করে গোমুখ বললে, এই রকমই হয়। বোকারা অকারণে খেটে লোক হাসায়।

হেসে গড়িয়ে পড়ল যুবরাজও। হালকা মনে ঘুমিয়ে পড়ল সবান্ধব।

৬৪. দেবশর্মা কাহিনি

পরের দিন গোমুখ তার অফুরন্ত গল্পের ভাঁড় থেকে উপহার দিয়ে গেল একটার পর একটা গল্প।

দেবশর্মা ছিল এক গ্রামের এক ব্রাহ্মণ। তার ব্রাহ্মণীর নাম যজ্ঞদত্তা। সদ্যোজাত কচি ছেলেটাকে শুইয়ে রেখে একদিন নদীতে স্নান করতে গেছিল ব্রাহ্মণী, কারণ, ঘরে রয়েছে ব্রাহ্মণ। আর ঠিক সেই সময়ে রাজবাড়ির লোক এসে ডাক দিল ব্রাহ্মণকে। রাজার কাছে গেলেই তো দক্ষিণা মিলবে। সুতরাং যেতেই হবে। এদিকে ছেলের ওপরেও নজর রাখা দরকার।
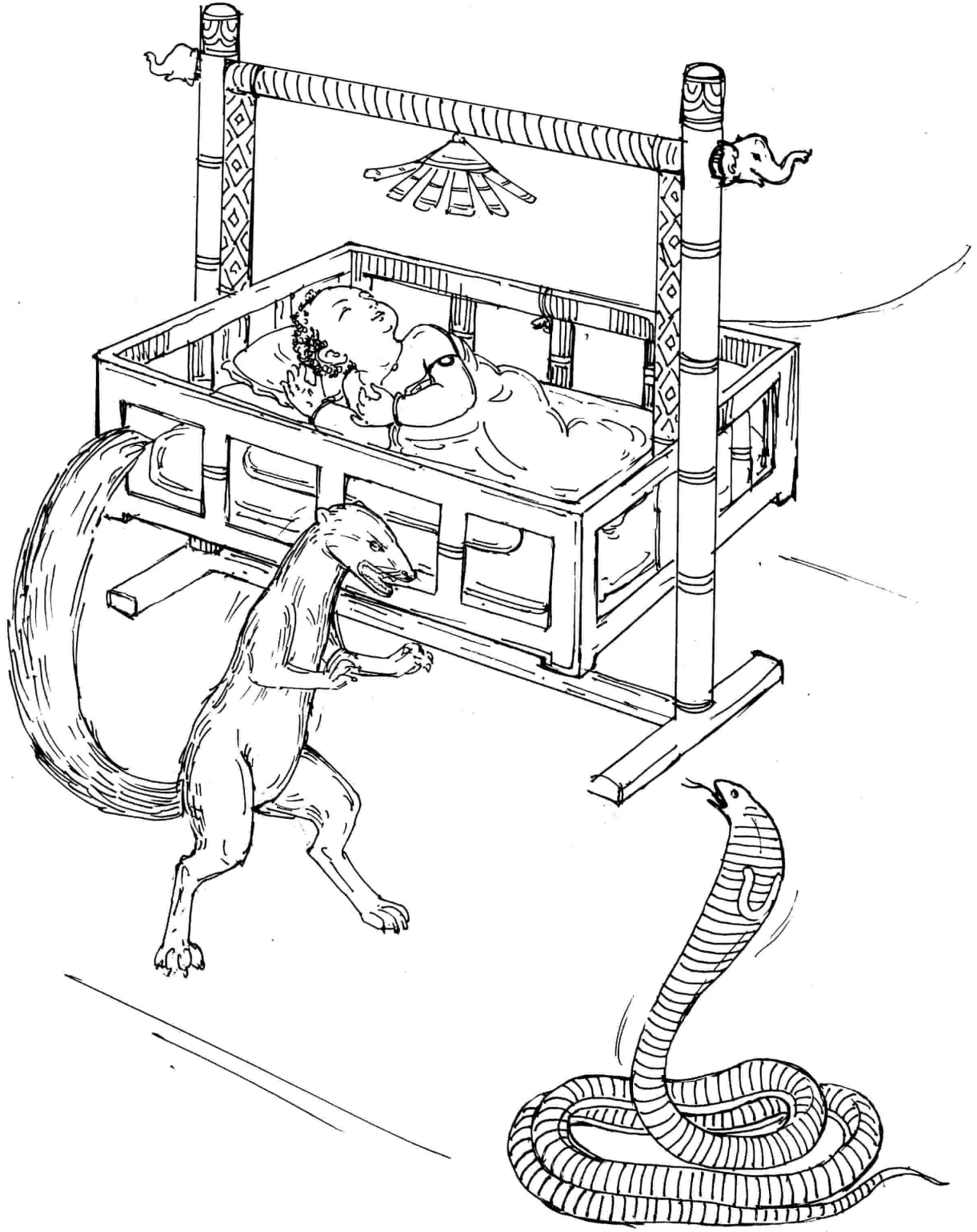
এমন সময়ে ঘরে ঢুকল একটা বিষধর সাপ।

সেই ভার দিয়ে গেল ঘরে পোষা এক বেঁজিকে।

বেঁজি পাহারা দিচ্ছে ছেলেকে। এমন সময়ে ঘরে ঢুকল একটা বিষধর সাপ।

লড়ে গেল বেঁজি তার সঙ্গে। খতম করল তৎক্ষণাৎ।

একটু পরেই পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল বাইরে। বাড়ি ফিরছে ব্রাহ্মণ। সাপের রক্ত লাগা মুখে বেঁজি দৌড়ে গেল বাইরে, আগেভাগে সর্পবধের সমাচার দিতে, রক্তমাখা চেহারা দেখিয়ে।

কিন্তু উলটো বুঝল ব্রাহ্মণ। রক্তাক্ত মুখ বেঁজিকে দেখেই ভেবে নিল, নিশ্চয় বাচ্ছা মেরেছে শয়তানটা।

একটা পাথর তুলে নিয়ে পিটিয়ে বেঁজিকে মারল সেইখানেই।

তারপর ঢুকল ঘরে। দেখল, ছেলে অক্ষত, কিন্তু একটা প্রকাণ্ড বিষধর সাপ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে রয়েছে মেঝেতে।

ব্রাহ্মণীও স্নান সেরে ফিরল ঠিক সেই সময়ে। মাথা চাপড়ে গেল ব্রাহ্মণের হঠকারিতা দেখে।

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে ধাঁ করে কিছু করতে নেই। পরিণাম ভালো হয় না।

যেমন একটা হাস্যকর কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছিল এক বোকা বায়ুরুগী। বদ্যি তাকে দিল একটা ওষুধ, কাছে রাখতে। বলেছিল, আমি বাড়ি যাচ্ছি। না আসা পর্যন্ত, কাছে রাখো এই ওষুধ।

বদ্যির ফিরতে একটু দেরি হয়েছিল। কিন্তু আর তর সয়নি বায়ুরুগীর। জল দিয়ে গিলে নিয়েছিল ওষুধটা।

বদ্যি এসে দেখল রুগীর অবস্থা খারাপ। চোখ কপালে উঠে গেছে। জ্ঞান নেই। ওষুধও নেই।

বোঝা হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। জ্ঞান ফেরাল বমি করিয়ে। তারপর দিল ধমক, তোমাকে ওষুধ দিয়েছিলাম কাছে রাখবার জন্যে, খেতে তো বলিনি। কারণ, এ ওষুধ গুহ্যদ্বারে দিতে হয়, খেতে নেই!

এই জন্যেই বলা হয়, বিধানসঙ্গত কাজ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

বোকাপাঁঠা একটা লোকের ছেলে বন্ধুর দল নিয়ে বনে গিয়ে হুল্লোড় করেছিল একটা গাছের কোটরে ঢুকে। তিতিবিরক্ত বাঁদরের দল খামচে আর আঁচড়ে রক্ত ঝরিয়ে দিয়েছিল ছেলেটার সর্বাঙ্গে।

সে ছেলেমানুষ। বাঁদর কখনো দেখেনি। তাই বাড়ি ফিরে কাঁদতে কাঁদতে বাপকে বলেছিল, গায়ে লম্বা লম্বা লোম, শুধু ফল খায়, তারা আমাকে মেরেছে।

ব্যস, বাপ দৌড়োল জঙ্গলে। গিয়ে দেখল একদল সন্ন্যাসী। তাদের গালে লম্বা দাড়ি, মাথায় লম্বা চুল, খাচ্ছে শুধু ফল।

সুতরাং মেরেছে তার ছেলেকে। তৎক্ষণাৎ তেড়ে মারতে গেল নিরীহ সাধুদের।

পথ আটকাল এক পথিক। বললে, তোমার ছেলেকে মেরেছে ওই গাছের বাঁদরের দল। সাধুদের গায়ে হাত দিও না।

মহাপাপ থেকে বেঁচে গেল সেই বোকা।

এই কারণেই বলা হয়, বুদ্ধিমানেরা বিবেচনা করে কাজ করে, জিতে যায়, ঠকে বোকারা, অবিবেচক বলে।

রাস্তায় সোনার টাকাভর্তি একটা থলি কুড়িয়ে পেল একটা লোক। সেইখানেই বসে মোহর গুনতে লাগল।

যার মোহর, তার টনক নড়তেই ঘোড়ায় চেপে ফিরে এসে দেখল মোহর। কেড়ে নিল তৎক্ষণাৎ।

গরিব কিন্তু বোকা সেই লোকটা এত অর্থ পেয়েও কাছে রাখতে পারল না। বুদ্ধিমান হলে সরে পড়ত। অন্য কোথাও গিয়ে মোহর গুনত।

সুতরাং, যার বুদ্ধি নেই, সে অনেক টাকা হাতে পেয়েও কাছে রাখতে পারে না, নিমেষে অর্থহীন হয়ে যায়।

একটা লোক চাঁদ দেখাচ্ছিল আঙুল তুলে। আর একটা লোক সেই আঙুলের দিকে চেয়ে রইল চাঁদ দেখবার জন্যে!

অতি কঠিন কাজও করা যায় যদি বিবেচক হওয়া যায়। মহাবিপদ থেকে বাঁচা যায়, যদি মাথায় বুদ্ধি থাকে।

যেমন বেঁচেছিল এক যুবতী মেয়ে। একটা বাঁদর তাকে তেড়ে এসেছিল। বুদ্ধিমতী মেয়েটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে যাচ্ছিল। তারপর সুযোগ বুঝেই গুঁড়িকে মাঝখানে রেখে, খপ করে চেপে ধরল বদমাস বাঁদরের দু-হাত।

গুঁড়ির একদিকে মেয়েটা, আর একদিকে বাঁদর। চলছে টানাটানি।

ঠিক এই সময়ে এক গয়লা যুবক যাচ্ছিল সেখান দিয়ে। ইয়া তাগড়াই চেহারা।

যুবতী তাকে বললে, বাঁদরটার হাত দুটো একটু চেপে ধরো না গো, চুল আর কাপড় সামলে নিই।

যুবক বললে, যদি সঙ্গমে রাজি হও, তাহলে ধরতে পারি।

বেগতিক দেখে যুবতী বললে, তাই হবে, তাই হবে।

যুবক এসে পাকড়াও করল বাঁদরের দু-হাত। চতুর মেয়েটা আগে নিজের চুল আর কাপড় সামলে নিল। তারপর, গয়লা যুবকের কোমর থেকে ছুরি টেনে খতম করল বাঁদরকে।

তারপর কটাক্ষ হেনে বললে বোকা যুবককে, চলো না, একটু আড়ালে যাই।

মদির চাহনি দেখেই ভুলেছিল কামুক যুবক। কথায় কথায় চালাক মেয়েটা একটু এসেই যেই দেখল একদল পথচারী, অমনি ভিড়ে গেল তাদের সঙ্গে। নিরাপদে ফিরে গেল বাড়ি।

বুদ্ধি যার বল তার। মেয়েরা নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে পারে স্রেফ বুদ্ধি খাটিয়ে। গতরে জোর না থাকলেও বুদ্ধি-শক্তি দিয়ে প্রাণ বাঁচানো যায়।

দুজন ডাকাত থাকত একটা শহরে। তাদের নাম ঘট আর কর্পর। একদিন নিশুতি রাতে ঘট একাই বেরিয়ে গেল অপকর্ম করতে।

ঘট সেই রাতে শুধু ডাকাতি করতে বেরোয়নি। সুন্দরী যুবতী রাজকন্যাকে ধর্ষণ করবে, তার ঘরে সোনাদানা হিরেজহরৎ, সব লুঠ করবে। এক ঢিলে দু-পাখি মারা হয়ে যাবে।

সে সুচতুর এবং দুর্ধর্ষ ডাকাত। এবং, সুদেহী। তাকে দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল রাজকন্যা। পেটাই চেহারা মনের মধ্যে কামানল প্রজ্বলিত করেছিল।

সুতরাং, সহজেই ধনদৌলত লুঠ হয়ে গেল। কলসি ভরে দামি দামি জিনিস বাড়ি এনে রাখল। তারপর ফিরে গেল রাজকন্যার ঘরে। মতলব ছিল ধর্ষণ করার। কিন্তু রাজকন্যা নিজেই যখন জ্বলছে মদনানলে, এখন তো পথ প্রশস্ত।

সমস্ত রাত রকমারি আসনে রাজকন্যাকে রতিমুখ দিয়ে ডাকাত ঘট ক্লান্ত শরীরে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল রতিক্লান্ত রাজকন্যাকে জড়িয়ে ধরে, অঙ্গের বসন ঠিকরে গেছিল মেঝেতে। পালঙ্কে ঘুমের মধ্যেও যেন এক হয়ে থাকতে চাইছে এক কালো পাথরের মূর্তির সঙ্গে এক সাদা মোমের কন্যা।

রাত ভোর হয়ে গেল। কিন্তু দুজনেই তখন ঘুমিয়ে রয়েছে।

ঘরে ঢুকল শান্ত্রী। গ্রেপ্তার হল ঘট। আনা হল রাজার সামনে। রেগে আগুন রাজা তৎক্ষণাৎ তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুকুম দিলেন, খতম করার মাঠে নিয়ে গিয়ে।

তার বন্ধু কর্পর কিন্তু চুপচাপ বসে থাকেনি বাড়িতে। ধনদৌলত ঠাসা কলসি তার জিম্মায় রেখেই তো ঘট ফিরে গেল রাজন্যার সঙ্গে সহবাস করতে। রাতভোর হয়ে গেল, এখনও ফিরছে না কেন?

তাই দূর থেকে নজর রেখেছিল রাজবাড়ির ওপর। দেখল সেপাই শান্ত্রী হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বন্ধুবর ঘট ডাকাতকে বধ্যভূমির দিকে।

কর্পর ভোল পালটে গেল পেছন পেছন।

কিন্তু ঘট তাকে দেখতে পেয়েছিল। চিনতে পেরেছিল। ডাকাতে ডাকাতে ইসারা-ভাষায় যেভাবে কথা হয়, সেইভাবে বন্ধু কর্পরকে বলেছিল, এখুনি যাও, রাজকন্যাকে রাজবাড়ি থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখো।

এরপরেই, গাছতলায় গিয়ে প্রাণে মেরে ফেলা হল ঘটকে।

চম্পট দিল কর্পর। সাংকেতিক ভাষা সে বুঝে নিয়েছে অক্ষরে অক্ষরে। এখন বধ করা হবে কুলটা রাজকন্যাকে। কিন্তু আজ নয়, কালকে।

সুতরাং সারাদিন ধরে সে মাটির তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে পৌঁছে গেল রাজকন্যার ঘরে রাত্রি নিশীথে।

দেখল, অপরূপা রাজকন্যাকে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে পালঙ্কে। রাজবংশের নাম যে ডুবিয়েছে, রাজা তার প্রাণ নেবেন রাত ভোর হলে।

কিন্তু তা হতে দিল না দুর্ধর্ষ ডাকাত কর্পর। সংক্ষেপে রাজকন্যাকে বুঝিয়ে দিল, কী ঘটতে চলেছে আর কী ঘটে গেছে। ঘট মরবার আগে বলে গেছে, রাজকন্যা যেন পালায় বন্ধু কর্পরের সঙ্গে।

পরিশেষে বললে, সুন্দরী, আমিই সেই কর্পর ডাকাত। তুমি এখন থেকে আমাকে ভজনা করবে, তোমার প্রথম প্রেমিকের ইচ্ছে তাই।

সাগ্রহে সম্মত হল রাজকন্যা। সে রূপবতী এবং কামবতী। তার সদা প্রজ্জ্বলিত কামানল নেভানোর জন্যে নিরন্তর সঙ্গমক্ষম পুরুষ পাওয়া আর স্বর্গ পাওয়া একই ব্যাপার। এই রকম নারীই যুগে যুগে বহুবল্লভা হয়। কামতৃষ্ণা মেটাতে মেটাতে সব হারায়, অথচ কামের আগুন নেভাতে পারে না। কাম-ইচ্ছা যে নিদারুণ তৃষ্ণা। কখনও মেটে না।

অতএব, ডাকাত কর্পরের সঙ্গে চম্পট দিল রতিরঙ্গ প্রিয়া সুরূপা রাজকুমারী। কর্পর তাকে কোলে নিয়ে পালিয়ে গেল সুড়ঙ্গপথে। এল নিজের বাড়িতে। সেই রাতেই নিশ্চিহ্ন করে দিল সুড়ঙ্গ। সে বড়ো ডাকাত। সব পাড়ে। বিশেষ করে সুন্দরী মোহে। নিয়ত সহবাস লোভে। দামি মণির চাইতেও দামি যে এক কামুকি কন্যা!

ভোর হল। শান্ত্রীরা রাজকন্যার দরজা খুলে দেখলে, কন্যা নেই! তাকে যে দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে রাখা হয়েছিল পালঙ্কের পায়ায়, সেগুলো কে যেন শাণিত ছুরি দিয়ে কেটেকুটে ফেলে রেখে গেছে।

সুড়ঙ্গের চিহ্নমাত্র তাদের চোখে পড়ল না। দক্ষ দস্যু কর্পর এই বিদ্যায় যে পয়লা। সব চিহ্ন এমনভাবে মুছে দিয়ে গেছে যে, দেখে মনে হল, হাওয়ায় উবে গেছে কুলটা কন্যা!

কিন্তু রাজা তো বোকা নন। তিনি ভেবে দেখলেন, এমন নিপুণ কর্ম করতে পারে একজনই, ঘট ডাকাতের প্রাণের বন্ধু কর্পর ডাকাত।

সেপাই গেল কর্পরের বাড়ি। কিন্তু সে বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। ধুরন্ধর কর্পর রাজকন্যাকে ভাগিয়ে এনে লুকিয়েছে অন্য কোথাও।

বুদ্ধিমান রাজা তখন সেপাইদের বললেন, বদ্ধ ভূমিতে নজর রাখো। ঘট ডাকাতের মৃতদেহ নিতে আসবে তার প্রাণের বন্ধু কর্পর ডাকাত, দাহ করার জন্যে। ক্যাঁক করে ধরবে তাকে। সে ধরা পড়লেই পাব মেয়েকে, তারপর তাকে মারব কামকেন্দ্রগুলোকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে, দেশের মেয়েরা যেন দেখে শেখে, কুপথ না মাড়ায়।

তাই করে গেল রক্ষীরা।

কিন্তু ধুরন্ধর কর্পর ডাকাত জেনে গেল রাজার মতলব। সব রকম গুপ্ত বিদ্যায় চৌকস বলেই দেশের সেরা নিশাচর দস্যু হতে পেরেছে সে। প্রতিপক্ষকে নাজেহাল করবার মতো সূক্ষ্ম বুদ্ধিতার রক্তে নাচে।

হেসে বললে রাজকন্যাকে, তোমার বাপকে ফের টেক্কা মারব। আমি ঘট ডাকাতের মতো বোকা নই।

বলে, ভোল পালটে নিল। ছদ্মবেশ ধারণ করল। এই বিদ্যায় সে অতিশয় নিপুণ। ছিল যমদুতের মতো আকৃতি, হয়ে গেল যেন নিরীহ সন্ন্যাসী। হাতে নিল একটা মাটির ভাঁড়, যাকে বলা হয় কর্পর, ভাঁড়ে রইল দইভাত।

খরচক্ষু রক্ষীরা দেখল, বধ্যভূমির পাশ দিয়ে পা টেনে টেনে যাচ্ছে এক সন্ন্যাসী, অপরিসীম ক্লান্ত, হঠাৎ আছড়ে পড়ল মাটিতে, হাতের ভাঁড় ছিটকে গিয়ে খান খান হয়ে যেতেই দই আর ভাত গড়িয়ে গেল মাটিতে।

সঙ্গে সঙ্গে কাতর কণ্ঠে প্রায় কেঁদে উঠল সন্ন্যাসী।

হায় কর্পর! হায় কর্পর!

কর্পর মানে মাটির ভাঁড়। রক্ষীরা বুঝল তাই। ভাঁড় ভেঙে যাওয়ায় কাঁদছে নিঃস্ব সন্ন্যাসী। আসলে সে যে বন্ধু ঘট-এর মৃতদেহ দেখে শোক প্রকাশ করছে ডাকাত কর্পর, তা কারও মাথায় ঢুকল না।

গোপন ডেরায় ফিরে এসে রাজকন্যাকে সব বলল কর্পর।

তারপর একদিন সন্ধ্যের সময়ে ফের ছদ্মবেশ ধরল, কর্পর ডাকাত। এবার সাজল ফুলবাবু। বাড়ির ঝি-কে নিজের বউয়ের মতো সাজিয়ে নিল। সঙ্গে রাখল খানিকটা ধুতরো আর ভাঙ। নিজে মুখে দিল না। কিন্তু এমন টলে টলে হাঁটতে লাগল যেন নেশায় মত্ত। গেল বধ্যভূমির কাছে, যেখানে বন্ধুবর ঘট-এর মৃতদেহ পাহারা দিচ্ছে রাজরক্ষীরা।

লম্পটরূপী কর্পরকে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল শান্ত্রীরা, কে তুমি? যাচ্ছ কোথায়? সঙ্গে কে?

বধ্যভূমি তো বেড়াবার জায়গা নয়। তাই সঙ্গত প্রশ্ন করেছিল সন্ধানীচক্ষু সান্ত্রীরা।

আর এই সুযোগটাই খুঁজছিল কর্পর। তাই এত অভিনয়। টলে টলে জড়িত স্বরে বললে, আমি এক ভদ্দরলোক। এই আমার বউ। যাচ্ছি শ্বশুরবাড়ি। সেখানে ফুর্তি করব, নেশা করব, কত কী করব।

মজা পেল রক্ষীরা। বললে, নেশার জিনিস শ্বশুরবাড়িতে কে দেবে? শালীরা?

কর্পর বলে গেল অবিকল নেশাখোরের মত, ধুস! ওরা কী দেয়? ওদের গিলিয়ে দেব। সবই তো ফাউ-বউ। তাই তো সঙ্গে নিয়েছি ভাঙ আর ধুতরো। এই দেখ। নেবে নাকি একটু? নাও, বাবা, নাও। ফুর্তি করো।

একটু একটু করে প্রায় সবটাই রক্ষীদের হাতে চালান করে দিল চতুর শিরোমণি কর্পূর। নেশার বস্তু হাতে পেলে না খেয়ে কেউ কি থাকে? খেল রক্ষীরাও। তারপর হল বেহুঁশ।

কাঠ জোগাড় করে বন্ধু ঘট-এর শব দাহ করে দিল কর্পর। ফিরে এল বাড়ি।

সকাল বেলা ক্ষিপ্ত হলেন রাজা সব শুনে। মত্ত রক্ষীদের বরখাস্ত করে জাঁদরেল রক্ষীদেদার মোতায়েন করলেন। বলে দিলেন, পোড়া হাড় নিতে যে আসবে, তাকে গ্রেপ্তার করবে। সে খাবার দিতে এলে তা খাবে না।

এবার গুপ্তচরগিরি করে সব খবর জোগার করে নিল কর্পর।

তারপর শরণ নিল এমন এক সন্ন্যাসীর যে জানে মোহন-মন্ত্র। মোহন-মন্ত্র আউড়ে অসাড় করে দিল দুঁদে শান্ত্রীদের। তাদের সামনেই ঘট-এর হাড় তুলে নিয়ে ভাসিয়ে দিল গঙ্গায়।

বাড়ি ফিরল বন্ধু সন্ন্যাসীকে নিয়ে। সে ভবঘুরে সন্ন্যাসী। থাকার জায়গা পেয়ে থেকে গেল কর্পর-এর সঙ্গে।

যথাসময়ে জেরা করে রাজা জানলেন, মোহন-মন্ত্র প্রয়োগ করে অবশ করা হয়েছিল শান্ত্রীদের। ঘোষকদের দিয়ে শহরের সবাইকে জানিয়ে দিলেন, মোহন-মন্ত্রে শক্তিমান যে পুরুষ আমার কন্যার সঙ্গে রয়েছেন তাঁর আর আত্মগোপন করে থাকার দরকার নেই। আমার সামনে এলেই আমি তাঁকে অর্ধেক রাজত্ব দেব।

কর্পর পা বাড়িয়ে ছিল, কিন্তু তাকে আটকে দিল রাজকন্যা।

বললে, মারা পড়বে, যেও না। চল, পালাই, এ দেশে আর নয়।

উত্তম মতলব। রাজা ছাড়বেন না। একদিন না একদিন তাঁর অগুন্তি গুপ্তচররা খুঁজে বের করবেই।

সুতরাং, তল্লাট ছেড়ে চম্পট দিল তিনজনে। তারপরেই শুরু হয়ে গেল রঙ্গিলা রাজকন্যার আরও বিচিত্র খেলা।

পথে ভবঘুরে সন্ন্যাসীকে একদিন একা পেয়ে বললে ছলনাময়ী, ঘট আমার সর্বনাশ করেছিল, তাকে কোনও দিনই ভালোবাসতে পারিনি। সে মরেছে, আপদ গেছে। এই যে কর্পর, এ আমাকে বাড়ি থেকে বের করেছে, একেও আমি ভা±লাবাসতে পারিনি। আমি ভালোবাসি তোমাকে। চল, আমরা পালাই।

সুতরাং, সুন্দরী মোহে সন্ন্যাসী ডেকে আনল নিজের সর্বনাশ। খুন করল ঘুমন্ত কর্পরকে।

কিছুদূর গিয়েই দেখা হয়ে গেল এক ধনবান বণিকের সঙ্গে। সন্ন্যাসীর মতো সে ভিক্ষুক নয়। সুতরাং রাজকন্যা তাকে কটাক্ষ-বাণে দলে টানল। বললে, এই ভিখিরিটাকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। তোমাকে দেখেই মজেছি। চল, পালাই দুজনে।

সুতরাং নিশীথ রাতে বণিকের সঙ্গে পালিয়ে গেল রাজকন্যা।

ভোরে ঘুম ভাঙবার পর সন্ন্যাসী দেখল, হাওয়া হয়েছে রাজকন্যা, বণিকের সঙ্গে।

মনে মনে বললে, মেয়েছেলে জাতটাই এইরকম। নিত্যনতুন নাগর চাই। যাক বাবা, প্রাণে তো বেঁচে গেছি, কর্পর-এর মতো ঘুমন্ত অবস্থায় তো মারা পড়িনি। সুতরাং পালানো যাক।

রাজকন্যাকে নিয়ে স্বদেশে গিয়ে বণিক ভাবল, মহা মুশকিলে পড়লাম। বাড়িতে রয়েছে আমার বউ, এই বারবনিতা মেয়েটাকে নিয়ে বাড়িতে ঢোকবার আগে বাড়ির খবর নেওয়া যাক।

খবর নিতে গিয়ে বাজ পড়ল মাথায়। তার বিয়ে করা বউ নিজেই তো বহুবল্লভা হয়ে বসে আছে। রোজ রাতে বারান্দা থেকে দোলনা ঝুলিয়ে দেয় দাসী। দোলনায় বসে যে উঠে আসে তাকে নিয়েই সারারাত কাটায়। আবার রাতে দোলনা ঝুলিয়ে তোলে নতুন নাগর।

বীভৎস! শুনে তো থ বণিক। তারপর মাথায় আনল এক জবর ফন্দি। যাচাই করা দরকার রটনা।

রাত ঘনিয়ে এলে নিজেই উঠে বসল দোলনায়। বণিকের বউ মদে চুর অবস্থায় তাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে বসাল খাটে, চিনতেই পারল না নিজের স্বামীকে।

সারারাত বিহার করে গেল, পরপুরুষ ভেবে। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়তেই দোলনায় চেপে রাস্তায় নেমে এল বণিক।

মনস্থির হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। আর নয়। সংসার ত্যাগ করা যাক। পরের মেয়ে দেখলাম, নিজের বউকে দেখলাম। সব মেয়েই সমান।

সব ত্যাগ করে জঙ্গলের দিকে যখন যাচ্ছে বণিক, দেখা হয়ে গেল এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে। তার নাম রুদ্রসোম। বণিকের মুখে তিক্ত অভিজ্ঞতার কাহিনি শুনে সে ভাবল, তাই তো! তাই তো! জগতের সব নারী কি সমান হতে পারে? দেখে আসা যাক আমার বউকে।

গেল নিজের গ্রামে। দেখল এক গয়লা নেচে নেচে চলেছে নদীর দিকে, যে নদীর কাছেই রুদ্রসেনের বাড়ি।

গয়লা-তনয়ের এত আহ্লাদ দেখে রুদ্রসোম জিজ্ঞেস করেছিল তাকে, খুব মজায় আছ মনে হচ্ছে! প্রেমে পড়েছ নিশ্চয়?

হেসে বললে ছোকরা, তাতো বটেই। তাতো বটেই! এই গ্রামের পণ্ডিত রুদ্রসোম এখন গ্রামের বাইরে, তার গিন্নী রোজ রাতে ঝি-কে দিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে যায়, সুখ পেতে। অবশ্য মেয়েছেলে সাজিয়ে নিয়ে যায়, তাতে বয়ে গেল। মজা তো পাই। কী মজা! কী মজা!

রেগে আগুন রুদ্রসোম অতিকষ্টে নিজেকে সামলে রেখে বললে লঘুকণ্ঠে, আজ রাতে আর একটা মজা করা যাক। তোমার বদলে আমি যাব, তোমার সাজে।

একপাক নেচে নিয়ে গয়লা-ছোঁড়া বললে, সে ভালো! সে ভালো! রোজ রাতে মেহনত করে আজ আমি ক্লান্ত। আমি জিরেন নিই, তুমি হাজিরা দাও আমার সাজে সেজে। এই নাও আমার কম্বল আর লাঠি। এইখানে দাঁড়িয়ে থাক, এখুনি আসবে ঝি।

এল ঝি। কম্বল আর লাঠি দেখে রাতের অন্ধকারে ভাবল, এই বুঝি সেই গয়লা নাগর। তাকে শাড়ি পরিয়ে নিয়ে গেল রুদ্রসোমের নিজের বাড়িতেই। অন্ধকার ঘরে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় যখন ভরিয়ে দিচ্ছে তারই স্ত্রী, তখন একেবারেই বিগড়ে গেল রুদ্রসোম।

সংসারে এতই যখন বঞ্চনা, তখন সে সংসার ত্যাগ করা যাক। তৎক্ষণাৎ ফিরে গেল বণিকের কাছে। দুজনে রওনা হল বনের দিকে।

পথে দেখা হল একটা লোকের সঙ্গে। তার নাম শশী। সে ফিরছে স্বদেশে। কথায় কথায় নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা বলল তাকে। বাড়ির বউ বেশ্যাগিরি করছে।

শঙ্কিত হল শশী। সে বড়ো হুঁশিয়ার পুরুষ। বিদেশে যাওয়ার সময়ে বউকে রেখে গেছিল পাতাল ঘরে। এইসব ঘটনা শুনে ভাবল, বিশ্বাস নেই মেয়েদের। একটু বাজিয়ে নেওয়া যাক।

বাড়ির কাছাকাছি এসে সন্ধ্যে নাগাদ শশী বললে রুদ্রসোম আর বণিককে—আজ রাতটা থেকে যাও আমার বাড়িতে।

ঠিক এই সময়ে শশী দেখল, একটা কুষ্ঠরোগী রাস্তায় বসে অশ্লীল গান গাইছে।

শশী তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, এমন আদিরসের গান ধরেছ কেন?

সে বললে, আমি যে কামদেবতা। তাই কামের গান গাইছি।

হেসে বললে শশী তা ঠিক, তা ঠিক। তোমার মতো রূপবান পুরুষই তো কামার্ত হয়। সত্যিই তুমি কামদেবতা, এমন রূপ কজনের দেখা যায়।

টিটকিরি গায়ে না মেখে বললে বিকলাঙ্গ কুষ্ঠরোগী, নইলে শশীর বউকে রোজ রমণ করছি কী করে?

বিষম চমকে শশী বললে, শশীর বউকে!

কুষ্ঠরোগী বললে, আজ্ঞে। এই গাঁয়ের অবস্থাপন্ন মানুষ শশী। রেগেমেগে বউকে পাতাল ঘরে পুরে রেখে গেছিল। কাজের মেয়ে রেখে গেছে একজনকে। সেই বউটা....শশীর বউটা......আমাকে দেখেই পটেছে। কাজের মেয়েটা রোজ রাতে আমাকে পিঠে করে নিয়ে যায় পাতাল ঘরে। আমার সঙ্গে পরমানন্দে বিহার করে রূপসী সেই বউ। তাহলেই দেখুন, আমি রূপবান কামদেবতা নই কেন?

শশী কোনোমতে সামলে রাখল নিজেকে। মুখে বললে, বটেই তো, বটেই তো। পরের বউ যখন পটেছে, তুমি সাক্ষাৎ কামদেবতা। তাহে, আমাকে একরাতে সুযোগ দাও না। তোমার বদলে আমি গিয়ে চেখে আসি শশীর বউকে।

কুষ্ঠরোগী বললে, নিশ্চয়, নিশ্চয়। তুমি আমার মতো কুষ্ঠরোগী সেজে হাতপা গুটিয়ে বসে থাকো, এইখানে। এই নাও আমার নোংরা জামাকাপড়। অন্ধকারে ঝি এসে আমি মনে করে তোমাকে নিয়ে যাবে। মনের সুখে চেখে নেবে পরের বউকে।

তাই হল। রজনী সমাগমে ঝিএর পিঠে চেপে নিজের বাড়িতে গিয়ে নিজের বউয়ের সঙ্গে পরকিয়া করে গেল এবং সহবাস-ক্লান্ত স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়তেই নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। সাত পাকে বাঁধা বউ পাতাল ঘরে সুরক্ষিতা থেকেও যদি কুষ্ঠরোগীর রক্ষিতা হতে পারে, তাহলে এই ভূমণ্ডলের কোনোও নারীকেই আর বিশ্বাস করা যায় না। বনগমনই শ্রেয়।

সোজা গেল বণিক বন্ধু আর ব্রাহ্মণ বন্ধুর কাছে। সকাল হতেই রওনা হল বনের দিকে, তিনজনে।

সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছল এক প্রকাণ্ড গাছের তলায়। পাশেই একটা পদ্মদীঘি। খেয়েদেয়ে তিনজনে উঠে গেল গাছের ডালে।

ওপর থেকে দেখল, এক পথচারী এসে ঘুমিয়ে পড়ল গাছতলায়। তারপরেই পদ্মদীঘি থেকে উঠে এল এক সুন্দর পুরুষ। ঢেঁকুর তুলে পেট থেকে বের করল এক সুন্দরীকে। তাকে রমণ করে ঘুমিয়ে পড়তেই সুন্দরী ঘুম থেকে জাগাল পথিককে। বিনা দ্বিধায় তার সঙ্গে আর এক দফা রমণ সেরে নিয়ে হাসিমুখে বললে পথিককে, ঘাবড়ে গেছ মনে হচ্ছে। তুমিই প্রথম নও। এর আগে নিরানব্বইজন পরপুরুষের সঙ্গে এইভাবে সঙ্গম করেছি। তোমাকে নিয়ে হল একশো জন।

পথিক বললে, কিন্তু তোমরা কে? ওই লোকটার পেটের মধ্যে ছিলে কেন?

সুন্দরী বললে, আমি এক নাগকন্যা। ওই আমার স্বামী, নাগপুরুষ। সে আমাকে একাই ভোগ করতে চায় বলে পেটে বন্দি করে রেখেছে। কিন্তু আমি যে নারী, বিশ্ব আমাকে ভোগ করুক, এই আমি চাই। স্বামীর চোখে ধুলো দিলাম একশোবার, দেব হাজার হাজার বার। তাতেও আমার আকাঙ্ক্ষা মিটবে না।

ঠিক এই সময়ে ঘুব ভেঙে গেল নাগপুরুষের। ক্রোধারুণ চোখে নাগকন্যার দিকে চাইতেই ঝলকে ঝলকে আগুনের স্রোত ঠিকরে এল মুখের ভেতর থেকে। সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল নাগবউ আর পথিক। নাগপুরুষ ঢুকে গেল পদ্মদীঘিতে।

তিন বন্ধু ভয়ানক এই দৃশ্য দেখে বাকি রাত আর ঘুমোতেই পারল না। এই তো নারী চরিত্র! পেটের মধ্যে রাখলেও তাকে চরিত্র খোয়ানো থেকে বাঁচানো যায় না। সুতরাং চিরতরে এই সংসার আর নারী সান্নিধ্য ত্যাগ করাই সমীচীন।

বনে গিয়ে তপস্যা করেছিল তিন বন্ধু একসঙ্গে, সিদ্ধিলাভ করেছিল একসঙ্গে।

সেই রাতে আর শক্তিযশার নাম উল্লেখ করেনি যুবরাজ। চিরচরিত্রহীনা কামিনীই যে সব দুঃখের মূল, এই চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল এক সময়ে।

গল্পবাজ গোমুখ আড়চোখে দেখে গেল যুবরাজের মুখাবয়ব। পরের দিন শুরু করল নতুন গল্পরাশি।

৬৫. বণিক ছেলের আরও কাহিনি

এক ধনবান বণিকের সুলক্ষণযুক্ত একটি ছেলে হয়েছিল। পূর্বজন্মের সাধন সিদ্ধি ছিল তার মধ্যে। কিন্তু শিশু অবস্থাতেই মা মারা যায়, সেটাও কর্মফল।

তার বাবা ফের বিয়ে করে। বিমাতার চক্রান্তে বিতাড়িত হয় বাড়ি থেকে।

তখন তার বিয়ে হয়ে গেছে। বাপের তাড়না খেয়ে বউকে নিয়ে চলে গেল বনের দিকে। হাতের টাকাপয়সা ফুরিয়ে গেল পথে। গিয়ে পড়ল এক মরুভূমিতে। সেখানে জল নেই, ঘাস পর্যন্ত নেই। কোনমতে সাতটা দিন অতিকষ্টে পথ চলার পর খিদে আর তেষ্টায় যখন ধুঁকছে বউ, তখন বণিকের ছেলে নিজের গায়ের মাংস কেটে তাকে খাইয়েছে, নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে তার তেষ্টা মিটিয়েছে। খাদ্য আর পানীয় থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখেছে। কাহিল হয়ে পড়েছে। তবুও স্ত্রীকে চাঙা রেখে দিয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, পাষাণী স্ত্রী স্বামীর রক্ত মাংস খেতে তিলমাত্র কুণ্ঠা বা পাপ বোধ করেনি।

এইভাবে সাতদিন গেল। আটদিনের দিন ভাগ্য সদয় হল। দুজনে পৌঁছোল একটা পাহাড়ের তলায়, গভীর জঙ্গলের মধ্যে। সেখানে বয়ে যাচ্ছিল পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্নার জল। গাছে ছিল ফল।

আগে স্ত্রীর খিদে আর তেষ্টা মিটিয়েছিল বণিকের ছেলে। তারপর স্নান করবার জন্যে জলে নামতেই দেখতে পেয়েছিল জলে ভেসে আসছে দুহাত আর দুপা কাটা একটা লোক।

বণিকের ছেলের নিজের অবস্থাই তখন শোচনীয়। কিন্তু তা গ্রাহ্য না করে হাত-পা কাটা মৃতপ্রায় মানুষটাকে জল থেকে উদ্ধার করে তীরে তুলে এনেছিল।

তারপর শুনেছিল তার দুর্দশার কাহিনি। শত্রুরা তার এই অবস্থা করেছে। প্রাণে মেরে ফেলার জন্যে।

বণিকের ছেলে নিজে তখন ক্ষতবিক্ষত। তারই তখন প্রাণ যায় যায়। তা সত্ত্বেও দুর্গত সেবা আগে করা উচিত বুঝেছিল। হাত-পা কাটা লোকটাকে সেবাশুশ্রূষা করে, খাইয়ে দাইয়ে আগে সুস্থ করেছিল, তারপর নিজে স্নান করেছিল। নিজের ক্ষতের শুশ্রূষা করেছিল, নিজের হাতে।

সেই থেকে গাছতলায় সংসার পেতেছিল বণিকের ছেলে—স্ত্রী আর সেই হাত-পা কাটা দুর্গতকে নিয়ে।

একদিন ফল সংগ্রহ করতে জঙ্গলে গেল বণিক-পুত্র। সেই অবসরে কামাতুরা স্ত্রী কাম চরিতার্থ করে নিল হাত-পা কাটা লোকটাকে দিয়ে। বিকৃত কামক্ষুধা ছিল দুজনেরই। নইলে যার কাটা হাত-পায়ের ঘা এখনও শুকোয়নি, তার এবং নিজের সঙ্গম-পিপাসা নিবৃত্তির জন্যে উভয়েই ব্যাকুল হবে কেন? যৌন-তৃষ্ণা যখন এমনই বিকট রূপ নেয়, তখন বিতৃষ্ণা বিদায় নেয়।

শুধু ন্যক্কারজনক যৌন-সঙ্গমেই ব্যভিচার সীমাবদ্ধ রইল না। বিকৃত লালসার বশে দুজনেই একদিন ঠিক করলে, পথের কাঁটা চিরতরে দূর করা যাক। বণিকের ছেলেকে পরলোকে পাঠানো যাক। সঙ্গম হোক খোলাখুলি, লুকিয়ে চুরিয়ে নয়। বিকৃত-অঙ্গ কিন্তু সঙ্গম-পারঙ্গম এই শ্রীহীন পুরুষই হোক পাপিষ্ঠার উপপতি।

কিন্তু বলিষ্ঠ বণিক যুবককে হত্যা করা তো মুখের কথা নয়। সুতরাং ছকে ফেলা হল পথের কাঁটা সরানোর পরিকল্পনা।

পরের দিন অসুখের ভান করে গোঁ-গোঁ করে চোখ উলটে ফেলতে লাগল বণিকপুত্রের সেই বিকৃত রসবতী অর্ধাঙ্গিনী। ব্যস্ত হয়ে বণিকপুত্র শুধোল, কী হয়েছে তোমার?

গোঁ-গোঁ গলায় বললে ছলনাময়ী, মরণরোগ হয়েছে আমার। যেভাবে দিন কাটছে, আর বাঁচব না। সরলস্বভাব দয়ার অবতার ব্যাকুল গলায় শুধিয়েছিল, কী করলে তোমার প্রাণরক্ষা করা যায়, তা যদি জানা থাকে, বলো। এই বনে ওষধি আমি পাবই।

ধুরন্ধর কুলটা বললে, নিশ্চয় পাবে। কিন্তু এই বনে নয়। স্রোতস্বিনীর ওপারে ওই যে পাহাড়, ওই পাহাড়ের গায়ে ওই দেখ অদ্ভুত একটা লতা দুলছে। কাল রাতে এক দেবতা এসেছিল আমার স্বপ্নে। চিনিয়ে দিয়েছে ওই লতা। বলেছে, ওই লতার রস খেলে প্রাণে বাঁচব। নইলে এই শেষ।

তক্ষুণি স্রোতস্বিনীর এ পারের ঘাস-লতা ছিঁড়ে এনে দড়ি পাকিয়ে নিল বণিকের ছেলে। একদিক বাঁধল নিজের কোমরে, আর একদিক গাছের গুঁড়িতে। ঝাঁপ দিল পাহাড়ি নদীর জলে।

তীব্র স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে যখন এগোচ্ছে ওপারের দিকে, নিষ্ঠুর সেই রমণী উঠে গিয়ে খুলে দিল গুঁড়ির গায়ে বাঁধা দড়ি।

নিমেষে প্রবল স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল বহুদূরে। কিন্তু অদৃষ্ট তাকে নিয়ে গিয়ে ফেলল এমন এক রাজ্যের নদীতীরে যেখানে রাজা দেহ রেখেছেন আগের দিন। প্রথামতো মঙ্গল-হাতি বেরিয়েছে। সে যাকে শুঁড়ে জড়িয়ে পিঠে তুলে নেবে, সিংহাসনে তাকেই বসাবে প্রজা আর মন্ত্রীরা।

মঙ্গল-হাতি নদীর পাড়ে এসে মুমূর্ষু কিন্তু সুলক্ষণযুক্ত বণিক পুত্রকে তুলে নিল পিঠে, মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়ে তাকেই রাজসিংহাসনে বসাল দেশের লোক।

রমণী যখন বিষ হয়, তখন তার সান্নিধ্য যে কতখানি ভয়াবহ আর পৈশাচিক হতে পারে, হাতে-কলমে সে শিক্ষা পেয়েছিল বণিকপুত্র। তাই রাজসিংহাসনে বসে, অগুন্তি সুন্দরীর লোলুপ দৃষ্টিতে টলে গেল না, তফাতে রেখে দিল নিজেকে।

আপদ বিদেয় হতেই বিকৃত-সঙ্গম লালসায় সেই পিশাচী, বণিকপুত্রের অগ্নিসাক্ষী রেখে বিয়ে করা বউ, হাত-পা কাটা বিকলাঙ্গ উপ-বরকে পিঠে বেঁধে নিয়ে ভিক্ষে করে গেল গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে একটাই বুকনি আউড়ে, স্বামীর শত্রুরা হাত-পা কেটে দিয়েছে আমার স্বামীর। কিছু খেতে দিন।

এমন দৃশ্য দেখে করুণা পরবশ হয়ে ভিক্ষে দিয়ে গেল সব্বাই, গ্রাম গ্রামে, শহরে শহরে। আর, রজনী সমাগমে দুজনেই দুজনের কাম নিবৃত্তি ঘটিয়ে গেল বিনা অনুশোচনায়।

মানুষ যখন অধঃপতনে নামে, তল খুঁজে পায় না। কামিনী যখন সর্পিনী হয়, তখন তার চোখের পাতা থাকে না, কিন্তু দাঁতে বিষ থাকে, পা থাকে না, কিন্তু শিরদাঁড়ায় হেঁটে চলে।

এইভাবেই বিকলাঙ্গকে পিঠে বহন করে সেই কদাচারিণী একদিন পৌঁছোল সেই দেশে, যে দেশের রাজসিংহাসনে অভিসিক্ত হয়েছে বণিকপুত্র। বিমাতা তাকে তাড়িয়েছে, কুলটা পত্নী তারই রক্তমাংসে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে নদীতে ডুবিয়ে তাকে মারতে গেছে, কিন্তু নিয়তি তাকে নিয়ে গেছে সিংহাসনে।

কথাটা তার কানে পৌঁছোল। হাত-পা কাটা একটা লোককে পিঠে করে ভিক্ষে করছে এক রমণী। শত্রুরা নাকি স্বামীর এই হাল করেছে।

স্বামী! পিঠে বইছে স্বামীকে! উপপতি হয়ে গেল স্বামী, প্রকৃত স্বামীকে জলে ভাসিয়ে দেবতার পর!

মেয়েটাকে দেখা দরকার তো! সত্যিই কী তার বউ?

আনা হল তাকে রাজসভায়। দেখেই চিনেফেলল বণিক-পুত্র। কুলটা কামিনী কিন্তু চিনতে পারল না নিজের স্বামীকে।

বণিকপুত্র মুচকি হেসে বললে, সত্যিই তুমি সতী। তোমার পতিভক্তির তুলনা নেই। পিঠে বয়ে ভিক্ষে করছ।

কুলটা কটাক্ষ হেসে বললে, হ্যাঁ রাজা, শত্রুরা এই অবস্থা করেছে আমার স্বামীর।

বণিকপুত্র গম্ভীর হেসে বললে, কিন্তু যার গায়ের রক্তমাংস দিয়ে খিদেতেষ্টা মিটিয়েছিলে, যাকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলে দড়ি কেটে, তাকে কি কোনও দিন পিঠে নিয়ে ঘুরেছিলে?

আঁৎকে উঠল দ্বিচারিণী। এবার চিনল সিংহাসনে আসীন মুকুটধারী রাজাকে। তারই স্বামী!

হতজ্ঞান হল তৎক্ষণাৎ। আছড়ে পড়ল মাটিতে।

মন্ত্রীরা দৌড়ে এল রাজার সামনে, ব্যাপার কী?

খুলে বলল বণিক-তনয়। বিচার হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। পাপিষ্ঠার নাক আর কান কেটে নিয়ে, কপালে রাজদণ্ড পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে, তাড়িয়ে দেওয়া হল দেশ থেকে।

গল্প শেষ করে গোমুখ বললে, যুবরাজ, যে রমণীর অন্তর নীচ, সে নিরন্তর নীচ হতে থাকে, কেউ তার অধোগতি রুখতে পারে না। অন্তরে যার সৎগুণ, তার উর্ধ্বগতি কেউ রুখতে পারে না। নাম যশ ঐশ্বর্য, সব ছুটে আসে তার দিকে সে না চাইলেও। এবার বলি অন্য গল্প।

মহাবনে পর্ণকুটিরে বসে সাধনমগ্ন ছিলেন এক বৌদ্ধ শ্রমণ। দয়ার অবতার। উপকার করতেন মানুষ পশু নির্বিশেষে। বদ লোককেও আপদ থেকে মুক্ত করতেন। পরোপকার করাই ছিল তাঁর ব্রত।

পরোপকার করবার জন্যেই তিনি মহাবনে যখন ঘুরছেন, তখন একটা কুয়ো দেখে কাছে যেতেই ভেতর থেকে কেঁদে কেঁদে বললে একটা নারীকণ্ঠ, আমাদের বাঁচান। কাল রাতে আমরা পড়েগেছি কুয়োয়, আমি তো মানুষের মেয়ে, আমার সঙ্গে পড়েছে এক সিংহ, এক সোনাঝুটি পাখি, আর এক সাপ। আপনি আমাদের বাঁচান।

সাধক বললে, পাখি কী করে কুয়োয় পড়ল? তার তো ডানা আছে।

বামা কণ্ঠ বললে, পাখি শিকারীর জালে আটকে গেছিল। ছিটকে বেরোতে গিয়ে কুয়োয় এসে পড়েছে।

সিদ্ধ পুরুষ তখন তার শক্তি খাটিয়ে চারজনকেই কুয়োর মধ্যে ভাসিয়ে বাইরে আনার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু ব্যর্থ হল। কারণটা অনুমান করে নিল তৎক্ষণাৎ। শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে পতিতা ওই স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে। অবশ্যই পাপের আকর এই মেয়েছেলে, কথার মধ্যে দিয়ে সেই পাপ প্রবাহিত হয়েছে সূক্ষ্ম শরীরে।

কিন্তু পরোপকার করতে যখন বেরিয়েছে, তা করতেই হবে। ঘাস আর লতা ছিঁড়ে বানিয়ে নিল একটা দড়ি। কুয়োর মধ্যে সেই দড়ি ফেলে দিয়ে একে-একে টেনে তুলল চার প্রাণীকেই।

তারপর জিজ্ঞেস করল কেশরী সিংহ, তিন-ফণা সাপ আর সোনাঝুটি পাখিকে—মানুষের মতো কথা বলছ কী করে?

সিংহ বললে, আমরা জাতিস্মর। শুনুন আমার পূর্বজন্মের কাহিনি।

হিমালয়ের বৈদুর্যশৃঙ্গে থাকেন বিদ্যাধর, রাজা পদ্মবেগ। তাঁর ছেলের নাম বজ্রবেগ। বড়ো দাম্ভিক, বড়ো ঝগড়াটে। বাবা স্বভাব শোধরাতে বলেছিলেন, সে তার জেদ ছাড়েনি। পিতৃদেব তখন অভিশাপ দিয়েছিলেন, যা, মানুষ, হয়ে জন্মা।

পুত্র পিতার আত্মাস্বরূপ। পিতা যদি পুত্রকে অভিশাপ দেয়, পরিণাম হয় ভয়ানক।

হলও তাই। বজ্রবেগ-এর অহংকার গুঁড়িয়ে গেল। আকাশ বিহারের ক্ষমতাও চলে গেল। আরও যেসব বিদ্যাধর-সুলভ শক্তি জন্মসূত্রে লাভ করেছিল, সে সবের কিছুই আর রইল না।

কেঁদে ফেলল ঝর ঝর করে। নরম হল বাবার মন।

বললেন, মর্ত্যে তুমি জন্মাবে ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে। কিন্তু অহংকারী হবে। বাবার অভিশাপে সিংহ হয়ে কুয়োয় পড়বে। এক সাধু পুরুষ তোমাকে উদ্ধার করবেন। তাঁর সেই উপকার সেদিন ফিরিয়ে দেবে, সেইদিন

তুমি শাপমুক্ত হবে।
তাই হয়েছিল। জন্মালাম ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে। অতিশয় অহংকারী হয়ে। বাবার অভিশাপে সিংহ হয়ে গেলাম। রাত্রে টহল দিচ্ছিলাম জঙ্গলে, পড়লাম কুয়োর মধ্যে। আপনি উদ্ধার করলেন। কিন্তু শাপমুক্ত হব সেদিন আপনার উপকার করতে পারব। সেই সুযোগ আমাকে দেবেন। আমাকে ডাকলেই চলে আসব।
করুণ চোখে প্রার্থনা জানিয়ে উধাও হয়ে গেল সিংহ।
এবার আত্মকথা শুরু করল সোনাঝুঁটি পাখি।
বললে, হিমালয়ের বজ্রদংষ্ট্রা বিদ্যাধর রাজার ছেলে ছিলাম আমি। আমার ওপরে ছিল পাঁচ দিদি। আমার নাম ছিল রজতদংষ্ট্র। বড়দি সোমপ্রভা একদিন বীণা বাজাচ্ছিল দেবমন্দিরে। আমি চেয়েছিলাম, দেয়নি। বীণা কেড়ে নিয়ে আমি আকাশে উঠে পড়েছিলাম, দিদি অভিশাপ দিয়েছিল, পাখির মতো আকাশে উড়ে গেলি তো, সোনাঝুঁটি পাখি হয়ে থাক। আমি কান্নাকাটি করেছিলাম। দিদি নরম হয়ে বলেছিল, অভিশাপ যখন দিয়েছি, তখন তোকে পাখি হতেই হবে। হওয়ার পর এক রাতে কুয়োয় পড়ে যাবি। এক সাধু তোকে উদ্ধার করবেন। যেদিন তাঁর একটা উপকার করে দিবি, সেইদিন তুই শাপমুক্ত হয়ে ফিরে আসবি। হে মহাত্মা, সেই সুযোগ আমাকে দিন। আমাকে ডাকলেই চলে আসব।
বলেই উধাও হয়ে গেল সোনাঝুটি পাখি।
তারপরে তিন-ফণা সাপ আরম্ভ করল নিজের গল্প, আমি ছিলাম কশ্যপ মুনির তপোবনে এক মুনিপুত্র হয়ে। একদিন বসেছিলাম দীঘির পাড়ে, স্নান করছিল আমার এক বন্ধু। এমন সময়ে একটা তিন ফণাওলা সাপ আমার দিকে তেড়ে আসতেই আমি তাকে মন্ত্র পড়ে অবশ করে দিয়েছিলাম, বন্ধুকে ভয় দেখানোর জন্যে। স্নান শেষ করে বন্ধু পাড়ে উঠে নিশ্চল সেই সাপ দেখে আঁৎকে উঠে অজ্ঞান হয়ে গেছিল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে নিজের শক্তি প্রয়োগ করে আমার কুকীর্তি জানতে পেরে অভিশাপ দিয়েছিল, যা তিন-ফণা সাপ হয়ে যা, এক্ষুণি। তারপর অবশ্য মনটা নরম হয়ে যেতে অভয় দিয়ে বলেছিল, সাপ হয়ে একটা কুয়োয় পড়ে যাবি। একজন সাধুপুরুষ তোকে উদ্ধার করবেন। তাঁর একটা উপকার করে দিবি। তাহলেই ফের মুনিপুত্র হয়ে যাবি। তাই আমি এখন সাপ। দয়া করে আমাকে ডাকবেন কোনও বিপদে পড়লেই। নিশ্চয় আমি আসব। উপকার করেই ফের মুনির ছেলে হয়ে যাব।
বলে, চক্ষের পলকে বনে ঢুকে গেল তিন-ফণাওলা সাপ।
সবশেষে আত্মকাহিনি শুনিয়ে গেল সেই রমণী, আমি পরপুরুষ বেশি ভালোবাসতাম, নিজের স্বামীকে হেয় করে। অথচ তিনি ছিলেন সুদর্শন ক্ষত্রিয়, সবার প্রিয়, উদার স্বভাবের মানুষ। একদিন তিনি আমার অপকর্ম ধরে ফেলে যেই সাজা দিতে যাবেন, পালালাম তল্লাট ছেড়ে, পড়ে গেলাম এই কুয়োয়। এখন যাই। পেট চালিয়ে নেব যেভাবেই হোক। যেদিন স্মরণ করবেন, নিশ্চয় আপনার আজকের এই উপকার ফিরিয়ে দেব।
কুলটা রমণী বন থেকে বেরিয়ে কাজ জুটিয়ে নিল এক রাজবাড়িতে, রানির পয়লা পরিচারিকা।
এদিকে সাধক পুরুষের সাধন শক্তি এমনই কমে গেল দুশ্চরিত্রার সান্নিধ্যে যে বনের ফলমূল পর্যন্ত আর নাগালের মধ্যে পেল না। ফলাহারী শ্রমণ অনাহারে শুকিয়ে গেল কয়েক দিনেই। দুর্বল হয়ে গিয়ে একদিন মনে মনে ডাক দিল বনের রাজা সিংহকে।
তৎক্ষণাৎ সিংহ চলে এল কাছে সুগম্ভীর নিনাদে বন কাঁপিয়ে। শুধু স্বরকম্পনেই গাছের উঁচু ডাল থেকে ঝরে পড়ল প্রচুর ফল। দিনকয়েক এইভাবে নানারকম ফলাহার করিয়ে সাধকের শরীরে শক্তি এনে দেওয়ার পর পশুরাজ বললে, এইবার আমি চলি। আমার শাপ কেটে গেছে।
মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতে সিংহ হয়ে গেল এক অপরূপ বিদ্যাধর। শ্রমণকে বিনম্র প্রণাম করে অন্তর্হিত হল আকাশে।
কিছুদিন পরে খিদের জ্বালায় ফের দুর্বল হয়ে পড়ল শ্রমণ। ফলমূল আবার বিরল হয়েছে। গাছেরাও কুপিত তার ওপর, কুলটার সঙ্গে কথা বলার পাপে।

সোনার ঝুঁটি পাখিকে মনে মনে ডেকেছিল শ্রমণ। পাখি এল। সব শুনল। সারা জীবন যাতে খাবার দাবার কিনে খেতে পারে, সেই ব্যবস্থা করে গেল হিরেজহরতের গয়না বোঝাই, একটা রত্নপেটিকা এনে দিয়ে।

বললে, আমার শাপ কেটে গেল। চললাম।

মুহূর্তের মধ্যে পাখি হয়ে গেল রূপবান বিদ্যাধর পুত্র। নিমেষে বিলীন হল আকাশে।

গয়না বেচবার জন্যে শহরে গেল শ্রমণ। এই শহরেই রাজবাড়িতে ঠাঁই নিয়েছে সেই অসতী স্ত্রীলোক।

এক বুড়ির বাড়িতে থাকার জায়গা হয়ে গেল শ্রমণের। এত দামি গয়না কেনবার ক্ষমতা আছে শুধু জহুরির। এই ভেবে জহুরির খোঁজে গেল বাজারে। সেখানে দেখা হয়ে গেল কুলটা সেই কামিণীর সঙ্গে, যে কিনা এখন রাজরানির পয়লা পরিচারিকা।

শ্রমণের মুখে আগে শুনে নিল রত্নপেটিকা বৃত্তান্ত। ক্রেতা খুঁজছে শুনে আগে গেল বুড়ির বাড়িতে, নিজের চোখে দেখে নিল জড়োয়া গয়নার রাশি, চোখ ঠিকরে গেল জলুস দেখে। মেয়েরা গয়না ভালোবাসে। সুতরাং মনে মনে পাঁচ কষে নিল তৎক্ষণাৎ। ভিক্ষুক শ্রমণের কাছে এত জড়োয়া থাকার কথা নয়। রাজার কানে কথাটা তুলে দিতে পারলেই তিনি তস্কর সন্দেহে শ্রমণকে গ্রেপ্তার করবেন। রমণীর গয়না-লালসা মিটবে যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার লাভে।

অতএব বিদ্যুৎবেগে খবর চলে গেল রানির কাছে। শুনেই খটকা লাগল রানির। মনে পড়ে গেল একদিনের কথা। গয়নার বাক্স খুলে দেখবার সময়ে ছোঁ মেরে বাক্স তুলে নিয়ে আকাশে উড়ে গেছিল এক সোনাঝুঁটি পাখি।

রাজাকে বলতেই তিনি বুড়ির বাড়ি থেকে শ্রমণকে ধরে এনে কারাগারে ঢুকিয়ে দিলেন, তার সত্যভাষণে কর্ণপাত করলেন না, সোনার গয়নাভর্তি পেটিকা ফিরে গেল রানির কাছে।

কারাগারের কষ্ট সইতে না পেরে তিন-ফণা সাপকে মনে মনে ডেকেছিল শ্রমণ। চকিতে ভীষণাকার সাপ উপস্থিত হয়েছিল তার সামনে।

সব শুনে বললে, এই যদি রাজার বিচার হয়, তাহলে খোদ রাজাকে আগে জব্দ করা যাক। আমি গিয়ে পেঁচিয়ে ধরব রাজাকে—মাথার ওপর তুলে ধরব তিন-তিনটে বিষদাঁত ঠাসা ফণা। কেউ কাছে আসতে সাহস করবে না। খবর ছড়িয়ে যাবে সারা রাজ্যে। খবর আসবে এই কারাগারেও। রক্ষীদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলবেন, আমার আদেশে ওই সাপ ছেড়ে যাবেই রাজাকে। কিন্তু আমাকে অর্ধেক রাজত্ব দিতে হবে। আপনি না চাইলেও পাবেন অর্ধেক রাজত্ব।

ভয়ানক তিন-ফণা সাপ যথাসময়ে রাজাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফণা তুলে রইল মাথার ওপর ...

শ্রমণ রাজি হয়ে গেল। ভয়ানক তিন-ফণা সাপ যথাসময়ে রাজাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফণা তুলে রইল মাথার ওপর, বিষদাঁত দেখেই কেউ আর কাছে এগোল না।

খবর ছড়িয়ে গেল গোটা রাজ্যে। খবর গেল কারাগারেও। শ্রমণ বললে রক্ষীদের তার ক্ষমতার কথা। তাকে আনা হল রাজার সামনে। নিজে থেকেই অর্ধেক রাজত্ব দিতে চাইলেন রাজা নির্লোভ শ্রমণকে। শ্রমণ বললে সাপকে, মুক্তি দাও রাজাকে। সাপ উধাও হল চকিতে। শ্রমণ পেল অর্ধেক রাজত্ব, আজীবন নিরাপত্তা।

সাপ? ঋষিপুত্রের রূপ ফিরে পেয়ে চলে গেল তপোবনে।

গল্প শেষ করে গোমুখ বললে যুবরাজ, পরের মঙ্গল করলে পরিশেষে নিজের মঙ্গলই হয়।

তারপরেই, ফের শুরু করল খান কয়েক দারুণ দারুণ গল্প।

এক মঠে থাকত বৌদ্ধশ্রমণরা। তাদের মধ্যে একজন ছিল বিষম বোকা। একদিন সে কুকুরের কামড় খায় রাস্তায়। মঠে ফিরে এসে অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করল, ছাদে উঠে ডুগডুগি বাজিয়ে মঠের সমস্ত শ্রমণকে ডেকে কুকুর কামড়ানোর খবরটা একেবারেই বলে ফেলা যাক, তাহলে আর জনে জনে একই বৃত্তান্ত বলতে গিয়ে মুখ ব্যথা হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে ছাদে উঠে খুব জোরে জোরে ডুগডুগি বাজিয়ে দিল কুকুর-দংশনে কাতর শ্রমণ। মঠবাসী সমস্ত শ্রমণরা যে-যেখানে ছিল, সেখান থেকেই কাজ ফেলে দৌড়ে এল ডুগ-ডুগ-ডুগ বাজনা শুনে। এসে যখন শুনল, গুরুতর কোনও কারণ নয়, জরুরি অবস্থাও সৃষ্টি হয়নি, এক কথা বারা বার বলতে হবে বলে বোকা শ্রমণ পাগলা ঘন্টির মতো ডুগডুগি বাজিয়ে তোলপাড় করেছে গোটা তল্লাট!

এরকম বোকার ওপর কি রাগ করা যায়? হেসেই গড়িয়ে পড়ল শ্রমণরা!

অনেক টাকা থাকলেই যে বুদ্ধি বেশি থাকবে, এমন কথা কেউ দিব্বি গেলেও বলতে পারবে না। বিশেষ করে সেই বড়োলোক যদি মহাকিপটে হয়।

যেমন ছিল টক্ক। মহাকৃপণ আর মহাবোকা। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই। এমনই হাড়কৃপণ সে ছাতু ছাড়া কিছু খেত না, তাও স্রেফ জলে গুলে নুন ছাড়া!

একদিন শশা সেদ্ধ খাওয়ার সাধ হল টক্কর। বউ সেদ্ধ করতে বসে গেল তক্ষুনি। টক্ক ঘরে গিয়ে শুয়ে রইল একটাই দুশ্চিন্তা নিয়ে, এখন যদি বন্ধুবান্ধব এসে পড়ে, তাহলেই শশা সেদ্ধ খেতে চাইবে, খরচ বাড়বে, কেউ যেন না আসে।

এমনই কপাল টক্কর, ঠিক সেই, সময়ে এল এক মহা ঘুঘু বন্ধু, সে শশা সেদ্ধ করার গন্ধ পেয়েছে। যার বাড়িতে বারোমাস উনুন জ্বলে না, তার বাড়িতে কী রান্না হচ্ছে, দেখা দরকার।

দৌড়ে এসে টক্কর বউ বললে, সর্বনাশ! তোমার বন্ধু এসেছে!

শশব্যস্ত টক্ক বললে, ভাগিয়ে দাও! ভাগিয়ে দাও! বলো, টক্ক মরে গেছে!

বন্ধুকে হুবহু তাই বলল টক্কর বউটক্ক মরে গেছে!

তাজ্জব হয়ে গেল টক্কর বন্ধু। এই তো এক্ষুনি হাসিমুখে শশা সেদ্ধ করতে দেখলাম টক্কর বউকে। এইটুকু সময়ের মধ্যেই টক্ক অক্কা পেল! বউ-এর মুখ গোমড়া! চোখে জল তো নেই!

নাঃ! ব্যাপারটা নিয়ে একটু ঘোল ঘাঁটা যাক!

দোরগোড়ায় বসে মরাকান্না শুরু করে দিল ধুরন্ধর বন্ধু। ছুটে এল লোকজন। টক্ক অক্কা পেয়েছে শুনে তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করতেই টক্কর বউ টক্কর কানে কানে বললে এবার উঠে পড়ো। নইলে তোমাকে পোড়াবে।

ফিস ফিস করে টক্ক বললে, কক্ষনো উঠব না। মহা চালাক! শশা খেতে এসেছে! আমি যখন মরেছি, তখন মরেই থাকব। শশার ভাগ দেব না!

হৈ হৈ করে টঙ্ককে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে যখন জ্যান্ত পোড়ানো হচ্ছে, তখনও মুখে টুঁ শব্দটি করল না টঙ্ক। আওয়াজ করলেই তো শশার ভাগ দিতে হবে! তার চেয়ে পুড়ে মরা ভালো।

হাড় কৃপণ এদেরকেই বলা হয়। হাড়ে হাড়ে কিপটেমি! মরেও টাকা জমায়!

বিদ্যামন্দিরের শিক্ষকও খুব বোকা হয়। যেমন ছিলেন উজ্জয়িনী শহরের এক শিক্ষক। কথায় বলে, যারা সরল তারা বোকা হয়। এই মানুষটার মনও ছিল খুবই সরল।

তিনি রাতে ঘুমোতেন বিদ্যালয়ে। কিন্তু সুনিদ্রা হত না ইঁদুরের উৎপাতে। সুরাহা বাতলে দিল এক বন্ধু, ঘরে একটা বেড়াল এনে রাখলেই তো হয়। ইঁদুর দেখলেই খেয়ে নেবে।

শিক্ষক কখনও বেড়াল দেখেনি। বন্ধুকে তাই জিজ্ঞেস করেছিলেন, বেড়াল দেখতে কী রকম?

বন্ধু বললে, গায়ের রং ধোঁয়াটে, চোখ নীলচে, পিঠে বড়ো বড়ো লোম, যেখানে-সেখানে ঘোরে।

শিক্ষক অবিকল সেই কথায় হুকুম দিয়ে গেল ছাত্রদের। তারা বেরিয়ে গেল দিকে দিকে অবিকল এই রকম চেহারার প্রাণীর সন্ধানে।

বাক্য-বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল এক প্রাণী। কিন্তু সে বেড়াল নয়, মানুষ। বেদ-অধ্যায়ী ব্রাহ্মণ-সন্তান। উপনয়নের পর থাকে গুরুগৃহে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল ছেলেটা। চোখ দুটো নীলচে, গায়ের রং ধোঁয়াটে, পিঠে হরিণের লোমশ চামড়া।

শিক্ষক মহাশয়ের দেওয়া বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল যখন, ছাত্ররা তাকেই নিয়ে এল শিক্ষকের কাছে। সমস্বরে বললে, বেড়াল এনেছি! বেড়াল এনেছি!

একেই বলে নিরেট গুরুর নিরেট শিষ্য!

শিক্ষক-বন্ধু পরের দিন সকালে ব্রহ্মচারী বালককে দেখে বললে, এ ছেলেটা এখানে কেন?

সমস্বরে বললে ছাত্ররা, আজ্ঞে, আপনি যে রকম বলেছিলেন, শিক্ষক মশায় যে রকম বলেছিলেন, সেই রকমই তো! এই তো বেড়াল।

অতিরিক্ত সরলতাও এক ধরনের বোকামি।

এক সাধু-আশ্রমে যে কজন সাধু ছিল, তারা প্রত্যেকেই নিরেট মূর্খ। মাথায় বুদ্ধি ছিল না ছিঁটেফোঁটাও। এদের মধ্যে এক্কেবারে বোকা ছিল একজনই।

একদিন তার কানে এল একটা কথা। পুকুর কাটিয়ে দিলে নাকি অনেক পুণ্য হয়।

বিস্তর ব্যয় করে সে একটা পুকুর কাটাল মঠের কাছেই।

কিন্তু একদিন সকালে এসে দেখল, খানিকটা পাড়কে খুঁড়ে রেখে গেছে। পরের দিনও দেখল একই ব্যাপার। আর একদিকের পাড় কে ভেঙে রেখে গেছে।

পরের দিন ভোর রাত থেকে পাহারায় রইল সে একা। আকাশে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে দেখল এক আশ্চর্য দৃশ্য।

আকাশ থেকে সাঁ-সাঁ করে নেমে এল একটা আতিকায় ষাঁড়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিং দিয়ে খুঁচিয়ে পাড় ভাঙতে লাগল অক্লেশে।

বোকা সাধু ভাবল, এই তো মওকা। স্বর্গ থেকে যখন এসেছে এই ষণ্ড মহাশয়, তখন ঝুলে পড়ি এর ল্যাজ ধরে, সশরীরে পৌঁছে যাব স্বর্গে।

সেই ষাঁড় সত্যিই স্বর্গের ষাঁড়। শিবের বাহন। ল্যাজে ঝুলন্ত জ্যান্ত মানুষকে নিয়ে চম্পট দিল শিবের কৈলাসধামে।

দিনকয়েক মণ্ডামিঠাইয়ের ভুড়িভোজে নাদুসনুদস হয়ে গিয়ে বোকা সাধু ঠিক করল, ষাঁড়ের ল্যাজ ধরে একদিন মর্ত্যের বন্ধুদের দর্শন দিয়ে আসা যাক। ফলাও করে নিজের সৌভাগ্য কাহিনি বলে আসা যাক।

ষাঁড়ের ল্যাজ ধরে নামল পুকুর পাড়ে। দৌড়ে চলে গেল আশ্রমে। বন্ধুবর্গকে সোচ্চারে শুনিয়ে দিল পুকুর কাটার ফলে সশরীরে স্বর্গ গমনের কাহিনি।

উৎসুক বন্ধুরা বায়না ধরল, তাহলে আমরাও যাব।

যুক্তি করে পরের দিন ভোর রাতে সাধুর দল ওৎ পেতে রইল পুকুর পাড়ে। ষণ্ড মহাশয় পাড় ভাঙা শুরু করতেই তার ল্যাজ আঁকড়ে ধরল পালের গোদা আরও এক ধরল তার ঠ্যাং। আরও একজন তার ঠ্যাং। এইভাবে ঝুলে রইল শেকলের মতো।

বিরক্ত হয়ে ষাঁড় উঠে পড়ল আকাশে, সব্বাইকে নিয়ে।

স্বর্গের কাছাকাছি গিয়ে উল্লসিত গলায় এক বোকা জিজ্ঞেস করল পয়লা বোকাকে, কৈলাশের মিঠাই কত বড়ো হে।

মুখ্য মূর্খ ল্যাজ ছেড়ে দিয়ে দুহাত দিয়ে দেখিয়ে বলল, অ্যাত্তো বড়ো!

ব্যস! ল্যাজ হাতছাড়া হতেই সাঁ করে নেমে এসে পৃথিবীতে আছড়ে পড়ে অক্কা পেল বোকার দল। ষাঁড় চলে গেল স্বর্গে।

কাশ্মীরের এক রাজা কনকাক্ষর ছেলে হিরণ্যাক্ষ একদিন রাস্তায় গুলি খেলতে খেলতে পথচারিণী এক সন্ন্যাসিনীকে গুলি ছুঁড়ে মেরেছিল খেলার ছলে। সন্ন্যাসিনী হেসে বলেছিল হিরণ্যাক্ষকে, মানুষ অহংকারে মট মট করে কখন? যৌবন এলে, আর বিত্তের পাহাড়ে বসে থাকলে। এত রূপ যৌবন ঐশ্বর্য নিয়ে যদি মৃগাঙ্কলেখাকে বিয়ে করতে, তাহলে বেশ মানাত।

নিরণ্যাক্ষ সবিনয়ে বলেছিল, মৃগাঙ্কলেখাকে?

সন্ন্যাসিনী মৃদু হেসে বলেছিল, হিমালয় অঞ্চলের বিদ্যাধরদের এক রাজার মেয়ে। তাকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল বিদ্যাধর যুবকরা। কিন্তু শুধু তোমার পাশেই মানায় তাকে।
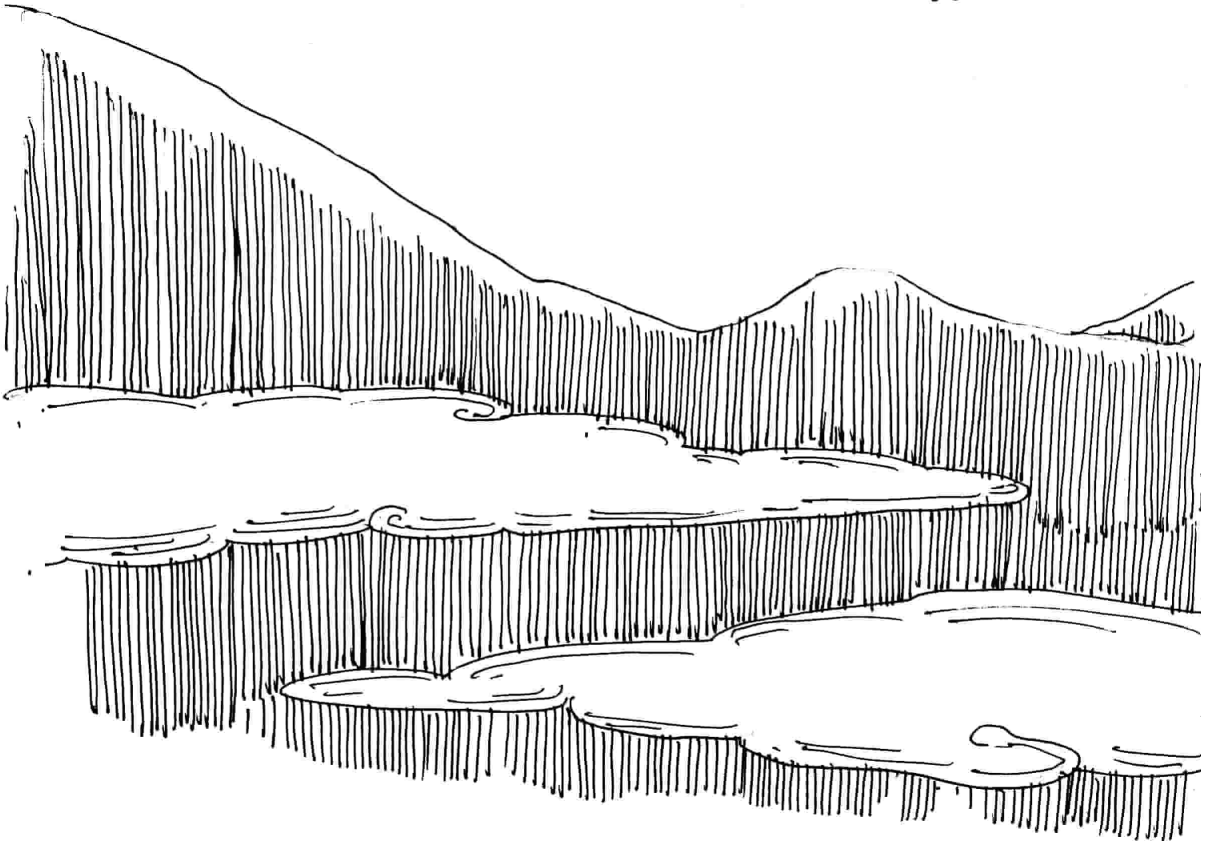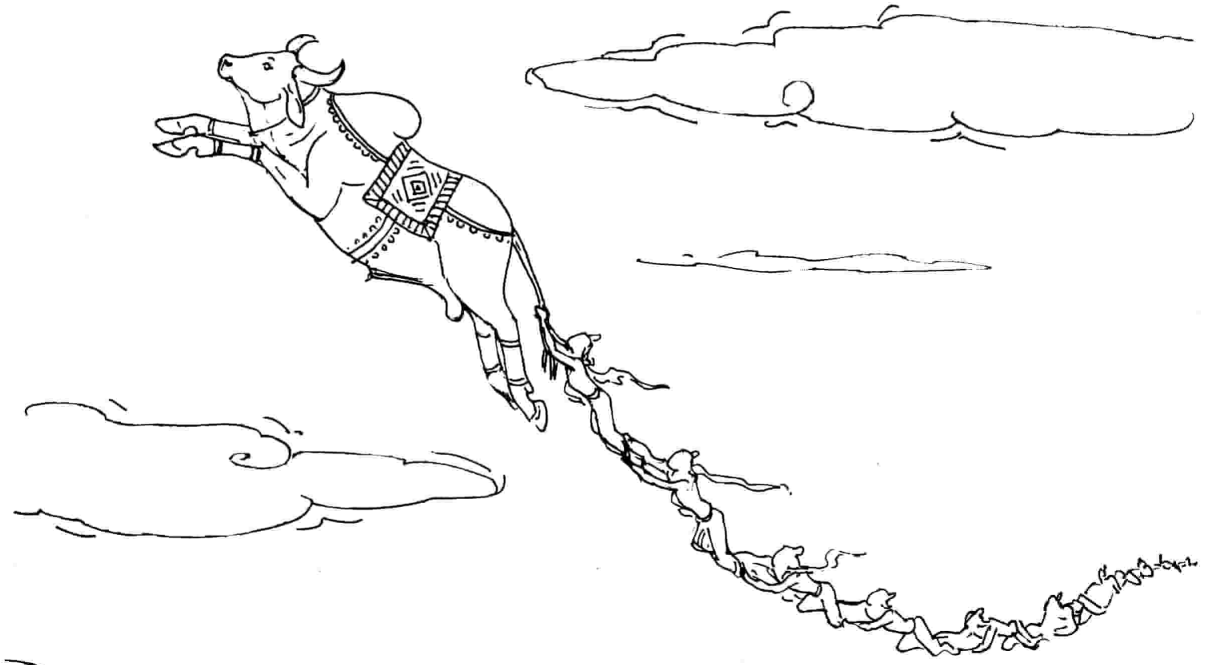
ল্যাজে ঝুলন্ত জ্যান্ত মানুষকে নিয়ে চম্পট দিল শিবের কৈলাসধামে।

কিন্তু তাকে পাব কী করে?

আমি গিয়ে তোমার কথা বলব। তার ইচ্ছে তোমাকে জানিয়ে যাব। দরকার হলে তোমাকে সেখানে নিয়েও যাব।

আপনাকে পাব কোথায়?

অমরেশ্বর মন্দিরে। রোজ সকালে।

কথা শেষ করে আকাশ পথে সেই মুহূর্তেই সন্ন্যাসিনী চলে গেল মৃগাঙ্কলেখার কাছে। হিণ্যাক্ষর শত প্রশংসা করেছিল। মুগ্ধ হয়েছিল রূপসী বিদ্যাধরী। শুধু মনে নয়, দেহেও রোমাঞ্চ জেগেছিল প্রকৃত বিবাহের সংকেত পেয়ে।

যোগিনীর সে রাত কেটে গেল মৃগাঙ্কলেখার কাছে, রাত ভোর হয়ে গেল গল্পে গল্পে।

এদিকে হিরণ্যাক্ষর অবস্থাও শোচনীয়। সুন্দরী পত্নী আকাঙ্ক্ষায় ঘুম আর হয় না। শেষ রাতে সামান্য ঘুমের সময়ে দেবী পার্বতী তার স্বপ্নে এসে বললেন, এ জন্মে তুমি মানুষ বটে, কিন্তু আগের জন্মে ছিলে বিদ্যাধর, মুনির শাপে মানুষ হয়ে জন্মেছ। তখন তোমার বিদ্যাধর বউ ছিল এই মৃগাঙ্কলেখা। এই সন্ন্যাসিনীর হাতের ছোঁয়ায় তুমি ফের বিদ্যাধর হয়ে যাবে, মৃগাঙ্গলেখাকে পাবে।

ঘুম ভেঙে গেল হিরণ্যাক্ষর। চলে গেল অমরেশ্বর মন্দিরে।

ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল মৃগাঙ্কলেখাও। দেবী পার্বতী তার স্বপ্নে এসে বলে গেছিল একই কথা, যা বলে এসেছেন হিরণ্যাক্ষকে।

ঘুম ভাঙতেই স্বপ্ন-কথা বলেছিল সন্ন্যাসিনীকে। তিনি তৎক্ষণাৎ অমরেশ্বর মন্দিরে এসে হিরণ্যাক্ষর হাত ধরে বলেছিলেন এই মুহূর্ত থেকে শাপমুক্ত হলে। চল।

হিরণ্যাক্ষর হাত ধরে, শূন্যে উঠে, তাকে এনে দাঁড় করালেন মৃগাঙ্কলেখার সামনে। হিরণ্যাক্ষ ততক্ষণে বিদ্যাধর অবয়ব ফিরে পেয়েছে। পূর্বজন্মের সব কথা স্মরণে এসেছে। আগের পবিত্রতা ফিরে এসেছে।

স্বপ্রেম চাহনি মেলে বলেছিল মৃগাঙ্কলেখাকে আগের জন্মে তুমি দেহ রেখেছিলে আমি শাপগ্রস্ত হওয়া মাত্র।

এ জন্মে তাই প্রেম জেগেছিল কানে শোনার সঙ্গে সঙ্গে, চোখে দেখার পর তা ব্যাপ্ত হয়েছে সমস্ত শরীরে। এবার হোক আমাদের পুনর্বিবাহ।

গোমুখ বললে, যুবরাজ, এই হল কর্মফল। তা ফলবেই, আচমকা ফলে যাবে।

শক্তিযশাও যে নরবাহনদত্তের ভার্যা হবেই, ঘুরিয়ে বলে গেল গোমুখ। উৎকণ্ঠার নিবারণ ঘটতেই সবান্ধব ঘুমিয়ে পড়ল যুবরাজ।

৬৬. যক্ষদম্পতির কাহিনি

পরের দিন রাতে ফের জমাটি গল্প শুনিয়ে গেল গোমুখ। গল্পের ফোয়ারা বললেই চলে তাকে।

শিবঠাকুরের এক তীর্থক্ষেত্রে থাকতেন বহু সন্ন্যাসী। তাঁদের গুরুদেব একদিন আশ্চর্য কাহিনি শুনতে চেয়েছিলেন।

এক শিষ্য শুরু করেছিল একটা গল্প।

কাশ্মীরে বিজয় নামে তীর্থক্ষেত্র আছে। শিবঠাকুরের দেশ বলা হয় জায়গাটাকে। সেখানে যে সন্ন্যাসী থাকতেন, তিনি ছিলেন মস্ত পণ্ডিত, কিন্তু বেজায় অহংকারী। একদিন তিনি ঠিক করলেন, জ্ঞানের লড়াইয়ে সবাইকে হারিয়ে আসা যাক।

রওনা হলেন পাটলিপুত্র অভিমুখে, জ্ঞানের আকর স্বরূপ বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের নিবাস সেখানে। পৌঁছোলেন এক মহাঅরণ্যে। গাছতলায় বসে যখন বিশ্রাম নিচ্ছেন, তখন দেখলেন হাতে লাঠি আর কমণ্ডলু নিয়ে আসছে এক ব্যক্তি। দেহ ধূলিধূসরিত। নিশ্চয় অনেক পথ হেঁটেছেন। দেখেও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বলে মনে হয়।

গাছতলায় বসেছিলেন সেই ব্যক্তি। সন্ন্যাসীর প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, আমি আসছি পাটলিপুত্র থেকে, যাচ্ছি কাশ্মীরে, পণ্ডিতদের জ্ঞানযুদ্ধে হারানোর জন্যে।

সন্ন্যাসী ভেবে দেখলেন, বিদ্যাক্ষেত্র থেকে আসছেন এই মহাজ্ঞানী। একে আগেই জ্ঞান-কথা শুনিয়ে হারাই। যদি হারাতে পারি, তাহলেই পাটলিপুত্র যাব।

বলে, নিজের জ্ঞানের বহর শুনিয়ে দিলেন সন্ন্যাসী। পরিশেষে বললেন, প্রকৃত জ্ঞানী, সে অযথা তর্ক করে জ্ঞানশক্তির অপচয় ঘটায় না।

কমণ্ডলুধারী যুক্তি মেনে নিলেন, না মানলে তো তিনি প্রকৃত জ্ঞানী রূপে প্রমাণিত হচ্ছেন না। অতএব, কাশ্মীরে আর না গিয়ে, ফিরে গেলেন পাটলিপুত্রে।

গাছতলায় বসে রইলেন সন্ন্যাসী। বসে বসে শুনলেন গাছের ওপর এক যক্ষ আর যক্ষীর মধ্যে চলছে প্রেমের খেলা। ফুলের মালা ছুঁড়ে যক্ষ মেরেছে যক্ষীকে। ফুলের আঘাতেই যেন মৃত্যু, এইরকম ভান করে মটকা মেরে পড়ে রইল যক্ষী। কান্নাকাটি শুরু করে দিল ছেলেমেয়েরা। একটু পরেই যেন প্রাণ ফিরে পেয়ে উঠে বসল যক্ষী।

যক্ষ শুধোল, বলো কী দেখলে এতক্ষণ।

যক্ষী বললে, দেখলাম যমদূতকে। অতিকায়, কৃষ্ণকায়, ভয়ালদর্শনা চোখ জ্বলছে আগুনের ভাঁটার মতো, অন্ধকার ঠিকরে যাচ্ছে গা থেকে। আমাকে ঝটকান মেরে নিয়ে গেল যমের দরবারে। কিন্তু যম-দপ্তরের সচিবরা আমাকে ফিরিয়ে দিল, আমার সময় হয়নি বলে।

অট্টহেসে যক্ষ বললে, যত্তো সব গালগল্প! ফুলের চোট খেয়ে কেউ মরে না, জ্যান্ত যমালয়ে গিয়ে কেউ ফিরেও আসে না। পাটলিপুত্রের মেয়েছেলেদের ন্যাকামির মতো করে গেলে এতক্ষণ। শোনো তাদের গল্প।

পাটলিপুত্রের রাজা দেবী সরস্বতীর তীর্থে গেছিলেন মন্ত্রী, সেনাপতি আর কবিরাজকে নিয়ে। চারজনের সঙ্গে ছিল চারজনের বউ। পথে দেখল, ভিক্ষে চাইতে বসেছে তার বিকৃত-অঙ্গ পুরুষ। এক কুঁজো, এক কাণা, এক ল্যাংড়া, আর এক কুষ্ঠী।

মেয়েদের মন গলে গেছিল, কাতর প্রার্থনায়। পুজো দিয়ে ফেরবার সময়ে চার রমণী চার বিকৃত-অঙ্গকে বাড়ি আনিয়ে নিল লোক মারফত। এক-একজনের বাড়িতে এক-একজন। পুণ্য কামনায় চলল তাদের সেবা-শুশ্রূষা, স্বামীদের টাকায়। শরীর-সেবাও চালিয়ে গেল নিজেদের শরীর দিয়ে। বিকৃত-কামনার শেষ রাখতে নেই, সম্ভ্রান্ত রমণী হয়েও কামাতুরা অবস্থায় বিকৃত লালসার ইন্ধন জুগিয়ে গেল কাণা, ল্যাংড়া, কুষ্ঠী আর কুঁজো। বিকৃত রমণ সুখ, সে এক অন্য তৃপ্তি!

প্রতি রজনীতে উপর্যুপরি রমণের ফলে ক্ষতযুক্ত হয়ে গেছিল চার রমণীর কোমল তনু। বসনের বাইরে যে ক্ষতগুলো, সেগুলো স্বামীদের চোখে পড়বেই। যেমন ঠোঁটে কামড়ের দাগ, স্তনে নখের দাগ, গালে চোষণের দাগ।

রাজা একদিন জানতে চাইল রানির কাছে, কে তোমার ঠোঁট কামড়েছে? কে তোমার পয়োধর আঁচড়েছে? কে তোমার গাল চুষেছে।

রানি বললে, দেওয়ালে আঁকা ওই দেবতা, যার হাতে রয়েছে শঙ্খ, চক্র আর গদা। রোজ রাতে দেওয়াল থেকে বেরিয়ে আমাকে নিংড়ে, চুষে, থেঁৎলে, কামড়ে সম্ভোগ করে আবার দেওয়ালে ঢুকে যান।

চোখেমুখে চালাকি খেলে রানি যে বোকা বানিয়ে গেল রাজাকে, উজবুক রাজা তা ধরতে পারল না। স্বয়ং বিষ্ণু এসে যদি উপভোগ করেন ঘরের বউকে, এ তো সৌভাগ্যের কথা।

মন্ত্রী, সেনাপতি, কবিরাজের কাছে আশ্চর্যের এই নৈশ রমণের কাহিনি বলতে তারাও বিশ্বাস করে নিল বউদের গল্প। বর বোকা হলে বউরা এইভাবেই তাদের বঞ্চনা করে যায়।

যক্ষ বললে যক্ষীকে, অমন বোকা আমি নই। গালগল্প ধরে ফেলি।

গাছের তলায় বসে এবার গলা খাঁকরি দিয়ে বললেন সন্ন্যাসী, কিন্তু আমি যেসব কথা শুনে ফেললাম। আমায় ক্ষমা করুন।

তক্ষুনি তাঁর সামনে নেমে এল যক্ষ আর যক্ষী। সন্ন্যাসীর সরলতায় মুগ্ধ হয়ে বললে, আশীর্বাদ করছি, তুমি সর্বত্র জয়ী হও। লক্ষ্মীর বরপুত্র হও।

সকাল হতেই পাটলিপুত্র রওনা হলেন সন্ন্যাসী। সেখানকার তাবড় তাবড় জ্ঞানীদের জ্ঞানযুদ্ধে হারিয়ে দিলেন, যক্ষের বর পেয়েছেন যে!

তারপর একটা হেঁয়ালির জবাব জানতে চাইলেন রাজার কাছে, পরাজিত পণ্ডিতদের সামনেই।

দেওয়ালে আঁকা এক ছবি থেকে রোজ রাতে বেরিয়ে আসেন এক শঙ্খ-চক্র-গদাধারী। আমার ঠোঁট কামড়ে, স্তন আঁচড়ে, গাল চুষে রতি সুখ দিয়ে আর নিয়ে ঢুকে যান দেওয়ালে। কী এর মানে?

রাজা নিরুত্তর। মুখ চাওয়াচাওয়ি করে গেল পণ্ডিতরা। এআবার কী ধরনের হেঁয়ালি?

অবশেষে ব্যাখ্যা করে গেলেন সন্ন্যাসী নিজেই। রমণী-রচনা শোনালেন ললনা ছলনাময়ী হয়েই জন্মেছে। তাদের বিশ্বাস করে শুধু মূর্খরা।

খুশি হলেন রাজা। দক্ষিণা দিতে চাইলেন নিজের রাজ্য। নিলেন না সন্ন্যাসী। রাজা তখন দিলেন অনেক অর্থ। গ্রহণ করলেন সন্ন্যাসী। সুখে কাটিয়ে দিলেন জীবন। লক্ষ্মীর বরপুত্র হয়ে।

মুনির শিষ্য গল্প শেষ করে বললে মুনিকে, যা বললাম, তা সত্য কাহিনি। শুনেছি সেই সন্ন্যাসীর মুখে।

গোমুখ বললে, যুবরাজ, রমণীমাত্রই কুহকিনী। শোনাই তাহলে আর এক রমণীর কাহিনি সে একাই এগারোজন স্বামীকে পরলোকে পাঠিয়েছিল।

মালোয়া দেশের এক গ্রামে এক ব্যক্তির ছিল তিন ছেলে। একটি মেয়ে হতেই পর পর মারা গেল স্ত্রী আর দুই ছেলে।

অপয়া মেয়েটির নাম দেওয়া হল ত্রিমারিকা, তিনজনের মরণ ঘটিয়েছে বলে।

গ্রামেরই এক ধনীপুত্রকে বিয়ে করল ত্রিমারিকা বড়ো হয়ে। কিছুদিন পরেই মারা গেল স্বামী।

রমণপ্রিয় সেই রমণী দিন কয়েক পরেই বিয়ে করল ফের। দ্বিতীয় স্বামীও ধরাধাম ত্যাগ করল কদিন পরেই। ত্রিমারিকার তর সইল না। কামজ্বালা জুড়োনোর জন্যে মালা দিল তৃতীয় বরের গলায়। সে বেচারিও পটকে গেল বিষাক্ত সম্ভোগের ফলে, দিন কয়েকের মধ্যেই। এইভাবে পর পর দশ স্বামীকে পরলোকে পাঠিয়ে দেওয়ার পর সেই বিষকন্যার নাম দেওয়া হল 'দশমারিকা'। কিন্তু কামানল যে জ্বলছে দাউ দাউ করে। আবার বিয়ের ইচ্ছে ছিল নিলাজ সেই রমণীর, কিন্তু বাবা মত না দেওয়ায় স্বামী-খাকী রয়ে গেল বাপের বাড়িতেই।

এই সময়ে বাড়িতে এক রাতের জন্য থাকতে এল সুদর্শন এক যুবক।

যথারীতি ত্রিমারিকা চাইল তাকে স্বামীরূপে পেতে, শরীর যে জ্বলে যাচ্ছে। দহন যে প্রতিটি কোশে ছড়িয়েছে কামযন্ত্রের কারসাজি!

বাধা দিল বাবা, ফের? দশটা বর মরেছে।

যুবক বললে, তাতে কী? আমারও দশটা বউ মরেছে। সব শুনেই এসেছি। এবার লড়াই হোক সমানে সমানে!

বিয়েটা হয়ে গেল বটে গ্রামের লোক রাজি হওয়ায়, কিন্তু একাদশপতিও অক্কা পেল সামান্য পীতজ্বরে!

সন্ন্যাসিনী হয়ে গেল একাদশমারিকা!

হাসতে হাসতে যুবরাজ বললে, গোমুখ, তোমার গল্পের ভাঁড়ারে আরও আছে?

গোমুখ বলে, শোনাচ্ছি...

গ্রামবাসী এক গরিবের সম্বল ছিল একটা মাত্র বলদ। এদিকে সংসার বড়ো। ভরপেট কেউ খেতে পায় না। একেবারে নিরন্ন হয়ে যাওয়ার ভয়ে বলদ বেচবারও সাহস নেই মানুষটার।

একদিন হত্যে দিল দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে।

স্বপ্নে এলেন দেবী। বললেন, বলদ তোমার সামনে থাকবে সব সময়ে।

বাড়ি ফিরেও বলদ বেচবার সাহস হল না গরিব মানুষটার। একমাত্র সম্বল চলে গেলে আর যদি না হয়? সব শুনে এক বন্ধু বললে, তুমি একটা মূর্খ। বড়সর। দেবী তোমাকে বর দিয়েছেন, বলদ তোমার সামনে থাকবে সব সময়ে। এই বলদটাই থাকবে, এমন কথা তো বলেননি। এটাকে বেচে দাও। লাভ করো। রোজ কেনো নুতন বলদ, সস্তায়। বলদ তো তোমার সামনেই থাকছে। বেচে দাও চড়াদামে।

সত্যিই তাই হয়েছিল। গরিব মানুষটার আর অন্ন-অভাব ঘটেনি।

সৎ থাকলে দৈব সহায় হয় এইভাবেই, দুর্বল থাকলে হয় না।

এক যে ছিল ধড়িবাজ মন্ত্রী। হোক তার গল্প।

দাক্ষিণাত্যে এক রাজ্যে ছিল এক বিষম ধূর্ত পুরুষ। লোক ঠকানোই ছিল তার পেশা। কিন্তু ছোটোখাটো প্রতারণায় সে খুশি হতে পারছিল না। গেল রাজ দরবারে, মারি তো হাতি, লুটি তো ভাণ্ডার, এই মতলবে, সওদাগর সেজে।

প্রথমে ভেট দিল রাজাকে। তারপর আস্তে আস্তে বললে, আপনাকে আড়ালে কিছু কথা বলতে চাই।

সভা ফাঁকা করে দিয়ে রাজা বললে, কী কথা?

ছদ্মবেশী ধড়িবাজ বললে, রোজ সবার সামনে আপনি আমার সঙ্গে ফিসফিস করে কিছুক্ষণ কথা বলবেন। আমিও আপনাকে রোজ পাঁচশো সোনার টাকা দিয়ে যাব। আর কিছু নয়।

রাজা ভাবল এর মধ্যে দোষ কী? একটু ফিসফিস করলেই যদি রোজগার হয়, বড়োলোক বণিকটা হাতে থাকে, তবে তাই হোক।

রোজ রোজ এই ফিসফাস ব্যাপার দেখে রাজসভার কেষ্টবিষ্টুরা ভাবল, রাজার খুবই কাছের লোক এই সওদাগর, সুতরাং একে হাতে রাখা দরকার।

একদিন রাজসভায় বসে এক রাজ-অমাত্যের দিকে ঘন ঘন চেয়ে গেল ধূর্ত-শিরোমণি। সভাভঙ্গ হতেই বাইরে এসে সেই অমাত্য জিজ্ঞেস করল ছদ্মবেশী ধূর্তকে, অমন করে তাকাচ্ছিলেন কেন?

নির্বিকার মুখে ডাহা মিথ্যে বলে গেল ধূর্ত, লুটেপুটে খাচ্ছ দেশটাকে। রাজা জেনে ফেলেছেন। তাই দেখছিলাম তোমাকে।

রাজার এত কাছের লোককে এক হাজার সোনার টাকা ঘুষ দিয়ে তাকে হাতে রাখল অমাত্য।

পরের দিন রাজার সঙ্গে ফিসফাস সেরে বাইরে এসে ভিতু অমাত্যকে অভয় দিল ধূর্ত, রাজাকে বলে কয়ে খুশি করিয়েছি। তোমার ভয় নেই। আমি তোমাকে আগলে রাখব।

সুতরাং, মাঝে মাঝেই ধূর্তকে মোটা ঘুষ দিয়ে গেল ভয়কাতুরে অমাত্য।

এইভাবেই, আরও অনেক রাজসচিবকে ভয় দেখিয়ে পাঁচকোটি সোনার টাকা জমিয়ে ফেলল ধূর্ত।

তারপর একদিন রাজাকে পাঁচকোটি সোনার টাকা দিয়ে ধূর্ত বললে, এই অর্থ আপনার কৃপায় রোজগার করেছি। আপনি নিন।

রাজা খুশি হলেন। তিনি অর্থলোভী। অর্ধেক নিজে নিলেন, অর্ধেক ধূর্তকে দিলেন। উপরন্তু, তাকে প্রধানমন্ত্রী করে দিলেন।

এইভাবেই ধড়িবাজ ব্যক্তিরা সামান্য পন্থায় লোক ঠকিয়ে প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়।

গল্প শেষ করে বিয়ে করার পক্ষে চমৎকার একটা গল্প শুরু করল গোমুখ।

বললে, বিয়ের ইচ্ছে হয়েছে যখন, এই গল্পটা মনে ধরবে।

বুদ্ধিপ্রভ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর বড়ো রানির মেয়ে হেমপ্রভা আগের জন্মে ছিল বিদ্যাধরী। অভিশাপের ফলে জন্মেছে মানবী হয়ে, মনে ছিল আকাশ গমনের আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু সে বিদ্যে তো পায়নি

মানব জন্মে, তাই দোলনায় দোল খেতে খুবই ভালোবাসত। বারণ করতেন রাজা, কিন্তু শুনত না হেমপ্রভা। একদিন চড়িয়ে দিয়েছিলেন রাজা।

রাগ করে বনে চলে গেল হেমপ্রভা। নিজের হাতে কুঁড়ে বানিয়ে শুরু করল শিব-সাধনা।

অনেক খুঁজেও মেয়েকে না পেয়ে গুম হয়ে বাড়িতে বসে রইলেন রাজা। মন ভেঙে গেল। তারপর একদিন মন হালকা করার জন্যে গেলেন মৃগয়ায়।

দেখতে পেলেন মেয়ের হাতে তৈরি কুঁড়েঘর। ভেতরে বসে মেয়ে। শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছে। সেই রূপ আর নেই।

কেঁদে ফেলেছিলেন রাজা। কেঁদেছিল হেমপ্রভা। কেঁদেছিল বনের পশুপাখিরাও।

হেমপ্রভা কিন্তু আর বাড়ি ফিরতে চাইল না। শিবসাধনায় যে শান্তি পেয়েছে, তাতো রাজবাড়িতে নেই।

রাজা তখন গাছতলায় একটা মন্দির বানিয়ে দিলেন। রোজ খাবারদাবার আর কাপড়চোপড় পাঠাতে লাগলেন।

হেমপ্রভা কিন্তু বনের ফলমূল খেয়েই রইল। বাবার পাঠানো সব জিনিস দিয়ে অতিথি সেবা করে গেল প্রতিদিন। গড়ে উঠল একটা আশ্রম।

একদিন এক তাপসী এলেন আশ্রমে। হেমপ্রভা তাঁকে সেবা করার পর জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি সন্ন্যাসিনী হলেন কেন? এই কঠোর জীবন বেছে নিলেন কেন?

তাপসী বললেন, বাবা আমাকে লাথি মেরেছিল বলে।

পা টিপতে টিপতে ঢুলছিলাম এই দোষে।

হেমপ্রভাও তো বাবার হাতে মার খেয়ে গ্রহণ করেছে সাধনব্রত। পরম সমাদরে তাপসীকে রেখে দিল আশ্রমে। বন-বান্ধবী রূপে।

একদিন রাতে দেখল একটা স্বপ্ন। যেন একটা বিশাল নদী পেরিয়ে যাচ্ছে। পারে উঠতেই সামনে দেখল একটা সাদা হাতি। হাতির পিঠে পৌঁছল একটা পাহাড়ে, শিবমন্দিরে। বিগ্রহের সামনে বসে বীণা বাজিয়ে যখন শিবের গান গাইছে, এল এক দেবপুরুষ। তার সঙ্গে আকাশপথে এসে আশ্রম থেকে সন্ন্যাসিনীকে নিয়ে গগনমার্গে উঠতে না উঠতেই ঘুম গেল ভেঙে।

স্বপ্ন কাহিনি বলেছিল সন্ন্যাসিনীকে। শুনে তিনি বললেন, আগের জন্মে নিশ্চয় তুমি দেবী ছিলে। শাপগ্রস্ত হয়ে মানবী হয়েছে। এবার শাপ কাটবে।

সেইদিনই ঘোড়ায় চেপে এক রাজপুত্র এল আশ্রমে। ঘোড়া থেকে নেমে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল হেমপ্রভার দিকে।

কে আপনি? ....জানতে চেয়েছিল হেমপ্রভা।

রাজপুত্র বললে, আমি রাজা প্রতাপসেনের বড়ো ছেলে। আগের জন্মে বিদ্যাধর ছিলাম। শাপগ্রস্ত হয়ে মানব জন্ম নিয়েছি। আমার বাবা শিবের তপস্যা করেছিলেন বলে। শিবের ইচ্ছেতেই তাঁর আরও একটি ছেলে হয়েছে। শিবের ইচ্ছেতেই আমার শাপমোচন ঘটবে। বংশ আর রাজ্য রাখবে ছোটো ছেলে। আমি লক্ষ্মী সেন, তাঁর বড়ো ছেলে। আমার ভাইয়ের নাম শূরসেন। কিন্তু আপনি কে?

হেমপ্রভা আপন কথা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল তার পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত সে তো ছিল বিদ্যাধরী!

একই সঙ্গে ফিরে পেল বিদ্যাধরী অবস্থার সমস্ত বিদ্যা!

বললে হে রাজকুমার, আপনার খোঁজে এদিকে ঘোড়া চালিয়ে আসছেন আপনার যে মন্ত্রী, তিনিও ছিলেন বিদ্যাধর। আমার এই তাপসী বন-বান্ধবী, ইনিও ছিলেন বিদ্যাধরী। ছিলেন আপনার মন্ত্রীর স্ত্রী। আমি ছিলাম আপনার স্ত্রী। আজ আমরা চারজনেই শাপমুক্ত হলাম।

কথা শেষ হতে না হতেই মন্ত্রী এল ঘোড়ায় চেপে। একই সঙ্গে চারজনেই বিদ্যাধর অরূপ পেয়ে উড়ে গেল আকাশে, সুখে রইল বিদ্যাধরলোকে।

শেষ হল গোমুখের গল্প। হাল্কা মনে ঘুমিয়ে পড়ল নরবাহনদত্ত।

দিন কয়েক পরেই আকাশ থেকে জ্যোর্তিময়ী রূপে নেমে এল বিদ্যাধরী শক্তিযশা, বাবার সঙ্গে, বিদ্যাধর সৈন্যসামন্তসহ।

বিয়ে হয়ে গেল নরবাহনদত্তের সঙ্গে শক্তিযশার। কন্যাযাত্রীরা ফিরে গেল স্বস্থানে।

সুখে রইল নরবাহন দত্ত...

আর, শক্তিযশা।

৬৭. জয়েন্দ্রসেনা কাহিনি

শুধু তো শক্তিযশা নয়, যুবরাজ নরবাহনদত্তের অর্ধাঙ্গিনী হয়েছিল আরও অনেক সুরূপা। মদনমঞ্জুষা ছিল সুয়ো যুবরানি। সবাইকে নিয়ে পরমসুখে যুবরাজ দিন কাটিয়ে গেল বাবার কাছে, কৌশাম্বী'তে, বন্ধুবান্ধব পরিবৃত হয়ে।

বহু বউ নিয়ে একদিন কানন-বিহার করবার সময়ে অন্য এক দেশের দুই রাজকুমার এসে প্রণাম নিবেদন করল যুবরাজকে।

তারা এসেছে বৈশাখপুর রাজ্য থেকে। একটা বিরোধ নিয়ে। মীমাংসা করে দিতে হবে নরবাহনদত্তকে।

রাজার দুই রানির দুই ছেলে তারা। একজনের মা আর একজনের সৎমা। বিরোধের বীজ সুপ্ত রয়েছে দুই ভাইয়ের মধ্যে। বর্তমান বিরোধ তুচ্ছ একটা বিষয় নিয়ে।

রুচিরদেব যার নাম, তার আছে একটা মেয়ে হাতি। পোতক যার নাম, আর আছে দুটো ঘোড়া।

দৌড়বাজ তিনটে প্রাণিই। নক্ষত্রবেগে দৌড়ায় মেয়ে হাতি, সমান বেগে দৌড়ায় দুই ঘোড়া।

কিন্তু রুচিরদেব বলতে চায়, তার মেয়েহাতি দৌড়োয় পোতক-এর দুই ঘোড়ার চেয়ে বেশি জোরে। বাজি ধরা হয়েছে পরস্পরের মধ্যে। দৌড়-প্রতিযোগিতায় যার জীব হারবে, তাকে সেই জীব দিয়ে দিতে হবে অপরজনকে।

কিন্তু দৌড় করাবে কে? মধ্যস্থ হতে পারে কেবল নরবাহনদত্ত, তার সুনাম-সুবিচারের প্রশংসা দিকে দিকে।

তর সইল না সরবাহনদত্তের। সেই মুহূর্তে দুই রাজপুত্রের আনা রথে চেপে গেল বৈশাখর পুরে। সটান রাজপ্রাসাদের মধ্যে। তার রূপ দেখে থ হয়ে গেল রাজ-অঙ্গনারা। দেবপুরুষ নাকী?

নরবাহনদত্ত নিজেও থ হয়ে গেছিল প্রাসাদের ভেতরে তৈরি আশ্চর্য এক মন্দির দেখে। মদনদেব-এর বিগ্রহ আছে মন্দিরে। আদিরসের আকর যেন সেই বিগ্রহ। আশপাশের প্রতিটি বায়ুকণিকায় যেন বিধৃত রয়েছে শৃঙ্গার আর সম্ভোগের সম্ভার। মন্দিরমধ্যে দাঁড়ালেই গা শিরশির করে ওঠে, রক্ত চঞ্চল হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস সখন হয়, আসঙ্গলিপ্সা আতীব্র হয়।

হয়েছিল নরবাহনদত্তের। সেও তো মানুষ।

রুচিরদেব-এর বাড়ি মন্দিরের গায়ে। আস্তাবল আর হাতিশালায় দাঁড়িয়ে অনেক ঘোড়া আর হাতি। গোটা বাড়িটাকে সাজানো হয়েছে নরবাহনদত্ত আসবে বলে।

এই বাড়িতেই তার সঙ্গে আলাপ হল রুচিরদেব-এর একমাত্র বোন জয়েন্দ্রসেনার সঙ্গে। কুমারী। রূপসী। যেন চলমান বিদ্যুৎ। পাপড়ি মেলে ধরা পদ্ম। কস্তুরি সৌরভে সুবাসিত। চাহনিতে আমন্ত্রণ, শয্যায়।

বিমোহিত হয়েছিল নরবাহনদত্ত, যদিও তার অন্তঃপুরে ঠাসা রয়েছে বহু বধূ, সদ্য এসেছে শক্তিযশা।

বিনিদ্র নয়নে রাত কাটাল নরবাহনদত্ত। পাশেই মদন মন্দির। একই বাসমন্দিরে আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তির জীবন্ত আধার।

পরের দিন প্রভাতেই সাঙ্গ হল রেষারেষির দৌড় প্রতিযোগিতা। অশ্বচালনা আর গজচালনা, দুই বিদ্যাতেই নিপুণ নরবাহনদত্ত পর্যায়ক্রমে চালনা করেছিল মেয়ে হাতি আর অশ্ব-যুগলকে। রায় দিয়েছিল রুচিরদেব-এর পক্ষে। তার মেয়ে হাতিই বেশ দৌড়বাজ পোতক-এর যুগল ঘোড়ার চেয়ে।

এটাও ঠিক যে, নরবাহনদত্ত আগেই মজেছিল রুচিরদেব-এর বোনকে দেখে। গজ-সম্প্রীতির মূলে সেই কারণটাও থাকতে পারে। কাম যে প্রথম রিপু! সর্বশক্তিমান!

কামদেব সম্ভাষণে তাকে অভিবাদন জানিয়ে গেল এক ধনবান বণিক দৌড় প্রতিযোগিতার ঠিক পরেই। কামদেব আখ্যা দিয়েই প্রস্থান করেনি অবশ্য। শুনিয়েছিল অতীব আশ্চর্য আত্মকাহিনি।

কাহিনিটা এই :

আমার নাম চন্দ্রসার। নিবাস চম্পা নগরে। আমার বাবার নাম কুসুমসার। পেশা, বাণিজ্য। আচরণে, ধার্মিক। শিবের কৃপায় আমি তাঁর ঔরসজাত পুত্র।

একদিন যাত্রা দেখতে গেছিলাম বন্ধুদের নিয়ে। দেখেছিলাম, এক বড়োলোক বণিক দেদার টাকা দান করছে।

দেখে ঈর্ষা হয়েছিল, বাবার কুবের-সম্পত্তি সত্ত্বেও। ধন-লালসা এমনই হয়। ইচ্ছে হয়েছিল, আমিও প্রচুর টাকা কামাবো, টাকা ওড়াবো।

রত্নবোঝাই ময়ূরপঙ্খী বজরা নিয়ে রওনা হলাম সমুদ্র পেরিয়ে দ্বীপ অভিমুখে।

পৌঁছোলাম সেই দ্বীপে। কিন্তু আমি তো জহুরি নই। জহর চিনি না। দ্বীপের রাজা বুঝে নিয়েছিল, আমি আনাড়ি। তাই আটকে রাখল জেলখানায়।

মন্ত্রী কিন্তু জানত আমার পিতৃ-পরিচয়। রাজাকে বুঝিয়ে মুক্তি দিল জেলখানা থেকে। রাজার আদর পেলাম, বন্ধুত্ব পেলাম, ওই দ্বীপ থেকেই দ্বীপে-দ্বীপে বাণিজ্যের অধিকার পেলাম।

একদিন দেখলাম এক পরমাসুন্দরী যুবতীকে, বসন্ত উৎসবের মেলায়। দেখেই বিয়ে করার ইচ্ছে হল। সটান গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব রাখলাম তার বাবার কাছে। তিনি একজন স্বনামধন্য বণিক।

সমানে-সমানে এই বিয়েতে তাঁর আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু তিনি আপত্তি করলেন।

বললেন, কোনও কারণে আমার কন্যাকে আমি দান করতে পারছি না। পাঠিয়ে দিচ্ছি ওর মামার কাছে। সেখানে গিয়ে তার অনুমতি নিয়ে বিয়ে করো। মামা থাকে সিংহল দ্বীপে। আমি জানিয়ে দিচ্ছি, সে যেন অনুমতি দেয়।

অদ্ভুত কথা! কিন্তু আমি তখন বিয়ের জন্যে পাগল। সুতরাং, চোখের সামনে দিয়ে সেজেগুজে পাত্রী চলে গেল সিংহল দ্বীপে, জাহাজে চেপে। আমিও আর একটা জাহাজ নিয়ে পেছন পেছন যাওয়ার জন্যে যখন তোড়জোড় করছি, যেন হাওয়ায় চলে এল সেই বুকভাঙা দুঃসংবাদ।

জাহাজডুবি হয়েছে। ভাবী বউ জলের তলায়!

কিন্তু খটকা লাগল মনে। সব্বাইকে নিয়েই তো জাহাজ ডুবেছে। তাহলে খবরটা আনল কে?

যাচাই করবার জন্যে রওনা হলাম তৎক্ষণাৎ। কিন্তু কপাল মন্দ। ঝড় উঠল। জাহাজ ডুবল। আমি একটা একটা কাঠ আঁকড়ে ধরে ভাসতে ভাসতে পৌঁছোলাম তীরভূমিতে। বালির ওপর পড়েছিল একটা সোনার টুকরো। তুলে নিয়ে গিয়ে কাছের গ্রামে বেচে দিলাম। সেই টাকায় কাপড়চোপড় কিনে, খেয়েদেয়ে যখন উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরছি, এক জায়গায় দেখলাম, বালিতে পোঁতা একটা শিবলিঙ্গ পুজো করছে এক মুনির মেয়ে। আরও অনেক মুনির মেয়ে ঘোরাফেরা করছে সেখানে।

পূজারতা মেয়েটি প্রকৃতিই অপরূপা? যদিও পরণে শুধু গাছের ছাল, তা সত্ত্বেও রূপ যেন স্নিগ্ধ আভা বিলিয়ে যাচ্ছে।

ঠিক যেন সেই হারিয়ে যাওয়া পাত্রী, সমুদ্রে ডুবে নাকি যার মরণ হয়েছে!

সাহস করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কে গো তুমি? প্রাসাদে তোমাকে মানায়, অরণ্যে নয়।

সে জবাব দিল না। উঠে চলে গেল, আমাকে দেখতে দেখতে। তার এক বান্ধবী মুনি-মেয়ে এসে আমাকে বললে, এই মেয়ের বাবার নাম শিখর। পেশায় বণিক, নিবাস অন্য এক দ্বীপে। এর মা নেই। শিখর-বণিকের এক জ্ঞানী বন্ধু বলেছিল, এই মেয়ের বিয়ের আসরে কন্যাদান পর্ব যেন তোমার হাতে না হয়, হলে মেয়ে

মরবে। তাই মেয়েকে পাঠিয়েছিল সিংহল দ্বীপে, মামার হাত দিয়ে সম্প্রদানের জন্যে। কিন্তু জাহাজডুবি হয়ে মেয়েটি ভেসে আসে এখানে। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল বালিতে। আশ্রমে নিয়ে আসেন আমার বাবা। বেলাভূমিতে পাওয়া গেছিল বলে এর নাম রাখা হয়েছে বেলা। আমি ধ্যান বলে জেনেছি, বেলা ছিল তোমার আগের জন্মের অর্ধাঙ্গিনী। এস, তোমার হাতে ওকে সম্প্রদান করি। তোমরা সুখী হও।

মুনির মেয়ের সঙ্গে গেলাম আশ্রমে। আশ্রম-পিতা মতঙ্গ মহামুনি বেলাকে সম্প্রদান করলেন। আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আমরা রয়ে গেলাম আশ্রমে।

আমার এই মতঙ্গ মুনিই আমাদের অভিশাপ দিয়ে বসলেন আমাদেরই চপলতার দোষে। জল ছুঁড়ে খেলা করছিলাম, উনি কাছেই স্নান-জপ করছিলেন। গায়ে ছিটে লাগতেই রেগে গিয়ে বললেন, ছাড়াছাড়ি হোক তোদের!

কাকুতিমিনতি করায় নরম হলেন। বললেন, মেয়ে হাতি ছুটিয়ে জোড়া-ঘোড়ার বেগকেও যে হারিয়ে দেবে, সেই নরবাহনদত্তকে দর্শন করলেই শাপান্ত হবে, ফের মিলন হবে।

বলে তিনি চলে গেলেন শ্বেত-দ্বীপে। তাঁর মেয়েও গেল বাবার সঙ্গে।

ব্রহ্মশাপের ভয়ে আর মুনি শূন্য আশ্রমে থাকা সমীচীন নয় মনে করে বেলাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, ইচ্ছে দেশে ফিরে যাওয়ার।

কিন্তু ব্রহ্মশাপ কাটাতে পারলাম না। সাগরের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা জাহাজ দেখেছিলাম। বণিকের জাহাজ। বেলাকে আগে তুলে দিয়েছিলাম। আমি ওঠবার আগেই অতর্কিতে তুমুল ঝড় এসে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গেল জাহাজকে, দূর হতে দূরে।

আম জ্ঞান হারিয়েছিলাম। এক সন্ন্যাসী এসে আমার জ্ঞান ফিরিয়ে আশ্রমে নিয়ে যায়। কিছুদিন পরে ঝড়ে বেসামাল একটা বাণিজ্য-জাহাজ এসে ভিড়েছিল তীরে। ভাঙা জাহাজের বণিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে দুজনে মিলে হাঁটা শুরু করেছিলাম। আজ এসে পৌঁছেছি এখানে, দেখলাম আপনাকে, কেটে গেল ব্রহ্মশাপ।

সত্যিই কেটে গেল ব্রহ্মশাপ। ঠিক সেই মুহূর্তে এসে পৌঁছোল বেলাকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকজন বণিক, সেই জাহাজের বণিক, যে জাহাজে বেলাকে তুলে দিতেই জাহাজকে উড়িয়ে নিয়ে গেছিল ঝড়। মতঙ্গমুনির অভিশাপ কাহিনি শুনে বেলাকে নিয়ে বণিকরা খুঁজে খুঁজে এসেছে যুবরাজ নরবাহনদত্তের সামনে।

সহর্ষে বেলা সহ চন্দ্রসার স্বদেশ অভিমুখে প্রস্থান করতেই রুচিরদেব ধরে বসল নরবানদত্তকে, বোনকে যখন মনে ধরেছে, তখন বিয়েটা হয়ে যাক এখুনি।

সাঙ্গ হল বিবাহ-পর্ব। ঘোড়া আর হস্তিনী দৌড় করানোর পুরস্কার, নতুন আর এক বউ। সঙ্গে উপহার পেল দৌড়পটু দুই ঘোড়া আর দৌড়পটিয়সী হস্তিনীকেও!

ফিরে এল কৌশম্বীতে বউ-ভাড়ারে ঢুকল আর এক বউ!

৬৮. ললিতলোচনা কাহিনি

যুবরাজ নরবাহনদত্তকে কাম-বণিক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই সওদায় সে সিদ্ধহস্ত। রূপসী সংগ্রহে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

একদিন নিশীথ রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তার মনে হল, যেন এক দেবললনা তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে আকাশপথে, যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখছে এই স্বপ্ন।

ঘুম ভাঙল ক্ষণপরেই। দেখল, স্বপ্ন নয়, সত্যি। সে শুয়ে রয়েছে খুব উঁচু এক মেঘালয় পাহাড়ি অঞ্চলে, গাছতলায়, পদ্মরাগমণি খচিত পাথরের বেদিতে। তখনও রাত কাটেনি। আঁধারেও ঠাহর করা যাচ্ছে, এক দেবললনা অঙ্গবিচ্ছুরিত প্রভায় চারপাশ সমুজ্জল করে বসে রয়েছে তার পাশে।

সে এক অপূর্ব অভূতপূর্ব দৃশ্য। নরবাহনদত্ত নিমেষে বুঝে নিল, এই ললনাই তাকে ঘুমের মধ্যে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে অদৃষ্টপূর্ব এই অঞ্চলে, কামনায় অস্থির হয়ে, কিন্তু প্রকৃত নারী বলেই নিঃসীম লজ্জায় তা মুখে প্রকাশ করতে পারছে না, কষ্ট হচ্ছে, তবুও বেহায়া হতে পারছে না।

প্রেম বিষয়ে চতুর চূড়ামণি নরবাহনদত্ত তখন মেয়েটির মনোভাব বোঝবার জন্যে যেন ঘুমের ঘোরে কথা শুরু করেছিল, মদনমঞ্জুষা! মদনমঞ্জুষা! কোথায় তুমি? এস না, এক হয়ে যাও আমার সঙ্গে!

মেয়েটি ধরে নিল, নারী সান্নিধ্যে আসঙ্গ লিপ্সা লেলিহান হয়েছে নরবাহনদত্তের প্রতিটি রোমকূপে। নিজের যৌনকামনার নিবৃত্তির জন্যেই তো মানুষটাকে সে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে তার ঘুমন্ত অবস্থায়। এমতাবস্থায় সরম রাখা সমীচীন নয়।

সুতরাং স্বীয় বিদ্যাবলে সে রূপ পালটে নিল নিজের, হয়ে গেল মদনমঞ্জুষা, নরবাহনদত্তের বড়ো বউ, যাকে ঘুমের ঘোরে খুঁজছে কুমারদেব। তারপর, উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল নরবাহনদত্তের ওপর। জড়িয়ে ধরল গলা। ঠোঁট রাখল ঠোঁটে।

চোখ খুলল নরবাহনদত্ত। চমকিত নয়নে দেখল, আর এক মদনমঞ্জুষা... হুবহু একইরকম এক মদনমঞ্জুষা... কামাতুরা লোচনে দেখছে তাকে, চাহনির নীরব ইসারা অতিশয় স্পষ্ট।

দিব্যশক্তিময়ী চাইছে নিবিড় নিপীড়ন, প্রতি অঙ্গ দিয়ে প্রতি অঙ্গের মিলন...

অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিল নরবাহনদত্ত, একী বিশেষ জ্ঞানের লীলা দেখাচ্ছে লীলাময়ী!

বলেই, সবলে সকাম আলিঙ্গন দিয়েছিল লাবণ্যময়ীকে। হাস্যমুখর আলিঙ্গন।

রমণী বুঝেছিল, নরবাহনদত্ত তার কৌশল ধরে ফেলেছে। সুতরাং আর কেন ছলনা?

মুহূর্তে ফিরিয়ে এনেছিল নিজের প্রকৃত রূপ, বাহুবন্ধনে থাকা অবস্থাতেই। বলেছিল স্খলিত কণ্ঠে, আর যে পারছি না, যুবরাজ। এই মুহূর্তে আমাকে রমণ করুন। সেই রমণকে বৈধ করে নিচ্ছি আপনাকে বিয়ে করে, গান্ধর্ব মতে।

স্বয়ংবরা হল সুরূপা। রজনী আতিবাহিত হল সুখসাগরে ভেসে।

এখন তো আশ্চর্য এই কামিনীর বৃত্তান্ত জানা দরকার। এবং তা কৌশলে বের করতে হবে কৌশল্যার মুখ থেকে।

তাই শুরু করল এক গল্প।

সেই মহামুনির নাম ছিল ব্রহ্মসিদ্ধি। প্রকৃতই সিদ্ধপুরুষ। বহু বিশেষ জ্ঞান, যার অপর নাম বিজ্ঞান, অর্জন করেছিলেন যোগবলে।

এই পর্যন্ত বলে আড়চোখে দেখে নিল সরবাহনদত্ত। তন্ময় হয়ে বিজ্ঞানের গল্প শুনছে নব-দয়িতা, বিশেষ জ্ঞানের কৌশল দেখিয়ে যে অর্জন করেছে নরবাহনদত্তকে, স্বামীরূপে।

ব্রহ্মসিদ্ধির আশ্রমের অনতিদূরে পাহাড়ের গুহায় থাকত এক বুড়ি শিয়াল। কদিন একনাগাড়ে ঝড় আর বৃষ্টির উৎপাতে খাবারের খোঁজে বেরোতে পারেনি বিবর থেকে।

শেষে আর পারল না খিদের জ্বালা সইতে। কিন্তু খাবার পাওয়ার আগেই তেড়ে এল এক বুনো হাতি, তার বউ হারিয়ে গেছে, মাথার ঠিক নেই।

আশ্রমে বসে তা দেখলেন ব্রহ্মসিদ্ধি। চক্ষের নিমেষে বুড়ি শিয়ালকে যুবতী হস্তিনী বানিয়ে দিলেন। যে রোগের যে দাওয়াই। কামরোগে ক্ষিপ্ত হয়েছিল হাতি। মেয়ে হাতি পেয়েই আগেই কামের আগুন মিটিয়ে নিল। তারপর হস্তিনী-প্রেমে মুগ্ধ হয়ে চলে গেল অন্যত্র, যুগলে। তারপরেই ঘটল একটা দুর্ঘটনা। প্রেমিকা হস্তিনীকে লালপদ্ম উপহার দেবে বলে পদ্ম দীঘিতে নেমেছিল হাতি। পাঁকে পা আটকে গেছিল। আর উঠতে পারেনি।

হস্তিনীরূপী শেয়ালনি চম্পট দিল অন্য বনে। পেল আর একটা মদ্দা হাতি। সুখে থেকে গেল তার সঙ্গে।

বুনো হাতির যে আগের বউ, সে ঠিক এই সময়ে মদ্দা হাতির সন্ধানে এসে গেছিল পদ্মদীঘির পাড়ে। প্রাণের মায়া না রেখে, শুঁড় দিয়ে মদ্দা হাতিকে টেনে তুলবে বলে, নেমে পড়েছিল দীঘিতে। নিজেও আটকে গেছিল পাঁকে।

ব্রহ্মসিদ্ধি হঠাৎ এসেছিলেন সেখানে। সিদ্ধাই প্রয়োগ করেছিলেন। হাতি-যুগলকে পাঁক থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

বিজ্ঞানের গল্প শেষ করে পরিশেষে জ্ঞানের আরক দিয়ে গেল নরবাহনদত্ত, কুল যদি সৎ হয়, বন্ধুকে কখনও বিপদে ফেলে যায় না, বরং বিপদ থেকে বারে বারে উদ্ধার করে। কিন্তু কুল যদি নীচ হয়, তাহলে স্বার্থ ছাড়া কিছু দেখে না, নিঃস্বার্থ দয়া-মায়া উপকারের ধার ধারে না।

গল্প আর জ্ঞান শ্রবণ করে সেই অপরূপা অসম্ভব-সম্ভব-কারিণী নারী, যে মনের মানুষকে ঘুমন্ত অবস্থায় অপহরণ করে বিবাহের মাধ্যমে কাম চরিতার্থ করে, সে বললে, হে মনমোহন, হে রমণ-অক্লান্ত বিস্ময়-পুরুষ, শুনুন তাহলে এক অভিনব কাহিনি...

বাহুশক্তি ছিলেন কান্যকুব্জ দেশের রাজা। তাঁর অধীনস্থ এক ব্রাহ্মণ বিলক্ষণ প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন জ্ঞান আর বুদ্ধির দৌলতে। তাঁর স্ত্রী-র নাম বসুমতী। সতী রমণী, পতি ভিন্ন মনে অন্য কোনও পুরুষকে ঠাঁই দিতেন না। এঁদের ছেলের নাম বামদত্ত। সুন্দর, শিক্ষিত। বিয়ে করে শশিপ্রভা নামে এক মেয়েকে। শ্বশুর-শাশুড়ির মৃত্যুর পর এক যোগিনীর কাছে শিখেছিল শাকিনী মন্ত্র। অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে শুরু করেছিল ব্যভিচার, স্বামীকে না জানিয়ে।

বামদত্ত রাজদরবারে যেত কাজ করত। বেশির ভাগ সময় সেখানেই থাকত। একদিন সেখানে গেল তার কাকা। বললে, বংশে কালি দিচ্ছে তোমার বউ। নিজের চোখে দেখে এলাম নিলাজ বারাঙ্গনার মতো লালসা মিটাচ্ছে তোমার মোষের খাটাল যে দেখে, তাকে দিয়ে।

বামদত্ত তক্ষুনি একখানা কৃপাণ বাগিয়ে চলে গেল নিজের বাড়িতে। কিন্তু লুকিয়ে রইল ফুলবাগানে। রাত হতেই মোষরক্ষক এল বাগানে। তার স্ত্রী-ও থালাভর্তি খাবার নিয়ে এল সেখানে। নিজের হাতে খাওয়াল তাকে, সেইসঙ্গে চলল ঢলাঢলি। তারপর দুজনে যেই বাড়ির মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছে, শয্যায় রতিতৃপ্তির জন্যে, রে-রে করে তেড়ে গেল বামদত্ত কৃপাণ উঁচিয়ে।

ঘুরে দাঁড়াল তার স্ত্রী। একমুঠো ধুলো কুড়িয়ে নিয়ে মন্ত্র পড়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, থেমে যা!

শুধু যে চলৎশক্তি রহিত হল বামদত্তর তা তো নয়, নিমেষে হয়ে গেল একটা মোষ! কিন্তু মনুষ্য-স্মৃতি থেকে গেল মস্তিষ্কে।

এরপর শুরু হল প্রহার। মোষ-রক্ষককে দিয়ে চাবকে ক্ষতবিক্ষত করা হল মোষরূপী স্বামীকে। টেনে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখা হল খাটালে।

ঘটনাক্রমে ঠিক ওই সময়ে অন্যগ্রাম থেকে মোষ কিনতে এসেছিল এক ব্যবসাদার। শশিপ্রভা বেচে দিল মোষরূপী স্বামীকে।

একে তো মারের চোটে ধুঁকছিল বামদত্ত, এখন তার ঘাড়ে চাপানো হল বিস্তর মালপত্র। মারতে মারতে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হল গঙ্গাতীরের এক গ্রামে।

কেঁদে ফেলেছিল বামদত্ত। একে মারের যন্ত্রণা, তার ওপর ঘরের বউয়ের কালসাপের মতো আচরণ, যা আরও অসহ্য।

ঠিক তখনই সেখান দিয়ে যচ্ছিলেন এক যোগিনী। মোষের চোখে জল দেখে দাঁড়ালেন। মন দিয়ে বুঝলেন রোদনের অর্থ, মনের চোখ দিয়ে দেখলেন, মোষের আকারে রয়েছে এক মানুষ, তার মান বামদেব।

মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে দিতেই মোষ-কলেবর পালটে নিয়ে মানুষ হয়ে গেল বামদেব। যোগিনী তাকে নিজের বাড়িতে এনে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। মুঠো ভরে দিলেন মন্ত্রপড়া সর্ষে। বললেন, তোমার আগের বউয়ের গায়ে ছিটিয়ে দেবে, সে ঘোড়া হয়ে যাবে।

নতুন বউকে নিয়ে বাড়ি ফিরে ঠিক তাই করেছিল বামদেব। শশিপ্রভার গায়ে ছুড়ে মেরেছিল মন্ত্রপড়া সর্ষে। নিমেষে মেয়ে-ঘোড়া হয়ে গেছিল শশিপ্রভা। তাকে আস্তাবলে বেঁধে রেখে আশ মিটিয়ে চাবকেছিল

বামদেব। সেই একবার নয়, রোজ। খেতে বসবার আগে ঘোড়ানি শশিপ্রভাকে গুণে গুণে সাতবার লাঠিপেটা করত।

একদিন বাড়িতে এল এক অতিথি। তাকে নিয়ে খেতে বসেই মনে পড়ে গেল বামদেবের, এই যাঃ! আজকে তো লাঠিপেটা হয়নি। তখুনি গেল আস্তাবলে। গুণে গুণে সাতবার লাঠি হাঁকড়ে, হালকা মনে বসল থালার সামনে।
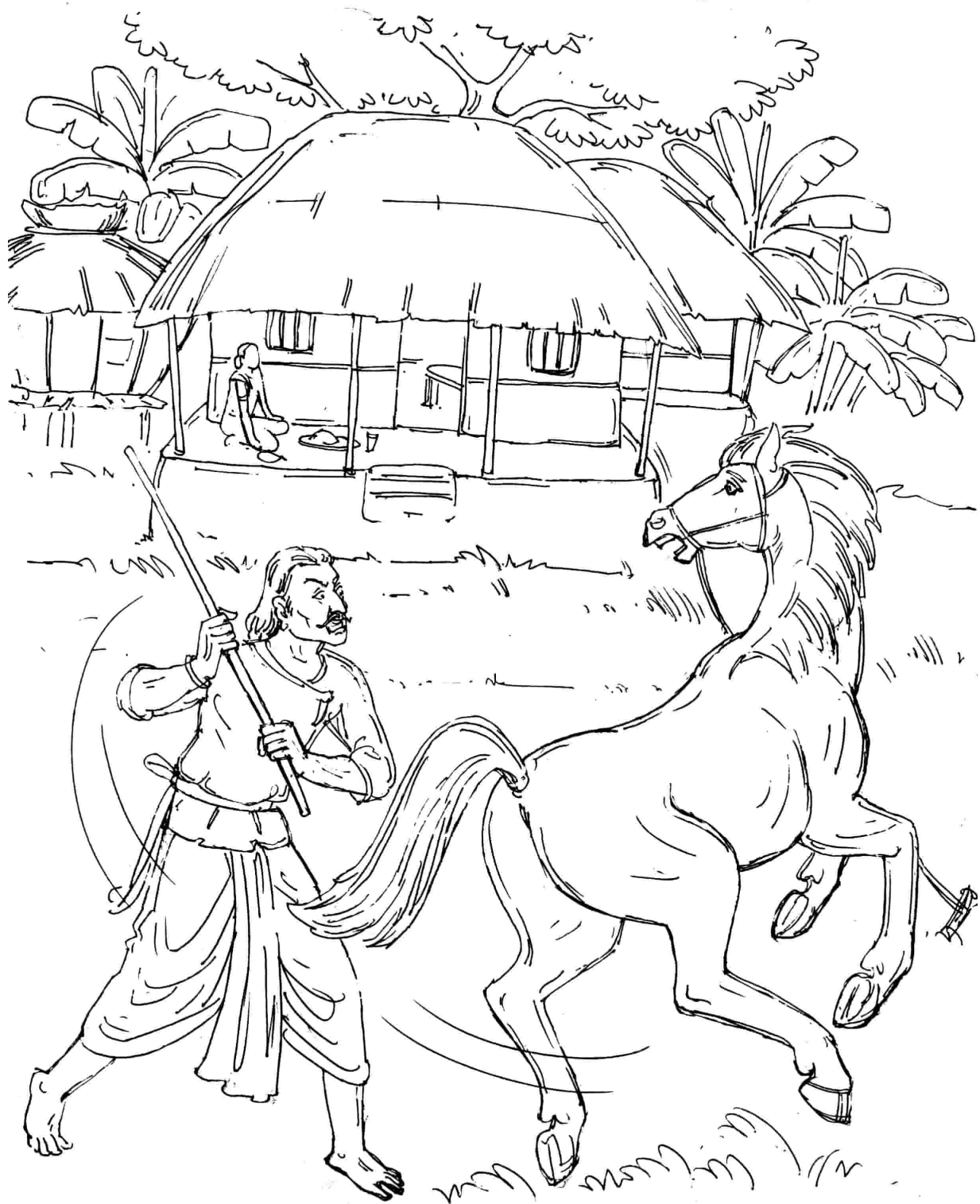
খেতে বসবার আগে ঘোড়ানি শশিপ্রভাকে গুণে গুণে সাতবার লাঠিপেটা করত।

অতিথির কৌতুহল জেগেছিল। খেতে বসে, না খেয়ে, উঠে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করেছিল।

সব শুনে সৎ উপদেশ দিয়েছিল অতিথি, খামোকা রাগ পুষে না রেখে বরং আপনার শাশুড়ির সেবা করুন, যিনি আপনার পশুরূপ ঘুচিয়ে দিয়ে মানুষরূপ ফিরিয়ে দিয়েছেন।

কথাটা মনে ধরেছিল বামদত্তর। অতিথি বিদায় নেওয়ার পর একদিন সস্ত্রীক চলে গেছিল শাশুড়ির কাছে।

তার অভিপ্রায় শুনলেন যোগিনী। মেয়ে-জামাইকে দীক্ষা দিলেন। কাল-সঙ্কর্ষিনী, বিদ্যা শিখিয়ে দিলেন। বামদত্ত সাধনা করল শ্রীপর্বতে গিয়ে। সিদ্ধিলাভ করে পেল একটা দৈব কৃপাণ, যার দৌলতে হয়ে গেল বিদ্যাধর, বিদ্যাধরী হল তার স্ত্রী। মলয় পাহাড় চুড়োয় অত্যাশ্চর্য প্রাসাদ বানিয়ে নিল বিদ্যাধর-বিদ্যা প্রয়োগে, সুখে রয়ে গেল সেখানে দুজনে।

তাদের মেয়ের নাম ললিতলোচনা। এই সেই মলয় পাহাড়। দৈববাণী হয়েছিল তার জন্মের সময়ে, এই মেয়ের স্বামী হবে নরবাহনদত্ত।

কাহিনি শেষ করে সুন্দরী বললে, আমিই ললিতলোচনা। আমার কপালের লিখন অনুসারে, আপনি আমার স্বামী। তাই আপনাকে এনেছি, বিয়ে করেছি।

লালিতলোচনাই বিদ্যাধরী বিদ্যা খাটিয়ে খবরটা জানিয়ে দিল নরবাহন দত্তর বিশাল পরিবারে।

সুখী হল সবাই। সুসংবাদ। আর এক বধূ অর্জন করেছে যুবরাজ!

৬৯. বিনয়বতী কাহিনি

অরণ্য-কাননে পরমানন্দে রতিবিহার করে গেল যুবরাজ নরবাহনদত্ত। নতুন বউ, নতুন স্বাদ। পুরোনো বউদের কথা কিছুদিন মনে থাকে না।

তারপর মনে পড়ে, স্মৃতির দহন শুরু হয়ে যায়। ফুল তুলতে তুলতে ললিতলোচনা একদিন চোখের আড়াল হতেই মদনমঞ্জুষা বিরহে আচ্ছন্ন হয়ে গেছিল যুবরাজ। অত্যুগ্র কামনায় চোখে অন্ধকার দেখেছিল। জ্ঞান হারিয়েছিল।

ঠিক এই সময়ে এক তাপস এসেছিলেন দীঘির জলে স্নান করবেন বলে। তাঁর নাম সিশঙ্গজট। যোগবলে বুঝে গেছিলেন, বিশেষ এক রমণীকে রমণ করতে না পেরে কামজ্বরে বেহুঁশ হয়েছে মানুষটা। মোক্ষম দাওয়াই প্রয়োগ করলেন তিনি, চন্দন বেটে জলে গুলে গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। শীতল হল সর্বাঙ্গ। মূর্চ্ছাবস্থায় নরবাহনদত্তের মনে হল যেন স্বয়ং মদনমঞ্জুষা কোমল করস্পর্শ দিয়ে যাচ্ছে। ঘোর কেটে গেল।

চোখ খুলে দেখল, দুই চোখে বিচিত্র কিরণ বিছিয়ে এক মুনি তাকিয়ে আছেন তার দিকে। তৎক্ষণাৎ তাঁকে প্রণাম নিবেদন করেছিল নরবাহনদত্ত।

দিব্যদৃষ্টি দিয়ে তার বর্তমান আর ভবিষ্যৎ জেনে ফেলেছিলেন সিশঙ্গজট মুনি। নিয়ে গেছিলেন নিজের আশ্রমে। শুরু করেছিলেন এক বিচিত্র উপাখ্যান।

অযোধ্যার রাজা অমরদত্তর ছেলে ছিল বহু গুণের আধার। অথচ বিনয়নম্র। প্রকৃত বীর। কিন্তু মুখে আস্ফালন ছিল না। তার নাম, মৃগাঙ্কদত্ত।

মৃগাঙ্কদত্তর দশ বন্ধু। দশজনের নাম বিশেষ শক্তিসূচক। শক্তিমান দশজনেই।

বলবীর্যের প্রতীক মৃগাঙ্কদত্ত কিন্তু বিয়ে করেনি মনের মতো বউ পায়নি বলে।

একদিন তার বন্ধু ভীমপরাক্রম বললেন, কাল রাতে যা ঘটেছে, তা বলছি...

ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, অত বড়ো প্রাসাদের মধ্যে সিংহ ঢুকেছে। আমার দিকে তেড়ে আসছে। আমি ক্ষুর তুলে ধরতেই, সিংহ ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুট দিল। আমি পেছন নিলাম। সে গেল নদীর ধারে। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁ করতেই আমি তার জিভ কেটে দিলাম। জিভকাটা সিংহ সেতুর ওপর দিয়ে নদী পেরিয়ে গেল। আমি পেছনে ধেয়ে গেলাম। ওপারে পৌঁছেই সিংহর চেহারা পালটে গেল। হয়ে গেল একটা মানুষ। কিন্তু তার প্রত্যেকটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকৃত। অতিশয় কদাকার।

সে বললে, আমি বেতাল। তোমার সাহস দেখে খুশি।

আমি বললাম, আপনি বেতাল? তাহলে বলবেন, কে হবে বন্ধু মৃগাঙ্কদত্তের বউ?

—শশাঙ্কবতী। উজ্জয়িনীর রাজা কর্মসেনার মেয়ে। বলেই, বাতাসে মিলিয়ে গেল বেতাল।

অন্যান্য বন্ধুদের ডেকে ভীমপরাক্রমের গল্প বলে গেল মৃগাঙ্কদত্ত। তারপর বললে-এবার বলি, আমি যে স্বপ্ন দেখেছি।

স্বপ্নে মনে হল আমরা এই এগারোজনে যেন ঢুকেছি এক বিরাট বনে। তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে। অতি কষ্টে জলের সন্ধান পেলাম। চুমুক দিতে যাচ্ছি, বাধা দিল পাঁচজন সশস্ত্র পুরুষ। বধ করলাম তাদের। ফের চুমুক দিতে গেলাম, অদৃশ্য হয়ে গেল তড়াগ আর সেই পাঁচটা মৃতদেহ। তেষ্টায় যখন ছটফট করছি, শিবঠাকুর দেখা দিলেন। তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি তাঁর ডান চোখ থেকে এক ফোঁটা জল মাটিতে ফেললেন, নিমেষে সেই এক বিন্দু জল পরিণত হল এক প্রকাণ্ড জলধিতে। তার মধ্যে পেলাম বিচিত্র একটা মুক্তামালা। গলায় পরলাম। পেলাম একটা নর করোটি। তাই দিয়ে জল তুলে খেতে খেতে জলাধির সব জল শুকিয়ে দিলাম।

ঘুম ভেঙে গেল তৎক্ষণাৎ। তখন ভোর হয়েছে।

বন্ধুবর বিমলবুদ্ধি বললে, স্বপ্ন আপনাকে দেখিয়েছে, মুক্তামালা আপনার গলায়। জলধির জল পান করে শুকিয়ে দেওয়ার পর। এর অর্থ, কন্যা শশাঙ্কবতী আপনার অঙ্ক আলো করবে, আপনাদের আলোয় জগৎ প্রতিভাত হবে, আপনি পৃথিবীর অধিপতি হবেন, জলধি সমান স্থলদেশ আপনার পদতলে আসবে। কিন্তু রাজা কর্মসেনা শক্তিমান পুরুষ। তাঁর কেল্লাসজ্জা আর সৈন্যসংখ্যা ভীতিকর। সুতরাং গায়ের জোরে তাঁর মেয়ে ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না। বুদ্ধির শক্তি দেখাতে হবে। উপমা স্বরূপ একটা কাহিনি শোনাচ্ছি।

মগধদেশে একসময়ে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর নাম ভদ্রবাহু। তাঁর শাণিত বুদ্ধি মন্ত্রীর নাম মন্ত্রগুপ্ত।

ভদ্রবাহু একদিন বললেন মন্ত্রগুপ্তকে, কাশীর রাজা ধর্মগোপ তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চাইছেন না। রাজকন্যার নাম অনঙ্গলীলা। ভদ্রবাহুকে লড়াইতে হারানো সম্ভব নয়। তাঁর একটা হাতি আছে। তার নাম ভদ্রদন্ত। রণক্ষেত্রে সে ভীষণ। শত্রু ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সুতরাং, লড়ে তাঁর মেয়েকে কেড়ে আনা যাবে না। কী করা যায়?

মন্ত্রগুপ্ত দিল উত্তম মন্ত্রণা, গায়ের জোরে যা হয় না, বুদ্ধির জোরে তা হয়। আপনি যা চাইছেন, তা পাবেন।

পরের দিনই কূটবুদ্ধির খেলা শুরু করে দিয়েছিল মন্ত্রী। নিজে সন্ন্যাসীর ভেক ধরে, সঙ্গে সাতজন অনুরূপ ছদ্মবেশী অনুচর নিয়ে রওনা হয়েছিল কাশীর দিকে। কাশী গিয়ে সাত অনুচর সাতদিকে গিয়ে গুজব ছড়িয়ে দিল, তাদের গুরু বিরাট যোগী পুরুষ। অসম্ভবকে সম্ভব করে দেয়।

রটনার ক্ষমতা অসীম। মানুষ কানে শুনে বিশ্বাস করে।

ফলে, দলে দলে মানুষ আসতে লাগল কপট যোগীর কাছে। স্তোকবাক্য শুনিয়ে তাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখল ধুরন্ধর মন্ত্রী।

তারপর একদিন সাত অনুচরকে নিয়ে বেরোল শহর পরিক্রমায়। দেখে মনে হল, যেন বড়ো সাধু ছোটো সাধুদের নিয়ে তীর্থ-শহর দেখছে। সমম্ভ্রমে সবাই প্রণাম করছে, পথ ছেড়ে দিচ্ছে।

ফলে, যা দেখবার দেখে নিল ছদ্মবেশীরা।

দেখল, রাজার হাতিশালার অধ্যক্ষ-গৃহিণী চুপি চুপি বেরোল বাড়ি থেকে। তাকে আগলে নিয়ে যাচ্ছে চারজন সশস্ত্র রক্ষী। তা সত্ত্বেও, ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে সেই মহিলা, এই বুঝি তাকে কেউ দেখে ফেলল। ঢুকে গেল একটা বাড়িতে। সেই বাড়িতে একটা চিহ্ন দিয়ে মন্ত্রী ফিরল স্বস্থানে।

পরের দিন হইচই পড়ে গেল কাশী শহরে। রাজার হাতিশালার অধ্যক্ষ-গৃহিণী সর্বস্ব নিয়ে চম্পট দিয়েছে। অধ্যক্ষ খুঁজছে বউকে।

ছদ্মবেশী মন্ত্রী অনুচরদের পাঠিয়ে দিল তার কাছে। মনের দুঃখে ততক্ষণে বিষ খেয়েছে অধ্যক্ষ। বিষের ওষুধ জানা ছিল অনুচরদের। বহুবিদ্যা জেনে তবে তারা ধুরন্ধর মন্ত্রীর ধুরন্ধর অনুচর হয়েছে। বিষনাশক দাওয়াই খাইয়ে বাঁচিয়ে দিল অধ্যক্ষকে।

নিয়ে গেল গুরুর কাছে।

গুরু সব শুনল। মিথ্যে ধ্যান করল কিছুক্ষণ। তারপর বলে দিল ঠিকানা, চিহ্ন দেওয়া অমুক বাড়িতে রয়েছে কুলটা কামিনী, সমস্ত ধনরত্ন, আর চার পরপুরুষ, যারা ঘরের বউকে পথে নামিয়েছে, ধনরত্নের লোভে।

তৎক্ষণাৎ সেই বাড়িতে হানা দিয়ে বউ আর ধনরত্ন উদ্ধার করেছিল হাতিশালার অধ্যক্ষ। প্রাণে মেরে দিয়েছিল চার বদমাসকে। নকল সাধু আর চার সাগরেদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বাড়িতে।

কিন্তু আমন্ত্রণ গ্রহণ করেনি ধূর্ত মন্ত্রী। সে যে সন্ন্যাসী। গৃহীর বাড়িতে যেতে পারে না। রাত কাটাতে পারে হাতিশালায়। সামান্য আহারও হোক সেখানে।

সেই ব্যবস্থাই করেছিল কৃতজ্ঞ অধ্যক্ষ। খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিল হাতিশালায়।

নিশুতি রাতে দুষ্কর্মটা কারে নিল মন্ত্রী। বাঁশের চোঙের মধ্যে বিষধর সাপ রেখে, ঢুকিয়ে দিল ঘুমন্ত হাতির কানে। ছোবল খেয়েই মারা গেল রণজয়ী সেই হাতি।

চম্পট দিল মন্ত্রী, চার অনুচর সহ। সটান মগধে।

ভদ্রবাহু আনন্দে নেচে উঠেছিল সুখবর শুনে। কাশীর রাজার যুদ্ধশক্তিই যখন নষ্ট হয়ে গেছে, এবার তাহলে তাঁর মেয়েকে প্রার্থনা করা যাক। ঘটক পাঠানো হল তৎক্ষণাৎ।

সত্যিই মনে মনে দুর্বল হয়ে গেছিলেন কাশীরাজ। তিনি নির্বোধ নন। সময় খারাপ গেলে বেত-লতার মতো যে নুইয়ে নিতে হয় নিজেকে, তা তিনি জানেন। মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে জামাইয়ের শক্তিতে শক্তিমান হলেন।

কাহিনি শেষ হতেই বললে মৃগাঙ্কদত্ত, তাহলে আমিও তো বুদ্ধির জোরে শশাঙ্কবতীকে বউ করে নিতে পারি।

মৃগাঙ্গকদত্তর আর এক বন্ধু বিচিত্র কর্ম তৎক্ষণাৎ ফেঁদে বসল আর একটা বিচিত্র গল্প।

ভদ্রাক্ষ ছিলেন তক্ষশিলার রাজা। ছেলে ছিল না। মা লক্ষ্মীর পুজো দিতেন রোজ, ছেলে চাইতেন, একশো আটটা সাদা পদ্মের অর্ঘ দিয়ে, খড়্গের ওপর সাজিয়ে।

একদিন পুজোয় বসে দেখলেন একটা পদ্ম কম পড়ছে। এদিকে সময় আর নেই, শুভক্ষণ চলে যাবে আর একটা পদ্ম খুঁজতে গেলে।

তিলমাত্র দ্বিধা না করে নিজের হৃদয়-পদ্ম উপড়ে আনলেন। হয়ে গেল একশো আট পদ্ম। পুজো দিলেন দেবীকে।

দেবী আবির্ভূতা হলেন। 'দিগবিজয়ী পুত্র হবে', এই বর দিয়ে, রাজার বুকে হৃদয়-পদ্ম ফিরিয়ে দিয়ে, অদৃশ্য হলেন।

ছেলে হল যথাসময়ে। তার নাম রাখা হল পুষ্করাক্ষ। মানে, পদ্মের ঘুঁটি!

ছেলে বড়ো হলে তাকে সিংহাসনে বসিয়ে ভদ্রাক্ষ চলে গেলেন বনে।

পুষ্করাক্ষ ছিল শৈব-উপাসক। শিবঠাকুর বর দিয়েছিলেন, মনের মতো বউ পাবে শিগগিরই।

সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে একদিন মৃগয়া করতে বনে গেছিল পুষ্করাক্ষ। বিচলিত হয়েছিল নৃশংস এক দৃশ্য দেখে। রমণ-নিরত এক সাপ-দম্পতিকে গিলতে যাচ্ছে একটা হাতির বাচ্ছা।

তির ছুঁড়ে তৎক্ষণাৎ হাতির বাচ্ছাকে প্রাণে মেরে দিয়েছিল পুষ্করাক্ষ। নিহত হস্তি-শিশু কিন্তু এক বিদ্যাধরের রূপ নিয়ে হেসে বলেছিল পুষ্করাক্ষকে, খুব উপকার করলেন। কীভাবে করলেন, সেই কাহিনি শোনাই, শুনুন।

রঙ্গমালী এক বিদ্যাধরের নাম। বিদ্যাধরী তারাবলি তার প্রেমে পড়ে, গান্ধর্বমতে বিয়ে করে। কিন্তু তারাবলির বাবা তা জানতে পেরে রেগে যায়। বিরহ-ব্যথার অভিশাপ দেয়।

ফলে, ছাড়াছাড়ি হয় দুজনের মধ্যে। বনে বনে ঘুরে বেড়াতে থাকে দুজনেই। একদিন বনেজঙ্গলে ঘুরতে গিয়ে একজন চলে গেল আর একজনের চোখের আড়ালে, অভিশাপ ফলে গেল, ছাড়াছাড়ির পর শুরু হল বিরহ ব্যথা।

তারাবলি প্রাণের পুরুষকে হন্যে হয়ে খুঁজতে খুঁজতে চলে এল আরব সাগরের তীরে একটা জাম গাছের তলায়। ফিঙে পাখিরা দল বেঁধে থাকে সেই গাছে। গানে গানে মুখর করে রাখে তল্লাট।

তারাবলি এক মেয়ে-ফিঙের রূপ ধরে থেকে গেল সেই গাছে। ফুলে বসে মধুপান করে গেল পরমানন্দে।

ঠিক সেই সময়ে তার স্বামীও এসে হাজির সেখানে। বহুদিন পর স্বামীকে পেয়ে কামানল আর সইতে পারেনি তারাবলি। কামরস ঝরে পড়েছিল একটা জাম-ফুলে।

ফিঙেরূপ ছেড়ে তারাবলি তো আনন্দে নাচতে নাচতে চলে গেল স্বামীর সঙ্গে, এদিকে তার স্খলিত কামরস নিক্ষিত জাম ফল জন্ম দিয়ে ফেলল এক পরমাসুন্দরীর। দিব্যলোকেও নারী বা পুরুষের কামরস কখনো নষ্ট হয় না, সন্তান উৎপাদন করবেই। সেই কন্যা রইল জাম ফলের মধ্যে।

বিজিতাসু নামে এক মুনি ফল সংগ্রহ করতে এসেছিলেন। বিশেষ এই জাম ফলটি গাছ থেকে পড়ে ভেঙে গেছিল তাঁর পায়ের কাছে। মিষ্টি মেয়েটা বেরিয়ে এসে প্রণাম করেছিল মুনিকে।

দিব্যচক্ষু দিয়ে মুনিপ্রবর তৎক্ষণাৎ জেনে নিয়েছিলেন সমস্ত ব্যাপারটা। ফল-ফেটে-বেরোলো ফুটফুটে মেয়েকে নিজের আশ্রমে নিয়ে গিয়ে নাম দিয়েছিলেন বিনয়বতী।

এই পর্যন্ত বলে একটু থামল সেই বিদ্যাধর, মরা হাতির বাচ্ছা থেকে যে বিদ্যাধর রূপে বেরিয়ে এসেছে।

তারপর বললে,

আমি একদিন যাচ্ছিলাম আকাশ দিয়ে। দেখতে পেলাম বিনয়বতীকে, ফুটফুটে ফল-থেকে-বেরোনো সেই মেয়ে তখন অপরূপা যুবতী বনবালা। কামশরে ছটফটিয়ে গেলাম। রূপের দেমাক ছিল আমার নিজের। আকাশ থেকে নেমে এসে বিনয়বতীকে সহবাস করতে চাইলাম। সে রাজি হল না। আমি তাকে ধর্ষণ করলাম।

তার কান্না শুনে বিজিতাসু মুনি দৌড়ে এসে রাগে কাঁপতে কাঁপতে শাপ দিলেন আমাকে, হাতির বাচ্ছা হয়ে যা!

আমি কান্নাকাটি করেছিলাম।

নরম হয়ে বলেছিলেন বিজিতাসু, আগে তো হ হাতির বাচ্ছা, তারপর মর রাজা পুষ্করাক্ষের বাণে। তারপর রূপ ফিরে পাবি, রূপসী বিনয়বতীকে বিয়ে করবে রাজা পুষ্করাক্ষ।

বিদ্যাধর বললে, ধর্ষণের শাস্তি, রূপ হারিয়ে কুৎসিত হাতির বাচ্ছা হওয়া। তাই হলাম। মরে ফিরে পেলাম আগের চেহারা। এইবার আপনি বিয়ে করে ফেলুন বিনয়বতীকে।

বলে, আকাশে উড়ে গেল লম্পট বিদ্যাধর। পুষ্করাক্ষ প্রাসাদে ফিরে এসে, রাজ্যশাসন মন্ত্রীদের হাতে সঁপে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল বিনয়বতীর খোঁজে। এল আরব সাগরের তীরে। সাগর পেরোবে কী করে ভাবতে ভাবতে গেল এক চণ্ডিকা মন্দিরে। পুজো দিয়ে, মন্দিরে রাখা বীণা বাজিয়ে স্তবগান করে, ঘুমিয়ে পড়ল মন্দিরেই। দেবী চণ্ডিকা তাঁর অনুচরদের দিয়ে পুষ্করাক্ষকে সাগর পার করে দিলেন।

ঘুমন্ত অবস্থায় কিছুই জানতে পারেনি পুষ্করাক্ষ। চোখ মেলে দেখেছিল, পৌঁছে গেছে সাগরের অপর পাড়ে। চণ্ডিকা দেবীর মন্দির সেখানে নেই।

সমুদ্রকে পেছনে রেখে কিছুদূর হেঁটে গিয়ে দেখতে পেয়েছিল একটা আশ্রম। ভেতরে বসে শিষ্য পরিবৃত এক মুনি। তিনিই বিজিতাসু।

বললেন, এস পুষ্করাক্ষ। বিনয়বতী কাঠ কুড়োতে গেছে। সে তোমার আগের জন্মের বউ। এই জন্মেও তাই হবে, বন থেকে ফিরলেই।

পুষ্করাক্ষ জিজ্ঞেস করেছিল, বিনয়বতীকে আগের জন্মে বিয়ে করেছিলাম কীভাবে, চানতে ইচ্ছে যাচ্ছে। বিজিতাসু মুনি শোনালেন সেই কাহিনি।

তাম্রলিপ্ত নগরে থাকতেন ধর্মসেন নামে এক সওদাগর। তাঁর স্ত্রী-র নাম বিদ্যুৎলেখা। এক সময়ে বাড়িতে ডাকাত পড়ে। সব কেড়েকুড়ে নিয়ে যাওয়ার সময়ে মারাত্মকভাবে জখম করে যায় ধর্মসেনকে। কষ্ট সইতে না পেরে দুজনেই যখন অগ্নিপ্রবেশ করে মরতে যাচ্ছেন, বিমোহিত হয়েছিলেন আকাশে উড়ন্ত হংস-মিথুন দৃশ্য দেখে। মরণকালের এই মোহ জন্মান্তরে তাঁদের রাজহংস-রাজহংসী করে দিয়েছিল। সুখে ছিল স্বামী-স্ত্রী। হংস-হংসী রূপে।

বর্ষার সময়ে খেজুর গাছে বাসা বেঁধে পরমানন্দে যখন বর্ষা উপভোগ করছে স্বামী-স্ত্রী, এই সময়ে ঘটল এক বিপদ। দারুণ ঝড়ে চিরে দু-ফাঁক হয়ে দুদিকে ছিটকে গেল খেজুর গাছ, সেই সঙ্গে ঝড় উড়িয়ে নিয়ে গেল দুজনকে দুদিকে, বিচ্ছিন্ন করে দিল হংস-দম্পতিকে।

ঝড় থামল সকালে। হংস কিন্তু খুঁজে পেন না হংসীকে। এদিকে কাম-তাড়না তাকে অস্থির করে তুলেছে। হঠাৎ দেখতে পেল অন্য এক হংসীকে। তার সঙ্গে উড়ে গেল মানস-সরোবরে, সেই সময়ে সব হাঁসেরাই বিহার করতে যেত সেখানে।

আর, এইখানেই নিজের হংসী-বউকে পেয়ে গেল হংস-বর! বর্ষাকালটা মহানন্দে কাটাবার জন্যে গেল এক পাহাড়ের চুড়ায়। কিন্তু কপাল খারাপ। সেইখানেই বউ হংসী মারা গেল এক ব্যাধের হাতে। হংস বেচারা ভয়ের চোটে পালাল তল্লাট ছেড়ে।

মরাহংসীকে নিয়ে কিছুদূর গিয়েই ব্যাধ দেখতে গেল, জনাকয়েক সশস্ত্র পুরুষ আসছে সেই দিকে। মরা হংসীকে পাছে কেড়ে নেয়, এই ভয়ে গর্তের মধ্যে হংসীকে রেখে, তার ওপর ঘাস চাপা দিয়ে, চম্পট দিল ব্যাধ।

সশস্ত্র পুরুষরা চোখের আড়ালে চলে যেতেই বেরিয়ে এল ব্যাধ। ঘাস সরাতেই তার চোখের সামনে দিয়ে আকাশে উড়ে গেল হংসী!

আশ্চর্য ব্যাপার তো! কাটা ঘাসের মধ্যে অন্য কিছু ছিল কিনা খুঁজতে গিয়ে ব্যাধ দেখল, সত্যিই একটা সঞ্জীবনী শেকড় ঢুকে গেছে ছেঁড়া ঘাসের মধ্যে! না জেনে সবশুদ্ধ ছিঁড়ে এনেছিল ব্যাধ। সেই রসের ছোঁয়া পেতেই বেঁচে উঠেছে হংসী!

এদিকে হংসীর স্বামী হংস মহাশয় একা-একা উড়ে গিয়ে পৌঁছেছিল এক দীঘির পাড়ে। সেখানে ছিল বেশ কিছু হংস আর হংসী। প্রিয়তমা হংসীর ভাবনায় আচ্ছন্ন অবস্থায় অন্য এক হংসীকে সঙ্গিনী করে নিয়ে যখন উড়ে যাচ্ছে, ধরা পড়ল এক ব্যাধের জালে, দুজনেই।

নিশ্চিন্ত হয়ে ব্যাধ গেল খেতে, দীঘির পাড়ে। ঠিক সেই সময়ে স্বামীর খোঁজে হন্যে হয়ে সেখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল বিরহিনী হংসী। জালবদ্ধ হংস-স্বামীকে দেখে ফিকিরের খোঁজে এদিক ওদিক তাকাতেই দেখল, একটা লোক স্নান করতে নেমেছে দীঘিতে, কাপড় খুলে রেখেছে পাড়ে, তার ওপর চাপা দিয়ে রেখেছে গলার মণিমাণিক্যের মালা।

এই তো সুযোগ! সাঁ করে উড়ে গিয়ে, রত্নহার ঠোঁটে তুলে নিয়ে, ব্যাধকে দেখিয়ে দেখিয়ে সামনে দিয়ে উড়ে গেল হংসী।

চতুরা হংসী স্বামীসহ নীলগগনে উড়ে যাচ্ছিল একটা পদ্মফুলকে মাথার ওপর ধরে ছাতা বানিয়ে।

লোভী ব্যাধ লাঠি নিয়ে তাড়া করল হংসীকে জালে আটাকাল হংস-হংসীরা রইল পেছনে। হংসী গিয়ে বসল একটা উঁচু পাহাড়ে। পাহাড় বেয়ে যখন সে উঠছে, তখন বুদ্ধিমতী হংসী রত্নহার রেখে দিল পাহাড়চূড়োয়, নিজে সাঁ করে নেমে এল দীঘির পাড়ে, যেখানে জালে পড়া হংস আর হংসীরা ছটফট করছে।

ঠিক তার ওপরে গাছের ডালে আয়েশ করে ঘুমোচ্ছিল একটা বাঁদর। হংসী তার পায়ে চঞ্চুর ঠোক্কর মারতেই ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে উঠতে গিয়ে বাঁদর ঠিকরে গেল ডাল থেকে মাটিতে, ধড়াম করে পড়ল জালের ওপর, ছিঁড়ে গেল জাল। হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল হংস-হংসীরা। চতুরা হংসী নিজের স্বামীর সঙ্গে চম্পট দিল সেখান থেকে।

ব্যাধ বেচারা মণিমালা নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসতেই, যার কণ্ঠহার, সে মালা ছিনিয়ে নিল ব্যাধের হাত থেকে, ছুরিকাঘাতের পর। জখম করে গেল নির্দোষ ব্যাধকে।

চতুরা হংসী স্বামীসহ নীলগগনে উড়ে যাচ্ছিল একটা পদ্মফুলকে মাথার ওপর ধরে ছাতা বানিয়ে। সে বড়ো মনোহর দৃশ্য। কিন্তু তীরবিদ্ধ হল সেখানেই, ব্যাধের তীর, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি, শূন্যপথেই মারা গেল হংস আর হংসী। যে পদ্মফুলের ছাতা মাথার ওপর মেলে ধরেছিল, সেই ছাতা সাঁ-সাঁ করে নেমে এল নীচে...

ঠিক নীচেই শিবলিঙ্গ পুজো করছিলেন এক সন্ন্যাসী। পদ্মফুল পড়ল শিবলিঙ্গের মাথায়। পাশেই আছড়ে পড়ল মরা হংস আর হংসী।

ব্যাধ নিল হংস-মৃতদেহ, সন্ন্যাসীকে দিয়ে গেল হংসীর মৃতদেহ। সন্ন্যাসী শিবের পুজোয় উপচার দিল সেই হংসী।

কাহিনি সমাপ্ত করে বললেন বিজিতাসু মুনি, পুষ্করাক্ষ, তুমিই ছিলে সেই হংস, আর বিনয়বতী সেই হংসী। বিদ্যাধরী হয়ে জন্মেছিল তার মাংসে শিবপুজো হয়েছিল বলে। সুতরাং, এই বিনয়বতীই তোমার জন্মজন্মান্তরের স্ত্রী।

পুষ্করাক্ষ বললে, তবে যে শুনেছি, যত দেহ ধ্বংস হবে, তত পাপ কেটে যাবে। তাহলে কেন মানবেতর প্রাণী হয়ে জন্মালাম দুজনে?

বিজিতাসু ব্যাখ্যা করে দিলেন, যে কামনা নিয়ে প্রাণী মরণে যায়, নতুন জীবনে সেই কামনা পূরণের সহায়ক সব কিছু পায়। শোন একটা দৃষ্টান্ত...

লাবণ্যমঞ্জরী ছিল ব্রাহ্মণ কন্যা। কুমারী। কঠোর ব্রহ্মচারিণী। কিন্তু একদিন এক সুতনু সুরূপ ব্রাহ্মণ যুবককে দেখে কামযন্ত্রণায় জ্বলে গেল। যাতনা সইতে না পেরে গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করল বটে, কিন্তু মরণকালের আতীব্র কামস্পৃহা তাকে পরজন্মে বেশ্যা করে দিল। অটুট রইল পূর্বজন্মের স্মৃতি। কামস্পৃহা মিটিয়ে যেতে হল বহুবল্লভা হয়ে। বেশ্যাদের পূর্বজীবনে থাকে এমনই অতৃপ্ত কামনা, ইন্ধন জুগিয়ে যায় বেশ্যাগিরিতে।

জাতিস্মর ছিল বলেই বেশ্যা মেয়েটি এক ব্রাহ্মণের পরামর্শ নিয়ে ইষ্টমন্ত্রে জপ করা শুরু করে। জপ করতে করতেই দেহ রাখে। পরের জন্মে সৎবংশে জন্মে সৎভাবেই সে জীবন কাটিয়েছিল।

হিতোপদেশ কাহিনি শেষ করে বিজিতাসু মুনি বললেন পুষ্করাক্ষকে, যাও, স্নান সেরে এস। বিনয়বতীর বাবা রঙ্গমালী আর মা তারাবলিকে আনতে লোক পাঠাচ্ছি। তারা এলেই মেয়ে বিনয়তীর সঙ্গে বিয়ে দেবে তোমার।

তাই হয়েছিল। শ্বশুর রঙ্গমালী একটা বিমান যৌতুক দিয়েছিল জামাই পুষ্করাক্ষকে। নতুন বউকে নিয়ে বিমান হাঁকিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে স্বদেশে ফিরে এসেছিল পুষ্করাক্ষ।

বন্ধু বিচিত্রকর্মের অভিনব এই কাহিনিমালা শুনে যুবরাজ মৃগাঙ্কদত্ত মনে মনে তৈরি হলেন রাজকুমারী শশাঙ্কবতীকে উজ্জয়িনী থেকে এনে নিজের পাশে বসানোর জন্যে।

৭০. শ্রুতধি কাহিনি

মতলব আঁটলেন যুব মন্ত্রীদের সঙ্গে। সাধুবেশে যাওয়া যাক উজ্জয়িনী। ভীমপরাক্রম লুকিয়ে জোগাড় করল খাটের পায়া, মাথার চুল, নরকরোটি ইত্যাদি। সন্ন্যাসীর ভেক ধরতে গেলে যা-যা দরকার।

কিন্তু খবরটা চলে গেল রাজার প্রধানমন্ত্রীর কানে।

আর এমনই কপাল, একদিন তিনি রাজকুমারের প্রাসাদের তলা দিয়ে যখন হন হন করে হেঁটে যাচ্ছিলেন, শশাঙ্কবতীর স্বপ্নে মশগুল মৃগাঙ্কদত্ত পানের পিচ ফেলেছিল ছাদের পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে, সেই পিচ ছপাৎ করে পড়েছিল মন্ত্রীমশায়ের মাথায়!

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, শোধ তুলবেন। এত বড়ো স্পর্ধা, মাথায় থুথু ফেলা!

সুযোগ এসে গেল পরের দিন। রাজামশায়ের ভেদবমি আর পায়খানা আরম্ভ হয়ে গেছিল অকস্মাৎ, ঠিক পরের দিন। রাজসিক পানাহার করলে এরকম হতেই পারে। কিন্তু কুটিল প্রধানমন্ত্রী ঘুরিয়ে দিল সহজ ব্যাপারটাকে। রাজার কানে কানে বললে, মহারাজ এসব আপনার ছেলের কাণ্ড। সিংহাসনের লোভে তুকতাক করে আপনাকে মারবার জন্যে কোমর বেঁধেছে। আমি খবর পেয়েছি গুপ্তচরের মুখে। আপনি যাচাই করে নিন সেনাপতিকে দিয়ে। তারপর এমন ছেলেকে তাড়িয়ে দিন দেশ থেকে।

বিচক্ষণ মন্ত্রীর গুপ্ত মন্ত্রণায় বিলক্ষণ বিচলিত রাজামশায় তৎক্ষণাৎ সেনাপতিকে দিয়ে গোপনে খবর নিয়ে জানলেন, কথাটা সত্যি বটে। তুকতাক, ভৌতিক আর পৈশাচিক ক্রিয়ার সামগ্রী পাওয়া গেছে ছেলের বাড়িতে।

রেগে টং হয়ে সেই দণ্ডে যুবমন্ত্রীদের সমেত যুবরাজকে বের করে দিলেন রাজ্য থেকে।

এই রকমই হয়। যাদের দিয়ে কাজ করানো হয়, তারা যদি মিথ্যেও বলে বিশ্বাসের জোরে মিথ্যেকে সত্যি বলে মেনে নিতে হয়।

রাজপুত্র মৃগাঙ্কদত্ত কিন্তু পরমানন্দে বন্ধু-টন্ধু সমেত বেরিয়ে গেলেন রাজ্য থেকে, সিংহাসনের মোহ ত্যাগ করে। তার আগে গণেশপুজো করে নিলেন, যিনি সব বিঘ্নের বিনাশ ঘটান।

দশ বন্ধু নিয়ে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর বলেছিলেন বন্ধুদের, শক্তিরক্ষিত আমার বন্ধু। কিরাতদের রাজা। আগে তার কাছে যাওয়া যাক। তারপর যাব শশাঙ্কবতীর উজ্জয়িনীতে।

সন্ধ্যে নাগাদ সবাই ঢুকল এক অরণ্যে। ঠাঁই নিতে হল একটা শুকনো গাছের তলায়। কারণ, ঝাঁকালো গাছ চোখে পড়ল না।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল মৃগাঙ্কদত্তের। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। ফুটফুটে আলোয় দেখলেন এক আশ্চর্য দৃশ্য।

শুকনো গাছে ফল-ফুল-পাতা গজিয়েছে। পাকা ফল টুপটুপ করে মাটিতে খসে পড়ছে।

অবাক কাণ্ড! মন্ত্রীদের ঘুম ভাঙালেন। সবাই মিলে পাকা ফল তুলে খাওয়া শুরু করে দিলেন, খিদের চোটে।

অমনি, সেই শুষ্ক তরুবর চেহারা পালটে হয়ে গেল এক সুদর্শন ব্রাহ্মণ তনয়।

বললে, অবাক হচ্ছেন? তাহলে শুনুন, আমার নাম শ্রুতধি। আমার বাবার নাম দমধি। নিবাস, অযোধ্যায়। দুর্ভিক্ষে আমার মা মারা যায়। বাবা আমাকে নিয়ে পথে নামেন। আসেন এখানে। একজন তাঁকে পাঁচটি ফল খেতে দিয়েছিল। বাবার খিদে পেয়েছিল। তা সত্ত্বেও, তিনটে ফল আমাকে দিয়েছিলেন, দীঘিতে স্নান করতে নেমেছিলেন। আমি পর পর পাঁচটা ফলই খেয়ে ফেলেছিলাম। তারপর, কাঠের মতো শুয়েছিলাম। স্নানশেষে বাবা এসে যখন দেখলেন, লোভে পড়ে তাঁর খিদের কথা না ভেবে একাই সব খেয়ে নিয়েছি, রেগে গেলেন। শাপ দিলেন। বললেন, শুকনো গাছ হয়ে থাক। জ্যোৎস্না রাতে ফল-ফুল-পাতায় ঝলমল করবি। তখন যদি পথশ্রান্ত কোনও মানুষ সেই ফল তুলে খায়, তোর শাপ কেটে যাবে। তাই, শুকনো গাছ হয়েছিলাম এতদিন। আজ কেটে গেল আমার শাপ। কিন্তু আপনি কে?

মৃগাঙ্কদত্ত আত্মপরিচয় দিলেন। শ্রুতধি বললে, "তাহলে আজ থেকে আমিও আপনার বন্ধু হয়ে গেলাম।"

ভোরের আলোয় যাত্রা শুরু হল বারোজনের। পথে পড়ল আর একটা জঙ্গল। জঙ্গলের নাম করিমণ্ডিত। সেখানে দেখা গেল পাঁচজন অতীব কুৎসিত মানুষকে। তাদের মাথায় লম্বা লম্বা চুল।

পরিচয় নিয়ে জানা গেল, তাদের প্রত্যেকের বয়স পাঁচশো বছর। জন্ম কাশীপুরে। সম্বল ছিল শুধু কয়েকটা গোরু। দুর্ভিক্ষ এলে, গোরুদের নিয়ে চলে এসেছিল এই জঙ্গলে। এখানকার দীঘির জল আয়ু বাড়িয়ে দেয়। গাছের ফল নিজেরা খেয়েছে, মাঠের ঘাস গোরুরা খেয়েছে, এখনও খাচ্ছে, পাঁচশো বছর ধরে।

মৃগাঙ্কদত্ত সবান্ধব গেলেন তাদের আশ্রমে। পরের দিন ভোরে বেরিয়ে যথাসময়ে পৌঁছোলেন বন্ধুবর কিরাতরাজার দেশে। তাঁর বাড়িতে দিব্বি আরামে কয়েকদিন কাটিয়ে পথে বেরোনোর উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করলেন রাজকুমার।

তারপর একদিন ফের সবান্ধব রওনা হলেন শশাঙ্কবতীকে বিয়ে করার জন্যে।

পথে পড়ল এক জঙ্গল। সেখানে থাকেন এক জটাধারী সাধু। সর্বাঙ্গে মাখা ছাই। তিনি ছাড়া সে জঙ্গলে আর কেউ থাকে না। কারণটা জানা গেল সাধুর মুখে।

তিনি শুদ্ধকীর্তি গুরুর শিষ্য। মন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ। একদিন এক ক্ষত্রিয় বালককে আবিষ্ট করে তার মুখে জেনেছিলেন, উত্তরের বিন্ধ্যাটবীতে আছে শিংশপা গাছের এক জঙ্গল। সেখানকার পাতালে থাকে দুর্ধর্ষ নাগরা। সব সময়ে ধুলোয় ঢাকা সেই অঞ্চলে দুপুর নাগাদ আসে জোড়ায় জোড়ায় হাঁসের দল। দুর্ধর্ষ নাগাদের একজনের নাম পারাবত। তার কাছে আছে একটা দারুণ শক্তিময় কৃপাণ, সেই কৃপাণের নাম বৈদূর্যকান্তি। যার হাতে থাকবে, সে হবে অপরাজেয়, সিদ্ধ পুরুষদের শক্তি থাকবে তার পেছনে। তারা হবে কৃপাণধারীর অনুগত।

সেই কৃপাণ হস্তগত করার অভিপ্রায়ে মন্ত্রসিদ্ধ এই পুরুষ আজও রয়েছেন নিবিড় নির্জন এই জঙ্গলে। পৃথিবীটাকে টহল দিয়েও এমন একজনকেও পাননি যার সাহায্য নিয়ে ছিনিয়ে আনতে পারেন সেই কৃপাণ, পারাবত নাগের দখল থেকে। এই দুঃখেই থেকে যাবেন এখানে আমরণ।

সব শুনে বললেন মৃগাঙ্কদত্ত, ধৈর্য ধরুন। আমরা আপনার সহায় হচ্ছি।

খুশি হলেন মন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ। অত্যাশ্চর্য এক রকম তেল দিলেন পায়ের তলায় রগড়ে নেওয়ার জন্যে।

সত্যিই জাদু আছে সেই তেলেতে। পায়ের তলায় ঘষে নিতেই সবান্ধব মৃগাঙ্কদত্ত পৌঁছে গেলেন নাগ অঞ্চলে। কোনও কষ্টই হল না।

সিদ্ধপুরুষ কয়েকটা চিহ্নর কথা বলে দিলেন। সেই চিহ্ন মিলিয়ে নাগ-পুরুষরা থাকে কোথায়, তাও জানা হয়ে গেল। গভীর রাতে এই ক্রিয়াকাণ্ড করার পর ভোরের আলো ফুটতেই মন্ত্রপড়া সর্ষে ছুঁড়ে দিলেন সিদ্ধপুরুষ। অমনি সরে গেল রাশি রাশি ধুলো, তলায় দেখা গেল এক টলটলে জলের দীঘি। ফের মন্ত্র পড়ে গেলেন সিদ্ধপুরুষ, যাতে মেঘ এসে উৎপাত করতে না পারে, ধুলো উড়িয়ে এনে স্বচ্ছতোয়া সরোবরকে ফের ঢেকে না দেয়। সবই তো নাগপুরুষদের শক্তির খেলা, তারপর আরও প্রচণ্ড মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করলেন। হোম আরম্ভ হল।

অতি আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটল তৎক্ষণাৎ।

শিংশপা গাছের মধ্যে শোনা গেল রিমঝিম মন্ত্রোচ্চারণ। স্তোত্র সংগীত। বামা কণ্ঠে।

পরক্ষণেই গাছের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল অপরূপা এক ললনা। ক্ষীণকটি পীন পয়োধরা গুরু নিতম্বিনী এক রমণী। তার রূপের ছটা দেখে মনে হল যেন দেবলোকের এক কামিনী। সুষমা তার চোখে, গালে, অধরে, গ্রীবাভঙ্গিমায়।

তাকে দেখেই থ হয়ে গেছিলেন মন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ। কামিনী কটাক্ষে বিদ্ধ হতেই বিস্মৃত হয়েছিলেন মন্ত্র। পঠন স্তব্ধ হয়েছিল মূর্তিময়ী কাম তার গলা জড়িয়ে ধরতেই।

হাত থেকে খসে পড়েছিল হোম করার ভাঁড়।

সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রলয় ঝড় উঠল হোম করার জায়গায়। আবির্ভূত হলে নাগরাজ, যাঁর নাম পারাবত। ভীষণদর্শন।

নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল আয়তলোচনা কটাক্ষবর্ষিণী সেই দিব্যাঙ্গনা।

করাল কায়া দেখে অক্কা পেলেন সিদ্ধপুরুষ তৎক্ষণাৎ।

হুংকার ছেড়ে শাপ দিলেন নাগরাজ, "রে রে মৃগাঙ্কদত্ত, বুকের পাটা তোর বড্ড বেশি। দলবল নিয়ে এসেছিস পরোপকার করতে। দিলাম সাজা, বেশ কিছুদিন একা একা থাক প্রত্যেকে।"

দাঁত কিড়মিড় করে শাপ ঝেড়ে শূন্যে মিলিয়ে গেলেন অমিতশক্তি নাগরাজ। অমনি চোখে ধোঁয়া দেখলেন মৃগাঙ্কদত্ত আর মিত্রবর্গ। কানেও আর কিছু শুনতে পেলেন না। চোখ আর কানকে যে অকেজো করে দিয়ে গেছেন নাগরাজ বিষম রাগে।

ফলে, চেঁচাতে চেঁচাতে দলের প্রত্যেকেই সরে গেল একজন আর একজনের কাছ থেকে। রাত ভোর হওয়ার আগেই।

সকালের আলোয় দেখা গেল, একা প্রত্যেকেই, নিবিড় বনের মধ্যে। মৃগাঙ্কদত্ত একা একাই মাস দুই তিন টহল দিয়ে গেলেন সেই ভীষণ অরণ্যে। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল ব্রাহ্মণ শ্রুতধির সঙ্গে। দুজনেই রওনা হলেন উজ্জয়িনী অভিমুখে, এই ভেবে যে বাকি বন্ধুরাও নিশ্চয় বুদ্ধি খাটিয়ে মূল গন্তব্যস্থানের দিকে গেছে। সত্যিই তাই হল। পথেই দেখা হয়ে গেল বিমলবুদ্ধির সঙ্গে।

বিমলবুদ্ধি শুনিয়ে গেল এক অতি-আশ্চর্য ছায়ানাটকের কাহিনি। নিছক ছায়া নয়, ভবিষ্যৎকে ছায়ার মধ্যে দিয়ে তুলে সাজানো এক অশ্রুতপূর্ব নাটক।

এই সেই নাটক...

নাগপাশে অভিভূত বিমলবুদ্ধি বন্ধুবিচ্ছিন্ন হয়ে ঘুরতে ঘুরতে অরণ্যের পুবদিকে গিয়ে পড়েছিল। সেখানে দেখা হয়েছিল এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। সন্ন্যাসী ছন্নছাড়া বিমলবুদ্ধিকে পৌঁছে দিয়েছিল এক মস্ত মুনির আশ্রমে, তাঁর নাম, ব্রহ্মদণ্ডী।

সেইখানে এক গুহায় ঢুকেছিল বিমলবুদ্ধি নিছক কৌতূহল মেটাতে। দেখেছিল অবিশ্বাস্য দৃশ্যপরম্পরা।

মন্দিরের মধ্যে রয়েছে এক মন্দির। দামি দামি রত্ন দিয়ে তৈরি। জানলা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়েছিল বিমলবুদ্ধি। দেখেছিল এক সুন্দরীকে। বসে বসে চাকা ঘোরাচ্ছে। চাকার ওপর রয়েছে বিস্তর ভোমরা। চাকার সামনে দাঁড়িয়ে একটা গাধা, আর একটা ষাঁড়।

ঘুরন্ত চাকা থেকে ভোমরাগুলো উড়ে গিয়ে বসল গাধা আর ষাঁড়ের ওপর।

অমনি বমি শুরু করে দিল গাধা আর ষাঁড়। গাধার বমিতে শুধু রক্ত, ষাঁড়ের বমিতে শুধু দুধ। ভোমরাগুলো উড়ে এসে খেয়ে গেল রক্তবমি আর দুধবমি।
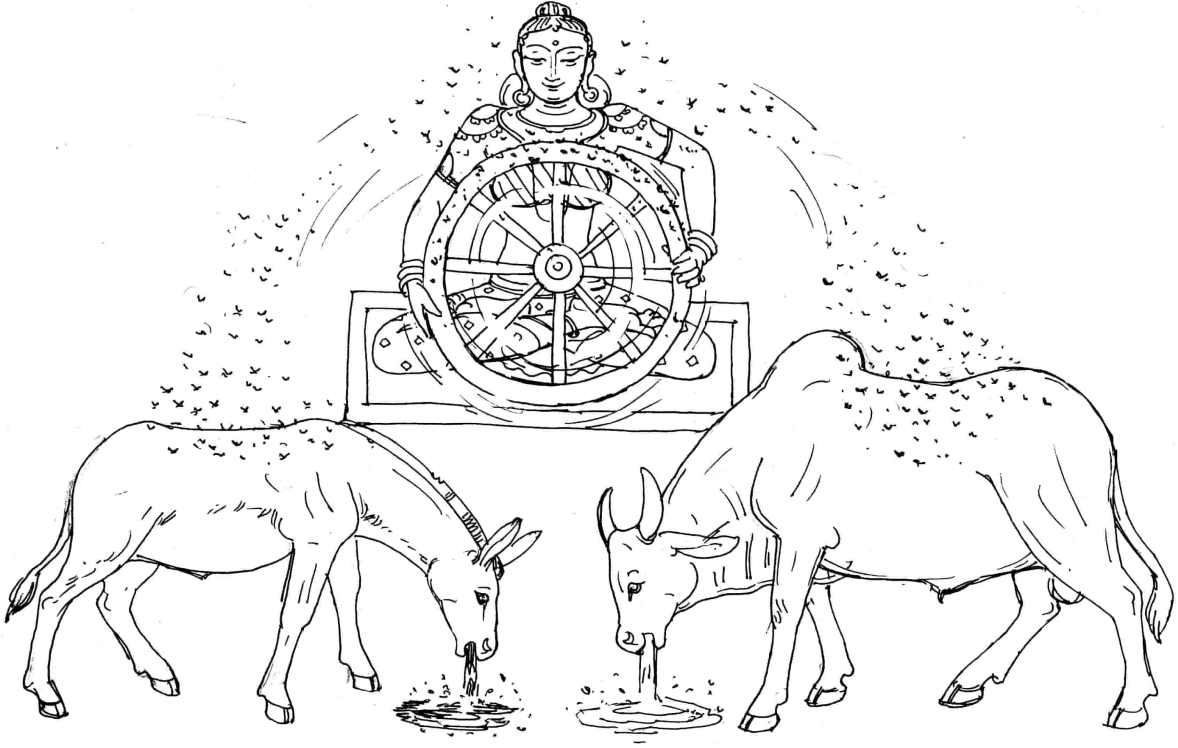
ঘুরন্ত চাকা থেকে ভোমরাগুলো উড়ে গিয়ে বসল গাধা আর ষাঁড়ের ওপর।

রক্তবমি যারা খেয়েছিল, তারা হয়ে গেল কালো পোকা; দুধবমি যারা খেয়েছিল, তারা হয়ে গেল সাদা পোকা।

দুধরনের পোকাই জাল বুনে গেল ব্যস্তসমস্ত হয়ে। জাল বুনতে বুনতে বিষ্ঠা ত্যাগ করে, সেই বিষ্ঠার মধ্যে বানিয়ে গেল নিজেদের জাতের পোকা।

জাল যারা বুনছিল, তাদের কারও গায়ে পাওয়া গেল ফুলের সুগন্ধ, কারও গায়ে বিষাক্ত ফুলের দুর্গন্ধ। তারা আটকে গেল নিজের নিজের জালে।

এমন সময়ে এল একটা দুমুখো সাপ। তার একমুখ সাদা, আর একমুখ কালো।

সাদা মুখে ছোবল মারল সাদা পোকাদের, কালো মুখে কালো পোকাদের।

সেই পোকাগুলোকে তুলে নিয়ে একটা ঘটের মধ্যে ফেলে দিল সুন্দরী। আগের মতোই তারা জালে জড়িয়ে গেল। কাঁদতে লাগল বিষের জ্বালায়। তাদের কান্না দেখে কান্না জুড়ে দিল অন্য জালের পোকারাও।

হাউ হাউ কান্নার অট্টরোলে ধ্যান ভেঙে গেল ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর। কোমল হৃদয় তাঁর। কপাল থেকে অগ্নি-বিচ্ছুরণ ঘটালেন, পুড়িয়ে ছাই করি দিলেন সমস্ত জাল। জালমুক্ত পোকাগুলো ঢুকে গেল একটা ছিদ্রযুক্ত ডাণ্ডার মধ্যে, যে ডাণ্ডা নির্মিত হয়েছে দামি দামি জহর দিয়ে। ডাণ্ডার ওপরের ছিদ্রপথ দিয়ে ঠিকরে যাচ্ছে চোখধাঁধানো জ্যোতি, ঠিক যেন কিরণ বিতরণ করছে আর এক সূর্য। পোকাগুলো ডাণ্ডা থেকে বেরিয়ে বিলীন হয়ে গেল সেই জ্যোতির মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় গলে গলে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই অপরূপা, চাকা, ষাঁড় আর গাধা।

নিদারুণ বিস্মিত হয়ে এদিকে সেদিকে যখন ঘুরে বেড়াচ্ছে বিমলবুদ্ধি, তখন দেখতে পেল একটা অতীব মনোহর পুকুর। পদ্মময় পুকুর। সব পদ্মই পাপড়ি মেলে ধরেছে যেন পরমানন্দে। রাশি রাশি ভোমরা গুণ গুণ

করছে প্রতিটি বিকশিত পদ্মের ওপর। যেন রূপ দেখিয়ে আর সংগীত শুনিয়ে আবেশ রচনা করে আহ্বান জানাচ্ছে মানুষকে।

বিমলবুদ্ধি বসে পড়েছিল সুন্দর সেই জলাশয়ের পাশে। মুগ্ধ নয়নে চেয়েছিল অপর পাড়ের অরণ্যের দিকে। সেই অরণ্যে ছিল এক ব্যাধের নিবাস। তার পোষা এক সিংহ-শিশুর ছিল দশখানা পা। বড়ো দুরন্ত সেই সিংহ-শাবককে একদিন রেগেমেগে বন থেকে তাড়িয়ে দিল ব্যাধ। অন্য বনে তখন এখটা সিংহী ঘন ঘন ডেকে যাচ্ছিল। বন-কাঁপানো সেই গর্জন শুনে দশ পায়ে লাফ দিয়ে দিয়ে সিংহী অভিমুখে ছুটে যেতে গিয়েই উঠল প্রলয়ঙ্কর এক ঝড়। সেই ঝড়ে খসে গেল সিংহ-শাবকের কয়েকটা পা। যন্ত্রণায় কিছুক্ষণ ছটফট করবার পর ফের ফিরে পেল খসে যাওয়া পাগুলো। লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেল সিংহীর কাছে। সিংহীকে নিয়ে ফিরে এল নিজের বনে। খুশি হল ব্যাধ। নিজস্ব অরণ্য অঞ্চল সিংহ-শাবককে দান করে দিয়ে চলে গেল অন্য জায়গায়।

এইসব দেখে ভীষণ অবাক হয়ে বিমলবুদ্ধি আশ্রমে ফিরে এসে মহাঋষিকে বলে গেল যা-যা দেখেছে।

ঋষি ছিলেন ত্রিকালদর্শী। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ দেখবার অতীন্দ্রিয় নয়নের অধিকারী।

বিমলবুদ্ধিকে কাছে বসিয়ে বলে গেলেন, "ঈশ্বর খুশি তোমার ওপর, তাই দেখালেন এত অদ্ভুত দৃশ্য। ধন্য তুমি। তোমার দেখা ওই সুন্দরী মায়ার প্রতীক, চাকা সংসারের চাকার প্রতীক, আর ওই ভোমরাগুলো এই সংসারের জীবদের প্রতীক। ষাঁড় ধর্মের প্রতীক, গাধা অধর্মের প্রতীক। দুধ পুণ্যের প্রতীক, রক্ত পাপের প্রতীক। নিজেদেরই বমি করা দুধ আর রক্ত। সংসারের চাকায় জড়িয়ে পড়া সৎ জীব পুণ্যময় দুধ খেয়ে সাদা জাল কেটে গেছে, পাপী জীব পাপের রক্ত খেয়ে কালো জাল কেটে গেছে। যারা পুণ্যবান, তাদের গায়ে পাওয়া গেছে ফুলের সুগন্ধ, যারা পাপী তাদের গায়ে ফুলের দুর্গন্ধ। সৎ আর অসৎ-এর প্রতীক, যথাক্রমে সুগন্ধ আর দুর্গন্ধ। সাপ তো স্বয়ং মহাকাল। সৎ আর অসৎ সবাইকে দংশন করে তাদের পরমায়ুর অন্ত টেনে দিয়েছে। মায়া, মোহিনী ওই মায়া, কর্মফল অনুযায়ী জীবদের সেই-সেই যোনিতে ফেলে দিয়ে পুনর্জন্ম ঘটিয়েছে। কিন্তু কর্মফল অনুযায়ী জীবেরা তখনও কেঁদে গেছে ঈশ্বরের উদ্দেশে, পাপীরা চেয়েছে পরিত্রাণ, পুণ্যবানরা চেয়েছে ঈশ্বরের সান্নিধ্য। ঈশ্বর ঋষিরূপে এসে সংসার জাল পুড়িয়ে দিলেন, মুক্ত জীবেরা সূর্যমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে পরমধামে চলে গেল।

সেই সঙ্গে লয় পেল মোহিনী রূপের মায়া, ষাঁড় রূপের ধর্ম, গাধা রূপের অধর্ম, আর চাকা রূপের সংসার। পরিত্রাণ এল অবশেষে জন্মমৃত্যুর আবর্তন থেকে, জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে, পাপ আর পুণ্যের কর্ম-চক্র থেকে। ঈশ্বরের আরাধনাতেই তা সম্ভব। তাঁকে ডাকলেই তিনি সাড়া দেন।

বিমলবুদ্ধি, তোমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দেওয়ার জন্যেই ঈশ্বর কৃপা করলেন, রূপকের মাধ্যমে পরমজ্ঞান দিয়ে গেলেন। তুমি ভাগ্যবান।

এরপরেও যা দেখেছ দীঘির পাড়ে বসে, তাও বিধাতা তোমাকে দেখিয়েছেন রূপকের মাধ্যমে তোমাকে নিশ্চিন্ত করবার জন্যে। তোমার বন্ধু, প্রভু মৃগাঙ্কদত্তকে নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলে। তাই ভবিষ্যৎ দেখিয়েছিলেন ছায়া-দৃশ্যের মাধ্যমে। রূপক-দৃশ্যের মাধ্যমে। দশ পা-ওলা সিংহশাবকই তো মৃগাঙ্কদত্ত, তার দশখানা পা তো তোমরা, দশ বন্ধু। ব্যাধ মৃগাঙ্কদত্তর বাবা, রেগেমেগে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ওই যে সিংহীর ডাক, ও ডাক অবন্তীদেশের রাজকুমারীর আহ্বান। ডাক শুনে মৃগাঙ্কদত্ত ধেয়ে যেতেই দশ পা রূপী দশ বন্ধু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল নাগরাজের কোপে, তার শাপে, ওই সেই ঝড়। কিন্তু সব বিঘ্ন দূর করে দিতে পারেন যিনি, সেই বিঘ্ননাশকের কৃপায় ফের ফিরে এল দশ বন্ধু, মিলন ঘটল রাজকন্যার সঙ্গে, ফিরে পাওয়া গেল পিতৃরাজ্য, পিতার অভিপ্রায়ে তার আগের ইচ্ছার পূরণ ঘটায়।

তুমি ভাগ্যবান বিমলবুদ্ধি, তুমি পুণ্যবান, তাই পরমব্রহ্ম ছায়াদৃশ্য দেখিয়ে তোমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়ে গেলেন।

কাহিনি শেষ করে বললে বিমলবুদ্ধি, "মুনিপ্রবরের আশ্চর্য ব্যাখ্যা শুনে আমার অস্থিরতা চলে গেল। সবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এবার যাওয়া যাক উজ্জয়িনীর দিকে।"

৭১. আজব ময়ূর কাহিনি

যাত্রা শুরু হল উজ্জয়িনী অভিমুখে। মৃগাঙ্কদত্তের সঙ্গে শ্রুতধি আর বিমলবুদ্ধি, প্রাণপ্রিয় দুই সখা। আরও আট সখা কে যে কোথায় ঝড়ে উড়ে গেছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

তিনজনে এল নর্মদা নদীর তীরে। মৃগাঙ্কদত্ত যে মুহূর্তে জলে নেমেছেন স্নান করবেন বলে, ঠিক তখনই জলে নেমেছিল আর এক ব্যক্তি, তার নাম মায়াবটু। নীচকুল শবরদের রাজা।

কী আশ্চর্য! মায়াবটুকে হঠাৎ আক্রমণ করে বসল তিন-তিনটে জল-মানুষ। নিবাস তাদের জলের তলায়। কিন্তু মহাখাপ্পা বেচারা মায়াবটুর ওপর, যে কোনও কারণেই হোক।

ভয়ের চোটে দিগম্বর হয়ে গেল মায়বটু!

তখন, মৃগাঙ্কদত্ত কোষ থেকে টেনে বের করেছিলেন তাঁর অজেয় কৃপাণ। তিন কোপে কচুকাটা করে দিয়েছিলেন তিন জল-মানবকে।

আচমকা আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আচমকা পরিত্রাণ পাওয়ায় বিহ্বল মায়াবটু পা জড়িয়ে ধরেছিল বীর মৃগাঙ্কদত্তের। জানতে চেয়েছিল তাঁর পরিচয়। কী উদ্দেশ্যে আগমন সেখানে, যাওয়া হচ্ছে কোথায়।

শ্রুতধি গুছিয়ে জবাব দিয়ে গেল সব প্রশ্নের। শুনে, অভিভূত হয়ে শবররাজা বললে মৃগাঙ্কদত্তকে, "আজ থেকে আমিও আপনার বন্ধু হয়ে গেলাম। হাতিদের রাজা আমার প্রিয় বন্ধু। বন্ধু হিসেবে পেলেন তাকেও। এবার চলুন আমার বাড়ি।"

সুতরাং, মায়াবটুর প্রাসাদে দিনকয়েক থেকে গেলেন মৃগাঙ্কদত্ত। আলাপ হয়ে গেল হাতি রাজার সঙ্গে।

এরপরেই ঘটে গেল বিচিত্র এক ঘটনা। মোহিনী মায়ার নবতম নজির। অর্ধাঙ্গিনী যখন অধঃপাতে যায়, তখন...

হোক সেই কাহিনি।

শবররাজা মায়াবটু একদিন পাশা খেলতে বসেছিল প্রাসাদের দ্বারপাল চণ্ডকেতুর সঙ্গে। ঠিক সেই সময়ে মেঘগর্জন শুরু হতেই নাচানাচি শুরু করে দিয়েছিল প্রাসাদ চত্বরের ময়ূরেরা। পাশাখেলা ফেলে সেই নাচ দেখতে দৌড়েছিল মায়াবটু।

তাকে আটকেছিল চণ্ডকেতু, প্রাসাদ প্রহরী চণ্ডকেতু।

বলেছিল, এই ময়ূরেরা নাচতে শেখেনি। শিক্ষিত ময়ূরের নাচ দেখতে হয় তো চলুন আমার বাড়িতে, দেখাব কাল সকালে।

রাজি হল মায়াবটু।

রাত নিবিড় হতেই মৃগাঙ্কদত্ত ভোল পালটে নিয়ে টহল দিতে বেরোলেন শবর নগরে। তখন তাঁর অঙ্গে নীল পরিচ্ছদ, গায়ে সুগন্ধি কস্তুরিচূর্ণ, কোমরে অজেয় কৃপাণ। নিকষ আঁধারে অকস্মাৎ ধাক্কা লাগল এক পথচারীর সঙ্গে।

বেশ লেগেছিল মৃগাঙ্কদত্তের। ভাবলেন, ধাক্কাটা মারা হয়েছে ইচ্ছে করেই, মজা করার জন্যে।

সুতরাং মজা বের করে দেওয়ার বাসনা জেগেছিল মনে। খাপ থেকে কৃপাণ টেনে নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন পথিককে।

সবিনয়ে বলেছিল পথিক, "মহাশয় অকারণে আমার ওপর খাপ্পা হয়েছেন। আসল দোষ তো আকাশের ওই চাঁদের। তার কাজ আলো দেওয়া। কেন দিচ্ছে না আলো?"

উত্তম বক্তব্য। রাগ জল হয়ে গেল মৃগাঙ্কদত্তের। বললেন মিঠে গলায়, কে হে তুমি?

অজানা পথিক বড়ো রসিক পুরুষ। হেঁয়ালি গলায় বললে, আপনিও যা, আমিও তাই, নিশিকুটুম্ব।

নিশিকুটুম্ব মানে তো চোর। রাত্রি নিশীথে যে হয় কুটুম। চোর ভেবেছে, মৃগাঙ্কদত্তও একজন চোর!

মজা পেলেন মৃগাঙ্কদত্ত। বললেন, তাহলে চল একসঙ্গে যাওয়া যাক, একই পথের পথিক তো!

তা তো বটেই, তাতো বটেই, একই পথের পথিক আমরা। বড়ো রসের পথ। আসুন আমার সঙ্গে, রসকুম্ভ পেয়ে যাবেন হাতে হাতে, ভাগাভাগি করে নেব, কেমন? রস যে তার অনেক, দুজনকে পেলে বর্তে যাবে।

কথার মানে যেন কেমন কেমন। কৌতুহল লেগেছিল মৃগাঙ্কদত্তের। গেছিলেন রাতের পথিকের সঙ্গে একটা কুয়োর ধারে, লম্বা লম্বা ঘাসে মুখ ঢাকা। খুবই পুরোনো কুয়ো। তাই পরিত্যক্ত।

রাতের পথিক কিন্তু কুয়োর ভেতরে নেমে গেছিল অনায়াসে, যেন কতদিনের অভ্যেস। নামিয়ে এনেছিল মৃগাঙ্কদত্তকেও। তারপর দুজনে ঢুকেছিল একটা সুড়ঙ্গে। সুড়ঙ্গ শেষ হয়েছে কোথায়?

শবররাজ মায়াবটুর অন্তঃপুরে।

দীপ জ্বালিয়ে বসে রয়েছে মায়াবটুর বহুবল্লভা বউ!

যার প্রতীক্ষায় প্রায় অনাবৃত অবস্থায় বসে দুই চোখে কামবহ্নির রোশানাই জ্বালিয়ে রেখেছে, সে কে?

স্বয়ং চণ্ডকেতু! মায়াবটুর দ্বারপাল!

অন্ধকারে মৃগাঙ্কদত্তকে চিনতে পারেনি চণ্ডকেতু, উপরন্তু বেশ পালটেছেন বলে। দীপের ম্যাড়মেড়ে আলোতেও ছদ্মবেশ ভেদ করতে পারেনি।

শবররানির নাম মঞ্জুমতী। যেন কালো পাথর কুঁদে গড়া অপরূপা সুন্দরী। চণ্ডকেতুকে দেখেই দৌড়ে এসে চুম্বনে আলিঙ্গনে বুঝিয়ে দিল, বড় দেরি হয়ে গেছে, আর তার তর সইছে না!

তারপরেই জানতে চেয়েছিল, আজ সঙ্গে আর একজন কেন? ও কে?

আমার বন্ধু, জবাব দিয়েছিল চণ্ডকেতু।

মজলিশ জমবে ভালো।

কিন্তু কী করে বিশ্বাস করি বল? আমার যা কপাল। মরতে মরতেও আমার স্বামী বেঁচে গেল মৃগাঙ্কদত্তের কৃপায়। মরল না। এক চুলের জন্যে বেঁচে গেল।

সহাস্যে চণ্ডকেতু বললে, ভেবো না। মৃগাঙ্কদত্তকেই খতম করব এবার।

মঞ্জুমতী বললে, অত বড়াই কেন? নদীর জলেই তো মৃগাঙ্কদত্তকে প্রাণে মেরে দিতে পারতে, ভয়ের চোটে তো পালিয়েছিলে বিকট জলমানুষদের দেখে। তাই বলি, কথা না বলে কাজে দেখাও। কথা হাওয়ায় উড়ে যাবে, মৃগাঙ্কদত্ত তোমাকেই যমালয়ে পাঠিয়ে দেবেন।

চণ্ডকেতুর মাথায় রক্ত চড়ে গেল টিটকিরি শুনেই। নিজের কৃপাণ কোষমুক্ত করল তৎক্ষণাৎ, এখন দেখছি প্রেম উথলে উঠছে মৃগাঙ্কদত্তের ওপর! কুলটা কোথাকার! মর.....মর....মর...!

বলেই, কৃপাণ চালিয়েছিল মঞ্জুমতীর কণ্ঠদেশ লক্ষ করে!

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে লাফিয়ে তার সামনে চলে এসেছিল মঞ্জুমতীর এক দাসী, হাতে খোলা ছুরি নিয়ে।

পালিয়ে গেল মঞ্জুমতী।

ঝিয়ের হাত থেকে ছুরি ছিনিয়ে নিয়েছিল চণ্ডকেতু, কিন্তু ধস্তাধস্তিতে কেটে ঠিকরে গেল ঝিয়ের একটা আঙুল।

মৃগাঙ্কদত্ত ছিলেন অন্য ঘরে এত কাণ্ড ঘটবার সময়ে। সেখান থেকেই দেখেছিলেন মারামারি আর রক্তপাত। এখন চণ্ডকেতু তাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। টেনে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে।

বললে, রাতের অতিথি, আজ আপনি ক্লান্ত। জিরোন।

বলে এক চাকরকে ডেকে বলে দিল, যে ঘরে অদ্ভুত ময়ূর আছে, এঁকে সেখানে বিছানা পেতে শুইতে দাও।

মনিবের হুকুমমাফিক তাই করেছিল চাকর। সে বেরিয়ে যেতেই ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে প্রদীপের আলোয় শেকলে বাঁধা অদ্ভুত ময়ূরকে একদৃষ্টে দেখতে দেখতে মৃগাঙ্কদত্ত স্পষ্ট বুঝলেন, অদ্ভুত

ময়ূর খাঁচার ভেতর থেকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে রয়েছে তাঁর দিকে। চাহনির মধ্যে মূর্ত হয়েছে এমন একটা আকুতি যা ময়ূরের চোখে দেখা যায় না।

খটকা লেগেছিল মৃগাঙ্কদত্তের। খাঁচার ভেতর থেকে বের করে এনেছিলেন অদ্ভুত ময়ূরকে।

অদ্ভুত কাণ্ডটা ঘটে গেল পরক্ষণেই।

মৃগাঙ্কদত্তের মুখপানে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ময়ূর। পরক্ষণেই লুটিয়ে পড়ল তাঁর পায়ের ওপর।

আশ্চর্য ব্যাপার তো! ময়ূরের গলায় বাঁধা রয়েছে একটা সুতো। এই সুতোর জন্যেই কি কষ্ট পাচ্ছে অবলা জীব?

সুতোটা ছিঁড়ে দিলেন মৃগাঙ্কদত্ত।

অমনি, ময়ূর হয়ে গেল তাঁর ভীমপরাক্রম মন্ত্রী?

বললে সানন্দে, নাগরাজের ঝড় তো আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলল অনেক দূরে। এক বনের মধ্যে। সেখানে ছিল গণপতির এক বিগ্রহ। বসে বসে ভাবলাম, অনর্থের মূল তো আমি। বেতাল-কাহিনি বলেছিলাম বলেই যত গণ্ডগোল। সুতরাং না খেয়ে মরবো, এইখানে। দিন কয়েক পরে এক বুড়ো পথিক সেখানে এলেন। আমার অনাহার-শুষ্ক চেহারা দেখে সব কথা জেনে নিলেন। তারপর বললেন, বীরপুরুষ কখনও মেয়েদের মতো ফট করে আত্মহত্যা করে না। শোনো একটা গল্প।

কমলাকর ছিলেন কোশলরাজের রাজা বিমলাকরের ছেলে। তেজিয়ান পুরুষ, রূপবান তো বটেই, দানধ্যানে উদার হস্ত।

একদিন কমলাকরকে তোষামোদ করার জন্যে এক বন্দি গানের সুরে যে বন্দনা গেয়ে গেছিল, তার সরলার্থ এই :

যুবরাজ কমলাকরকে স্বামীরূপে পেলে ধন্য হয়ে যাবে রাজকুমারী হংসাবলি।

কিন্তু নিবাস কোথায় এই হংসাবলির? জানতে চেয়েছিল কমলাকর।

বন্দির নাম মনোরথসিদ্ধি। সে ইনিয়ে বিনিয়ে বললে, হংসাবলি তো উজ্জয়িনীর রাজা মেঘমালীর মেয়ে। টোঁ-টোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে একদিন গেছিলাম সেখানে। উঠেছিলাম যাঁর বাড়িতে, তিনি নাচ গান শেখান। তাঁর নাম দর্দুরক।

তাঁর মুখেই একদিন শুনলাম, হংসাবলি বাবাকে নতুন শেখা নাচ দেখাবে পরের দিন সকালে। দর্দুরকের সঙ্গে গিয়ে সেই নাচ দেখে মুণ্ড ঘুরে গেল। নাচ তো নয়, কামসায়রের তরঙ্গভঙ্গ। মনে মনে ভাবলাম, এমন রূপসী নর্তকীই তো রাজকুমার কমলাকরের পাশে মানাবে। মনে মনে ফন্দি আঁটলাম। নাচ শেষ হলে রাজবাড়ির বাইরে এলাম। দরজায় একটা ছবি আঁকলাম। হেঁকে বললাম, ক্ষমতা যদি থাকে, এই রকম একটা ছবি এঁকে যাক এ দেশের সেরা শিল্পী। কেউ এল না দেখে রাজা আমাকে তাঁর মেয়েকে ছবি আঁকা শেখার কাজে লাগিয়ে দিলেন। আমি রাজকন্যার বাড়ি গিয়ে প্রতিটা থামে এঁকে দিলাম আপনার ছবি। কিন্তু কার ছবি, তা লিখলাম না। তারপর একদিন এক বিশ্বাসী লোককে পাগল সাজিয়ে নিয়ে এলাম রাজকন্যার বাড়িতে। থামের গায়ে আঁকা আপনার ছবি দেখে সে নেচে নেচে গান গেয়ে গেল অবিকল পাগলের মতো। গানের অর্থ এই : আজ তার পরম সৌভাগ্য। ভগবান বিষ্ণুর মতো অশেষ গুণের অধিপতি কমলাকরকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। কৌতূহলী রাজকন্যা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, পাগলাটা কার কথা বলছে? আমি ভনিতা না করে আপনার রূপগুণের এমন ঢ্যাঁড়া পিটে দিলাম যে কামজ্বরে আক্রান্ত হয়ে বেহুঁশ হয়ে গেল রাজকন্যা। এমন সময়ে রাজা এলেন। আমাকে আর নকল পাগলকে তাড়িয়ে দিলেন।

রাজকন্যা কিন্তু কামযন্ত্রণা আর সইতে না পেরে গিয়ে রইল বিষ্ণুমন্দিরে। সেখানে আমি গেলাম। একটা চিঠি দিল আমাকে, আপনাকে দেওয়ার জন্যে। চিঠিটা শ্লোকের আকারে লিখেছিল নিজেরই একটা শাড়ির ওপর। এই নিন সেই শাড়ি। আর এই যে শ্লোকটা লেখা রয়েছে, এটাই সুর করে গেয়ে শোনাচ্ছিলাম আপনাকে।

শ্লোক পড়ে আর হংসাবলিকে কল্পনার চোখে দেখে কমলাকর তার প্রেমে পড়ে গেলেন। কী করে হংসাবলিকে বিয়ে করা যায়, তাই নিয়ে সাত পাঁচ যখন ভাবছেন, তলব করলেন তাঁর পিতৃদেব।

ধমক দিলেন কড়া গলায়, বিষয় থাকলেই শত্রু হয়। অলস হলে শত্রু মাথা চাড়া দেয়। এখন তাই হচ্ছে। অঙ্গরাজ্যের রাজা শত্রুতা শুরু করেছে। তুমি সৈন্যসামন্ত নিয়ে বেরিয়ে পড়ো।

নেচে উঠে রাজি হয়ে গেলেন কমলাকর। ভিন্ন উদ্দেশ্যে। যুদ্ধ হোক, সেই সঙ্গে অপরূপা হংসাবলিকে খোঁজা যাক।

প্রথমেই অঙ্গরাজ্যের রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে বন্দি করে পাঠিয়ে দিলেন বাবার কাছে। নিজে এগিয়ে গেলেন আরও শত্রুদমনের অছিলায় হংসাবলির অন্বেষণে।

পৌঁছোলেন উজ্জয়িনীর কাছে। শিবির রচনা করার পর রাজা মেঘমালীর কাছে দূত পাঠালেন। সোজা চাইলেন তাঁর মেয়ে হংসাবলিকে—বউরূপে।

রাজা মেঘমালী শুনেই সটান চলে এলেন কমলাকর-এর কাছে। বললেন, তাই হবে।

বিয়ের দিন ঠিক করে ফিরে গেলেন রাজধানীতে।

হংসাবলির কানে গেল সেই খবর। সখীকে বললে, যাও তো, গিয়ে দেখে এসো, থামের গায়ে যার ছবি আঁকা দেখেছিলাম, এই পুরুষ সত্যিই তিনি কিনা।

যে সখীর ওপর সন্দেহভঞ্জনের ভার দেওয়া হল, তার নাম কনকমঞ্জরী। সে একা গেল না, সঙ্গে নিল আরও কয়েকজন সখী। প্রত্যেকেই সন্ন্যাসিনীর সাজে সেজে দলবেঁধে ঢুকে গেল কমলাকরের শিবিরে।

স্তম্ভিত হয়ে গেল কনকমঞ্জরী রাজপুত্রের রূপ দেখে। নরলোকে এমন কান্তিমান পুরুষ তো দেখা যায় না। কোন নারী এমন পুরুষের অঙ্কশায়িনী হতে না চায়?

সেই ইচ্ছা জাগ্রত হল কনকমঞ্জরীর হৃদয়ে। কামনায় আচ্ছন্ন হল তনু। কামজ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে কূটকৌশল রচনা করল মাথার মধ্যে।

শিবির থেকে বেরিয়ে, হংসাবলির কাছে গিয়ে, বেমালুম মিথ্যে বলে গেল কামাতুরা কনকমঞ্জরী।

রাজপুত্রকে তো ভূতে পেয়েছে! সন্ন্যাসিনী পরিচয় দিয়েছিলাম বলেই শিবিরের ভেতরে ঢুকে গেছিলাম। কী দেখলাম? সারা শরীরে তাবিজ মাদুলি শেকড় বাঁধা। প্যাঁকাটি চেহারা। চাকরবাকররা ধরে রয়েছে দু-পাশ থেকে। বলে এসেছি, কাল সকালে এসে ভূত তাড়িয়ে দেব।

গুম হয়ে গেল হংসাবলি। ভূতে পাওয়া মানুষকে কি বিয়ে করা যায়? ধুস! এর চাইতে জঙ্গলে গিয়ে থাকা যাক!

সুযোগ বুঝে কুবুদ্ধি দিল কনকমঞ্জরী, তাহলে এক কাজ করা যাক। বিয়ের দিন যখন ঠিক হয়ে গেছে, তখন কন্যাসম্প্রদান না করলে যে আমাদের রাজার অসম্মান। সুতরাং, কনের সাজে সাজিয়ে অন্য কাউকে বিয়ের পিঁড়িতে বসানো যাক। তুমি আর আমি সেই ফাঁকে পালাব জঙ্গলে।

কাঁদতে কাঁদতে হংসাবলি বললে, কিন্তু সাধ করে কে বিয়ে করবে ভূতে পাওয়া মানুষকে?

অমনি যেন চোখ ছলছল করে উঠল কুটিলা কনকমঞ্জরীর। কান্নায় যেন বুজে এল কণ্ঠস্বর। ছেনালি গলায় বললে, সই, তোমার জন্যে তাও করব আমি। দাও তোমার বিয়ের সাজ। পালাও তুমি জঙ্গলে। শিমুল গাছের কোটরে ঢুকে বসে থাকবে, বিয়ে সেরেই আমি পালাব, দেখা হবে শিমুল কোটরে।

তাই হয়েছিল। বিয়ের দিন হংসাবলি বেরিয়ে গেল নগরের বাইরে, পশ্চিমের অরণ্যে মস্ত শিমূলের কোটরে না ঢুকে বসে রইল একা পাশের বটগাছের ডালে সাশ্রুনয়নে—কনকমঞ্জরীর প্রতীক্ষায়।

শিমূলের কোটরের অন্ধকার দেখে ভয় পেয়েছিল—তাই...! ঘোমটায় মুখ ঢেকে কমলাকরকে বিয়ে করে নিল কনকমঞ্জরী। তারপর এল বটে বিয়ে সেরে, একা নয়, বরকে নিয়ে হাতিতে চেপে শোভাযাত্রা করে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে, দূর থেকে শিমূল গাছ দেখিয়ে বললে, ওই...ওই সেই গাছ...ভোরের স্বপ্নে

দেখেছি... একটা রাক্ষসী সুন্দরী সেজে বেরিয়ে আসছে আমাকে খেতে! ওগো বর! পুড়িয়ে দাও! পুড়িয়ে দাও ওই গাছ, মরুক রাক্ষসী! নইলে আমি বাঁচব না!

নববধূর কথা রেখেছিলেন কমলাকর। তক্ষুনি লোকজন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন শিমূল গাছ।

পাশের বটগাছের ডালে বসে হংসাবলি সাশ্রুনয়নে দেখে গেল বান্ধবীর কীর্তি!

ধুরন্ধর বান্ধবী আরও একটা কাজ করেছিল শ্বশুরবাড়ি পৌঁছেই। শিল্পী মনোরথসিদ্ধিকে সরিয়ে দিয়েছিল লোকজন লাগিয়ে, যাতে সে ফাঁসিয়ে না দেয়।

হংসাবলি তখন কোথায়?

গভীরতর জঙ্গলে। ধ্যানমগ্না। পাপক্ষয় হোক, বিশ্বাসঘাতক বান্ধবী প্রতিফল পাক, তবে যদি পাওয়া যায় মনের মানুষ কমলাকরকে।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঠিক এই সময়ে রাজবাড়িতে ভোগবিলাসের মধ্যে থেকেও নিদারুণ জ্বরে পড়লেন কমলাকর। কামজ্বর চম্পট দিয়েছিল সেই কালজ্বর রে-রে করে তেড়ে আসায়। ভয়ে প্রাণ উড়ে গেছিল জাল হংসাবলির। মাথার ওপর ভগবান আছেন। সেখানে ছলনা চলে না। ধর্মের চাকা ঠিকই ঘুরছে।

অত দুশ্চিন্তার মধ্যেও হংসাবলির বাবা কী বলে গেছিলেন কমলাকরকে বিয়ের দিন ঠিক করার আগে, তা মনে পড়ে গেছিল কনকমঞ্জরীর।

বলেছিলেন, স্বপ্নে বিষ্ণু বলে গেছেন আমাকে, মেয়ের বিয়ের জন্যে ভেবো না। তার বিয়ে হবে রাজপুত্র কমলাকর-এর সঙ্গে। একটু সংকট অবশ্য দেখা দেবে, তাও কেটে যাবে। তোমার মেয়ে আমার পুজো করে জ্বরহর শক্তি পেয়েছে। দুরারোগ্য জ্বরও সেরে যাবে তার হাতের ছোঁয়ায়।

এমন অনেক কথাই বলেন মেয়ের বাবারা মেয়ের বিয়ে দেওয়ার আগে। কিন্তু হংসাবলির বাবা তো অসত্যভাষণ করেন না। মেয়ের এই গুপ্ত ক্ষমতার কথা এতদিন জাহির করেননি, বলেছেন শুধু ভাবী জামাইকে।

তাহলে কি নিয়তি হংসাবলিকে টেনে আনতে চাইছে কমলাকর-এর সান্নিধ্যে রোগনিরাময়ের জন্যে?

কিন্তু হংসাবলি এখন তো বেঁচে নেই! অন্তত কনকমঞ্জরী তাই জানে। অথচ, হংসাবলির হাতের ছোঁয়ায় জ্বর সেরে যাবে, বলেছিলেন হংসাবলির বাবা। এখন যদি খোদ কমলাকর সেই আদেশ দেন জাল হংসাবলিকে? তিনি তো জানেন, ঘোমটা ঢাকা এই মেয়েটাই তাঁর হংসাবলি। আসল হংসাবলি যে পুড়ে ছাই, তা জানেন না। ঘোমটা খুলতেও দেয়নি কনকমঞ্জরী, ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে।

সুতরাং, এক অপরাধ ঢাকতে আর এক অপরাধ করা যাক। ভূতের যজ্ঞ করা যাক। ভুতসাধন মন্ত্র জানা আছে পাপিষ্ঠা কনকমঞ্জরীর। অশরীরী আহ্বান করার আগে এক নারীকে অবশ্য বলি দিতে হয়। তাও করতে হবে কমলাকরকে নিরাময় করার জন্যে। সেই নারী হোক কনকমঞ্জরীরই দুষ্টকর্মের সহচরী, অশোককরী। যার সঙ্গে যোগসাজসে আসল হংসাবলিকে বনে সরিয়ে কনকমঞ্জরী নিজে বসেছিল বিয়ের পিঁড়িতে, লম্বা ঘোমটায় মুখ ঢেকে।

এখন শলাপরামর্শ হল সেই অশোককরীর সঙ্গে। ভূতযজ্ঞ করতে গেলে অনেক নিকৃষ্ট আচার অনুষ্ঠান করতে হয়। অশোককরীর তাতে আপত্তি নেই, নোংরা মন যে তারও। অতএব এক গভীর রাতে দুই বান্ধবী গেল বনে, এক শিবমন্দিরে। ছাগবলি দেওয়ার পর কনকমঞ্জরী বললে, অশোককরী, এবার তুমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করো, শেষ অভিচারটা সেরে নিই। তাহলেই পাবে জ্বর সারানোর শক্তি।

ধূপ ধুনোর ধোঁয়ায়, ছাগরক্তের স্রোতে আর রক্তজমানো মন্ত্রোচ্চারণের ফলে রাত্রিনিশীথে আবেশ এসে গেছিল ব্যভিচারিনী অশোককরীর। সটান উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল রক্তে মাখা মাটির ওপর......

খড়্গ তুলে কোপ মেরেছিল কনকমঞ্জরী, এক কোপে মুণ্ড আলাদা করে দেবে বলে।

কিন্তু হাত রপ্ত না থাকায় খড়্গ গিয়ে ঠেকে গেছিল কাঁধে, মাংস উড়ে গেছিল সেখান থেকে। বিষম যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে ছিটকে গিয়ে রাত্রিনিশীথে যখন প্রাণভয়ে দৌড়োচ্ছে অশোককরী রক্তাক্ত দেহে বিকট স্বরে

চেঁচাতে চেঁচাতে, পেছনে খড়্গহস্তে কানকমঞ্জরী।

নগররক্ষীরা ঘিরে ফেলেছিল দুজনকে। প্রহার শুরু হয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ। হাতে যার রক্তমাখা খড়্গ, আগে মরেছিল সে, অর্থাৎ, কনকমঞ্জরী। তারপর, হাউমাউ করে গোটা ষড়যন্ত্রটা ফাঁস করে দিয়েছিল অশোককরী।

এবং, তখনই জানা গেল, আসল হংসাবলিকে নাকি শিমূল গাছ সমেত পুড়িয়ে মেরে ফেলেছেন কমলাকর নিজেই।

কিন্তু খটকা লেগেছিল রাজা মেঘমালীর। বিষ্ণু স্বপ্নে বলে গেছেন, কমলাকরই হবে হংসাবলির স্বামী, তবে, একটা বিঘ্ন ঘটবে। আর, তার হাতের ছোঁয়ায় সেরে যাবে দুরারোগ্য জ্বর।

বিষ্ণুর কথা মিথ্যে হবার নয়। হংসাবলি নিশ্চয় বেঁচে আছে।

খুঁজে বের করা হল মনোরথসিদ্ধিকে। সে বললে, এখন আমি বুঝলাম, কেন আমাকে ছলে বলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল রাজবাড়ি থেকে। নতুন বউ যে আসল হংসাবলি নন, আমি দেখলেই যে চিনে ফেলতাম। যাক, আমি তাঁকে খুঁজে আনছি।

রাজা মেঘমালী কিন্তু মনোরথসিদ্ধিকে একা ছাড়লেন না। গেলেন তার সঙ্গে গহন অরণ্যে। খুঁজে বের করলেন এক ধ্যানমগ্না রমণীকে, রক্তাশোক গাছের তলায় যেন জীবন্ত প্রদীপ শিখা।

চিনিয়ে দিল মনোরথসিদ্ধি, ওই আপনার হংসাবলি।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। হংসাবলি এল জ্বরে অচেতন কমলাকর-এর পাশে। গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেই জ্বর চম্পট দিল তৎক্ষণাৎ।

চোখ মেলে কমলাকর দেখলেন, থামে আঁকা সেই অপরূপাকে, হংসাবলি, সাধনক্ষমতার দৌলতে এখন জ্যোতির্ময়ী।

বিয়ে হয়ে গেল দুজনের।

বিচিত্র কাহিনি-লহরীতে যতি টেনে সহর্ষে বললে বন্ধুভীমপরাক্রম, পথিক তো আমার মনে শক্তির সঞ্চার ঘটিয়ে প্রস্থান করলেন, আমিও রওনা হলাম উজ্জয়িনীর দিকে, আপনার কাছে আমার অভিপ্রায়ে। পথশ্রান্ত হয়ে আশ্রয় নিলাম এক স্ত্রীলোকের বাড়িতে। দাম দেব খাবারের, রাতটাও কাটাব সেখানে। যে খাটে শুতে দিল, সেই খাটে শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে দেখলাম, সেই মেয়েছেলেটা অদ্ভুত কাণ্ড করছে ঘরের মধ্যে। একমুঠো যব নিয়ে মন্ত্র পড়ছে বিড়বিড় করে। তারপর, ঘরময় ছড়িয়ে দিল মন্ত্রপড়া যব। অমনি, গজিয়ে উঠল গাছ, ফল ধরল গাছে। কাঁচা ফল পেকেও গেল। পাকা ফল তুলে নিয়ে যে ভেজে নিল, গুঁড়িয়ে ছাতু বানাল, সেই ছাতু মন্ত্রপড়া জলে ছেঁকে নিয়ে রাখল একটা কাঁসার বাটিতে। তারপর, ঘরকে নিয়ে এল আগের অবস্থায়, বেরিয়ে গেল স্নান করতে।

দেখে বুঝলাম, এই মেয়েছেলে অবশ্যই দুর্গার অনুচরী শাকিনীপুজো করে তন্ত্রমন্ত্র শিখেছে। শাকিনী সিদ্ধি লাভ করেছে বলেই ঘরের মধ্যে এহেন অলৌকিক কাণ্ড করতে পারছে। সুতরাং, এর সান্নিধ্যে থাকা নিরাপদ নয়।

সঙ্গে সঙ্গে মাথায় খেলে গেল বুদ্ধি। ছাতু আগে ছিল যে ভাঁড়ে, সেই ভাঁড়ে রাখলাম কাঁসার বাটির ছাতু, আর কাঁসার বাটির ছাতু রাখলাম মাটির ভাঁড়ে। তারপর, খাটে শুয়ে মটকা মেরে রইলাম।

স্নান করে এসে শাকিনী মেয়েছেলেটা আমাকে খেতে দিল কাঁসার বাটির ছাতু, নিজে খেতে বসল মাটির ভাঁড়ের ছাতু। ছাতু পালটাপালটি করে রেখেছি, তা সে জানতে পারেনি।

ফল হল অবিশ্বাস্য! শাকিনী হয়ে গেল একটা ছাগী, আমার চোখের সামনে!

মাথায় রক্ত চড়ে গেছিল। আমাকে ছাগল বানানোর মতলব এঁটেছিল যে, তাকেই বিক্রি করে দিলাম এক কশাইয়ের কাছে।

কশাইয়ের বউ কিন্তু নিজেই তো শাকিনী। ছাগী দেখেই সে চিনে ফেলেছিল, ছাগী নয়, তারই বান্ধবী শাকিনী!

সে রেগে টং হতেই চম্পট দিয়েছিলাম সেখান থেকে। এথ ধকলের ফলে বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম বলে নগরের বাইরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম একটা বটগাছের তলায়।

কশাইয়ের শাকিনী বউ খুঁজে খুঁজে এসেছিল সেখানে। ঘুমন্ত অবস্থায় একটা সুতো পরিয়ে দিয়েছিল আমার গলায়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই আমি ময়ূর হয়ে গেছিলাম। ঘুম ভাঙবার পর নিজের ময়ূর আকৃতি দেখে হতভম্ব হয়েছিলাম। আগের স্মৃতি বজায় ছিল পুরোপুরি। কিন্তু কিছুতেই খুলতে পরিনি গলার মন্ত্রপূত সুতো।

উন্মনা হয়ে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছি নানান জায়গায়। ধরা পড়েছিলাম এক ব্যাধের জালে। সে আমাকে উপহার দিয়েছিল ভীল রাজার সেনাপতি চণ্ডকেতুকে। চণ্ডকেতু আমাকে দিয়েছিল নিজের বউকে। আজব ময়ূর তো, তাই সে রেখেছিল আমাকে এই ঘরে। আজ ফের মানুষ হলাম, আপনি সুতো খুলে দেওয়ায়।

এবার পালানো যাক। দরজা যখন বাইরে থেকে বন্ধ তখন পালান ওই গোল জানলা দিয়ে, তারপর পালাবো আমি। এই বলে, ভীমপরাক্রম সুতো বেঁধে দিল মৃগাঙ্কদত্তের গলায়। ময়ূর হয়ে গিয়ে গোল জানলা গলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াতেই হাত বাড়িয়ে গলা থেকে সুতো খুলে নিয়ে ভীমপরাক্রম পরল নিজের গলায়। ময়ূর হয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতেই মৃগাঙ্কদত্ত সুতো খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের মধ্যে।

চম্পট দিল তৎক্ষণাৎ। সটান চলে গেল যেখানে রয়েছে আরও দুই বন্ধু, সেখানে।

সকালে এলেন ভীলরাজ মায়াবটু। সঙ্গে সেনাপতি।

শ্রুতধি বললে, কাল যে বলেছিলেন আজব ময়ূর দেখাবেন, তাকে দেখান?

মায়াবটু বললেন দুষ্ট সেনাপতিকে, আনো তোমার ময়ূর।

তখনই টনক নড়েছিল সেনাপতির। কী সর্বনাশ! ময়ূরের ঘরে তো রাতের চোরকে আটকে রাখা হয়েছে। তাকে তো আগে খতম করা দরকার, নইলে যে রাজমহিষীর কেচ্ছা ফাঁস করে দেবে!

দৌড়ে গিয়ে দেখেছিল, ঘর ফাঁকা! পড়ে আছে শুধু একগাছি সুতো!

মুখ চুন করে এসে বলেছিল মায়াবটুকে, সর্বনাশ হয়েছে! কাল রাতে ময়ূর চুরি হয়ে গেছে!

মুচকি হেসে বলেছিল শ্রুতধি, তাহলে তো সেই চোর সাধারণ চোর নয়!

তারপরেই ভেঙেছিল হেঁয়ালি। ফাঁস করে দিয়েছিল রাজবধূর সঙ্গে রাজসেনাপতির অবৈধ সম্পর্ক কাহিনি।

অন্তঃপুরে গিয়ে প্রমাণ পেয়েছিলেন ভীলরাজা। এক দাসীর আঙুল কাটা। ঘরে পড়ে একটা সুতো।

সেই সুতো ভীমপরাক্রমের গলায় বেঁধে দিতেই চোখের সামনে সে হয়ে গেল আজব ময়ূর!

সেনাপতি চন্দ্রকেতু বধ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। দূর করে দেওয়া হল কুলটা রানিকে, স্ত্রীহত্যা মহাপাপ বলে।

দিন কয়েক পরমানন্দে সেখানে কাটিয়ে ফের শশাঙ্কবতী চিন্তায় উন্মনা হলেন মৃগাঙ্কদত্ত।

রমণী মাত্রই যে শরীরী চুম্বক?

৭২. বিনীতমতি কাহিনি

এই সময়ে মায়াবটুর নতুন সেনাপতি একদিন এসে বললে, আপনার নির্দেশে নরবলির মানুষ খুঁজছিলাম। অনেক কষ্টে পেলাম বটে একজনকে, কিন্তু সে মহা লড়াকু। একাই আমাদের পাঁচশো সৈন্যকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।

এমন এক মহাবীরকে কে না দেখতে চায়? আনা হল তাকে মায়াবটুর সামনে। যদিও দড়ি দিয়ে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়েছে, কিন্তু তার ভৈরব আকৃতি আর চণ্ডাল ক্রোধ দেখে কেউ কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। তার সারা গায়ে অস্ত্রাঘাতের অজস্র চিহ্ন, রক্তে মাখামাখি দেহ। কিন্তু যেন মানুষরূপী এক মহাক্রুদ্ধ হাতি!

মৃগাঙ্কদত্ত তাকে দেখেই চিনলেন। তারই প্রিয়বন্ধু মন্ত্রী গুণাকর!

তৎক্ষণাৎ বন্ধনমুক্ত করা হল তাকে। ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগানো হল। তারপর সে বললে নিজেই চমকপ্রদ কাহিনি।

নাগশাপে দলছাড়া হয়ে দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে এসে পড়লাম বিন্ধ্যদেবীর মন্দিরে। দেখলাম, এক ব্যক্তি আত্মবলি দিয়েছে নিজেকে। বন্ধুবিচ্ছিন্ন অবস্থায় নিদারুণ হতাশায় সেই ইচ্ছা মাথাচাড়া দিয়েছিল আমার মনের মধ্যেও। তুলে নিয়েছিলাম দেবীর খড়্গ।

কিন্তু দৌড়ে এসেছিল এক বুড়ি। বয়সের ভারে কাঁপছে ঠকঠক করে। সে আমাকে আত্মহত্যা করতে দিল না। আশ্বাস দিল। বললে, মরা মানুষও অনেক সময়ে ফিরে আসে। খামোকা মরতে যেও না। শোনো এক গল্প।

উদয়তুঙ্গ ছিলেন অহিচ্ছত্র নগরের রাজা। তাঁর সেনাপতির নাম কমলমতি। এই কমলমতির ছেলের নাম বিনীতমতি।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে প্রাসাদের ছাদে বসে চাঁদকে উঠতে দেখেছিল বিনীতমতি। চাঁদের আলোয় পথঘাট ঝকঝক করছে দেখে তির ধনুক নিয়ে টহল দিতে বেরিয়েছিল। কিছুদূর গিয়ে শুনেছিল বামাকণ্ঠে কান্না।

কে এমন কাঁদছে? খুঁজে খুঁজে তাকে বের করেছিল বিনীতমতি। গাছের তলায় বসে রয়েছে সেই মেয়েটা। জল ঝরছে দুচোখে।

কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করায় সে বলেছিল, আমার নাম বিজয়রতী। নাগরাজ গন্ধমালী আমার বাবা। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একদিন পালিয়ে যাচ্ছিল আমার বাবা। রেগে যান বাসুকি। অভিশাপ দেন, শত্রুর চাকর হয়ে থাক!

ফলে গেল শাপ। যক্ষ কালজিহ্ব নাগদের চিরশত্রু। সে আমার বাবাকে বাগানের মালি করে রেখে দিল।

বাবার মুক্তির জন্যে দেবী গৌরীর পুজো করলাম আমি। দেবী দেখা দিলেন। বললেন, এই দীঘিতে একটা বিরাট পদ্ম আছে। তাতে একহাজার পাপড়ি আছে। স্ফটিকের পাপড়ি। সূর্যের আলোয় ঝলমল করে। মনে হয় যেন শেষনাগের ফণা, অজস্র সাপ মাথার মণি থেকে জ্যোতি ছড়াচ্ছে।

দীঘির জলে স্নান করতে এসে একদিন কুবের সেই পদ্ম দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। পদ্মের ওপর বসে শিবের পুজো করেছিল। সেই সুযোগে কুবেরের অনুচর যক্ষরা হাঁস, চক্রবাক, এইসব জলচরদের রূপ ধরে জলে মাতামাতি জুড়েছিল।

যক্ষ কালজিহ্বার বড়ো ভাই বিদ্যুৎজিহ্বও মেতে গেছিল সেই খেলায়। নিজে চক্রবাক রূপ ধারণ করেছিল, বউকেও চক্রবাক করেছিল। হুল্লোড় করছিল জলে। অঘটনটা ঘটে তখনই।

বিদ্যুৎজিহ্বের ডানার ঝাপটা লেগে কুবেরের হাত থেকে ঠিকরে গেছিল অর্ঘ্যপাত্র।

রেগে টং হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন কুবের, বউকে নিয়ে চক্রবাক পাখি হয়েই থাক এই দীঘিতে।

সেই থেকে তারা শাপভোগ করছে দীঘির জলে। বিদ্যুৎজিহ্বের ছোটোভাই কালাজিহ্বও দাদাকে সঙ্গ দেবার জন্যে সস্ত্রীক চক্রবাক হয়ে থাকে জলে, সঙ্গে থাকে অষ্টপ্রহরের চাকর গন্ধমালী। তাকে এই দাস-অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে শুধু বিনীতমতি। এই নাও ঘোড়া, এই নাও খড়্গ। তাকে দাও। সে তোমার বাবার দাস অবস্থা ঘোচাবে, পৃথিবীর রাজা হবে।

এই বলে চলে গেলেন দেবী গৌরী। আমি মিছিমিছি কাঁদতে বসলাম, ছলনা করে আপনাকে এখানে টেনে আনবার জন্যে। হে মহামতি বিনীতমতি, আমার বাবাকে উদ্ধার করে আনুন, আমাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করুন।

রাজি হল বিনীতমতি। সুরূপা জীবন সঙ্গিনী সবাই চায়। তার মন রাখতে বীরত্ব প্রদর্শনও করে।

বিজয়রতি তখন একটা সাদা ঘোড়া এনে দিল বিনীতমতিকে। যে-সে ঘোড়া নয়। চাঁদের আলো জমে গিয়ে যেন সৃষ্ট হয়েছে সেই শ্বেতঅশ্ব। আশ্চর্যজনক বেগবান। একটা কৃপাণও দিল বিজয়বতী। শত্রুদের কটুকাটা

করার জন্যে।

সাদা ঘোড়া অলৌকিক বেগে নিমেষে বিনীতমতিকে নিয়ে গেল সেই হিমালয় সরোবরে। কালজিহ্ব গর্জন ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই বিনীতমতি তাকে এক কোপে যেই দু-টুকরো করতে যাচ্ছে, প্রাণভিক্ষা চাইল কালজিহ্ব। বিনীতমতি তাকে ছেড়ে দিল। কালজিহ্ব তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মুক্তি দিল ভৃত্য গন্ধমালীকে, সেই সঙ্গে উপহার দিল এমন একটা আংটি যার মধ্যে আছে আশ্চর্য এক শক্তি, সব দোষ নাশ করে দেয়।

আংটি, ঘোড়া, কৃপাণ আর অলোকসুন্দরী নাগকন্যা বিজয়রতীকে নিয়ে বীরদর্পে বাড়ি ফিরেই বিয়েটা আগে সেরে নিয়েছিল বিনীতমতি, বাবার ইচ্ছায়।

তারপর একদিন বাবা বললেন, এবার উদয়বতীকে বিয়ে করে আনো। সে রাজা উদয়তুঙ্গের মেয়ে। রূপসী, গুণবতী। সব শাস্ত্র তার কণ্ঠস্থ। যে তাকে শাস্ত্রবিচারে হারাতে পারবে, তাকেই বিয়ে করবে।

গেল বিনীতমতি দ্বিতীয় বউ আনতে। গিয়ে দেখল, রাজকন্যা উদয়বতী মরকত সিংহাসনে বসে বিদ্যাশক্তির অহংকারে মটমট করছে। কিন্তু রূপ বুঝি ফেটে পড়ছে।

তখন শুরু হল বিদ্যাযুদ্ধ। বিনীতমতি অক্লেশে তাকে হারিয়ে বউ বানিয়ে চলে এল বাবার কাছে।

দুই বউ নিয়ে কিন্তু দর্প বেড়েছিল বিনীতমতির। একদিন এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে ঠকিয়েছিল। সরাভর্তি সোনা না দিয়ে বালি দিয়েছিল।

বিষণ্ণ ব্রাহ্মণ কিছু বলেননি। চলে গেছিলেন। যথা সময়ে পাপের ফল পেয়েছিল বিনীতমতি।

এরপরেই শ্বশুর উদয়তুঙ্গ জামাই বিনীতমতিকে রাজত্ব দিয়ে গঙ্গাতীরে চলে গেলেন। কারণ, তিনি অপুত্রক ছিলেন।

এরপর একদিন বিনীতমতিকে ফের বিদ্যাযুদ্ধে বসতে হল বৌদ্ধসন্ন্যাসী রত্নচন্দ্রমতির সঙ্গে। বাজি ধরে।

সাতদিন একটানা বিদ্যাযুদ্ধের পর হার হল বিনীতমতির। উদয়বতী অধীন হল বৌদ্ধসন্ন্যাসীর। বিনীতমতি নিজেও বৌদ্ধ হয়ে গেল।

বৌদ্ধসন্ন্যাসী একদিন বললে বিনীতমতিকে, আপনার সামান্য কিছু পাপ আছে। পাপক্ষয়ের উপায় শিখে রাখুন।

বলে, স্বপ্ন দেখার একটা কৌশল শিখিয়ে দিলেন বিনীতমতিকে।

সেই রাতেই স্বপ্ন দেখলে বিনীতমতি। পরলোকে গেছে। খিদে পেয়েছে। জমদূতরা গরম বালি খেতে দিয়েছে। আর বলছে, এই তোমার পাপের শাস্তি। ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণকে বালি খেতে দিয়েছিলে। দশকোটি সোনার টাকা দান করলে পাপক্ষয় হবে।

পরের দিন তাই করেছিল বিনীতমতি।

কিন্তু রাতে দেখল একই স্বপ্ন। পরলোকের যমদূতরা ফের গরম বালি খেতে দিয়েছে।

শুধিয়েছিল বিনীতমতি, আমি তো দান করেছি।

যমদূতেরা বলেছিল, ওই দশকোটির মধ্যে একটা সোনার টাকা ছিল এক ব্রাহ্মণের।

পরের দিন সকালে ফের দশকোটি সোনার টাকা ব্রাহ্মণদের দান করেছিল বিনীতমতি। কিন্তু রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে আবার তাকে গরম বালি খেতে দিয়েছিল যমদূতরা।

কারণটাও বলে দিয়েছিল। নিষ্ফল হয়েছে এবারের দানও। কেননা, সেই ব্রাহ্মণ মারা গেছেন। ডাকাতরা মেরে ফেলেছে। দায়ী তো বিনীতমতিই, নিঃস্ব রেখেছিল, সুরক্ষার ব্যবস্থা করেনি, সুতরাং ব্রাহ্মণ হত্যার পাপও তার। এই পাপক্ষয় ঘটবে কী ভাবে? এবার আর দশকোটিতে হবে না, বিশকোটি সোনার টাকা দান করতে হবে।

তাই করেছিল বিনীতমতি। তারপর জিজ্ঞেস করেছিল বৌদ্ধশ্রমণকে, ধর্মরক্ষার এত ফ্যাসাদ?

শ্রমণ বললেন, উৎসাহ যাদের সহজে নিভে যায়, ধর্মাচরণ তাদের কাজ নয়। শোনো বোধিসত্ত্ব বরাহজাতকের গল্প।

বিন্ধ্যপাহাড়ের গুহায় থাকত দুই বন্ধু। এক শূকর, আর এক বাঁদর।

একবার একটানা বৃষ্টি হওয়ায় এত জল জমে গেল যে জন্তুরা যে-যার আস্তানাতেই থেকে গেল।

বৃষ্টি একটু থামলে এক নিশুতি রাতে গুহার সামনে এল এক সিংহ, তার সিংহী, আর তাদের ছেলে। কদিন না খেয়ে তিন জনেরই প্রাণ যায়-যায় অবস্থা।

সিংহী বললে সিংহকে, না খেয়ে সব্বাই মরবে কেন? আমাকে তুমি আর তোমার ছেলে খেয়ে নাও। তুমি সিংহ, প্রাণে বাঁচলে আর এক সিংহী জুটে যাবে। ছেলেটাও আমাকে খেয়ে বাঁচুক। সেই তো নারীধর্ম।

শূকর তখন জেগেছিল, ঘুমোচ্ছিল বাঁদর। সিংহীর কথা সে শুনেছিল। বেরিয়ে এল গুহার বাইরে। বললে, তোমরা আমার অতিথি। আমাকে খেয়ে তোমরা প্রাণে বাঁচো।

সিংহ বললে, আগে ছেলেটা খাক। তারপর খাব আমি, সবশেষে খাবে সিংহী।

ছেলে খেল শূকরের কিছু মাংস। পেট ভরে গেল।

শূকর তখনও বেঁচে। বললে সিংহকে, রক্ত যে গড়িয়ে যাচ্ছে মাটিতে, মিছিমিছি নষ্ট না করে চেটে খেয়ে নাও, পরে খাবে আমার মাংস। তারপর খাবে তোমার সিংহী।

অনাহারে সিংহীর প্রাণ গলায় এসে ঠেকেছিল। এবার বেরিয়ে গেল প্রাণটা।

মনের দুঃখে ছেলেকে নিয়ে চলে গেল সিংহ।

তখন ভোর হয়েছে। ঘুম ভেঙেছে বাঁদরের। গুহার বাইরে এসে দেখল মৃতপ্রায় শূকরকে। সব শুনে কেঁদে ফেলল।

বললে, পশুযোনি থেকে তুমি মুক্ত হতে চলেছ। বলো তোমার শেষ ইচ্ছা কী?

শূকর বললে, সিংহী পেটের খিদে নিয়ে মরেছে। সে যেন বেঁচে উঠে আমাকে খায়।

অমনি ধর্মরাজ এল সেখানে। মুমূর্ষু শূকরকে স্পর্শ করতেই সে দেহত্যাগ করেই হয়ে গেল দিব্যদেহ তাপস।

ধর্মরাজ বললেন, পরের জন্যে সব দেবে, এই ছিল তোমার সাধন-ব্রত। তুমি সিদ্ধিলাভ করলে। আমিই সেই সিংহ। যাচাই করতে এসেছিলাম তোমাকে।

তাপস বললে, তাহলে আপনি আমার এই বাঁদর বন্ধুরও পশুদেহ ঘুচিয়ে দিন।

তাই হল তৎক্ষণাৎ। বাঁদর হয়ে গেল আর এক মুনি।

অদৃশ্য হলেন ধর্মরাজ। সেই সঙ্গে মরা সিংহী।

শ্রমণ বললে বিনীতমতিকে, সুতরাং, ধর্ম যে করে, অসম্ভব কাজও সে করতে পারে।

রাত্রে ফের স্বপ্ন দেখল বিনীতমতি। এক সাধু বলছেন, তোমার পাপক্ষয় হয়েছে। এবার করো বোধিচর্যা ব্রত। দু-হাতে দান করে যাও।

তাই করেছিল বিনীতমতি। দান করেও ধনক্ষয় হল না কিছুতেই। ধর্ম যে করে, তার সম্পদ এই ভাবেই বেড়ে যায়। পুণ্যের জোরে। যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে!

একদিন এল এক ব্রাহ্মণ। তার ছেলেকে আশ্রয় করেছে এক ব্রহ্মরাক্ষস। কালজিহ্ব যে আশ্চর্য আংটি দিয়েছিল বিনীতমতিকে, চাই সেই আংটি।

দিয়ে দিল বিনীতমতি। দানের খ্যাতি আরও ছড়িয়ে গেল।

এরপর এক রাজপুত্র ইন্দুকলস। বললে, আমার ভাই কনককলস আমাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আপনার অজেয় ঘোড়া আর কৃপাণ আমাকে দিন। রাজ্য ফিরে পেতে চাই।

অম্লানবদনে দুটি বস্তুই দিয়ে দিল বিনীতমতি, অথচ নিজের রাজ্য রক্ষে করতে গেলে ওই দুটি জিনিসই তার দরকার।

রাজপুত্র ইন্দুকলস কিন্তু বখাটে ভাই কনককলসকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ফিরে পেল রাজ্যে।

তখন রাজ্যহীন কনককলস এল বিনীতমতির কাছে। আত্মহত্যার জন্যে যখন প্রস্তুত হচ্ছে, বিনীতমতি দেখিয়ে দিল দানশক্তির পরাকাষ্ঠা।

মন্ত্রীদের ডেকে বললে, আমার জন্যেই কনককলস পথের ভিখিরি হয়েছে, এখন মরতে চলেছে। আমার ছেলে নেই। তাকে আমার রাজ্যদান করে চললাম বনে।

তাই হল। পত্নীদের নিয়ে বনবাসী হল বিনীতমতি, শূন্য সিংহাসনে বসিয়ে গেল কনককলসকে।

কিন্তু পুণ্য যার সহায়, তার অভাব কীসের? বনের মধ্যেই এক আশ্চর্য বাগান দেখতে পেল বিনীতমতি, সেখানে সব কিছুই সুন্দর পাথর দিয়ে বাঁধানো।

মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একজোড়া হাঁস। হংসরূপী দুই মহাযোগী। বলে গেল, বিনীতমতি, এই নন্দনকানন তুমিই বানিয়েছ তোমার পুণ্য দিয়ে। থাকো এখানেই।

দুই বউ নিয়ে পরম সুখে সেখানে রয়ে গেল সর্বস্বত্যাগী বিনীতমতি।

কিন্তু একদিন দেখল, সেখানেও একটা লোক এসে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে চলেছে।

কারণ জিজ্ঞেস করেছিল বিনীতমতি।

সে বললে, আমার নাম সোমশূর। আমার বাবার নাম নাগশূর। আমার জন্মদোষ ছিল, চোর হবো। বাবা আমাকে ধর্মের বই পড়ালেন। কিন্তু পূর্বজন্মের ফল তো পেতেই হবে। চুরি করতে শিখলাম। ধরা পড়লাম। শূলে চাপিয়ে আমাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত হল। বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল। এমন সময়ে রাজার হাতি বাঁধন ছিঁড়ে তেড়ে এল সেখানে। প্রাণ নিয়ে পালাল সবাই। পালালাম আমিও।

তারপর শুনলাম, বাবা আর মা বাড়ি ছেলে চলে গেছেন, আমাকে শূলে চাপানো হচ্ছে খবর পেয়ে।

তাঁদের খুঁজতেই এসেছিলাম এদিকে। দেখলাম এক দেবকন্যাকে। তিনি বললেন, তুমি এসেছ রাজর্ষি বিনীতমতির আশ্রমে। তোমার পাপ কেটে গেছে। তিনিই তোমাকে সম্যক জ্ঞান দেবেন।

কিন্তু বাবা আর মা-কে খুঁজে না পেয়ে যখন গলায় দড়ি দিয়ে মরতে যাচ্ছি, আপনি এলেন।

বিনীতমতি সোমশূরকে নিজের কুঁড়েঘরে নিয়ে গেল। দুই বউ তার সেবা করে গেল।

তারপর বললে রাজর্ষি বিনীতমতি, যে-কোনও পন্থায়ই হোক, অজ্ঞানের তমসা কাটাতে হয়। শোনো এক কাহিনি।

পাঞ্চালদেশে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বেদ তাঁর নখদর্পণে। তাঁর নাম দেবভূতি। পত্নীর নাম ভোগবতী। সতী মেয়ে।

একদিন স্নান করতে গেছেন দেবভূতি। তাঁর আহারের জন্যে শাক তুলতে বেরোলেন ভোগবতী নিজেদের শাকের খেতে।

দেখলেন, প্রতিবেশী ধোপার গাধা মনের সুখে শাক খেয়ে যাচ্ছে। ভোগবতী লাঠি তুলে তাকে তাড়া করেছিলেন। পালাতে গিয়ে গর্তে পড়ে একটা পা ভেঙে ফেলেছিল গাধা।

ধোপা গেল খেপে। ভোগবতীর পেটে তখন বাচ্চা। তা সত্ত্বেও তাকে বেদম পিটিয়ে গেল সেই ধোপা, লাঠি দিয়ে, আর লাথি মেরে।

নষ্ট হয়ে গেল পেটের বাচ্ছা।

স্নান সেরে এসে ভোগবতীর এই দশা দেখে দেবভূতি চলে গেলেন নগরপালের কাছে। নালিশ জানালেন।

বিচার হল অদ্ভুত। যতদিন খোঁড়া গাধার পা ভালো না হচ্ছে, ধোপার মোট বয়ে দেবেন দেবভূতি। আর যদ্দিন না ফের গর্ভবতী হচ্ছেন ভোগবতী, তদ্দিন তাঁর সঙ্গে সঙ্গম করবে ধোপা!

আত্মহত্যা করেছিলেন দেবভূতি আর ভোগবতী। রাজা তো শুনে প্রাণদণ্ড দিলেন বিচারকের। তার পুনর্জন্ম হয়েছিল পশুযোনিতে, যন্ত্রণা পেয়েছে আমরণ।

অজ্ঞানতাও একটা অর্ধম। এই তার পরিণাম।

রাজর্ষি বিনীতমতি আর একটা গল্প শোনাল সোমশূরকে। এ গল্পেও রইল দানের মহিমা। দান করার মতো পুণ্যব্রত আর নেই।

মলয়প্রভ ছিলেন কুরুক্ষেত্রের রাজা। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। টাকাপয়সা আর ধান বিলিয়ে যাচ্ছিলেন। বাধা দিল মন্ত্রীরা। অপচয় বন্ধ করলেন মলয়প্রভ।

তাঁর ছেলে ইন্দ্রপ্রভ বললে, 'রাজা তো প্রজাদের কাছে কল্পতরু। প্রজারাও রাজার কাছে কামধেনু।'

মলয়প্রভ রেগে গেলেন। বললেন—, 'এতই যখন দয়া, নিজে কল্পতরু হও। আমার টাকাপয়সা অক্ষয় নয়।'

ইন্দ্রপ্রভ বনে গিয়ে তপস্যার জোরে দুর্ভিক্ষ দূর করেছিল দেশ থেকে। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র খুশি হলেন। ইন্দ্রপ্রভকে কল্পতরু বানিয়ে নগরে রেখে দিলেন।

কিছুদিন পর দেবরাজ ইন্দ্র এসে বললে, অনেক উপকার করেছ। এবার এস, স্বর্গে থাকবে।

কল্পতরুরুপী ইন্দ্রপ্রভ জবাবটা দিল চমৎকার, গাছেরা নিঃস্বার্থ। ফল আর ফুল বিলিয়ে সবার উপকার করে যাচ্ছে। আমিও তাই করে যাই। নিজের একার সুখ চাই না।

ইন্দ্র বললেন, তাহলে প্রজাদের নিয়েই স্বর্গে এস।

ইন্দুপ্রভ বললে, প্রজারা যাক। আমি পরের উপকার করে যাব কল্প-গাছ হয়ে। সেই হোক আমার তপস্যা।

স্বয়ং বুদ্ধদেবের অংশে জন্ম হয়েছিল ইন্দুপ্রভর তাই এমন বদান্যতা, মহানুভবতা আর আশ্চর্য তপস্যা।

ইন্দ্র প্রজাসমেত তাকে নিয়ে গেলেন স্বর্গে। গাছকলেবর ছেড়ে সৌম্যরূপ ধারণ করে বুদ্ধস্বভাবে সাধনা করে গেল ইন্দুপ্রভ।

রাজর্ষি বিনীতমতি এরপর সোমশূরকে শোনাল আর এক কাহিনী, দুহাতে দান করে আশ্চর্য সিদ্ধিলাভের গল্প।

বিন্ধ্যপর্বতে ছিলেন এক শুকরাজা। বুদ্ধদেবের অংশে তাঁর জন্ম। তাঁর নাম হেমপ্রভ। আগের জন্মে ছিলেন সৎ, এ জন্মেও তাই। ছিলেন জাতিস্বর।

কিন্তু তাঁর সেনাপতি চারুমতি ছিল মহামূর্খ। সংসারে আসক্ত। তার বউ ব্যাধের জালে ধরা পড়ে মারা গেছিল। দিবানিশি আচ্ছন্ন ছিল সেই শোকে।

খামোকা কষ্ট পাচ্ছে দেখে মহামতি হেমপ্রভ একদিন তাকে একটা মিথ্যে কথা বলেছিল। সেনাপতির বউ মরেনি। ব্যাধের জাল ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেছে। দিব্যি বেঁচে আছে।

এই বলে হেমপ্রভ বোকা চারুমতিকে নিয়ে উড়ে গেল একটা পুকুরের ওপর। জলে ছায়া পড়ল শুধু নিজের। চারুমতি তখন দূরে।

নিজের ছায়া দেখিয়ে হেমপ্রভ বললে, 'ওই তো তোমার বউ। দিব্যি রয়েছে জলে।

বোকা চারুমতি আহ্লাদে গলে গিয়ে গোঁৎ খেয়ে ছায়ার সঙ্গে চুম্বন-আলিঙ্গন করতে গেছিল। কিন্তু তা হয় না এবং হয়নি।

ম্লানমুখে তখন একটা আমলকি ফল রেখেছিল জলের ছায়ার ওপর। আমলকি ডোবেনি, ভেসেই রইল।

কষ্ট পেল। বললে হেমপ্রভকে, বউ আমার ওপর রেগে রয়েছে। গা ছুঁতে দিল না, কথা বলল না, এখন আমলকিও ফিরিয়ে দিল।

হেমপ্রভ বললে, তাহলে বলি, তোমার বউ অন্যকে মন দিয়েছে। এস, জলের মধ্যে তাও দেখাচ্ছি।

বলে, জড়ামড়ি করে উড়ে গেল পুকুরের ওপর দিয়ে। বোকা চারুমতি ভাবল বুঝি তার বউ নাগর নিয়ে জলকেলি করছে।

রেগেমেগে চলে এল পুকুরের ওপর থেকে। বললে হেমপ্রভকে, মহাবোকা আমি। খামোকা কষ্ট পেয়েছি এতদিন। এখন বলুন, কী করা উচিত।

হেমপ্রভ বুঝলে, জ্ঞানদান করার সময় এবার হয়েছে।

বললে, স্ত্রীজাতিকে কক্ষনো বিশ্বাস করতে নেই। তার চাইতে বিষখাওয়া ভালো, গলায় সাপ বেঁধে রাখা ভালো। বশীকরণ মন্ত্র, পাথর বা জড়িবুটি দিয়েও রমণীকে আয়ত্তে রাখা যায় না। স্বভাবে রাজসিক, ত্যাগ নয়, ভোগ চাই। তাই, সৎ লোকের নামে কলঙ্ক রটিয়ে, তাদের অপমান করে এরা আনন্দ পায়। বাতাস যেমন চঞ্চল, নারীও তাই। মুঠোয় রাখার প্রয়াস নিস্ফল হয়। তাই, বুদ্ধি আছে যে পুরুষের, সেই পুরুষ রমণীকে রত্ন বলে মনে করে না, বিষপাথর মনে করে। রমণীতে আসক্ত হয় না।

সুবচন শোনবার পর এক্কেবারে পালটে গেল চারুমতি। ত্যাগ করল স্ত্রী সংসর্গ।

জ্ঞানী পুরুষ এইভাবেই অজ্ঞানীর মনের আঁধার কাটিয়ে দেন জ্ঞানের জ্যোতি দিয়ে।

এবার শোনো ক্ষমা করার গুণ, সেটাও এক ধর্মআচরণ।

কেদার পাহাড়ে তপস্যা করতেন এক সন্নাসী। তাঁর নাম শুভনয়। একরাতে একদল চোর এল সেখানে।

অনেক আগে তারা প্রচুর চোরাই সোনা লুকিয়ে রেখেছিল পাথরের তলায়। কিন্তু অনেক খুঁজেও পেল না সেই সোনা।

ভেবে নিল, নিশ্চয় চোরের ওপর বাটপারি করেছে শুভনয় সন্ন্যাসী। ঢুকল তাঁর কুঁড়েঘরে। অপমান করল যৎপরোনাস্তি। লাঠি দিয়ে পেটাল। দুখানা পা কেটে দিল। দুই চোখ উপড়ে ফেলে দিল। তাতেও যখন সোনা পাওয়া গেল না, রেগেমেগে বেরিয়ে গেল কুঁড়ে থেকে।

সকাল হল। সন্ন্যাসীর শিষ্য এলেন। তিনি ক্ষমতাবান রাজা। গুরুর এই অবস্থা দেখে রেগে টং হলেন। চোরদের ধরে আনলেন গুরুর সামনে। প্রাণদণ্ড দিতে যাচ্ছেন,

বাধা দিলেন সন্যাসী।

বললেন, ওদের দোষ নেই। মূল দায়ী অস্ত্র, যা দিয়ে আমার এই দশা করেছে। অস্ত্রচালনা ঘটিয়েছে ওদের ক্রোধ। ক্রোধের উন্মেষ ঘটিয়েছে সোনার অপ্রাপ্তি। সোনা না পাওয়ার মূলে আমার অদৃষ্ট। আমার অদৃষ্টকে আমিই সৃষ্টি করেছি। তাহলে ওদের দোষ কোথায়? তাই আমি ক্ষমা করছি ওদের।

ক্ষমা করলেন সন্ন্যাসী। অধিকতর পুণ্যসঞ্চয় করে গেলেন।

রাজর্ষি বিনীতমতি বললে, ধৈর্য ধারণ করাও ধর্ম। একটা কাহিনি শোনাই।

আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল এক গান্ধর্বপুত্র। নীচ থেকে সেই দৃশ্য দেখেছিল এক ব্রাহ্মণ তনয়। তার নাম মালাধর। দেখে ইচ্ছে হয়েছিল আকাশে ওড়বার। ঘাস দিয়ে ডানা বানিয়ে, পিঠে বেঁধে, রোজই চেষ্টা করে গেল, কিন্তু শূন্যে উড়তে আর পারল না।

সেই বৃথাচেষ্টা একদিন দেখে ফেলেছিল গন্ধবপুত্র। সে সিদ্ধকুমার, আকাশে ওড়বার ক্ষমতা তার জন্মগত, মানুষের ছেলে তা পারবে কেন।

কিন্তু ছেলেটার ধৈর্য দেখে মন গলে গেছিল সিদ্ধকুমারের। মালাধরকে আকাশে ওড়ার বিদ্যাদান করে রেখে দিয়েছিল নিজের অনুচরদের মধ্যে।

ধৈর্য যার আছে, দেবতারাও তাকে অনুগ্রহ করে।

এরপর বিনীতমতি শোনাল ধ্যান-ধর্মের এক কাহিনি।

মলয়মালী ছিল বণিকপুত্র। বাবার নাম বিজয়মালী। দেশ কর্ণাট।

বাবার সঙ্গে একদিন রাজবাড়ি গিয়ে রাজকন্যা ইন্দুযশাকে দেখে কামজ্বরে আচ্ছন্ন হয়েছিল মলয়মালী। রাতের ঘুমও ছুটে গেল। মুখে কোনও কথা নেই। যেন বোবা।

তার বন্ধুর নাম মন্থরক। চিত্রশিল্পী। মলয়মালীকে এই অবস্থায় দেখে সে আসল ব্যাপারটা বের করল পেট থেকে। তারপর দিল উপদেশ, বামন কি চাঁদ ধরতে পার? হাঁস কি পদ্মনাভের নাভিপদ্ম পেতে পারে?

মন্থরক কিন্তু গোঁ ধরেই রইল। রাজকন্যাকে তার চাই।

চতুর মন্থরক তখন রাজকন্যার এমন এখটা ছবি এঁকে দিল মলয়মালীকে, যে ছবি বুকে নিয়ে চুমু-টুমু দিয়ে দিবসরজনী কাটিয়ে দিল এক দর্শনেই প্রেম-পাগল মলয়মালী। তার কাছে, ওটা ছবি নয়, রক্তমাংসের

রাজকন্যা।

মোহবিকারগ্রস্ত মলয়মালী একদিন ছবি বুকে নিয়ে গেছিল নির্জন বাগানে। সন্ন্যাসী বিনয়জ্যোতি আকাশ থেকে নেমে এলেন তাকে দেখে। তার অবস্থা দেখে, ছবির কোণে একটা জ্যান্ত সাপ এঁকে দিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মলয়মালী তখন ফুল আনতে গেছিল রাজকন্যাকে সাজাবে বলে। ফিরে এসে দেখল ছবিতে সাপ নড়ছে। আর, ওর সামনেই সাপ ছোবল মারল রাজকন্যাকে।

মনের দুঃখে গাছে উঠে নীচে লাফিয়ে যেই আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে মলয়মালী, সন্ন্যাসী তাকে দু-হাতে লুফে নিলে।

বুঝিয়ে দিলেন, ছবি যেমন নিষ্প্রাণ, সাপও তেমনি প্রাণহীন। সত্য বলে মনে করছে মলয়মালী মনোবিকারের জন্যে।

এইবার চৈতন্য হল মলয়মালীর। ধ্যানে বসল। বুদ্ধত্ব পেল।

ধ্যান করেই তা সম্ভব হয়েছিল। ধ্যান মিথ্যা ধারণাকে ভেঙে দেয়, সত্যের আলো দেখায়।

বিনীতমতি বললে, এবার শোনাই প্রজ্ঞাকাহিনি।

প্রজ্ঞা অর্থে জ্ঞান। এই কাহিনি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ। এককথায়, প্রজ্ঞাপারমিতা।

সিংহবিক্রম ছিল সিংহলের চোর। জন্মইস্তক সে চুরিই করে গেছে। কিন্তু বুড়ো বয়সে এহেন অপকর্ম যখন আর সম্ভব হল, তখন শুরু হল চিন্তা। পরকালের চিন্তা।

এক উপায় আছে। পরমেশ্বর ভজনা। কিন্তু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের ভজনা তো একচেটিয়া করে রেখেছে রথীমহারথীরা, বড়ো বড়ো সাধকরা, আগে তাদের বর না দিয়ে পাপিষ্ঠ চোরকে পাত্তা দেবেন কেন ওঁরা?

শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি একটা বেরোল মগজ থেকে। চিত্রগুপ্তর পুজো করা যাক। সে ভদ্রলোক জাতে কায়স্থ। জমের দরবারে বসে স্রেফ পাপপুণ্যের হিসেব রেখে যান, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের কাজকর্মের ইতিহাসও তাঁকে লিখতে হয়। নথি যিনি রাখেন, তাঁকেই হাত করা যাক। কারণ, নথির উলটোপালটা ব্যাখ্যা তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

চিত্রগুপ্তের গদি নড়ে গেল চোরের সাধনায়। একদিন যাচাই করতে এলেন। চোর তাঁকে কতখানি ভক্তিশ্রদ্ধা করে, সেটা দেখা দরকার।

এলেন এক বুড়ো বামুনের রূপ ধরে। অতিথি আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি রাখল না।

তখন মোক্ষম চাল ছাড়লেন চিত্রগুপ্ত। নথি লিখে লিখে বুদ্ধি পাকিয়েছেন। তিনি জানেন, মর্ত্যের মানুষ রমণী দেখলেই গলে যায়। কাছে পেতে চায়। আর এই রমণী যদি নিজের বউ হয়, হাতছাড়া করতে চায় না। কারণ, বউদের বিশ্বাস করা যায় না।

অতএব, চিত্রগুপ্ত নিজের রূপ ধারণ করে বললেন, ওহে চোর, আমাকে খুশি না করলে তো তোমার পরকাল নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাব না।

অর্থাৎ, ঘুষ চান চিত্রগুপ্ত! পরকালটা সুখের করার জন্যে চোর ঘুষ দিতে প্রস্তুত।

বললে, কি চান বলুন।

তোমার বউকে।

নিয়ে যান।

প্রীত হলেন চিত্রগুপ্ত। পরের বউ নিয়ে ঝামেলা বাড়ানোর মতো উজবুক তিনি নন।

বললেন, বলো কি চাই।

যাতে না মরি। পরকালে না যেতে হয়।

তা হয় না। জন্মালে মরতে হবে। পরকালেও যেতে হবে। কিন্তু একটা প্যাঁচ বলে দিচ্ছি। পুরাকালে শ্বেতমুনিকে প্রসন্ন রাখবার জন্যে মহাদেব মহাকালকে ধ্বংস করেন। পরে আবার মহাকালকে সৃজনও

করেন, একটা শর্তে। শ্বেতমুনির অবস্থান যেখানে, সেখানে মহাকাল ঢুকতে পারবে না, জীব সেখানে মৃত্যুহীন থাকবে। অর্থাৎ, অমর। শ্বেতমুনি এখন থাকেন পুবসাগরের পারে তরঙ্গিনী নদীর অপর পারে। সেখানে মৃত্যু নেই। তোমাকে রেখে আসছি সেখানে। নদীর এপারে এলেই কিন্তু মরবে। কক্ষনো আসবে না। নিয়তি যদি টেনেও আনে পরপারে, মরে আসবে আমার দপ্তরে, পরলোকে। তখন একটা ব্যবস্থা করা যাবে খন।

খোদ চিত্রগুপ্ত যখন পরকালের বিহিত করবেন, তখন আর চিন্তা কীসের? চিত্রগুপ্তের পিঠে চেপে তৎক্ষণাৎ শ্বেতমুনির আশ্রমে চলে এল চোরবাবাজি।

এদিকে মৃত্যুর পুঁথি দেখে মহাকাল এল চোরকে বেঁধে নিয়ে যেতে। কিন্তু তরঙ্গিনী নদী পেরিয়ে শ্বেতমুনির আশ্রমে ঢুকতে পারল না।

বেড়ে চাল চেলেছে তো বেটা চোর! ভেবেচিন্তে পালটা চাল দিল মহাকাল। খাসা এক মেয়েছেলে সৃষ্টি করল মন থেকে। পাঠিয়ে দিল শ্বেতমুনির এলাকায়, ছলাকলা দেখিয়ে চোরের মতিবিভ্রম ঘটানোর জন্যে।

একে রূপসী, তায় মায়াবিনী। মুনিরও মতিভ্রম ঘটে। চোরের আর দোষ কী! অঙ্গ স্পর্শ করতেই কামজ্বরে প্রায় বেহুঁশ হয়ে গেল। দিনকয়েক রতিক্রিয়া চলল পুরোদমে।

আর তার পরেই তরঙ্গিনীর জলে ঝাঁপ দিল মায়াবিনী। যেন ডুবে যাচ্ছে, এমনি ভাব দেখিয়ে চেঁচিয়ে গেল গলা ফাটিয়ে, বাঁচাও! বাঁচাও!

বীরবিক্রমে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল চোর। প্রায় ডুবে, প্রায় ভেসে নদীর অপরপারে পৌঁছে গেল মায়াবিনী। আত্মবিস্মৃত চোর চিত্রগুপ্তের সাবধান বাণী বেমালুম ভুলে গিয়ে হাঁচড় পাঁচড় করে উঠে পড়লো পরপারে।

সঙ্গে সঙ্গে শূণ্যে মিলিয়ে গেল মায়ায় গড়া মোহিনী। মহাকাল চোরের গলা টিপে ধরে নিয়ে ফেলল যমের দরবারে।

আঁৎকে উঠেই সামলে নিল ধুরন্ধর চিত্রগুপ্ত। নিয়তির লিখন খণ্ডাবে কে? কিন্তু পরলোকেই যখন এসেছে চোর, মন্ত্র দেওয়া যাক কানে কানে।

ফিসফিস করে বললে চিত্রগুপ্ত, যমরাজ হুংকার ছেড়ে জানতে চাইবেন, আগে কোথায় যাবে? স্বর্গে, না, নরকে? তুমি বলবে স্বর্গে। স্বর্গে গিয়েই এন্তার পুণ্যসঞ্চয় করে যাবে, তাহলে স্বগেই তোমার পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে যাবে। হিসেব তো রাখব আমি।

তাই হল। যমরাজ আগে নথিকার চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞেস করলেন, এই বেটা চোর কোনও পুণ্য করেছে কি?

চিত্রগুপ্ত বললে, আজ্ঞে, তা করেছে। একদিন অতিথিসেবা করেছে মন দিয়ে। সুতরাং, ওর একদিন স্বর্গবাস প্রাপ্য হয়েছে।

যমরাজ চোরকে একদিনের জন্যে স্বর্গে পাঠিয়ে দিলেন।

চোর সেখানকার স্বর্গগঙ্গায় গলা পর্যন্ত ডুবে এমন জপ করে গেল যে, দ্বিতীয় দিনও তার স্বর্গবাস প্রাপ্য হয়ে গেল। এইভাবে গেল দিনের পর দিন। একটানা জপতপ করার ফলে পুণ্যের পাহাড় জমে যাওয়ায় যমদূতরা তার ছায়া মাড়ানোও ছেড়ে দিল।

বিনীতমতি বললে, শুনলে তো, জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, মানে, প্রজ্ঞাপারমিতার বলে, সামান্য চোরও স্বর্গবাসের অধিকার পেয়ে গেল। যাদের বুদ্ধি আছে, তারা এইভাবে ছ-রকম পরাকাষ্ঠা, অর্থাৎ পারমিতা দেখায়। ধৈর্য পারমিতা, দান পারমিতা, শীল পারমিতা, ক্ষমা পারমিতা, ধ্যান পারমিতা আর প্রজ্ঞাপারমিতা। ছ-রকম পারমিতার বর্ণনা তোমাকে দিলাম। বিধান মেনে চললে সংসার সাগর পেরিয়ে যাবে। দুঃখ চলে যাবে, চিরশান্তি পাবে।

এইসব জ্ঞানের কথা বলার পর সন্ধ্যে নামল। সোমশূর বিনীতমতির কাছ ছেড়ে আর গেল না। জ্ঞানের কথায় তার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটেছে। সেইখানেই পৃথক কুঁড়ে বানিয়ে সাধননগ্ন হয়ে রইল। পরমজ্ঞান লাভ করল যথাসময়ে। সাধনা করলে সিদ্ধিলাভ তো ঘটবেই।

এদিকে বিনীতমতির পরের পর দানের প্রতিক্রিয়াও সৃষ্ট হয়ে চলেছে। কনককলস রাজ্যহীন হয়েছে ইন্দুকলসের আক্রমণে, বিনীতমতির দেওয়া ঘোড়া আর কৃপাণের জোরে। পথের ভিখিরি হয়ে কনককলস এল বিনীতমতির আশ্রমেই। বিনীতমতি যখন তার সেবা করছে, মায়াবিস্তার করে গেলেন দেবরাজ ইন্দ্র, বিনীতমতির সুমতির পরীক্ষা নেওয়ার জন্যে। মায়াকাননকে মুহূর্তের মধ্যে মরুভূমি করে দিলেন। এরই নাম ইন্দ্রজাল, ইন্দ্র যে বিদ্যায় অতিশয় নিপুণ।

বিনীতমতির মনোবল কিন্তু ভেঙে গেল না। নিঃস্ব হয়েই শরণাগত কনককলসের সেবার আয়োজন করে গেল।

বললে, কনককলসকে, আমার পাপে এমন নন্দনকানন এখন ভীষণ মরুকান্তার। কিন্তু তুমি চলে যাও এক মাইল দূরে। দেখতে পাবে একটা খাদ। সেই খাদে দেখবে মরে পড়ে রয়েছে একটা হরিণ। ঝলসে খেয়ে নেবে। খিদে মেটাবে।

কনককলসকে রওনা করিয়ে দিয়েই যোগবলে বিনীতমতি উপস্থিত হল খাদের মধ্যে। রূপ পরিবর্তন করে, মৃগরূপ ধরে, পড়ে রইল অবিকল মড়ার মতো।

পেটের খিদে নিয়ে কনককলস এসে দেখল, সেই মরা হরিণকে। আগুনে ঝলসে নিয়ে খেল তৎক্ষণাৎ।

বিনীতমতির বউ দুজন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছিল অকস্মাৎ নন্দনকাননের রূপ পরিবর্তন দেখে। সেইসঙ্গে উধাও হয়েছে স্বামীদেবতাও। কাঁদতে কাঁদতে দুজনে গেল সোমশূরের কাছে সে তখন ধ্যানস্থ। এত কাণ্ডের কিছুই জানে না।

গুরুপত্নীদের তাড়নায় ধ্যান ছুটে গেল তৎক্ষণাৎ। পরমজ্ঞানী বলেই মুহূর্তের মধ্যে বুঝে ফেলল আসল ব্যাপারটা। ফের দানশীল হয়েছে গুরু বিনীতমতি। এবার নিজের কলেবর দিয়ে, আর তো কিছু দেবার নেই।

নিয়ে গেল গুরুপত্নীদের খাদের মধ্যে। বুঝিয়ে দিল, ওই মরা হরিণই তাদের স্বামী, বিনীতমতি।

তৎক্ষণাৎ চিতা প্রস্তুত করে বিনীতমতিকে দাহ করা শুরু হল, চিতায় সজ্ঞানে প্রবেশ করল দুই সতী, সহমরণের জন্যে।

কনককলস নিদারণ অনুশোচনায় তৎক্ষণাৎ আত্মবিসর্জন দিল জ্বলন্ত চিতায়।

সোমশূর কত আর সহ্য করবে? ঘাসশয্যা বানিয়ে শুয়ে পড়ল, নিজেও আত্মাহুতি দেবে বলে।

তৎক্ষণাৎ কেটে গেল মায়া মরীচিকা। হাসিমুখে হাজির হলেন দেবরাজ ইন্দ্র।

বললেন, ক্ষান্ত হও। শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সব্বাই। মরলোক থেকে ইহলোকে সব ফিরিয়ে আনছি অমৃত বর্ষণ করে। দ্যাখো, দ্যাখো, দ্যাখো!

আকাশ থেকে অমৃত বর্ষণ শুরু হয়ে যেতেই ফিরে এল সেই অপরূপ নন্দনকানন, ভস্ম থেকে পূর্বকলেবরে জাগ্রত হল বিনীতমতি, তার দুই বউ আর কনককলস। স্বর্গ থেকে নেমে এলেন প্রধান দেবতারা। আশীর্বাদ করে গেলেন সব্বাইকে।

গণাকর এই সুদীর্ঘ কাহিনি শুনিয়ে দেওয়ার পর বললে মৃগাঙ্কদত্তকে, আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মরতে দিল না সেই বনবুড়ি। বলেছিল, মরামানুও অনেক সময়ে ফিরে আসে। বলে, যে গল্প শুনিয়েছিল, চমকপ্রদ সেই গল্পমালা শোনালাম এতক্ষণ ধরে। আমার আত্মহত্যা নিবারণ করে বুড়ি চলে যেতেই বেরোলাম আপনার খোঁজে। এই অরণ্যে আসতেই পড়লাম ভীলদের খপ্পরে, আমাকে দিয়ে, তারা নরবলি দিতে চায় দেবী চণ্ডিকার বেদীমূলে। অত সহজে প্রাণ দেব কেন? লড়ে গেলাম। ওরা অনেকে, আমি একা। ক্ষতবিক্ষত হলাম। শেষকালে বেঁধে নিয়ে এসেছে। আর দুশ্চিন্তা নেই। বুড়ির কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। মরতে বসেও ফিরে পেলাম আপনাকে।

বন্ধুভাগ্য বটে পরস্পরের। অভিভূত মৃগাঙ্কদত্ত তৎক্ষণাৎ যথাবিহিত শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেছিলেন গুণাকরের।

দিন কয়েক পরে বন্ধুদের নিয়ে উজ্জয়িনীতে গিয়ে শশাঙ্কবতীকে সহধর্মিণী করবেন, এই মনোবাঞ্ছা কিন্তু অম্লান দীপশিখার মতোই প্রজ্বলিত রইল মনের মধ্যে।

৭৩. শ্রীদর্শন কাহিনি

গুণাকরের গায়ের অস্ত্রক্ষত শুকিয়ে যাওয়ার পর সবান্ধব মৃগাঙ্কদত্ত রওনা হলেন উজ্জয়িনী অভিমুখে, শশাঙ্কবতী লাভের মনোবাসনা নিয়ে।

পথে নামল রাত্রি। গভীর জঙ্গলে। এক গাছতলায় চারবন্ধুকে নিয়ে ঘুনিয়ে পড়লেন মৃগাঙ্কদত্ত।

ঘুম ভাঙল হঠাৎ। দেখলেন, পাশেই ঘুমিয়ে রয়েছে তাঁর আর এক বন্ধু-মন্ত্রী, বিচিত্ররথ। হারিয়ে যাওয়া বন্ধু!

ঘুম ভাঙল বিচিত্ররথেরও। শোনাল নিজের কাহিনি।

নাগরাজের অভিশাপে পথ হারালাম। জ্ঞান পর্যন্ত রইল না।

একদিন একরাত অজ্ঞান অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে কোথায় গিয়ে পড়েছিলাম, তা বলতে পারব না। জ্ঞান ফেরবার পর চোখের সামনে দেখলাম এক বিরাট প্রাসাদ। ভারি সুন্দর।

প্রাসাদের ভেতর দেখলাম এক দিব্যকান্তি পুরুষকে। দেবনারীর মতো পরমাসুন্দরী দুই বউ নিয়ে সংসার করছেন সেখানে।

খাওয়া দাওয়া সেখানেই করলাম। সুস্থবোধ করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কে?

সুন্দর পুরুষ বললেন, আমি এক যক্ষ। এই দুই সুন্দরী আমার বউ। নাগরাজের অভিশাপে তুমি যে কষ্ট পাচ্ছ, তা কেটে যাবে, বন্ধু মৃগাঙ্কদত্তকে ফিরে পাবে। সংসারে দুঃখকষ্ট থাকে, ভুগতে হয় সবাইকে। আমিও ভুগেছি।

এই বলে আশ্চর্য এক কাহিনি শোনালেন সেই যক্ষ।

ত্রিগর্তা একটা সুন্দর নগর। সেখানে থাকতেন এক ব্রাহ্মণ যুবক। তাঁর নাম পবিত্রধর। দরিদ্র, কিন্তু মানী। থাকতেন ব্রাহ্মণ ধনীদের সঙ্গে, সসম্মানে।

একদিন তিনি ভাবলেন, এখানে আমাকে মানাচ্ছে না। কারণ আমি গরিব। ছন্দোময় কবিতায় আমি যেন একটা বেখাপ্পা শব্দ। সুর কেটে যাচ্ছে। অতএব আমি যক্ষিনী সাধনা করব। যক্ষিনী বিয়ে করব। বড়োলোক হবো।

যেমন কথা, তেমনি কাজ। সাধনায় সুফল পেলেন যথা সময়ে। বিয়ে করলেন এক যক্ষিনীকে। তার নাম, সৌদামিনী।

কিন্তু যথাসময়ে সৌদামিনীর গর্ভে এল না সন্তান। মন খাপার করে বসেছিলেন পবিত্রধর। সৌদামিনী বললে, কেন ভাবছেন? সাধ মিটবে। যথাসময়ে আমাদের ছেলে হবে। এখন শুনুন এক গল্প।

দক্ষিণের দেশে আছে এক মস্ত তমাল অরণ্য। সেখানে থাকতেন এক যক্ষ। তার নাম, পৃথুদর। আমি তাঁরই মেয়ে, একমাত্র সন্তান।

বাবা আমাকে নানা পাহাড়, নানা উপবনে নিয়ে যেতেন। আমি সঙ্গিনীদের নিয়ে আপন মনে খেলা করে বেড়াতাম।

একদিন দেখলাম এক যক্ষপুত্রকে। তার নাম অট্টহাস। দুজনে দুজনের প্রেমে পড়লাম। বাবা আমাদের বিয়ে দেবেন স্থির করলেন। আমাকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

পরের দিন আমার এক সহচরী একটা খারাপ খবর দিল আমাকে। অট্টহাস আমার কথা ভাবছিল এক পাহাড়ে বসে। মন খারাপ দেখে তার বন্ধুরা তাকে নিয়ে এক খেলা জুড়েছিল। কুবের আর নলকুবের-এর খেলা। যক্ষদের রাজা কুবের। তাঁর ছেলের নাম নলকুবর। অট্টহাসকে কুবের কল্পনা করে নেওয়া হয়েছিল, অট্টহাসের ভাই দীপশিখলে ধরে নেওয়া হয়েছিল নলকুবর। বন্ধুরা হয়েছিল তাদের মন্ত্রী। এ খেলা হচ্ছিল অট্টহাসের মন ভালো রাখার জন্যে।

কিন্তু খেপে গেছেন আসল নলকুবর। ঠিক ওই সময়ে আকাশপথে তিনি যাচ্ছিলেন। রঙ্গ-অভিনয় বুঝলেন না। অট্টহাসকে বলেছেন, তোর স্পর্ধা তো কম নয়। প্রভুকে নকল করছিস। যা, মানুষ হয়ে জন্মা।

কাকুতি মিনতি করেছিল অট্টহাস। সে তো সত্যি সত্যিই তামাসা করছে না যক্ষ অধিপতিকে নিয়ে। এ তো নিছক খেলা।

মন নরম হয়েছিল নলকুবর-এর। কিন্তু মুখ দিয়ে যে কথা বেরিয়েছে, তা তো ফলবেই।

তাই বলেছেন, তুই জন্মাবি মানুষ হয়ে, আর যে যক্ষিনীর কথা ভাবছিস, সে হবে তোর বউ। তোদের ছেলে হয়ে জন্মাবে তোর এই ভাই দীপশিখ। তবেই তোদের মর্ত্যের ভোগান্তি শেষ হবে, ফিরে আসবি এখানে। তোদের ছেলে রাজ্যশাসন করবে, মানে, তোর এই ভাই। তারপর শাপ কেটে যাবে, সে-ও ফিরে আসবে এখানে।

গল্প শেষ করে সৌদামিনী বললে, আমিই সেই যক্ষিনী আপনি সেই অট্টহাস। আমাদের ছেলে হয়ে জন্মাবে আপনার সেই ভাই দীপশিখ।

যথাসময়ে ছেলে হল সৌদামিনীর। তৎক্ষণাৎ যক্ষরূপ ফিরে পেল অট্টহাস। বললে সৌদামিনীকে, আর কেন? চল ফিরে যাই নিজেদের জায়গায়।

সৌদামিনী বললে, আঁতুড়ে ছেলেকে ফেলে? বাঁচবে কী করে?

ধ্যানে বসল অট্টহাস। সমাধান পেয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

ত্রিগর্তা নগরেই আছেন এক বেজায় বড়োলোক ব্রাহ্মণ। নিঃসন্তান। অগ্নিদেবতা তাঁকে স্বপ্নে বলে গেছেন, ছেলে তুমি পাবে, তবে তোমার ঔরসে নয়। সেই ছেলেই তোমার কপাল ফিরিয়ে দেবে। ঐশ্বর্য আরও বাড়িয়ে দেবে।

অট্টহাস বললে সৌদামিনীকে, চলো, ছেলেকে রেখে আসি বামুনের বাড়িতে।

সেই রাতেই দামি দামি পাথরের মালা পরিয়ে ছেলেকে সোনার গামলায় শুইয়ে রেখে আসা হল ব্রাহ্মণের বাড়িতে, পাশে রইল রাশি রাশি সোনাদানা।

সৌদামিনীকে নিয়ে যক্ষদের যায়গায় ফিরে গেল অট্টহাস, সস্ত্রীক।

ভোরে কচি ছেলের কান্নায় ঘুম ভেঙে গেল ব্রাহ্মণ দম্পতির। অগ্নিদেবতার কৃপায় পাওয়া ছেলের নাম দেওয়া হল, শ্রীদর্শন।

সেই শ্রীদর্শন বড়ো হয়ে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তো হলই, অস্ত্রবিদ্যাতেও দেখিয়ে দিল আশ্চর্য পারদর্শিতা। সেই সঙ্গে দিনে দিনে বৃদ্ধি পেল ব্রাহ্মণের ধনরত্ন, উপচে ওঠার মতো অবস্থা।

মনস্কামনার আর তো কিছু অবশিষ্ট রইল না। তৃপ্ত ব্রাহ্মণ তীর্থ পর্যটনে বেরোলেন। খবর এল, তীর্থেই তিনি দেহ রেখেছেন।

ব্রাহ্মণী সহমরণে গেলেন জ্বলন্ত চিতায়।

উপদেষ্টার অভাব দেখা দিল শ্রীদর্শনের জীবনে। সে বিদ্বান, বুদ্ধিমান। তা সত্ত্বেও আকৃষ্ট হল পাশা খেলার জুয়োয়।

গেল সর্বস্ব, এমন কী পরনের বস্ত্র পর্যন্ত।

তিনদিন তিনরাত্রি মুখ লুকিয়ে ঘরের কোণে বসে রইল।

তারপর পাশামহলেরই এক বন্ধু এল তার কাছে। তার নাম মুখরক। বললে, পাশাখেলা মহাপাপ। ঘুঁটিগুলো অলক্ষ্মীর কটাক্ষপাত। এই নেশায় যে মাতে, তাকে হাতবালিশে শুতে হয়, ধুলোই হয় বিছানা, উঠোনই হয় বাড়ি, অপমান করে গৃহবধূ। কষ্ট পেও না। শোনো এক গল্প।

এই পৃথিবীর ভূস্বর্গ কাশ্মীরে লক্ষ্মী আর সরস্বতী সহাবস্থান করেন, অধর্ম জাগাতে কলি যাতে ঢুকতে না পারে, তাই কাশ্মীরকে নিজের দেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছেন হিমালয়, সেখানকার বিতস্তা নদী দেবতাদের লীলাক্ষেত্র, এহেন পুণ্য পাহাড় থেকে যাতে কেউ নেমে না আসতে পারে, তাই পথ আগলায় বিতস্তা নানা

দেহভঙ্গিমায়। সেখানকার গগনচুম্বী পাহাড়দের দেখলে মনোহর প্রাসাদ দেখবার সাধ মিটে যায়। সেখানে অতিবৃষ্টি নামক প্রাকৃতিক উপদ্রব ঠাঁই পায় না। রাজা ভূনন্দন থাকতেন এইখানে। মহাবীর। সুন্দরীপ্রিয়।

এক রাতে স্বপ্নে তিনি দেখলেন, এক রূপসী লালসাময়ী তাঁর শয্যায় এসে তাঁকে সম্ভোগসুখ দিচ্ছে। কিন্তু কামার্ত হলেন রাজা। ঘুম ভেঙে গেল।

তখন দেখলেন, নিছক স্বপ্ন দেখেননি। সত্যিই এক রমণী তাঁর নিদ্রাকালে তাঁর সঙ্গে সঙ্গম করেছে, চরমানন্দ পেয়েছে, সারা গায়ে তাই তো এত নখের দাগ, গালে দাঁতের দাগ, কামরস লেগেছে শরীরের বিশেষ জায়গায়।

কে এই রাতের কামিনী? চিন্তায় এমনই আচ্ছন্ন হলেন যে রাজকাজ ত্যাগ করলেন। বনে চলে গেলেন। রাজ্যশাসনের ভার দিয়ে গেলেন ছোটো ভাই-সুনন্দনকে।

কেন? না, ঘুমের সুযোগে কোনো কামিনী সম্ভোগ রসের ভাণ্ড খালি করে গেছে তাঁর মতো বীরপুরুষের ওপর, প্রকৃত বীরাঙ্গনা সেই রমণীকে লাভ করতেই হবে।

কাশ্মীরের আর এক নদী অপরগঙ্গার তীরে বসে বারো বছর সেই আশ্চর্য নৈশ-কামিনীর ধ্যান করে গেলেন।

তারপর, সশিষ্য এক জটাধারী সন্ন্যাসী এসে তাঁকে বললেন, যার জন্যে কামনা-ধ্যানে বসেছ, সে থাকে পাতালে, দৈত্যের মেয়ে যে। পাতাল শাস্ত্র আমার জানা। শিখেছি বাবার কাছ থেকে। আমার নাম ভূরিবসু। শিবের আরাধনা করে জেনেছি, পাতালে প্রবেশের পথ আছে কোথায় কোথায়। একটা গর্ত বানিয়েছেন ময়দানব এই কাশ্মীরে। সেই গর্ত দিয়ে ঢুকে আর এক গর্ত দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায় এক পাহাড়ের চুড়ো দিয়ে। এই দুটো জায়গার নাম প্রদ্যুম্নশিখর আর শারিকাকুট। এস আমার সঙ্গে শারিকাকুটে। নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে সেই মূর্তিমতী কাম দৈত্যকন্যার কাছে, সম্ভোগ সুখের বিবিধ কৌশলে যে অদ্বিতীয়া।

সদলবলে শারিকাকুটে গেলেন রাজা ভূনন্দন। বিতস্তায় স্নান করে শুদ্ধ দেহে আগে বিঘ্ননাশন গণেশের পুজো করলেন, তারপর দেবী শারিকার পুজোয় বসলেন।

পেলেন মহাদেবের কৃপা। খুলে গেল পাতাল-গহ্বরের গোপন দ্বার। পাঁচদিন পাঁচরাত একটানা হেঁটে নেমে গেলেন। ষষ্ঠ দিনে পেরিয়ে গেলেন পাতাল গঙ্গা ভোগবতীকে। প্রবেশ করলেন রজতভূমিতে, সেখানকার মাটি খাঁটি রুপো দিয়ে গড়া। দেখলেন চোখ ঝলসানো এক বাগান। বাগানে রয়েছে খুব উঁচু একটা শিবমন্দির। ভিত সোনা দিয়ে তৈরি, থামগুলো দামি দামি মণিপাথর দিয়ে গড়া, মেঝে চন্দ্রকান্তমণি দিয়ে বাঁধানো।

জটাধারী সন্ন্যাসী বললেন, ভূনন্দন, ভূনন্দন, এই সেই পাতালবাসী হাটকেশ্বর মন্দির।

সেখানে পুজো দিলেন রাজা ভূনন্দন।

পূজো শেষ হল, মন্দিরের সামনে দেখা গেল একটা বিশাল জাম গাছ। বিস্তর পাকা ফল ঝুলছে।

সেই ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন জটাধারী অভিজ্ঞ সন্ন্যাসী। তাঁর কথা শোনেনি এক শিষ্য। খিদের জ্বালায় মুখে পুরেছিল পাকা ফল। নিজেই গাছ হয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ।

মাইল দুই হেঁটে যাওয়ার পর দেখা গেছিল খুব উঁচু একটা সোনার পাঁচিল। জহর দিয়ে গড়া দরজা। শিং উঁচিয়ে দুপাশে দাঁড়িয়ে দুটো প্রকাণ্ড ভেড়া, ঢুকতে দেবে না কাউকে।

জটাধারী মন্ত্রপুত লোহার ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে তাদের মেরে ফেললেন। দরজা ঠেলে ঢুকলেন ভেতরে সবাইকে নিয়ে। দেখলেন, সারি সারি চোখ ধাঁধানো রত্নখচিত প্রাসাদ। পাতালে রত্নের অভাব নেই, অভাব নেই এই অট্টালিকাগুলোতেও।

প্রত্যেক প্রাসাদের পাহারাদারের হাতে রয়েছে লোহার মুগুড়।

জটাধারী সন্ন্যাসী এক গাছতলায় বসে দুষ্টনাশিনী যোগক্রিয়া শুরু করতেই চম্পট দিল পাহারাদাররা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে।

এইবার দরজার পর দরজা খুলে প্রাসাদসারির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দৈত্যকন্যাদের সহচরীরা। এক-একটা প্রাসাদ থেকে একজন করে। প্রত্যেকের গায়ের গয়না থেকে রোশনাই ঠিকরে যাচ্ছে। যে কজন পুরুষ সেখানে ছিল, তাদের প্রত্যেকের সামনে এসে দাঁড়াল এক-একজন কামলোচনা কামিনী, পরিচারিকা প্রত্যেকেই, কিন্তু আসঙ্গ লিপ্সা ফেটে পড়ছে প্রত্যেকের যৌবনরসে টলমল বরতনুর প্রতিটি লোমরন্ধ্র থেকে, কোনও পুরুষ স্থির থাকতে পারে না সেই কাম হিল্লোলের ছোঁয়ায় এলে।

কিন্তু তা নিছক ভূমিকা। পূর্বপ্রস্তুতি। কামনায় অধীর হয়ে সমাগত পুরুষরা যেন আর এক লহমাও স্থির থাকতে না পেরে পরিচারিকাদের ঢলঢল আঁখিপাতের নীরব আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আগমন করে তাদের প্রত্যেকের স্বামিনী দৈত্যকন্যার কাছে।

বাক্যের প্রয়োজনও ছিল না। সচল সম্ভোগদের দেখেই সংযম তিরোহিত হয়েছিল প্রতিটি পুরুষের মন থেকে। টানটান হয়ে গেছিল দেহ।

ব্যতিক্রম ঘটেনি জটাজুটধারী ক্ষেত্রেও। তিনিই পথ দেখিয়ে এনেছেন সবাইকে পাতালে পাতালকন্যাদের অভাবনীয় সঙ্গম প্রক্রিয়ার আস্বাদ পাওয়ানোর জন্যে। নিজেই পথ দেখালেন সবার আগে। আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এক পরিচারিকার, আজ্ঞা দিলেন সঙ্গীদের, খবরদার, বিমুখ কোরো না কাউকে। যে যা বলবে, তাই করবে, নইলে সর্বনাশ হবে। যাও, এক এক প্রাসাদে এক-একজন। সেখানে গিয়ে সঙ্গম-পিপাসা মেটাবে নিজেদের, দৈত্য কন্যাদের, তাদের সহচরীদের। উপোসি প্রত্যেকেই, উপোসি তোমরাও। নিভুক শরীরের আগুন, পরস্পরের। আবার জ্বলুক, কেননা, কামের আগুন যে অনির্বাণ!

তাই হয়েছিল। জটাজুটধারী বিজ্ঞ সন্ন্যাসী নিজেই এক প্রাসাদে প্রবেশ করে নিরাবরণা দৈত্যকন্যার সঙ্গে নিরন্তর সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছিলেন। ভূনন্দন ঢুকেছিলেন যে মণিময় প্রাসাদে সেখানকার দেওয়ালে দেওয়ালে ছায়া নেচে বেড়াচ্ছে রতিক্রিয়ার রকমারি আসনে। বাতাসে ভেসে যাচ্ছে লালসাজাগানো উদ্দাম সঙ্গীতের সুর, ঘর ম ম করছে রতিরসের সুগন্ধে...সেখানে শুধু শরীর, খেলার অশ্রুত উদ্দাম আমন্ত্রণ!

দেখেই বুঝে নিয়েছিলেন রাজা ভূনন্দন—এই সেই রাতের কামিনী যে তার ঘুম না ভাঙিয়ে সঙ্গম সুধা দিয়ে গেছে ...

পাশাপাশি বসে কাম-আলোচনায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে দৈত্যকন্যা রাজা ভূনন্দনকে নিয়ে গেল দীঘির পাড়ে। সারবন্দি গাছের ডাল থেকে ঝুলছিল পচাগলা মড়া। সেই রস আর রক্ত থেকে তৈরি হচ্ছে কড়া মদ।

বীভৎস সেই সুরায় পানপাত্র ভরে রাজা ভূনন্দনকে খেতে দিল অপরূপা কামসম্রাজ্ঞী সেই দৈত্যকন্যা।

প্রত্যাখ্যান করলেন ভূনন্দন। পানপাত্র ছুঁড়ে মারল দৈত্যকন্যা। সহচরীরা এসে তাঁকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল পাতাল-দীঘির জলে।

ডুবে গিয়েও হাঁক-পাঁক করে ভেসে উঠেছিলেন ভূনন্দন।

কী দেখেছিলেন?

ভাসছেন শারিকাকুট তীর্থের বিতস্তায়।

বুঝলেন, জটাজুটধারী সন্ন্যাসী পই পই করে কেন বলেছিলেন দৈত্যকন্যারা যে-যা বলবে, তাই শুনবে।

না শোনার পরিণাম এই!

এদিকে রাশি রাশি ছেঁকে ধরেছে তাঁকে। তারা ছুটে এসেছে সুগন্ধ পেয়ে। কারণ, সুগন্ধ বেরচ্ছে চোখেমুখে লেগে থাকা সেই পচাগলা মড়া থেকে তৈরি মদ থেকে!

আসলে তা সুগন্ধী আসব! ভ্রান্তি ঘটিয়েছে দৈত্যকন্যা, চক্ষুবিভ্রম!

ভোমরার দংশন যখন আর সইতে পারছেন না ভূনন্দন, ঠিক তখনই পরিত্রাণ এল দৈব সহায় হওয়ায়। এক সন্ন্যাসী যাচ্ছিলেন নদীর পাড় দিয়ে। তিনি সব দেখলেন শুনলেন। বিধান দিলেন, নদীর পাড়ে বসেই একটানা বারো বছর মন্ত্র জপ করে যেতে হবে হরিণের চামড়া দিয়ে মুখ ঢেকে, তাহলে ভোমরা আর হুল ফোটাতে পারবে না। কারণ, এই সুগন্ধ তো গা ফুঁড়ে বেরোচ্ছে। দিব্যগন্ধের অধিকারী হয়েছে ভূনন্দন।

এই বলে, মন্ত্র দিলেন সেই সন্ন্যাসী, সেই সঙ্গে একটা হরিণের চামড়া।

একটানা বারো বছর মন্ত্র জপ করতে হয়েছিল ভূনন্দকে। হরিণের চামড়ায় মুখ ঢেকে। সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। দৈত্যকন্যা কুমুদিনীর রাগ পড়ে গেছিল। ভূনন্দনের গলায় মালা পরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল পাতালে, সুখ দিয়েছিল দিবানিশি।

কাহিনি শেষ করে বন্ধু মুখরক বললে শ্রীদর্শনকে, ধৈর্য, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা—এই তিন হল মহাশক্তি। ভেঙে পড়ছ কেন?

শ্রীদর্শন বললে, সব বুঝলাম। কিন্তু লোকের কাছে যে মুখ দেখাতে পারছি না। আজ রাতেই দেশত্যাগ করব।

মুখরক বললে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

গভীর রাতে দুই বন্ধু বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে কিছুদূর যেতে না যেতেই দৈব সহায় হল শ্রীদর্শনের, আশ্চর্যজনক ভাবে।

ঠিক সেই সময়ে আকাশ পথে অদৃশ্যরূপে উড়ে যাচ্ছিল তার মা আর বাবা, যক্ষিনী সৌদামিনী আর যক্ষ অট্টহাস। ছেলেকে দেখেই তার দুরবস্থার কারণ জেনে ফেলেছিল যক্ষ-ক্ষমতায়। অদৃশ্য অবস্থাতেই মা সৌদামিনী বলেছিল ছেলের মাথার ওপর ভাসমান থেকে, আমি তোমার মা বলছি। বাড়ি ফিরে যাও। মেঝে খুঁড়লেই পাবে প্রচুর গয়না, আমার গয়না। তুলে নিয়ে যাও মালব দেশে। সেখানকার রাজা শ্রীসেন তোমার মতো ভুগেছিলেন পাশাখেলার নেশায় পড়ে। এখন একটা মঠ বানিয়ে দিয়েছেন পাশা-জুয়াড়িদের মঙ্গলের জন্যে। সেখানেই থাকবে।

বর্তে গেল শ্রীদর্শন। বন্ধুকে নিয়ে ফিরে এল বাড়িতে। মেঝে খুঁড়ে পেল রাশি রাশি দামি দামি যক্ষিনী-গয়না। সব নিয়ে বন্ধুসহ রওনা হল মালব দেশের দিকে। সারা রাত, তার পরের সারা দিন হেঁটে সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছোল শস্যশ্যামলা একটা গ্রামে। পুকুর পারে বসল জিরোতে।

অমনি জল থেকে উঠে এল এক কালো রূপসী। যেন স্বয়ং রতি, গায়ের রঙটা শুধু মিশমিশে। গলা পর্যন্ত গা ডুবিয়ে বসেছিল এতক্ষণ।

এক দর্শনেই প্রেমে পড়ে গেছিল শ্রীদর্শন। কালো মেয়েও ভালোবেসে ফেলেছিল শ্রীদর্শনকে। শুধিয়েছিল, আসা হচ্ছে কোথা থেকে?

মুখরক মুখর হয়েছিল তৎক্ষণাৎ, তুমিই বা কে? এত কৌতুহলই বা কেন?

কালো মেয়ে বললে, সুঘোষ গ্রামের মেয়ে আমি। আমার নাম পদ্মিষ্ঠা। আমার বাবা বেদপণ্ডিত। তাঁর নাম পদ্মগর্ভ। আমার মায়ের নাম শশিকলা আমরা ব্রাহ্মণ। আমার দাদার নাম মুখরক। পাশাখেলার নেশায় মেতেছিল। বদবন্ধুদের পাল্লায় পড়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, কোথায় কে জানে। দাদার জন্যে কেঁদে কেঁদে মা মারা গেল। বাবা গ্রাম ছেড়ে গেলেন আমাকে নিয়ে। ছেলেকে খুঁজতে খুঁজতে এলেন এই গ্রামে। কিন্তু এই গ্রামে থাকে নামী চোর বসুভূতি। সে ব্রাহ্মণ, কিন্তু চোর। বড়ো দল, অনেক চোর পোষে। মানুষ খুন করে চোখের পাতা না কাঁপিয়ে। আমার বাবা প্রাণ দিল তার হাতে। বাবার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে বসুভূতি আমাকে আটকে রাখল তার বাড়িতে, তার চোর ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে বলে। আমার ভাগ্য এখনও পর্যন্ত ভালো, কারণ, সেই চোর ছেলে গেছে গ্রামের বাইরে অন্য জায়গায় চুরিডাকাতি করতে। তার নাম সুভূতি। আমার কপালে যা লেখা আছে, তা ঘটবে। কিন্তু তোমরা মরবে। পালাও, এখুনি।

মুখরক কথা শুনছিল আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওই অন্ধকারেই দেখছিল কালো মেয়েটিকে। চুলচেরা পর্যবেক্ষণ। প্রতিটি অঙ্গবৈশিষ্ট্য যেন যাচাই করে নিচ্ছে।

এখন বললে সহর্ষে, পদ্ম, আমিই তোর সেই পলাতক দাদা, মুখরক!

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিল পদ্মিষ্ঠা।

প্রখরবদ্ধি শ্রীদর্শন বললে, এখন কি কান্নাকাটির সময়? নিজেদের বাঁচাতে হবে, টাকাপয়সা যায় যাক।

বলে, থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে শুয়ে পড়ল পুকুর পাড়ে। অনেকদিন সে খায়নি। শরীর কাহিল ছিলই, এখন প্রকৃতই মুমূর্ষু।

বন্ধুর অবস্থা দেখে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিল মুখরক। পদ্মিষ্ঠা সটান চলে গেছিল চোর-অধিপতির কাছে।

বলেছিল, দুটো লোক এসেছে পুকুর পাড়ে। একজন মরতে চলেছে। আর একজন তার সেবা করছে।

চোরেদের রাজা তক্ষুনি পাঠাল একজন স্যাঙাতকে। সে এসে দেখলে, সত্যিই একজন মরতে চলেছে। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই গড় গড় করে বলে গেল মুখরক, আমার এই বন্ধুটি জাতে ব্রাহ্মণ। তীর্থ দেখতে বেরিয়েছিলাম দুজনে। এখন ও রোগে পড়েছে। মৃত্যু আসন্ন। ঘাসের চিতা তৈরি করতে বলেছে। একজন পণ্ডিত বামুনকে ডেকে আনতে বলেছে। আজ রাত কাটবে না মনে হচ্ছে। ব্রাহ্মণকে দান করবে সর্বস্ব। কিন্তু এই অবস্থায় একে ছেড়ে আমি ব্রাহ্মণ সন্ধানে যেতে পারছি না।

চোর, অনুচর বড়ো চোরকে গিয়ে বললে, চলুন, ওর যা কিছু আছে, লুটে নেওয়া যাক। তারপর মরে গেলে পুড়িয়ে দেব।

বড় চোর বললে, ধুস! খুন না করে লুঠ করা আমার নীতি নয়।

ছোটো চোর বললে, খামোকা বামুন মেরে পাপ করবেন কেন? ও তো এমনিতেই অক্কা পাবে।

বড়ো চোর বসুভূতি ভাবল, তা বটে। এল শ্রীদর্শনের কাছে। অমনি দম আটকে যাওয়ার ভান করে গেল শ্রীদর্শন। ভাঙা ভাঙা কথা বলতে বলতে মায়ের গয়নার একটু বের করে দিল খুনে চোর বসুভূতিকে। খুশি হয়ে স্যাঙাত সমেত স্বস্থানে প্রস্থান করল বসুভূতি। নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ, কাজ তো হাসিল হয়েছে। দামি দামি গয়না হাতে এসেছে। এইবার মরুক বেটা ভোরের দিকে। তখন পোড়ানো যাবে।

সেই ফাঁকে পালিয়ে এল পদ্মিষ্ঠা। দাদা মুখরক আর প্রিয়তম শ্রীদর্শনকে নিয়ে রওনা হলো মালব দেশের দিকে, যেখানে আছে জুয়ারিদের মঠ, আছেন রাজা শ্রীসেন, আছে নিরাপত্তা।

এতটা পথ একটানা হেঁটে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতে ঢুকল এক বামন-বুড়ির বাড়িতে, মালব নগরে পৌঁছেই।

বামন বুড়ি মানুষটা ভালো। বিধবা। তাঁর স্বামী রাজকাজ করতেন। মারা গেছেন। মাইনের চার ভাগের এক ভাগ এখনও পায় ব্রাহ্মণী, কারণ তিনি নিঃসন্তান।

আত্মপরিচয় দেওয়ার পর দুঃখ করে বললে বুড়ি ব্রাহ্মণী, রাজা শশী এখন যক্ষ্মারোগে পড়েছেন। সব চিকিৎসা ব্যর্থ হয়েছে। তিনি মরতে চলেছেন। কিন্তু একজন তান্ত্রিক রাজাকে বাঁচিয়ে দিতে পারে বেতাল পুজো করে। এই সাধনায় দরকার এমন এক পুরুষের যার বুকের পাটা আছে। ঢেঁড়া পিটিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও কেউ এগিয়ে আসেনি। তখন রাজা বলেছেন, জুয়ারিদের মঠে খোঁজ নাও। জুয়ো যারা খেলে, তাদের বুকের পাটা থাকে। মঠের প্রধান কর্মচারীকে বলে রাখা হয়েছে, এই রকম দুঃসাহসী কাউকে পাওয়া গেলেই যেন রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তোমরা জুয়োরি ছিলে এক সময়ে, দুর্ধর্ষ বলেই মনে হচ্ছে, চলো রাজার কাছে। রাজা বাঁচবেন, তোমরা বাঁচবে, আমি বাঁচব। অর্থকষ্ট আর সয় না।

শ্রীদর্শন চিরকাল অকুতোভয়। একের নম্বরের ডানপিটে। ভূতসিদ্ধির মন্ত্র যে জানে, দেখাই যাক না তার চেলা হয়ে বেতাল আনতে পারে কিনা।

বুড়ির সঙ্গে গেল মঠে। সঙ্গে কৃপাণ। সেখান থেকে মুমূর্ষু রাজার কাছে। শ্রীদর্শনের বীরোচিত আকৃতি আর বীররসক্ষরিত কথাবার্তা শুনেই রাজার অর্ধেক রোগ যেন সেরে গেল। তিনি তা মুখেও স্বীকার ররলেন। তারপর দেখা করল তান্ত্রিকের সঙ্গে। ঠিক হল, সেই রাতই কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত, বেতাল আহ্বানের উপযুক্ত সময়। শ্মশানে যেন হাজির থাকে শ্রীদর্শন।

রাত নামতেই শ্রীদর্শন চলে গেল শ্মশানে কোমরে কৃপাণ বেঁধে।

ভীষণ সেই শ্মশানের চারদিকে পোড়া আর আধপোড়া মড়া নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করছে শেয়াল আর অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীরা। তান্ত্রিক বসেছিল মধ্যিখানে। তার সারা গায়ে শ্মশানের চিতার ছাই, গলায় ঝুলছে মানুষের

মাথার চুল দিয়ে তৈরি পৈতে, পরনে নীল কাপড়, ভূতের ছোঁয়া লাগা কাপড় দিয়ে তৈরি পাগড়ি মাথায়।

শ্রীদর্শনকে বললে তান্ত্রিক, যাও পশ্চিম দিকে এক ক্রোশ। দেখবে একটা শিমূল গাছ। চিতার আগুনে পুড়ে গেছে পাতা। ডালে ঝুলছে একটা মড়া। নিয়ে এস আমার কাছে।

ভয়ংকর ঘটনাক্রমের সূত্রপাত তখন থেকেই।

শিমূল গাছের কাছে পৌঁছোনোর আগেই ডাল থেকে মড়া নামিয়ে নিয়ে পালাচ্ছিল একজন। শ্রীদর্শন মড়া ধরে টান মারতেই মড়ার গলা থেকে বেরিয়ে এল রক্তজল করা হুহুংকার!

মড়াচোরের হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ!

নির্বিকার শ্রীদর্শন মড়া তুলে নিল কাঁধে। কয়েক পা যেতে না যেতেই মরে যাওয়া মড়াচোর দানোয় পাওয়া অবস্থায় তিড়িং করে দাঁড়িয়ে উঠে দৌড়ে এল শ্রীদর্শনের দিকে। মড়া নিয়ে তাকে যেতে দেবে না। শ্রীদর্শনও মড়া ছাড়বে না।

সমাধান বাতলে দিল মড়া নিজেই। বললে বিকট স্বরে, যে আমাকে খেতে দেবে, আমি তার সঙ্গে যাব।

যে সদ্য জ্যান্ত মড়া হয়েছে সে বললে, আমি এখুনি মরে বেঁচেছি, খাবার পাব কোথায়?

শ্রীদর্শন বললে, তবে ফের মরো, বলেই, কৃপাণের কোপ মারতেই 'বাপরে' বলে জ্যান্ত মড়া ফের মড়া হয়ে গেল।

কাঁধের মরা কিন্তু নাছোড়বান্দা, খাবার চাই, খাবার দাও, বড় খিদে, বড় খিদে!

শ্রীদর্শন নিজের গায়ের মাংস কেটে পুরে দিল বেতাল মড়ার মুখে।

খুশি হল বেতাল। বললে, তোমার কাটা ঘা সেরে যাক। ফেরে মাংস গজাক।

আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে তাই হলো। বেতালের হুকুম কী চাট্টিখানি কথা? শ্রীদর্শনের ক্ষত অদৃশ্য হয়ে গেল নিমেষ মধ্যে।

ফের বললে বেতাল, ওহে শ্রীদর্শন, তুমি মানুষটা ভালো, কিন্তু ওই তান্ত্রিকটা মহা পাজি। ও মরবে।

বেতাল ঘাড়ে তান্ত্রিকের কাছে পৌঁছে শ্রীদর্শন দেখল, মানুষের হাড় গুঁড়িয়ে একটা মণ্ডল এঁকেছে তান্ত্রিক, চার কোণে রেখেছে চারটে কলসি, মানুষের রক্ত দিয়ে ভরা, মানুষের চর্বি দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে মণ্ডল ঘিরে।

মড়া এসে পৌঁছোতেই তাতে মাখানো হল লাল চন্দন, গলায় পরানো হল লাল জবার মালা, চিৎ করে মড়াকে শুইয়ে তান্ত্রিক গ্যাঁট হয়ে বসল তার বুকের ওপর, একখানা হাড় নিয়ে হোম শুরু করল মড়ার মুখের কাছে।

সঙ্গে সঙ্গে লকলকে অগ্নিশিখা বেরিয়ে এল মড়ার মুখ থেকে। লম্ফ দিয়ে তান্ত্রিক মড়ার বুক থেকে নেমে দাঁড়াতেই হাত থেকে খসে পড়ল হোম করার হাড়, ভয়ের চোটে।

এবার সটান দাঁড়িয়ে উঠল মড়ারূপী বেতাল। কোঁৎ করে গিলে ফেলল তান্ত্রিককে, এক্কেবারে আস্ত, বিরাট হাঁ করে।

শ্রীদর্শন চটে গেছিল। কৃপাণ উঁচিয়ে বিভীষণ মড়ার দিকে তেড়ে যেতেই অট্ট অট্ট হেসে বেতাল বললে, ক্ষান্ত হও। খুশি হয়েছি তোমার ওপর। এই নাও আমার মুখের সর্ষে। রাজার মাথায় কিছু বেঁধে দেবে, বাকিটা হাতের মুঠোয় রাখতে বলবে। যক্ষ্মা সেরে যাবে।

শ্রীদর্শন বললে, কিন্তু এই তান্ত্রিককে না নিয়ে গেলে রাজা তো আমাকেই সন্দেহ করবেন। ভাববেন, আমিই ওকে খতম করেছি। ঘাতক তো তুমি। প্রমাণ কী দেব?

বেতাল বললে, রাজাকে শ্মশানে নিয়ে আসবে, আমার পেট চিরবে, দেখবে, তান্ত্রিক রয়েছে সেখানে। এখন চলি।

বলেই, বিকট শব্দে মড়ার মুখ দিয়ে বেরিয়ে বেতাল চলে গেল বেতাল-লোকে।

রাতটা শ্মশানে কাটিয়ে শ্রীদর্শন সকালে গেল রাজার কাছে। মন্ত্রীবর্গসহ তাঁকে শ্মশানে এনে মড়ার পেট চিরে দেখাল, আস্ত তান্ত্রিক গুটিয়ে এতটুকু হয়ে রয়েছে পাকস্থলীর খোলে!

এবার সটান দাঁড়িয়ে উঠল মড়ারূপী বেতাল। কোঁৎ করে গিলে ফেলল তান্ত্রিককে ...

তারপর, বেতালের দেওয়া সর্ষে প্রয়োগ করে সারিয়ে দিল রাজার দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগ। নিঃসন্তান রাজা শ্রীদর্শনকে ছেলে হিসেবে গ্রহণ করলেন। যুবরাজ করে দিলেন। বিয়ে দিলেন পদ্মিষ্ঠার সঙ্গে। শ্যালক-বন্ধু মুখরককে নিয়ে সুখে রইল মহাডানপিটে শ্রীদর্শন।

এরপর শ্রীদর্শনের জীবনে এল দ্বিতীয় বউ। এই সেই অত্যাশ্চর্য কাহিনি।

কাহিনি শুনিয়ে গেল বিচিত্ররথ।

উপেন্দ্রশক্তি নামে সওদাগর সমুদ্রসৈকতে কুড়িয়ে পেয়েছিল একটা গণপতি মূর্তি। দামি দামি রত্ন দিয়ে তৈরি মূর্তি। দেখলে চোখে ধাঁধা লাগে।

মুগ্ধ উপেন্দ্রশক্তি সেই মূর্তি উপহার দিয়ে গেল শ্রীদর্শনকে।

শ্রীদর্শন মস্ত মন্দির বানিয়ে নিত্য গণেশ পুজোর ব্যবস্থা করল মহাসমারোহে।

খুশি হলেন গণেশদেবতা। তিনি অদ্ভুতকর্মা। বিঘ্ননাশক। ইচ্ছাপূরক। অনুচরদের ডেকে বললেন, আমার ইচ্ছায় মহাপুণ্যবান এই শ্রীদর্শন যথাসময়ে হবে পৃথিবীর সম্রাট। এখন ওর আর একটা বউ জুটিয়ে দেওয়া যাক। কাজটা করতে হবে তোমাদের।

কী করতে হবে, তা বুঝিয়ে দিলেন গণেশ দেবতা। পশ্চিম সমুদ্রে একটা দ্বীপ আছে। হংস দ্বীপ। সেখানকার রাজার নাম অনঙ্গোদয়। তাঁর মেয়ে অনঙ্গমঞ্জরী অতিশয় গণেশভক্ত। সে চায় এমন স্বামী যে হবে সম্রাট, রাজাদের রাজা। এমন মানুষ তো একজনই আছে ধরাতলে, শ্রীদর্শন। সুতরাং, রাত্রি নিশীথে শ্রীদর্শনকে ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিতে হবে অনঙ্গমঞ্জরীর পাশে। আলাপপরিচয় হয়ে গেলেই আবার ফিরিয়ে আনবে শ্রীদর্শনকে বধূ পদ্মিষ্ঠারপাশে।

যেহেতু, শ্রীদর্শন আর অনঙ্গমঞ্জরী দু-জনেই গণেশভক্ত, সুতরাং এইভাবেই দুজনকে একইসাথে সুখী করে তোলা যাবে। সেইসঙ্গে উপকার করতে হবে সওদাগর উপেন্দ্রশক্তির। মূল্যবান গণেশ বিগ্রহ সে তো নিজের কাছেই রাখলে পারত। কুড়িয়ে পাওয়া মূর্তি। কিন্তু সে প্রকৃতই নির্লোভ। সুতরাং তার ঐশ্বর্য বহুতর বৃদ্ধি পাবে।

গণেশের অনুচররা উৎফুল্ল হয়ে সেই রাতেই ঘুমন্ত শ্রীদর্শনকে কালো বউ পদ্মিষ্ঠার পাশ থেকে তুলে নিয়ে, ঘুম না ভাঙিয়ে, রেখে দিল সাগরঘেরা হংসদ্বীপে, ঘুমন্ত রাজকন্যা অনঙ্গমঞ্জরীর পাশে।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলেছিল শ্রীদর্শন। হতভম্ব হয়ে গেছিল পাশে ঘুমন্ত ধবধবে ফর্সা একটি মেয়েকে দেখে। কোথায় গেল কালো বউ পদ্মিষ্ঠা?

অনঙ্গমঞ্জরীরও ঘুম ভেঙেছিল তৎক্ষণাৎ। অবাক হয়ে গেছিল পাশের দিব্যদেহী পুরুষকে দেখে। অন্তঃপুরে এই পুরুষ এত রাতে এল কী করে? স্বপ্ন নাকি?

স্বপ্ন যে নয়, তা পরিষ্কার হয়ে গেল আলাপ জমে উঠতেই। আলাপ থেকে প্রেমালাপ। তারপর, গয়না বিনিময়। অনঙ্গমঞ্জরী ভালোবেসে নিজের মেয়েলি গয়না পরিয়ে দিল শ্রীদর্শনকে। শ্রীদর্শন আদর করে নিজের পুরুষালি আভরণ পরিয়ে দিল অনঙ্গমঞ্জরীকে।

রাজ্যের ঘুম চোখে চেপে বসল তৎক্ষণাৎ। গণেশ অনুচরদের ইচ্ছায়। ঘুমন্ত অবস্থায় সাঁ করে শ্রীদর্শনকে এনে ফেলা হল পদ্মিষ্ঠার পাশে। এমন ভেলকি বিঘ্ননাশকের দক্ষ অনুচররাই দেখাতে পারে।

নিজের পালঙ্কে শুতে না শুতেই মায়া-ঘুম ছুটে গেছিল শ্রীদর্শনের। স্বপ্নে দেখছিল কি এতক্ষণ? কিন্তু না, স্বপ্ন নয়। গায়ে রয়েছে মেয়েলি গয়না। পরিয়ে দিয়েছিল অনঙ্গমঞ্জরী।

ঘুম ভেঙে গেল পদ্মিষ্ঠারও। সব শুনল। রাত ভোর হতেই অনঙ্গমঞ্জরীর নাম খোদাই করা গয়না দেখাল রাজা শ্রীসেনকে।

কিন্তু কোথায় সেই হংসদ্বীপ? ঢেঁড়া পিটেও সন্ধান জানা গেল না।

শ্রীদর্শনের অবস্থা দাঁড়াল শোচনীয়। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে দিবারাত্র চেয়ে রইল অনঙ্গমঞ্জরীর গয়নার দিকে। ঘরে বিয়ে করা বউ, তা সত্ত্বেও কামজ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে রইল আর এক কামিনীকে দেখেই। কাম যে

প্রথম রিপু। বিষম শক্তি ধরে।

হংস দ্বীপেও একই ভোগান্তি ভুগে চলেছে রাজকন্যা অনঙ্গমঞ্জরীও। ভোরে ঘুম ভেঙেছে। রাতের ঘটনা মনে পড়েছে। গায়ের পুরুষ আভরণ তো তার প্রমাণ। তবে তো যা ঘটেছে, তা মিথ্যে নয়। কুমারী মেয়ে পরপুরুষের সঙ্গে অলঙ্কার বিনিময় করেছে, এক শয্যায় শুয়ে আদর খেয়েছে এবং দিয়েছে, এ কথা মুখ ফুটে কাউকে বলা যায়? এদিকে বুক যে ফেটে যাচ্ছে!

কিন্তু বলতেই হল বাবাকে। হঠাৎ ঘরে ঢুকে মেয়ের গায়ে যে পুরুষ অলঙ্কার তিনি দেখে ফেলেছিলেন!

সব শুনে থ হয়ে গেলেন রাজা। এ রকম অত্যাশ্চর্য ইন্দ্রজাল কাহিনি তিনি কখনও শোনেননি।

তাই গেলেন হংসদ্বীপের মহাযোগী ব্রহ্মসোমের কাছে।

তিনি ধ্যানে বসলেন। সব জেনে গেলেন।

বললেন রাজাকে, সবই গণেশ দেবতার কেরামতি। তিনি যে ইচ্ছাপূরণের দেবতা। মালব দেশ থেকে শ্রীদর্শনকে আনিয়ে ঘটকগিরি করলেন। পাত্রপাত্রী দুজনকেই তিনি স্নেহ করেন। দুজনের বিয়ে হবেই। আপনার জামাই পৃথিবীর সম্রাট হবে।

ফাঁপড়ে পড়লেন পাত্রীর পিতা। কোথায় হংসদ্বীপ, আর কোথায় মালব দেশ। যোগাযোগটা হবে কী করে?

সিদ্ধযোগী ব্রহ্মসোমের অসাধ্য কিছু নেই। সেই মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, পৌঁছে গেলেন শ্রীসেনের রাজধানীতে। নতুন গণেশ মন্দিরে ঢুকে, গণেশ দেবতার সামনে বসে শুরু করলেন গণপতি স্তব।

ঠিক তখনই মন্দিরে ঢুকেছিল সওদাগর উপেন্দ্রশক্তির বদ্ধপাগল ছেলে মহেন্দ্রশক্তি। এমনই পাগল পরনে সুতো পর্যন্ত রাখে না।

মন্দিরে ঢুকেই সে তেড়ে গেছিল মহাযোগীর দিকে।

নিমেষে ব্রহ্মসোম বুঝে গেলেন মহেন্দ্রশক্তির মস্তিষ্কের অবস্থা। মনে মনে মন্ত্র পড়লেন। টেনে এক চড় মারলেন।

সুস্থ হয়ে গেল মহেন্দ্রশক্তি। টনটনে জ্ঞান ফিরে আসতেই দেখল নিজের নিরাবরণ অবস্থা। লজ্জা পেয়ে দুহাতে লজ্জাস্থান আড়াল করে দৌড়ে গেল বাবার কাছে। বাবা সব শুনলেন। ছেলেকে স্নান করিয়ে, খাইয়ে, জামাকাপড় পরিয়ে নিয়ে এলেন গণেশ মন্দিরে। ব্রহ্মসোমকে অর্থ দিতে চাইলেন, তিনি এক কপর্দকও গ্রহণ করলেন না।

এর পরেই ছুটে এলেন রাজা শ্রীসেন নিজে। বললেন ব্রহ্মসোমকে, সওদাগরের পাগল ছেলেকে ভালো করে দিলেন। এবার সুস্থ করুন আমার ছেলে শ্রীদর্শনকে। এ-ও যে পাগল হতে বসেছে।

হাসলেন ব্রহ্মসোম। বললেন, আপনার ছেলে চোর। হংসদ্বীপের রাজকন্যার গয়না চুরি করেছে, মন চুরি করেছে। রাতারাতি। সুতরাং চোরের কোনও উপকার করব না।

হতভম্ব হয়ে গেলেন শ্রীসেন। এত খবর জানেন এই যোগীপুরুষ?

তাই ধরে বসলেন ব্রহ্মসোমকে। শ্রীদর্শনের একটা হিল্লে করতেই হবে।

করে দিলেন ব্রহ্মসোম। শ্রীদর্শনকে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছোলেন হংসদ্বীপে। যথাসময়ে বিয়ে দিলেন অনঙ্গমঞ্জুরীর সঙ্গে। বর-বউকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন শ্রীসেনের কাছে।

দুই বউ নিয়ে পরমানন্দে রইল শ্রীদর্শন। যথাসময়ে হল ভুবনজয়ী। দুই বউ উপহার দিল দুটি পুত্ররত্ন।

পাদ্মিষ্ঠা দিল পদ্মসেনকে, অনঙ্গমঞ্জরী দিল অনঙ্গসেনকে।

সুখের সাগরে ভেসে রইল শ্রীদর্শন। গোটা পৃথিবী পায়ের তলায়, দুপাশে দুই বউ, কোল আলো করা দুই ছেলে।

কপাল-লিখন শ্রীদর্শনকে এনে দিল সব কিছু।

তারপর একদিন...

আচমকা শুনল এক ব্রাহ্মণের কান্নাকাটি, ঘরের বাইরে, বারান্দায়। ঘরে বউ-ছেলে নিয়ে বসে সেই কান্না স্পষ্ট শুনতে পেল শ্রীদর্শন!

ডাকিয়ে আনল ঘরের মধ্যে।

কাঁদতে কাঁদতে ব্রাহ্মণ বলে গেল, মহারাজ, অট্টহাস হাসি হাসতে হাসতে অট্টহাস কালমেঘ গ্রাস করেছে আমার অগ্নিকে, যে-অগ্নির কাছে দ্বীপ্ত শিখা, জ্যোতি আর ধূম-এর লেখা।

কথাগুলো বলেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল ব্রাহ্মণ।

তৎক্ষণাৎ ঘটে গেল আর এক অভাবনীয় ঘটনা। অশ্রু নেমে এল পদ্মিষ্ঠা আর অনঙ্গমঞ্জরীর গাল বেয়ে। দুজনেরই দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেল পরমুহূর্তেই।

হতচকিত শ্রীদর্শন আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

শ্রাদ্ধকার্য শেষ করে বছর খানেক রইল রাজবাড়িতে, কেঁদে গেল দিবানিশি। তারপর, দুই ছেলেকে রাজত্ব দুভাগ করে দিয়ে চলে গেল বনে।

একদিন এক বটগাছের তলায় আসতেই গাছ থেকে টপ করে নেমে এল দুই পরমাসুন্দরী।

বললে সন্ন্যাসী-রাজা শ্রীদর্শনকে, এই নিন, ফল এনেছি আপনার জন্যে।

আশ্চর্য হলেন শ্রীদর্শন। নিবিড় অরণ্যে এমন দিব্য রমণীরা এল কোত্থেকে? জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কে?

দুজনেই বললে একসঙ্গে, আসুন আমাদের সঙ্গে।

শ্রীদর্শন বললে, চলো।

মেয়েদুটি শ্রীদর্শনকে নিয়ে গেল বটগাছেরই অপর দিকে। সেদিকে রয়েছে একটা মস্ত কোটর। কোটরের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা সোনায় গড়া প্রাসাদ।

প্রাসাদে ঢুকে ফলাহার করে একটু বিশ্রাম নিয়েছিল অবাক শ্রীদর্শন। এতক্ষণ মিটিমিটি হেসেই চলেছিল দুই সুন্দরী।

এবার বললে, শুনুন আমাদের কাহিনী। প্রতিষ্ঠানপুর নামে মস্ত নগর ছিল একসময়ে। ব্রাহ্মণ কমলগর্ভ থাকতেন সেখানে। তাঁর দুই বউ। পথ্যা আর বলা। আচমকা কালজ্বরে কাবু হলেন তিনজনেই। রোগ যখন সারবে না, তখন তিনজনেই একই সঙ্গে অগ্নিপ্রবেশ করে মরণকে বরণ করলেন। মরবার আগে প্রার্থনা জানিয়ে গেলেন অগ্নিদেবতাকে, আমরা যেন জন্ম জন্ম ধরে এইভাবে স্বামী-স্ত্রী হয়ে থাকি।

অগ্নিদেব তাদের মরণকালীন প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

পরের জন্মে ব্রাহ্মণ কমলগর্ভ জন্মালেন যক্ষ হয়ে। যক্ষ প্রদীপ্তাক্ষর ছোটো ছেলে হলেন, নাম হল, দীপ্তশিখ।

প্রদীপ্তাক্ষর বড়ো ছেলের নাম অট্টহাস।

যক্ষরাজ ধূমকেতুর দুই মেয়ে হয়ে জন্মালেন কমলগর্ভের দুই বউ, জ্যোতিলেখা আর ধূমলেখা নাম নিয়ে, আগের জন্মে যাদের নাম ছিল পথ্যা আর বলা।

দীপ্তশিখ যক্ষ ফের জন্ম নিল মানুষ হয়ে, তখন তার নাম হল শ্রীদর্শন।

জ্যোতিলেখা আর ধূমলেখাও মানুষ হয়ে জন্মে বিয়ে করল তাকে, পাপিষ্ঠা আর অনঙ্গমঞ্জুরী নামে।

অগ্নিদেবের কাছে মরণকালীন প্রার্থনা ফলে গেল এইভাবে।

যক্ষ অট্টহাস ব্রাহ্মণের রূপ ধরে এসে কেঁদেকেটে আগের কথা মনে করিয়ে দিতেই তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করল পদ্মিষ্ঠা আর অনঙ্গমঞ্জরী, আগের জন্মে যারা ছিল জ্যোতিলেখা আর ধূমলেখা, তারও আগের জন্মে, পথ্যা আর বলা।

কাহিনি শেষ করে মিটিমিটি হেসে বললে দুই বনবালা, সোনার প্রাসাদে যাদের নিবাস, আমরাই সেই যক্ষকন্যা, আপনিই সেই দীপ্তশিখ যক্ষ, আমরা আপনার বউ।

তৎক্ষণাৎ শ্রীদর্শনের মনে পড়ে গেল পূর্বজন্ম কাহিনি। সত্যিই তো, আগের জন্মে সে ছিল দীপ্তশিখ যক্ষ!

দেহত্যাগ করল তৎক্ষণাৎ। ফিরে পেল যক্ষদেহ, যক্ষ দীপ্তশিখ।

সুদীর্ঘ কাহিনিলতা পরম্পরা শেষ করে বিচিত্ররথ বললে মৃগাঙ্কদত্তকে, যক্ষ দীপ্তশিখ দুই বউদের পাশে বসিয়ে বললেন, এরাই আমার সেই যক্ষিনী বউ, জ্যোতিলেখা আর ধূমলেখা। দেবগণে জন্ম আমাদের। তবুও জন্ম ধরে সুখদুঃখ ভোগ করলাম। তুমি মানুষ। সুখদুঃখ তোমার কপালে তো থাকবেই। বন্ধু মৃগাঙ্কদত্তকেও ফিরে পাবে। এখন থাকো এখানে। এই কাজটা করবার জন্যেই আমরা তিনজন রয়েছি এখানে। তোমাদের মিলন ঘটিয়ে দিয়ে চলে যাবো কৈলাসে, যক্ষলোকে।

তারপর একদিন আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে এনে শুইয়ে দিয়ে গেলেন আপনার পাশে, ওঁরা আগেই জেনে গেছিলেন আপনি এসেছেন এই অরণ্যে।

বন্ধুদের নিয়ে পরের দিন সকালেই উজ্জয়িনী অভিমুখে রওনা দিলেন মৃগাঙ্কদত্ত, শশাঙ্কবতীকে লাভ করার সঙ্কল্প নিয়ে।

৭৪. সাত অক্ষরের বিদ্যা

পাঁচবন্ধু ফিরে এল, অনেক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর। লোমহর্ষক চিত্তাকর্ষক সেইসব কাহিনি নিয়ে জমিয়ে গল্প শেষ হল অনেক রাতে। পরের দিন সকালে মৃগাঙ্কদত্ত সবান্ধব রওনা হলেন শশাঙ্কবতীকে অঙ্কশায়িনী করবার অভিলাষ নিয়ে, দুরূহ কর্ম নিঃসন্দেহে, এত বাধা পড়ছে সেই কারণেই, কিন্তু বিঘ্ন, তত মনোবল, বিঘ্ন সৃষ্টি করেন যিনি, বিঘ্ননাশ করেন তিনি, ভগবান গণপতি, যাঁর শুঁড়ের আন্দোলনে নক্ষত্র ছিটকে যায়, যাঁর নৃত্যের তালে তালে ব্রহ্মাণ্ড কেঁপে কেঁপে উঠে কখনও হয় সংকুচিত, কখনও প্রসারিত।

জয় হোক গণপতির!

সিদ্ধেশ্বরের নাম স্মরণ করেই বধূহরণ এবং বধূবরণের মনস্কামনায় অটল মৃগাঙ্কদত্ত রওনা হয়েছিলেন বীরদর্পে। এমন সময়ে আশ্চর্য একটা ব্যাপার দেখে অচল হল পা!

বিশাল একটা হাতি দীঘির জলে গা ডুবিয়ে দিব্বি মানুষের গলায় কথা বলে যাচ্ছে একটা মানুষের সঙ্গে। সেইসঙ্গে কুলোর মতো কান নেড়ে বাতাস করছে মানুষটাকে, শুঁড়ে করে জল ছিটিয়ে নাইয়ে দিচ্ছে!

আজব ব্যাপার তো। বন্ধুদের নিয়ে পুকুরপাড়ে বসেছিলেন মৃগাঙ্কদত্ত জলপিপাসা মেটানোর জন্যে। তাজ্জব কাণ্ড দেখে থ হয়ে গেলেন।

মানুষকে সান্তনা দিয়ে যাচ্ছে প্রকাণ্ড একটা হাতি। কীমাশ্চর্যম!

মানুষটা কিন্তু ক্ষীণ কলেবর তো নয়, বিলক্ষণ শক্তিমান পুরুষ। কিন্তু দৃষ্টিহীন!

গাছের আড়ালে থেকে মানুষ আর হাতির কথোপকথন শুনে গেলেন মৃগাঙ্কদত্ত।

অন্ধ বলছে, আমি অযোধ্যার রাজা অমরদত্তের ছেলে মৃগাঙ্কদত্তের প্রিয় বন্ধু এবং প্রিয় মন্ত্রী। আমার নাম প্রচণ্ডশক্তি।

এই পর্যন্ত শুনেই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন মৃগাঙ্কদত্ত। প্রচণ্ডশক্তি! তার প্রাণপ্রিয় দশ বন্ধুর একজন! নাগরাজার প্রকোপে পড়ে ধুলোর ঝড়ে উড়ে যাওয়া প্রিয় মিতাদের একজন! কী সর্বনাশ! সে যে এখন চক্ষুহীন! হল কী করে?

উৎকর্ণ হলেন মৃগাঙ্কদত্ত।

হাতি জিজ্ঞেস করল, অন্ধ হলে কি করে?

নাগরাজের শাপে। ধুলোর ঝাপটায়। এখন ঘুরে মরছি এই অরণ্যে, এইখানেই গাছের ফল খেয়ে কাটাচ্ছি দিবস রজনী। কিন্তু আপনি কে? চেহারায় হাতি, কথা বলছেন মানুষের মতো। এমন অবস্থা আপনার হল কী করে?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাতি বললে, একলব্যা নগরের শ্রুতধর রাজার দুই ছেলে ছিল। দুই রানির দুই ছেলে। রাজা মারা গেলে ছোটোভাই সত্যধর বড়োভাই শীলধরকে তাড়িয়ে দেয় রাজ্য থেকে। শীলধর বনে গিয়ে

মহাদেবের তপস্যা করে এই বর চায়, সে যেন গন্ধর্ব হতে পারে, আকাশে যাতায়াতের ক্ষমতা পায়, আর, বদমাস ছোটোভাইকে যমালয়ে পাঠাতে পারে।

মহাদেব সশরীরে তার, সামনে এসে বললেন, ওহে শীলধর, ভজনা যখন করেছ আমাকে, তখন মনস্কামনা পূর্ণ হবেই। তবে, এ জন্মে তো ছোটোভাইকে খতম করতে পারবে না, কেননা, এইমাত্র সে নিজেই অক্কা পেয়েছে। সামনের জন্মে সে হবে রাঢ় দেশের রাজা উগ্রভট-এর ছেলে সমরভট। তুমি জন্মাবে তার বিমাতা পুত্র হয়ে, তোমার নাম হবে ভীমভট। তোমার হাতেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হবে সমরভট, তুমি হবে রাজা। তবে বৎস, একটা দোষ যে করে ফেলেছ, তার সাজা যে পেতে হবে।

সভয়ে বলেছিল শীলধর, কী করলাম?

মহাদেব বললেন, রাগের মাথায় তপস্যা করেছ। পঞ্চরিপুকে বিসর্জন দিয়ে দেবদেবী আরাধনা করতে হয়। তুমি দ্বিতীয় রিপুর আশ্রয়ে ছিলে। সেই অপরাধে তুমি বুনো হাতি হয়ে জন্মাবে সামনের জন্মে, কিন্তু আগের জন্মের সব কথা মনে থাকবে। কথাও বলবে অবিকল মানুষের মতো, তাতে বৃংহিত ধ্বনি থাকবে না। একদিন এক মানুষ, খুবই অসহায় আর দুর্বল মানুষ তোমার অতিথি হবে। তাকে শোনাবে তোমার পরিচয়। কে তুমি, কী ছিলে, কী হয়েছ। অকপটে সব স্বীকার করলেই হাতি থেকে হয়ে যাবে গন্ধর্ব। উপকার হবে সেই অতিথিরও।

মহাদেব মিলিয়ে গেলেন বাতাসে, বর দিয়েই। শীলধরও আত্মহত্যা করল গঙ্গায় ডুবে।

তারপর জন্ম নিল রাজা উগ্রভট-এর ঔরসে, অনেক কাণ্ডকারখানার পর।

উগ্রভট ছিলেন নিঃসন্তান। সুখে ছিলেন মহিষী মনোরমাকে নিয়ে। কিন্তু কাল হল নাচনি লাস্যবতীকে দেখে। অন্তঃপুরে এনে বিয়েও করে ফেললেন।

শুরু হল পুত্রেষ্টি যজ্ঞ পায়েসের প্রথম ভাগ বরাদ্দ ছিল প্রথম পত্নীর জন্যে, শেষভাগ দ্বিতীয় পত্নীর জন্যে। শেষভাগ দ্বিতীয় পত্নীর জন্যে। যে-যার পায়ের খেয়ে নিল চেটেপুটে।

শীলধর এল প্রথম পত্নীর গর্ভে, নাম হল, ভীমভট।

সত্যধর এল দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে, নাম হল, সমরভট।

ভীমভটকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন রাজা নাচনি রানির কথায়, অথচ ভীমভট সেরা ছেলে, তার পায়ের নখের যোগ্যতাও নেই ছোটোভাই সমরভট-এর। নাচনির ছেলে তো, রক্তে দোষ ঢুকে গেছিল।

ভীমভট মায়ের পরামর্শে চলে গেল মামার বাড়ি পাটলিপুত্রে।

রাজা যে অন্যায় করলেন, তা বুঝল রাজহিতৈষীরা। তারা গোপনে যোগাযোগ রেখে গেল ভীমভটের সঙ্গে। অর্থাৎ, ভীমভটের পঞ্চম বাহিনী প্রস্তুত রইল তার জন্ম-রাজ্যে।

ব্রাহ্মণ শঙ্খদত্ত ছিলেন রাজার ক্ষমতাবান মন্ত্রী। তিনি গোপনে ভীমভটের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দিলেন।

এই সময়ে মণিদত্ত নামে এক ভিনদেশি সওদাগর একটা ঘোড়া বেচতে এল নগরে। সুলক্ষণ যুক্ত ঘোড়া। দেখে মনে হয় যেন উচ্চৈঃশ্রবা। শ্বেত অশ্ব।

শঙ্খদত্ত ভীমভটকে দিয়ে ঘোড়া কেনালেন। নিজের কাছে রাখলেন।

খবর পেয়ে সমরভট এসে বললে বণিক মণিদত্তকে এ ঘোড়া আমার চাই।

মণিদত্ত বললে, ঘোড়া বিক্রি হয়ে গেছে।

সমরভট ঘোড়া ছিনিয়ে নিয়ে গেল শঙ্খদত্তের কাছে।

তখন এল ভীমভট। পিটিয়ে আধমরা করে দিল সমরভটকে। শঙ্খদত্ত তাকে একেবারেই মেরে ফেলতে গেছিল, কিন্তু তা হতে দেয়নি উদারমনা ভীমভট। বাবা কষ্ট পাবেন বলে।

মার খেয়ে এবং ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে বাপের কাছে দৌড়েছিল সমরভট।

ভীমভটের মা বেগতিক দেখে তক্ষুণি ছেলেকে পাঠিয়ে দিল মামার বাড়িতে, শঙ্খদত্তের সঙ্গে, নতুন ঘোড়ায় চেপে। শঙ্খদত্ত চাপলেন অন্য ঘোড়ায়।

দুটো ঘোড়াই গভীর রাতে পৌঁছোল এক নলখাগড়ার জঙ্গলে। মানুষের মাথা ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে সেইসব নলখাগড়া। এমন জঙ্গলেই সিংহ থাকে। এখানেও ছিল এক পশুরাজ দম্পত্তি, বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে।

আগে তারা নখ দিয়ে চিরে মেরে ফেলল ঘোড়া দুটোকে।

পালিয়ে বাঁচলেন শঙ্খদত্ত আর ভীমভট।

ভোরের দিকে ক্ষতবিক্ষত দেহে পৌঁছোলেন গঙ্গার ধারে। সেখানে বেদ পড়ছিল এক ব্রাহ্মণ বালক।

তার নাম নীলকণ্ঠ। বারাণসীর শ্রীকণ্ঠ ব্রাহ্মণের ছেলে। গুরুর কাছে থেকে পড়াশুনো শেষ করে বাড়ি ফিরে দেখেছিল, আত্মীয়স্বজন সব মারা গেছে। কপর্দকহীন অবস্থায় গঙ্গার তীরে এসে তপস্যায় মন দিয়েছে। মা-গঙ্গার কৃপায় রোজ সকালে স্নানের সময় কয়েকটা ফল ভেসে আসে। সেই ফল খেয়ে ভালোই আছে ব্রাহ্মণ-তনয়। তার কোনও অভাব নেই।

অল্পতেই সে তুষ্ট, আকাঙ্ক্ষা যার মনে নেই, তাকেই তো সব দিতে ইচ্ছে যায়। ভীমভট মায়ের কাছ থেকে অনেক ধনরত্ন পেয়েছিল। সব দিয়ে দিল নিঃস্ব ব্রাহ্মণ-তনয়কে।

তারপর, সাঁতরে গঙ্গা পেরতে গেল ভীমভট, শঙ্খদত্তকে নিয়ে। কিন্তু জলের তোড়ে ভেসে গেলেন শঙ্খদত্ত, অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচাতে না পেরে মনের দুঃখে যখন জলে ঝাঁপ দিয়ে মরতে যাচ্ছে ভীমভট .....

দেখা দিলেন মা-গঙ্গা।

বললেন, শঙ্খদত্ত বেঁচে আছে। দেখা হবে যথাসময়ে। এখন শিখিয়ে দিচ্ছি একটা মজার মন্ত্র। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পর পর আউড়ে গেলে অদৃশ্য হয়ে যাবে। আবার যখন শেষ থেকে শুরু পর্যন্ত পর পর আবৃত্তি করবে, তোমাকে সবাই দেখতে পাবে। বড়ো মন্ত্র নয়, ছোট্ট। মাত্র সাত অক্ষরের।

মন্ত্র শিখিয়ে চলে গেলেন মা-গঙ্গা।

ভীমভট শঙ্খদত্তের অন্বেষণে টোঁ-টোঁ করতে করতে গিয়ে পৌঁছোল লাট দেশে। সেখানে এক জুয়ারি আড্ডায় ঢুকে সব্বাইকে হারিয়ে সব বাজি জিতে নিয়ে আবার ফিরিয়ে দিল প্রত্যেকের টাকাপয়সা। এমন আশ্চর্য ক্ষমতা আর মহানুভবতা জুয়ারিরা কক্ষনো দেখেনি। তারা বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিল ভীমভট-এর সঙ্গে।

এমন সময়ে নামল বর্ষা। জল বাড়ল বিপাশা নদীতে, সাগরের জল হু-হু করে ঢুকে পড়ায়। জলের তোড়ে ঢেউয়ের ধাক্কায় নদীতে ঠিকরে এল একটা মস্ত তিমি।

উল্লসিত জেলের দল তিমি শিকার করেছিল তৎক্ষণাৎ। পেট চিরেছিল...

অমনি পেটের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন সজীব শঙ্খদত্ত!

চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছিল ভীমভট-এর! একী কাণ্ড!

কাণ্ডটা অসাধারণ নিঃসন্দেহে।

পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরে উল্লাসে ফেটে পড়বার পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলেন শঙ্খদত্ত। তারপর বললেন, তিমির পেটে গিয়ে এতদিন বেঁচে ছিলাম তিমির মাংস খেয়ে। ছুরি দিয়ে কেটেছি আর খেয়েছি।

অবাক কাণ্ড নিঃসন্দেহে! তিমির পেটে নিবাস, তিমির মাংসে আহার!

শঙ্খদত্তকে নিয়ে এল ভীমভট নিজের জায়গায়। তারপর একদিন দুজনে গেছিলেন সরোবরের ধারে বাসুকি উৎসবের সময়ে, দেখতে পেলেন হংসাবলিকে। রাজা লাট-এর মেয়ে। স্নান করতে এসেছে সরোবরে।

প্রথম দর্শনেই এমনই প্রেম জাগল, যে কামজ্বরে আচ্ছন্ন হল দুজনেই। রাজকন্যা ভাবল, ভীমভট নিশ্চয় স্বয়ং কামদেব। আর ভীমভট ধরে নিল, এ মেয়ে নিশ্চয় দেবলোক অথবা নাগলোক থেকে এসেছে।

কাম-বেহুঁশ রাজকন্যা লোক মারফত ভীমভট-এর খোঁজখবর নিয়ে চলে গেল নিজের বাড়ি। সন্ধ্যায় পাঠাল এক সখীকে সখী বললে, আমাদের রাজকন্যা আপনার সঙ্গে সঙ্গম লালসায় অস্থির। কী করবেন?

ভীমভট সাফ বলে দিলে, একই অবস্থা আমারও। আমার জানা আছে এমন এক মন্ত্র যা আউড়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি। সুতরাং, রাত হোক, অন্তঃপুরে হবে দেখা।

রাত গভীর হতেই রাজকন্যার সামনে দৃশ্যমান হল ভীমভট। চটপট গন্ধর্ব বিয়েটা সেরে নিয়ে, সারা রাত মদনানন্দে থেকে, ভোরের আগেই ফিরে এল স্বস্থানে।

এদিকে, সখীরা অবাক হয়ে গেছিল রাজকন্যার সারা শরীরে রতি লালসা নিবৃত্তির বিবিধ চিহ্ন দেখে। সুস্পষ্ট চিহ্ন। রাজকন্যা হংসাবলি স্বেচ্ছায় কামক্রীড়া করেছে কোনও এক পুরুষের সঙ্গে। কিন্তু প্রহরীবেষ্টিত অন্তঃপুরে সেই পুরুষ এল কী করে?

খবর দিল রাজাকে। রাজা নিয়োগ করলেন এক গুপ্তচরকে।

রাত হতেই কামনা মেটাতে ভীমভট দৃশ্যমান হল হংসাবলির সামনে। তৎক্ষণাৎ খবর চলে গেল রাজার কাছে।

বিবেচক রাজা বললেন প্রহরীদের, মানুষটাকে ঘাঁটাতে যেও না। সবার চোখের সামনে যে অন্তঃপুরে যাতায়াত করতে পারে, সে অসামান্য পুরুষ। বন্ধ দরজার বাইরে থেকে বলবে, রাজা ডেকেছেন।

তাই বলেছিল শান্ত্রীরা। ভেতর থেকে জবাব দিয়েছিল ভীমভট, কাল রাজসভায় সবার সামনে আসব। যা বলবার, সবার সামনে বলব।

সকাল হল। ভীমভট বন্ধুদের নিয়েই এল রাজসভায়, সব্বাইকেই অদৃশ্য করে নিয়ে, নিজেও অদৃশ্য থেকে। তারপর হল দৃশ্যমান।

শঙ্খদত্ত বললেন রাজাকে, এখানে এসেছে ভীমভট, রাঢ় রাজার ছেলে। সে অদৃশ্যকরণ মন্ত্র জানে। বিয়ে করতে চায় আপনার মেয়েকে।

সোজা কথা শুনে রাজা খুশি হলেন। তাঁর বয়সও হয়েছিল। ভীমভটকে জামাই করে নিলেন, তাকে রাজ্যদান করলেন। নিজে বনবাসী হলেন।

একদিন খবর পেল ভীমভট, ছোটোভাই সমরভট বসেছে রাঢ় সিংহাসনে, কেননা, বাবা মারা গেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠাল সমরভটকে দূত মারফৎ, সিংহাসন ছাড়, নাচনির ছেলের ওই সিংহাসনে বসবার যোগ্যতা নেই।

সমরভট জানাল, লড়ে নাও সিংহাসন।

হল যুদ্ধ। সমরভট-এর মুণ্ড বাদ গেল ধড় থেকে। মাকে সেই সুসংবাদ দিয়ে, শঙ্খদত্তকে লাট-সিংহাসনে বসিয়ে, বাবার সিংহাসনে এসে বসল ভীমভট।

হংসাবলিকে নিয়ে পরমানন্দে কিছুদিন কাটানোর পর সমস্যা ঘনিয়ে এল ভীমভট-এর কপালে।

উতঙ্ক মুনি এসেছিলেন ভীমভট-এর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু শান্ত্রীরা সে খবর পাঠায়নি ভীমভটকে। রেগে গিয়ে শাপ দিলেন মুনি, বুনোহাতি হয়ে জন্মা।

কথাটা ভীমভট এর কানে পৌঁছোতেই শিউড়ে উঠে দৌড়ে এসেছিল মুনির কাছে। ক্ষমা চেয়েছিল। কাকুতি মিনতি করেছিল।

মুনি নরম হয়েছিলেন। বলেছিলেন, বাকসিদ্ধ আমি। যা বলেছি, তা ঘটবেই। তবে হ্যাঁ, প্রচণ্ডশক্তি নামে একজন অন্ধ তোমার কাছে আসবে। সে মৃগাঙ্কদত্তের বন্ধু। তার কথা শুনবে, তাকে আশ্বাস দেবে। তোমার শাপ কেটে যাবে। মহাদেবের কৃপায় গন্ধর্ব হয়ে যাবে। প্রচণ্ড শক্তির অন্ধত্বও ঘুচে যাবে।

মুনি তো চলে গেলেন। ভীমভট বেচারাকেও হাতি হয়ে বনে বনে টহল দিতে হল। তারপর একদিন দেখা হয়ে গেল প্রচণ্ডশক্তির সঙ্গে।

কাহিনি সমাপ্ত করে হাতি হয়ে গেল ভীমভট। প্রচণ্ডশক্তি ফিরে পেল চোখ। তৎক্ষণাৎ, ভীমভট হয়ে গেল গন্ধর্ব।

সবান্ধব মৃগাঙ্কদত্ত আড়াল থেকে দৌড়ে চলে এলেন সামনে।

আকাশপথে প্রস্থান করার আগে গন্ধর্ব বলে গেল মৃগাঙ্কদত্তকে, বাকি বন্ধুদেরও এবার ফিরে পাবে। শশাঙ্কবতীকেও বউ হিসেবে পাবে। তখন আমাকে স্মরণ করবে। আমি আসব।

বন্ধুসহ বেজায় আনন্দে সেদিনটা সেখানেই কাটিয়ে দিলেন মৃগাঙ্কদত্ত।

বেতালপঞ্চবিংশতি : পঁচিশ বেতালের কাহিনি

৭৫. প্রথম বেতাল

পরের দিন বন থেকে বেরিয়ে উজ্জয়িনী অভিমুখে রওনা হলেন মৃগাঙ্কদত্ত, বন্ধুদের নিয়ে। কিছুদূর যেতে না যেতেই আকাশ থেকে নেমে এল এক বিকটাকার পুরুষ। তার কাঁধ থেকে টপ করে মাটিতে নেমে দাঁড়াল মৃগাঙ্কদত্তের দশ বন্ধুর অন্যতম বন্ধু, বিক্রমকেশরী। নেমে দাঁড়িয়েই ফিরে বললে ভয়াল চেহারার পুরুষকে, এখন যাও। চলে আসবে মনে মনে ডাকলেই।

বিকট পুরুষ নিমেষে অন্তর্হিত হল আকাশে।

বিক্রমকেশরী শুরু করল তার অদ্ভুত কাহিনি।

নাগরাজের অভিশাপে বন্ধু বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর রওনা হয়েছিলাম উজ্জয়িনীর দিকেই, জানি তো, সব্বাই যাবে ওইখানেই।

একদিন পৌঁছোলাম ব্রহ্মস্থল নামে একটা গ্রামে, উজ্জয়িনীর কাছেই। দীঘির পাড়ে গাছতলায় বসতে না বসতেই এক ব্রাহ্মণ হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, পালাও! পালাও! এখানে আছে ভয়ানক এক বিষধর সাপ। কামড়েছে আমাকে, জ্বলছি বিষের জ্বালায়, মরবো জলে ডুবে।

সাপের বিষ কাটানোর বিদ্যে আমি জানি। বিষ কাটিয়ে দিলাম। আমার দুঃখের কাহিনি তাঁকে বললাম।

তিনি বললেন, তুমি আমার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছ, আমি তোমাকে 'বেতালসাধন' মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি। গুণী ব্যক্তি ছাড়া এ মন্ত্র কাউকে শেখানো যায় না।

আমি বললাম, লাভ কী আমার? বন্ধুদের হারিয়েছি, মন্ত্র নিয়ে কী করব?

ব্রাহ্মণ হেসে বললেন, বন্ধুদের ফিরে পাবে। বেতালের কাছে যা চাইবে, তাই পাবে। রাজা ত্রিবিক্রমসেন বিদ্যাধর অধিপতি হয়েছিলেন কীভাবে?। এই বেতালসিদ্ধির জোরে। শোনো সেই কাহিনি।

ত্রিবিক্রমসেন ছিলেন প্রতিষ্ঠান রাজ্যের রাজা। এ রাজ্য ছিল গোদাবরী নদীর তীরে।

তিনি রাজসভায় বসলেই রোজ একজন সাধু আসত। একটা ফল দিত। রাজা ফল রাখতে দিতেন ধনাগারের অধ্যক্ষকে।

দশ বছর ধরে প্রতিদিন এইভবে একটা করে ফল দিয়ে গেছে সন্ন্যাসী। রাজা সেই ফল দিয়েছেন ধনাগার-অধ্যক্ষকে।

একদিন ঘটে গেল একটা কাণ্ড। সন্ন্যাসী যথারীতি ফল উপহার দিয়ে বিদায় নিতেই সভায় ঢুকল একটা বাঁদর, শান্ত্রীর অলক্ষ্যে। লাফিয়ে লাফিয়ে চলে এল রাজার সামনে। হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা চাইল সেই ফল।

রাজা ফল দিলেন বাঁদরের হাতে। বাঁদর বেচারা ছিল ক্ষুধার্ত। ফল হাতে নিয়ে আছড়ে ফেলে ভাঙতেই, ভেতর থেকে শাঁস না বেরিয়ে, গড়িয়ে গেল রাশি রাশি ঝলমলে দামি দামি রত্নপাথর।

আশ্চর্য ব্যাপার তো। খটকা লেগেছিল রাজার। নিয়ম করে প্রতিদিন শুধু একটা ফল দিয়ে গেছে সন্ন্যাসী কি এই কারণেই? ফলের খোসার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থেকেছে এত জহরত।

আগের ফলগুলোতেও কি তাহলে ছিল এই ঐশ্বর্য?

ধনাগার অধ্যক্ষকে জিজ্ঞেস করলেন রাজা, ফলগুলো নিয়ে কি করেছো?

সভয়ে বললে অধ্যক্ষ, ধনাগারের ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, গোল জানলার ভেতর দিয়ে, কোনওদিন ভেঙেও দেখিনি, ভেতরেও ঢুকিনি।

এখনও যাও।

ছুটলো অধ্যক্ষ। ফিরে এসে বললে চক্ষু চড়কগাছ করে, ফল তো দেখলাম না। পাহাড়প্রমাণ জহর আলো করে রেখেছে গোটা ধনাগারকে।

ফলের ভেতরেই ছিল এত রত্ন!

পরের দিন রোজকার মতো এল সেই ভিক্ষুক-সন্ন্যাসী। ফল দিতে গেল রাজাকে।

রাজা বললেন, রোজ এত রত্ন কেন আমাকে দেওয়া হচ্ছে, তা না বললে এ ফল নেব না।

সন্ন্যাসী বললে, বলব, তবে আড়ালে।

আড়ালে গিয়ে কারণটা বললে সন্ন্যাসী, মন্ত্রসাধন উদ্দেশ্যে। দরকার একজন বীরপুরুষের। যার প্রাণে ভয়ডর নেই। ভয়ানক কিছু দেখলেও আঁৎকে উঠবে না। আপনি যোগ্যতম পুরুষ। আপনাকে সহায়রূপে পাওয়ার জন্যেই রোজ ভেট দিয়ে গেছি পাঁচজনকে না জানিয়ে।

রাজি হয়ে গেলেন রাজা, কি করতে হবে?

আগামী কৃষ্ণা চতুর্দশীর দিন সন্ধ্যায় আসবেন মহাশ্মশানের মহাবটের তলায়। আমি থাকব।

সঙ্গে মন্ত্র নেব?

নেবেন। আপনার কৃপাণ। পরনে থাকবে নীল পোশাক। মাথায় পরবেন তমাল ফুলের মকুট। কেউ যেন জানতে না পারে।

নির্দিষ্ট দিনে সঠিক সময়ে সন্ন্যাসীর কথামতো সাজসজ্জা করে সশস্ত্র রাজা হাজির হলেন শ্মশানে। সে এক ভয়ানক শ্মশান। চারদিকে জ্বলছে চিতা। চোখ ঝলসে যাচ্ছে আগুনের আভায়। নরকঙ্কাল ছড়িয়ে আছে এদিকে সেদিকে। বিকট উল্লাসে নেচে চলেছে ভূত বেতালরা। আধপোড়া মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে শিয়ালরা, তাদের বিকট নিনাদে গায়ের রক্ত ছলকে ওঠে।

মহাবটের তলায় বসে বেতাল সাধনার মন্ত্র আঁকছিল সন্ন্যাসী।

বললে রাজাকে, চলে যান দক্ষিণের শিমূল গাছের তলায়। ডাল থেকে যে মড়া ঝুলছে, পুরুষের মড়া, মাথা নিচের দিকে করে, তাকে নিয়ে আসুন আমার কাছে।

গেলেন রাজা সেখানে। মড়া দেখলেন। গাছে উঠলেন। দড়ি কেটে মরা ফেলে দিলেন নীচে—

অমনি হাউমাউ করে কেঁদে উঠল মড়া।

জ্যান্ত মানুষ নাকি? হুড়মুড় করে গাছ থেকে নেমে এসে তার গা ছুঁতেই রক্তজলকরা অট্টহাসি হেসে উঠল মড়া।

নিশ্চয় দানোয় পেয়েছে মড়াকে, যাকে বলে বেতালে পাওয়া। সুস্থির গলায় রাজা বললেন, কেঁদ না, এস আমার সঙ্গে।

অমনি মাটি ছেড়ে মড়া উঠে গেল গাছে, ঝুলতে লাগল মাথা নীচের দিকে করে আগের মতো।

নিঃশঙ্ক রাজা ফের মড়া নামালেন ডাল থেকে। ঘাড়ে চাপিয়ে যেই পা চালিয়েছেন, মড়া বললে, পথ ভুলেছেন? শুনুন একটা গল্প, ভুল কেটে যাবে।

প্রথম কাহিনি

প্রতাপমুকুট নামে এক রাজা ছিলেন বারাণসী নগরে। রাজপুত্রের নাম বজ্রমুকুট। তাঁর বন্ধু ছিলেন যিনি, তাঁর নাম বুদ্ধিশরীর। বুদ্ধি তাঁর অণুপরমাণুতে।

একদিন দুই বন্ধু শিকার করতে বেরিয়েছিলেন। সিংহ-বনে ঢুকেছিলেন। বহু সিংহ বধ করেছিলেন।

তারপর দেখলেন একটা অপরূপ পদ্মদীঘি। এক অপরূপা রূপের ছটায় দশদিক আলো করে নাইতে নেমেছে। এমনই সুন্দরী যে তার কটাক্ষপাতে দীঘিতে নতুন নতুন পদ্ম জন্ম নিচ্ছে।

রাজপুত্র দেখে মোহিত হলেন। অপরূপা কন্যাও রাজপুত্রের প্রেমে পড়ে গেলেন। অশেষ বুদ্ধিমতী। তাই রমণীভূষণ লজ্জা ত্যাগ করে প্রেমনিবেদন করলেন না। যা বলবার, তা সংকেতে বললেন।

পরপর তিনটি সংকেত করলেন, সবই কমলবনের পদ্ম মারফত।
এক, খোঁপায় গোঁজা ছিল যে পদ্মটি, সেটি খোঁপা থেকে টেনে এনে প্রথমে রাখলেন কানে।
দুই, কান থেকে পদ্ম নামিয়ে দাঁত দিয়ে কেটে নিজের পায়ের তলায় ফেলে দিলেন।
তিন, আর একটা পদ্ম নিয়ে মাথায় রাখলেন, তারপর বুকে হাত দিলেন।
সবই করে গেলেন প্রেমশরবিদ্ধ রাজপুত্রের চোখে চোখে চেয়ে। কিন্তু মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারলেন না মহাবীর রাজপুত্র।
বুঝলেন মহাবুদ্ধিমান বন্ধু। চুপ করে রইলেন।
মুখ খুললেন স্বরাজ্যে ফিরে। রাজপুত্র বিরহ-অনলে জ্বলছেন দেখে।
বললেন, কন্যা তোমাকে মুখে কিচ্ছু বলেননি। কিন্তু সংকেতে জানিয়েছেন তিনি থাকেন কোথায়, কী তাঁর নাম, কোন বংশে জন্ম।

ঘাড়ে চাপিয়ে যেই পা চালিয়েছেন, মড়া বললে, পথ ভুলেছেন?

অবাক হয়ে গেলেন রাজপুত্র সংকেত? এত কথা বলা যায়?

যায়। কারণ, বুদ্ধি তাঁর মগজে থই থই করছে। প্রথম দর্শনেই তিনি তোমাকে দেহমন সমর্পণ করেছেন, সহবাস প্রার্থনা করেছেন।

তাই নাকি? তাই নাকি? কীভাবে?''

তিনটে সংকেত মারফত। প্রথম সংকেত, কানে পদ্ম রাখলেন। বলে দিলেন, কর্নোৎপল রাজার রাজ্যে তাঁর নিবাস। দ্বিতীয় সংকেত, দাঁত দিয়ে পদ্ম কাটলেন। অর্থ উনি দন্তঘাটকের মেয়ে। পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, উনি আপনার চরণপ্রার্থী। তৃতীয় সংকেত, একটা পদ্ম মাথায় রেখে বুকে হাত দিলেন। অর্থ, ওঁর নাম পদ্মাবতী। আপনি রয়েছেন ওঁর বুকে।

মনে পড়ে গেল রাজপুত্রের, সত্যিই তো, কর্ণোৎপল নামে এক রাজা আছেন, তাঁর অতি প্রিয়পাত্রর নাম সংগ্রামবর্ধন দন্তঘাটক। আর, তাঁর মেয়ে পদ্মাবর্তীর রূপের আলোয় চাঁদ-সূর্য ও লজ্জা পায়। কিন্তু কর্ণোৎপল রাজার রাজত্ব তো কলিঙ্গ দেশে।

বুদ্ধিশরীরের বুদ্ধি চমৎকৃত করেছিল রাজপুত্রকে। তৎক্ষণাৎ সবন্ধু শিকারের অছিলায় রওনা হয়েছিলেন। কলিঙ্গদেশ অভিমুখে, খুঁজে খুঁজে বের করেছিলেন দন্তঘাতকের বাড়ি। খুব কাছেই একটা বাড়িতে থাকত এক বুড়ি। ঠাঁই নিলেন সেই বুড়ির বাড়িতে, ঘোড়াদুটিকে অন্য জায়গায় লুকিয়ে রেখে।

তারপর একদিন কথায় কথায় বুড়িকে জিজ্ঞেস করলেন বুদ্ধিশরীর, সংগ্রামবর্ধন দন্তঘাটককে, জানা আছে?

এক গাল হেসে বুড়ি বললে, বিলক্ষণ জানা আছে। আমি যে তারই মেয়ে পদ্মাবর্তীর ধাই-মা। রোজ অবশ্য যাই না, ভালো কাপড় নেই যে।

শুনেই দামি দামি কাপড় কিনে এনে বুড়িকে দিলেন বুদ্ধিশরীর, বললেন, কাপড় দিলাম ছেলের মতো। তুমি হয়ে গেলে আমার মা। তাইতো?

একগাল হেসে বুড়ি বললে, তা বটে! তা বটে!

বুদ্ধিশরীর বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দিলেন তৎক্ষণাৎ। বললেন, তাহলে এক্ষুণি চলে যাও পদ্মাবতীর কাছে। গিয়ে বলো, ওগো সংকেতকুমারী, দীঘির পাড়ে যে রাজপুত্রকে দেখে মজেছিলে, তিনি এসেছেন। খবর পাঠালেন তোমাকে।

বুড়ি নাচতে নাচতে নতুন কাপড় পড়ে চলে গেল পদ্মাবতীর কাছে। পদ্মাবতী রাজকুমারের আগমনবার্তা শুনেই বুড়ির দুইগালে দুই চড় কষিয়ে দিল হাতে কর্পূর ঘষে নিয়ে।

ফিরে এসে বুড়ি দেখালো দ-গাল। বেশ জোরেই থাপ্পড় কষিয়েছে পদ্মাবতী। পাঁচ আঙুলের দাগ পড়েছে এগালে, পাঁচ আঙুলের দাগ ওগালে।

মোট দশ আঙুলের দাগ।

এটাও একটা সংকেত। নিমেষে বুঝে নিলেন বুদ্ধিশরীর। আশ্বস্ত করলেন হতভম্ব রাজপুত্রকে, কর্পূর মাখা দশ আঙুলের ছাপের এই : শুক্লপক্ষের আর দশ দিন বাকি এই দশ রাতে সহবাস সমীচীন নয়। অতএব, হে প্রিয়, ধৈর্য ধরুন!

দশদিন পরে বুদ্ধিশরীর ফের পাঠালেন বুড়িকে আর একখানা, কাপড় পরিয়ে। শুভকাজে নতুন বস্ত্র যে সুলক্ষণ!

কিন্তু সেদিনও বুড়িকে দেখেই, কোনও কথা না বলে, আর এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল ভুবনমোহিনী পদ্মাবতী।

তিন আঙুলে বেশ করে আবির মাখিয়ে ছাপ মেরে দিল-কোথায়?

বুড়ির বুকে !

নিমেষে অর্থ বোঝা হয়ে গেল বুদ্ধিশরীরের। রাজপুত্রকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, হে বন্ধু, তোমার ইচ্ছা পূরণ হতে চলেছে। তবে তিনদিন ধৈর্য ধরো। পদ্মাবতী এখন রজস্বলা। তিনদিন তাঁকে ছোঁয়া যাবে না।

তিনদিন পরে পূর্ণকাম নিয়ে তিনি সঙ্গম করবেন তোমার সঙ্গে।

তিন-তিনটে দিন কামানলে জ্বলে গেলেন রাজপুত্র। চতুর্থ দিবসে বুদ্ধিশরীর বুড়িকে পাঠালেন চতুরা পদ্মাবতীর কাছে।

যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুড়িকে যে মন মাথায় তুলে রাখল পদ্মাবতী। সারাদিন রেখে দিল নিজের কাছে। প্রিয় সখীকে দিয়ে গোপন ব্যবস্থায় হাতিশালা থেকে একটা হাতিকে বের করে দিল রাজবাড়ির সামনে। হাতি যখন লাফালাফি জুড়েছে, লোকজন পালাচ্ছে, তখন বুড়িকে বললে তোড়ন দিয়ে বেরোতে গেলে মরবে। চলো, তোমাকে জানলা দিয়ে নামিয়ে দিই বাগানে।'

বলে, একটা পিঁড়ে বাঁধল দড়িতে, সেই পিঁড়ে ঝোলালো জানলার বাইরে, বুড়িকে পিঁড়িতে বসিয়ে নামিয়ে দিল বাগানে।

বুড়ি বাড়ি ফিরে সব বলতেই পদ্মাবতীর সাংকেতিক বার্তা বুঝে গেছিলেন বুদ্ধিশরীর।

রাজপুত্রকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, সংকেময়ী পদ্মাবতী জানিয়ে দিলেন, আজ রাতে ঠিক ওইভাবেই তোমাকে যেতে হবে অন্তঃপুরে।

বুদ্ধিবটে পদ্মাবতীর! তোরণ-প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে পরপুরুষকে ঢুকিয়ে নিচ্ছে অন্তঃপুরে!

চমৎকৃত রাজপুত্র রাতগভীর হতেই বাগানের পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকে দেখেছিল গবাক্ষ থেকে দড়িতে বাঁধা পিঁড়ে ঝুলছে। যেন, দোলনা। গ্যাঁট হয়ে তাতে বসতেই দোলনা দুলতে দুলতে উঠে গেছিল গবাক্ষর সামনে, টেনে তুলেছে রাজকন্যার সখীরা, মুখ টিপে হাসতে হাসতে। পালঙ্কে বসেছিল পদ্মাবতী, যেন পূর্ণিমার চাঁদ। উঠে এসে আলিঙ্গন করেছিল রাজপুত্রকে। মালা চন্দন এনে রাখা ছিল। গার্ন্ধবমতে বিয়ে হয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ। তারপরেই দেহমিলন পর্ব। কামনা এমনই ভোগস্পৃহা-অনির্বাণ আগুনের মতো, যতই ঘি ঢালা যায় আগুনে, আগুন ততই দাউ দাউ করে ওঠে।

সুতরাং, পর পর কয়েকদিন কয়েক রাত রতিবিহারে কাটিয়ে দেওয়ার পর হুঁশ হল রাজকুমারের, বন্ধুবর বুদ্ধিশরীর যে প্রতীক্ষায় রয়েছে বুড়ির বাড়িতে। একবার গিয়ে দেখে আসা যাক, ভোগ-বিবরণ দিয়ে আসা যাক।

পদ্মাবতীকে সে কথা বলতেই সে জিজ্ঞেস করেছিল, উনি কি জানেন আপনাকে আমি সংকেতে সংবাদ পাঠিয়েছিলাম?

হেসে বলেছিলেন রাজা কুমার, অবশ্যই জানে। নিগূঢ় সংকেতের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা তো সে-ই করেছে।

ঝটিতি বলেছিল পদ্মাবতী, আগে তো বলবেন। যোগ্য সমাদর করতাম। আজ রাতে আপনি তাঁর কাছে গল্প করুন, কাল সকালে আমি পাঠিয়ে দেব পান-মিষ্টি শুধু ওঁর জন্যে। বুড়ির বাড়ি এসে রাজপুত্র সবিস্তারে সব বলেছিল বুদ্ধিশরীরকে। পদ্মাবতী সব জেনে গেছে শুনে গুম হয়ে গেছিল বুদ্ধিশরীর। সমানে সমানে যখন টক্কর চলে, প্রতিপক্ষকে তখন হুঁশিয়ার থাকতে হয়। কোনও রমণীই চায় না, তার গুপ্ত কামলিপ্সার কাহিনি অন্য পুরু জেলে যাক।

তাই হুঁশিয়ার হয়েছিলেন বুদ্ধিশরীর। হয়েছিলেন বলেই প্রাণে বেঁচে গেলেন।

রাতভোর গল্প শেষে রাজকুমারীর সখী এল পান-মিষ্টি নিয়ে। বুদ্ধিশরীরের হাতে দিয়ে বলে গেল, শুধু আপনার জন্যে।

সে চলে যেতেই বুদ্ধিশরীর একটা মিষ্টি তুলে নিয়ে খেতে দিলেন একটা কুকুরকে।

খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হল কুকুর।

রাজকুমারের যখন চক্ষুস্থির, তখন বুঝিয়ে দিলেন বুদ্ধিশরীর, গুপ্ত সংকেত যার উদ্দেশ্যে, সে ছাড়া আর কেউ যদি তা বুঝে ফেলে, তাহলে তাঁকে টিকিয়ে রাখতে নেই। আমি যখন এতই জেনে ফেলেছি, যখন আমি বেঁচে থাকলে তার অন্যান্য সংকেতের অর্থ ধরে ফেলে হয়তো রতি-উন্মাদিনীর কাছ থেকে তোমাকে সরিয়েও নিতে পারি। তাই আমাকে সরানোর চেষ্টা করা হয়েছিল।

বিহ্বল রাজকুমার বললেন, কিন্তু আমি যে তাকে ছাড়তে পারব না। ওই রতিসুখ আরও চাই।

পাবে, বললেন বুদ্ধিশরীর, কিন্তু ওই বাড়িতে নয়। পদ্মাবতীকে বের করে আনতে হবে ওই বাড়ি থেকে, তার বিষদাঁত ভাঙতে।

কীভাবে?

এইভাবে বলে, একটা ছোট্ট ত্রিশূল রাজকুমারের হাতে দিয়ে বললেন প্রিয়বন্ধু, আজ রাতে মদ খাইয়ে সহবাস করার পর সে যখন বেহুশ হবে, তুমি তার নিতম্বে এই ত্রিশূলের ছাপ দেবে, ত্রিশূল গরম করে নিয়ে। তারপর পালিয়ে আসবে গবাক্ষ দিয়ে। গয়নাগাটি সব নিয়ে আসবে পুঁটলিতে বেঁধে।

হুবহু তাই করেছিলেন রাজপুত্র। অলঙ্কার খুলেই দেহমিলনে মেতেছিল কাম-উন্মাদিনী পদ্মাবতী, মদিরা-প্রমত্ত থাকায় গরম ত্রিশূলের ছ্যাঁকা দেওয়াও টের পায়নি।

ভোর হতেই সন্ন্যাসীরূপে শ্মশানে বসে গেলেন ধুরন্ধর বুদ্ধিশরীর, চ্যালা বানিয়ে নিলেন রাজপুত্রকে। সঙ্গে রইল গয়নার পুঁটলি।

একটা গয়না নিয়ে সাধুবেশী রাজপুত্রকে দিয়ে বললেন, সোজা চলে যাও বাজারে, এই গয়না বেচতে, দাম বলবে চড়া, কেউ নিতে পারবে না। যখন জিজ্ঞেস করবে, গয়না পেয়েছ কোথায়? বলবে, গুরুদেবের কাছে।

পদ্মাবতীর গয়না লোপাটের তদন্ত আরম্ভ করে দিয়েছিল নগররক্ষীরা। ছদ্মবেশী রাজপুত্রের হাতে গয়না দেখে বুঝে ফেলেছিল এই সেই চোরাই গয়না। ধরে নিয়ে গেছিল নগরপালের কাছে। নগরপালের জেরার জবাবে ছদ্মবেশী রাজপুত্র বলেছিল বুদ্ধিশরীর যা বলতে বলেছে। নগরপাল তক্ষুনি গেছিল শ্মশানে সাধুবেশী বুদ্ধিশরীরের কাছে। লোমহর্ষক একটা গল্প শুনিয়ে দিয়েছিল বুদ্ধিশরীর।

গয়না এসেছে কোত্থেকে? দিয়ে গেছে মায়াবিদ্যায় নিপুণা এক নারী। দল বেঁধে এসেছিল তারা গতরাতে। ধরে এনেছিল এক রাজপুত্রকে। বেচারার হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিয়ে উপচার দিয়েছিল শ্মশান ভৈরবকে। কেড়ে নিতে এসেছিল ছদ্মবেশী বুদ্ধিশরীরের জপমালা। রুখে দাঁড়াতেই বদন বিকট করে ভয় দেখাচ্ছিল। রেগে আগুন হয়ে গেছিল সন্ন্যাসীরূপী বুদ্ধিশরীর। ত্রিশূল গরম করে নিয়ে ছ্যাঁকা দিয়েছিল উলঙ্গিনী নিতম্বিনীর নিতম্বে। সে যখন যন্ত্রণায় চেঁচাচ্ছে, তখন কেড়ে নেওয়া হয়েছিল গায়ের গয়না। পালিয়েছিল দাগী মায়াবিনী। কিন্তু তার গয়না কাছে রাখা কি সমীচীন? সন্ন্যাসীর পক্ষে? কক্ষনো নয়। তাই চেলাকে দিয়ে বেচতে পাঠিয়ে দিয়েছিল অলঙ্কার কেনাবেচার দোকানে।

বুদ্ধিশরীরের কুশাগ্র বুদ্ধির কাছে অবশেষে হার মানতে হয়েছিল পদ্মাবতীকে। নগরপাল দৌড়ে গিয়ে গয়না দেখিয়ে রাজাকে শুনিয়েছিল রাতের মায়াবিনীর গল্প। রাজা চমকে উঠেছিলেন। এ তো তাঁর মেয়ে পদ্মাবতীর গায়ের গয়না। তাহলে কি মেয়ের নিতম্ব পুড়েছে গরম ত্রিশূলের ছ্যাঁকায়? পদ্মাবতীরই এক সখীকে দিয়ে জেনে নিলেন, সত্যিই তাই বটে! চামড়া ঝলসে দিয়ে নিতম্বে ত্রিশূল এঁকে রেখেছে নিজের চিহ্ন!

পদ্মাবতী তাহলে কুহকবিদ্যার চর্চা করে রাত্রিনিশিথে? ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!

দূর করে দিলেন মেয়েকে! তাকে রেখে আসা হল এক গভীর জঙ্গলে, রাজ্যের বাইরে।

কাজ হাসিল হয়েছে দেখে স্ববেশে স্বরূপে ঘোড়ায় চেপে বুদ্ধিশরীর গেল অরণ্যে, রাজপুত্রকে নিয়ে। পদ্মাবতীর বুদ্ধির দর্প তখন একেবারেই শেষ হয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে গেল রাজপুত্রের স্বদেশে, রইল সুখে, এবং সভয়ে!

মেয়েকে তাড়িয়ে দিয়ে মনে দাগা পেয়েছিলেন পদ্মাবতীর বাবা। বুকভাঙা কষ্ট নিয়ে একদিন তিনি দেহ রাখলেন। সহমরণে গেলেন পদ্মাবতীর মা। দুজনেই ধরে নিয়েছিলেন, পদ্মাবতীকে বাঘে খেয়েছে। জঙ্গলে আর তাকে যে পাওয়া যায়নি।

আজব কাহিনি সমাপ্ত করে বলেছিল বেতাল, ওহে রাজা, দেখে তো মনে হচ্ছে আপনার মাথায় বুদ্ধি আছে বিলক্ষণ। বলুন দেখি, পদ্মাবতীর বাবা আর মায়ের অকালমৃত্যুর জন্যে কে বেশি পাপী? বুদ্ধিশরীর, না রাজপুত্র, না পদ্মাবতী, জবাব যদি সঠিক না হয়, তাহলে আপনার খুলি ফেটে একশো টুকরো হয়ে যাবে।

বিনা দ্বিধায় জবাব দিলেন রাজা ত্রিবিক্রম, তিনজনের কেউ নয়। পাপী পদ্মাবতীর বাবা।

কেন? কেন? কেন?

রাজা কানে শুনে বিচার করেছিলেন বলে। যা অন্যায় গুপ্তচর লাগিয়ে আসল ব্যাপারটা তাঁর জানা উচিত, তিনি রাজধর্ম করেননি। বুদ্ধিশরীর উপকার করেছে বন্ধুর, নিঃস্বার্থভাবে। সে নিষ্পাপ। কাম জেগেছে, কাম মিটিয়েছে পদ্মাবতী আর রাজপুত্র। এর মধ্যে পাপ নেই।

শুনেই, পরমজ্ঞানী রাজাকে বেকায়দায় ফেলা গেল না দেখে, তাঁর কাঁধ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে নিমেষে উধাও হয়ে গেল বেতাল, কোথায়, কে জানে।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাজা তার সন্ধানে ফের এলেন শিমূল গাছের তলায়।

৭৬. দ্বিতীয় বেতাল

দেখলেন, বেতালে পাওয়া মড়াটা পড়ে রয়েছে মাটিতে। বিকট নিনাদ ছাড়ছে গলা দিয়ে। চিতা জ্বলছে এদিকে সেদিকে। আগুনের আভায় সে এক লোমহর্ষক দৃশ্য।

কিন্তু রাজা ত্রিবিক্রমের প্রাণে ভয় বলে কোনও পদার্থ নেই। এক হ্যাঁচকায় সেই মড়া কাঁধে তুলে নিয়ে ফের হন হন করে চললেন। পুরুষসিংহ তো, ভয় দেখালে আরও গোঁ চেপে যায়।

অগত্যা বেতালে পাওয়া মড়ার মুখদিয়ে ফের বেরিয়ে এল গা হিম করা কণ্ঠস্বর, হে বীর রাজা, খামোকা কষ্ট পাচ্ছেন শোনাই একটা খাসা গল্প, পথশ্রম কমবে।

কোনও এক সময়ে গঙ্গার তীরে খাকতেন এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ। তাঁর নাম অগ্নিস্বামী। তাঁর মেয়ে মন্দারবতী ছিল নিখুঁত সুন্দরী।

মেয়ের বিয়ের বয়স হতেই তিনজন ব্রাহ্মণ যুবক এল তাকে বিয়ে করতে। তিনজনেই সমান বিদ্বান, সমান গুণবান, সমান রূপবান।

কাকে জামাই করা যায়? কাউকেই নয়, সিদ্ধান্ত নিলেন মেয়ের বাবা।

বিয়ে পাগল তিন ব্রাহ্মণ তনয় থেকে গেল সেখানেই। প্রবাদ আছে, চকোর পাখি নাকি জ্যোৎস্না পান করে টিকে থাকে। এই তিন ব্রাহ্মণপুত্র মন্দারবতীর রূপের জ্যোৎস্নায় বিভোর হয়ে পড়ে রইল বাড়ির সামনে।

এই সময়ে কালজ্বরে মারা গেল মন্দারবতী। বিষম শোকে বিহ্বল তিন ব্রাহ্মণ তনয় তার মৃতদেহ বহন করে নিয়ে গেল শ্মশানে। দাহ করল।

চিতাভস্মর ওপরে আখড়া বানিয়ে এক ব্রাহ্মণপুত্র শুয়ে রইল সেই ছাইগাদায়।

মন্দারবতীর অস্থি নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিল দ্বিতীয় মন্দারবতী প্রেমিকা। তৃতীয়জন জন সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেল তীর্থ ভ্রমণে। ঘুরতে ঘুরতে একদিন পৌঁছোল বক্রলোক নামে একটা পল্লীগ্রামে। অতিথি হল এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে। এই সময়ে শিহরণ জাগানো এক ঘটনা ঘটে গেল তার চোখের সামনে।

খুব কাঁদছিল ব্রাহ্মণের কচি ছেলেটা। কান্না থামাতে না পেরে রেগে মেগে ব্রাহ্মণী তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল জ্বলন্ত উনুনে। বাচ্ছা ছাই হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

শিউরে উঠেছিল অতিথি ব্রাহ্মণ তনয়। একী নৃশংসতা!

খাবার মুখে না দিয়ে যেই পালাতে যাচ্ছে, হেসে বলেছিল গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, আঁৎকে উঠবেন না। আমি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জানি। এই দেখুন।

একটা পুঁথি এনেছিলেন ব্রাহ্মণ। পাঠ করেছিলেন একটা মন্ত্র। ধুলো নিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন ছাইয়ে। কচি ছেলেটা পূর্ব কলেবরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মায়ের বুকে।

গেরস্থ ব্রাহ্মণ পুঁথি রেখে দিলেন কুলুঙ্গিতে।

অলৌকিক এহেন কাণ্ড দেখে অতীব চমৎকৃত অতিথি ব্রাহ্মণ খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ল বটে, কিন্তু চোখ রইল কুলুঙ্গির দিকে। সবাই যখন ঘুমোচ্ছে, তখন চম্পট দিল পুঁথিখানা বগলে নিয়ে।

ফিরে এল গঙ্গার তীরে যেখানে মন্দারবতীর ছাইএর ওপর আখড়া বানিয়ে শুয়ে আছে এক ব্রাহ্মণপুত্র।

মন্দারবতীর হাড় ভাসিয়ে দিতে গেছিল যে ব্রাহ্মণ কুমার, সে-ও রয়েছে সেখানে।

কেরামতি দেখিয়ে দিল পুঁথিচোর ব্রাহ্মণ তনয়। ছাইয়ের ওপর শুয়ে মন্দারবতীর ধ্যান করছিল যে, তাকে ঠেলে তুলে দিয়ে পুঁথি খুলে মন্ত্রপাঠ করে, একমুঠো ধুলো তুলে ছাইয়ের গাদায় ছুঁড়ে দিতেই ...

কী আশ্চর্য! কোথায় ছাই! রূপের রোশনাই ছড়িয়ে জীবন্ত মন্দারবতী দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

গোল বাঁধল তখনই। কার বউ হবে মন্দারবতী? যে ছাইয়ের গাদায় শুয়ে থেকেছে, তার? না, যে হাড় ভাসিয়ে এসেছে গঙ্গায়, তার? নাকি, যে মন্ত্র পড়ে ফের জ্যান্ত করেছে মন্দারবতীকে, তার?

তিনজনেই চাইল মন্দারবতীকে বিয়ে করতে, মন্দারবতী হবে শুধু একজনের। কিন্তু কার?

কাহিনি শেষ করে বেতাল বললে, বিবাদের মীমাংসা কীভাবে হওয়া উচিত? হে রাজা, যদি সঠিক জবাব না দিতে পারেন, এই মুহূর্তে আপনার খুলি একশো টুকরো হয়ে যাবে।

সে ভয়ে ভীত নন রাজা। জ্ঞান যে মগজকে ঠেসে রেখেছে। জবাবটা দিলেন নিমেষে, মন্ত্রের জোরে মন্দারবতীকে যে জীবন দিয়েছে, সে তো বাপের কাজ করেছে; বাপ কি মেয়েকে বিয়ে করতে পারে? অসম্ভব। গঙ্গায় যে হাড় ফেলে দিয়ে এসেছে, সে তো ছেলের কাজ করেছে। ছেলে কি মা-কে বিয়ে করতে পারে? কক্ষনো না। কিন্তু যে ছাইয়ের গাদায় দিনরাত শুয়ে থেকে মন্দারবতীর ধ্যান করে গেছে, প্রেমপাগল বলেই করতে পেরেছে, মন্দারবতী তাকেই ধরা দিতে পারে প্রেমপুজোর পুরস্কার স্বরূপ।

জবাবটা কানখাড়া করে শুনেই বেগতিক বুঝে বেতালে-পাওয়া মড়া ঝটিতি চম্পট দিল রাজামশায়ের কাঁধ থেকে নেমে।

একরোখা রাজাও দৌড়োলেন শ্মশান অভিমুখে মড়ার সন্ধানে।

৭৩. তৃতীয় বেতাল

শ্মশানে গিয়ে দেখলেন, বেতালে-পাওয়া মড়া আগের মতোই ঝুলছে শিমূল গাছে।

গোঁয়ার রাজা তৎক্ষণাৎ তাকে টেনে নামিয়ে, কাঁধে তুলে, হন হন করে চললেন।

অমনি কথা বেরিয়ে এল পুরুষ-মড়ার মুখ দিয়ে। কথা বলছে বেতাল।

বলছে, আপনি তো দেখছি মহাগোঁয়ার। এত ছুটোছুটি করে নিশ্চয় হেদিয়ে পড়ছেন। শুনুন আর একখানা গল্প। পথকষ্ট কমবে।

বিক্রমকেশরী ছিলেন পাটলিপুত্র নগরের রাজা, অনেক আগে। আশ্চর্য এক টিয়াপাখি পুষতেন তিনি। পণ্ডিত টিয়া, ক্ষুরধার বুদ্ধি দৈবশক্তিসম্পন্ন। নির্ঘাৎ শাপগ্রস্ত কোনও দেবলোকবাসী। প্রজারা তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করত। রাজাও তার বুদ্ধি নিয়ে রাজকার্য চালাতেন। মানুষের গলায় কথা বলে কঠিন সমস্যারও সহজ সমাধান বাতলে দিত টিয়াদেহী সেই দিব্যসত্তা।

রাজা এই টিয়ারই বুদ্ধি নিয়ে বিয়ে করলেন মগধরাজার মেয়ে চন্দ্রপ্রভাকে। রাজকন্যা নিজেও একটি মেয়ে-টিয়া পুষত। বিয়ের পর তাকে শ্বশুরবাড়িতে এনে রেখে দিল রাজার টিয়ার খাঁচায়, একই সঙ্গে।

একদিন পুরুষ-টিয়ার বড় ইচ্ছে হয়েছিল মেয়ে-টিয়ার সঙ্গে সঙ্গম করবে। খুবই সঙ্গত কামনা। একই খাঁচায় থেকে প্রথম রিপুর দাপট কে এড়াতে পারে?

কিন্তু এড়িয়ে গেছিল মেয়ে-টিয়া। বলেছিল পুরুষ-টিয়াকে, দূর! দূর! পুরুষ বড় বেইমান। গা ছুঁতেও চাই না।

চটে গিয়ে পুরুষ-টিয়া বলেছিল, ঠিক উল্টো। মেয়েগুলোই বদমাস। তাদের বুক পাথর দিয়ে গড়া।

লাগল বাগযুদ্ধ টিয়া আর টিয়ানিতে শেষে পর্যন্ত বাজি ধরা হলো এইভাবে, টিয়া যদি হেরে যায় আপন বক্তব্যে তাহলে টিয়ানির চাকর হয়ে থাকবে। আর, টিয়ানি যদি নিজের বক্তব্যের সত্যতা দাঁড় করাতে না পারে, তাহলে বউ হয়ে থাকবে টিয়ার।

বাগযুদ্ধের মধ্যস্থতা করবেন কে? স্বয়ং রাজামশায়।

টিয়ানিই প্রথমে গল্প ফেঁদে বসল নিজের যুক্তির পক্ষে। গল্পটা এই :

এক মহা বড়োলোক বণিক থাকতেন কামন্দকী নগরে। তাঁর নাম অর্থদণ্ড। তিনি পরলোকে যাওসয়ার পর বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়েছিল।

তাঁর একমাত্র ছেলে ধনদত্ত টাকা উড়োতে লাগল দু-হাতে বিবিধ বদনেশায়, সে সবের মধ্যে সাংঘাতিকতম নেশা জুয়ো খেলা।

সব টাকা দুদিনেই ফুঁকে দিয়ে বিষম লজ্জায় দেশত্যাগী হয়ে ধনদত্ত ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছোল চন্দনপুর গ্রামে। খিদে পেয়েছিল বলে ঢুকেছিল সওদাগরের বাড়িতে। ছেলেটির চমৎকার চেহারা, মিষ্টি কথাবার্তা আর উত্তম বংশে জন্ম জেনে তাকে ঘরজামাই করে রেখে দিল সেই সওদাগর। মেয়ের নাম রত্নাবলি।

কিন্তু মাথায় জুয়োখেলার ভূত চাপলে তা সহজে যায় না। শ্বশুরের টাকা ওড়ানোর ফিকিরে একদিন শ্বশুরের অনুমতি নিয়ে রওনা হল স্বগৃহ অভিমুখে। সঙ্গে রইল এক বুড়ি দাসী।

পথে পড়ল এক মহাঅরণ্য। মিষ্টবচনে বউকে বুঝিয়ে তার সমস্ত গয়নাগাটি জুয়ারি স্বামী রাখল নিজের কাছে।

জুয়ো আর বারবনিতায় যারা আসক্ত, তাদের মন হয় তরবারির মতো কঠিন, নির্মম, দয়ামায়াহীন, পৈশাচিক অর্থলিপ্সায় তারা জঘন্যতম কর্ম করতেও চোখের পাতা কাঁপায় না।

তাই, বউ আর তার বুড়ি ঝি-কে একটা গভীর গর্তে ফেলে দিয়ে চম্পট দিল ধনদত্ত।

বুড়ি মরে গেল তক্ষুনি, অত উঁচু থেকে আছাড় খাওয়ায়, কিন্তু লতাপাতায় জড়িয়ে যাওয়ায় প্রাণে বেঁচে গেল রত্নাবলি। লতা ধরেই কোনমতে বেরিয়ে এল গর্তের বাইরে কাঁদতে কাঁদতে গেল বাপের বাড়িতে।

কিন্তু সাধ্বী বলেই স্বামীর কুকীর্তি চেপে গেল। বললে, ডাকাতে গয়নাগাটি কেড়ে নিয়ে ফেলে দিয়েছিল তাকে, বুড়ি-ঝিকেও। বুড়ি মরেছে, সে মরেনি। থেকে গেল বাপের বাড়িতে।

ধনদত্ত নিজের বাড়ি ফিরে দু-দিনেই সব উড়িয়ে দিল জুয়োখেলে, আবার হল পথের ভিখিরি।

অতিশয় হৃদয়হীন বলেই ঠিক করল ফের যাওয়া যাক শ্বশুরবাড়ি, মোটা টাকা নিংড়ে নেওয়া যাক। বউ কোথায় জিজ্ঞেস করলে বলে দেব, সে রখেছে শ্বশুরবাড়ি, বহালতবিয়তে।

কিন্তু বিপদ ঘটল শ্বশুরবাড়িতে ঢুকতেই। দূর থেকে তাকে আসতে দেখেই বউ দৌড়ে এসে বললে, খবরদার বলবে না তুমি আমাকে গর্তে ফেলে দিয়েছিলে। বলবে, ডাকাতে ফেলে দিয়েছিল, আমি তাই বলেছি।

আরামে শ্বশুরবাড়িতে থেকে গেল পাপিষ্ঠ ধনদত্ত। তারপর একদিন বউকে প্রাণে মেরে দিয়ে তার সমস্ত গয়না নিয়ে পালিয়ে গেল নিজের বাড়ি।

পুরুষ জাতটা এই রকমই। তাদেরকে বিয়ে করা যায় না।

টিয়ানির গল্প শেষ হতেই টিয়া শুরু করল তার গল্প।

ধর্মদত্ত ছিলেন মস্ত বণিক। টাকার পাহাড়ে বসে থাকতেন। নিবাস হর্ষবতী নগরে। তাঁর রূপবতী কন্যার নাম বসুদত্তা।

অনেক খুঁজেপেতে তাম্রলিপ্ত নগরের সমুদ্রদত্ত নামে এক সওদাগর-পুত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিছেন ধর্মদত্ত।

বাপের বাড়িতে থাকলে মেয়ে তো রসাতলে যাবেই। রোজ রাতে পুরুষ ধরে এনে মদনানন্দে মত্ত রইল বসুদত্তা।

কিছুদিন পরে স্বামী এল শ্বশুরবাড়ি। কিন্তু কুলটা বসুদত্তা এক শয্যায় শুয়েও তাকে অঙ্গস্পর্শ করতে দিল না। ঘুমিয়ে পড়ল ক্লান্ত স্বামী।

অমনি, বিছানা থেকে উঠে বেরিয়ে পড়ল ভ্রষ্টা বসুদত্তা। সটান চলে গেল সেই বাগানে যেখানে কুলকলঙ্কনীর সঙ্গে অবৈধ সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার প্রত্যাশায় বসে রয়েছে তার উপপতি।

এখন, বসুদত্তার অগোচরে একজন চোর শোবার গরে আগে থেকেই ঢুকে ঘাপটি মেরে বসেছিল। সঙ্গমক্লান্ত মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়লেই গয়না নিয়ে হাওয়া হবে বলে।

সে দেখলে, কী আশ্চর্য ব্যাবার! স্বামীর সঙ্গে কামকর্ম করতে হবে বলে ইচ্ছে করে মটকা মেরে পড়ে রইল মেয়েটা। স্বামী ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়তেই রাতের আঁধারে মেয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে, গয়না ঝমঝমিয়ে, গোটা শরীর নাচিয়ে, কামপিপাসা। দেখা যাক কোথায় যায় রাতের-অভিসারিকা।

দেখল, বাগানে অপেক্ষারত তার উপপতিকে!

কিন্তু কপাল খারাপ উপপতির। ঠিক সেই মুহূর্তে নগররক্ষীরা তাকে দেখে ফেলেছিল। চোর মনে করেছিল। গাছের ডালে ফাঁসিতে লটকে দিয়েছিল।

আর, ঠিক তারপরেই বাগানে ঢুকেছিল কুলটা বসুদত্তা। উপপতির ঝোঝুল্যমান মৃতদেহ দেখে কাঁদতে কাঁদতে গাছের ডাল থেকে মৃতদেহ নীচে নামিয়ে, ফুল চন্দন দিয়ে সাজিয়ে, মুখে চুমু দিয়ে গেছিল উপর্যুপরি, চোখের জল ঝরাতে ঝরাতে।

রগড় দেখছিল এক বেতাল, আড়ালে দাঁড়িয়ে। মনস্থ করেছিল, জঘন্য মেয়েটাকে একটু সাজা দেওয়া যাক। সুট করে ঢুকে গেছিল মড়ার শরীরে। বসুদত্তা যেই ঠোঁটে চুমু বসিয়েছে, কটাৎ করে কামড়ে কেটে নিয়েছিল বসুদত্তার নাকের ডগা।

কিন্তু মেয়েজাতটা যখন ন্যক্কারজনক কামক্রীড়ায় আসক্ত হয়ে পড়ে, তখন তাদের কাছে কোনও রকম ঘৃণিত কাজ ঘৃণ্য বলে মনে হয় না।

মড়া যখন ঘ্যাঁক করে কামড়ে নাক কেটেছে, তাহলে তো মড়া বেঁচে উঠেছে। তাহলে, সঙ্গম করা যাক পুনর্জীবিত উপপতির সঙ্গে।

তাই, কামনা অধীর কামিনী ঘন ঘন ঝাঁকুনি দিয়ে গেছিল বেতাল অধ্যুষিত মড়াকে, ওঠো প্রিয়, ওঠো! আর যে আমি পারছি না। রসের সাগর রাতের নাগর, চুমুক দাও আমার রসভাণ্ডে!

এইবার ঘৃণা হয়েছিল বেতালেরও। এই কামিনীর ছোঁয়াও যে ঘৃণ্য। মড়া ছেড়ে পলায়ন করেছিল তৎক্ষণাৎ!

বসুদত্তা যখন দেখল, নাগর আর নড়েনা, মরেছে সত্যিই, তখন নাককাটা অবস্থাতেই ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেছিল স্বগৃহে।

মজা দেখবার জন্যে পেছন পেছন গেছিল নিশাচর চোর।

নাককাটা বসুদত্তা স্বামী বেচারাকে ফাঁসাবে, এই মতলবে শোবার ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠেছিল হাউমাউ করে, গেল! গেল! আমার নাক গেল! বদমাস সোয়ামি আমার নাক কেটে নিয়েছে গো!

জেগে উঠল গোটা বাড়ি। এ আবার কী কথা! কে কবে শুনেছে বউ-সহবাস করতে গেলে তার নাক কেটে নেওয়া হয়!

মারমুখো কন্যা-পিতা ঘরে ঢুকেই জামাইকে বাঁধলেন দড়ি দিয়ে, তার বক্তব্য শোনবার প্রয়োজন মনে করলেন না।

পাপাচারের এই বাড়িতে নির্ভাষ থাকাই শ্রেয় মনে করে বোবা হয়ে রইল জামাই বাবাজি।

তাজ্জব ব্যাপার দেখল চোর। টুঁ-শব্দটি না করে চম্পট দিল তৎক্ষণাৎ।

পরের দিন রাজা সব শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। দুষ্টু জামাইকে বধ করার হুকুম দিলেন। এত বড়ো স্পর্ধা! বউকে সুখ না দিয়ে নাক কামড়ে কেটে নেয়।

ঢেঁড়া পিটে আজব দুষ্কর্ম জানিয়ে দেওয়া হল নগরবাসীদের।

শুনল চোর মহোদয়।

নিশিকুটুম্ব হলেও সে হৃদয়বান। রাজঘাতকদের বললে, করছ কী? কাটা নাক যার মুখের মধ্যে, নাক কেটেছে সে।

কার মুখের মধ্যে? তেড়ে উঠেছিল ঘাতকবৃন্দ।

বাগানে মড়ার মুখে।

ফাজলামি হচ্ছে! মড়া কখনও নাক কামড়ায়?

কামড়ায় গো, কামড়ায়। যখন সেই মড়াকে বেতালে পায়।

হতচকিত ঘাতকরা চোরের সঙ্গে বাগানে গিয়ে কুলটা কন্যার কাটা নাক পেয়েছিল মড়ার মুখে!

রাজা সব শুনে রাগে কাঁপতে কাঁপতে পাতকী বসুদত্তার কান দুটোও কচাকচ কেটে নিয়ে দূর করে দিলেন দেশ থেকে।

মোটা টাকার জরিমানা করলেন কুলটার বাবাকে, মেয়েকে সুপথে রাখতে না পাবার জন্যে।

আর, চোরকে কী দিলেন? পুরস্কার। নগরপালের পদ। রাত্রিনিশীথে কোথায় কি কুকর্ম সংগোপনে ঘটে চলেছে, সেসবের এমন বিশদ তথ্য সংগ্রহে অদ্বিতীয় বলে।

পরমাশ্চর্য কাণ্ড ঘটল এর পরেই।

টিয়া আর টিয়ানি যে-যার গল্প সমাপ্ত করার পুরস্কার স্বরূপ শাপ বিমুক্ত হয়ে চলে গেল নিজের নিজের লোকে। টিয়া হয়ে গেল গন্ধর্ব। টিয়ানি হয়ে গেল তিলোত্তমা অপ্সরা।

বেতাল বললে ত্রিবিক্রম রাজাকে, কে বেশি পাপী? নারী, না, পুরুষ? জবাব সঠিক না হলে মস্তক বিদীর্ণ হবে একশো টুকরোয়।

কাঁধে ঝুলন্ত বেতালের হুমকি শুনে একটুও টলে না গিয়ে রাজা বললেন, নারী।

টপ করে রাজার কাঁধ থেকে নেমে পড়ে সাঁৎ করে সরে পড়ল বেতাল।

রাজা বড়ো ঘুঘু! কিছুতেই কবজা করা যাচ্ছে না!

৭৮. চতুর্থ বেতাল

জেদি রাজা ফের চলে গেলেন শিমূল গাছের কাছে। দেখলেন, অট্ট অট্ট হাসি হাসছে সেই মড়া। অর্থাৎ, বেতাল ফের ঢুকেছে তার মধ্যে।

হাসুক, মড়া কাঁধে নিয়ে ফের অগ্রসর হলেন রাজা।

বেতাল বললে, কী আশ্চর্য! একটা বদমাস সন্ন্যাসীর জন্যে কেন এত খেটে মরছেন? যাক গে, শুনুন আর একখানা খাসা গল্প। পথকষ্ট কমবে। যদি সঠিক জবাব না দিতে পারেন, খুলি চৌচির হবে।

সেকালে শূদ্রক নামে এক রাজা বীরবিক্রমে রাজত্ব করতেন শোভাবতী রাজত্বে। যুদ্ধে হারিয়ে অন্য দেশের সুন্দরীদের ধরে এনে তাদের দিয়ে চামর-এর বাতাস খেতেন।

একদিন মালব দেশ থেকে এক ব্রাহ্মণ এলেন তাঁর কাছে। ব্রাহ্মণের নাম বীরবর। তিনি রাজার কাছে চাকরি চান। বীরবরের সঙ্গে ছিল তাঁর বউ, ছেলে আর মেয়ে।

রাজা শূদ্রক দেখলেন, বীরবর ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু অস্ত্রধারী। কোমরে ঝুলছে কৃপাণ, এক হাতে কত্তাল, আর এক হাতে চামড়ার ঢাল।

রাজার কাছে তিনি কর্মপ্রার্থী, দৈনিক পাঁচশো সোনার টাকা বেতনে।

অবাক হয়েছিল রাজা শূদ্রক। চারজনের সংসারে রোজ পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রা কী প্রয়োজন?

কৌতূহল চেপে রেখে রাজা তাঁকে দেউড়িতে মোতায়েন করলেন।

তারপরেই, চর লাগিয়ে খোঁজ নিলেন, রোজ পাঁচশো সোনার টাকা নিয়ে করেন কী ব্রাহ্মণ বীরবর?

গুপ্তচর খোঁজখবর নিয়ে এসে বললে, বীরবর সকালে আপনার সামনে হাজিরা দিয়ে দুপুর পর্যন্ত দেউড়ি পাহারা দেনা। তারপর বাড়ি গিয়ে একদিনের সংসার খরচ একশো স্বর্ণমুদ্রা দেন বউ কে; আর একশো দিয়ে কেনেন পান-তামাক, প্রসাধনী, কাপড়চোপড়; তারপর, স্নান সেরে একশো সোনার টাকা দিয়ে আরাধনা করেন বিষ্ণু আর শঙ্করকে; বাকি থাকে দুশো সোনার টাকা, পুরোটাই দান করে দেন ব্রাহ্মণ আর গরিবদের। তারপর, খেয়েদেয়ে সারারাত জেগে পাহারা দেন সিংহতোরণ, হাতে কৃপাণ নিয়ে।

শুনে, প্রীত হলেন রাজা শূদ্রক। বীরবর প্রকৃতই বীর এবং বিষম দাতা, প্রতিদিন পাঁচশো সোনার টাকা খরচ করা কম কথা নয়, বিশেষ করে শুধু সৎকাজে, পাপকাজে কানাকড়িও ব্যয় করেন না। এমন কর্মচারী পায় কে?

পুরো গ্রীষ্মকালটা নিদারুণ গরম সয়ে এইভাবে রাজকর্ম করে গেলেন বীরবর। তারপর নামলো বর্ষার ধারাবর্ষণ। কিন্তু দেউড়ি পাহারায় ক্ষণেকের বিরতিও দিলেন না বীরবর, আহার আর পুজোর সময়টুকু ছাড়া।

প্রাসাদের ছাদে দাঁড়িয়ে একদিন দিনের বেলা বীরবরকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেঁকে বলেছিলেন রাজা শূদ্রক ঈষৎ কৌতুকের স্বরে, কে আছে সিংহতোরণে?

সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এসেছিল গুরুগম্ভীর বিনয়ক্ষরিত জবাব, আমি আছি—আপনার সেবক বীরবর।

পরের দিনও তুমুল বৃষ্টির মধ্যে গভীর রাতে বীরবরকে সিংহদ্বার রক্ষা করতে দেখে রাজা অবাক হলেন। মনে মনে যখন ভাবছেন, এমন কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষকে অধিকতর সম্মানজনক গুরুদায়িত্ব অর্পণ করবেন কি না, ঠিক এই সময়ে তাঁর কানে ভেসে এল স্ত্রীকণ্ঠের করুণ কান্না।

বিচলিত হলেন রাজা। হেঁকে বললেন বীরবরকে, কে কাঁদে? দেখে এসে বলো।

ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত গ্রাহ্য না করে বীরবর তৎক্ষণাৎ রওনা হয়েছিলেন কান্নার উৎস লক্ষ্য করে, অস্ত্র বাগিয়ে। কৌতূহলী রাজা গেছিলেন পেছন পেছন।

গেছিলেন এক দীঘির পাড়ে। দেখেছিলেন, গলা পর্যন্ত গা ডুবিয়ে কাঁদছে এক সুন্দরী। আর বলছে, হে বীর, তোমাকে ছাড়া আমি থাকব কী করে?

বীরবর জানতে চেয়েছিলেন কার জন্যে এত কান্না।

রমণী বলেছিল, রাজা শূদ্রকের জন্যে। সে যে আমার স্বামী। আর আমি এই পৃথিবী। আজ থেকে ঠিক তিনদিন পরে প্রাণবিয়োগ ঘটবে আমার স্বামীর। তখন আমার কী দশা হবে ভেবে চোখের জল আটকাতে পারছি না।

বীরবর বললেন, আমাকে বলুন কীভাবে তাঁর প্রাণবিয়োগ রোধ করা যায়।

পৃথিবী বললে, উপায় আছে, কিন্তু তা সাধন করা বড় কঠিন।

বীরবর বললেন, যত দুঃসাধ্য হোক, আমার অসাধ্য কিছু নেই।

পৃথিবী বললে, দেবী চণ্ডিকার সামনে নরবলি দিতে হবে, তোমার ছেলেকে। নইলে, তিনদিন পরে মরবেন রাজা।

বীরবল বললেন, তাই হবে।

শূন্যে মিলিয়ে গেল পৃথিবী দেবী। বীরবর চললেন নিজের বাড়ির দিকে, পেছনে রাজা।

বাড়ি গিয়ে বউকে ঘুম থেকে তুলে বীরবর বললেন পৃথিবী দেবীর নির্দেশ। সব শুনে নিজের ছেলেকে বলি দিতে কুণ্ঠিত হল না স্ত্রী। ছেলেকে তোলা হল ঘুম থেকে। সানন্দে সে প্রস্তুত হল খাঁড়ার কোপে প্রাণ দেওয়ার জন্যে। মেয়েকে কোলে নিয়ে, ছেলের হাত ধরে, চণ্ডিকা দেবীর সামনে হাজির হলো বীরবর-বধূ। পাশে বীরবর। অনেক পেছনে রাজা শূদ্রক। এরকম কাণ্ড তিনি যে জীবনে দেখেননি, শোনেননি।

খাঁড়ার এককোপে ছেলে ছিন্নমুণ্ড হতেই কোলের মেয়ে কেঁদে উঠে প্রাণ হারাল তৎক্ষণাৎ। তাদের মা বললে, ছেলেমেয়ে নিয়ে এবার আমি জীবন্ত চিতায় পুড়বো। সঙ্গে সঙ্গে চিতা সাজিয়ে দিলেন বীরবর। জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ দিল স্ত্রী, মরা ছেলেমেয়েকে কোলে নিয়ে। বীরবর নিজেও আর স্থির থাকতে না পেরে নিজেই নিজের মাথা কেটে ফেললেন কৃপাণ-কোপে।

স্তম্ভিত রাজা আর সইতে পারলেন না। দেবী চণ্ডিকাকে বললেন, এরা আমার কেউ নয়। কিন্তু সপরিবারে প্রাণ দিল আমার আয়ু রক্ষার জন্যে। দেবী, আমার প্রাণ নিন, বিনিময়ে এদের প্রাণ দিন।

বলে, কৃপাণ তুলে নিজের গলা কাটতে গেলেন। অমনি শোনা গেল দৈববাণী, নিরস্ত হস্ত। বীরবর সপরিবারে বেঁচে উঠবে।

তৎক্ষণাৎ যেন ঘুম ভেঙে গেল বীরবর আর তাঁর পরিবারের সকলের। ততক্ষণে দূরে সরে গেছেন রাজা শূদ্রক। দূর থেকেই চার পুনর্জীবিতকে অনুসরণ করে দেখলেন, বউ-ছেলে-মেয়েকে বাড়িতে রেখে এসে ফের সিংহদ্বারে কর্তব্যে মোতায়েন হয়ে গেলেন বীরবর।

বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে সকালেই রাজসভায় বসে মন্ত্রীদের ডেকে সব কথা বললেন রাজা।

সর্বসম্মতিক্রমে নিঃস্বার্থ মহৎপ্রাণ বীরবরকে দিলেন নিজের রাজত্বের অর্ধেক, বাকি অর্ধেক রাখলেন নিজের জন্যে।

বেতাল বললে, বলুন রাজা, এঁদের মধ্যে কে বেশি মহৎ।

রাজা বললেন, রাজা শূদ্রক।

বেতাল বললেন, বীরবর নয় কেন? তার বউ? তার ছেলে?

রাজা বললেন, বীরবর নিছক কর্তব্য করেছে, বউ-ছেলের প্রাণের বিনিময়ে রাজার দীর্ঘ আয়ু চেয়েছে, সেটা তার কর্তব্য। বীরবরের বউ সতীসাধ্বীর কাজ করেছে, রাজার যা করা কর্তব্য। বীরবরের ছেলে পিতার কথা রক্ষে করেছে, ছেলের যা কর্তব্য। মেয়ে একই ধাতু দিয়ে তৈরি বলে প্রাণ হারিয়েছে। রাজা বেতন দিয়েছেন, বেতনভুক কর্মচারীর নিষ্ঠা তারা দেখিয়েছে। এর মধ্যে মহত্ত্ব কিছু নেই। মহত্ত্ব আছে বটে রাজা শূদ্রকের। তিনি দৈনিক পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছেন, প্রত্যাশার অধিক তো কিছু পাননি। তা সত্ত্বেও, দিয়ে দিলেন অর্ধেক রাজত্ব। প্রকৃত মহৎ তো তিনিই।

শুনেই, ঘাড় থেকে নিমেষে নেমে উধাও হয়ে গেল বেতাল।

হাল ছাড়বার পাত্র নন রাজা ত্রিবিক্রম সেন। নক্ষত্রবেগে রওনা হলেন শিমূল গাছ অভিমুখে।

৭৯. পঞ্চম বেতাল

গিয়ে দেখলেন, মড়া ঝুলছে আগের মতোই গাছের ডাল থেকে। নামিয়ে এনে, ঘাড়ে চাপিয়ে, ফের হনহন করে হাঁটতে শুরু করলেন।

বেতাল বললে, আপনার মেহনত দেখে আর একটা গল্প শোনাতে ইচ্ছে করছে। ধাঁধার জবাব যদি সঠিক না হয়, মাথা ফেটে যাবে একশো টুকরোয়।

সেকালের কথা। উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন পুষ্পসেন। তাঁর ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর নাম ছিল হরিস্বামী। অনেক গুণের অধিকারী। এঁর ছিল এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলের নাম দেবস্বামী। মেয়ের নাম সোমপ্রভা। ভুবনমোহিনী সুন্দরী। কাহিনি এই কন্যাকে নিয়ে।

কেননা, বিয়ের বয়স হতেই সে বললে বাবা আর মা-কে, বীর অথবা জ্ঞানী অথবা বিজ্ঞানী, এঁদের ছাড়া কাউকে বিয়ে করব না।

শুরু হলো সেই রকম পাত্র অন্বেষণ।

এই সময়ে রাজা পুষ্পসেন মন্ত্রী হরিস্বামীকে দাক্ষিণাত্যে পাঠালেন সেখানকার রাজার সঙ্গে যুদ্ধের বদলে সন্ধি করার জন্যে। সেই কাজ শেষ করে হরিস্বামী যখন দেশে ফিরছেন, পরিচয় ঘটল এক ব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে।

সেই যুবক জামাই হতে চাইল মন্ত্রীর।

মন্ত্রী বললেন, কিন্তু আমার মেয়ে যে পণ করেছে জ্ঞানী, বিজ্ঞানী অথবা বীর ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না।

যুবক বললে, আমি বিজ্ঞানী।

বলেই, দেখিয়ে দিল তার বিজ্ঞানের ক্ষমতা। বৈজ্ঞানিক মন্ত্রবলে বানিয়ে দিল এক উড়ুক্কু রথ। সেই রথে মন্ত্রীকে চাপিয়ে ঘুরিয়ে আনল স্বর্গ ছাড়াও অন্যান্য দেবলোক।

স্তম্ভিত মন্ত্রী কথা দিলেন, ঠিক সাতদিন পরে তাকে জামাই করবেন।

ইতিমধ্যে উজ্জয়িনীতে কন্যার ভাইয়ের কাছে এক ব্রাহ্মণী পাত্র এসে ভগ্নিপতি হতে চেয়েছিল এবং হাতেনাতে দেখিয়ে দিয়েছিল সে প্রকৃতই মহাবীর, বিবিধ অস্ত্র তার হাতে যেন জাদুসৃষ্টি করে যায়। ভাই কথা দিয়েছিল, ঠিক সাতদিন পরে তাকেই ভগ্নিপতি করা হবে।

একই সময়ে আর এক ব্রাহ্মণ পাত্র কন্যার মায়ের কাছে এসে দেখিয়ে দিয়েছিল তার অসাধারণ জ্ঞানের নমুনা। পাত্রীর দৈহিক রেখা দেখে বলে দিয়েছিল তার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। চমৎকৃত মা কথা দিয়েছিলেন, এমন জ্ঞানী পাত্রকেই জামাই করবেন কী সাতদিন পরে।

বাড়ি ফিরেই ফ্যাসাদে পড়লেন মন্ত্রী হরিস্বামী। একই দিনে তিন যোগ্য পাত্র হাজির জামাই হওয়ার মানসে। তিন বর, এক কন্যা। করেন কী কন্যার পিতা?

সমস্যার ওপর সমস্যা সৃষ্টি করে ঠিক এই সময়ে বিয়ের কনে হাওয়া হয়ে গেল বাড়ি ছেড়ে। মন্ত্রীর মাথায় তখন বজ্রাঘাত!

বিচলিত হয়ে তিনি জ্ঞানী বরকে বললেন, বাবাজী, তুমি তো অদ্ভুত অদ্ভুত জ্ঞানের অধিকারী। বলো দেখি, কোথায় গেল আমার কন্যা রত্ন?

জ্ঞানী বর তিলমাত্র বিলম্ব না করে বললে, ধূমশিখ অপহরণ করেছে তাকে। রেখেছে নিজের বাড়িতে। বিন্ধ্য অরণ্যে।

ধূমশিখ কে?

কে রাক্ষস।

কিভাবে ফিরে পাব কন্যাকে?

চলুন আমার সঙ্গে, বলেই, নিমেষ মধ্যে বৈজ্ঞানিক মন্ত্রবলে এক কলকবজার রথ বানিয়ে, মন্ত্রী আর প্রতিদ্বন্দ্বী দুই বরকে তাতে উঠিয়ে, আকাশ পথে হাজির হল বিন্ধ্যের জঙ্গলে, রাক্ষস ধূমশিখের কেল্লাবাড়িতে।

ধূমশিখ নিজেই বেরিয়ে এল লড়বে বলে। কিন্তু নিহত হল পলকের মধ্যে, অস্ত্রজ্ঞানী বরের অর্ধচন্দ্র বাণে, মুণ্ড ছিটকে গেল ধর থেকে।

বিয়ের কনেকে নিয়ে সবাই হৈহৈ করে ফিরে এল বটে বিয়ের আসরে, কিন্তু ধুন্ধুমার কাণ্ড লেগে গেল তারপরেই তিন বরের মধ্যে। কে বিয়ে করবে সোমপ্রভাকে?

জ্ঞানী বর বললে, কি মুশকিল! আমি যদি বলে না দিতাম কনে কোথায়, তাহলে কি কনে উদ্ধার করা যেত?

অস্ত্রবীর বর বললে, আর আমি যদি ধূমশিখকে যমালয়ে না পাঠাতাম, তাহলে কি কনে পাওয়া যেত?

বিজ্ঞানী বর বললে, আশ্চর্য ব্যাপার তো! আমি যদি পলকের মধ্যে আকাশযান বানিয়ে ঝটিতি সেখানে সবাইকে না নিয়ে যেতাম, কনে তো এতক্ষণে ধূমশিখের বউ হয়ে যেত!

বুদ্ধিমান বিচক্ষণ মন্ত্রীর মাথা ঘুরে গেল তিন বরের যুক্তিতে। কন্যা সম্প্রদান করবেন কাকে? অকাট্য যুক্তি তিনজনেরই।

বেতাল বললে, রাজা ত্রিবিক্রম সেন, সঠিক সমাধান কী হওয়া উচিত? উত্তর যদি নির্ভুল না হয়, খুলি হবে চৌচির।

নির্ভয়ে নির্ভুল জবাব দিলেন রাজা, ধূমশিখকে যে খতম করেছে, সঠিক বর সে। রাক্ষস না মরলে পণ্ড হত বিয়ের আসর। জ্ঞানী আর বিজ্ঞানী শুধু তাদের কর্তব্য করেছে, উপকার করেছে, কিন্তু বিয়ের কনেকে তো ফিরিয়ে আনেনি। সুতরাং বাঞ্ছিত বর সে একা—আর কেউ নয়।

এক্কেবারে নির্ভুল উত্তর পেয়ে ঢ্যাটা বেতাল চক্ষের নিমেষে ফিরে গেল শিমূল গাছে, অক্ষত মস্তক নিয়ে জেদী রাজাও বায়ুবেগে চললেন সেদিকে।

৮০. ষষ্ঠ বেতাল

গাছ থেকে সম্বমান বেতালকে নামিয়ে কাঁধে চাপিয়ে যখন ফের ছুটছেন রাজা, বেতাল বললে, অহো! অহো! কি বীরত্ব! বড়ই প্রীত হলাম, রাজা। শুনুন তাহলে আর একখানা উপাখ্যান—ক্লান্তির অপনোদনের জন্যে। কিন্তু মস্তক শত টুকরো হবে সঠিক জবাব না পেলে।

যশোকেতু ছিলেন শোভাবতী নগরের নৃপতি, অনেক.....অনেক বছর আগে। নগরে ছিল অপরূপ এক গৌরী দেবালয়। মন্দিরের দক্ষিণে যে দীঘি, তার নাম গৌরীতীর্থ। প্রতি বছর আষাঢ় মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে পুণ্যার্থীরা আসতেন সেখানে। একবার এল ধবল নামে এক যুবক ধোপা। তার নিবাস ব্রহ্মস্থল নামক গ্রামে।

আর এক ধোপার মেয়ে ঠিক ওই সময়ে স্নানে নেমেছিল দীঘিতে। তার নাম মদনসুন্দরী। তার বাবার নাম শুদ্ধপট।

মদনসুন্দরী দর্শনে কামানলে জ্বলতে জ্বলতে বাড়ি ফিরে গিয়ে খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিল ধবল ধোপা।

শুধু মাকে বললে, মদনসুন্দরীকে বিয়ের ইচ্ছে।

বাবার কানে কথাটা যেতেই সে বললে, কী আশ্চর্য! শুদ্ধপট তো আমার বন্ধু। পালটি ঘর। এ বিয়ে হবেই।

বিয়ে হয়ে গেল পরের দিনেই। বর-বউ ফিরল বাড়িতে। দিন কয়েক পরেই এল মদন সুন্দরীর ভাই। বাড়িতে দেবীপুজো হচ্ছে। বোন আর বোনের বরকে নিয়ে যেতে এসেছে।

খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। নতুন বিয়ের পর মেয়েকে তো একবার বাপের বাড়ি যেতেই হবে, স্বামীসহ। সুতরাং, ভাই আর বরকে নিয়ে মদনসুন্দরী রওনা হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

শোভাবতী নগরে পৌঁছে গৌরী দেবালয়ে দেবীদর্শন করবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল ধবল। নিষেধ করেছিল শ্যালক। খালি হাতে দেবীদর্শন করতে নেই।

কিন্তু নিষেধ শোনেনি ধবল এই গৌরীদেবীর বিগ্রহ যে দেখবার মতো। তিনি বসে আছেন মোষের পিঠে, আঠারোখানা হাত ছড়িয়ে। ভক্তিভরে প্রণাম করবার পর ঐশী প্রভাব জাগ্রত হয়েছিল ধবল ধোপার অনুপরমাণুতে। শ্যালক বলেছিল, রিক্ত হাতে দেবী দর্শন করতে নেই। পাপ হয়। কিন্তু সে তো খালি হাতে প্রণাম সেরেছে। এখন তো কিছু অর্পণ করা প্রয়োজন দেবী চরণে। কী দেওয়া যায়? অকস্মাৎ প্রবল ঝোঁক চেপেছিল ধবলের মাথায়। মাথাটাই অর্পণ করা যাক দেবীকে।

ভয়ানক কাণ্ডটা ঘটে গেল তৎক্ষণাৎ। ঝুলন্ত ঘন্টায় ধবল বেঁধে নিল নিজের মাথার লম্বা চুল। তারপর, দেবীর হাত থেকে খাঁড়া তুলে নিয়ে এক কোপে কেটে ফেলল নিজের মুণ্ড।

এদিকে বাইরে বোনকে নিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর শ্যালক ঢুকেছিল মন্দিরে। মেঝেতে ধবলের কবন্ধ দেহ আর ঘন্টায় ঝুলন্ত কাটা মুণ্ড দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর, রক্তমাখা খাঁড়া তুলে নিয়ে ছিন্নমস্তক করল নিজেকে।

অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবার পর নিস্তব্ধ মন্দিরের মধ্যে কী কাণ্ড চলছে দেখবার জন্যে মদনসুন্দরী ঢুকেছিল ভেতরে। মাথা ঘুরে পড়ে গেছিল থই থই রক্ত আর দু-দুটো কবন্ধ দেহ দেখে। একটা মুণ্ড ঝুলছে ঘন্টায়, আর একটা মুণ্ড গড়াচ্ছে মেঝেতে।

তারপর, দেবীর হাত থেকে খাঁড়া তুলে নিয়ে এক কোপে কেটে ফেলল নিজের মুণ্ড।

একটু পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মনস্থির করে ফেলেছিল সাধ্বী মেয়ে মদনসুন্দরী। খাঁড়া নিয়ে কাটতে গেছিল নিজের মুণ্ড।

দৈববাণী হয়েছিল তৎক্ষণাৎ, কন্যা, তুমি অনন্যা। ফিরে পাবে স্বামীকে, ভাইকে, মুণ্ড দুটো তুলে নিয়ে কাটা কাঁধে বসিয়ে দাও, বেঁচে উঠবে দুজনেই।

দেবীর বরাভয় শুনে একটু হুটোপাটি করে ফেলেছিল মদনসুন্দরী। ফলে, স্বামীর মুণ্ড বসাল ভাইয়ের কাটা ঘাড়ে, আর ভাইয়ের কাটামুণ্ড বসাল স্বামীর ঘাড়ে।

দুজনেই আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল তৎক্ষণাৎ।

সমস্যাটা দেখা দিল তার পরেই!

মদনসুন্দরীর প্রকৃত বর হবে এখন কে?

তিলমাত্র দ্বিধা না করে বললেন রাজা ত্রিবিক্রম সেন, স্বামীর মুণ্ড যার ঘাড়ে, সে।

কী যুক্তিতে? কী যুক্তিতে? সরব হয়েছিল কুচক্রী বেতাল।

কারণ, বলেছিলেন রাজা, মগজই প্রধান শরীরের মধ্যে। মগজ যার, শরীর তার। সুতরাং, স্বামীর মুণ্ড আর ভাইয়ের শরীর, এই নিয়েই রমণীর ধর্ম রমণকর্ম করে যেতে হবে মদনসুন্দরীকে।"

মোক্ষম জবাব পেয়েই তেএঁটে বেতাল তৎক্ষণাৎ চম্পট দিল রাজার কাঁধ থেকে।

একবগ্গা রাজাও পবনবেগে ধাবিত হলেন তাকে ফিরিয়ে আনতে।

৮১. সপ্তম বেতাল

বদমাস বেতাল ঠিক আগের মতোই ঝুলছিল শিমূল গাছের ডালে। রাজা তাকে টেনে নামিয়ে, ঘাড়ে চাপিয়ে রওনা হতেই মধুর বচনে বেতাল বললে, আহা! কি কষ্টই না করছেন! শ্রমের লাঘব ঘটাচ্ছি আর একখানা গল্প শুনিয়ে কিন্তু মনে থাকে যেন আমার অভিশাপটা, জবাব সঠিক না হলেই মস্তক হবে শতধা চূর্ণ!

চণ্ডসেন ছিলেন তাম্রলিপ্ত নগরের রাজা। একদিন দাক্ষিণাত্য থেকে এক গরিব রাজপুত্র এল তাঁর কাছে, ছেঁড়া কাপড় পরে। রাজা তাকে আশ্রয় দিলেন বটে, কিন্তু কৃপা করা তো দূরের কথা, ঘুরেও কোনও দিন তার মুখদর্শন করতেন না। মনে কষ্ট পেত রাজপুত্র, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করত না।

রাজপুত্রের নাম সত্ত্বশীল।

একদিন মৃগয়া অভিযানে বেরোলেন রাজা, ঘোড়ায় চেপে, সৈন্যসামন্ত নিয়ে। সত্ত্বশীল চলল পায়ে হেঁটে, সবার পেছনে। ছেঁড়া কাপড় পরে।

রাজা ধাওয়া করলেন এক বুনো শুয়োরকে। শুয়োর চম্পট দিল গহন জঙ্গলে। রাজা পথ হারালেন, দিশে হারালেন, সৈন্যসামন্ত কোনদিকে, তা ঠাহর করতে পারলেন না।

এমন সময়ে সত্ত্বশীল পথ খুঁজে নিয়ে এসে পৌঁছোল তাঁর কাছে।

অবাক রাজা বললেন, এই জঙ্গল থেকে বেরোনোর পথ জানো?

সত্ত্বশীল বললে, জানি।

রাজা বললেন, তেষ্টা পেয়েছে। জল আনতে পারবে?

খুব উঁচু একটা গাছে উঠে গেল সত্ত্বশীল নদী কোথায় আছে দেখে নিয়ে নেমে এল। রাজাকে নিয়ে গেল নদীর ধারে। রাজা স্নান করতে জলে নামতেই রাজার ঘোড়ার গা মেজেঘষে তাকে চাঙা করে দিল সত্ত্বশীল, বন থেকে দুটো আমলকি ফল নিয়ে এল। জল থেকে রাজা উঠতেই তাঁর হাতে তুলে দিল।

রাজা যখন আহার করছেন, সত্ত্বশীল তখন তাঁর ঘোড়ায় সাজ পরাচ্ছে। আহার শেষ হতেই ঘোড়া নিয়ে এল তাঁর সামনে। রাজাকে ঘোড়ায় চাপিয়ে নিজে হেঁটে চলল পেছন পেছন। সৈন্যদের খুঁজে পেয়ে, তাদের নিয়ে প্রাসাদে ফিরলেন রাজা। বিস্তর পুরস্কার দিলেন সত্ত্বশীলকে।

কিছুদিন পর রাজার ইচ্ছে হল সিংহল রাজার মেয়েকে বিয়ে করবেন। প্রস্তাব পাঠালেন সত্ত্বশীল মারফত। সমুদ্রপথে রওনা হল সত্ত্বশীল। অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল গভীর সমুদ্রে জাহাজ পৌঁছোতেই।

একটা সোনার থাম উঠে এল জলের ভেতর থেকে। নানা বর্ণের পতাকা উড়ছে থামের গায়ে। সে এক বিচিত্র দৃশ্য। ভয়াবহ ঝড় উঠল ঠিক সেই সময়ে। মেঘে ঢেকে গেল আকাশ। শুরু হল তুমুল বৃষ্টি।

এদিকে, সোনার থাম উঁচু হতে হতে ঠেকল আকাশে জাহাজও আছড়ে পড়ল থামের গায়ে। ডুবে গেল তৎক্ষণাৎ। কৃপাণ বাগিয়ে জলে ঝাঁপ দিল সত্ত্বশীল।

জলের তলায় দেখল সোনা আর দামি দামি রত্ন দিয়ে গড়া এক অত্যাশ্চর্য প্রাসাদ। সাগরের চিহ্নমাত্র সেখানে নেই! প্রাসাদের সামনে বাগানের মধ্যে খুব উঁচু একটা গৌরী মন্দির।

দেবীকে প্রণাম করে চুপচাপ বসে ভাবতে লাগল সত্ত্বশীল, একি স্বপ্ন, না, ভোজবাজি?

এমন সময়ে দেবীর জ্যোতিপ্রভা থেকে বেরিয়ে এল একদল সুন্দরী। দলনেত্রীকে দেখে ভালোবেসে ফেলল সত্ত্বশীল। মুচকি হেসে সেই পরমা সুন্দরী সহচরীদের ইশারা করতেই তারা হইচই করে সত্ত্বশীলকে নিয়ে গেল অন্দরমহলে। সত্ত্বশীল মেঝেতে বসে কামুক চোখে চেয়ে রইল পালঙ্কে বসা পরমাসুন্দরীর দিকে। তাই দেখে, অপাঙ্গ চাহনি হেনে হাসি গোপন করে, সুন্দরী সহচরীদের ইশারা করতেই তারা সত্ত্বশীলকে নিয়ে গেল বাগানে।

বললে, অতিথি, দীঘির জলে পরিষ্কার হয়ে নাও। তারপর পরমাসুন্দরী বসবে তোমার কোলে।

জলে ডুব দিয়েছিল সত্ত্বশীল। মাথা তুলে দেখেছিল। ফিরে এসেছে তাম্রলিপ্ত নগরে, রাজ-দীঘিতে স্নান করছে!

বুঝল পাতালকন্যার ছলনা। ললনার ধর্ম ললনা করেছে, কিন্তু পাগল হয়ে গেল সত্ত্বশীল।

উন্মাদ সত্ত্বশীলকে আনা হল রাজার সামনে।

রাজা সব শুনলেন, তারপর একদিন তাকে নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করলেন, সোনার থামের সন্ধানে, পাতাল সুন্দরীর অন্বেষণে।

গভীর সমুদ্রে জাহাজ পৌঁছোতেই আবার ঘটে গেল সেই অবাক কাণ্ড। জল থেকে উঠে এল মণিময় সোনার থাম।

সত্ত্বশীল বললে রাজাকে, আমি ঝাঁপ দেব জলে, আপনিও দেবেন।

পরপর দুজনে সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে দেখল জলতলের সেই বিচিত্র প্রাসাদ, সোনা আর হিরেজহরত দিয়ে তৈরি। অবাক রাজা সশীলকে নিয়ে বসলেন গৌরী মন্দিরে। দেখলেন, দেবীর প্রভা থেকে বেরিয়ে এল একদল অনিন্দ্যসুন্দরী ললনা, তাদের শিরোমণি স্বরূপ কন্যা এত রূপসী যে চোখ যেন ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

রাজা চণ্ডসেনকে দেখেরূপসী কিন্তু মজেছিল। দেবীপূজা শুরু করতেই রাজা গিয়ে বসলেন বাইরের বাগানে—সত্ত্বশীলকে নিয়ে। একটু পরেই সেই অপরূপার এক সখী এসে বললে রাজাকে, চলুন অন্দর মহলে, আপনি যে আমাদের অতিথি।

তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বললেন রাজা চণ্ডসেন, কোনও প্রয়োজন নেই। এখানেই বেশ আছি।

সখীমুখে সেই বৃত্তান্ত শুনে গরবিণী রূপসী বুঝে নিয়েছিল এই রাজা পুরুষ শ্রেষ্ঠ, কামিনী কাঞ্চন তাঁর চোখে আর মনে ধাঁধা সৃষ্টি করে না। তাই নিজেই এল রাজার কাছে। সবিনয়ে আহ্বান জানাল অন্দর মহলে, অতিথি হওয়ার জন্যে।

প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়ে অবজ্ঞা দেখিয়ে বললেন রাজা, আমার এই বন্ধু সত্ত্বশীলের মুখে তোমার মায়া-প্রপঞ্চ বৃত্তান্ত শুনে স্বচক্ষে দেখতে এসেছিলাম। তাকে পাগল বানিয়েছ। আমাকে পারবে না, সরে পড়ো।

নাছোড়বান্দা অনিন্দ্য কামিনী বললে অসামান্য কটাক্ষ হেনে, তাহলে দেখে যান আমার আর একখানা অতুলনীয় কাঞ্চনপুরী। স্বর্গ মর্ত্য পাতালে যার জুড়ি নেই।

ব্যঙ্গভরে রাজা বললেন, যেখানে আছে তোমার জাদুদীঘি?

সরমে মরমে মরে গিয়ে বললে মায়াবিনী কন্যা, আর লজ্জা দেবেন না। আপনাকে নিয়ে কুহক, খেলা খেলব না, পার পাবো না। আসুন। আমাকে কৃতার্থ করুন।

চণ্ডসেনের চাবুক কথায় ওষুধ ধরেছে! সত্ত্বশীলকে নিয়ে তাই পরমা কন্যার দ্বিতীয় পুরীতে গেলেন রাজা। দেখলেন সেই কুহক-সরোবর, যার জলে ডুব দিলে আর রক্ষে নেই। দীঘির পাশে যে রত্নপুরী, প্রকৃতই তা ত্রিভুবনে অদ্বিতীয়।

রত্নখচিত সিংহাসনে রাজাকে বসিয়ে পরমাসুন্দরী আগে তাঁর পা ধুইয়ে বন্দনা সেরে নিল। তারপর দিল আত্মপরিচয়।

বললে, আমি কালমেয়ে দৈত্যের মেয়ে। তিনি মরেছেন বিষ্ণুর রোষে। এই যে দুটি প্রাসাদ দেখছেন, এদের নির্মাতা স্বয়ং বিশ্বকর্মা। এখানে কেউ অসুখে ভোগে না, কেউ বৃদ্ধ হয় না, কেউ মরে না। আপনি এখানে থাকুন, আমার বাবার প্রাসাদে, আমার অভিভাবক হয়ে।''

রাজা চণ্ডসেন মোক্ষম চাল দিলেন তৎক্ষণাৎ, তোমার অভিভাবক আমি? বেশ, বেশ, তাহলে বিয়ে করো আমার অনুগত পরম বন্ধু এই সত্ত্বশীলকে।

বিয়ে হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

তারপর রাজা বললেন সত্ত্বশীলকে, খিধের সময়ে খাইয়েছিলে দুটো আমলকি। ঋণ শোধ হল একটার। ঋণী রইলাম আর একটার জন্যে।

সত্ত্বশীলের নতুন বউকে বললেন, আমার রাজ্যে ফিরব, পথ দেখাও।

কুহকিনী দৈত্যকন্যা তখন দুটো বস্তু উপহার দিল রাজাকে। আশ্চর্য একটা ফল, যা খেলে বার্ধক্য আসবে না, মৃত্যু আসবে না। আর একটা কৃপাণ যা শত্রুহননে অদ্বিতীয়।

বস্তু দুটি নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে সব বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করে জগৎ প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন রাজা চণ্ডসেন।

সুখী হয়েছিল সত্ত্বশীল অপরূপা দৈত্যকন্যাকে নিয়ে।

কাহিনি সমাপনান্তে বললে ধড়িবাজ বেতাল, সঠিক উত্তর দিন, রাজা, নইলে মস্তক হবে বিদীর্ণ : কে বেশি সাত্ত্বিক? রাজা, না, সত্ত্বশীল?

সপেটা জবাব দিলেন রাজা ত্রিবিক্রমসেন, সত্ত্বশীল।

কেন? কেন? কেন?

কারণ, সত্ত্বশীল তো সবার আগে প্রাণের মায়া ছেড়ে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল। কিন্তু রাজা তো সব জেনেশুনেই জলে ডুব দিয়েছিলেন।

দৈত্যকন্যা যেচে বউ হতে চাইল, কিন্তু নিজে বিয়ে না করে সত্ত্বশীলের সঙ্গে বিয়ে তো দিলেন কত বড় উদার, উনি, তাই না?

উদার মোটেই নন। চতুর আর দূরদর্শী। দৈত্যকন্যা পাছে নতুন কুহক মায়ায় তাঁকে বেধে ফেলে, এই ভয়ে তিনি সরে পড়েছিলেন।

মোক্ষম জবাব শুনেই নিমেষ মধ্যে চম্পট দিল বেতাল।

রাজা ধাওয়া কললেন অসীম মনোবলে।

কাজ শেষ না করে কুঁড়েমিকে প্রশ্রয় দেয় না বুদ্ধিমান পুরুষ, রাজা ত্রিবিক্রমসেন তা বারংবার দেখিয়ে গেলেন।

৮২. অষ্টম বেতাল

শিমূল গাছে লম্বমান দানোয় পাওয়া মড়াকে নিয়ে ফের হনহনিয়ে যখন চলেছেন রাজা ত্রিবিক্রমসেন, বেতাল বললে, অহো! অহো! সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা যখন দেখিয়ে যাচ্ছেন, তখন শোনাই আর একটা আশ্চর্য গল্প। পথশ্রম কমবে। কিন্তু গল্পের শেষে ধাঁধার জবাব না দিতে পারলে দড়াম করে ফাটবে খুলি, একশোটা টুকরো যাবে ঠিকরে!

বৃক্ষঘট নামে একটা গ্রাম আছে। বিজ্ঞ আর বিত্তবান ব্রাহ্মণ বিষ্ণুস্বামীর নিবাস ছিল সেখানে। তাঁর তিন ছেলেই বিলক্ষণ বুদ্ধিমান। কিন্তু তিনজনে তিন রকম বিলাসী। একজন ভোজনবিলাসী, আর একজন নারীবিলাসী, তৃতীয় জন শয্যাবিলাসী।

একদিন ব্রাহ্মণ বিষ্ণুস্বামী যজ্ঞ শুরু করে তিন ছেলেকে বললেন, যাও, একটা কচ্ছপ নিয়ে এস। যজ্ঞে দরকার।

কচ্ছপ তো পাওয়া গেল, কিন্তু ভোজনবিলাসী ভাই কচ্ছপ বইতে চাইল না। কারণ, সে যে খাদ্যনিপুণ বলেই বিখ্যাত। অখাদ্য এই কচ্ছপ বহন করা তার কর্ম নয়। নারীনিপুণ ভাই বললে, কী মুশকিল! রমণী বিষয়ে সৌখীন আমি, কচ্ছপ বওয়া আমার কর্ম নয়। ভোজননিপুণ ভাই সবেগে মস্তকচালনা করে বললে, অসম্ভব! অসম্ভব! আমি হলাম বিছানানিপুণ। আমি বইব কচ্ছপ? আমার মতো সৌখীন পুরুষের কাজ এটা নয়।

ঝগড়া মেটাতে তিন ভাই গেল রাজদরবারে। রাজা আবার বিচার বিষয়ে বড়োই নিপুণ। তিনি খাদ্যনিপুণকে চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় খেতে দিলেন। কিন্তু সে নাক টিপে উঠে পড়ল। কেন? কেন? কেন? কী দোষ আছে এমন খাসা খাসা খাদ্যে?

ঘেন্নায়, নাক সিঁটিয়ে ভোজনবিলাসী বললে, ভাত! ভাত! ভাত থেকে শ্মশানের দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে! মড়াপোড়ার গন্ধ!

ভাতে শ্মশানের দুর্গন্ধ! মড়াপোড়ার বিটকেল গন্ধ। বলে কী ভোজনবিলাসী?

বিচারনিপুণ রাজার কিন্তু খটকা লেগেছিল। তিনি লোক লাগিয়ে চালের দোকানে আর আড়তে খোঁজ নিয়ে জানলেন, সত্যিই তো এ চাল যে খেত থেকে এসেছে, তার পাশেই আছে শ্মশান। মড়াপোড়ার বিটকেল গন্ধে ধানগাছ বড়ো হয়েছে, চালে সেঁধিয়েছে সেই বিশ্রী গন্ধ?

সুতরাং, খাদ্যবিলাসের পরীক্ষায় উতরে গেল এক ভাই। এবার নারীবিলাসীর পালা।

তার ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল এমন এক ভুবনমোহিনী নগরবধূকে যার গায়ে ভুর ভুর করছে কস্তুরি অগুরু কর্পূর চন্দনের সুরভি। নারীবিলাসী কিন্তু দু-আঙুলে নাক টিপে কঁকিয়ে উঠল তাকে দেখেই। কেন? কেন? কেন?

কেন আবার! এ মেয়ের গা থেকে যে উৎকট বিকট ছাগলের গন্ধ বেরোচ্ছে!

এতগুলো সুগন্ধি মেখে যে সুন্দরী এসেছে সুখ দিতে, তার গায়ে ছাগলের গন্ধ!

ভুরুটুরু কুঁচকে খোঁজ নিলেন বিশুদ্ধ বিচারক রাজামশায়। এবং তাজ্জব হয়ে গেলেন।

কেননা, এই যে রমণী, সে কিনা রূপে তিলোত্তমা সমান তো বটেই, শ্রীঅঙ্গের সুগন্ধি লেপণে যে অদ্বিতীয়া, সেই নারী মায়ের দুধ খেতে পায়নি অল্প বয়েসেই মা মারা যাওয়ায়, খেয়েছে ছাগীর দুধ! তাই তার রোমকূপে রোমকূপে বিধৃত রয়েছে এমনই এক অতিসূক্ষ্ম ছাগ-গন্ধ যা টাটিয়ে দিয়েছে নারীনিপুণের নাসিকারন্ধ্রকে! ধন্য ধন্য পড়ে গেল নারীনিপুণ ব্রাহ্মণ তনয়ের সৌখিনতা দেখে!

এইবার পালা এল সেই ব্রাহ্মণ পুত্রের যে কিনা অতিশয় শয্যানিপুণ বলে নাম কিনেছে।

সুবিবেচক রাজামশায় তাকে এমন একটা শয্যায় শুতে দিলেন যেখানে পর পর সাতখানা অতি-কোমল গদি পাতা হয়েছে।

শয্যাবিলাসী ব্রাহ্মণ তনয় কিন্তু তার ওপর একবার গড়িয়ে নিয়েই তড়াক করে নেমে এসে চেঁচিয়ে উঠল তিরিক্ষে গলায়, জ্বলে গেল! জ্বেলে গেল! চামড়া আমার জ্বলে গেল!

দেখা গেল সেই আশ্চর্য ব্যাপার। ব্রাহ্মণ পুত্রের নরম গায়ে পরিষ্কার ফুটে রয়েছে এঁকাবেঁকা রক্তরেখা!

তক্ষুণি তুলে ফেলা হল একটার পর একটা গদি। সব নীচের গদির তলায় দেখা গেল এঁকে বেঁকে পড়ে রয়েছে এক গাছি চুল!

সাত-সাতটা গদি ভেদ করে সেই চুল রক্তছাপ মেরে গেছে শয্যাসুখী ব্রাহ্মণ বেটার চামড়ায়!

চমৎকৃত রাজা তিন বিলাসীর তিন নৈপুণ্যের প্রমাণ পেয়ে, যা কিনা অলৌকিক ক্ষমতা বললেই চলে, তিনজনের প্রত্যেককে পারিতোষিক দিলেন।

এক লাখ করে সোনার টাকা।

আর, তিন গুণীকে ঠাঁই দিলেন রাজবাড়িতে। তাঁর কাছে যে এরা মানুষরূপী রত্ন।

তোফা কাহিনি শেষ করে বেতাল বললে, ওহে রাজা, এবার পরখ হোক তোমার বিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধির। বলো দেখি, তিন বিলাসীর মধ্যে সেরা বিলাসী কে?

চটপট জবাব দিলেন তুখোড়বুদ্ধি রাজা, শয্যাবিলাসী যে, সে।

কেন? কেন? কেন?

কারণ, শ্মশানের চাল আর ছাগীর দুধ খাওয়ার ব্যাপার লোকমুখে জ্ঞাত হওয়া যায়, কিন্তু সাত-সাতখানা গদির নীচে রেখে দেওয়া চুলের দাগ চামড়ায় ফুটিয়ে তোলা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। প্রকৃতই শয্যানিপুন এই বামুন পুত্র।

সঠিক জবাব, সাঁ করে কাঁধ থেকে নেমে উধাও হয়ে গেল ধুরন্ধর বেতাল। পেছন নিলেন নাছোড়বান্দা রাজা।

৮৩. নবম বেতাল

জেদিরাজা ফের গেলেন শিমূল গাছের তলায়। বেতালকে টেনে নামিয়ে রওনা হতেই সুমিষ্ট বচনে বেতাল বললে, আহা, কি কষ্ট আপনার! কর্মফল! কর্মফল! পরের জন্যে খেটে মরছেন! আর একখানা দেদার মজার

গল্প শোনাই। পথকষ্ট কমবে।

এ গল্প সত্যযুগের গল্প, স্বর্গের দেবতারা মর্ত্যের অবন্তীদেশে এক অপূর্ব শহর গড়ে দিয়েছিলেন, সত্যযুগে সেই শহরের নাম ছিল পদ্মাবতী। ত্রেতাযুগে নাম পালটে হয় ভোগবতী। দ্বাপর যুগে হয় হিরণ্যবতী।

কলিযুগে সেই শহরেরই নাম এখন উজ্জয়িনী। বীরদেব নামে এক রাজা ছিলেন সেখানে, পদ্মাবতী ছিলেন তাঁর রানি। শিবের আরাধনা করে তাঁরা পেয়েছিলেন এক ছেলে আর এক মেয়ে। শিবের ইচ্ছায় এত রূপ দুজনে পেয়েছিল যা ত্রিভুবনে তুলনাবিহীন।

ছেলের নাম রাখা হয়েছিল শূরদেব, মেয়ের নাম অনঙ্গরতি।

মেয়ে বড়ো হল, এবার তার বিয়ে দেওয়া দরকার। যৌবন যে উপচে পড়ছে। স্বয়ং কামদেবকেও টলিয়ে দেওয়ার মতো রূপ কি ঢেকে রাখা যায়? অনঙ্গরতি নিজেও যে পতি চায়!

সুতরাং বাবা-মা ব্যস্ত হলেন। নানা দেশের সুন্দর সুন্দর রাজপুত্রদের ছবি এনে দেখালেন মেয়েকে। কিন্তু অনঙ্গরতির পছন্দ হল না কাউকেই।

রাজা তখন ঠিক করলেন স্বয়ংবর সভা করবেন। আসুক সুঠাম সুন্দর রাজার ছেলেরা। একজনকে মনে ধরবেই অনঙ্গরতির।

কিন্তু অনঙ্গরতি তাতেও রাজি নয়। সবার মাথা হেঁট করে শুধু একজনকে বেছে নিতে সে চায় না।

তবে চায় কী?

আশ্চর্য বিজ্ঞান জানা এক যুবককে!

খবর চলে গেল দেশে দেশে, গোটা ভারতবর্ষে।

দাক্ষিণাত্য থেকে এল চার বিজ্ঞানী যুবক।

রাজা তাদের বিজ্ঞানের বহর জানতে চাইলেন।

একজন বললে, জাতে আমি শূদ্র। কিন্তু এমনই বিজ্ঞান জানি যে পাঁচখানা কাপড় একাই বুনে ফেলতে পারি।

আর একজন বললে, আমি জাতে বৈশ্য হলে কী হবে, পশুপাখির ভাষা বোঝবার বিজ্ঞান জানি।

তৃতীয় জন বললে, বাহুবলে আর অস্ত্রবলে আমি অপরাজেয়। লড়াই বিজ্ঞানে আমি অদ্বিতীয়। আমি জাতে ক্ষত্রিয়।

চতুর্থ জন বললে, জন্মেছি ব্রাহ্মণ হয়ে, কিন্তু জেনেছি মড়া বাঁচানোর বিজ্ঞান।

ফাঁপড়ে পরলেন রাজা। কোন বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ?

বেতাল সেই প্রশ্নই করল রাজাকে।

কে হবে অনঙ্গরতির মনোমত বর?

ঝটিতি জবাব দিলেন রাজা, রাজকন্যা শূদ্র-বৈশ্যকে বিয়ে করতে যাবে কেন? কাপড় বোনা আর পশুপাখির ভাষা জানার বিজ্ঞান কী কাজে লাগবে? মড়া বাঁচানো তো একটা ভোজবিদ্যা, তা নিয়ে ক্ষত্রিয় কন্যা কী করবে? ক্ষত্রিয় মেয়ে বিয়ে করুক ক্ষত্রিয় ছেলেকে, লড়াই বিজ্ঞানে যে অদ্বিতীয়, রাজ্যরক্ষায়, রাজ্যবিস্তারে যা কাজে লাগবে।

মুখের মতো জবাব পেয়ে, ঝট করে কাঁধ থেকে নেমে, সট করে সরে পড়ল বেতাল।

তাতে দমে গেলেন না রাজা। বীরত্ব যে তাঁর অণুপরমাণুতে, উৎসাহ অফুরন্ত। সুতরাং...

৮৪. দশম বেতাল

ফের বেতালকে নামালেন শিমূল গাছ থেকে। হনহনিয়ে যখন হাঁটছেন, খলখল করে অট্টহেসে বেতাল বললে, অহো! অহো! কী অসীম ধৈর্য! কী অতুলনীয় কষ্ট। তাহলে শোনাই আর একখানা সরল ধাঁধা। শ্রম কমবে। কিন্তু জবাব চাই সঠিক, নইলে মস্তক হবে বিদীর্ণ, শত খণ্ডে।

সেকালের কথা। অনঙ্গপুর শহরে রাজা বীরবাহুর শহরে থাকতেন অর্থদত্ত, বিত্তবান এক বণিক। তাঁর মেয়ে মদনসেন। একদিন বাগান ভ্রমণে বেরিয়ে দেখল, দাদার বন্ধু ধর্মদত্ত, সেও এক বণিকপুত্র, তার দিকে কামলোচনে তাকিয়ে আছে।

ধর্মদত্তর অভিলাস, বন্ধুর বোনকে ওই উপবনেই ভোগ করবে। কিন্তু মদনসেনা তাকে বুঝিয়ে বললে, আমি যে বাগদত্তা হয়ে রয়েছি। বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গেছে। তুমি যদি এখন আমাকে উচ্ছিষ্ট করে দাও। স্বামীকে যে ঠকানো হবে। তার চাইতে বরং আজ আমাকে ছেড়ে দাও, বিয়ের পর স্বামী সহবাস করার আগেই তোমার কাছে চলে আসব।

তাই হয়েছিল। ধর্মদত্ত ভেবে দেখল, পরের বউকে ভোগ করার মধ্যে বেশি মজা, কুমারী ধর্ষণের চেয়ে।

বিয়ে হল মদনসেনার। স্বামী-সহবাসের আগেই বললে স্বামীকে ধর্মদত্তকে দেওয়া কথা। সে মিটিয়ে নিক তার খিদে, তারপর মেটাক স্বামী।

মনটা বিষিয়ে গেছিল স্বামীর। কী রকম মেয়ে এই মদনসেনা? ফুলশয্যার রাতে বলে কিনা পরপুরুষ সঙ্গম করবে?

যেতে দিল নতুন স্বামী, উদগ্র কামনা চেপে রেখে।

গভীর রাতে মদনসেনাকে পথে দেখে এক চোর তার গয়নাটয়না কেড়ে নিতে এলে একই কথা বললে মদনসেনা। অমুককে যে সুখ দেবে কথা দিয়ে এসেছে। সালঙ্কারা না থাকলে সে সুখ পাবে কী করে? ফেরার পথে দেবে গয়না।

দাদার বন্ধুর কাছে গিয়ে মদনসেনা তাকে সঙ্গমে আহ্বান জানাতেই সে বললে, কী আশ্চর্য! তুমি যে এখন পরস্ত্রী! তোমাকে আর ভোগ করা সমীচীন নয়!

যখন ফিরে যাচ্ছে মদনসেনা, রাস্তায় চোরকে দেখতে পেয়ে বললে, এবার নাও আমার গয়না।

চোর তো অবাক! এ কিরকম মেয়ে! পরের পর সত্যরক্ষা করেই চলেছে! বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সে বললে, নাগো, তোমার গয়না চাই না।

মদনসেনা এল স্বামীর কাছে। বললে, এবার নাও আমাকে। আমি এঁটো নই।

ধরণীতে এমন কন্যাও আছে? সত্যরক্ষার জন্যে এতকিছু করেও নিজেকে টাটকা রেখে দিতে পারে, টলে গেল স্বামী। সুখে ঘরকন্না করে গেল মদনসেনার সঙ্গে, অটল বিশ্বাস নিয়ে, গভীর প্রেমে।

বেতাল বললে, পরম জ্ঞানী রাজামশায়, বলুন দিকি চোর, দাদার বন্ধু আর স্বামী, এই তিনজনের মধ্যে কার জ্ঞান সবচেয়ে বেশি?

তিলমাত্র দ্বিধা না করে রাজা বললেন, চোরের। কেননা, তার কাজ অপহরণ করা, গৃহস্থের সর্বনাশ করা, নিশার আঁধারে সত্যবতী সালঙ্কারা কামিনীর গয়না কেড়ে না নিয়ে সে দেখিয়েছে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা।

বেতাল বললে, সেকি কথা! বন্ধুর দাদা হাতে পেয়েও যুবতী রমণ না করে ছেড়ে দিল এটা কী মহৎ ব্যাপার নয়?

একেবারেই নয়। কেননা, ধর্ষণের ইচ্ছে তখন তার চলে গেছিল।

আর তার স্বামীর? সদ্য বিয়ে করা বউ চলল পরপুরষকে দেহ দিতে, রাজী তো হলই, সংসারও করে গেল তাকে নিয়ে, এটা কি কম কথা? কম উদারতা?

বউ যখন পরপুরুষকে দেহ দিতে পণ করে, তখন তাকে আটকানো যে বোকামি, স্বামী তা বুঝে ছিল। এর মধ্যে উদারতা নেই।

সমুচিত জবাব শুনে লম্ফ দিয়ে রাজার ঘাড় থেকে নেমে চম্পট দিল বেতাল।

রাজা ছুটলেন ফের তাকে আনতে।

৮৫. একাদশ বেতাল

বেতাল ঘাড়ে যখন ছুটছেন রাজা, বেতাল বললে, আহা! আহা! কী কষ্ট! হোক তাহলে আর একখানা তোফা গল্প!

অনেক আগে উজ্জয়িনীতে ধর্মরাজ রাজার ছিল তিন সুখী বউ। ছিল এক-একজনের এক-একরকম স্পর্শ-কাতরতা, বড়ো সুখে ছিলেন রাজা তিন পরমাসুন্দরীকে নিয়ে।

এক বসন্ত সমাগমে রাজা তিন বউকে নিয়ে বাগানে বেড়াচ্ছেন, খেলার ছলে বউ ইন্দুলেখার চুল ধরে টেনেছিলেন রাজা। ফলে, কানের শোভা পদ্মফুলটা টুপ করে খসে পড়েছিল ইন্দুলেখার কোলে। আর তাইতেই, ফুলের ঘায়ে, ক্ষত সৃষ্টি হয়ে গেছিল ঊরুতে!

আশ্চর্য ব্যাপার! এ যে ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়ার মতো কাণ্ড! এতই স্পর্শ সচেতন ইন্দুলেখা! ঊরু কেটে ঘা হয়ে গেল পদ্মফুলের আঘাতে।

রাজা তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়ে। এবং, মোহিত হয়ে রইলেন এমন স্পর্শকাতর বধূ পেয়ে।

কিন্তু চমকিত হলেন আর একদিন। আর এক অভূতপূর্ব ঘটনায়। সেদিন চাঁদনি রাতে দ্বিতীয় রানি তারাবলিকে নিয়ে প্রাসাদের ছাদে বিহার করছিলেন রাজা। ফুটফুটে জ্যোৎস্নার রূপোলি কিরণে চারদিক যেন ভেসে যাচ্ছে। চাঁদের আলোর সে এক আশ্চর্য উদ্দাম বন্যা।

তাড়াবলি বিভোর হয়ে তনুবরের সমস্ত বস্ত্র অপসারণ করে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছিল রাজার কোলে। স্বামীর চোখে চোখ রেখে নিরাবরণা স্ত্রী যখন সুখসাগরে ভাসছে, এমন সময়ে...

রাজা সেই সময়ে ছিলেন ছাদের ঘরে। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছিল পরমাপত্নীর গোপনতম অঙ্গে। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে যখন সেই দৃশ্য নিরীক্ষণ করছেন রাজা, অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটে গেল তাঁর সামনেই।

ঝলসে গেল গুহ্যঅঙ্গের চামড়া!

স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে চামড়া পুড়ে যায়, এমন কথা কে কবে শুনেছে? কিন্তু অত্যাশ্চর্য সেই ঘটনা তো ঘটে গেল রাজার বিস্ফারিত চক্ষুযুগলের সামনেই!

রানির যন্ত্রণা-কান্নায় প্রেম আর কাম ছুটে গেছিল তৎক্ষণাৎ। বদ্যি-ট্যদি ডেকে ঝলসানো গুহ্যঅঙ্গ নিরাময়ের ব্যবস্থা করে গুম হয়ে বসে রইলেন রাজা। চন্দন লেপন করে, পদ্মশয্যায় পত্নীকে শুইয়ে যখন সাতপাঁচ ভাবছেন রাজামশায়...

তখন খবর পেয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে দৌড়ে আসছে তৃতীয় রানি মৃগাঙ্কবতী; এমন সময়ে ঘটে গেল আর একটা অভূতপূর্ব ঘটনা...

এক গেরস্তবাড়িতে ধান ভাঙা হচ্ছিল ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে। দুম-দুম আওয়াজের ধাক্কায় দাগড়া দাগড়া হয়ে থেঁতলে গেল কোমলা মৃগাঙ্কবতীর নরম নরম দুটো হাতের তালু!

তার চিৎকার আর কান্না শুনে লোকজন দৌড়ে এসে দেখলে, সত্যিই তো, দুম দুম করে ঢেঁকির পাড় পড়ছে, আর থেঁতলে থেঁতলে কালসিটে পড়ে যাচ্ছে আঙুলে আর চেটোতে!

গালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন রাজা। এত সুখী বউদের নিয়ে সুখে ঘর করাও যে এক বিড়ম্বনা।

বেতাল শুধোলো রাজাকে, এবার বলুন, কে বেশি স্পর্শকাতর?

যার হাতের চেটো থেঁতলে যায় ঢেঁকির পাড় পড়ার আওয়াজ শুনে, সে। মুষল পড়া সে দেখেনি, মুষল তার হাতে পড়েনি, শুধু শুনেছে কান দিয়ে। শব্দস্রোত কানের মধ্যে দিয়ে, স্নায়ু প্রবাহিত হয়ে, দাগড়া দাগড়া করে দিয়েছে করযুগলকে, স্পর্শ ছাড়াই। বাতাস বাহিত শব্দস্রোত স্নায়ুবাহিত হয়ে যার চামড়ায় ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে মনে মনে আঘাত পাওয়ার কল্পনা করে নিয়ে, তার চাইতে কোমলাঙ্গী জগতে আর নেই।

উচিত জবাব শুনে তড়াক করে কাঁধ থেকে নেমে পলায়ন করেছিল বেতাল।

এক গেরস্তবাড়িতে ধান ভাঙা হচ্ছিল ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ...

৮৬. দ্বাদশ বেতাল

বেতালকে ঘাড়ে চাপিয়ে ফের যখন ফিরছেন রাজা, হি-হি করে হেসে বেতাল বললে, কী মজা! কী মজা! যত কূট গল্পই শোনাই না কেন, উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন ঠিকঠাক। তবে হোক আর একখানা জবরদস্ত গল্প।

এ গল্প অঙ্গদেশের গল্প। সে দেশের রাজা ছিলেন যশোকেতু, আর মন্ত্রী ছিলেন দীর্ঘদর্শী।

যেহেতু দীর্ঘদর্শী অতিশয় বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান মন্ত্রী, তাই তাঁর হাতে রাজ্যশাসনের সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে রাজা যশোকেতু স্রেফ আমোদপ্রমোদে ডুবে থাকতেন। কারও সুপরামর্শে কান দিতেন না।

এদিকে অযথা অপযশ রটতে লাগল মন্ত্রী দীর্ঘদর্শীর নামে। লোকের চোখ টাটালে দুর্ণাম ছড়িয়ে তো বেড়াবেই। মন্ত্রী নাকি রাজাকে রমণী জুগিয়ে নিজে লুটেপুটে নিচ্ছেন।

মনের কষ্টে একদিন মন্ত্রীমশায় মুখ খুললেন বউ মেধাবিনীর কাছে। বললেন, কি করা যায়? রাজার জন্যে খেটে মরছি, অথচ কুড়িয়ে যাচ্ছি কলঙ্ক। শ্রীরামচন্দ্র জনসাধারণের অপবাদ সইতে না পেরে সীতা-ত্যাগ করেছিলেন। আমি কী করি বলো তো?

বউ বললে, এক ঢিলে দুই পাখি মারুন। তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে যান। লোকে জানবে, আপনি ধর্মপ্রাণ, রাজাকে ঠকাচ্ছেন না। রাজা তখন নিজেই রাজ্যশাসন করবেন। তাতে তাঁরও শিক্ষা হবে। প্রমোদ লালসা চলে যাবে। আপনি ফিরে এসে দোষমুক্ত হয়ে মন্ত্রীত্বের হাল ধরবেন।

তাই হল। রাজা কিন্তু ছাড়তে চাননি মন্ত্রীকে। আটকাতেও পারেননি। মন্ত্রী যথাসময়ে তীর্থে বেরিয়ে গেছিলেন, একা, ধর্মপত্নীকেও ধর্ম-তীর্থে নিয়ে যাননি। তিনি বায়না ধরলেও।

অনেক তীর্থ ঘুরে এসেছিলেন পুণ্ড্রদেশে। গেছিলেন সাগরের ধারের এক শহরে, শিবমন্দিরে।

একই সময়ে শিবের পুজো দিতে এসেছিলেন এক সওদাগর। দীর্ঘশীর্ষের সুন্দর আকৃতি আর পৈতে দেখে বুঝে নিলেন এ মানুষ সাধারণ ব্যক্তি নন।

সুতরাং তাঁর সমাদর করলেন। তারপর পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন।

সওদাগরের নাম নিধিদত্ত। দীর্ঘদর্শীর পরিচয় জানবার পর বললেন, আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত। বিশ্রাম নিন। আমি সোনার দ্বীপে যাচ্ছি বেচাকেনা করতে। ফিরে এসে আপনাকে আপনার দেশে পৌঁছে দেব।

দীর্ঘদর্শী বললেন, আমিও যাবো আপনার সঙ্গে।

রাজি হলেন নিধিদত্ত। দীর্ঘদর্শী তাঁর বাণিজ্য-জাহাজে চেপে সমুদ্র পেরিয়ে পৌঁছোলেন সোনার দ্বীপে। ব্যবসা শেষ করে নিধিদত্ত তাঁকে নিয়ে সমুদ্রপথে যখন ফিরছেন, সহসা উত্তাল ঢেউ ভেদ করে সমুদ্রতল থেকে উঠে এল এক কল্পতরু। আশ্চর্য সেই গাছের ডালপালা প্রবাল দিয়ে তৈরি। ফলগুলো সবই মণিমাণিক্য। রত্নসাগরের সমস্ত রত্ন যেন রয়েছে অত্যাশ্চর্য সেই গাছে।

সবচেয়ে আশ্চর্য এক পরমাসুন্দরী যুবতী গাছের কাঁধে মণিময় পালঙ্কে বসে রয়েছে। মাণিক্য সুবাস আর তার গাত্র সুবাস মিলেমিশে অতুলনীয় এক সৌরভে সাগরের বাতাসে ভেসে যাচ্ছে।

স্তম্ভিত দীর্ঘদর্শী যখন পলকহীন চোখে দেখছেন সেই অপরূপাকে, ঠিক তখনি সুরেলা গলায় যে গান গেয়ে উঠেছিল কন্যা, তার মর্মার্থ এই : যে যেমন কর্ম করে, সে তেমন ফল পায়। কর্মফলের হেরফের ঘটানোর ক্ষমতা নেই স্বয়ং বিধাতারও।

গান শেষ হল, মণিময় পালঙ্ক সমেত প্রবাল-মাণিক্য বৃক্ষ তলিয়ে গেল সাগরে কন্যাকে নিয়ে।

থ হয়ে রইলেন দীর্ঘদর্শী। এমন কাণ্ড তিনি জীবনে দেখেননি, শোনেননি।

নিধিদত্ত বললেন, অবাক হবেন না। এই কাণ্ড দেখে দেখে আমার চোখ সয়ে গেছে।

কিন্তু দীর্ঘদর্শী বিস্ময়ে বুঁদ হয়ে রইলেন, জাহাজ সাগর পেরিয়ে ফিরে আসার পর, নিধিদত্তের ভবনে কিছুদিন আরামে থাকবার পর, স্বদেশে ফিরে আসবার পর, রাজা যশোকেতুকে শোনালেন সাগর রমণীর আশ্চর্য কাহিনি।

প্রমোদ এবং প্রমদা লোভী যশোকেতুর মনের প্রাঙ্গণে তৎক্ষণাৎ গজিয়ে উঠল কামনার বৃক্ষ। সাগরকন্যাকে ভোগ করবার কাম বাসনা।

পরের দিনই তিনি রওনা হলেন সাগরকন্যার অন্বেষণে। মন্ত্রী দীর্ঘদর্শীকে দিয়ে গেলেন রাজ্যশাসনের দায়িত্ব। আগের মতো।

পথে দেখা হল এক ঋষির সঙ্গে। তাঁর নাম কুশনাভ।

সাগরকন্যার বৃত্তান্ত শুনে তিনি বললেন, চলে যাও লক্ষ্মীদত্ত সওদাগরের কাছে, সে যাচ্ছে সোনারদ্বীপে।

অনেক দেশ পেরিয়ে, অনেক দিন পরে সাগরের ধারে লক্ষ্মীদত্ত সওদাগরের সঙ্গে দেখা করলেন রাজা যশোকেতু।

লক্ষ্মীদত্ত তাঁকে জাহাজে চাপিয়ে নিয়ে গেলেন সাগরের সেই জায়গায়, সেখান থেকে নিয়ম করে সাগরকন্যা উঠে আসে মণিময় পালঙ্কে বসে, প্রবাল আর মাণিক্য বৃক্ষের কোলে।

এবং, দেখলেন সেই অতুলনীয়া রূপসীকে।

মোহিত হলেন। গান শুনলেন। যে গানের অর্থ, কর্মফল এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য কারও নেই।

সমুদ্রস্তব শুরু করলেন রাজা। কামনা-কাতরের সেই সমুদ্র-পুজোয় অভীষ্ট আকাঙ্ক্ষা একটাই, আশ্চর্য ওই রমণীর সঙ্গে রমণেচ্ছা।

স্তব শেষ হল, অমনি কন্যা মাণিক্যবৃক্ষ সমেত তলিয়ে গেল রত্নাকরের অথই জলে।

রাজা যশোকেতু তৎক্ষণাৎ জাহাজ থেকে ঝাঁপ দিলেন জলে, কন্যা যেখানে, উনিও যাবেন সেখানে।

সওদাগর লক্ষ্মীদত্তও ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিলেন রাজা যশোকেতুকে বাঁচানোর জন্যে, কিন্তু থমকে গেলেন দৈববাণী শুনে।

গম্ভীর নিনাদে দিগবিদিক কাঁপিয়ে বলে গেল গগনের কণ্ঠ, যেও না। ওই কন্যা ছিল রাজা যশোকেতুর আগের জন্মের বউ। উনি এসেছেন বউকে ফিরিয়ে নিতে। নেবেনও। তারপর গিয়ে বসবেন স্বদেশের সিংহাসনে।

নিবৃত্ত হলেন লক্ষ্মীদত্ত।

এদিকে যশোকেতু সমুদ্রের তলায় গিয়ে দেখতে পেলেন এক অপূর্ব সুন্দর মাণিক্য প্রাসাদ, সোনার পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। প্রাসাদ ঘিরে রয়েছে অগুন্তি সৌধময় এক সুন্দর শহর। প্রতিটি ভবন সোনা, মাণিক আর প্রবাল দিয়ে গড়া।

ব্যাকুল রাজা, উদভ্রান্ত রাজা, রূপসী লোভী রাজা সাতটি ভবনে গেলেন, প্রতিটি ঘরে ঢুকলেন, কিন্তু সেই কল্পনাতীত রূপের আধার সমুদ্রকন্যাকে দেখতে পেলেন না।

অবশেষে নিঃসীম নৈরাশ্যে গুঁড়িয়ে গিয়ে ঢুকলেন পেল্লায় এক মণি-মন্দিরে। দেখলেন, আপাদমস্তক চাদরে ঢেকে কে যেন শুয়ে রয়েছে খাটে। কাছে গিয়ে একটানে কাপড় সরিয়ে দিতেই উঠে বসল সেই কন্যা...

অঙ্গ থেকে বিকীর্ণ হল যেন চন্দ্রপ্রভা। আলোকময়ী কন্যার রূপের প্রভায় দূরীভূত হল মন্দিরের অন্ধকার।

বীণা ঝংকৃত স্বরে কন্যা বললে রাজার পায়ের দিকে চেয়ে, কে আপনি? এই পাতালে এলেন কী করে? রাজচিহ্ন দেখছি আপনার শ্রীঅঙ্গে। আপনি কি রাজা?

যশোকেতু গাঢ় স্বরে বললেন, হ্যাঁ, আমি রাজা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে এসেছি সাগরের তলায়। কিন্তু তুমি কে?

সুন্দরী বললে, আমি বিদ্যাধরদের রাজা মৃগাঙ্কসেনের মেয়ে। আমার নাম মৃগাঙ্কবতী। আমাকে একা রেখে বাবা সবাইকে নিয়ে কোথায় গেছেন জানি না। রোজ তাই জলের ওপরে যাই কলের গাছে চেপে, গান গাই কর্মফলের।

নয়নে নয়নে প্রেম সঞ্জাত হয়েছিল উভয়ের মধ্যেই। কামশরের কাজও শুরু হয়ে গেছে। প্রেমবিহ্বল কণ্ঠে কন্যা বলে গেল, হে প্রাণপ্রিয় পুরুষ, প্রতিমাসের কৃষ্ণা চতুদর্শী আর অষ্টমীতে আমি পরের অধীনে যাই, যেতেই হয়। কোথায় যাই, তা জিজ্ঞেস করবেন না। যেতে নিষেধও করবেন না। যে কারণে যেতে হয়, তা এতই গুহ্য যে বলতে পারছি না। এখন হোক আমাদের গান্ধর্ব বিবাহ, তারপর চলুক দেহসুখ বিনিময়।

তাই হয়েছিল। রতক্রিয়ায় নিমগ্ন ছিল কামান্ধ দুই নারীপুরুষ নিরন্তর।

সাতদিন পরে এল কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী।

কন্যা বললে, রাজা, ওই যে দেখছেন কাঁচের বাড়ি, আজ আপনি ওখানে যাবেন না। আর ওই যে দেখছেন সরোবর, ওখানে স্নান করবেন না। যদি করেন, নিমেষে পৌঁছে যাবেন ধরাতলে, নিজের প্রাসাদে।

এই বলে, জঙ্ঘা দুলিয়ে, নিতম্ব সঞ্চালনে কামতরঙ্গ সৃষ্টি করে, দুই নয়নে বিপুল কামবহ্নির সঞ্চরণ ঘটিয়ে বিদায় নিল রহস্যময়ী রত্নাকর, রমণী।

নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করে গেলেন রাজা যশোকেতু, কোষবদ্ধ কৃপাণকে হাতের মুঠোয় এনে।

কাঁচের বাড়িতে গিয়ে দেখলেন এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য।

ভীষণাকৃতি এক দৈত্য বিকট হাঁ করে তেড়ে এসেই গপ করে গিলে ফেলল মৃগাঙ্কবতীকে!

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন যশোকেতু। নিমেষে কৃপাণ চালিয়ে দৈত্যের মুণ্ড নামিয়ে দিলেন ধড়থেকে।

তাতে রাগ কমল বটে, কিন্তু সমুদ্রবতী কন্যা বিহনে অশান্ত হলেন বিলক্ষণ। পাগল-পাগল অবস্থা।

আচমকা ঘটে গেল আর একটা চক্ষুস্থির করা কাণ্ড!

দৈত্যের কবন্ধ দেহ ভেতর থেকে ফাটিয়ে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে এল সেই রূপসী, রূপের আলোয় চতুর্দিক ভাসিয়ে দিয়ে।

রাজা স্পন্দনরহিত। চোখের পাতা পর্যন্ত পড়ছে না।

তারপর দৌড়ে গেলেন। ত্রিলোকসুন্দরীকে আলিঙ্গনে বাঁধলেন। মুহ্যমান স্বরে শুধোলেন, একি মায়া?

সুন্দরী হেসে বললে, না, রাজা, সব সত্য, বাবার অভিশাপে এইসব ঘটছে। আমি সামনে না বসলে তাঁর খাওয়া হত না। প্রতি চতুর্দশী আর অষ্টমীতে আমি আসতাম এখানে, গৌরীদেবীর পুজো করতে। একদিন ফিরতে দেরি হয়েছিল। রাগ করে বাবা খাননি। আমি রাত করে বাড়ি ফিরেছিলাম। বাবা অভিশাপ দিয়েছিলেন। কৃষ্ণপক্ষের প্রতি অষ্টমী আর চতুর্দশীতে গৌরী পুজোয় গেলেই আমাকে আস্ত গিলে খাবে কৃতান্তসংত্রাস নামে একটি দৈত্য। কিন্তু আমি বেরিয়ে আসব জ্যান্ত, অর্থাৎ শরীরে, শাপের কথা অথবা দৈত্যের পেটে যাওয়ার কথা কিছু মনে থাকবে না। সমুদ্রতলের এই প্রাসাদপুরীতে থাকবে একা, নিঃসঙ্গ।

আমি কান্নাকাটি করেছিলাম। বাবার মন গলে গেছিল। বলেছিলেন, রাজা যশোকেতু এখানে এসে তোমাকে বিয়ে করে যেদিন রাক্ষসটার মাথা কাটবে, সেইদিন এই, অভিশাপ কেটে যাবে। বিদ্যাধরীদের সমস্ত ক্ষমতা ফিরে পাবে।

এই বলে বাবা চলে গেলেন মর্ত্যের নিষধ পাহাড়ে। আমি রইলাম একা। আজ আমি শাপমুক্ত। চললাম বাবার কাছে। আপনি এখানেও থাকতে পারেন, স্বরাজ্যে ফিরে যেতে পারেন, যা আপনার অভিরুচি।

রাজা বললেন, তা হয় না। এই সাতদিনেই তোমাকে বড়ো ভালোবেসে ফেলেছি। তোমাকে ছাড়া থাকবো কী করে? ঠিক আছে, আরও সাতটা দিন তোমাকে নিয়ে থাকতে দাও। তারপর যেও বাবার কাছে।

রাজি হয়ে গেল সমুদ্র সুন্দরী, জন্মসূত্রে যে বিদ্যাধরী, রাজা তাকে চুটিয়ে ভোগ করলেন পর পর ছ দিন। সপ্তম দিবসে তাকে কথায় ভুলিয়ে নানা অছিলা সৃষ্টি করে নিয়ে গেলেন সেই জাদু সরোবরে যেখানে ডুব দিলেই সটান চলে যাওয়া যায় ভূলোক পৃষ্ঠে। কথার মায়ায় বিদ্যাধরীকে মোহিত করে, তার গলা জড়িয়ে ধরে ঝাঁপ দিলেন সরোবরে...

জল থেকে মাথা তুলে দেখলেন, পৌঁছে গেছেন অঙ্গদেশে, নিজের প্রাসাদের সরোবরে!

দৌড়ে এল শান্ত্রীরা। তার পরেই স্বয়ং মন্ত্রীমশায়। তিনি বড়ো খুশি হলেন রাজার বউরূপে সমুদ্রসুন্দরীকে দেখে। শাঁখ বাজিয়ে তাকে বরণ করা হল অন্দরমহলে।

মন্ত্রী জানলেন, ললাট লিখন ফলবেই। যার অদৃষ্টে যা লেখা আছে, তা যতই অসম্ভব মনে হোক না কেন, তা ফলবেই।

এদিকে মগাঙ্কবতীর ইচ্ছে হল, এবার যাওয়া যাক বিদ্যাধরদের রাজ্যে, সাতদিন তো হয়ে গেল।

কিন্তু কিছুতেই উঠতে পারল না শূন্যে। মনেও করতে পারল না। কীভাবে নিমেষে চলে যাওয়া যায় মাটি ছেড়ে আকাশে।

লোপ পেয়েছে তার বিদ্যাধরী বিদ্যা!

অথবা, বিস্মৃত হয়েছে!

ম্লানমুখে সেই কথাই বলেছিল রাজাকে। মর্ত্যের পুরুষের সঙ্গে সহবাস করায় আজ সে দিব্যবিদ্যা হারিয়েছে।

শূন্যে উল্লাসিত হলেন রাজা যশোকেতু। যাক! বিদ্যাধরী বউকে তাহলে আমরণ কাছে পাওয়া যাবে। হয়ে গেল আর এক দফা উৎসব।

কিন্তু মন্ত্রী দীর্ঘদর্শীর অবস্থাটা কী দাঁড়াল?

হৃদস্পন্দন রহিত হয়ে মারা গেলেন সেই রাতেই।

বেতাল জিজ্ঞেস করল রাজাকে, কেন মারা গেলেন মন্ত্রী? বিদ্যাধরীকে না পেয়ে? না, রাজা ফিরে আসায় রাজ্য আর মুঠোর মধ্যে থাকবে না বলে?

রাজা বললেন, দুটোর কোনওটাই সঙ্গত কারণ নয়। উনি মারা গেলেন দুর্ভাবনায়, বিদ্যাধরী বউকে নিয়ে রাজা তো আরও বেশি ভোগে মাতবেন। দীর্ঘদর্শী যতই হাল ধরুন না কেন, অপবাদ রটবেই। এই দুর্ভাবনায় বিকল হল তাঁর হৃৎপিণ্ড।

মুখের মতো জবাব পেয়ে তৎক্ষাণাৎ চম্পট দিল মায়াবী বেতাল।

৮৭. ত্রয়োদশ বেতাল

একগুঁয়ে রাজা ফের মড়াটেনে নামিয়ে যেই হনহনিয়ে হাঁটা শুরু করেছেন, অমায়িক স্বরে বেতাল বললে, এবার শুনুন ছোট্ট একটা উপাখ্যান। পরিশেষে রাখব প্রশ্ন। সঠিক জবাব না পেলে খুলি হবে শত চূর্ণ।

হরিস্বামী ছিলেন ব্রাহ্মণ। নিবাস কাশীতে। বউ ছিল নিখুঁত সুন্দরী।

একদিন জ্যোৎস্না ঝলকিত রাতে বাড়ির ছাদে সহবাসের পর অতীব ক্লান্ত হয়ে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, পরস্পরকে জড়িয়ে স্ত্রী অঙ্গের বসন ছিল না স্বস্থানে।

আকাশ পথে যাচ্ছিল এক বিদ্যাধর যুবক। অতিশয় কামুক। অনাবৃতা ললনাকে দেখে ঘুমন্ত অবস্থাতেই তাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছিল কামক্ষুধা মেটানোর জন্যে।

হরিস্বামীর ঘুম ভেঙে গেছিল ঠিক তার পরেই। বউকে পাশো না দেখে খুঁজেছিলেন সব জায়গায়, কিন্তু পাননি।

তারপর একদিন যথাসর্বস্ব দান করে দিয়ে বেরিয়ে গেছিলেন তীর্থপর্যটনে।

দারুণ গ্রীষ্মে পথশ্রম আর খিধের জ্বালা সইতে না পেরে ঠাঁই নিয়েছিলেন পদ্মনাভ নামক এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে। সেই সময়ে সেই বাড়িতে খেতে বসেছিল বহু ব্রাহ্মণ।

জায়াগাটা এঁটো থাকায় পদ্মনাভ বললেন হরিস্বামীকে, এই নিন পায়েস। বসে যান পুকুরপাড়ে।

তাই করলেন হরিস্বামী। পায়েস রাখলেন বটগাছের তলায়। পুকুরে নামলেন হাতমুখ ধুতে।

ঠিক সেই সময়ে একটা বাজপাখি এসে বসল গাছের ডালে। ঠোঁটে ধরে রয়েছে একটা বিষধর সাপ। মরবার আগে সেই সাপ বিষথলির সমস্ত বিষ বের করে দিল বিষদাঁত দিয়ে।

টপটপ করে বিষ পড়ল হরিস্বামীর পায়েসে। পুকুর পাড় থেকে উঠে এসে সেই পায়েস খেলেন হরিস্বামী। বিষক্রিয়া শুরু হল ধীরে ধীরে পাকস্থলীর বিষ একটু একটু করে রক্তে মিশে যেতেই।

টলতে টলতে গেলেন পদ্মনাভের বাড়ি। এল কবিরাজ। কিন্তু মারা গেলেন।

পদ্মনাভ নিজের বউকে তাড়িয়ে দিলেন বাড়ি থেকে, পায়েসে বিষ মেশানোর জন্যে।

হরিস্বামীর মৃত্যুর জন্যে দায়ী তাহলে কে?

রাজা বললেন, কেউ নয়। বাজপাখি নিজের খিধে মিটিয়েছে, পদ্মনাভের স্ত্রী অতিথির খিধে মিটিয়েছে। এদের মধ্যে একজন দায়ী যে বলবে, সে একটা মূর্খ।

সড়াৎ করে রাজার কাঁধ থেকে নেমে বেতাল চলে গেল শিমূল গাছে।

৮৮. চতুর্দশ বেতাল

অদম্য উৎসাহে রাজামশায় আবার গেলেন শিমূল গাছের তলায়। বেতাল বজ্জাতকে টেনে নামিয়ে ঘাড়ে চাপিয়ে যেই হাঁটতে শুরু করেছেন, বেতাল বললে, শ্রান্তি অপনোদনের জন্যে শোনাই আর একটা মনোহর কাহিনী।

অনেক আগে বীরকেতু নামে এক রাজা ছিলেন অযোধ্যার অধিপতি। রত্নদত্ত ছিল সেই রাজ্যের বিত্তবান সওদাগর। একটাই মেয়ে তার, ছেলে ছিল না। বড়ো ঢ্যাঁটা মেয়ে। রূপের সীমাপরিসীমা নেই। কিন্তু ভয়ানক পুরুষবিদ্বেষী। বিয়ে করবে না কিছুতেই, জোর করে বিয়ে দিলে আত্মহত্যা করবে, এমন হুমকিও দিয়ে রেখেছিল বাবাকে।

মেয়েরা যত সুন্দরীই হোক না কেন, বর জোটাতে কালঘাম ছুটে যায় এই পুরুষশাসিত সমাজে। একবগ্গা এই মেয়েটি কিন্তু হাঁকিয়ে দিয়েছে তাবড় তাবড় বর-হতে-ইচ্ছুক সুন্দর সুন্দর যুবকদের, এতই বিতৃষ্ণা পুরুষ জাতটার ওপর।

ঠিক এই সময়ে একটা ধুরন্ধর চোর বড়ো উৎপাত করে যাচ্ছিল অযোধ্যায়। রাজার নগরপাল চ্যালাচামুণ্ডা নিয়ে তার টিকি খুঁজে পাচ্ছিল না, অথচ গেরস্থদের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছিল প্রতি রাতে।

শেষে রাজা নিজেই একরাত বেরোলেন চোর ধরতে। অন্ধকারে দেখলেন একটা কৃশ মূর্তি পাঁচিলের ওপর দিয়ে মার্জার চরণে হেঁটে যাচ্ছে। রাজা তার পেছনে নিলেন একই রকম লঘুপদে।

কৃশমূর্তি বললে, তুমি কে হে?

রাজা বললেন, আমি এক চোর।

চোর বললে, আমিও যে এক চোর। ভালোই হল, বন্ধু পাওয়া গেল। চল আমার বাড়ি। ফুর্তিফার্তা করা যাক।

বনে ঢুকল চোর, রাজাকে নিয়ে নামল এক পাতাল সুড়ঙ্গে। পৌঁছোল এক পাতাল প্রাসাদে। আলোয় আলো হয়ে রয়েছে বিরাট সেই প্রাসাদ। যেন বলিরাজার সুরম্য নিকেতন।

রাজাকে বিশ্রামে বসিয়ে চোর মহাশয় অন্যত্র যেতেই পা টিপে টিপে এল এক দাসী। বললে রাজার কানে কানে-মরতে এসেছেন নাকি? চোর কখনও বন্ধু রাখে? আপনাকে শেষ করবার জন্যে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে এনেছে এখানে। এখুনি আসবে, প্রাণটা নেবে। পালান, যদি বাঁচতে চান।

পলায়ন করলেন রাজা। এবং বিলম্ব করলেন না। সেই রাতেই সৈন্যসামন্ত নিয়ে হানা দিলেন পাতাল প্রাসাদে। অনেক লড়াইয়ের পর চোরকে বেঁধে নিয়ে গেলেন বধ্যভূমিতে শূলে চাপিয়ে খতম করার জন্যে।

আর ঠিক সেই সময়ে চোরকে দেখে কাম জ্বরজ্বর হল সেই বণিককন্যা, যে কিনা বিষম পুরুষ বিদ্বেষী। অনেক ভালো ভালো পাত্রকে বিমুখ করেছে। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে।

বাপকে বললে মনের কথা। চাই ওই চোরকে, পতিরূপে। যেন আকাশ থেকে পড়লেন সওদাগর মশায়। একী সম্ভব? ধনীর দুলালীর সঙ্গে জঘন্য তস্করের পরিণয়?

জেদি মেয়ে কিন্তু সাফ বলে দিলে, হয় এই বিয়ে হবে, নইলে চোর মরলে তার সঙ্গে কন্যা যাবে সহমরণে। জ্যান্ত পুড়বে চিতায়।

এ তো ভয়ানক পণ! মেয়েকে যখন টলানো গেল না, তখন গেল রাজার কাছে। করজোরে মুক্তি প্রার্থনা করল তস্করের। কেন? না, জামাই করবে।

এমন প্রার্থনা রাজামশায় জীবনে শোনেননি। সুতরাং তা না মঞ্জুর হল। চোরকে ঢাকঢোল পিটিয়ে শূলে চাপানো হল, তীক্ষ্ণাগ্র শূল যখন চোরের শরীর ভেদ করে ঊর্ধ্বে উঠছে, মরণের আর বিলম্ব নেই, তখন পাল্কিতে চেপে পুরবাসিনীদের নিয়ে সেই ঢ্যাঁটা মেয়ে এল বধ্যভূমিতে।

মৃত্যু যখন নিকটে, তখন তাকে বিয়ে করতে এসেছে এই পরমাসুন্দরী, এমন কথা কর্ণকুহর দিয়ে শ্রবণমাত্র চোর প্রথমে একটু কেঁদে নিল, তারপরেই হেসে ফেলে মারা গেল।

একবগ্গা বণিক তনয়া তৎক্ষণাৎ চোরের লাশ শূল থেকে নামিয়ে চিতায় চাপিয়ে নিজে যখন শুতে যাচ্ছে তার পাশে, এমন সময়ে, স্বয়ং বিধাতা বিষম বিচলিত হয়ে এলেন সেই ত্যাঁদোড় কন্যার সামনে।

বললেন, তোমার মতো কন্যার এভাবে মরণ হওয়া উচিত নয়। কি চাও?

সপেটা বললে কন্যা, এই চোর বেঁচে উঠুক, আমার বর হোক। তাই হবে, বলে, অন্তর্ধান করলেন বিষম বিস্মিত বিধাতাপুরুষ। তাজ্জব হওয়ার মতো ঘটনাই বটে। মরা চোরকে বাঁচিয়ে বিয়ে করতে চায়, এ কী রকম নারী?

এদিকে চোর তো পুনর্জীবন পেয়ে উঠে বসেছে চিতায়। ঢলঢল চোখে তার গলায় মালা পরিয়ে বণিক কন্যা নেমে এল চিতা থেকে। শহর কাঁপিয়ে উৎসব করে যথাবিধি বিবাহ করল তাকে।

শুনে, চক্ষুস্থির রাজা দৌড়ে এলেন বণিক ভবনে। বিবাহ সভাতেই চোরকে বরণ করলেন প্রধান সেনাপতির পদে, কারণ, চোর দিয়েই চোর ধরতে হয়। বিশেষ করে যে চোর মরে গিয়েও বেঁচে ওঠে, তাকে দুনিয়ার চোরডাকাত আর দেশের শত্রুরা দেখলেও তো আঁৎকে উঠবে।

বেতাল বললে সরস স্বরে, চোর বেটা প্রথমে একটু হেসে নিয়ে পরে কাঁদতে গেল কেন?

রাজা বললেন, হঠাৎ পাওয়া বণিক বন্ধুর কোনও উপকার করার সময় আর পাওয়া গেল না, এই ভেবে চোখের জল ফেলল প্রথমে। তারপরেই হেসে ফেলল নারীচরিত্রের বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করে। পুরুষবিদ্বেষী কন্যা কি না এত কামাতা যে এক জঘন্য চোরের সঙ্গে সহবাস করতে চায়!

উচিত জবাব শুনে চকিতে হাওয়া হয়ে গেল বেতাল।

৮৯. পঞ্চদশ বেতাল

বেতালকে শিমূল গাছ থেকে নামিয়ে আবার রওনা হলেন রাজামশায়। উদ্যমের তাঁর অন্ত নেই।

গল্পের ভাঁড়ার থেকে আর একখানা মজাদার গল্প টেনে বের করলো বেতাল।

এ গল্প নেপালের। বড়োই আজব গল্প।

সেখানকার শিবপুর শহরের রাজা যশোকেতু রানি চন্দ্রপ্রভা ছাড়া চোখে অন্ধকার দেখতেন। অষ্টপ্রহর তাকে নিয়েই মেতে থাকতেন। রাজ্য চালাতো তাঁর মন্ত্রী, প্রজ্ঞাসাগর।

যথাসময়ে রানির কোল আলো করে এল একটি মেয়ে। তার নাম রাখা হল শশীপ্রভা।

যৌবনে পা দিয়ে এতই রূপসী হল শশীপ্রভা যে তার দিকে একবার তাকালে আর চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যেত না।

এহেন যৌবনমদমত্তা শশীপ্রভা একদিন বাগানে গিয়ে ফুল পাড়ছিল দুহাত তুলে। বস্ত্র খসে পড়েছিল পীনপয়োধর যুগল থেকে।

অদূরে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখেছিল এক ব্রাহ্মণ যুবক। তার নাম মনোস্বামী। রূপসী যুবতীর মনোহর পয়োধর কামবাসনা উগ্র হয়ে উঠেছিল মনের মধ্যে।

একই অবস্থা দাঁড়িয়েছিল শশীপ্রভারও। নিমেষে আতপ্ত হয়েছিল নিদারুণ কামজ্বরে, মনোস্বামীকে এক ঝলক দেখেই। স্বয়ং রতিপতি যেন স্বয়ং নিরীক্ষণ করছেন তার অনাবৃত বক্ষদেশ। শিহরণ জেগেছিল সর্বাঙ্গে। যে শিহরণের নিবৃত্তি ঘটতে পারে শুধু নিবিড় রমণে।

এমতাবস্থায় পুষ্পচয়নের কথা মনেও ছিল না শশীপ্রভার। উচাটন মনে সে যখন ভাবছে কিভাবে এই বলিষ্ঠ যুবকের নিপীড়নে প্রশান্ত করা যায় আতপ্ত অঙ্গকে, ঠিক এই সময়ে একটা হায় হায় ধ্বনিতে মুখর হল উপবন।

চমকিত চোখে শশপ্রভা দেখল, রাজার হাতি খেপেছে। তেড়ে আসছে এই দিকেই, মাহুতকে মাড়িয়ে শেকল ছিঁড়ে, সে পাগল হয়েছে এক হস্তিনীর কামগন্ধে।

নিমেষে অসীম বিক্রম দেখিয়েছিল ব্রাহ্মণ মনোস্বামী। ধেয়ে এসেছিল পাগলা হাতির সামনে। আশ্চর্য কৌশলে তাকে নিপাত করেছিল কিছুক্ষণের মধ্যে, শশীপ্রভার বিস্ফারিত দুই চক্ষুর সামনেই।

ধেয়ে এসেছিল পাগলা হাতির সামনে।

শশীপ্রভা তখন একা। সখীরা চম্পট দিয়েছিল মদমত্ত হাতিকে দেখেই। এখন ফিরে এসে দেখল, মদনসরে বিদ্ধ শশীপ্রভা অনিমেষে চেয়ে আছে মনোস্বামীর দিকে। মনোস্বামীও দুই চোখে প্রেমের আর কামের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে লেহন করে যাচ্ছে অনিন্দ্যসুন্দরী মূর্তিময়ী রতি শশীপ্রভার দিকে। রতিরঙ্গের তুফান-স্বপ্ন দুজনেরই বিহ্বল লোচনে।

প্রাসাদে ফিরে এল বটে শশীপ্রভা, কিন্তু বীরপুরুষ মনোস্বামী দখল করে রইল তার মন্দির। বিশেষ করে সেই চাহনি যা লেহন করে গেছে, তার সর্বাঙ্গ।

চাহনি এমনই শক্তি। উদ্দীপ্ত করতে পারে কামবহ্নি। সুতরাং দিবানিশি যখন কামানলে জ্বলছে শশীপ্রভা, তখন মনোস্বামীও ভুগছে একই আসঙ্গলিপ্সায়, জ্বলে যাচ্ছে সর্বাঙ্গে অসহ্য কামনায়। সব সহ্য করা যায়, অতৃপ্ত কামদহন সওয়া যায় না। শেষকালে আর থাকতে না পেরে ছুটল গুরু মূলদেবের কাছে।

মূলদেব অনেক গুপ্তজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি সব শুনলেন। তারপর, অতিপ্রকৃতি শক্তিসম্পন্ন একটা বড়ি রাখলেন নিজের মুখের মধ্যে, আর একটা বড়ি রাখলেন মনোস্বামীর মুখের মধ্যে।

অবাক দৃশ্য দেখা গেল তৎক্ষণাৎ। অবিশ্বাস্য, কিন্তু ঘটে গেল চোখের সামনে, পলকের মধ্যে।

মূলদেব হয়ে গেলেন এক অশীতিপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, মনোস্বামী হয়ে গেল এক রূপসী রঙ্গিনী।

দুজনে গেলেন শশীপ্রভার পিতৃদেব যশোকেতুর কাছে। বৃদ্ধরূপী মূলদেব বললেন বিনয় বচনে, আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে এই মেয়েকে এনেছিলাম। কিন্তু সে যে কোথায় গেছে জানি না। তাকে খুঁজতে যাবো, আপনি যদি অনুগ্রহ করে এই রূপসীকে আপনার অন্দরমহলে নিরাপদে রেখে দেন। প্রজাদের ধন মান ধনি রক্ষার কর্তব্য তো দেশের রাজার।

এখানে 'ধনি' শব্দের অর্থ যুবতী নারী। যুবতী যদি সুন্দরী হয়, রাজা যশোকেতুর মন মজে যায়। মূলদেব তাই এই চাল চাললেন

সফলও হলেন। রাজা যশোকেতু সুন্দরী রূপিনী মনোস্বামীকে সমাদরে রেখে দিলেন অন্তঃপুরে, রাজকন্যার তত্ত্বাবধানে। তার সখীরূপে।

অর্থাৎ, কৌশলে মূলদেব রাজকন্যা শশীপ্রভা আর মনোস্বামীকে এনেছিলেন পরস্পরের কাছে! গুপ্তজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে সুযোগ জুটিয়ে দিলেন উভয়কেই, মিটিয়ে নিক পরস্পরের বাসনা!

এবং, সেই কর্মই চলল প্রতিরাতে। দিনের বেলা মনোস্বামী থেকেছে কন্যারূপে, নিশি আগমনে মুখ থেকে বড়ি বের করে নিয়ে, পুরুষরূপ ধারণ করে চুটিয়ে ভোগ করে গেছে শশীপ্রভাকে!

অঘটন ঘটল এরপরেই। মজাদার ঘটনাও বলা চলে!

শশীপ্রভা মামার বাড়ি গেল একটা বিয়ে উপলক্ষে। সঙ্গে নিয়ে গেল রমণীরূপিনী মনোস্বামীকে।

সেখানে মন্ত্রীর ছেলে কামবিহ্বল হল রমণীরূপিনী মনোস্বামীকে দেখেই। অহো! অহো! কী অঙ্গবৈভব, কী অপাঙ্গ চাহনি, কী স্ফূরিত অধর! নৃত্যপর পয়োধর যুগলের আকর্ষণে প্রাণ যায়-যায় অবস্থা দাঁড়াল মন্ত্রীপুত্রের।

অথচ, যাকে দেখে তার শরীরে কামবন্যা জেগেছে, আসলে সে তারই মতো এক পুরুষ!

রাজার কানে গেল মন্ত্রীর ছেলের কামজ্বর কাহিনি। তিনি ফাঁপড়ে পড়লেন।

কামখিদে বড়ো ভয়ানক খিদে। না মিটলে, মরবে মন্ত্রীর ছেলে। সে ব্যাটা মরলে, মন্ত্রী আর কাজ করবে না, ছেলের শোকে। মন্ত্রী কাজ না করলে, রাজ্য চালাবে কে? রাজা নিজে তো নিত্য নিয়ত সঙ্গমকর্মে নিরত!

উপরন্তু, মন্ত্রীর বেটার সঙ্গে অন্তঃপুরে গচ্ছিত কন্যার যদি বিয়ে দেওয়া যায়, সেই বুড়ো বামুনটা এসে যখন মেয়েকে ফেরত চাইবে, তখন? তার অমতে কন্যা দান করা হয়েছে শুনলে যে অনর্থ ঘটবে।

যে কন্যাকে নিয়ে এত দুশ্চিন্তা, সে কন্যা আসলে যে এক পুরুষ, রাজা তো তা জানেন না। মজাটা এইখানেই!

অনেক মাথা চুলকে, অনেক মাথা খাটিয়ে রাজা ঠিক করলেন, দূর ছাই, মন্ত্রীর ছেলের সঙ্গে বিয়েই দেওয়া যাক গচ্ছিত কন্যার। নইলে মরবে মন্ত্রী আর মন্ত্রীর ছেলে দুজনেই, সে আর এক মহাপাপ।

রাজার সিদ্ধান্ত শুনে তো মাথা ঘুরে গেল কন্যারূপিনী মনোস্বামীর। কী সর্বনাশ! সে এসেছে কন্যারূপে, রাতে পুরুষরূপে শশীপ্রভাকে ভোগ করবে বলে। এখন তো তাকেই অষ্টপ্রহর ভোগ করতে চলেছে মন্ত্রীর ছেলে, তাকে মেয়ে ভেবে, এতো আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল! জন্মেছে যে ছেলে হয়ে, সে মেয়ে হয়ে নিজেকে দিয়ে যাবে কী করে অষ্টপ্রহর?

অনেক ভেবেচিন্তে কন্যারূপিনী মনোস্বামী বলে পাঠান রাজাকে, রাজার এই সিদ্ধান্ত অসমীচীন। কেননা, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। নিরুদ্দেশ ছেলেকে খুঁজে পেলেই তিনি এসে মেয়েকে ফেরত চাইবেন। তখন যখন শুনবেন, গচ্ছিত ধনি অপরের অঙ্কশায়িনী, অনর্থ কাণ্ড ঘটবে।

শুনে তা চুলখাড়া হয়ে গেল রাজামশায়ের। তাই তো বটে! তাই তো বটে!

ফয়সালা করে দিল কন্যারূপে ধুরন্ধর মনোস্বামী, হতে পারে এই বিয়ে, যদি বিয়ের পর একসঙ্গে শোওয়ার আগে মন্ত্রীর ছেলে একটানা ছ-মাস তীর্থ-পর্যটনে যায়। যদি না যায়, তাহলে কন্যারূপী মনোস্বামী আত্মহত্যা করবে দাঁত দিয়ে নিজের জিভ কেটে দু-খানা করে!

হুমকি শুনে রাজি হয়ে গেল মন্ত্রীর ছেলে। এই শর্তেই হয়ে যাক বিয়েটা। ছ-মাস পরে না হয় সঙ্গম করা যাবে কন্যার সঙ্গে।

মনোস্বামীর বুদ্ধিতে বাঁচল শশীপ্রভা নিজেও, চলছে ব্যভিচার, চলুক। কিন্তু পাত্র হাতছাড়া করতে সে রাজি নয়।

বিয়ে হয়ে গেল কন্যারূপিনী মনোস্বামীর সঙ্গে মন্ত্রীর ছেলের।

মন্ত্রীর ছেলের আগেও একটা বউ ছিল। তার নাম মৃগাঙ্কবতী। নতুন বউকে তার কাছে রেখে তীর্থ-পর্যটনে বেরিয়ে গেল মন্ত্রীর বেটা। জানতেও পারল না, কামুক প্রথম বউয়ের কাছে যাকে রেখে গেল, সে নিজেই

একটা কামুক বেটাছেলে! আকৃতিতে মেয়ে!

রঙ্গ শুরু হয়ে গেল এর পরেই। বিচিত্র রতিরঙ্গ।

একদিন কামযন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মৃগাঙ্কবতী বললে সতিনকে, উঃ! রাত যে আর কাটে না!

ফুরসত পেয়ে সতিন বললে (আসলে নওজোয়ান মনোস্বামী), উপায় আছে? উপায় আছে? আমি এক মন্ত্র জানি, রাতে ছেলে হতে পারি।

চোখ বড়ো বড়ো করে মৃগাঙ্কবতী বললে, তারপর যদি আমার পেটে বাচ্ছা এসে যায়?

সতিনরূপে মনোস্বামী বললে, ইলনামা তো সূর্যবংশে জন্মেছিলেন ছেলে হয়ে। গৌরীর শাপে মেয়ে হয়ে গেছিলেন। বুধ-এর সঙ্গে সঙ্গম করেছিলেন। রাজা পুরুরবার জন্ম দিয়েছিলেন, এ রকম হয়। গুপ্তজ্ঞান থাকলে ছেলে মেয়ে হতে পারে, মেয়ে ছেলে হতে পারে, তাদের মধ্যে সঙ্গম চলতে পারে, সবই দেবতাদের নির্দেশে।

তবে তাই হোক, বলেছিল মৃগাঙ্কবতী।

তৎক্ষণাৎ মুখ থেকে বড়ি বের করে, মনোস্বামী নিজ রূপ ধারণ করে, রতিসুখ দিয়েছিল মৃগাঙ্কবতীকে। নিজে রতি-উপোস থেকে বেঁচেছিল, মৃগাঙ্কবতীকেও বাঁচিয়েছিল!

ছ-মাস পেরিয়ে গেল এইভাবে। এইবার ফিরবে মন্ত্রীর ছেলে। সহবাস করবে দ্বিতীয় বউয়ের সঙ্গে আসলে যে নিজেই এক পুরুষ, মনোস্বামী।

ধুরন্ধর মনোস্বামী (কন্যারূপে) চম্পট দিল নিখাদ মেয়ে মৃগাঙ্কবতীকে নিয়ে! অহো! রমণ সঙ্গিনীকে কি ফেলে পালানো যায়?

সময় হয়েছে বুঝে তৈরি হলেন মন্ত্রবিদ মূলদেব। নিজের বন্ধু শশীকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি রাখলেন।

মন্ত্রীর ছেলের ফিরে আসবার দিন ঘনিয়ে আসতেই বৃদ্ধরূপ ধারণ করে বন্ধু শশীকে রাজার সামনে নিয়ে গিয়ে বললেন, এই আমার ছেলে। ফিরে এসেছে। এবার ফিরিয়ে দিন আমার পছন্দ করা পাত্রীকে, বিয়ে দেব ছেলের সঙ্গে।

মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল রাজার। মুখ চুন করে বললেন, সে পালিয়েছে। তার বদলে আমার এই রাজকন্যা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিন আপনার ছেলের।

বিয়ে হয়ে গেল শশির সঙ্গে শশীপ্রভার। সেই শশীপ্রভা যে কিনা লুকিয়ে রোজ রাতে সঙ্গম করেছে মনোস্বামীর সঙ্গে!

মূলদেব সরে পড়লেন রাজকন্যাকে নিয়ে, শশির সঙ্গে।

খবর পেয়ে মনোস্বামীও স্বরূপে হাজির হল সেখানে।

মনোস্বামী চাইছে শশীপ্রভাকে।

শশি দেবে না তাকে।

বেতাল শুধোলো, শশীপ্রভা এখন কার বউ?

রাজা বললেন, শশির, প্রকাশে, অগ্নিসাক্ষী রেখে তার সঙ্গে শশীপ্রভার বৈধ বিয়ে হয়েছে বলে।

চম্পট দিল বেতাল।

৯০. ষোড়শ বেতাল

জেদি রাজা ফের নামালেন শব শিমূল গাছ থেকে। যত বাগড়া পড়ছে, ততই রুখে উঠছেন। লম্বা লম্বা পদক্ষেপে কিছুদূর আসতে না আসতেই সুমিষ্ট বচনে বেতাল বলে উঠল, অহো! অহো! কী উদ্যম! পথশ্রান্তি লাঘব করার জন্যে হোক তাহলে আর একখানা গল্প। চুক্তি কিন্তু সেই একই, উচিত জবাব না পেলে করোটি হবে শতখান।

হিমালয়ের কাঞ্চনপুরে থাকতেন বিদ্যাধরদের রাজা জীমূতকেতু। প্রাসাদ প্রাঙ্গণে ছিল একটা কল্পতরু, বংশপরম্পরায় পাওয়া। যে যা চেয়েছে, তাই পেয়েছে কল্পতরুর কৃপায়। জীমূতকেতু পেয়েছিলেন পুত্র

জীমূতবাহনকে। সে জাতিস্মর! পূর্বজন্মের বোধিসত্ত্বের অংশ পেয়েছিল সে এই জন্মে।

জীমূতবাহন যুবরাজ হওয়ার পরে একদিন তার বাবার মন্ত্রীরা তাকে বললে, মনোবাঞ্ছাপূরক এই কল্পতরুকে প্রতিদিন পুজো করতে হয়। তাহলে দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত আমাদের পেছনে লাগবে না।

জীমূতবাহন বাবাকে বললে, পরের উপকার করাই তো সেরা ধর্ম। আজ পর্যন্ত কল্পতরুকে দিয়ে তা করাননি আমার কোনও পূর্বপুরুষ। আমি করতে চাই। অনুমতি দিন।

অনুমতি দিলেন জীমূতকেতু।

জীমূতবাহন কল্পতরুর সামনে গিয়ে বললে, এই রাজ্যে যেন কখনও গরিব না থাকে, সেই ব্যবস্থা করে দিয়ে আপনি স্বস্থানে প্রস্থান করুন।"

এরকম মনোবাঞ্ছা অপিচ শোনেননি কল্পতরু। জীমূতবাহনের পূর্বপুরুষরা শুধু নিজেদের শ্রীবৃদ্ধির জন্যেই অমুক-তমুক চেয়ে এসেছেন। কিন্তু এই ছেলের নিজের সম্পদ-লালসা নেই, চাইছে দেশের লোকের কল্যাণ।

কল্পতরু ডম্বরু কণ্ঠে বললেন, তাই হবে। দেশের লোক ধনবান থাকুক চিরকাল, আমিও চললাম স্বস্থানে, যখন আর তুমি চাও না আমাকে।

নিমেষে আকাশে চলে গেল কল্পবৃক্ষ। ঝমঝমাঝম শব্দে ধনরত্ন আকাশ থেকে নেমে এল গোটা রাজ্যে। এমন জহরবৃষ্টি কেউ কখনও দেখেনি।

কিন্তু আর একটা পরিণাম দেখা গেল তারপর থেকেই। জ্ঞাতিরা ভাবলে, কল্পতরু যখন আর সহায় নেই, তখন এদের পেছনে লাগা যাক। আরম্ভ হল যুদ্ধপ্রস্তুতি। দখল করতে হবে জীমূতকেতুর রত্নময় রাজ্য।

জীমূতবাহন কিন্তু বললে বাবাকে, লাভ কী বৃথা রক্তক্ষয়ে? রাজ্যে দরকার নেই, নিক জ্ঞাতিরা। আমরা যাই অন্য জায়গায়, যেখানে ধর্মাচরণের সুযোগ পাবো।

রাজি হলেন বাবা। স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে তিনি গেলেন মলয় পর্বতে। ঠাঁই নিলেন একটা গুহায়। ঝর্নার ধারে। শান্তিতে চলল ধর্মের অনুষ্ঠান।

এইখানেই একজন বন্ধু পেল জীমূতবাহন। তার নাম মিত্রাবসু। সিদ্ধরাজা বিশ্ববসুর ছেলে, মিত্রাবসু।

উপবনে বেড়াতে বেড়াতে জীমূতবাহন একদিন দেখল, অনিন্দ্যসুন্দরী এক কন্যা পুজো দিচ্ছে গৌরীমন্দিরে। আর গান গাইছে বীণা বাজিয়ে। সেই গান শুনছে বনের পশুপাখিরা নিশ্চুপ হয়ে।

প্রথম দর্শনেই প্রেম সঞ্জাত হল জীমূতবাহনের মনে। অপরূপার সখীকে শুধালো, কে এই কন্যা? জন্ম কোন বংশে?

সখী বললে, ইনি সিদ্ধরাজা বিশ্ববসুর মেয়ে, মিত্রাবসুর বোন। এঁর নাম মলয়বতী। আপনার পরিচয়?

জীমূতবাহন দিল নিজের বংশপরিচয়, নিজের নাম, ইত্যাদি।

কান খাড়া করে সব শুনেই কন্যা মলয়বতী বললে সখীকে, এ রকম মানুষ আমার বাবার অতিথি হচ্ছেন না কেন?

ইঙ্গিত বুঝে, সখী একটা ফুলের মালা দিল জীমূতবাহনকে। বন্ধুত্বের বন্ধন।

জীমূতবাহন সেই মালা পরিয়ে দিল মলয়বতীর গলায়।

নীলপদ্মের মালা। নিজেই নিজের বর বেছে নিল।

ফিরে এল বাড়িতে। কিন্তু জ্বলে গেল কামানলে। সখীরা তার গায়ে চন্দন-টন্দন মাখিয়ে দিয়েও শীতল করতে পারল না অঙ্গদাহ।

একই অবস্থা দাঁড়িয়েছিল জীমূতবাহনের। বাগানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মলয়বতীকে আর একবার দেখার জন্যে। দেখেও ছিল নিজে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে, মলয়বতী এসেছিল মদন-দহন জুড়োতে গাছের ছায়ায়।

এমন সময়ে বাগানে দৌড়ে এসেছিল মলয়বতীর এক সখী। আনন্দে নেচে নেচে দিয়েছিল সুখবরটা। মিত্রাবসু এসেছেন রাজার কাছে মলয়বতীর সঙ্গে জীমূতবাহনের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। রাজা রাজি হয়েছেন।

ঝটপট বাড়ি ফিরে গিয়ে মিত্রাবসুর মুখেই সুখবরটা শুনল জীমূতবাহন। বললে, মলয়বতীকে দেখে মনে হয়েছে, সে যেন আগের জন্মে ছিল আমার স্ত্রী।

বিয়ে হয়ে গেল দু-জনের।

কিছুদিন পরে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেছিল জীমূতবাহন। সঙ্গে ছিল বন্ধু এবং শ্যালক মিত্রাবসু। দেখেছিল এক জায়গায় স্তূপাকারে রয়েছে অনেক হাড়।

কারণটা জানিয়েছিল মিত্রাবসু। বলেছিল, এ এক সর্বনাশা বাজি ধরার পরিণাম। বাজি ধরা হয়েছিল নাগ-মা কদ্রু আর গরুড়-মা বিনতার মধ্যে। কোনও একটা বিষয়ে। বিনতা হেরে গিয়ে থাকেন কদ্রুর দাসী হয়ে। গরুড় কেড়ে নিয়ে আসে মাকে আর ছোঁ মেরে মেরে খেতে থাকে পাতালের নাগদের। নাগবংশ যখন ধ্বংস হতে বসেছে তখন স্বয়ং বাসুকি গিয়ে গরুড়ের সঙ্গে রফা করেন। খাওয়ার জন্যে রোজ একজন নাগ হাজির হবে সাগরের দক্ষিণ তীরে। পাতালে এসে নাগবংশ ধ্বংস করার দরকার নেই। রাজি হয়ে যায় গরুড়। সেই থেকে একটা করে নাগকে রোজ খেয়ে হাড় ফেলে রাখে গরুড়। হাড়ের পাহাড় জমেছে এই কারণেই।

জীমূতবাহনের প্রাণে মায়াদয়ার সাগর উথলে উঠেছিল নাগলোকের বাসিন্দাদের দুর্দশা শুনে।

বলেছিল সখেদে, বাসুকি এত দুর্বল? নিজেই নিজের সন্তানদের খেতে দিয়ে যাচ্ছেন? তাঁর তো হাজারটা মুখ। একটা মুখেও কি বলতে পারেননি, সন্তানদের নয়, খাও আমাকে? গরুড়ও মহাপাপী।

ঠিক এই সময়ে রাজা লোক পাঠালেন মিত্রাবসুকে ডেকে নিয়ে যেতে, দরকার আছে।

বন্ধুর সঙ্গে না গিয়ে জীমূতবাহন একা দাঁড়িয়ে রইল সাগরতটে। উদ্দেশ্য, নিজেই আজ খাদ্য হবে গরুড়ের। একজন নাগেরও তো জীবন বাঁচবে।

একটু পরেই কানে ভেসে এল প্রাণে মরার বিষম কান্না।

শব্দ লক্ষ্য করে দৌড়ে গেল জীমূতবাহন। দেখল এক বুড়িকে। হাহাকার করছে ছেলের জীবন যেতে বসেছে বলে। সে শঙ্খচূড়-এর মা। এসেছে ছেলের বদলে নিজের জীবন দিতে। গরুড় খাক তাকে, প্রাণে বাঁচুক শঙ্খচূড়।

শঙ্খচূড় পাশেই দাঁড়িয়েছিল। জীমূতবাহনকে এগিয়ে আসতে দেখেই হাউমাউ করে বুড়ি কেঁদে উঠতেই শঙ্খচূড় বলেছিলেন, কেঁদো না, মা। ইনি গরুড় নন। গরুড় এত সুন্দর নন।

জীমূত বললে, আমি জীমূতবাহন। এসেছি আপনার বদলে গরুড়ের পেটে যেতে। কাপড় মুড়ি দিয়ে নিজেকে এমন ঢেকে নেব যে গরুড় চিনতেও পারবে না।

বাধা দিল শঙ্খচূড়। বললে, তা হয় না। আপনি তো জীমূতবাহন, দয়ার সাগর। আমার জন্যে আপনার প্রাণ যাওয়া সমীচীন নয়। আমি গোকর্ণকে প্রণাম করে এসেই খাদ্য হবো গরুড়ের। মা, তুমি বাড়ি যাও।

বলে, গেল গোকর্ণ প্রণামে।

আর ঠিক এই সময়ে ডানার ঝাপটায় বাতাসে ঝড় তুলে গরুড়কে আসতে দেখেই গায়ে মাথায় কাপড় মুড়ি দিয়ে চ্যাটালো পাথরের ওপর শুয়ে পড়েছিল জীমূতবাহন।

যেখানে প্রাণ দিতে আসে নাগেরা।

গরুড় সোঁ-সোঁ করে এসে, ঠোঁটে করে জীমূতবাহনকে তুলে নিয়ে গিয়ে বসল মলয়পাহাড়ের চুড়োয়। শুরু হল ঠুকরে ঠুকরে মাংস খাওয়া।

পুষ্পবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল আকাশ থেকে। পরকে বাঁচানোর জন্যে জীবিত অবস্থায় এহেন আত্মদানের ঘটনা তো কখনও ঘটেনি।

জীমূতবাহনকে প্রথমে ঠুকরে ঠুকরে রক্ত ঝরিয়ে তারপর ঠোঁটে তুলেছিল গরুড়। রক্তাক্ত জীমূতকে ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময়ে তার মাথায় মণি রক্তমাখা অবস্থায় ঠিকরে পড়েছিল মলয়বতীর কোলে। মলয়বতী সেই মণি দেখিয়েছিল শ্বশুর আর শাশুড়িকে। বিদ্যাজ্ঞান প্রয়োগে জানা হয়ে গেছিল কী অবস্থায় রয়েছে জীমূতবাহন। তিনজনেই তৎক্ষণাৎ ছুটে বেরিয়ে গেছিল তার খোঁজে।

দেখা হয়ে গেছিল শঙ্খচূড়ের সঙ্গে। সে ফিরছিল গোকর্ণ প্রণাম সেরে।

রক্তধারা অনুসরণ করে পৌঁছে গেছিল মলয় পাহাড়ের চুড়োয়।

এদিকে গরুড়ের মনে খটকা লেগেছে, খাদ্য-প্রাণীটার সারা শরীরে রোমাঞ্চ আর হর্ষচিহ্ন। দেখে, ঠুকরে ঠুকরে যাকে খাওয়া হচ্ছে, সে কেন এত প্রফুল্ল! প্রাণেও মরছে না, আনন্দে যেন ফেটে পড়ছে।

এ আনন্দ প্রাণ দেওয়ার আনন্দ, পরের উপকারে।

খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল গরুড়ের।

জীমূতবাহন বললে—খাওয়া বন্ধ করলে কেন? এখনও তো অনেক মাংস রয়েছে!

শুনেই বুঝল গরুড়, নাগ তো নয়, খাচ্ছে এক মানুষকে।

ঠিক এই সময়ে হাজির হল শঙ্খচূড়।

বললে, কী মুশকিল! মানুষ খাচ্ছো কেন? আমিই তো নাগ। এই দ্যাখো আমার দুটো জিভ, আর ফণা। এই মানুষের তা নেই। খাও আমাকে।"

একই সময়ে ছুটে এসে মলয়বতী আর তার শ্বশুর-শাশুড়ি হৃদয়বিদারক এই দৃশ্য দেখে কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে।

গরুড় হল বিমূঢ়। একী অনুচিত কাণ্ড সে করেছে! জীমূতবাহনের পরিচয় পেয়ে সে স্তম্ভিত।

বিগত প্রাণ হল জীমূতবাহন।

হাহাকার করে উঠল মলয়বতী।

স্বর্গ থেকে নেমে এলেন দেবী ভগবতী। কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে দিতেই প্রাণ ফিরে পেল জীমূতবাহন, শরীর হলে ক্ষতহীন, আগের চেয়েও কান্তিময়।

আবার কমণ্ডলুর জল ছিটোলেন দেবী ভগবতী, এবার জীমূতবাহনের মাথায়। বললেন, সম্রাট হও বিদ্যাধর রাজ্যের—আজ থেকে।

বিদায় নিলেন দেবী। গরুড় বললে, সবিনয়ে সম্রাট জীমূতবাহন, বলুন কী করতে হবে আপনার জন্যে।

জীমূত বললে, আজ থেকে আর নাগদের খাবেন না। যাদের খেয়ে হাড় ফেলে রেখেছেন, তাদের বাঁচিয়ে দিন।

তৎক্ষণাৎ বেঁচে উঠলো সমস্ত নাগ, গরুড়ের ইচ্ছায়।

বিদ্যাধর সম্রাটের সিংহাসনে গিয়ে বসল জীমূতবাহন।

বেতাল বললে, কাকে বেশি প্রশংসা করতে হয়? জীমূতবাহনকে, না শঙ্খচূড়কে?

শঙ্খচূড়কে, সঠিক জবাব দিলেন রাজা, কারণ সে প্রাণে বেঁচে গিয়েও ফের এসেছিল প্রাণ দিতে। জীমূতবাহন মহৎ, কিন্তু সে তো বহু জন্মের কর্মফলের মহত্ত্ব।"

মুখের মতো জবাব পেয়ে আর কি থাকে বেতাল? চম্পট দিল তৎক্ষণাৎ।

৯১. সপ্তদশ বেতাল

রাজা আবার বেতালকে ঘাড়ে নিলেন, শিমূল গাছ থেকে নামিয়ে। চললেন গন্তব্য স্থান অভিমুখে।

আবার একটা জমাটি গল্প শুরু করল বেতাল, পুরোনো শর্তে, জবাব সঠিক না হলে মস্তক হবে শতচূর্ণ।

কনকপুর ছিল গঙ্গাতীরের এক রাজ্য। রাজা ছিলেন যশোধন। তেজস্বী নৃপতি।

শহরে ছিল এক সওদাগর। তাঁর মেয়ের নাম রাখা হয়েছিল উন্মাদিনী। কেননা, তাকে দেখলেই আতীব্র কামনায় উন্মাদ হয়ে যেত পুরুষ।

সওদাগর চাইল এমন কামরূপ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হোক স্বয়ং রাজার।

রাজার জ্যোতিষীদের মাথা ঘুরে গেল কন্যাকে দেখে। এ মেয়ে যদি রাজার কোলে বসে, তাহলে তো রাজ্যশাসন করতে ভুলে যাবেন রাজা। রাজত্ব গোল্লায় যাবে।

তাই মিথ্যে করে বললে রাজাকে, কন্যা অতিশয় কুলক্ষণা।

রাজা তাকে বিয়ে করলেন না।

সওদাগর কন্যার বিয়ে দিলেন রাজার সেনাপতি বলধর-এর সঙ্গে। সুখী হল দুজনে।

এর পরেই এল বসন্ত কাল। উৎসব শুরু হল রাজ্য জুড়ে। দেখতে বেরিয়েছিলেন রাজা। দেখলেন উন্মাদিনীকে, দাঁড়িয়েছিল সেনাপতির বারান্দায়।

মাথা ঘুরে গেল রাজার। এমন মেয়ে কখনও কুলক্ষণা হতে পারে না। বুঝলেন, মিথ্যে বলেছিল জ্যোতিষীরা, তাদেরকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

নিজে অসুস্থ হলেন, উন্মাদিনী চিন্তায়।

খবর পেয়ে সেনাপতি এল। বললে, আমি আপনার দাসী, দাসপত্নী আপনার দাসী, পরনারী নয়। স্বচ্ছন্দে তাকে ভোগ করুন।

রাজা রাজি হলেন না।

সেনাপতি বললে, তাহলে আমি ওকে দেবালয়ের দেবদাসী করে দিচ্ছি। দেবদাসী সম্ভোগ পাপ কাজ নয়।

রাজা তাতেও রাজি হলেন না। মারা গেলেন কামজ্বরে। সেনাপতি আত্মহত্যা করল আগুনে পুড়ে।

বেতাল বললে, কে বেশি সাত্ত্বিক? রাজা, না সেনাপতি?

রাজা ত্রিবিক্রমসেন বললেন, রাজা। কেননা, রাজা মাত্রই স্বেচ্ছাচারী হয়। ভোগ করে যেনতেনপ্রকারেণ। তিনি তা করেননি। আর সেনাপতি তো তার কর্তব্য করেছে। প্রভুর চিত্ত বিনোদন করা ভৃত্যের কর্তব্য, যেনতেনপ্রকারেন।

বেতাল উধাও হয়ে গেল সমুচিত জবাব শুনে।

৯২. অষ্টাদশ বেতাল

তারপরেই দেখিয়ে দিল মায়াবী বেতাল নিজের মায়া। শিমুল গাছে ঝুলিয়ে রাখল অনেকগুলো মড়া।

রাজা দৌড়ে গিয়ে ধাঁধায় পড়লেন। এত মড়ার মধ্যে কোনটায় বেতাল রয়েছে বুঝতে পারলেন না। এদিকে যদি রাত ভোর হয়ে যায়, তাহলে তো ব্যর্থ হবেন। আগুনে পুড়ে মরা ছাড়া উপায় থাকবে না।

রাজার মনোভাব বুঝে নিল বেতাল। প্রকৃতই সত্ত্বগুণের আধার এই নৃপতি। গুটিয়ে নিল নিজের মায়া।

ফটাফট অদৃশ্য হয়ে গেল অন্যান্য মড়া, একটা ছাড়া, যার মধ্যে রয়েছে বেতাল।

তাকে ঘাড়ে নিয়েই দৌড় দিলেন রাজা।

বেতাল শুরু করল আর একখানা মুশকিলের গল্প।

উজ্জয়িনী শহরটা ছিল ভোগবিলাসের জায়গা, কোথায় লাগে ইন্দ্রপুরী। কিন্তু কোমলা কামিনী ভোগ করা ছাড়া কুটিলতা ছিল না কারও মনে। মেয়েরা চোখ বেঁকিয়ে তাকালেও বেঁকিয়ে কথা বলতো না কেউ। কাঠিন্য দেখা যেত শুধু কামিনীদের কাম-কঠিন পয়োধরে, কঠিন ছিল না কারও বাক্য। মূর্খ ছিল শুধু গোরু, মানুষ নয়। রাতের অন্ধকারেই মনের তমসা প্রকাশ পেত কোমলা নারীর নিবিড় সান্নিধ্যে, নইলে নয়। এমন দেশের মন্ত্রীর ছেলে নিজে শাস্ত্রবিদ হয়েও আসক্ত ছিল জুয়োর নেশায়। তার নাম চন্দ্রস্বামী।

চন্দ্রস্বামী একদিন জুয়ো খেলতে গিয়ে পরনের বস্ত্র পর্যন্ত খোয়াল। সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে তিনদিন লাঠিপেটা খেয়ে গেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কিন্তু কাণাকড়িও যখন আর দিতে পারল না, একটা অন্ধকার কুয়োয় ঠেলে ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল জুয়ারিরা, তাকে নিয়ে আসা হল জঙ্গলে। কিন্তু আধমরা অবস্থা দেখে জঙ্গলেই ফেলে রেখে চম্পট দিল পাষণ্ড জুয়ারিরা, খেয়ে যাক বনেপ শ্বাপদ, ল্যাটা চুকে যাক।

কিছুক্ষণ মড়ার মতো পড়ে রইল চন্দ্রস্বামী বেহুঁশ অবস্থায়। তারপর অতিকষ্টে উঠে টলতে টলতে একটা শিবমন্দরে। সারাদিন রইল সেখানে। দিনের শেষে সন্ধ্যা সমাগমে এলেন এক ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী। ভিক্ষার ভাগ দিলেন ক্ষুধাতক্লিষ্ট চন্দ্রস্বামীকে।

চন্দ্রস্বামী বললে, আমি যে ব্রাক্ষণ। ভিক্ষার ভাগ তো নিতে পারি না।'

এই সন্ন্যাসী ছিলেন যোগ সিদ্ধপুরুষ। অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। চন্দ্রস্বামীর কথা শুনে ঢুকলেন নিজের কুঁড়েঘরে। বিদ্যাকে স্মরণ করলেন, যে বিদ্যার কাছে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়।

বিদ্যা এল। সন্ন্যাসী বললেন, অতিথির যথা আপ্যায়ন করো।

সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রস্বামী দেখল, একটা সোনার সৌধ এসে গেছে তার সামনে। সামনে এক মনোরম বাগান। চাকর-চাকরানি নানারকম খাবার-দাবার সাজিয়ে বসে আছে তার সেবার জন্যে।

একি মায়া মরীচিকা? চন্দ্রস্বামী যখন চোখ রগড়াচ্ছে, দলে দলে বেরিয়ে এল স্বর্ণবরণ অতি সুন্দরী রমণীরা সোনার প্রাসাদের ভেতর থেকে। খাতির করে চন্দ্রস্বামীকে নিয়ে গেল কনকভবনের ভেতরে। তাকে স্নান করিয়ে, মূল্যবান বস্ত্র পরিয়ে খেতে বসাল পাশেই বসল সবচেয়ে সুন্দরী, খেল একসঙ্গে, শুতে গেল একসঙ্গে, সুখদায়ক রমণ কর্মের পর ঘুমিয়ে পড়ল একসঙ্গে।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙার পর চন্দ্রস্বামী অবাক হল। আর একবার। সামনে দাঁড়িয়ে সেই সন্ন্যাসী। সোনার প্রাসাদ নেই, দাসদাসী নেই, রতিবিহার-সঙ্গিনী নেই ললনাও নেই।
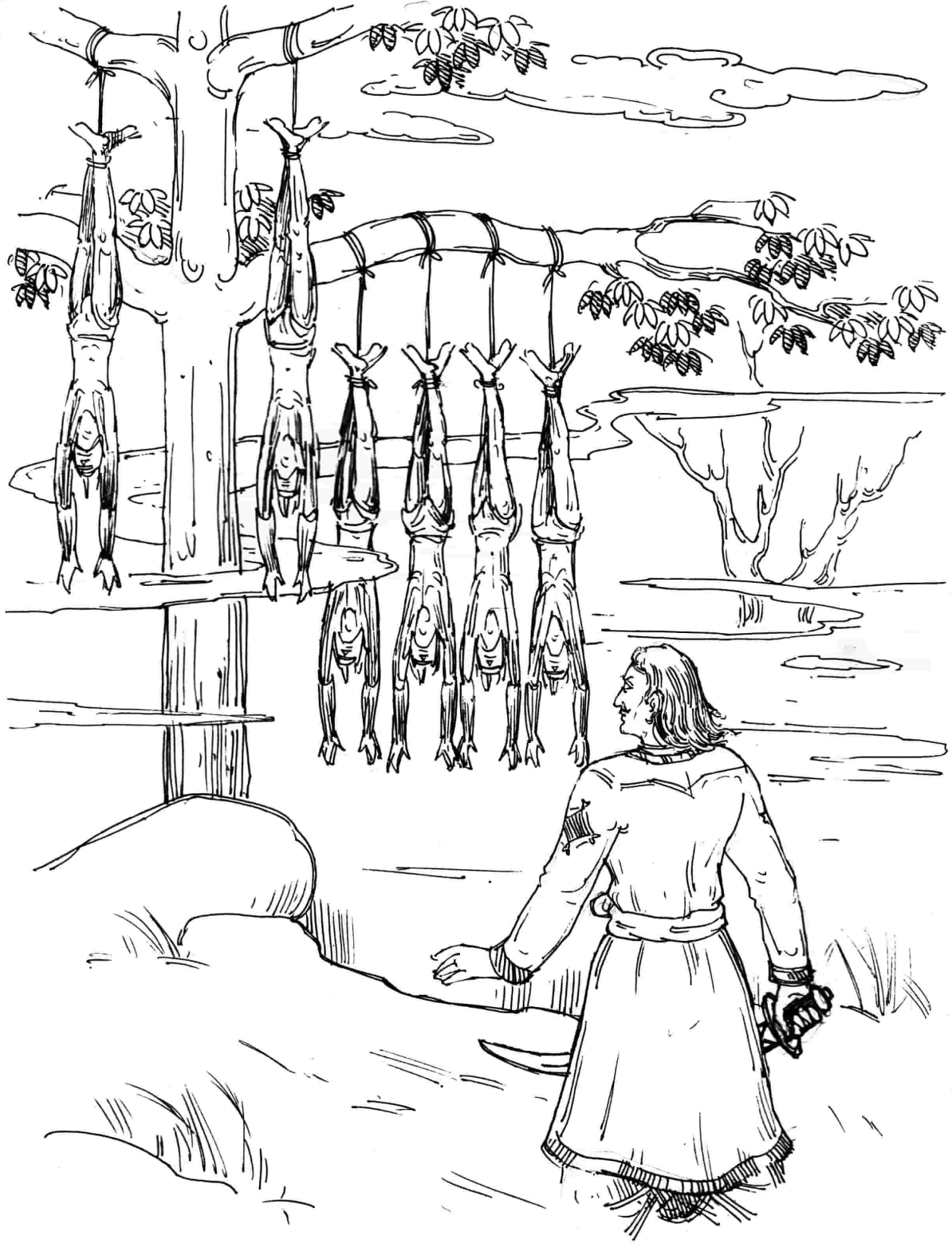
এত মড়ার মধ্যে কোনটায় বেতাল রয়েছে বুঝতে পারলেন না।

আছেন শুধু সেই সর্বত্যাগী সাধু আর শিবমন্দির। কাতরকণ্ঠে চন্দ্রস্বামী বললে, প্রভু, কাল রাতের ওই সুন্দরী ছাড়া যে আমি বাঁচব না।

সন্ন্যাসী বললেন, থাকো এখানে। রজনীতে আবার পাবে তাকে।

সত্যিই তাই হল। শুধু সেই রাতে নয়, প্রতিরাতে।

একদিন চন্দ্রস্বামী বললে শৈব-উপাসককে, আমাকে শিখিয়ে দিন এই বিদ্যে।

সন্ন্যাসী বললেন, তুমি শিখতে পারবে না।

চন্দ্রস্বামী বললে, কেন পারবো না?

সন্ন্যাসী বললে, জলের মধ্যে থেকে সাধনা করতে হয়। সাধককে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্যে এইসব মোহ উপস্থিত করা হয়। সবই মায়া, মিথ্যা। কিন্তু এই মিথ্যাকে সত্যি বলে যে মনে করে, করানো হয়, সে এই বিদ্যা লাভ করতে পারে না। কিন্তু যে এই মায়ামোহের ঊর্ধ্বে থেকে বহুজন্ম স্মরণ করে, কর্মফল অনুধাবন করে, অনলে প্রবেশ করে ফের উঠে এসে জলে প্রবেশ করে, সে পায় এই মহামায়া সৃষ্টির মহাবিদ্যা। কিন্তু অপাত্রে এই বিদ্যা দান করলে বিদ্যাগুরুর বিদ্যা নষ্ট হয়ে যায়। তুমি যা পাচ্ছ, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাক, অধিক প্রত্যাশা করো না, আমার বিদ্যানাশ হবো।

চন্দ্রস্বামী কিন্তু নাছোড়বান্দা।

অগত্যা তাকে নদীর তীরে নিয়ে এসে শিক্ষা দিলেন সেই সিদ্ধপুরুষ। নদীতে ডুবে মন্ত্র জপ করতে করতে সমস্ত বিস্মৃত হল চন্দ্রস্বামী। তার মনে হল, সে যেন জন্ম নিল একজনের ঔরসে, বড় হল, পৈতে নিল, বেদ পড়ল, বিয়ে করল, ছেলে হল, পুত্রস্নেহে বদ্ধ হল আত্মীয় সমাবেশে মোহিত হয়ে রইল।

কিন্তু সেই মায়া কাটিয়ে দিলেন যোগসিদ্ধ সন্ন্যাসী। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন নদীর তীরে। চন্দ্রস্বামী বুঝল, এসব মায়া।

তখন, আগুনে ঢুকে পরবর্তী সাধনা শুরু করতে যেতেই মিথ্যা আত্মীয়েরা তাকে ঘিরে ধরে বললে, করছো কী? করছো কী?

দিব্যস্বামী তখন সর্তক, গুরুর কৃপায়। কারও কথায় কান না দিয়ে চলে এল নদীর ধারে শ্মশানে, যেখানে জ্বলছে অনেকগুলো চিতার আগুন। তার বুড়োবুড়ি বাবা-মা আর যুবতী বউ কাঁদছে, কাঁদছে বাচ্ছারা।

মায়া! মায়া! সব মায়া! বুঝলে চন্দ্রস্বামী। প্রতারিত না হয়ে প্রবেশ করল আগুনে। আগুনকে মনে হল বরফের মতো কনেকনে।

ঘুচে গেল মায়ার খেলা, উঠে এল নদীতীরে। সব বললে গুরুকে।

গুরু বললেন, কোথায় একটা ত্রুটি হয়েছে। আগুনকে বরফের মতো কনেকনে মনে হবে কেন? এই বিদ্যা সাধনকালে তা তো হয় না।

দিব্যস্বামী বললে, গুরুদেব, আমি তো কোনও ভুল করিনি।

গুরু বললেন, যাচাই করে নিচ্ছি। ভুল যদি করে থাকো, আমার বিদ্যা নষ্ট হয়ে যাবে।

বিদ্যার প্রয়োগ ঘটাতে গেলেন গুরু। পারলেন না। আর সেইসব মায়ামরীচিকা সৃষ্টি করতে পারলেন না। তাঁর বিদ্যানাশ হয়েছে, অপাত্রে বিদ্যাদান করতে গিয়ে!

বেতাল বললে, শিষ্য তো গুরু নির্দিষ্ট পথেই বিদ্যাসাধনা করেছিল। তা সত্বেও, বিদ্যা চলে গেল কেনদুজনেরই?

রাজা বললেন, শিষ্যর মনে অবিশ্বাস ছিল বলে। অবিশ্বাসী শিক্ষার্থী তো অপাত্র। অপাত্রে বিদ্যাদান অধর্ম। সেই অধর্মে বিদ্যা চলে গেল সন্ন্যাসীর, সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীর।

রাজা দেখলেন, বেতাল পালিয়েছে।

৯৩. ঊনবিংশ বেতাল

আবার তাকে নামালেন শিমূল গাছ থেকে, আবার ঘাড়ে নিলেন, আবার দৌড়োলেন। মনের জোর তাঁর অপরিসীম। বেতাল বিস্মিত। ক্লান্তি অপনোদনের জন্যে শুরু করল আর একটা চমকপ্রদ কাহিনি। অবশ্যই রাজার খুলি শতখান করার সংকল্প নিয়ে।

বক্রোলক নগরের রাজা ছিলেন সূর্যপ্রভ। তাঁর পুত্র ছিল না, অথচ পত্নী সংগ্রহ করেছিলেন অনেক। তাই মনে ছিল দুঃখ।

এই সময়ে তাম্রলিপ্তি নগরে ছিল ধনপাল নামে এক ধনী সওদাগর। তাঁর কন্যা ধনবতী ছিল রূপের আকর। বিশ্বসুন্দরী।

এমন সুন্দরী মেয়ের বিয়ে দেওয়ার আগেই পরলোকে যেতে হয়েছিল ধনপাল সওদাগরকে। জ্ঞাতিশত্রুরা রাজার সঙ্গে ষড় করে সম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়েছিল তার বিধবা বউয়ের দখল থেকে।

বিপদ বুঝে মেয়েকে নিয়ে দেশত্যাগী হয়েছিল বিধবা, সঙ্গে নিয়ে গেছিল গুপ্তধন। রাতের অন্ধকারে পথ চলতে গিয়ে না দেখে যাকে মাড়িয়ে ফেলেছিল সওদাগর পত্নী, সে একজন চোর। শূলবিদ্ধ হয়েও মরেনি, প্রাণটা গলায় এসে ঠেকে রয়েছে।

একে মরণযন্ত্রণা, তার ওপরে পায়ে মাড়িয়ে যাওয়া, চোর তো ককিয়ে উঠবেই।

ক্ষমা চেয়েছিল বিধবা। তখন পুবগগন ফর্সা হচ্ছে। ভোরের আলোয় সওদাগর কন্যার আশ্চর্য রূপ দেখে মরণকালেও বিয়ের ইচ্ছে হয়েছিল চোরের।

বলেছিল কন্যার মাকে, গাছতলায় পোঁতা আছে আমার সহস্র স্বর্ণমুদ্রা। দেব তোমাকে, বিনিময়ে দাও তোমার মেয়েকে, আমার বউ হোক সে। আমি মরলে, অন্য পুরুষকে দিয়ে গর্ভে আসুক পুত্র, সেই পুত্র হবে আমার ক্ষেত্রজপুত্র। মরেও শান্তি পাবো।

সোনার টাকার লোভে বেনেরা সব করতে পারে। বণিকবধূ তিলমাত্র বিলম্ব না করে কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল চোরের। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হল চোরের। গাছের তলার মাটি খুঁড়ে হাজার সোনার টাকা নিয়ে চম্পট দিল বিধবা মা, সঙ্গে বিধবা মেয়ে।

গেল বক্রোলকপুর নগরে। সেখানেই বসবাস শুরু করল একখানা বাড়ি কিনে নিয়ে। আর এই বাড়ির জানলা থেকেই একদিন মনোস্বামী নামে অপূর্ব কান্তিময় যুবককে দেখে কামশরে বিদ্ধ হয়ে জ্বলে গেল বিধবা কন্যা। বায়না ধরল বিয়ে করবে পথের ওই রূপবান যুবককে।

রূপবান ব্রাহ্মণ যুবক মনোস্বামী কিন্তু পয়লানম্বর চরিত্রহীন। বেশ্যাসক্ত। হংসাবলি নামে এক বারবনিতা তার কাছ থেকে নগদ পাঁচশো সোনার টাকা নিয়ে তবে একবার মাত্র সহবাস করতে দিত। সেই অর্থ ছিল না মনোস্বামীর। অথচ চাই হংসাবলিকে।

এমন সময়ে বণিককন্যা দেখল তাকে। তার কামজ্বর দেখে তার মা ভাবলে, তাহলে এই যুবককে দিয়েই কন্যাগর্ভে ক্ষেত্রজপুত্র উৎপাদন করা যাক।

মনোস্বামী দাম হাঁকল পাঁচশো সোনার টাকা, একবার মাত্র সহবাসের জন্যে।

তাতেই রাজি বিধবা মা। সোনার টাকা গুণে দিয়ে, বিধবা মেয়ের সঙ্গে মনোস্বামীর বিয়ে দিয়ে, সেই দণ্ডেই তাদের একত্রে শুইয়ে দিল এক বিছানায়। এবং নিবিড় সহবাসের ফলে ওই একবারেই গর্ভাধান ঘটে গেল বণিককন্যার।

মনোস্বামীর তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। পঞ্চশত স্বর্ণমুদ্রা উড়িয়ে দিল এক রজনীতেই একবার মাত্র বেশ্যাসংসর্গ করে।

যথাসময়ে এক সুলক্ষণযুক্ত পুত্র প্রসব করেছিল বণিককন্যা। তার মা সদ্যোজাত সেই নাতিকে রেখে এসেছিল রাজার সিংহতোরণের সামনে, নিশুতি রাতে পাশে একটা থলিতে পাঁচশো সোনার টাকা, মহাদেবের স্বপ্নাদেশে।

রাজার স্বপ্নেও মহাদেব এসে বলে গেছিলেন, অপুত্রক বলে তোমার মনে বড়ো দুঃখ। যাও, সিংহতোরণের সামনে রয়েছে এক সুলক্ষণযুক্ত ছেলে। সবে জন্মেছে। সে হোক তোমার রাজপুত্র। পাঁচশো সোনার টাকা আছে পাশে, ছেলেকে মানুষ করার টাকা।

তাই হয়েছিল সিংহতোরণের সামনে গিয়ে সবে জন্ম নেওয়া ছোট্ট ছেলেটার হাতে আর পায়ে রাজচিহ্ন দেখেছিলেন রাজা, পতাকা আর চক্র চিহ্ন, জড়ুল আকারে জন্মসূত্রে পাওয়া নির্ঘাত রাজপুত্র এসেছে অন্যের ঔরসে। রাজা তাকে যুবরাজের শিক্ষা দিলেন, তারপর রাজধর্ম বুঝিয়ে দেওয়ার পর তাকে রাজা করে দিয়ে রাজ্য ত্যাগ তীর্থ দেখতে বেরোলেন। কাশীতে মারা গেলেন।

এই যে ছেলে, ক্ষেত্রজপুত্র হয়েও যে রাজপুত্র হয়েছে, নামকরণ হয়েছে চন্দ্রপ্রভ, একদিন সেও বৃদ্ধ হল, রাজ্যত্যাগ করে তীর্থভ্রমণে বেরোল, গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দিতে গেল পিতৃপুরুষদের।

তিনখানা হাত বেরিয়ে এল পিণ্ড নিতে ....

পিণ্ড দেবে কোন হাতে?

একখানা হাত লোহার, নিশ্চয় চোরের হাত।

দ্বিতীয় হাতটা পবিত্র, নিশ্চয় ব্রাহ্মণের হাত।

তৃতীয় হাতটা ভোগী হাত, বড়ো নরম, আঙুলে সোনার আংটি, নিশ্চয় রাজার হাত।

চন্দ্রপ্রভ দ্বিধায় পড়ল। পিণ্ড দেবে কোন হাতে?

বেতাল সেই প্রশ্ন রাখল রাজা ত্রিবিক্রমসেনের সমীপে।

তিনি দিলেন সপেটা জবাব, চোরের হাতে। কারণ চন্দ্রপ্রভ চোরের ক্ষেত্রজপুত্র, যার ঔরসে তার জন্ম, সে তো টাকা নিয়ে গর্ভাধান করেছে, বীর্য বিক্রি করেছে।

চন্দ্রপ্রভকে মানুষ করেছেন যে রাজা, তিনিও তো টাকা নিয়ে অর্থাৎ দাম নিয়ে ছেলে মানুষ করেছেন। অর্থাৎ ছেলে কিনেছেন। চোর মরবার আগে তার বৈধ বধূকে আজ্ঞা দিয়ে গেছিল অন্যর ঔরসে আনো পুত্র, সে হবে আবার ক্ষেত্রজপুত্র। বড় উদার, নিঃস্বার্থ অভিপ্রায়, মৃত্যুকালে। সুতরাং পিণ্ড পাবে চোর।

বেতাল তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করলো শিমূল গাছে।

৯৪. বিংশ বেতাল

ফের বেতাল বহন শুরু হতেই বেতাল বললে, কী মুশকিল! বদমাস ওই সন্ন্যাসীটার কাছে আমাকে পৌঁছে দিতে এত ব্যগ্রতা কেন আপনার?

রাজা কর্ণপাত না করে প্রায় দৌড়ে চললেন বেতালকে কাঁধে নিয়ে।

নাচার হয়ে বেতাল বললে, তাহলে শোনাই আর একখানা প্রহেলিকা উপাখ্যান। সঠিক সমাধান না পেলে কিন্তু মস্তক হবে শতখান।

তিনখানা হাত বেরিয়ে এল পিণ্ড নিতে ....

চিত্রকূট নগরের নৃপতি ছিলেন চন্দ্রাবলোক। তাঁর সব ছিল, ছিল না কেবল মহিষী।

মনের দুঃখে একদিন মৃগয়া করতে গিয়ে বনের মধ্যে দেখলেন এক মুনিকন্যাকে। অপরূপার অঙ্গে শুধু গাছের চাল আর মাথায় ফুলের অলঙ্কার থাকলে কী হবে, রূপের আলোয় অরণ্য অঞ্চল যেন উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

কন্যার সখীদের কাছে পরিচয় জেনে নিলেন রাজা চন্দ্রাবলোক। এ মেয়ে অপ্সরা মেনকার গর্ভে জন্মেছে, কন্বমুনির ঔরসে। মুনির আশ্রম নিকটেই।

মুনির সামনে চলে গেলেন রাজা। তাঁর জামাই হতে চাইলেন। মেয়েটির নাম ইন্দীবরপ্রভা। সে-ও মজেছিল রাজাকে দেখে। সুতরাং দুজনের বিয়ে দিয়ে দিলেন মুনি।

নতুন বউকে নিয়ে রাজবাড়ি ফেরার সময়ে রাত নামল বনে। মস্ত একটা অশ্বত্থ গাছতলায় আশ্রয় নিলেন রাজা। ফুলশয্যা হয়ে গেল রাতের অন্ধকারে। সুখপ্রদ দেহমিলন।

ভোরে উঠে যেই রওনা হতে যাবেন নিজের নগর অভিমুখে, বন কাঁপিয়ে তাঁর সামনে হাজির হল এক ব্যাদিতবদন ব্রহ্মরাক্ষস, দেবযোনিতে জন্ম নিয়েও যার মানুষ ভক্ষণের রুচি যায়নি।

ভীষণ হুংকার ছেড়ে সে বললে, রে-রে রাজা! তোর স্পর্ধা তো কম নয়! এই অশ্বত্থ গাছে আমার নিবাস। রাতে বেরিয়েছিলাম বনভ্রমণে। সেই ফাঁকে তুই অপবিত্র করেছিস তরুতল পত্নীবিহার করে। এখুনি তোর হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিয়ে খাব কাঁচা রক্ত।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাজা বললেন, না জেনে অন্যায় করে ফেলেছি। আমার এই হৃৎপিণ্ডের বদলে কী খেতে চান বলুন, তাই এনে দেব।

ব্রহ্মরাক্ষসের মাথা একটু ঠাণ্ডা হল রাজার ভয়কম্পিত অমায়িক বচনে।

বললে, একটা ব্রাহ্মণ ছেলে চাই। বয়স হবে সাত। তুই যখন তাকে বলি দিবি আমার সামনে, তখন তার দু-হাত আর দু-পা ধরে থাকবে তার বাবা আর মা। চাই সাতদিনের মধ্যে। না পেলে তোকে খাবো, তোর বউকে খাবো।

ওরে বাবা! কিন্তু কথা দিতে হল তখুনি, নইলে তো রেগে আগুন ব্রহ্মরাক্ষস কড়মড় করে চিবিয়ে খাবে দুজনকেই।

রাজ্যে ফিরলেন রাজামশায়। পরের দিন রাজসভায় কান্না-কান্না গলায় জানালেন তাঁর দুর্দৈব কাহিনি। সাতদিনের মধ্যে এনে দিতে হবে সাত বছরের ব্রাহ্মণ বালককে। নইলে, ইত্যাদি!

একজন অমাত্য অভয় দিলে বললেন, ঘাবড়াবেন না। এই পৃথিবী বড়ো আশ্চর্যের জায়গা, যা চাচ্ছেন, তা পাবেন।

বলে, স্বর্ণকারকে ডেকে তৈরি করালে একটা সোনার ছেলে, যার বয়স সাত, তাকে পরালো হিরে জহরতের বিস্তর গয়না। তারপর মানুষে টানা রথে চাপিয়ে, ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে, সেই সোনার মূর্তি ঘোরালো শহরময়, যে ব্রাহ্মণের আছে সাতবছর বয়েসের ছেলে, সে যদি সেই ছেলেকে ব্রহ্মরাক্ষসকে দিয়ে খাওয়ায়, খাওয়ার সময়ে চার-হাত-পা ধরে রাখে বাবা আর মা, তাহলে তাকে উপহার দেওয়া হবে একশোটা গ্রাম, সেই সঙ্গে এই সোনার মূর্তি।

রাজি হয়ে গেল এমন একজন ব্রাহ্মণ তনয় নিজেই। ঘোষণা শুনে দৌড়ে গিয়ে রাজি করাল বাবা আর মাকেও এই বলে যে একশোটা গ্রাম আর নিরেট সোনার এমন একখানা রাশি রাশি হিরেজহরতের গয়না পরা মূর্তি পেলে আর তো তাদের কোনও অভাব থাকবে না। ছেলে? পরে আবার হবে!

নিজেই গেল রাজার কাছে। একশোটা গ্রামের দানপত্র আর নিরেট সোনার সেই গয়নাপরা মূর্তি এনে দিল বাবা আর মা-কে। তারপর তাদের সঙ্গে নিয়ে গেল রাজার কাছে। রাজা সবাইকে নিয়ে উপস্থিত হল অশ্বত্থ গাছের তলায়।

সেদিন ছিল শপথ পূরণের সপ্তম দিবস। বড়ো বড়ো দাঁত বের করে হাসতে হাসতে এল ব্রহ্মরাক্ষস। ব্রাহ্মণের ছেলেকে চিৎ করে শুইয়ে, তার চার হাত-পা টেনে ধরল বাবা আর মা। শূন্যে কৃপাণ তুললেন রাজা।

ছেলেটা তখন শুধু একটু হাসল।

শূন্যে কৃপাণ তুললেন রাজা।

রাজার তলোয়ার রইল শূন্যে, ব্রহ্মরাক্ষস খাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল স্মিতবদন বালকের দিকে।

মরণকালে এই শেষ হাসির অর্থ?

বেতাল সেই একই জিজ্ঞাসা রাখল রাজার কাছে।

চকিত জবাব দিয়েছিলেন রাজা, বিপরীত বুদ্ধির এহেন পৈশাচিক বিকাশ দেখে। ব্রাহ্মণ বালক জানে পরম সত্য, এই সংসারে সবই অনিত্য, এই দেহটাও অনিত্য, একদিন তো যাবেই, সুতরাং এখনই সেই দেহ দান করে উপকার করা যাক রাজার, বাবা-মায়ের আর ব্রহ্মরাক্ষসের। মাত্র সাত বছর বয়সেই সে পরম জ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে তার মধ্যে, তা একেবারেই অনুপস্থিত বয়স্ক রাজা, বাবা-মা আর দেবযোনিতে জন্ম ব্রহ্মরাক্ষসের মধ্যে। এই প্রহসন প্রত্যক্ষ করে সে যুগপৎ বিস্ময় আর ব্যঙ্গের হাসি হেসে নিয়েছিল দেহান্তরে যাওয়ার প্রাক্কালে।

উধাও হয়ে গেল বেতাল মহোদয় মুখের মতো জবাব পেয়ে। এমন জবর হেঁয়ালির এহেন চটপট অথচ নির্ভুল জবাব সে আশা করেনি।

৯৫. একবিংশ বেতাল

ফের বেতালকে গাছ থেকে টেনে নামিয়ে গোঁয়াড় রাজা ত্রিবিক্রমসেন ছুটলেন অপেক্ষারত সন্ন্যাসী অভিমুখে।

ফের একখানা গল্প আরম্ভ করে দিল বেতাল। এ গল্প স্রেফ অতি-উগ্র কামবিষয়ক। কিন্তু পরিশেষে আছে আর এক হেঁয়ালি, প্রশ্ন।

বিশালানগরে সওদাগর অর্থদত্তর অনঙ্গমঞ্জরী নামে এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল তাম্রলিপ্তি নগরের এক সুপ্রসিদ্ধ সওদাগর পুত্র মণিবর্মার সঙ্গে। মণিবর্মা ঘরজামাই হয়েছিল শ্বশুরবাড়িতে। কারণ, শ্বশুর অর্থদত্তর অর্থ ছিল, কিন্তু পুত্র ছিল না।

ঘরজামাইকে বিস্তর লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়, বিশেষ করে ঘরণীর কাছে। ব্যতিক্রম ঘটেনি বেচারা মণিবর্মার ক্ষেত্রে। উঠতে বসতে গঞ্জনা আর অন্তর টিপুনি খেয়ে যেতে হয়েছে। অথচ, মণিবর্মার চোখের মণি ছিল এই বউ, যার নাম অনঙ্গমঞ্জরী।

একদিন বাবা-মাকে দেখতে গেল মণিবর্মা তাঁদের শরীর খারাপ শুনে। আর ঠিক সেই সময়ে দুরন্ত কামস্পৃহায় ব্যভিচারের পিচ্ছিল পথে পা দিল অনঙ্গমঞ্জরী।

বাড়ির ওপরের বারান্দা থেকে দেখল, রাজপথ দিয়ে যাচ্ছে অতিসুন্দর যুবক কমলাকর, রাজার পুরুতঠাকুরের ছেলে।

কমলাকরও ওপরে তাকিয়ে দেখল অনঙ্গমঞ্জরীকে।

দুজনেই লেহন করে গেল দুজনকে চোখ দিয়ে কাম বাসনায়।

তারপর তিনদিন তিনরাত সে কি যন্ত্রণা অনঙ্গমঞ্জরীর চোখে ঘুম নেই, আহারের স্পৃহা নেই, সাজসজ্জায় স্পৃহা নেই, অষ্টপ্রহর ধ্যান করে গেল নতুন নাগরকে। জ্বলে গেল কাম যন্ত্রণায়। শেষে আর সইতে না পেরে নিশুতি রাতে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে গেল বাগানে।

দেখে ফেলল এক সখী। উদ্বন্ধন স্থগিত রেখে দৌড়োল পুরোহিত, পুত্রের কাছে। হোক অবৈধ সঙ্গম। বাঁচুক অঙ্গমঞ্জরী। যদিও সে পরের বউ। তাতে কী? প্রেম কোনও নিষেধ মানে না।

ব্যভিচারের দূতীর প্রস্তাব লুফে নিল দুশ্চরিত্র কমলাকর। পরকীয়া প্রেমে ঝুঁকি নেই, লাভ বিস্তর।

সুতরাং, কুটিনীর ব্যবস্থা অনুযায়ী গভীর রাতে বাগানে এল কমলাকর। আগে থেকেই সেখানে হাজির ছিল অনঙ্গমঞ্জরী।

অঘটনটা ঘটল তখনই। দুরন্ত কামনায় অস্থির অনঙ্গমঞ্জরীর হৃদযন্ত্র বিকল হল সঙ্গমপূর্ব মুহূর্তে।

পরস্ত্রীর এহেন অকস্মাৎ প্রয়াণে হৃদযন্ত্র স্তব্ধ হল কমলাকরেরও।

খবর পেয়ে চলে এল মণিবর্মা, বাবাকে নিয়ে। বিয়ে করা বউয়ের অধঃপতনের পাপ, আর পাপে মৃত্যু তাকে এমনই শোকাহত করেছিল যে বউয়ের মড়া দেখার সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল তার হৃদযন্ত্রও।

তিন-তিনটে মড়া নিয়ে যখন হইচই আরম্ভ হয়েছে বাগানে, তখন শিবের অনুচররা হাজির ছিল বাগান সংলগ্ন চণ্ডী মন্দিরে। এই শোকবহ দৃশ্য দেখে তারা প্রার্থনা জানিয়েছিল দেবী চণ্ডীকে, প্রাণ ফিরিয়ে দিন তিনজনকে। তিনজনেই মরেছে প্রেমশরের যন্ত্রণায়। প্রেম কি গর্হিত কর্ম?

বিচলিত হয়েছিলেন দেবী চণ্ডী। পাথরের বুকেও দেখা গেছিল প্রাণের স্পন্দন। কিন্তু তাঁর আজ্ঞার মধ্যে ছিল সুবিচার, এদের অকাল মৃত্যুর হেতু অতিশয় কাম। এরা প্রাণ ফিরে পাক, কিন্তু কাম চলে যাক।

যেন ঘুম ভাঙল তিন প্রাণশূন্য কলেবরের। উঠে বসল একই সঙ্গে। মাথা হেঁট করে চম্পট দিল পুরুত-পুত্র কমলাকর। অধোবদনে স্বামীর সঙ্গে ঘরে ফিরল অনঙ্গমঞ্জরী।

বেতাল প্রশ্ন করল রাজাকে, এই তিন প্রেমে অন্ধদের মধ্যে-কার প্রেম সবচেয়ে বেশি? রাজা বললেন, মণিবর্মার। পরপুরুষে আসক্ত জেনেও স্ত্রী-কে সে ক্ষমা করেছে। তার প্রেম নিষ্কাম। অন্য দুজনের প্রেম সকাম। মোক্ষম জবাব পেয়ে বেতাল মায়া বিস্তার করে অদৃশ্য হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

৯৬. দ্বাবিংশ বেতাল

তেজস্বী রাজা তেড়ে গিয়ে আবার তাকে নামালেন শিমূল গাছের ডাল থেকে। ঘাড়ে করে যেই রওনা হয়েছেন, অমনি বেতাল শুরু করল আর একটা আখ্যান।

এক ব্রাহ্মণের ছিল চার ছেলে। হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হল। ব্রাহ্মণীও চিতায় উঠে প্রাণ দিলেন।

চার যুবক ছেলের সর্বস্ব ঠকিয়ে নিল জ্ঞাতিশত্রুরা। নিরুপায় হয়ে নিঃস্ব চার ভাই আশ্রয় নিল মামার বাড়িতে।

কিছুদিন পরেই শুরু হল অবজ্ঞা আর অপমান। আশ্রিতদের আবার মানসম্মান কীসের?

মনের দুঃখে চারভাই একদিন যুক্তি করল এই : চারজনে চলে যাবে চারদিকে। বিজ্ঞান শিক্ষা করে ফিরে আসবে ঠিক এই জায়গায়।

কবে ফিরবে, সেই দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গেল।

টোঁ টোঁ অভিযান চালিয়ে বিদ্যাশিক্ষা করে যথাসময়ে চারভাই মিলিত হল নির্দিষ্ট জায়গায়।

এইবার বলতে হবে, কে কী বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে এল।

প্রথম ভাই বললে, যে কোনও একটা হাড় পেলে আমি তাতে মাংস গজিয়ে দিতে পারি।

দ্বিতীয় ভাই বললে, বাঃ! আমি কিন্তু সেই মাংসে লোম আর চামড়া গজিয়ে দিতে পারি।

তৃতীয় ভাই বললে, আমি পারি লোম-চামড়াময় সেই মাংসখণ্ডের অন্যান্য অবয়ব সৃষ্টি করতে।

চতুর্থ ভাই বললে, আমি পারি সেই অবয়বী প্রাণীর মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করতে।

হৈ-হৈ করে উঠল চারভাই। নিছক একখণ্ড অস্থি থেকে আস্ত একটা প্রাণীর সৃষ্টি, চারবিদ্যার সংযোজনে! হয়ে যাক পরীক্ষা।

পাওয়া গেল একটা হাড়। প্রথম ভাই তার বিজ্ঞান বলে শুকনো হাড়ে মাংস লাগিয়ে দিল। দ্বিতীয় ভাই সেই মাংসে লোম আর চামড়ার সঞ্চার ঘটিয়ে দিল। তৃতীয় ভাই ফটাফট এনে দিল লোম-চামড়াময় মাংসখণ্ডের অন্যান্য অবয়ব। দেখা গেল একটা সিংহ তৈরি হয়ে গেছে। আস্ত। কিন্তু নিষ্প্রাণ।

চতুর্থ ভাই প্রাণের সঞ্চার ঘটাল সিংহ কলেবরে। সিংহনাদ ছেড়ে ভূমিশয্যা থেকে লাফিয়ে উঠেই পলকে পলকে থাবা চালিয়ে চারভাইকে পরলোকে পাঠিয়ে, তাদের টাটকা মাংসে ভুড়িভোজ সাঙ্গ করে, হেলেদুলে অরণ্যে প্রস্থান করল পশুরাজ।

চারভাই চার রকম ভাবে সিংহকে গড়েছিল। কার অপরাধ সবচেয়ে বেশি?

বেতালের এই প্রশ্নের জবাবে রাজা ত্রিবিক্রমসেন বললেন, চতুর্থ ভাইয়ের। আস্ত একটা সিংহকে সামনে দেখেও তাকে সঞ্জীবিত করে বামুন-হত্যার পাপ করেছে।

নিমেষে বিলীন হয়ে গেল বেতাল।

৯৭. ত্রয়োবিংশ বেতাল

নাছোড়বান্দা রাজা বেতালকে ঘাড়ে চাপিয়ে ফের যখন হাঁটা দিয়েছেন, মধুর স্বরে বেতাল বললে, হোক তাহলে আর একখানা গল্প।

এ গল্প কলিঙ্গ দেশের গল্প। এক ব্রাহ্মণ দম্পতির ছেলে হয়েছিল বৃদ্ধ বয়েসে। সেই ছেলে যখন ষোল বছরের কিশোর, একদিন প্রবল জ্বরে সে মারা গেল।

ছেলেকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল, চিতায় শোয়ানো হল.....

ঠিক এই সময়ে আর একটা ঘটনা ঘটে গেল সেই শ্মশানেই।

এক অতিবৃদ্ধ শৈব-উপাসক শ্মশান সংলগ্ন মঠে থাকতেন। চলৎশক্তিহীন বলে তাঁর ভিক্ষা নিতে বেরোতেন এক জোয়ান শিষ্য। সে যেমন বোকা, তেমনি দেমাকি।

মৃত কিশোরকে দাহ করার জন্যে শ্মশানে আনার সময়ে যে বিপুল হট্টগোল হয়েছিল, সেই চেঁচামেচি কীসের জন্যে, শিষ্যকে তা জেনে আসতে বলেছিলেন শৈবযোগী, নিজে হাঁটতে চলতে পারেন না বলে।

তেড়ে মেড়ে শিষ্য বলেছিল, এখন ভিক্ষে করার সময়। আপনি নিজে যান। আমি যাব খিদের চাল জোটাতে।

হেসে বলেছিলেন বৃদ্ধ, এখন তো সবে আধবেলা। এখনই এত খিদে?

তেড়ে উঠে বলেছিল শিষ্য, আপনার মতো গুরুর আমার দরকার নেই। চললাম আমি।

শিষ্য তো গেল। গুরু শুধু হাসলেন। হাসিমুখে অতি কষ্টে দোরগোড়ায় এসে দেখলেন, দাহ করতে আনা হয়েছে এক উজ্জ্বলকান্তি সদ্যমৃত কিশোরকে।

এই দেখেই সিদ্ধযোগীর মাথায় এল একটা বুদ্ধি। তিনি স্বইচ্ছায় নিজের আত্মাকে অন্য দেহে সঞ্চার করার বিদ্যা জানতেন। এখন ঠিক করলেন, কিশোরের মড়ার মধ্যে তিনি ঢুকবেন, বৃদ্ধের অথর্ব মড়া পড়ে থাকবে।

এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তিনি একটা আদ্ভুত কাণ্ড করলেন। নির্জন জায়গায় গিয়ে লুকিয়ে খুব খানিকটা কেঁদে নিলেন। তারপর, ধেই ধেই করে একটু নেচে নিলেন।

তারপরে ঘটিয়ে দিলেন আত্মার সঞ্চালন। বৃদ্ধদেহ পড়ে রইল মড়া হয়ে, কিশোরের মড়া জ্যান্ত হয়ে উঠে বসল চিতায়।

দেহান্তরিত হয়েও বুদ্ধিভ্রষ্ট হননি শৈবযোগী। তরতাজা শরীরে দাঁড়িয়ে উঠে দিয়ে দিলেন একখানা সুললিত মিথ্যা ভাষণ, আমি পরলোকে গেছিলাম। মহাদেব আমাকে ধমক-টমক দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন একটাই শর্তে, তাঁর উপাসনায় জীবন কাটাতে হবে। সুতরাং আমি চললাম। নইলে, ফের মরবো।

বলে, শ্মশান ত্যাগ করলেন দেহান্তরিত সিদ্ধযোগী। আগে নিজের জরাজীর্ণ দেহটাকে ফেলে দিলেন একটা গর্তে। তারপর, শিবপুজোর জন্যে নব কলেবরে চলে গেলেন অন্য জায়গায়।

কিন্তু ইনি প্রথমে একচোট কেঁদে নিয়ে পরে পরমানন্দে নৃতু করলেন কেন?

বেতালের এই প্রশ্নের চটপট জবাব দিলেন রাজা এইভাবে, যে শরীর নিয়ে এতগুলো বছর ধরে সাধনি করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, সেই শরীর ত্যাগের শোকে অত কেঁদেছিলেন। মা-বাপের গড়া শরীরের ওপর মায়ার টান কি এত সহজে যায়? তারপর বিপুল আনন্দে নৃত্য করেছিলেন নব কলেবরে দীর্ঘতর সাধনার সুযোগ পাচ্ছেন বলে।

বেতাল মিলিয়ে গেল বাতাসে।

৯৮. চতুর্বিংশ বেতাল

শিমূল গাছের তলায় ঝটিতি ফিরে গিয়ে ঝুলন্ত শবকে টেনে নামিয়ে, ঘাড়ে চাপিয়ে, সন্ন্যাসী সন্নিধানে রওনা হলেন অকুতোভয় এবং সংকল্পে অটল রাজা ত্রিবিক্রমসেন।

শব আশ্রয়ী মায়াবী বেতাল শুরু করল আর একখানা অতীব দুরূহ প্রশ্নের গল্প। জটিলের জবাব কি দিতে পেরেছিলেন রাজা? দেখা যাক।

দাক্ষিণ্যাত্যে ধর্ম নামে এক রাজা ছিলেন। অন্তর ছিল বড়ো পবিত্র। তাঁর মহিষীর নাম চন্দ্রবতী, কন্যার নাম লাবণ্যবতী।

কন্যা যখন বিবাহযোগ্যা, শত্রুরা দল বেঁধে পথে বসাল রাজাকে।

বউ আর মেয়েকে নিয়ে গভীর রাতে পালিয়ে গেলেন রাজা প্রাণের ভয়ে। সঙ্গে নিলেন সোনাদানা, বউ আর মেয়ের গায়ে রইল জড়োয় গয়না।

গেলেন বনের মধ্যে। পড়লেন শবর ডাকাতদের খপ্পরে। রানি আর মেয়ে পালিয়ে গেল আরও গভীর জঙ্গলে। বীরের মতো লড়ে ডাকাতদের হাতে প্রাণ দিলেন রাজা। লুঠে নিল তারা ধনরত্ন।

বিধবা চন্দ্রবতী কন্যা লাবণ্যবতীকে নিয়ে প্রাণের ভয়ে, ইজ্জত রক্ষার জন্যে ঢুকে গেল আরও নিবিড় জঙ্গলে। পথ হারিয়ে পৌঁছোল এক পদ্মদীঘির পাড়ে।

অসীম ক্লান্ত দুজনেই। পা আর চলে না। ভয়ে বুক কাঁপছে।

ঠিক এই সময়ে দুটো ঘোড়ায় চেপে সেখানে এলেন রাজা চণ্ডসিংহ আর তাঁর ছেলে রাজপুত্র সিংহপরাক্রম।

ধুলোয় পড়েছিল মা আর মেয়ের পায়ের ছাপ। সেই ছাপ দেখিয়ে রাজা বললেন রাজপুত্রকে, মেয়েদের পায়ের ছাপ। অনুসরণ করো। যদি দেখতে পাও, দুজনের একজনকে বিয়ে করবে।

রাজপুত্র বললে, যার পায়ের ছাপ ছোটো, তার বয়স নিশ্চয় কম, তাকে আমি বিয়ে করবো। যার পায়ের ছাপ বড়ো, তার বয়স অবশ্যই বেশি তাকে আপনি বিয়ে করবেন।

রাজা বললেন, এ আবার কী কথা! এই তো কদিন আগে তোমার মা মারা গেছেন। আর বিয়ের ইচ্ছে নেই, তোমার বিমাতা আনবারও দরকার নেই।

রাজপুত্র বললে, তাই কি হয়? যার বউ নেই, তার ঘর ফাঁকা। আর, যে ঘরে পত্নী স্বামীর পথ চেয়ে বসে না থাকে, সে ঘর ঘর নয়, কেল্লা। সুতরাং, বিয়ে আপনাকে করতেই হবে, যার পায়ের ছাপ বড়ো, তাকে।

পুত্রের নির্বন্ধে রাজি হলেন রাজা। বললেন, ঠিক আছে, তুমি যখন যেচে সৎমা চাইছ, তাই পাবে, যার পায়ের ছাপ বড়ো—তাকে।

পায়ের ছাপ অনুসরণ করে পদ্মদীঘির পাড়ে পৌঁছে পিতা-পুত্রের চোখে ধরা পড়ল জড়োয়া গয়নায় মোড়া ভয়-ব্যাকুলা দুই রমণী, মা আর মেয়ে।

মহাসমাদরে দুজনকে আনা হল স্বরাজ্যে। চুক্তি অনুযায়ী রাজা বিয়ে করলেন মেয়েকে, কারণ তার পায়ের ছাপ বড়ো, আর রাজপুত্র বিয়ে করলো মা-কে, কারণ তার পায়ের ছাপ ছোটো!

বেতাল শবের গলা দিয়ে বিকট হাসি হেসে বললে, বিজ্ঞ রাজা, এবার বলুন, এদের যখন বাচ্ছাকাচ্ছা হল, তখন তাদের মধ্যে সম্বন্ধটা দাঁড়াল কী ধরনের?

এইবার প্যাঁচে পড়লেন রাজা ত্রিবিক্রমসেন। ঘেমে গেলেন, কিন্তু অনেক ভেবেও সঠিক জবাব জোগাতে পারলেন না।

সদয় হল বেতাল রাজার পরাজয় দেখে। শাপ দিয়ে খুলি গুঁড়ো না করে তাঁর আসন্ন মৃত্যু ঠেকিয়ে দিল ভবিষ্য দৃষ্টির দৌলতে।

বললে, রাজা, আপনি সত্যিই সরল আর বোকা, এত জ্ঞানী হয়েও। যে সন্ন্যাসীকে শব জোগানোর জন্যে সারারাত মেহনত করে গেলেন, সে একটা পাপিষ্ঠ। মহাধড়িবাজ। আপনি শব নিয়ে যাওয়ার পর সে আপনাকে অষ্টঅঙ্গ প্রণাম করতে বলবে। যেই আপনি তা করবেন, খাঁড়ার কোপে আপনাকে বলি দেবে।

শিউড়ে উঠলেন রাজা, সর্বনাশ!

বেতাল বললে, পরিত্রাণের পথ বাতলে দিচ্ছি। আপনি বলবেন, আমি রাজা, ওইভাবে প্রণাম করতে শিখিনি। আপনি শিখিয়ে দিন। সন্ন্যাসী যখন মাটিতে শুয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম দেখাবে, আপনি তার খাঁড়া দিয়ে, তাকেই বলি দেবেন। তাহলেই তার বিদ্যাধর, ঐশ্বর্য-সিদ্ধি আপনি পেয়ে যাবেন। আপনাকে প্রাণে বাঁচানোর জন্যেই গল্প বলে বলে আপনাকে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। এখন যান, শঠের সঙ্গে শঠতা করে সিদ্ধিলাভ করুন, সমস্ত রাত এত ছুটোছুটির পুরস্কার নিয়ে যান।

বলে, মড়া ছেড়ে প্রস্থান করল বেতাল।

বেতাল বিহীন শব কাঁধে বটগাছের তলায় পৌঁছোলেন রাজা।

৯৯. পঞ্চবিংশ বেতাল

রাজা ত্রিবিক্রমসেন পৌঁছোলেন ভয়াল শ্মশানে। গেলেন বটগাছের তলায়, যেখানে শবসাধনার প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে ধূর্ত শিরোমণি সন্ন্যাসী। জ্বলছে একটা পিদিম। সামনে একটা গোলাকার মণ্ডল তৈরি হয়েছে মানুষের হাড়ের সাদা গুঁড়ো দিয়ে, রক্তমাখা মাটির ওপর। মণ্ডলের চারদিকে রাখা হয়েছে চারটে ঘট, মানুষের রক্তভর্তি ঘট। যে পিদিমটা জ্বলছে টিমটিম করে, তাতে তেল নেই, আছে মানুষের চর্বি।

এই মণ্ডলের সামনেই জ্বলছে হোমের আগুন।

রাজার কাঁধ থেকে শব নামাল সন্ন্যাসী। স্নান করাল। চন্দন মাখিয়ে, মালা পরিয়ে, শুইয়ে দিল মণ্ডলের মধ্যে।

পিদিম আর হোমের আগুনের আভায় দেখা যাচ্ছে শবসাধকের মূর্তি। গলায় ঝুলছে পৈতে, যে পৈতে তৈরি হয়েছে মানুষের মাথার চুল দিয়ে। গায়ে মেখেছে চিতার ছাই। কাপড় দিয়ে মড়া ঢেকে রেখে ধ্যানস্থ

হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর শুরু হল মন্ত্রপাঠ।

এই মন্ত্রের জোরেই শবের মধ্যে সুড় সুড় করে ঢুকে গেল বেতাল।

সন্ন্যাসী পুজো করল সেই বেতালকে। পুজোর উপচার : মানুষের মাথার খুলি, খুলির কপালে মানুষের রক্ত, ফুলের বদলে মানুষের দাঁত, ধূপের বদলে মানুষের চোখ, বলি দেওয়া হল মানুষের মাংস।

শেষ হল পৈশাচিক পুজো।

বললে রাজাকে, শুয়ে পড়ুন মাটিতে। অষ্ট-অঙ্গ পৃথ্বী সংলগ্ন করে প্রণাম করুন মহাশক্তিধর বেতালকে। তাহলেই পাবেন যা চাইবেন।

বেতালের শেখানো কথাগুলো অম্লানবদনে বলে গেলেন রাজা, কিন্তু আমি যে রাজা। এই ধরনের প্রণাম তো কখনও করিনি। আমাকে শিখিয়ে দিন।

সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ অষ্টাঙ্গ প্রণাম শেখানোর জন্যে অষ্ট-অঙ্গ ভূতল সংলগ্ন করেছিল।

এই তো সুযোগ। টপ করে খাঁড়া তুলে নিয়ে ঝপ করে কোপ মারলেন রাজা। অষ্টাঅঙ্গ প্রণাম অবস্থায় সন্ন্যাসীর মুণ্ড হল দেহচ্যুত।

পরক্ষণেই, বুক চিরে টেনে বের করলেন তখনও ধড়ফড়ে হৃদযন্ত্র। উপচার দিলেন বেতালকে।

হৃদয়পদ্মের অর্ঘ্য নিবেদনে পরম প্রীত হয়ে দ্রিমি দ্রিমি অপার্থিব স্বরে বললে বেতাল, রাজা, এই দুষ্ট সন্ন্যাসী বিদ্যধরদের অধিপতি হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কঠিন সাধনায় মেতে ছিল। কিন্তু সাধনা শেষ করলেন আপনি, তাই সিদ্ধি লাভ করলেন আপনি। অনেক কষ্ট দিয়েছি আপনাকে সারারাত ধরে। এইবার দেব তার পুরস্কার। বলুন, কী চান।

টপ করে খাঁড়া তুলে নিয়ে ঝপ করে কোপ মারলেন রাজা।

নির্লোভ রাজা বললেন, কিচ্ছু চাই না। আপনি সন্তুষ্ট, সেইটাই আমার পরম পাওয়া।

যেন বাতাসকে ফাটিয়ে ফাটিয়ে যুগপৎ হর্ষ আর বরাভয় ব্যঞ্জক মন্দ্রমন্থর স্বরে বেতাল বললে, প্রত্যাশা না করে পরোপকার যে করে, তার উপকার প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে হয়। আপনারও হবে। আপনি সানন্দে ব্যক্ত করুন মনোভাব, মঙ্গল চান অপরের। কীভাবে?

রাজা বললেন, এই যে পঁচিশটি গল্প, তা বেতাল পঞ্চবিংশতি নামে জগত প্রসিদ্ধ হোক। এই পঁচিশটি গল্প যে শুনবে আর যে শোনাবে, উভয়ের অন্তর যেন পবিত্র হয়ে যায়। পঁচিশ গল্পের পাঠ যেখানে হবে, সেখানে যেন কোনও অশরীরী উৎপাত না থাকে।

বেতাল বললে, তাই হবে।

বলে, বিদায় নিল শব থেকে।

এইবার মহাদেব আবির্ভূত হলেন মহাশ্মশানে, অন্য সব দেবদেবীদের নিয়ে।

বললেন, ম্লেচ্ছ বিনাশের জন্যে তোমাকে রাজা বিক্রমাদিত্য রূপে সৃষ্টি করেছিলাম আমি। পাপিষ্ঠ এই সন্ন্যাসীর নিধনের জন্যেও তোমাকে ত্রিবিক্রমসেন রূপে সৃষ্টি করেছি আমি। তুমিই হবে বিদ্যাধরদের অজেয় সম্রাট। এই নাও অপরাজিত খড়্গ। যা চাইবে, এই দৈব আদিষ্ট খড়্গ তোমাকে তা এনে দেবে।

অন্তর্হিত হলেন মহাদেব, দেবদেবীদের নিয়ে।

তারপরেই ফুটল ভোরের আলো। রাজ্যে ফিরলেন রাজা। খড়্গপ্রভাবে বিশ্বজয় করলেন। সম্রাট হলেন অতুল সিদ্ধির অধিকারী বিদ্যাধরদের।

বেতাল কাহিনি নিবেদন করার পর মৃগাঙ্কদত্তকে বললে মন্ত্রী বিক্রমকেশরী, সেই ব্রাহ্মণ আমাকে বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্পমালা শুনিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি বেতাল সাধনা করো। আমি মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি। বেতাল তোমাকে পৌঁছে দেবে তোমার প্রভু মৃগাঙ্কদত্তের কাছে। আমি তাই করেছিলাম। নিজের গায়ের মাংস কেটে বেতালকে ভক্ষণ করিয়েছিলাম। খুশি হয়ে বেতাল আমাকে ঘাড়ে চাপিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেল আপনার কাছে।

খুশিমনে সপারিষদ উজ্জয়িনী অভিমুখে রওনা হলেন মৃগাঙ্কদত্ত, প্রিয়া মিলন বাসনায়।

১০০. গণেশ তরুর কাহিনি

পাওয়া গেল ছয় মন্ত্রীকে, এখনও বাকি চারজন। মৃগাঙ্কদত্ত তাদের কথা ভাবতে ভাবতে রওনা হলেন উজ্জয়িনীর দিকে। পৌঁছোলেন এক ভয়ানক জঙ্গলে। সেখানে জন নেই, পথ নেই, ছায়া নেই। নিদারুন গ্রীষ্ম ছারখার করে দিয়েছে বিশাল বনভূমিকে।

দ্রুত চরণে অরণ্য অতিক্রম করে পৌঁছে গেলেন মনোরম এক সরোবরের পাড়ে। সেখানকার জল দেখে মনে হয় যেন সূর্যের তাপে চাঁদের আলো গলে গিয়ে শীতল জল হয়ে গেছে।

সরোবরের পাড়ে রয়েছে একটা অদ্ভুত গাছ। বড়ো বড়ো ডালগুলো হেলছে দুলছে নড়ছে অবিকল মানুষের হাত নাড়ার মতো। খুবই উঁচু গাছ। এত উঁচু যেন মেঘ ছুঁয়ে যাচ্ছে গাছের ডগা। অগুন্তি ফল ঝুলছে প্রতিটি ডালে। যেন, কলসি কলসি অমৃত দুলছে ডালে ডালে।

গাছ দুলছে হাওয়ায়, অথবা দুলে দুলে উঠছে নিজে থেকেই, আর যেন বাতাসের ধ্বনিতে ভাসিয়ে দিচ্ছে হুঁশিয়ার বাণী, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না আমাকে।

কল্পবৃক্ষ প্রতিম অপরূপ সেই অতিবৃহৎ পাদপের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন মৃগাঙ্কদত্ত। মৃগাঙ্কবতী মিলন অভিযানে বেরিয়ে তিনি বিস্ময় সাগরে অবগাহন করতে করতে এসেছেন এতটা পথ, কিন্তু এমন বিস্ময় বৃক্ষ তো জীবনে প্রত্যক্ষ করেননি!

মৃগাঙ্কদত্ত যখন অবাক হয়ে পাদপ নিরীক্ষণ করছেন, তখন খিদের জ্বালায় অধীর ছয় মন্ত্রী তীরবেগে দৌড়ে গিয়ে দোদুল্যমান গাছে পা দিয়ে উঠে পড়েছিল ডালে ডালে—মঙ্গলঘটের মতো দেখতে সরস সুবৃহৎ ফল খাওয়ার জন্যে।

অত্যাশ্চর্য ব্যাপারটা ঘটে গেল চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই।

ছ-জন বেকুব মন্ত্রীই ছ-টা ফল হয়ে ঝুলতে লাগল গাছের ডালে।

হঠকারিতা আর অবিমৃষ্যকারিতার পরিণাম!

দূরদর্শী আর সুবিবেচক মৃগাঙ্কদত্ত গাছতলায় দাঁড়িয়ে শিহরিত শরীরে দেখলেন সেই অবিশ্বাস্য অলৌকিক দৃশ্য। ছ-জন জলজ্যান্ত মানুষ ছ-খানা ফল হয়ে ঝুলছে দুলন্ত গাছের ডালে ডালে!

তিনি যখন হতবুদ্ধি এহেন দৃশ্য দেখে, যখন শোকাকুল বন্ধুদের ফিরে পেয়েও ফের হারিয়ে ফেলার জন্যে, তখন ব্রাহ্মণ শ্রুতধি বললেন আশ্বাস দিয়ে, ভেঙে পড়ছেন কেন? এত বিপদ পেরিয়ে এলেন, এই বিপদও কেটে যাবে।

মৃগাঙ্কদত্ত তখন মুহ্যমান, বন্ধুশোকে। শ্রুতধির কথায় কান না দিয়ে ঝাঁপ দিতে গেলেন সরোবরের জলে, বন্ধু বিহনে এ প্রাণ আর রাখবেন না।

আকাশবাণী শোনা গেল ঠিক সেইসময়ে। গোটা আকাশ যেন ফেটে ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চাইল সেই দিগ্বিদিক কাঁপানো দৈব বচনে।

মৃগাঙ্কদত্ত! জীবন বিসর্জন দিও না। এই গাছে থাকেন গণেশ। বড়ো পবিত্র গাছ। তোমার মন্ত্রীরা গাছে উঠেছিল নোংরা পায়ে, পা না ধুয়ে। তাই গণপতির অভিশাপে তারা ফল হয়ে ঝুলছে। একই পরিণতি হয়েছে তোমার অন্য চার মন্ত্রীরও। তারা খিদের জ্বালায় ছটফটিয়ে হাত-পা না ধুয়ে গাছে উঠেছিল। ফল হয়ে ঝুলছে তারাও। ফলরূপ এই দশ মন্ত্রীকেই তুমি ফিরে পাবে, গণেশের পুজো দিলে। তাঁকে তুষ্ট করো। অভীষ্টসিদ্ধি হবে।

দৈববাণী নববলের সঞ্চার করে গেল মৃগাঙ্কদত্তের মনে।

শুরু হল গণপতি আরাধনা, একাদিক্রমে এগারো দিবস, এগারো রজনী। ছেদহীন জপতপ, অন্তর দিয়ে অন্তরতমের উপাসনা।

দ্বাদশ দিবস কাটল নিরন্তর সাধনায়। সেইরাত্রে চোখ বুঁজে গভীর ঘুমের স্বপ্নে দেখা দিলেন বিঘ্ন বিনাশন গণপতি, যাঁর নৃত্যকালীন শুঁড়ের ঘায়ে আকাশ থেকে নক্ষত্রসকল ফুলের মতো ঝরে পড়ে।

গম্ভীর নিনানীদে সুমধুর বচনে তিনি বললেন, মৃগাঙ্কদত্ত, তোমার তপস্যা আমাকে প্রীত করেছে। তুমি প্রকৃতই বন্ধুবৎসল, বন্ধুপ্রাণ। ফিরে পাবে দশ বন্ধুকে, একসঙ্গে। তাদের নিয়ে যাবে উজ্জয়িনীতে, সেখানে পাবে মৃগাঙ্কবতীকে। সস্ত্রীক রাজ্যে ফিরে আসার পর এই ধরণীর অধীশ্বর হবে, ভূ-ঐশ্বর্য থাকবে তোমার পদতলে।

ভোর হল ঘুম ভাঙল মৃগাঙ্কদত্তের। তৎক্ষণাৎ দেহমন শুদ্ধ করে নিয়ে বসল গণপতি পুজোয়। পুজো শেষ করে ভক্তিভরে আশ্চর্য বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করতেই দশ মন্ত্রীবন্ধু নেমে এল গাছ থেকে ছিল ফল, হয়ে গেল মানুষ।

১০১. মন্দারবতী আখ্যান

সবাই স্নান করলেন সরোবরে সহর্ষে। অভিশাপগ্রস্ত একাদশ বন্ধু ছিটকে ছড়িয়ে গেছিলেন। সেটাও যেমন অতীব আশ্চর্য অলৌকিক কাণ্ড, একাদশ বন্ধুর একত্র মিলিত হওয়ার ঘটনা পরম্পরা তার চাইতেও অতি আশ্চর্য ব্যাপার!

শুদ্ধ হয়ে সরোবর তীরে উঠে আসবার পর মৃগাঙ্কদত্ত জিজ্ঞেস করলেন সেই চার বন্ধুদের তাদের কাহিনি, যারা ফল হয়ে ঝুলছিল গাছে, অভিশাপগ্রস্ত হওয়ার পর চারজনের ভাগ্যে ঘটেছিল কী কী ঘটনা?

চারজনে যা বলে গেল, সংক্ষেপে তা এই :

নাগ মহাশয়ের ভয়ানক অভিশাপে ব্যাঘ্রসেন ছিটকে গিয়ে পড়েছিল এক জঙ্গলে। জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান যখন ফিরে পেল তখনও অন্ধকার কাটেনি। ভোরের দিকে রওনা হয়েছিল উজ্জয়িনী অভিমুখে এই ভেবে যে মৃগাঙ্কদত্ত তো শেষ পর্যন্ত সেইখানেই পৌঁছবেন। পথে দেখা হয়ে গেছিল বাকি তিন বন্ধুর সঙ্গে, এক সরোবরের পাড়ে, দৃঢ়মুষ্টি স্থূলবাহু আর মেঘবল, এই তিন বন্ধুও হাজির হয়েছিল সেখানে। হতাশ মনে

চারজনেই যখন জলে ডুবে আত্মহত্যার কথা ভাবছে, সেই সময়ে এক সন্ন্যাসী এলেন স্নান করতে। তিনি দীর্ঘতপা মুনির ছেলে। সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েকজন মুনিপুত্র।

তাই গণপতির অভিশাপে তারা ফল হয়ে ঝুলছে।

এঁরা চারজনের আত্মহত্যা আটকে দিলেন। চারজনকেই নিয়ে এলেন দীর্ঘতপা মুনির আশ্রমে। তিনি সব শুনে মনে সাহস আর উৎসাহ আনবার জন্যে শোনালেন সুন্দরসেন-মন্দারবতীর কাহিনি।

নিষধদেশের অলকা নগরের রাজা মহাসেন ছিলেন ধর্মপ্রাণ পুরুষ। মহাবীর। তাঁর ছেলে সুন্দরসেন পাঁচ বন্ধু-মন্ত্রী নিয়ে সুখেই ছিল, ছিল না কেবল ঘরণী, তাই বড় মনোকষ্টে ছিল সুন্দরসেন।

মনের দুঃখে একদিন জঙ্গলে শিকার করতে গেছিল সুন্দরসেন। সেখানে দেখেছিল এক সন্ন্যাসিনীকে। প্রৌঢ়া। তাঁর নাম, কাত্যায়নী। সুন্দরসেনের আশ্চর্য রূপ দেখে তিনি অবাক হয়েছিলেন। 'জয়যুক্ত হও' বলে আশীর্বাদ করেছিলেন। কিন্তু অন্যমনস্ক থাকায় সুন্দরসেন তা শুনতে পায়নি।

রুষ্ট হয়েছিলেন সন্ন্যাসিনী। বলেছিলেন, ওহে যৌবনমদমত্ত কুমার, হংসদ্বীপের রাজকন্যা মন্দারবতী যদি তোমার বউ হয়, তাহলে তো অহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করবে!

লজ্জা পেয়েছিল সুন্দরসেন। ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিল। জানতে চেয়েছিল মন্দারবতী উপাখ্যান।

সন্ন্যাসিনী বলেছিলেন, তীর্থ দেখতে বেরিয়ে অনেক দ্বীপে আমি যাই। হংসদ্বীপে দেখেছিলাম মন্দারবতীকে। অপূর্ব রূপসী, যেন স্রষ্টার গড়া আর এক চাঁদ। তার যোগ্য বর হতে পার শুধু তুমি, এতই রূপবান তুমি।

মন্দারবতীর একখানা ছবি এঁকে রেখেছি। এই দ্যাখো।

ছবি দেখেই মন্দারবতীর প্রেমে পড়ে গেছিল সুন্দরসেন। এমন মেয়েকেই তো বিয়ে করা যায়।

বলেছিল সন্ন্যাসিনীকে, ওই ছবির পাশে আমার ছবিটা এঁকে দেবেন?

এঁকে দিয়েছিলেন সন্ন্যাসিনী। ছবি দেখে মনে হল সত্যিই রাজযোটক। অতিশয় শুভসূচক।

ছবিটা রাজপুত্রকে উপহার দিয়ে চলে গেলেন সন্ন্যাসিনী।

কিন্তু সেই মুহূর্ত থেকে উন্মনা হয়ে গেল রাজপুত্র, মন্দারবতী কামনায়।

বাড়িতে ফিরেও তার যখন এই অবস্থা, কারণটা কানে গেল রাজা আর রানির। ছেলেকে ডেকে রাজা বললেন, মন্দাবতীর বাবা মন্দারদেব আমার বন্ধু। এই মেয়ের সঙ্গেই তোমার বিয়ে দেব।

বলে, রাজদূতের হাতে ছবিটা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন হংসদ্বীপে মন্দারদেবের কাছে, বিয়ের প্রস্তাব সমেত।

ছবি দেখে মুগ্ধ প্রত্যেকেই। বিশেষ করে অবস্থা কাহিল হল মন্দারবতীর। এমন সুপুরুষকে কে না বিয়ে করতে চায়। পাশাপাশি দুজনকে মানিয়েওছে চমৎকার।

বিয়ে দিতে রাজি হলেন মন্দারদেব। প্রতিদূত পাঠালেন ভাবী বেয়াইয়ের কাছে। জানতে চাইলেন, ছেলে আসবে বিয়ে করতে, না, মেয়ে যাবে বিয়ে করতে?

মন্দারদেব জানালেন, বর আসুক বউ নিতে, তিন মাস পরে, কার্তিক মাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে।

কিন্তু তিন-তিনটে মাস বসে থাকতে হবে শুনে অস্থির হয়ে গেল মন্দারবতী। খাওয়া-ঘুম মাথায় উঠল। মাঝে মাঝে জ্ঞান লোপও পেল। কামের যাতনা যে বড়ো যাতনা!

মন্দারদেব সব শুনে ভাবলেন, দূর ছাই! ভাবী বেয়াই তো আমার বন্ধু। বন্ধুর বাড়িতে মেয়ে গিয়ে থাকুক না কেন তিনটে মাস।

সিদ্ধান্ত নিয়ে, মেয়েকে জাহাজে চাপিয়ে, পাঠিয়ে দিলেন ভাবী জামাইয়ের বাবার কাছে। সঙ্গে দিলেন মন্ত্রী বিনীতমতিকে।

দিন কয়েক সমুদ্র রইল শান্ত। তারপর হল অশান্ত। দামাল ঝড়ে। জাহাজ ডুবে গেল। ঢেউ মন্দারবতীকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলল এক জঙ্গলের ধারে।

যখন চোখের জলে গাল ভাসাচ্ছে মন্দারবতী, ঠিক সেই সময়ে মতঙ্গমুনি এলেন সমুদ্রতীরে ব্রহ্মচারিণী কন্যা যমুনাকে নিয়ে। মন্দারবতীর কান্না দেখলেন, কাহিনি শুনেলেন, তাকে নিজের আশ্রমে নিয়ে গেলেন।

এত কাণ্ড কিছুই জানত না রাজপুত্র সুন্দরসেন। সে প্রায় তিন-তিনটে মাস বিয়ের দিনের অপেক্ষায় থাকবার পর, যথাসময়ে জাহাজে চেপে বেরিয়ে পড়ল হংসদ্বীপ অভিমুখে। সঙ্গে রইল বন্ধু মন্ত্রীরা, বরযাত্রী হয়ে।

কিন্তু দুর্দান্ত সমুদ্র অশান্ত হয়ে ডুবিয়ে দিল এই জাহাজটাকেও। মন্ত্রী দৃঢ়বুদ্ধিকে নিয়ে সুন্দরসেন জলে ভেসে এসে উঠল সমুদ্রতীরে। অন্য চার বন্ধু ভেসে গেল কোথায়, কে জানে!

আর, সেখানেই এসে পৌঁছোলেন দুজন সন্ন্যাসী। দুই অসহায় যুবককে তাঁরা নিয়ে গেলেন নিজেদের আশ্রমে।

যথাসময়ে খবর পৌঁছে গেল রাজা মহাসেন আর রাজা মন্দারদেব-এর কাছে। একজনের ছেলে ডুবেছে সমুদ্রে, আর একজনের মেয়ে। দুই বন্ধু মিলিত হলেন, শোক সাগরে ডুবে রইলেন।

বিধাতা কিন্তু বিচিত্র খেলা খেলে গেলেন সুন্দরসেন আর মন্দারবতীকে নিয়ে।

বিবাগি হয়ে বনেজঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে মন্দারবতী যে আশ্রমে ছিল, সেই আশ্রমে পৌঁছে গেল সুন্দরসেন! সঙ্গে ছিল বন্ধুবর দৃঢ়বুদ্ধি।

প্রথমে গেছিল আশ্রম-সংলগ্ন সরোবর তীরে। দেখেছিল, জনা কয়েক মুনিকন্যা ফুল তুলছে আর হুল্লোড় করছে। তাদের মধ্যে রয়েছে পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে, যার অসামান্য রূপ আর দেহসৌষ্ঠব দেখলে চোখের পাতা বুঝি স্থির হয়ে যায়।

যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সেই মেয়েটির দিকে চেয়ে ছিল সুন্দরসেন। আর ভাবছিল, কে এই রূপসী? দেবলোকের মেয়ে, না, কোনও রাজার মেয়ে?

গাছের আড়ালে থেকে দুই বন্ধু অনিমেষ নয়নে দেখে গেল রূপসীদের। ফুল তোলা শেষ করে মেয়েরা নামল স্নান করতে।

আর ঠিক তখনই একটা কুমির তেড়ে এল সবসেরা রূপসীকে লক্ষ্য করে।

বাঁচাও! বাঁচাও! বলে সেই মেয়ে যখন চেঁচাচ্ছে, সুন্দরসেন তখন জলে ঝাঁপ দিয়েছে। ঝপাঝপ সাঁতরে কুমিরের কাছে গিয়ে লড়ে গেল শুধু একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে।

বড় মারাত্মক অস্ত্র। খতম হল কুমির।

তীরে ফিরে এসে কিন্তু মন্দারবতীর খটকা লেগেছিল সুন্দরসেনকে দেখে। পটে আঁকা ছবির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে যে! ইনিই কি আমার ভাবী স্বামী?

সুন্দরসেনও একদৃষ্টে চেয়েছিল মন্দারবতীর দিকে। চেনা-চেনা মনে হচ্ছে!

সখীদের জিজ্ঞেস করেছিল, ইনি কে?

সখীরা বলেছিল, রাজা মন্দারদেবের মেয়ে। নাম, মন্দারবতী।

শুনেই তো ধেই ধেই করে নেচে উঠেছিল দৃঢ়বুদ্ধি। কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! বিষম বিষম দুর্ঘটনার পর কী অপূর্ব মিলন!

মন্দারবতী আর সুন্দরসেনের গাল তখন ভেসে যাচ্ছে অশ্রুধারায়।

মিলনাশ্রু!

গেল সবাই মুনির আশ্রমে। মুনি তো খুব খুশি। সুন্দরসেনকে দেখে। বললেন, মন্দারবতীকে আমি মেয়ের মতো পালন করেছি। সুতরাং কন্যাদানের অধিকার আমার আছে। চলে যাও নিজের রাজ্যে কন্যা নিয়ে।

কন্যা নিয়ে সমুদ্রতীরে এল সুন্দরসেন। সঙ্গে মন্ত্রীবন্ধু দৃঢ়বুদ্ধি। নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে ছিল একটা বাণিজ্যজাহাজ। বণিকের সঙ্গে কথা হয়ে গেল সুন্দরসেন আর দৃঢ়বুদ্ধির। তিনজনকে পৌঁছে দেবে।

কিন্তু মনে পাপ ছিল বণিকের। অতি বদ লোক। মন্দারবতীকে আগে তুলল জাহাজে। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল জলযান, সুন্দরসেন আর দৃঢ়বুদ্ধিকে না তুলেই।

উদ্দেশ্য মন্দারবতীকে ভোগ করা।

এবার ভাবী পত্নী গেল দুরাত্মার খপ্পরে। ভাবী পতি চলল সমুদ্রের তীর বরাবর তার খোঁজে, বন্ধু দৃঢ়বুদ্ধিকে সঙ্গে নিয়ে।

পথে ঢুকতে হল গভীর জঙ্গলে। হানা দিল ডাকাতরা। ধরে নিয়ে গেল দুই বন্ধুকে, ঢুকিয়ে দিল কারাগারে, চতুর্দশী তিথিতে বনদেবীর সামনে হাড়িকাঠে ফেলে বলি দেবে বলে।

আর এই কারাগারেই সুন্দরসেন দেখতে পেল তার আরও চার বন্ধু-মন্ত্রীকে, জাহাজ জলে ডুবে যাওয়ার পর যারা তীরে উঠতেই ধরা পড়েছিল ডাকাতদের হাতে।

এই ডাকাতরা ছিল বনের শবরজাত। এদের রাজার নাম বিন্ধ্যকেতু।

বলিদানের দিন বিন্ধ্যকেতুর সামনে পাঁচ বন্ধুকে নিয়ে আসতেই খটকা লেগেছিল সুন্দরসেনের।

এই কি সেই বিন্ধ্যকেতু যাকে শবর বনের আধিপত্য দিয়েছিলেন তার বাবা রাজা মহাসেন? এই কি সেই বিন্ধ্যকেতু যে রাজা মহাসেনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আনুগত্যের শপথ নিয়েছিল?

সুন্দরসেন যখন একদৃষ্টে বিন্ধ্যাকেতুর দিকে চেয়ে এইসব কথা ভাবছে, বিন্ধ্যকেতুও তখন চেনা-চেনা চোখে চেয়েছিল সুন্দরসেনের দিকে।

পরক্ষণেই লাফিয়ে উঠে বলেছিল, রাজপুত্র সুন্দরসেন।

সভাস্থল যখন ফেটে পড়েছে বিস্ময়-উল্লাসে, ঠিক তখন শবর রাজার সেনাপতি ধরে নিয়ে এল এক বণিককে। এক পরমাসুন্দরী রমণী আর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে জাহাজ থেকে জঙ্গলে নেমেছিল এই বদমাস বণিক।

তাকে দেখেই কিন্তু চিনেছিল সুন্দরসেন। ধেয়ে গিয়ে টুঁটি টিপে ধরে বলেছিল, কোথায় মন্দারবতী?

কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল বণিক, আছে....আছে....পেছনে আছে......তার অঙ্গ স্পর্শ করিনি.....বিয়ে করবো ভেবেছিলাম—।

পাওয়া গেল মন্দারবতীকে।

যথাসময়ে শুভলগ্নে বিয়ে হল দুজনের। যথাসময়ে বৃদ্ধ বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন রাজা মহাসেন।

রাজা হল সুন্দরসেন। সুখী হল রানি মন্দারবতীকে নিয়ে।

অপূর্ব এই কাহিনি নিবেদন করে মৃগাঙ্কদত্তকে বললে মন্ত্রীবন্ধু ব্যাঘ্রসেন—"মুনি এই গল্পশুনিয়ে বললেন আমাকে, ধৈর্যশক্তি মহাশক্তি। ধৈর্য ধরলে সব পাওয়া যায়। তুমিও ফিরে পাবে সব বন্ধুদের। তারপর এলাম এই বনে। খিদে পেয়েছিল। গাছে উঠে ফুল খেতে গিয়ে নিজেই ফল হয়ে ঝুলে পড়েছিলাম।

মৃগাঙ্কদত্ত মনে বল পেল বন্ধুকাহিনি শুনে। কী আশ্চর্য ঘটনাপরম্পরা!

সবই সুলক্ষণ।

১০২. যুদ্ধের প্রস্তুতি

যথাসময়ে উজ্জয়িনী পৌঁছে সুদৃঢ় প্রাকার আর বিপুল প্রহরা ব্যবস্থা দেখে চিন্তিত হয়েছিলেন মৃগাঙ্কদত্ত। বুঝেছিলেন, রাজা কর্মসেন বড়ো শক্ত ঘাঁটি। যুদ্ধে হারিয়ে তাঁর মেয়েকে ছিনিয়ে এনে বিয়ে করা খুব সহজ ব্যাপার হবে না।

তাই, প্রথম পর্যায়ে মিত্রশক্তিদের জুটিয়ে সৈন্যবল বাড়িয়ে নিলেন মৃগাঙ্কদত্ত।

তারপর, আপোষ মীমাংসার জন্যে দূত পাঠালেন। রাজা কর্মসেন হাঁকিয়ে দিলেন সেই দূতকে।

হোক যুদ্ধ।

১০৩. শশাঙ্কবতী মিলন

কিন্তু হল না যুদ্ধ।

অনেক বিচারবিবেচনায় ঠিক হল, যুদ্ধের মাধ্যমে মীমাংসাকে জঘন্যতম বলে রায় দিয়েছেন পণ্ডিতরা।

সুতরাং, নিশুতি রাতে শশাঙ্কবতীকে হরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন মৃগাঙ্কদত্ত।

এদিকে, শশাঙ্কবতীও চর পাঠিয়ে জেনেছিল, মৃগাঙ্কদত্ত অতিশয় সুপুরুষ। এমন পাত্রকে বাবা জামাই করতে চান না বুঝে নিশুতি রাতে আত্মহত্যা করতে গেছিল বাগানে, গলায় ওড়নার ফাঁস দিয়ে।

দেখে ফেলেছিল সখীরা। মরণ আর হয়নি।

দেখেছিল মৃগাঙ্কদত্তও। তিনি এসেছিলেন ঘোড়ায় চেপে, লুকিয়ে।

মৃগাঙ্কবতীকে তুলে নিয়ে চলে গেলেন নিজের শিবিরে। দূতমুখে সেই খবর পাঠালেন রাজা কর্মসেনকে।

তিনি রাগলেন না। অনেক বিবেচনার পর ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন কন্যা সম্প্রদানের জন্যে।

বিয়ে হল অযোধ্যায়। সারম্বরে।

গেল অনেক বছর। বৃদ্ধ বয়সে অষ্টম রানিকে নিয়ে বনে গেলেন মৃগাঙ্কদত্তের বাবা।

দশটা দ্বীপের নাম রয়েছে সমগ্র কথাসরিৎসাগরে। নারিকেল দ্বীপ, কটাহদ্বীপ, কর্পূর দ্বীপ, সুবর্ণ দ্বীপ, সিংহল দ্বীপ, উৎস্থল দ্বীপ, ধীবরদের স্বর্ণদ্বীপ, রত্নকুট দ্বীপ, শ্বেত দ্বীপ, হংস দ্বীপ। সপ্তদীপা মেদিনী বলতে কোন সাতটা দ্বীপ?—সম্পাদক।

সপ্তদ্বীপসহ বিশাল রাজত্ব শাসন করে গেলেন মৃগাঙ্কদত্ত সিংহাসনে বসে।

কাহিনি শেষ করে মুনি বললেন নরবাহনদত্তকে, মৃগাঙ্কদত্ত যেমন অনেক ধকল সয়ে শশাঙ্কবতীকে পেয়েছিলেন, তেমনি তুমিও পাবে মদনমঞ্জুষাকে। ধৈর্য ধরো।

ধৈর্য ধরলেন নরবাহনদত্ত।

১০৪. মদিরাবতী উপাখ্যান

মদনমঞ্জুষার কথা ভাবতে ভাবতে নরবাহনদত্ত একদিন হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছোলেন এক হ্রদের পাড়ে। দুজন সুদর্শন ব্রাহ্মণ যুবক নীচুগলায় কথা বলছিল সেখানে। অতীব সুদর্শন নরবাহনদত্তকে দেখেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল দুজনেই।

প্রণাম সেরে নিয়ে একজন বললে, আপনি নিশ্চয় কামদেব। কিন্তু আপনার ফুলশর কোথায়? ধনুক কোথায়? সহচরী রতি কোথায়?

নরবাহনদত্ত বললেন, আমি সামান্য মানুষ, কামদেব নই। তবে হ্যাঁ, আমার রতিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

বলে, শুনিয়ে দিলেন মদনমঞ্জুষাকে না পাওয়ার হয়রানি কাহিনি।

দুই ব্রাহ্মণ যুবকের একজন তখন বললে, তাহলে শুনুন একটা গুপ্তকাহিনী।

কলিঙ্গ দেশের শোভাবতী নগরে থাকতেন ধনাঢ্য আর বিদ্বান ব্রাহ্মণ যশস্কর। তাঁর স্ত্রীর নাম মেঘনা। আমি তাঁদের একমাত্র ছেলে।

পৈতে হওয়ার পর যখন লেখাপড়ায় মন দিয়েছি, দেশে হল দুর্ভিক্ষ। আমাকে আর মাকে নিয়ে বাবা গেলেন বিশালপুরীতে এক বড়োলোক বন্ধুর বাড়ি।

পড়াশুনো চালিয়ে গেলাম সেইখানেই। বন্ধুদের মধ্যে পেলাম বিজয়সেন নামে এক ক্ষত্রিয়কে। একদিন দেখলাম তার সহোদরা মদিরাবতীকে।

অহো! অহো! সেকী রূপ! কামদেব যেন তার শরীরটার মধ্যে ষাটখানা বাণ ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছেন।

আমাকে দেখেই সে ত্যাগ করেছিল শুধু একখানা বাণ, নেত্রবাণ। তাইতেই আমার হেঁচকি উঠে গেল। আমাকে আধমরা করে দিয়ে হেলেদুলে তনু তরুর বিবিধ দেহসৌষ্টবের আভাস দেখাতে দেখতে মদিরাবতী চলে গেল বাড়িতে। বুঝিয়ে গেল, সে-ও মরেছে!

বাড়ি ফিরলাম বটে, কিন্তু ছটফট করতে লাগলাম বিষম বিরহ যাতনায়।

পরের দিন বন্ধুবর বিজয়সেন এসে বললে, বন্ধুহে, আমার সহোদরা তো মরেছে তোমাকে দেখে। চল আমার বাড়ি, দেখা দিয়ে এস।

গেলাম। দেখলাম তাকে। সখীর হাতে ফুলের মালা পাঠিয়ে দিল সে, বাগানের ফুল তুলে গাঁথা মালা। যেন স্বর্গসুখ পেলাম। বাড়ি ফিরলাম।

পরের দিন মদিরাবতীকে সঙ্গে নিয়ে বিজয়সেন এল আমাদের বাড়ি। আমার বাবা-মা তাকে দেখে পছন্দ করলেন।

এইভাবে চলল দেখাসাক্ষাৎ। গভীর হল প্রেম।

একদিন তার সখী এসে বললে, মদিরাবতী আমাকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে, বিলম্বে কী লাভ? প্রেমসাগরে ডুবেছেন যখন, বিয়েটা করে নিন।

আমি বললাম, তাহলে তো বাঁচি।

পরের দিন ঘটে গেল একটা অঘটন। উজ্জয়িনী থেকে এক ক্ষত্রিয় পাত্র এসে বিজয়সেনের বাবাকে বললে, সে বিয়ে করতে চায় মদিরাবতীকে। ক্ষত্রিয় পাত্র যখন, রাজি হয়ে গেলেন মদিরাবতীর বাবা।

থ হয়ে গেলাম। কিংকর্তব্যবিমূঢ়!

দিন কয়েক পরে বাইরের ফটক বন্ধ করে দিয়ে, বাড়ির মধ্যে আমার প্রবেশ আটকে দিয়ে, মদিরাবতীর সঙ্গে সেই ক্ষত্রিয় যুবকের বিয়ের আয়োজন শুরু করে দিলেন মদিরাবতীর পিতৃদেব।

আমি আত্মহত্যা করব ঠিক করলাম। নগরের বাইরে গেলাম। বটগাছে উঠলাম। একটা ডালে দড়ি বাঁধলাম। গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়লাম। জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলাম, শুয়ে আছি এক সুদর্শন যুবাপুরুষের কোলে। গলায় নেই দড়ির ফাঁস।

বুঝলাম, আমাকে মরতে দেয়নি এই মানুষটা। সুতরাং একে সব বলা যায়। বললামও। আমার প্রেম আর পাষণ্ড মদিরাবতী-পিতৃদেবের অমানুষিক বিবাহ-ব্যবস্থার করুণ কাহিনী।

সেই যুবক বললে, তুমি বুদ্ধিমান হয়েও বোকার মতো মরতে যাচ্ছিলে। শোনো আমার কাহিনি।

হিমাচলের কাছে নিষধ দেশে আমার নিবাস। আমার বাবা বহু শাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ।

শঙ্খপুরের গুরুর বাড়িতে থেকে শাস্ত্রশিক্ষা করবার সময়ে একদিন শঙ্খহ্রদ দেখতে গেছিলাম। সেখানে এক অনিন্দ্যসুন্দরীকে দেখেছিলাম। সে ফুল তুলছিল। রূপে সে অপ্সরা। অপাঙ্গচাহনি নিক্ষেপ করে যাচ্ছিল আমাকে দেখে হাত তুলে ফুল তুলতে তুলতে। ফলে, দেখে ফেলেছিলাম তার বক্ষশোভা।

কিন্তু বেশিক্ষণ দেখবার সুযোগ পাইনি। আচমকা ঘোর কেটে গেছিল এক পাগলা হাতি ছুটে আসায়। মাহুতের অঙ্কুশ হাতির কানের নীচে গেঁথে গিয়ে ঝুলছে।

আমি ঝট করে সেই কন্যাকে কোলে তুলে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় দৌড়ে গেছিলাম। কন্যার পরিজনদের কাছে কন্যাকে পৌঁছে দিয়েছিলাম।

হাতির ভয় চলে যাওয়ার পর খুঁজলাম সেই সুন্দরীকে। আর পেলাম না।

হতাশ হয়ে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে দেখলাম, তুমি গলায় দড়ি দিচ্ছ।

কী আশ্চর্য বলো তো? আমি যাকে ভালোবেসেছি, তার নাম কুল গোত্র নিবাস, কিছুই জানি না। তাকে চাই, কিন্তু পাচ্ছি না। অথচ মরতে যাচ্ছি না। আর তুমি কিনা তোমার প্রিয়তমার সবকিছু জেনেও অক্কা পেতে যাচ্ছ। ছ্যা, ছ্যা। যে ধৈর্য ধরে, সে যা চায়, তাই পায়। মহাশক্তি কী? ধৈর্য, তিতিক্ষা আর সহিষ্ণুতা। রুক্মিণীদেবীর কাহিনি কি তোমার অজানা? তাঁকে তো দেওয়া হয়েছিল শিশুপালকে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো হরণ করেছিলেন রুক্মিণীকে?

ঠিক এই সময়ে শোনা গেল অনেক বাজনার আওয়াজ। গাছের আড়ালে গিয়ে আমি আর সেই যুবক দেখলাম, মদিরাবতীকে নিয়ে আসছে বাড়ির মেয়েরা।

প্রাণদাতা যুবককে বললাম, ওই তো মদিরাবতী।

যুবক বললে, এখানে কেন আসছে?

আমি বললাম, বিয়ের আগে কামদেবের পুজো দিতে হয়। আমি জানতাম, পুজো দিতে আসবে। তাই গলায় দড়ি দিতে এসেছিলাম। মদিরাবতী জেনে যেত, তার জন্যে মরেছি।

বন্ধু বললে, কী মুশকিল! আগে সেকথা বলতে হয়! চলো, চলো, মদিরাবতী আসবার আগেই লুকিয়ে পড়ি কামদেবের বিগ্রহের পেছনে।

তাই করলাম। দুজনেই।

মদিরাবতী এল মন্দিরে। অন্য মেয়েদের বাইরে রেখে একা মন্দিরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

তারপর বললে বিগ্রহকে, হে কামদেব, মনের মতো মানুষকে এ জন্মে পেলাম না। সামনের জন্মে যেন পাই।

বলে, ওড়নার ফাঁস গলায় জড়িয়ে, যেই মরতে যাচ্ছে, আমি আর সেই যুবক বেরিয়ে এলাম বিগ্রহের পেছন থেকে।

বন্ধু বললে, এখন সন্ধ্যে। বাইরে অন্ধকার। আমি মদিরাবতীর শাড়ি-গয়না পরে বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি আঁধারে মুখ ঢেকে। আমার পোশাক পরুক মদিরাবতী। তোমার সঙ্গে বেরিয়ে যাক পেছনের দরজা দিয়ে। রাত পোহানোর আগেই চলে যাও অন্য দেশে।

তাই হল।

ভোরে পৌঁছোলাম অচলপুর নগরে। এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে উঠে সেইখানেই বিয়ে করে নিলাম মদিরাবতীকে। থেকে গেলাম সেইখানেই। কিন্তু মন কেমন করত সেই বন্ধুটির জন্যে। যে আমাদের পালাতে দিয়েছে, নিজের কী হবে, সেসব না ভেবে।

আজ গঙ্গাস্নান করতে এসে পেলাম সেই দুঃসময়ের বন্ধুকে। গল্প জমিয়েছি, এমন সময়ে এলেন আপনি।

নরবাহনদত্ত শুধোলেন বিপদে উদ্ধারকারী সেই বন্ধুকে, শুনলাম বন্ধুর জন্যে তোমার বিপদ বরণ করার কাহিনি। এবার বলো তোমার কাহিনি।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ যুবক বললে, মদিরাবতীর শাড়ি-গয়না পরে তো আমি বেরিয়ে এলাম। মদিরাবতী ভেবে আমাকে পাল্কীতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হল বিয়েবাড়িতে। বসানো হল একটা ঘরে। সে ঘরে কেউ যখন নেই, নূপুরের আওয়াজ তুলে একটি মেয়ে এসে ঢুকল। দেখেই চমকে উঠলাম। এ যে সেই মেয়ে যাকে হাতির খপ্পর থেকে বাঁচিয়েছিলাম, আর খুঁজে পাইনি। তৎক্ষণাৎ দুজনেই পালালাম পেছনের দরজা দিয়ে। অনেক ঘুরে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে বিয়েটাও সেরে নিলাম। তারপর দুজনে এসেছিলাম গঙ্গাস্নান করতে। পেলাম এই বন্ধুকে।

এমন সময়ে গোমুখ প্রমুখ মন্ত্রীরা এল সেখানে নরবাহনদত্তের খোঁজে। দুই যুবককে সঙ্গে নিয়ে নরবাহনদত্ত চললেন নিজের জায়গায়।

১০৫. বেগবতী কাহিনি

মদনমঞ্জুষা সহ অন্যান্য মহিষীদের নিয়ে কোশাম্বিতেই পরমানন্দে রইলেন নরবাহনদত্ত। গোমুখ প্রমুখ মন্ত্রীরাও রইল সঙ্গে।

বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা সেরে একদিন রাত্রে অন্তঃপুরে এলেন নরবাহনদত্ত। কিন্তু চোখের মণি মদনমঞ্জুষা আর তার কাছের কাউকে দেখতে পেলেন না। চিন্তায় পড়লেন। প্রথমে ভাবলেন, মদনমঞ্জুষা নিশ্চয় মজা করছে কোথাও লুকিয়ে থেকে। তারপর ভাবলেন, প্রিয় বউকে কেউ চুরি করে নিয়ে গেল না তো?

ক্রমে ব্যাপারটা জেনে গেল সব্বাই, বাবা-মা পর্যন্ত।

এই সময়ে এক বুড়ি দাসী এসে বললে, দিনকয়েক আগে একজন বিদ্যাধর যুবক প্রাসাদের ছাদে নেমেছিল আকাশপথে উড়ে এসে। কলিঙ্গসেনার সঙ্গে দেখা করে বলেছিল মদনমঞ্জুষাকে প্রাণেশ্বরী করে রাখতে চায়। কলিঙ্গসেনা তার কামুক প্রস্তাবকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়। মনে হচ্ছে, তখন সেই বদমাস বিদ্যাধর বিদায় নিলেও এখন সে মায়া বিস্তার করে মদনমঞ্জুষাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। বিদ্যাধরেরা দিব্যসত্তার জীব হলে কী হবে, পরের বউ অপহরণ করার কাম প্রবল হলে, দিব্যসত্তার ধার ধারে না। মেয়েছেলে বলে কথা, তায় বিশ্বসুন্দরী।

শুনে তো রাগের চোটে বেতসপত্রের মতো থরথর করে কাঁপতে লাগলেন নরবাহনদত্ত। বউ চুরি গেলে বীরপুরুষ মাত্রেরই মাথায় খুন চাপে।

রুমন্বান কিন্তু বললে অন্য কথা, এই প্রাসাদপুরী সুরক্ষিত। শিবের বরে মদনমঞ্জুষার কেশাগ্র স্পর্শ করার ক্ষমতা কারোর নেই। সুতরাং, আমাদের মনে হয় আপনার ওপর রাগ করে তিনি কোথাও লুকিয়ে আছেন। এই সম্পর্কে একটা কাহিনি শোনাচ্ছি।

অষ্টাবক্র মুনির মেয়ে সাবিত্রীকে অর্ধাঙ্গিনী করার ইচ্ছে হয়েছিল অঙ্গিরার। কিন্তু মেয়ের বিয়ে অন্য জায়গায় ঠিক করে রেখেছিলেন অষ্টাবক্র। কী আর করেন অঙ্গিরা। বিয়ে করলেন বিধাতার মেয়ে অশ্রুতাকে। সুখেই রইলেন।

অশ্রুতা কিন্তু জানত তার স্বামী প্রথমে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন সাবিত্রীকে। সাবিত্রীর সঙ্গে অশ্রুতার ভাবও ছিল।

অঙ্গিরা একদিন ধ্যানে বসেছিলেন। অশ্রুতা জিজ্ঞেস করেছিল, কার ধ্যান করছেন?

সাবিত্রীর বলেছিলেন অঙ্গিরা।

রেগে গিয়ে জঙ্গলে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে যাচ্ছে অশ্রুতা, দেবী গায়ত্রী এসে বললেন, কী মুশকিল! ঠাট্টাও বোঝ না। অঙ্গিরা তো আমার ধ্যানে বসেছিল!

ছোট্ট গল্প শেষ করে রুমন্বান বললে, এই রকমই হয়। ভালবেসে ভুল করে মানুষ রেগে যায়। মদনমঞ্জুষাও কোথাও লুকিয়ে প্রণয়-রঙ্গ করছেন। দেখা হবেই।

সায় দিলেন নরবাহনদত্তের পিতৃদেব।

মদনমঞ্জুষা অন্বেষণে বেরিয়ে পড়লেন উদভ্রান্ত নরবাহনদত্ত। অমাত্যরাও বন্ধুপত্নীকে খুঁজতে বেরিয়ে গেল দিকে দিকে।

নরহবাহনদত্ত এলেন এক মনোরম বাগানে। সেইখানে তাঁকে ছলনা করতে এল এক বিদ্যাধরকন্যা অবিকল মদনমঞ্জুষার রূপ ধরে। বসে রইল একটা অশোক গাছের তলায়।

খুঁজতে খুঁজতে মরুভূতি এসে তাকে দেখেছিল। দেখেই, দৌড়ে গিয়ে খবরটা দিয়েছিল। নরবাহনদত্ত লম্ফ দিয়ে ছুটে এসে মদনমঞ্জুষা ভেবে যেই জড়িয়ে ধরতে যাবে সেই ছলনাময়ী বিদ্যাধরকে, অমনি ন্যাকামি করে সে বলেছিল অবিকল মদনমঞ্জুষার গলায়, ছোঁবেন না, ছোঁবেন না, ফের বিয়ে করুন আমাকে।

কেন? ফের বিয়ে করব কেন? নরবাহনদত্ত তো অবাক, একবার তো বিয়ে করেছি।

সে বিয়ের সময়ে যক্ষদের যে উপহার দেওয়া হয়নি।

তাতে কী হল?

কুমারী অবস্থায় আমি যে কথা দিয়েছিলাম, মনের মতো বর পেলে যক্ষদের মনের মতো উপহার দেব। তারা রেগেছে। তাই আর একবার বেদ মতে বিয়ে করে নিন। নইলে অমঙ্গল ঘটাবে এই যক্ষরা।

ভয় পেলেন নরবাহনদত্ত। আসলে যে ধরিবাজ বিদ্যাধরী একটা অলীক গল্প ফেঁদে তাকে বিয়ে করে ফেলতে চাইছে, তা বুঝবেন কী করে?

সুতরাং পুরুত ডাকিয়ে বিয়ে করলেন ছদ্মবেশিনীকে, মনে করলেন, বিয়ে করা বউ মদনমঞ্জুষাকেই ফের বিয়ে করছেন।

যক্ষদের উপহার-টুপহার দিয়ে, নরবাহনদত্তকে নিয়ে, শুতে গিয়ে সুচতুরা বিদ্যাধরী (মদনমঞ্জুষারূপে)। স্বামীর কানে কানে বললে, ওগো প্রিয়তম, আমি যখন অকাতরে ঘুমোব, তখন ভুলেও আমার মুখের দিকে তাকবেন না।

কেন? ছদ্মবেশিনী বিদ্যাধরী একথা বলতে গেল কেন নরবাহনদত্তকে?

কারণ, ঘুমের সময়ে মায়ার প্রভাব থাকে না! আসল রূপ বেরিয়ে আসে!

নরবাহনদত্ত কিন্তু কৌতূহলে ফেটে পড়েছিলেন।

মুখচোখ স্ত্রী যেই ঘুমিয়েছে, কাপড় সরিয়ে চমকে উঠেছিলেন।

কোথায় মদনমঞ্জুষা! এ যে অন্য এক যুবতী! গনগনে রূপবতী!

বিমূঢ় নরবাহনদত্ত তখন কিছু বললেন না। ঘুমন্ত রূপ দেখে রাত কাবার করলেন। ভোরের দিকে ঘুম ভাঙলো বিদ্যাধরীর। তখন আর মুখে চাপা নেই। নরবাহনদত্তের স্তম্ভিত চাহনির সামনেই ফিরে এল ছদ্মবেশিনীর ছদ্মরূপ, মদনমঞ্জুষা!

রেগে গেলেন নরবাহনদত্ত। জানতে চাইলেন, কী প্রয়োজন ছিল এহেন তঞ্চকতার।

মায়াবতী বিদ্যাধরী খিলখিলিয়ে হেসে বললে আত্মকাহিনী।

আমার নাম বেগবতী আমার বাবার নাম মানসবেগ। তিনি বিদ্যাধরদের রাজা। আমার নিবাস আষাঢ়পুর পাহাড়ে।

আমি বাবার ছোটো মেয়ে। আমার দাদা আমাকে হিংসে করে। তাই আমাকে সিদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে দেয়নি, যে বিদ্যা জানা থাকলে, যা ইচ্ছে হয়, তাই করা যায়।

তাই, সিদ্ধবিদ্যা শিখে নিলাম বাবার কাছে। তিনি তখন তপোবন নিবাসী।

একদিন দেখলাম, আষাঢ় পাহাড়ের বাগানবাড়িতে দাসীদের তত্ত্বাবধান করছে তোমার বউ, মদনমঞ্জুষা। খোঁজ নিয়ে জানলাম, আমার বদমাস দাদা উড়িয়ে নিয়ে গেছে আপনার বউকে ভোগ করবে বলে। কিন্তু গা ছুঁতে পারছে না মদনমঞ্জুষার সতীত্বের তেজে।

সাহসও পাচ্ছে না আমার দাদা। সে দুশ্চরিত্র। তাই তাকে শাপ দিয়ে রেখেছিলাম, জোর করে কোনও মেয়ের ধর্মনষ্ট করতে গেলেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হবে তৎক্ষণাৎ।

তাই, দাদা আমাকে সাধাসাধি করেছিল। আমি যেন মদনমঞ্জুষাকে রাজি করাই। স্বেচ্ছায় যেন সে আমার দাদার অঙ্কশায়িনী হয়।

গেছিলাম মদনমঞ্জুষার কাছে। শুনেছিলাম, বিরামবিহীন ভাবে সে আপনার নাম জপে যাচ্ছে।

শুনে, আপনাকে দিয়ে আমার কাম নিবারণ করার বাসনা হয়েছিল। মনে পড়েছিল, এক নিশিস্বপ্নের কথা। স্বপ্নে দেখা দিয়ে মা দুর্গা আমাকে বলেছিলেন, বেগবতী, যে পুরুষের নামগান শুনলেই তুমি কামতপ্ত হবে, সেই পুরুষই হবে তোমার বর।

তাই, আপনার বউ মদনমঞ্জুষাকে সহিষ্ণু হতে বলে চলে এসেছিলাম আপনার কাছে। মায়ার খেলায় আপনার চোখে ধোঁকা দিয়ে আপনার পত্নী হয়েছি। এখন চলুন, নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে আপনার পরমপ্রিয়া পত্নী মদনমঞ্জুষার কাছে, থাকবো তার পরিচারিকা হয়ে।

আত্মকাহিনি সমাপ্ত করে বেগবতী সিদ্ধবিদ্যার জোরে নরবাহনদত্তকে উড়িয়ে নিয়ে গেল আষাঢ় পাহাড়ে।

নরবাহনদত্ত নেই প্রাসাদে, আছে তাঁর এক গাদা বউ। শুধু তো নরবাহনদত্ত নয়, সদ্য ফিরে পাওয়া মদনমঞ্জুষাও যেন স্বামীসমেত হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

প্রত্যেকেই যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ঠিক তখন আকাশ থেকে সাঁ করে নেমে এলেন নারদ, যেন একটা আলোক পিণ্ড।

হাসিমুখে বললেন নরবাহনদত্তের বাবা বৎসরাজকে, ভেবো না। তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে এক বিদ্যাধরী। তার নাম বেগবতী। ফিরে আসবে শিগগিরই।

খবরটা দিয়েই ফের ঢেঁকির পিঠে চেপে অন্তরীক্ষে বিলীন হলেন নারদ মহাশয়। দেবলোকের সংবাদদাতা!

এদিকে হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড লেগেছে আষাঢ় পাহাড়ে। বোন বেগবতী ফিরে এসেছে মদনমঞ্জুষার বরকে নিয়ে, এই খবর পেয়েই রে-রে করে তেড়ে এসেছে তার বকাটে দাদা মানসবেগ।

মেয়েমানুষের বিয়ে হয়ে গেলে তখন তার আপনজন শুধু স্বামী, ভাই তখন পর। সুতরাং মায়াবিদ্যার খেল দেখিয়ে দিল বেগবতী। নিজে নিল ভয়ংকর ভৈরবের রূপ, সম্মোহনের জালে আবিষ্ট করে ফেলল মানসবেগকে, ছুঁড়ে ফেলে দিল আগুন পাহাড়ে।

নরবাহনদত্তকে নিয়ে এল গন্ধর্বপুরে। একটা শুকনো কুয়োর মধ্যে ঢুকিয়ে দিল তাঁকে। বললে, চিন্তা করবেন না, কিছুক্ষণ থাকুন এখানে। আমি দাদার অপমান করেছি যে বিদ্যা খাটিয়ে, সে বিদ্যা কমে গেছে।

বিদ্যাতেজ বাড়িয়ে নিতে যাচ্ছি। এখুনি আসবো।''

সাঁ করে চলে গেল বেগবতী।

১০৬. প্রভাবতী কাহিনি

বীণাদত্ত নামে এক গন্ধর্ব দূর থেকে দেখেছিল, শুকনো কুয়োয় নরবাহনদত্তকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সাঁ করে শূন্যে মিলিয়ে গেল বেগবতী।

বীণাদত্ত পরোপকারপী গন্ধর্ব। গাছ যেমন ছায়া দিয়ে ক্লান্তি অপনোদন করে ক্লান্ত পথিকের, প্রত্যাশা কিছু করে না, নিঃস্বার্থ ব্যক্তিও তেমনি পরোপকার করেই যায়, নিজেদের স্বার্থ দেখে না।

বীণাদত্ত তেমনি পরোপকারী গন্ধর্ব। বেগবতী অতিশয় জাঁহাবাজ মেয়ে। পরমসুন্দর একটি মানুষকে সে কেন শুকনো কুয়োয় একপ্রকার বন্দি অবস্থায় রেখে গেল, তা জানবার জন্যে তৎক্ষণাৎ চলে এসেছিল কুয়োর পাড়ে।

নরবাহনদত্তের পরিচয় জেনে নিয়ে তাঁকে কুয়ো থেকে বের করে এনেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, মানুষ হয়ে এই গন্ধর্বপুরে এলে কী করে? এটা দেবলোক, এখানে তো মানুষ আসতে পারে না।

নরবাহনদত্ত অকপটে বলেছিলেন নিগ্রহ কাহিনি।

বউচুরি, অতঃপর তাঁকে ঠকিয়ে বিয়ে করা।

বিশ্বাস করেছিল বীণাদত্ত নরবাহনদত্তের শরীরময় রাজচক্রবর্তী চিহ্ন দেখে। সমাদরে নিয়ে এসেছিল নিজের বাড়িতে।

গন্ধর্বপুরের প্রতি গন্ধর্ব একটি করে বীণা সঙ্গে রাখে কেন, তা দেখে কৌতূহলী নরবাহনদত্ত একদিন কারণটা জিজ্ঞেস করেছিলেন বীণাদত্তকে।

বীণাদত্ত বলেছিল, সাগরদত্ত এখানকার রাজা। তাঁর একমাত্র মেয়ে গন্ধর্বদত্তা অসাধারণ রূপবতী। সংগীতে তাকে আজও কেউ টেক্কা মারতে পারেনি। তাই সে পণ করেছে, সংগীত বিদ্যায় যে তাকে হারাতে পারবে, তাকেই বিয়ে করবে। দেশশুদ্ধ লোক তাই বীণা বাগিয়ে গানের কসরত শুরু করেছে রূপবতীকে বাগানোর জন্যে, কিন্তু আজও কেউ তাকে টেক্কা মারতে পারেনি।

আমি মারব, বলেছিলেন নরবাহনদত্ত।

গানের আসর বসল বীণাদত্তের মধ্যস্থতায়, রাজা সাগরদত্তের সামনে।

শুরু হল গানের পালা। প্রথমে সংগীতের স্বর্গ রচনা করে গেল সুরসুন্দরী গন্ধর্বদত্তা। সুরের মায়াজালে যেন ব্রহ্মশক্তি এসে গেল। সুর সপ্তকের উত্থানপতনে সে এক অবর্ণনীয় স্বর্গীয় পরিবেশ।

কিন্তু সুরবোদ্ধা নরবাহনদত্তের কান একটা বেতাল ধরে ফেলেছিল। বলেছিলেন, সুন্দরী গন্ধর্বদত্তা, তোমার বীণার তারে নিশ্চয় একটা চুল জড়িয়ে গেছে। তাল কেটে যাচ্ছে। শোনো আমি বাজাচ্ছি।

শুরু হল নরবাহনদত্তের বীণাবাদন। তখন তিনি আত্মসমাহিত, জাদুকরী সুরসুধায় সভা বিমোহিত।

নূপুর বাজিয়ে উঠে এসে নরবাহনদত্তকে বরমাল্য পরিয়ে দিল গন্ধর্বদত্তা। হার মেনেছে সে, কিন্তু জিতেছে এমন সুরশ্রী জাদুকরের গলায় মালা পরাতে পেরে।

নরবাহনদত্ত এবার পেলেন নৃত্যগীতে সেরা গন্ধর্ব কন্যাকে বউরূপে। মেতে রইলেন ভোগে।

একদিন বাগান বিহারে গিয়ে দেখলেন, গগন থেকে তাঁর সামনে অবতীর্ণ হল দুই রূপসী, মা আর মেয়ে। যেন বিদ্যুৎ ঝলকিত হল তাদের রূপের ছটায়।

মা বললে মেয়েকে, নরবাহনদত্তকে দেখিয়ে, এই তোমার ভাবী স্বামী, নরবাহনদত্ত।

নরবাহনদত্ত বললেন, কে তোমরা?

বয়স্কা সুন্দরী বললে, আমার নাম ধনবতী। আমার স্বামী দেবসিংহ বিদ্যাধরদের রাজা। এই আমার মেয়ে, অজিনাবতী। আমার ছেলের নাম চণ্ডসিংহ। আমি বিদ্যধরী বিদ্যার জোরে জেনেছি, বেগবতী তোমাকে কুয়োয় ফেলে গেছে। এ জায়গায় তোমার থাকা উচিত নয়, খুন হয়ে যেতে পার, বিদ্যাধর ছাড়া এখানে

কেউ থাকতে পারে না। খুন হবে ঈর্ষার দরুন। তাই এসেছি তোমাকে নিয়ে যেতে। নিরাপদ জায়গায় গিয়ে বিয়ে করবে আমার মেয়েকে।

বলেই নরবাহনদত্তকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে শ্রাবন্তীপুরীতে পৌঁছে দেল মা আর মেয়ে। একটা বাগানে তাঁকে নামিয়ে দিয়ে নিমেষে হল অন্তর্হিতা।

আর ঠিক সেইসময়ে রাজা প্রসেনজিৎ এসেছিলেন সেখানে। আশ্চর্য সুন্দর নরবাহনদত্তকে দেখে মুগ্ধ হলেন. পরিচয় জেনে নিলেন। মহাসমাদরে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

নিজের মেয়ে ভগীরথযশার সঙ্গে নরবাহনদত্তের বিয়ে দিয়ে দিলেন।

একদিন মদের নেশায় ভগীরথযশা ঘুমিয়ে পড়তেই নরবাহনদত্তের কানে ভেসে এল নারীকণ্ঠে একটা হাহাকার, বড়ো কষ্ট...বড়ো কষ্ট!

চোখ চালিয়ে দেখলেন, জানলার বাইরে শূন্যে ভাসছে আশ্চর্য সুন্দরী এক রমণীর শুধু মুণ্ডখানা।

পুরুষ কৌতূহলে সুন্দরীর অন্যান্য অঙ্গগুলো দেখবার ইচ্ছায় ব্যগ্র চাহনি বিস্তার করলেন নরবাহনদত্ত....

কিন্তু দেখতে পেলেন না!

নরবাহনদত্তের মনে পড়ে গেল পুরাকালের এক অত্যাশ্চর্য কাহিনি।

আতাপি নামে এক দৈত্য বড়ো অত্যাচার করে যাচ্ছিল দেবতাদের ওপর। টনক নড়ল ব্রহ্মার। তিনি কৌশলে আতাপিকে শায়েস্তা করার মতলব করলেন।

আতাপির কাছে গিয়ে বললেন, ও ছেলে, অবাক কাণ্ড যদি দেখতে চাও, চলে যাও নন্দনকাননে। এখুনি যাও।

ব্রহ্মার সুমিষ্ট বচনে ভুলে গিয়ে মহাভয়ানক আতাপি তৎক্ষণাৎ পৌঁছে গেল নন্দনকাননে। গিয়ে দেখল সত্যিই একটা অতি চমকপ্রদ দৃশ্য।

শুধু একটা পা। নারীর পা। সেই নারীর আর কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। দৃশ্যমান শুধু একটা চরণ। অহো! অহো! বিশ্বের যাবতীয় সৌন্দর্য বুঝি বিধৃত সেই একখানিমাত্র নগ্ন চরণে।

নিরাবরম রমণী চরণ দেখলে চরণের ঊর্ধ্বের অন্যান্য অঙ্গ দেখবার বাসনা পুরুষমনে লেলিহান হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। বিশ্বে এমন কোনও পুরুষ নেই, যে রমমী চরণ দেখবার পর সেই রমমীর অন্যান অঙ্গ-সৌন্দর্য দেখবার জন্যে লালায়িত না হয়। আতাপি দানবও সকাম ব্যগ্রতায় নগ্নচরণের ঊর্ধ্বের অঙ্গ এবং প্রত্যঙ্গগুলো দেখবার লালসায় চক্ষুচালনা করেছিল।

কিন্তু আর কিছুই দেখতে পায়নি। শুধু ওই একখানা নগ্নিকা পদ এমন তীব্র কামনা সৃজন করে গেছিলতার প্রতিটি অণুপরমাণুতে যা বিধ্বংসী রূপ নিয়ে নিমেষে সংহার করেছিল প্রবল পরাক্রম অতিবিকট দানব আতাপিকে।
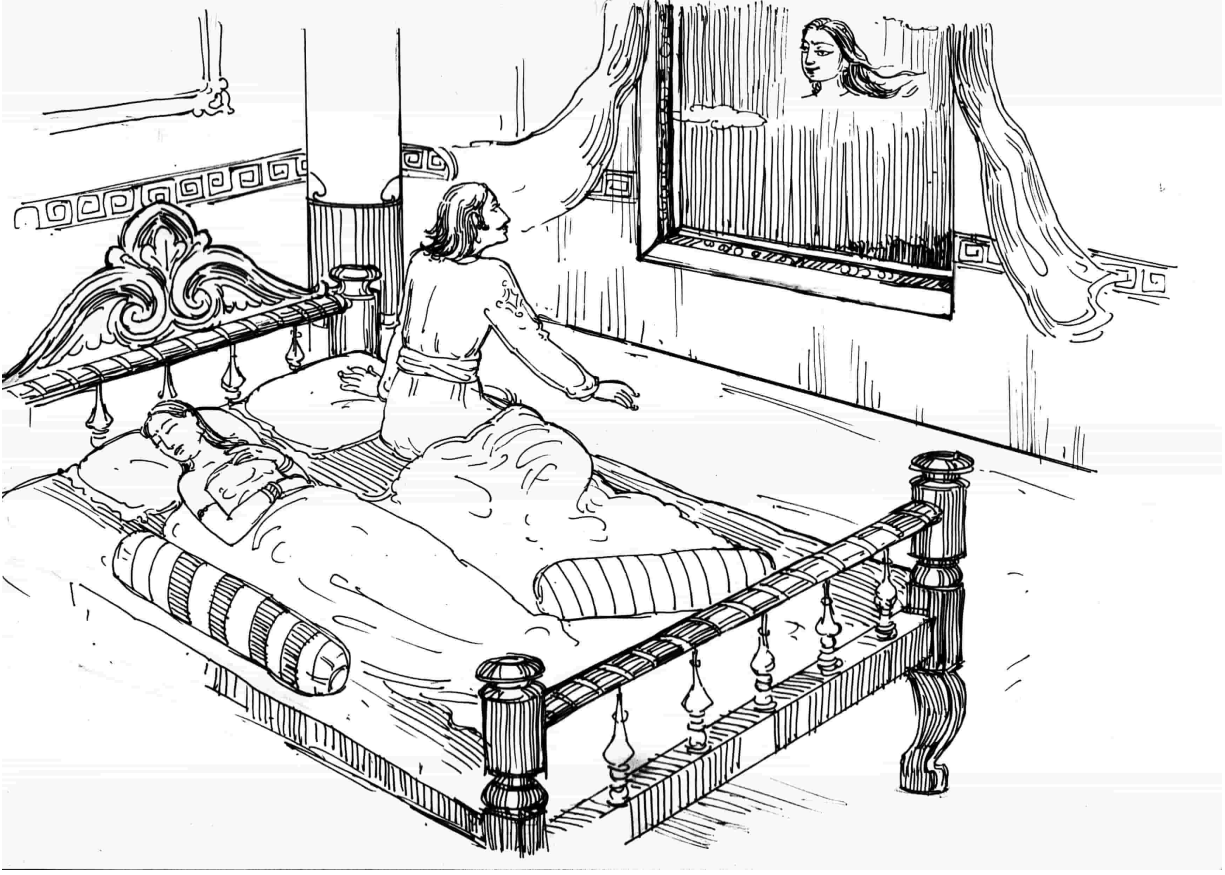
চোখ চালিয়ে দেখলেন, জানলার বাইরে শূন্যে ভাসছে আশ্চর্য সুন্দরী এক রমণীর শুধু মুণ্ডুখানা।

শুধু একখানা চরণ! নগ্নিকা চরণ! বিপুল ক্ষমতা বিধৃত থাকে যদি অনাবৃত রমণী চরণে, তাহলে তো হুঁশিয়ার হওয়া দরকার। হে পুরুষ! মেয়েদের পা দেখে ভুলো না মরণ অনিবার্য! ব্রহ্মাস্ত্র ওই নারী চরণ! যা নেচে নেচে যায়, অথবা নূপুরহীন নগ্নরূপ দেখিয়ে অদৃশ্য উর্ধ্বাঙ্গের আহ্বান জাগিয়ে কামনাতুর করে তোমার মরণ ডেকে আনতে পারে।

সাবধান! রমণী চরণকে সাবধান!

তাই সাবধান হয়ে গেলেন বিজ্ঞপুরুষ নরবাহনদত্ত। শুধু তাকিয়ে রইলেন। রমণী চরণের অনিন্দ্য রূপ প্রত্যক্ষ করে গেলেন। ঘরে তাঁর বহু স্ত্রী আছে, তাদের নগ্ন চরণসেবাও করে গেছেন। কিন্তু এমন রূপময়ী চরণ তো অপিচ দেখেননি।

সতর্ক অথচ মোহিত নরবাহনদত্তের চোখের সামনে সহসা দেখা গেল আর একটা ভেলকি।

জানলা দিয়ে গলে এল শুধু একটা হাত পরমসুন্দরীর শুধু একখানা করপল্লব। হাতের চেটো, পাঁচখানা আঙুল, কবজি পর্যন্ত। তার উর্ধ্বে হাত আর দেখা যাচ্ছে না। লীলায়িত ভঙ্গিমায় সেই করপল্লবে হাতছানি দিয়ে গেল নরবাহনদত্তকে।

যেন ডাকছে আঙুলের সংকেতে। নর্তকী ভঙ্গিমায় পাঁচ আঙুলের নিশানা দিয়ে বলছে শব্দহীন ইশারায়, এস! এস! এই দিকে এস!

এই আহ্বান কি এড়ানো যায়? স্তম্ভিত নিথর নিশীথে শুধু একখানা রূপের আকর রমণী করপল্লব যদি আহ্বান জানায় কোনও পুরুষ পুঙ্গবকে, বুকের রক্ত কি তার ছলকে ওঠে না? গা শিরশির করে ওঠে না? নিবনীত কোমল কলপল্লব অধিকারিণীর আহ্বানে সাড়া দিতে মন চায় না?

সুতরাং সাড়া দিয়েছিলেন মুগ্ধ নরবাহনদত্ত। ঘুমন্ত পত্নীর পাশ থেকে উঠে গিয়ে, ঘরের বাইরে এসে দেখেছিলেন...

এক দিব্যসুন্দরী মধুর হাসি হেসে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে তাঁকে, একটু আগেই জানলায় যে দেখিয়েছিল তার পা আর হাত!

নরবাহনদত্ত যখন রমণীর অঙ্গভঙ্গী অভ্যর্থনায় বিহ্বল, ঠিক তখনই কৌতুকের আর বিদ্রুপের হাসি হেসে সুমধুর স্বরে বলেছিল সুরসুন্দরী, ওহে মদনমঞ্জুষা, দেখে যাও, দেখে যাও, তোমার স্বামীর কীর্তি দেখে যাও! রমণী দেখলেই তার জিভে জল ঝরা দেখে যাও!

টনক নড়েছিল নরবাহনদত্তের। বিরহ-অনল দ্বিগুণ-ত্রিগুণ হয়ে উঠেছিল বুকের মধ্যে।

কাতর কণ্ঠে শুধিয়েছিল রজনীর বিস্ময় সেই রমণীকে, কে তুমি? কোথায় দেখে এলে আমার মদনমঞ্জুষাকে? তুমিই বা কী মতলবে এসেছ আমার কাছে?

হাতছানি দিয়ে রাতের রমণী যুবরাজকে নিয়ে গেল আরও দূরে। বললে ঝংকৃত স্বরে শুনুন তাহলে।

আমার নাম প্রভাবতী। আমি বিধ্যাধরী। আমার বাবা পিঙ্গলগান্ধার পুষ্করাবতী নগরের নৃপতি। তিনি অগ্নিদেবের আরাধনা করেন। প্রীত হয়ে অগ্নির দেবতা আমাকে দুহিতারূপে পাঠিয়েছেন তাঁর ঔরসে।

একদিন আমি আষাঢ় পাহাড়ে গেছিলাম বান্ধবী বেগবতীর সঙ্গে গল্প করতে। তার মায়ের কাছে শুনলাম, বেগবতী গেছে বিদ্যাবৃদ্ধির তপস্যায়। আরও শুনলাম, আপনার পরমপ্রিয়া ঘরণী মদনমঞ্জুষা রয়েছে এখানে।

বড়ো ইচ্ছে হয়েছিল তাকে দেখতে। তাই এসেছিলাম।

এসে দেখলাম, আপনার কথা ভেবে ভেবে শরীর আধখানা করে ফেলেছে সে। একখানা বেনী বেঁধে রয়েছে। দিবারাত্র চোখের জল ফেলছে। মানসবেগ নিহত না হলে বেশি খুলবে না।

দেখে কষ্ট হয়েছিল। বলেছিলাম, ভেবো না, মোছ চোখের জল। এনে দিচ্ছি তোমার নয়নে নিধিকে।

এই বলে, এসেছিলাম এখানে আপনাকে নিয়ে যেতে। এসে দেখলাম আপনি অন্য রমণীভোগে বিভোর। দেখে টিটকিরি দিয়েছিলাম আপনাকে।

নরবাহনদত্ত অনুতপ্ত হলেন।

বললেন, কোথায় মদনমঞ্জুষা? নিয়ে চলো আমাকে সেখানে।

প্রভাবতী প্রয়োগ করল বিদ্যাধরী বিদ্যা। আকাশপথে উড়িয়ে নিয়ে গেল নরবাহনদত্তকে।

যেতে যেতে এক জায়গায় দেখা গেল, জ্বলছে একটা অগ্নিকুণ্ড।

নিমেষে নেমে এল প্রভাবতী, নরবাহনদত্তের হাত ধরে। তাঁর হাত ধরেই সাত পাক দিয়ে নিল অগ্নিকুণ্ডকে। বিয়ে হয়ে গেল দুজনের।

আবার শুরু হল গগনপথে পরিভ্রমণ। যেতে যেতে তৃষ্ণার্ত হলেন নরবাহনদত্ত। তাঁকে নিয়ে এক সরোবরের পাড়ে নেমে এল প্রভাবতী। দুধের মতো সাদা সেই জল খাইয়ে দিল নরবাহনদত্তকে।

দুগ্ধশুভ্র এই জলের ছিল একটা আশ্চর্য ক্ষমতা। কণ্ঠ-পিপাসা নিবারণের সঙ্গে সঙ্গে অত্যুগ্র করে তোলে কাম-পিপাসা।

নরবাহনদত্ত ছটফটিয়ে উঠলেন। মদনমঞ্জুষাকে চাই এখুনি! কামানল যে জ্বালিয়ে দিল তাঁকে!

প্রভাবতী বললে, তার আগে শোনাই আমার একটা গোপন ইচ্ছার কথা।

এক বিধবা থাকত পাটলিপুত্র নগরে। তার রূপ ছিল, কিন্তু রূপো ছিল না। বড়ো গরিব। আর ছিল একটা ছেলে, একেবারেই শিশু।

প্রতিরাতে বিধবা বেরিয়ে যেত পথে। পরপুরুষ নিয়ে প্রমোদলীলা সাঙ্গ করে ফিরত বাড়িতে। বেরোনর সময়ে বলে যে, বাচ্চাটাকে, ঘুমো, ঘুমো, মোয়া আনতে যাচ্ছি তোর জন্যে। নেহাতই অবোধ শিশু মোয়ার আশায় থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ত একসময়ে।

একদিন মোয়া আনতে ভুলে গেছিল বিধবা। ছেলে মোয়া চাইতেই মুখঝামটা দিয়েছিল, আরে গেল যা! আমার কাছে মোয়া বলতে তো শুধু পরপুরুষ যাকে নিয়ে ফুর্তি করি সারারাত, এছাড়া আর কোনও মোয়ার খবর আমি রাখি না।

শিশু বুঝেছিল, মা তাকে প্রতিরাতে ভুলিয়ে মহাপাপ করতে গেছে।

আতীব্র মানসিক আঘাতে শিশুর মরণ হয়েছিল তৎক্ষণাৎ।

গল্প শেষ করে বললে প্রভাবতী, মদনমঞ্জুষাকেও তো আমি প্রবোধ দিয়ে এসেছি, এনে দেব তোমার স্বামীকে। তাই তো আপনাদের সম্ভোগ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আপনার অগ্নিসাক্ষী স্ত্রী হয়েও আপনাকে দিয়ে আমার কামনার আগুন নিভাতে পারছি না। আপনাদের সাধ মিটুক, তারপর মেটাব আমার সাধ। এই আমার গুপ্ত অভিপ্রায়।

বলে, চকিতচমকে নরবাহনদত্তকে নিয়ে গিয়ে হাজির করল মদনমঞ্জুষার সামনে। নিজে অদৃশ্যরূপে নরবাহনদত্ত নিজে দৃশ্যমান শুধু মদনমঞ্জুষার কাছে। কিন্তু অন্যদের চোখে রইলেন প্রভাবতীরূপে, প্রভাবতীর মায়াবিদ্যার দৌলতে। সাঙ্গ হল সম্ভোগপর্ব।

দুজনের কেউই কিন্তু দেখতে পেল না, প্রভাবতীকে। ভোরের আলোয় মদনমঞ্জুষার একবেণী খুলতে গেছিলেন নরবাহনদত্ত।

রাগ দেখিয়ে বলেছিল মদনমঞ্জুষা, আগে মারুন মানসবেগকে, তারপর খুলবেন বেণী। বেগবতী তাকে আগুন পাহাড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে বটে, কিন্তু সে মরেনি। প্রভাবতীর মায়ায় অন্যের কাছে অদৃশ্য হওয়ায় আপনার বিক্রমও লোপ পেয়েছে।

আশ্বাস দিলেন নরবাহনদত্ত, বীরত্ব দিব্যা যথাসময়ে ফিরে পাবো, মানসবেগকেও শেষ করবো।

খবরটা কিন্তু চলে গেল মানসবেগের কাছে। বেগবতীর বান্ধবী প্রভাবতী এসেছে মদনমঞ্জুষার সেবায়!

নরবাহনদত্ত তো অন্যের চোখে প্রভাবতী! মায়াবিদ্যার কী আশ্চর্য ক্ষমতা!

যাই হোক, কথায় কথায় একদিন মদনমঞ্জুষা নিজের নিগ্রহ কাহিনি বলে গেছিল নরবাহনদত্তকে, সেই পাষণ্ড আমাকে হরণ করে এখানে এনে ইস্তক বলাৎকারের চেষ্টা করেছে অনেক ভাবে। সেই সময়ে তলোয়ার উঁচিয়ে এক ভয়ানক দর্শন দেবতা এসে গেছিলেন। হুংকার দিয়ে বলেছিলেন, এই শ্রীমতী বিদ্যাধরদের ভাবী সম্রাজ্ঞী। তোমার এতবড়ো সাহস, এঁর অমর্যাদা করছো? হুংকার শেষ হতে না হতেই মানসবেগ রক্তবমি করতে করতে আছড়ে পড়েছিল। ভয়ানক দেবতা চলে যেতেই সেই যে নিজের বাড়ি চম্পট দিয়েছে মানসবেগ, আর জ্বালাতে আসে না এখানে। কিন্তু আমি যে আর সহ্য করতে পছিলাম না স্বামীবিরহ যন্ত্রণা। অনাহারে আত্মহত্যাও করতে গেছিলাম। তখন এই অন্তঃপুরের এক দাসী আমাকে একটা খবর দিয়ে গেল। পাপিষ্ঠ মানসবেগ এক সময়ে এক ঋষিকন্যাকে হরণ করেছিল তার সর্বনাশ করবে বলে। রেগে গিয়ে ঋষিরা অভিশাপ দিয়েছিলেন, যে মেয়ে তোকে আকাঙ্ক্ষা করে না, সেই মেয়েকে যেদিন ধর্ষণ করতে যাবি, তোর খুলি ফেটে একশো টুকরো হয়ে যাবে। এই ভয়ে মানসবেগ পরনারী ধর্ষণ করে না। সেই দাসী আরও বলে গেল, মানসবেগ আমাকে কিছুতেই সম্ভোগ করবে না, আমি অরাজি থাকলে। আর, স্বামীর সঙ্গে আমার মিলন হবেই, দেবাদেশে। তখন এল বেগবতী, মানসবেগের বোন, আমাকে বোঝাতে। যেন স্বেচ্ছায় এই শরীরটা দিই মানসবেগকে। কী জঘন্য প্রস্তাব! কিন্তু আমার অবস্থা দেখে তারও মন নরম হয়েছিল। আপনাকে আনতে গেছিল। তারপরের সব ঘটনা তো আপনি জানেন। আপনি যে বেগবতীকে বিয়ে করে ফেলেছেন, তাও আমার অজানা নয়। সে খবর দিয়ে গেছেন বেগবতী আর মানসবেগের মা পৃথিবীদেবী। তাঁর যুক্তি এই : বেগবতী এই রাজ্যের অর্ধেক পেয়েছে। সে তোমার স্বামীকে যখন বিয়ে করেছে, অর্ধেক রাজ্যের ওপর অধিকার তোমারও আছে। অতএব, তুমি খাও, নিজের রাজ্যের আহার খাও। সেই থেকে আহার করছি। বেঁচে আছি। তবে একটা কথা মনে রাখবেন। প্রভাবতী যদি চলে যায়, আপনি আর প্রভাবতীর রূপ ধরে থাকতে পারবেন না, স্বরূপ প্রকাশ পাবে।

নরবাহনদত্ত সব শুনে অভয় দিলেন মদনমঞ্জুষাকে, ভেবো না সব ঠিক হয়ে যাবে।
থেকে গেলেন মদনমঞ্জুষার কাছে প্রভাবতীর দেহ নিয়েই!
কিন্তু একদিন স্বরূপ বেরিয়ে গেল অন্তঃপুরে, মেয়েদের সামনেই! সেদিন বাপের বাড়ি গেছিল প্রভাবতী বিশেষ কাজে। মায়ার প্রভাব কেটে গেছিল তৎক্ষণাৎ।
হইচই পড়ে গেছিল অন্তঃপুরে। ব্যাটাছেলে এখানে এল কী করে? নিশ্চয় নারীলোভী কোন দুশ্চরিত্র!
খবর চলে গেল মানসবেগের কাছে। দলবেঁধে সে ছুটে এল লম্পট হত্যা করার জন্যে।
তখন এলেন তার মা, পৃথিবীদেবী।
বললেন, এই পুরুষ মদনমঞ্জুষার স্বামী, চন্দ্রবংশের প্রসিদ্ধ যুবরাজ নরবাহনদত্ত, আমার জামাইও বটে।
রেগে টং হয়ে মানসবেগ বললে, তাহলে তো আমার আরও বড়ো শত্রু!
পৃথিবীদেবী বললেন, খবরদার! বিদ্যাধরদের ধার্মিক-সভায় বিচার চাও। তারা যা বলবে, তা মাথা পেতে নেবে। যদি না নাও, বিদ্যাধররা তোমার বিরুদ্ধে যাবে, যুবরাজের মতো ধার্মিক-হত্যার জন্যে।
তবে চল ধার্মিক সভায়, বলে, নরবাহনদত্তকে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়েছিল মানসবেগ।
সেই হুকুম খাটাতে বেকায়দায় পড়ে গেল তার দলবল। লোহার খিল উপড়ে নিয়ে নরবাহনদত্ত পিটিয়ে মারলেন বেশ কজনকে। তারপর, একজনের হাত থেকে কৃপাণ কেড়ে নিয়ে কচুকাটা করলেন বাকি সবাইকে।
অগত্যা দিব্যবিদ্যা প্রয়োগ করল মানসবেগ। বেঁধে ফেলল নরবাহনদত্ত আর মদনমঞ্জুষাকে। নিয়ে গেল ধার্মিক সভায়।
ধর্মাসনে বসলেন বিদ্যাধরদের এক রাজা বায়ুপথ। বিশিষ্ট বিদ্যাধরেরা ভরিয়ে দিল গোটা সভাঘর।
মানসবেগ নরবাহনদত্তকে দেখিয়ে বললে, এই লোকটা আমার অন্তঃপুরে ঢুকে জঘন্য কাণ্ড করেছে। আমার বোনকে ধর্ষণ করেছে। সুতরাং একে আমি বধ করবো।
নরবাহনদত্ত বললেন, কী আশ্চর্য! মায়াবিদ্যায় আমাকে বেঁধে রেখে মাটিতে বসিয়ে মানবেগ নিজের আসনে বসে বিচার চাইছে! আগে বসুক আমার পাশে মাটিতে, খুলে দেওয়া হোক আমার মায়াবন্ধন, তারপর হোক বিচার।
খাঁটি কথা। ঘুরে গেল সমস্ত বিদ্যাধরেরা। বন্ধনমুক্ত হলেন নরবাহনদত্ত। মানসবেগকে বসানো হল তাঁর পাশে। শুরু হল সুবিচার পর্ব।
নরবাহনদত্ত বললেন, মানসবেগ আমার বিয়ে করা বউ এই মদনমঞ্জুষাকে হরণ করে এনেছে। আমি পত্নীসহবাস করেছি। সেটা কি ধর্ষণ। এই মানসবেগের বোন আমার স্ত্রী মদনমঞ্জুসার রূপ ধারণ করে আমার সঙ্গে সঙ্গম করেছে। সেটা কী ধর্ষণ? আমার অপরাধটা কোথায়?
বায়ুপথ বললেন, ঠিকই তো। মানসবেগ, তুমি অযথা অত্যাচার করছ এঁর ওপর।
খেপে গেল মানসবেগ। বিচার মানতে চাইল না।
রেগে গেলেন বিচারক বায়ুপথ। বিচার সভার সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ লেগে গেল মানসবেগের।
সিংহনাদ ছেড়ে বললেন নরবাহনদত্ত, মানসবেগ, মায়াবল ছেড়ে পৌরুষবলে লড়ে যাও আমার সঙ্গে।
বিচারসভা যখন রণক্ষেত্র হয়ে উঠছে, তখন আচমকা এক ভয়ংকরদর্শন ভৈরবরূপী দেবতা বেরিয়ে এলেন বিরাট একটা থামের ভেতর থেকে। তিনি কৃষ্ণকায়, বিরাটকায়, প্রদীপ্ত দুই চোখে যেন দুটো সূর্য জ্বলছে। এক-একটী দাঁত যেন এক-একটা বল্লম।
ভয়াল গর্জন ছেড়ে তিনি বললেন, মানসবেগ তুমি বড়ো ধড়িবাজ। কিন্তু জেনে রাখ, বিদ্যাধরদের ভাবী সম্রাট এই নরবাহনদত্ত। এঁকে হারানো যায় না।
বলেই, এক পদাঘাতে মানসবেগকে ঠিকরে বের করে দিলেন বিচারসভার বাইরে। নরবাহনদত্তকে হাতের চেটোয় তুলে নিয়ে রেখে গেলেন ঋষ্যমূক পাহাড়ে।

মানসবেগ স্ববিদ্যায় চলে এল আষাঢ় পাহাড়ে, মদনমঞ্জুষাকে নিয়ে।

১০৭. ফিরে এলেন নরবাহনদত্ত

প্রভাবতী এল ঋষ্যমূক পাহাড়ে, স্বামীদেবতা নরবাহনদত্তের কাছে।

বললে, আমি না থাকায় মানসবেগ আপনাকে ধার্মিক-সভায় নিয়ে যেতে পেরেছিল। আমিই বিদ্যা প্রয়োগ করে ভৈরবরূপী দেবতাকে আনিয়েছিলাম। তাঁকে দিয়েই আপনাকে এখানে আনিয়েছি, এই ঋষ্যমূক পাহাড়ে, যেখানে একদা শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন সীতাকে নিয়ে, এখান থেকেইসীতার অপহরণ ঘটে, এখান থেকেই শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কায় গিয়ে সীতা উদ্ধার করেন, বানর সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়ে। আপনিও জয়যুক্ত হবেন এই পবিত্র অঞ্চলের শুভশক্তির দৌলতে।

নববাহনদত্ত বললেন, গাছের ফল আর দীঘির জল খেয়ে কষ্টে তো নেই। কষ্ট কেবল মদনমঞ্জুষা কাছে নেই বলে।

প্রভাবতী ভুলিয়ে রাখল বিরহী নরবাহনদত্তকে ঋষ্যমূক পর্বতের নানান পবিত্র জায়গা দেখিয়ে, রামায়ণ কাহিনি শুনিয়ে।

এই সময়ে একদিন আকাশ থেকে নেমে এল দুই বিদ্যাধরী। ধনবতী আর অজিনাবতী। ধনবতী অজিনাবতীর মা। অজিনাবতী প্রভাবতীর বান্ধবী।

ধনবতীর ইচ্ছায় নরবাহনদত্ত বিয়ে করলেন তাঁর মেয়ে অজিনাবতীকে।

তারপর একদিন শাশুড়ি ধনবতী বললেন জামাই নরবাহনদত্তকে, তোমার মতো মহৎ পুরুষের সমীচীন নয় এখানে থাকা। ঈর্ষাকাতর বিদ্যাধরেরা তোমার ক্ষতি করে দিতে পারে। ওরা মায়া জানে। চলে যাও নিজের জায়গা কৌশাম্বীতে। আমি আমার ছেলে চণ্ডসিংহ আর প্রধান বিদ্যাধরদের নিয়ে যাচ্ছি সেখানে, তোমার উত্থানের পথ প্রশস্ত করতে।

আকাশ আলো করে বিদায় নিল গুণবতী বিদ্যাধরী ধনবতী।

দুই বিদ্যাধরী বউ প্রভাবতী আর অজিনাবতী নরবাহনদত্তকে নিয়ে চলে এল কৌশাম্বীর বাগানে।

মহোৎসব শুরু হল রাজপরিবারে।

বহু বউ পরিবৃত নরবাহনদত্তের সামনে আচমকা হাজির হল আর এক বউ, বেগবতী।

বললে, সাধনা করে হারানো বিদ্যা ফিরে পেয়েই চলে এলাম। নইলে পারতাম না।

তারপরেই এল ধনবতী, বহু বিদগ্ধ আর বলবান বিদ্যাধরদের নিয়ে আকাশপথে।

একটাই সংকল্প প্রত্যেকের মনের মধ্যে। নরবাহনদত্তকে আরও শক্তিমান করতে হবে। বিদ্যাধরদের ভাবী সম্রাট যে সে?

প্রভাবতীর বাবা পিঙ্গলগান্ধার বললেন, বাবাজী, এবার তৈরি হও। শক্তিসঞ্চয়ের আরাধনা করো। আমরা আছি। তোমাকে যুদ্ধে হারাতে হবে দুজন শক্তিমান বিদ্যাধর রাজাকে। হিমালয়ের দক্ষিণবেদীর রাজা গৌরীমুণ্ড আর উত্তরবেদীর রাজা মন্দরদেব অতি বদমাস। তুমি তাদের যুদ্ধে হারাবে। শক্তিসঞ্চয় করো শিবের আরাধনায়, বিদ্যাসাধনের সিদ্ধক্ষেত্র কৈলাসে। আমরা এসেছি তোমাকে সাহায্য করতে।

নরবাহনদত্তের শক্তিসাধনা

গন্ধর্ব আর বিদ্যাধরদের সম্মিলিত শক্তির প্রয়াস নরবাহনদত্তকে নিয়ে গেছিল সিদ্ধক্ষেত্র কৈলাসে। তাঁকে ঘিরে রেখেছিল নানানভাবে। এমনকি অপূর্ব সুন্দরী বিদ্যাধরীরও তাদের চোখের জ্যোতি দিয়ে আরও সুন্দর করে তুলেছিল নরবাহনদত্তকে। এদের মধ্যে পাঁচ বিদ্যাধরকন্যার মনের কোণে ছিল আসক্তি। যুবরাজের বউ হওয়ার বাসনা জেগেছিল পাঁচজনেরই মনে। পণ করেছিল, পাঁচজনেই যথাসময়ে পতিত্বে বরণ করবে যুবরাজকে, কেউ কাউকে হিংসে করবে না।

তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে গেছিল দুষ্টু রাজা গৌরীমুণ্ড আর মানসবেগ, আকাশপথে অগুন্তি সৈন্য এনে। তুমুল লড়াই হয়ে গেছিল যুবরাজ পক্ষের বিদ্যাধর সৈন্যদের সঙ্গে। রক্তস্রোত বয়ে গেছিল, রক্তনদীতে

অগুন্তি কবন্ধ ভেসে গেছিল, গৌরীমুণ্ড নিজেও বাহুযুদ্ধে মেতেছিল নরবাহনদত্তের সঙ্গে, যুবরাজকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল আগুন পাহাড়ে।

মানসবেগ শূন্যে নিক্ষেপ করেছিল যুবরাজের গোমুখ প্রমুখ পারিষদবর্গকে। কিন্তু ধনবতীর বিদ্যা প্রয়োগে ইতস্তত নিক্ষিপ্ত প্রত্যেকেই ফিরে এসেছিল এক জায়গায়। সেই সঙ্গে শুনেছিল ধনবতীর অভয়, শিগগিরই মিলিত হবে যুবরাজের সঙ্গে। ভয় পেও না।

তপস্যা পণ্ড করে দিয়ে মানসবেগকে নিয়ে বদমাস গৌরীমুণ্ড ফিরে গেছিল স্বস্থানে।

মানসবেগ গেল মদনমঞ্জুষার কাছে। অট্টহেসে বললে, অয়ি সুন্দরী এবার ভজনা করো আমাকে। তোমার পতি মরেছে।

হেসে বলেছিল মদনমঞ্জুষা, তিনি মহাপুরুষ। তাঁকে কেউ মারতে পারে না।

নিরাশ হয়ে মানসবেগ চম্পট দিয়েছিল স্বস্থানে। ভড়কি দিয়েও মদনমঞ্জুষার মনোবল ভাঙা গেল না!

এ কেমন কন্যা?

নরবাহনদত্তের সিদ্ধিলাভ

নরবাহনদত্তকে আগুন পাহাড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হলেও তিনি কিন্তু আগুন পাহাড়ে পড়েননি।

শূন্যপথেই তাকে লুফে নিয়েছিলেন এক দিব্য পুরুষ। নামিয়ে দিয়েছিলেন স্বর্গের গঙ্গা মন্দাকিনীরতীরে।

বলেছিলেন, আমার নাম অমৃতপ্রভ, বিদ্যাধর অধিপতি অমৃতপ্রভ। মহাদেবের আদেশে আপনাকে শূন্যে লুফে নিয়ে এখান নামিয়ে গেলাম। এই দেখুন কৈলাশ পাহাড়, মহাদেব রয়েছেন যেখানে। এইখানে বসে ওঁর আরাধনা করুন। যা চাইছেন, তা পাবেন।

বিদায় নিলেন অমৃতপ্রভ।

আরাধনা শুরু করলেন নরবাহনদত্ত। শুরু করলেন গণেশ পুজো দিয়ে, যিনি সব বিঘ্ন বিনাশ করেন। খুশি হলেন গণপতি। পীঠস্থানে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তোরণপথে ছিলেন নন্দী। তাঁকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করলেন।

নন্দী বললেন, যুবরাজ, আপনি প্রায় সিদ্ধপুরুষ হয়ে এসেছেন। আর কোনও বাধা পাবেন না। শিব-পার্বতীর ধ্যান করে যান এখানে বসে। শুদ্ধ না হলে পুরো সিদ্ধি পাবেন না।

ধ্যানে বসলেন যুবরাজ অনাহারে।

প্রীত হলেন শিব-পার্বতী। দর্শন দিলেন। বললেন, আজ থেকে তুমি বিদ্যাধরদের সম্রাট হলে। অলৌকিক সিদ্ধবিদ্যা সমূহের অধিকারী হলে। শত্রুর অজেয় হয়ে রইলে। আঘাত তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। শত্রুরা নিপাত যাবে তোমার সঙ্গে টক্কর দিতে এলে। শক্তিহীন হবে তোমাকে দেখলেই। আর, এইসব ক্ষমতার সঙ্গে আজ থেকে তোমার আয়ত্তে এল গৌরীবিদ্যা। যে বিদ্যা কেউ পায় না।

বর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য একটা বিমান উড়ে এসে দাঁড়াল যুবরাজের সামনে। ব্রহ্মার তৈরি বিমান। দলে দলে সিদ্ধবিদ্যা মূর্তি ধারণ করে নেমে এল ভেতর থেকে। এক পায়ে খাড়া তারা যুবরাজের আদেশের অপেক্ষায়।

বিমানে উঠলেন যুবরাজ। পৌঁছোলেন বক্রপুরে, বিদ্যাধর অধিপতি অমৃতপ্রভর নিবাস যেখানে।

অমৃতপ্রভ নিজের মেয়ে সুলোচনার সঙ্গে বিয়ে দিলেন নরবাহনদত্তের।

১০৮. মন্ত্রীদের নিজেদের কথা

পরের দিন...

নতুন সম্রাট বসেছেন বিদ্যাধর-সিংহাসনে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ হল এক দিব্যপুরুষ।

প্রণাম সেরে নিয়ে বললে, আমার নাম পৌররুচি। আমি বিদ্যাধর সম্রাটদের দ্বারপাল, পুরুষানুক্রমে। এসেছি আপনার আদেশ মাথা পেতে নিতে।

অমৃতপ্রভ সায় দিলেন পৌররুচির কথায়। দ্বারপালের গুরুদায়িত্ব দেওয়া হল তাঁকে।

এরপরেই সম্রাট-সভা উজ্জ্বলতর করে দিয়ে এলেন আরও অনেকে। এলেন শাউড়ি ধনবতী এবং অন্যান্য বিদ্যাধরেরা, নরবাহনদত্তের বিদ্যাধরী বউরাও দিগবিদিক ঝলমলিয়ে হাসির তুফান তুলে ঘিরে ধরল নরবাহনদত্তকে।

সবাই তো হাজির, কিন্তু তাঁর পারিষদরা কোথায়? মানসবেগ তো তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল দিকে দিকে বেঁচে আছে তো?

ব্যাকুল নরবাহনদত্তকে আশ্বাস দিয়ে বললেন ধনবতী, হ্যাঁ, বেঁচে আছে। আমার বিদ্যা প্রয়োগ করে তাদের শূন্যপথেই ধরে নিয়ে নামিয়ে দিয়েছি মাটিতে। এনে দিচ্ছি আমার অলৌকিক বিদ্যা খাটিয়ে।

বিদ্যা প্রয়োগ করেছিলেন ধনবতী। একে একে হাজির হয়েছিল বন্ধুবৎসল নরবাহন দত্তের সমস্ত বন্ধুরা।

বলেছিলেন নরবাহনদত্ত, বলো এতদিন কে কোথায় ছিলে, কীভাবে টিকে রইলে।

প্রথম আখ্যান করে গেল গোমুখ।

শূন্যে নিক্ষিপ্ত হতেই এক দেবী আমাকে লুফে নিলেন শূন্যেই, নামিয়ে দিলেন এক বনভূমিতে।

একটু পরেই দেখলাম এক সাধুকে। তিনি আমার নাম ধরে ডাকলেন। আমাকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে গেলেন। সেখানে শিবের আরাধনা হয়।

তাঁর নাম নাগস্বামী। ব্রাহ্মণ বাবা মারা যাওয়ার পর পাটলিপুত্রে গেছিলেন বিদ্যা অর্জন করতে। নিরক্ষর ছিলেন নিজের বোকামির জন্যে। অন্য ছাত্রদের টিটকিরি সইতে না পেরে বিন্ধ্যদেবীকে দর্শন করবেন বলে বেরিয়ে পড়েছিলেন। মাঝপথে পৌঁছেছিলেন বক্রোলক নগরে। খিদে মেটাতে গেছিলেন এক গেরস্তর বাড়িতে। সেই বাড়ির গিন্নি তাঁকে ভাতের সঙ্গে দিয়েছিল একটা লাল পদ্ম। পদ্ম হাতে আর এক গেরস্তের বাড়িতে যেতেই সেই বাড়ির গৃহিণী বলেছিলেন, সর্বনাশ। তোমাকে যে যোগিনীতে পেয়েছে। ওটা লাল পদ্ম নয়, রক্তমাখা কাটা হাত, মানুষের।

কথাটা শুনেই নাগস্বামী পদ্মের দিকে চোখ ফেরাতেই দেখেছিল, সত্যিই ধরে রয়েছে একটা রক্তমাখা কাটা হাত, মানুষের হাত!

ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গৃহিণীর পা জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, আমাকে বাঁচান!

গৃহিণী বলেছিলেন, তিনযোজন হাঁটো। একটা গ্রাম পাবে। সেখানে পাবে এক ব্রাহ্মণকে। তার নাম দেবরক্ষিত। তাঁর গোয়ালে আছে কামধেনুর মতো একটা গোরু। তোমার রক্ষাকবচ রয়েছে সেখানেই।

নাগস্বামী সারাদিন দৌড়ে তিনযোজন পথ পেরিয়ে সন্ধ্যে নাগাদ দেবরক্ষিতের বাড়িতে পৌঁছেছিল। কামধেনুকে প্রণাম করে যোগিনীদের হাত থেকে বাঁচতে চেয়েছিল।

ঠিক সেই সময়ে সন্ধ্যে হয়েছিল। যোগিনীরা আকাশপথে উড়ে এসেছিল। কামধেনু তাদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

ভোরের দিকে পরিষ্কার মানুষের গলায় কামধেনু বলেছিল, আজ রাতে তো তোমাকে আমি বাঁচাতে পারবো না। চলে যাও পাঁচযোজন দূরে বনের মধ্যে ভূতিশিব শৈব সন্ন্যাসীর মঠে। উনি বাঁচাবেন তোমাকে আজ রাতে।

প্রায় দৌড়ে পাঁচযোজন পথ পেরিয়ে ভূতিশিবের মঠে পৌঁছে গেছিল নাগস্বামী। তারপরেই নেমেছিল সন্ধ্যের অন্ধকার। তেড়ে এসেছিল যোগিনীরা।

কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারেনি দরজা আগলে ভূতিশিব দাঁড়িয়েছিলেন বলে, ত্রিশূল উঁচিয়ে।

ভোরের দিকে যোগিনীরা পলায়ন করেছিল। ভূতিশিব বলেছিলেন নাগস্বামীকে, আজ রাতে আর তোমাকে বাঁচাতে পারবো না। পারবেন বসুমতী ব্রাহ্মণ। উনি থাকেন এখান থেকে দশযোজন দূরে সন্ধ্যাবাস গ্রামে। আজ রাতটা যদি নির্বিঘ্নে কাটাও, পর পর তিনটে রাত বিফলে গেলে যোগিনীরা আর হানা দেবে না।

কিন্তু দশযোজন পথ তো কম নয়। প্রাণপণে দৌড়েও পথেই সন্ধ্যে করে ফেলেছিল নাগস্বামী। তেড়ে এসে যোগিনীরা তাকে ধরে যখন আকাশপথে উড়ে যাচ্ছে সোল্লাসে, লড়াই লেগে গেছিল আর একদল যোগিনীর

সঙ্গে, বোধহয় নাগস্বামীর ভাগ চেয়েছিল বলে। লড়াই যখম চরমে, নাগস্বামী টুপ করে খসে পড়েছিল নীচের জঙ্গলে, গাছের মাথায়। হুড়মুড় করে নেমেই দৌড়ে একটা শিবমন্দিরে ঢুকে গেছিল নাগস্বামী। সেখানে দেখেছিল অতি সুন্দরী এক রমণীকে, তাকে ঘিরে রয়েছে সমান সুন্দরী আরও কয়েকটি মেয়েছেলে।

অনিন্দ্যসুন্দরী বলেছিল, আমি যক্ষকন্যা সুমিত্রা। অভিশাপ পেয়ে রয়েছি এখানে। শাপ কেটে যাবে যদি একজন মানুষ আমার সঙ্গে সঙ্গম করে। তুমি করো আমাকে।

যথা আজ্ঞা। যক্ষকন্যাকে সম্ভোগ করে গেল নাগস্বামী। শাপ কেটে গেল সুমিত্রার। সখীদের নিয়ে চলে যাওয়ার সময়ে বলে গেল নাগস্বামীকে, আমার শক্তি তুমি পেয়ে গেলে। ভোগে থাকবে, ভয় থাকবে না। কিন্তু ওই বাড়ির ভেতরের ঘরে কক্ষনো ঢুকবে না।

যক্ষকন্যা চলে যাওয়ার পর কিন্তু কৌতূহলী নাগস্বামী ঢুকেছিল ভেতরের সেই ঘরে। দেখেছিল একটা ঘোড়া। কাছে যেতেই চাট খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছিল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখেছিল রয়েছে এই শিবমন্দিরে।

আত্মকাহিনি সমাপ্ত করে বলেছিল নাগস্বামী, সেই থেকে শিবযোগী হয়ে রয়েছি এখানে। যক্ষকন্যা সম্ভোগ করে ত্রিকাল দর্শনের অতীন্দ্রিয় নয়ন পেয়েছি। গোমুখ, তুমি এখানে থাক। যা চাও, তা পাবে।

গোমুখ বললে, এই হল আমার আশ্চর্য পরিত্রাণের বিবরণ। কাল রাতে স্বপ্ন দেখলাম স্বয়ং শিবকে। উনিই বললেন, আপনি বিদ্যাধরসম্রাট হয়েছেন। আজ এক দিব্য রমণী আমাকে তুলে নিয়ে এলেন আপনার সামনে।

নীরব হল গোমুখ।

সরব হল মরুভূতি।

মানসবেগ আমাকে শূন্যে নিক্ষেপ করতেই এক আকাশিক দেবী আমাকে লুফে নিয়ে নামিয়ে দিলেন দূরের এক বনস্পতি অঞ্চলে। দেখলাম, অদূরে বসে রয়েছেন এক সন্ন্যাসী। তিনি আমাকে তাঁর কাছে থাকতে বললেন।

থেকে গেলাম সেখানে। একদিন দেখলাম, জনাকয়েক দিব্যকন্যা স্নান করছে নদীতে। সন্ন্যাসী বললেন, যাও, ওদের যে কোনও একজনের কাপড় নিয়ে পালিয়ে এস।

তাই করলাম। যার কাপড় নিয়েছি, নিরাবরণা সেই মেয়েটি দু-হাতে বক্ষশোভা আর গোপনাঙ্গ ঢেকে দৌড়ে এল পেছনে পেছনে।

সন্ন্যাসী তাকে বললেন, কাপড় পাবে যদি বলো নরবাহনদত্তের সমস্ত খবর।

মেয়েটি বললে, নরবাহনদত্ত এখন কৈলাসে। শিবের তপস্যা করছে। দিন কয়েক পরে হবে বিদ্যাধর সম্রাট।

দিব্যকন্যা আগে একটা অভিশাপ পেয়েছিল। সেই অভিশাপের ফলেই কাপড় হারিয়ে নগ্না হয়ে এসেছিল সন্ন্যাসীর সামনে। অভিশাপ কাটানোর জন্যেই দেহ দিতে হল সন্ন্যাসীকে। যথাসময়ে একটা বাচ্চাও হল। সেই বাচ্চাকে সন্ন্যাসীর কোলে ফেলে দিয়ে সুন্দরী বললে, আমার শাপ কেটেছে, চললাম। যদি এখনও আমার সঙ্গে সহবাস করতে চান, এই বাচ্চাটাকে চালের সঙ্গে ফুটিয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলবেন।

চম্পট দিল রমণী। সন্ন্যাসীও চালের সঙ্গে বাচ্চাটাকে ফুটিয়ে নিয়ে একটু খেতেই আকাশে ওড়বার ক্ষমতা পেয়ে গেলেন। আর কী মাটিতে থাকেন? সহবাসের আতীব্র কামনা নিয়ে তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেলেন আকাশে। যাওয়ার আগে আমাকে বলে গেছিলেন সেদ্ধ মাংস একটু খেতে। আমি খাইনি।

একদিন ইচ্ছে হয়েছিল, খেয়ে দেখাই যাক না কী হয়। মাংস না খেয়ে শুধু দুটো ভাত তুলে নিয়ে কোঁৎ করে গিলে ফেলেছিলাম। থু-থু করে থুতু ফেলতে গিয়ে তো অবাক!

থুতুর সঙ্গে সোনা বেরোচ্ছে? শুধু সোনা আর আর সোনা!

সোনা থুতু ফেলে ফেলে বড়োলোক হয়ে গেলাম। ঘুরতে ঘুরতে একটা শহরে পৌঁছোলাম। এক বারবনিতার বাড়িতে উঠলাম। সোনা উড়িয়ে মজায় থাকলাম। কিন্তু সে আমার টাকাপয়সার উৎস কোথায়

জানতে পেরে গেছিল। লুকিয়ে বমির ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিল। বমির সঙ্গে বেরিয়ে এল দুটো পদ্মরাগমণি। সেই ভাতদুটো পেটে গিয়ে পদ্মরাগ হয়েছিল এতদিন, ঠিকরে দিয়েছে শুধু সোনা! ধড়িবাজ বারবনিতা মণিময় সেই ভাতদুটো টপ করে গিলে নিতেই তার থুতুর সঙ্গে শুধু সোনাই বেরোতে লাগল। আমার থুতু থুতুই হয়ে গেল। বেশ্যা দিল আমাকে খেদিয়ে। পৌঁছোলাম এক চণ্ডিকা মন্দিরে। রাতে স্বপ্ন দেখলাম, এবার দেখা হবে সম্রাট নরবাহনদত্তের সঙ্গে। ভোরে এল এক দিব্যরমণী। আমাকে আকাশে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেল আপনার কাছে। এই আমার কাহিনি।

এরপর হরিশিখ শুরু করল আত্মকথা।

আকাশে ঠিকরে গিয়েও মরলাম না। এক পরমাসুন্দরী দয়াবতী আমাকে লুফে নিয়ে নামিয়ে দিয়ে গেলেন উজ্জয়িনীতে। মরবার জন্যে নিশুতি রাতে গেলাম শ্মশানে। চিতা সাজিয়ে আগুন ধরিয়ে যেই ঝাঁপ দিতে গেছি, তালগাছের মতো লম্বা বিকটাকার এক ভূত এসে বললে, আমি ভূতেদের রাজা তালজঙ্ঘা। কেন মরতে যাচ্ছ? যুবরাজ নরবাহনদত্ত জীবিত। তপস্যারত। সিদ্ধিলাভ করলেই তাঁর দেখা পাবে।

শিবমন্দিরে ফিরে গেলাম। আজ এক দেবীর কৃপায় এলাম এখানে।

সম্রাট নরবাহনদত্তের অনুরোধে শাউড়ি ধনবতী তাঁর সব বন্ধুকে দৈবী ক্ষমতা দান করলেন। বিদ্যাধরদের ক্ষমতা পেয়ে গেল পারিষদবর্গ।

শত্রু নিধন

শাউড়ি ধনবতীর নির্দেশে সম্রাট নরবাহনদত্ত বেরিয়ে পড়লেন মানসবেগ আর গৌরীমুণ্ডকে শেষ করতে। আকাশ ছেয়ে তাঁর বিদ্যাধর বাহিনী তেড়ে গেল শত্রুদেশ অভিমুখে তেড়ে এল শত্রুসৈন্যও।

তাদের রক্তে যখন পাহাড় ভেসে যাচ্ছে। তখন নরবাহনদত্ত খামচে ধরলেন মানসবেগের চুলের মুঠি, মুণ্ড বাদ দিলেন শরীর থেকে কৃপাণের এক কোপে। মানসবেগের দু-পা ধরে শূন্যে তুলে আছাড়ের পর আছাড় মেরে শেষ করে দিলেন তাকেও।

বিদ্যাধর-বিদ্যা অর্জনের পর বিদ্যাধর-নিধনের ক্ষমতা যে এসে গেছিল নরবাহনদত্তের ভেতরেও। তিনি যে বিদ্যাধরদের সম্রাট, শিবের বরে, পার্বতীর আশীর্বাদে অপরাজেয়।

মদনমঞ্জুষাকে ফিরে পেলেন নরবাহনদত্ত

গৌরীমুণ্ডকে নিধন করেও তার মেয়েকে বিয়ে করতে হল নরবাহনদত্তকে, শাউড়ি ধনবতীর কথায়। নিজের ইচ্ছাতে তো বটেই, কারণ মেয়ে যে প্রকৃতই অপরূপা, ত্রিলোকসুন্দরী, নাম, আত্মনিকা।

পিতৃঘাতকের আদর সোহাগে পিতৃলোক ভুলে গেল আত্মনিকা।

মদনমঞ্জুষাকে আনিয়ে নিয়েছিলেন তার আগেই। বেগবতী আর প্রভাবতী গিয়ে পরমসমাদরে তাকে এনে মিলিয়ে দিয়েছিল স্বামীর সঙ্গে। সমাপ্তি ঘটেছিল দীর্ঘ বিরহের। বহু পত্নী নিয়ে বেশ কয়েক দিবস পরমানন্দে গৌরীমুণ্ডের উপবনে কাটিয়ে আবার যুদ্ধে বেরিয়েছিলেন নরবাহনদত্ত।

এবারের যুদ্ধ মন্দরদেবের বিরুদ্ধে। চরমুখে খবর এসেছিল, মন্দরদেব তৈরি হচ্ছে নরবাহনদত্তকে শেষ করার জন্যে।

সুতরাং সসৈন্যে আর সমস্ত পত্নীদের নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন নরবাহনদত্ত। পথে এক মনোহর তড়াগ দেখে পত্নীদের নিয়ে জলবিহার করতে নেমেছিলেন। যথেচ্ছ জলবিহারের ফলে ঘরণীদের চোখের কাজল ধুয়ে গেছিল, খোঁপা খুলে গেছিল, ভিজে কাপড় গায়ে লেপটে গেছিল।

সে এক নয়নসুন্দর জলকেলী। মুগ্ধ হয়েছিলেন নরবাহনদত্ত।

আরও পাঁচ বউ পেলেন নরবাহনদত্ত

পরের দিন সকালে সৈন্যসামন্ত নিয়ে আকাশপথে যুদ্ধযাত্রা করলেন সম্রাট নরবাহনদত্ত, বিমানে চেপে। পথে অতিথি হতেই হল বিদ্যাধররাজ বায়ুপথের মনোরম উদ্যানপরিবৃত বিলাসবহুল প্রাসাদে। সেখানেও এক ত্রিভুবনসুন্দরীকে পত্নী করে নিলেন নরবাহনদত্ত। মেয়েটি রাজা বায়ুপথের বোন। বিয়ে হয়নি তখনও। নাম,

বায়ুবেগযশা। বাগানের ভেতরে নকল নদীর পাড়ে বসে সোনার গুঁড়ো নিয়ে হাসি-হাসি মুখে খেলা করছিল আর আড়ে আড়ে দেখছিল নরবাহনদত্ত। কটাক্ষের বাণ আর রক্তাধরার নীরব আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারেননি প্রেমিক পুরুষ নরবাহনদত্ত। কাছে গেছিলেন। পত্নীরা তাই দেখে মুখটিপে হেসেছিল। লজ্জাপেয়ে বায়ুবেগযশা সরে গেছিল, প্রেমে জরজর হয়ে।

নরবাহনদত্তকে নিয়ে পরিহাসে মেতেছিল বন্ধুবর্গ, মদনমঞ্জুষা প্রমুখ রানিদের প্ররোচনায়। তারা তো মনেপ্রাণে চায় দল ভারি হোক রানিদের, অন্তঃপুরে আসুক আর এক ডানাকাটা পরী, স্বামীর চিরসঙ্গিনী হয়ে। রমণীদের মনের কথা জানা বড়োই দুষ্কর। বন্ধু বায়ুবেগের কানে গেল নীরব প্রেম আর আঁখি দিয়ে আঁখি আকর্ষণের সরস কাহিনি। হাস্যমুখে বিয়ের আয়োজন করলেন। পদ্মিনীসসা বোনকে নরবাহনদত্তের কোলে বসিয়ে দেওয়ার জন্যে বিয়ের আয়োজন করলেন।

অবাক ব্যাপারটা দেখা গেল তখনই মিষ্টি মেয়ের চোখে রয়েছে ইচ্ছে, বিয়ের ইচ্ছে, কিন্তু মুখের কথায় শোনা গেল তার বিপরীত!

সলাজকণ্ঠে বললে বায়ুপথের বোন, দাদা, আমার তো ইচ্ছে নেই বিয়ে করার।

সেকী কথা!

রহস্য ফাঁস করে দিল গোমুখ। সে বললে, এই কন্যা যদি একা বিয়ে করেন সম্রাট নরবাহনদত্তকে, তাহলে এঁর চার সখী অগ্নিপ্রবেশ করে জীবন বিসর্জন দেবে।

কেন? কেন? কেন?

বিবাহ বাসর যখন ফেটে পড়ছে বহুজনের এই একই প্রশ্নে, তখন বলেছিল গোমুখ, বায়ুবেগযশা যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, পঞ্চসখী একসঙ্গে পতিত্বে বরণ করবেন নরবহনদত্তকে। প্রতিজ্ঞার নড়চড় যদি হয়, একজন যদি বিয়ে করেন বাকি চারজনকে ফেলে, তাহলে বাকি চারজনেই করবেন আত্মহত্যা।

কোথায় তারা? সেই চার কন্যা?

গোমুখ আগেই দেখে এসেছিল অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে কোথায় বসে আছে চার সুন্দরী। তৎক্ষণাৎ বায়ুপথকে নিয়ে গেছিল সেখানে। তাঁদের মহাসমাদারে আনা হয়েছিল বিবাহসভায়।

সুন্দরী বায়ুবেগযশা পরিচয় দিয়েছিল চার সুন্দরীসখীর। একজন কালকূট রাজার মেয়ে কালিকা, দ্বিতীয়সুন্দরী বিদ্যুৎপুঞ্জের কন্যা বিদ্যুৎপুঞ্জা, তৃতীয় সুন্দরী মন্দর দুহিতা মন্দাকিনী, চতুর্থ সুন্দরী মহাদংষ্ট্রের আত্মজ পদ্মপ্রভা।

নতমুখী বায়ুবেগযশা বললে, এই চার কন্যাই বিদ্যাধরী। সিদ্ধক্ষেত্রে যখন তপস্যারত ছিলেন নরবাহনদত্ত, আমরা তাঁকে দেখে কামজরজর হয়েছিলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ওঁকে বিয়ে করব পাঁচজন একসঙ্গে। একজন যদি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে, বাকি চারজনে আগুনে পুড়ে মরব। হে সম্রাট, আমার প্রার্থনা রাখুন। পাঁচজনকেই একসঙ্গে বিয়ে করুন।

আপত্তি করলেন না বিবাহপটু নরবাহনদত্ত। একসঙ্গে পঞ্চকন্যাকে বিয়ের মালা পরিয়ে দিয়ে তাদের নিয়ে সম্ভোগের হুল্লোড়ে মেতে রইলেন, অন্যান্য মহিষীরাও বাদ গেলেন না রতিমুখপ্রসাদে।

দিন কয়েক প্রমোদে হুল্লোড়ে কেটে যাওয়ার পর মাধ্যক্ষ হরিশিখ এসে চৈতন্যোদয় ঘটাল নরবাহনদত্তের, করছেন কী? রণডঙ্কা বাজিয়ে বেরিয়েছেন, রতিরণ করে যাচ্ছেন? যুদ্ধনীতিতে এমন কাজ যে অন্যায়।

হুঁশ হল নরবাহনদত্তের।

যখন তৈরি হচ্ছেন রণদামামা বাজিয়ে ফের বেরোবেন বলে, শ্বশুরেরা বলেন, মন্দরদেব কিন্তু রয়েছে খুবই দুর্গম একটা জায়গায়। সেখানে যেতে হলে ত্রিশীর্ষ গুহার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সেই গুহার প্রবেশপথ পাহারা দেয় দেবমায়, মহাবীর দেবমায়। সিদ্ধপুরুষ তিনি। নিজে ঢুকতে পারেন সেই গুহায়, আর কেউ না। কাছেই আছে একটা চন্দনগাছ। তলায় বসে সাধনা করুন, তবেই ঢুকতে পারবেন গুহায়। চন্দনগাছের কাছেও যেতে পারে না সাধারণ পুরুষ। কিন্তু আপনি পারবেন। কারণ, আপনি রাজচক্রবর্তী। সেই রাতেই

কিচ্ছু না খেয়ে চন্দনগাছের তলায় চলে গেলেন নরবাহন দত্ত। অনেক উপদ্রবের সম্মুখীন হলেন। ভূত-প্রেত-পিশাচ-দানব-অন্তরীক্ষ আকাশে হানা দিয়ে গেল সমানে, প্রলয়সম প্রাকৃতিক উৎপাত তাঁকে টলতে পারল না। অসামান্য সাহসে চন্দন তরুকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করতেই শুনলেন কায়াহীন কণ্ঠের বাণী, আমি চন্দন তরু বলছি। তুমি সিদ্ধিলাভ করলে। যখনই মনে করবে আমাকে, উপস্থিত হব। এখন যাও গোবিন্দকূটে, অন্যান্য রত্নসিদ্ধি অর্জন করো। মন্দরদেব পরাজিত হবে।

পরের দিন গোবিন্দকূট পর্বতে গেলেন নরবাহনদত্ত রত্ন-সিদ্ধাই-অর্জন তপস্যার জন্যে।

১০৯. নরবাহনদত্ত পঞ্চরত্নসিদ্ধি পেলেন

গোবিন্দকূট পাহাড়ে নরবাহনদত্তের কাছে এলেন সেই অমৃতপ্রভ, বিদ্যাধর অমৃতপ্রভ, যিনি শূন্যে নিক্ষিপ্ত নরবাহনদত্তকে লুফে নিয়ে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন। আগুন পাহাড়ে পড়তে দেননি।

শূন্য পথেই এলেন তিনি। বললেন নরবাহনদত্তকে, মলয়াচলের সাধু বামদেব আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আপনি একা যাবেন। খবর দিতে পাঠালেন আমাকে।

তৎক্ষণাৎ অমৃতপ্রভের সঙ্গে আকাশপথে নরবাহনদত্ত চলে এলেন পরমপুরুষ বামদেবের আশ্রমে।

বামদেব বললেন, শিব দগ্ধ করেছিলেন কামদেবকে। তুমিই সেই কামদেব। বিদ্যাধর সম্রাট হয়ে ফিরে এলে শিবের ইচ্ছায়।

নরবাহনদত্তের রমণীমোহন শক্তি এবং বহুপত্নীলাভের রহস্য অবশেষে বোঝা গেল!

বামদেব বলে গেলেন, আমার এই পর্বত-মঠের পেছন দিকে একটা গভীর গুহা আছে। সেখানে আছে কয়েকটা রত্ন। তোমাকে দিলাম। নিয়ে যাও। পঞ্চরত্নে সিদ্ধিলাভ হবে। কুচক্রী করাল মন্দরদেবকে পরাভূত করতে পারবে। এইজন্যেই, শিবের আদেশে, তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

গুহার ভেতরে ঢুকলেন নরবাহনদত্ত।

প্রথমেই তেড়ে এল এক পাগলা হাতি। নরবাহনদত্ত তার কপালে এক ঘুসি মেরেই দাঁত দুটো ধরে লাফিয়ে উঠে গেলেন পিঠে।

গুহা গমগম করে উঠল খুশিউচ্ছল দৈবস্বরে, হস্তিরত্নে সিদ্ধিলাভ হয়ে গেল।

গভীর গুহার গভীরে ধেয়ে গেলেন নরবাহনদত্ত, হাতির পিঠে সওয়ার হয়ে। দেখতে পেলেন, শূন্যে ভাসছে আশ্চর্য একটা খাঁড়া। রশ্মি ঠিকরে যাচ্ছে জ্যোতির্ময় খড়্গ থেকে।

হাতির পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে নির্ভয়ে দক্ষহাতে খাঁড়াকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে এলেন নরবাহনদত্ত।

অমনি সেই দৈবকণ্ঠ বললে, খাঁড়ারত্ন সিদ্ধি হয়ে গেল।

এইভাবে পর পর পাওয়া গেল চন্দ্রিকা রত্ন, কামিনী রত্ন, আর বিধ্বংসিনী বিদ্যারত্ন।

পঞ্চরত্ন সিদ্ধি নিয়ে গুহার বাইরে এলেন নরবাহনদত্ত। প্রণাম করলেন ঋষি বামদেবকে।

ঋষি আশীর্বাদ করলেন, এবার জয় করতে পারবে মন্দরদেবকে।
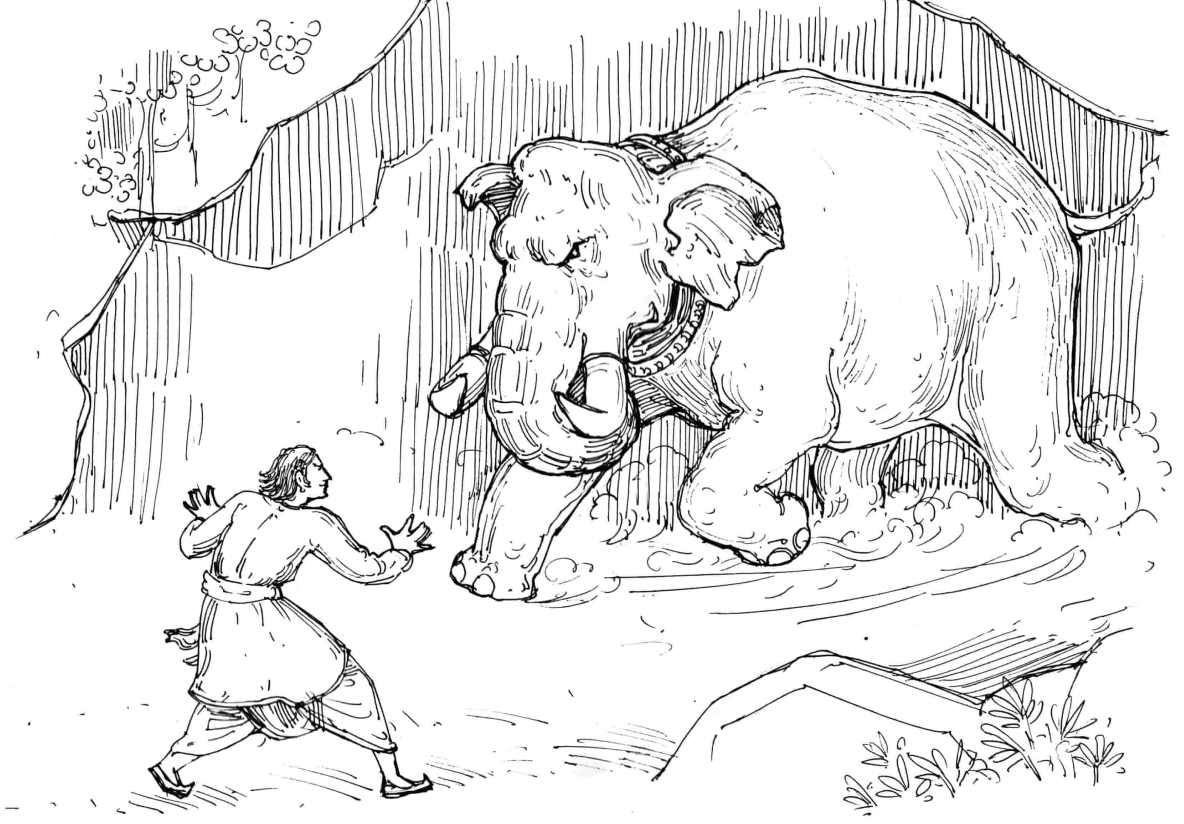
প্রথমেই তেড়ে এল এক পাগলা হাতি।

সম্রাটের বিজয় অভিযান

রত্নশক্তিতে বলবান নরবাহনদত্ত পরের দিন বেরোলেন মন্দরদেব বিজয় অভিযানে, ব্রহ্মার দেওয়া শিবদত্ত বিমানে চেপে, সঙ্গে নিলেন অর্ধাগ্নিনিদের।

অর্ধ অঙ্গ বলে কথা! ফেলে যাওয়া কি যায়!

আকাশ ছেয়ে গেল তাবড় তাবড় বিদ্যাধর রাজাদের সৈন্যসামন্তে। মানস সরোবর পেরিয়ে চলে এলেন গণ্ডশৈলের মাথার ওপর। দেবলোকের সুন্দরীদের আমোদপ্রমোদের জায়গা। কিন্তু নরবাহনদত্ত নিমেষে সসৈন্যে লোভনীয় এই অঞ্চল পেরিয়ে পৌঁছে গেলেন স্বর্গের গঙ্গা মন্দাকিনীর তীরে।

বিশ্রাম নিলেন সেখানে।

বুদ্ধিমান শ্বশুর, বিদ্যাধরদের অন্যতম রাজা মন্দর বললেন, কৈলাস পাহাড়ের ওপর দিয়ে গেলে সব বিদ্যা নষ্ট হয়ে যাবে, যেতে হবে নীচ দিয়ে, ত্রিশীর্ষ গুহার ভেতর দিয়ে, উত্তরের অঞ্চলে। কিন্তু অত্যন্ত অহংকারী বিদ্যাধররাজ দেবমায় সেই গুহার রক্ষক। তাকে না হারালে গুহার ভেতর দিয়ে কৈলাসের উত্তরে (চিনদেশ) যাওয়া যাবে না।

শাউড়ি ধনবতী সায় দিলেন মন্দরের হুঁশিয়ারিতে।

তাই, মন্দাকিনীর তীরে খাঁটি গেড়ে বসে দেবমায়কে আত্মসমর্পণের জন্যে দূত পাঠালেন নরবাহনদত্ত। যা রীতি। যুদ্ধের আগে সতর্ক করে দেওয়া।

কিন্তু দেবমায় গ্রাহ্য করল না হুঁশিয়ারি। বিনা যুদ্ধে সে ঢুকতে দেবে না ত্রিশীর্ষ গুহায়।

সুতরাং শুরু হল তুমুল যুদ্ধ।

কাতারে কাতারে সৈন্য মারা গেল বটে, কিন্তু মূল লড়াই যার সঙ্গে, সেই গোঁয়ার দেবমায়কে মারের চোটে অজ্ঞান করে দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললেন নরবাহনদত্ত।

বশ্যতা স্বীকার করল দেবমায়। শেষ হয়ে গেল যুদ্ধ।

ত্রিশীর্ষ গুহা সংবাদ

পরের দিন সকালে সভায় বসে নরবাহনদত্ত জানতে চাইলেন দেবমায়ের কাছে ত্রিশীর্ষ গুহার বিবরণ।

বুঝিয়ে দিল দেবমায়। অনেক আগে বিদ্যাধররা থাকত কৈলাসের উত্তরে আর দক্ষিণে। দুটো আলাদা রাজ্যে। দুই রাজ্যেরই রাজা ছিলেন একজনই। তাঁর নাম ঋষভদেব। তাঁকে রাজা করে দিয়েছিলেন স্বয়ং মহাদেব।

কিন্তু মূর্খ ঋষভদেব দক্ষিণ থেকে উত্তরে যেতেন কৈলাস টপকে, মহাদেবের মাথার ওপর দিয়ে। শিবঠাকুর রেগে টং হয়ে যান ফলে, স্বর্গ থেকে পতন ঘটে রাজ্যহারা ঋষভদেবের।

অনুতপ্ত ঋষভদেব শিবের তপস্যা করে তাঁর রোষানল প্রশমিত করেন। শিবের বরে দুটো রাজ্যই ফিরে পান।

কিন্তু ঠেকে শিখেছিলেন ঋষভদেব। বলেছিলেন সবিনয়ে, কিন্তু দুই রাজ্যে যাতায়াত করব কীভাবে? আকাশপথ তো নিষিদ্ধ।

তাই তো বটে! তাই তো বটে! বিদ্যাধর যে ব্যোমচারী। আকাশে বিচরণ করে। শিবঠাকুরের আর এক নামও ব্যোমকেশ। তাঁর মাথার ওপর দিয়ে বিচরণ... তা তো হয় না।

ফাঁপড়ে পড়ে দুদিক রক্ষে করলেন ব্যোমকেশ। মাথার ওপর দিয়ে যাওয়া চলবে না, পায়ের তলা তা দিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু পায়ের তলায় তো নিরেট পাথর। উনি তো বসে পাহাড়ের ডগায়।

শিবের অসাধ্য কিছুই নেই। তিনি গোটা কৈলাস ফুটো করে উত্তর থেকে দক্ষিণে যাতায়াতের একখানা পাতাল সুড়ঙ্গ বানিয়ে দিলেন।

বিরাট সেই গুহার নামই ত্রিশীর্ষ গুহা।

কৈলাসের বুক ফুঁড়ে সুড়ঙ্গ তো তৈরি হয়ে গেল, কিন্তু ফাঁপড়ে পড়লেন স্বয়ং কৈলাস। শিবের পায়ে আছড়ে পড়ে বললেন, মুশকিলে ফেললেন। কৈলাসের উত্তরে যাওয়ার ক্ষমতা এতদিন কারোর ছিল না। এখন তো হুড় হুড় করে লোক যাবে।

তাই তো বটে! টনক নড়ল শিবঠাকুরের। তিনি সুড়ঙ্গ পাহারার ভার দিলেন দিগগজ আর নাগদের ওপর। ফলে, ঐরাবত, পুণ্ডরীক ইত্যাদি দিগরক্ষক আটটা হাতি আর পাতাল সাপেরা পাহারা দিয়ে গেল গভীর গোপন প্রকাণ্ড সেই পাতাল পথকে। এ ছাড়াও, দক্ষিণে রাখলেন মহামায় আর উত্তরে কালরাত্রি চণ্ডীকে। কৈলাসকে নিশ্চিন্ত করলেন আরও একটা ব্যবস্থা দিয়ে। সৃষ্টি করলেন বেশ কিছু মহারত্ন; অর্থাৎ, মহাশক্তি। যে বা যারা এইসব মহারত্ন বা মহাশক্তি আয়ত্তে আনবে, তারাই পা দিতে পারবে ওই মহাসুড়ঙ্গে।

সবশেষ ব্যবস্থা রইল এই : মহাদেবকে যে তুষ্ট করতে পারবে, শুধু সে পাবে মহাসুড়ঙ্গে প্রবেশের অধিকার।

সব মিলিয়ে শিবঠাকুরের হাতেই রইল তাঁর পায়ের তলা দিয়ে যাওয়ারও অধিকার।

তিনি ব্যোমভোলা, কিন্তু অতি-বিচক্ষণ!

কিন্তু রাজ্যরক্ষার এত কবচ পাওয়ার পর অহংকারে ফেটে পড়েছিলেন ঋষভদেব। দেবতাদের সঙ্গে টক্কর দিতে গেছিলেন। খেপে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর মহাঅস্ত্র বজ্রত্যাগ করে খতম করে দিয়েছিলেন দর্পিত ঋষভদেবকে।

গুপ্ত সুড়ঙ্গ? মানব নির্মিত, না, প্রাকৃতিক? না, নিছক কল্পনা প্রসূত?

কাহিনি শেষ করে বললে দেবমায়, এই হল গিয়ে ত্রিশীর্ষ গুহার ইতিহাস। ভগবান সমান ব্যক্তি ছাড়া ওই গুহায় প্রবেশের ক্ষমতা কারোর নেই। বিশাল আর বিষম গুরুত্বপূর্ণ গুহাপথ সুরক্ষার আরও একটা বন্দোবস্ত করে রেখেছেন শিবঠাকুর। সুরক্ষা আর আরক্ষার গুরুদায়িত্ব দিয়েছিলেন মহামায়কে, যিনি আমার পূর্বপুরুষ। ফলে, এই সুড়ঙ্গের রক্ষক এখন আমি। আমি যখন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম, শোনা গেছিল একটা আকাশবাণী, এই দেবমায়কে যে জয় করতে পারবে, সে হবে বিদ্যাধরদের একচ্ছত্র সম্রাট। আপনি সব বিদ্যারত্ন লাভ করেছেন। আমাকেও জয় করেছেন। সুড়ঙ্গে প্রবেশের অধিকারও পেয়েছেন। বাকি শত্রুদের পদানত করুন সুড়ঙ্গের অপরদিকে গিয়ে।

তমসাবৃত ভয়ংকর নেই সুড়ঙ্গের মধ্যে তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করলেন না নরবাহনদত্ত। মহাপ্রলয়ের সময়ে যে তমসার আবির্ভাব ঘটে, শিব-রচিত কৈলাস-বিদীর্ণ সেই প্রলয়ংকর আঁধারে থমথম করছে গুহার মুখ।

ঢুকলেন পরের দিন প্রভাতে, ব্যোমযানে চেপে, সমুদয় বিদ্যারত্নে বলীয়ান হয়ে। সব আপদ, সব বিপদ, সব বিঘ্ন নিমেষে কাটিয়ে চলে এলেন সুড়ঙ্গের উত্তরের দিকে, কৈলাসের উত্তর অঞ্চলে।

আকাশবাণী শোনা গেল তৎক্ষণাৎ, সমস্ত বিদ্যারত্নে সিদ্ধিলাভ করেছ বলেই কেউ যা পারেনি, তুমি তা পারলে, ত্রিশীর্ষ গুহা পেরিয়ে এলে অক্ষত শরীরে। তুমি যথার্থই রাজচক্রবর্তী, বিদ্যাধরসম্রাট।

কিন্তু আর এক বিঘ্ন যে সামনেই উপস্থিত। কার নাম কালরাত্রি। অমৃত যখন উঠে আসে মন্থনের ফলে, দানবেরা এসেছিল তা লুঠে নিয়ে যেতে। বিষ্ণু সৃজন করেন কালরাত্রিকে দানবনিধনের জন্যে। তারপর, মহাদেবের আদেশে এই কালরাত্রিই গুহারক্ষক হয়ে রয়েছে।

কালরাত্রি কাহিনি শুনিয়ে গেল ধনবতী তার দেবমায়।

বললে, পুজো করুন, সন্তুষ্ট করুন, তবেই পথ ছাড়বে কালরাত্রি।

কিন্তু সেই মুহূর্তে পুজো করার সময় তো পেলেন না নরবাহনদত্ত। একে তো মহাসুড়ঙ্গ পেরিয়ে আসার ধকল, তার ওপরে অন্যান্য কাজ বাকি।

কাজেই সারাদিন গেল বিনা পুজোয়।

সন্ধ্যের আগেই টকটকে লাল হয়ে গেল কৈলাসের সানুদেশ। গোধূলির রক্তাভা যে এমন লোহিতাভা সৃষ্টি করতে পারে, এমন ধারণা কারোর ছিল না। তারপরেই বিলীন হল লোহিত বর্ণ। সে জায়গায় ঘনীভূত হল বিষম আঁধার। তাল তাল অন্ধকারে হুংকার-বিচরণে বেরিয়ে পড়ল অগুন্তি তাল-বেতাল পিশাচ আর ডাইনিরা। অলৌকিক শক্তির ধাক্কায় অচেতন হল নরবাহনদত্তের সমুদয় সৈন্য আর প্রিয়জন, পত্নীরাও।

সজ্ঞানে রইলেন শুধু তিনি।

বুঝলেন, কৈলাসভেদী সুড়ঙ্গ অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে কালরাত্রির উপাসনা না করার পরিণাম শুরু হয়েছে।

তৎক্ষণাৎ, সেই মুহূর্তে, বসে গেলেন কালরাত্রি আরাধনায়। কথা দিয়ে পুজোর ফুল গেঁথে গেলেন।

কথায় কিনা হয়। কথায় বসুন্ধরা জয় হয়। কথায় শুভ শক্তির বিকাশ ঘটে, অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটে। কথা সর্ববিঘ্নহর। কথা সর্বতমসানাশক। এবং প্রয়োজনে কথা প্রলয় সূচক।

নরবাহনদেবের বিদ্যাবতীর কথার প্রলয়প্রতিম প্রকল্প বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গেল বায়ুমণ্ডলে। বাতাসের রাজ্য বুঝি খান খান হয়ে গেল কথার প্রমাদগুণে।

মুগ্ধ হলেন ললাটলোচনা কালরাত্রি। স্তব্ধ হয়ে এল তাঁর নরকরোটি নৃত্য, তাথৈ তাথৈ এই নাচে তিনি হাতে ধরে থাকেন মানুষের মাথার খুলি।

তাথৈ তাথৈ এই নাচে তিনি হাতে ধরে থাকেন মানুষের মাথার খুলি।

কিন্তু ভয়াল নৃত্য যখন পুরোপুরি স্তব্ধ হল না, তখন নিজের মাথা নিজে কেটে বিভীষণা দেবীকে উপহার দিতে গেলেন নরবাহনদত্ত...

এইবার প্রীত হলেন দেবী কালরাত্রি।

বললেন প্রসন্ন স্বরে, ঢের হয়েছে, আর না। জ্ঞান ফিরে পাক সব্বাই। অগ্রসর হও, জয়যুক্ত হও।

তারা এতক্ষণ ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল মড়ার মতো, তার প্রত্যেকেই উঠে বসল নবীন শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে। শক্তির প্রসাদে হাসির তরঙ্গ প্রত্যেকের চোখে আর মুখে।

ভোরের আলোয় কালরাত্রিকে আর একবার যথাবিহিত পুজো করে নিয়ে মার-মার করে তেড়ে গেলেন নরবাহনদত্ত। মন্দরদেবের মুখ্য সহায়ক ধূমশিখকে যুদ্ধে পরাস্ত করে কষে বেঁধে আনলেন। বশ্যতা স্বীকার করিয়ে নিয়ে মুক্তিও দিলেন।

পরের দিন শুরু হল নরবাহনদত্ত বনাম মন্দরদেব যুদ্ধ। বুক কাঁপানো রক্ত ঝরানো সেই যুদ্ধে অক্ষত রইলেন শুধু নরবাহনদত্ত আর মন্দরদেব।

প্রথমে হয়ে গেল একপ্রস্থ মায়াযুদ্ধ।

মন্দরদেব পাগলা হাতি রূপে তেড়ে আসতেই নরবাহনদত্ত পশুরাজ সিংহরূপ ধারন করে হুহুংকারে ধেয়ে গিয়ে পলকের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন মত্ত মাতঙ্গকে।

এবার স্বরূপে খাঁড়া উঁচিয়ে তেড়ে এল মন্দরদেব।

নরবাহনদত্ত খড়্গ ছিনিয়ে নিলেন হাত থেকে।

শুরু হল হাতাহাতি লড়াই। নরবাহনদত্ত মন্দরদেবকে মাটিতে আছাড়ে ফেলে যেই তাঁর মুণ্ড কাটতে যাবেন....

দৌড়ে এল মন্দরদেবের বোন মন্দরদেবী, কুমারী মন্দরদেবী।

সবিনয়ে বললে নরবাহনদত্তকে, আপনি যখন তপস্যা নিরত ছিলেন, আপনাকে দেখেই স্বামী বলে মেনে নিয়েছি। সুতরাং আমার এই ভাই সম্পর্কে আপনার শালা। ওকে মারবেন না।

দয়ার অবতার নরবাহনদত্ত তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিলেন পাপিষ্ঠ মন্দরদেবকে। মেয়েছেলের কাকুতি মিনতিতে কিনা হয়। বিষেষ করে সেই কন্যা যখন ভাবী বধূ!

মন্দরদেবের বুকে লেগেছিল কিন্তু এহেন প্রাণদান! বোন বাঁচিয়ে দিল তাকে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

মনের দুঃখে চলে গেল বাবার কাছে, যিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন বনে।

অর্থাৎ, পরাজিত মন্দরদেব রাজ্য রক্ষা করতে না পেরে বনবাসী হল।

মন্দরদেবের অধীনস্থ বিদ্যাধর নৃপতিরা একযোগে বশ্যতা মেনে নিল নরবাহনদত্তের।

সাঙ্গ হল কৈলাসের উত্তর দিকের শত্রুজয়।

১১০. মহা অভিষেক

পরের দিন মন্দরদেবের প্রাসাদপুরী দখলে নিলেন নরবাহনদত্ত।

সভা জমিয়ে যখন বসেছেন, খবর এল মন্দরদেব বনবাসী হয়েছে বলে তার ধর্মপত্নীরা আগুনে-আত্মাহুতি দিতে চলেছে।

নরবাহনদত্ত তৎক্ষণাৎ তাদের আগুনে পুড়ে মরার ইচ্ছে থেকে নিরস্ত করলেন। আলাদা বাসভবনে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। তারা পরস্ত্রী, কিন্তু যেন নিজের বোন। ধন্য ধন্য রব উঠল চারিদিকে। কৈলাসের উত্তর আর দক্ষিণ অঞ্চল দখলে আনবার পর নরবাহনদত্তের ইচ্ছে হয়েছিল একদম উত্তরের মেরুঅঞ্চলও জয় করবেন, যে অঞ্চল চিরকাল অজেয়।

নারদ এসে নিরস্ত্র করলেন তাঁকে। বললেন, খুব ভুল হবে। কৈলাস পর্বতকে মাথায় তুলে ধরবে, এই গোঁ ধরেছিল রাবণ। সে হেরেছে সমস্ত যুদ্ধে। মহাদেব তোমাকে হিমালয়ের আধিপত্য দিয়েছেন, বিদ্যাধরলোকের সম্রাট তুমি, দেবলোকের আধিপত্য দেননি, সুমেরু যে দেবভূমি।

উপর্যুপরি রণজয়ের মদগর্বে স্ফীত নরবাহনদত্তের চৈতন্য হয়েছিল নারদমুনির তিরস্কারে।

নারদ তখন বলেছিলেন, যাও, বনে গিয়ে রাজর্ষি অকম্পনের সঙ্গে দেখা করো। মন্দরদেব রয়েছে সেখানে, বাবার কাছে।

কথা শুনেছিলেন নরবাহনদত্ত। রাজর্ষি অকম্পন নরবাহনদত্তকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, এই বনভূমিকে টপকে গেলে ঋষিদের শাপ পেতে। তারপর, নিজের মেয়ে মন্দরবতীকে দেখিয়ে বলেছিলেন, এই মেয়ে দৈববাণী শুনেছে, সে হবে রাজমহিষী। ও হতে চায় তোমার স্ত্রী। তুমি সম্মত হও।

সঙ্গে সঙ্গে বললে মন্দরবতী, কিন্তু শুধু আমাকে বিয়ে করলেই তো হবে না, আমার চার সখীকেও বিয়ে করতে হবে। আমরা পাঁচ সখী পণ যে করেছি, একই সঙ্গে বধূ হবো এই মহাপুরুষের।

অপর চার কন্যাদের পরিচয়?

কাঞ্চনদংষ্ট্রের মেয়ে কনকবতী, কালজিহ্বর মেয়ে কালবতী, দীর্ঘদংষ্ট্রের মেয়ে শ্রুতা, আর পোত্ররাজের মেয়ে অম্বরপ্রভা।

নিঃসন্দেহে পাঁচ কন্যাই প্রকৃত কামিনী, অর্থাৎ তীব্র কামযুক্তা রমণী।

নরবাহনদত্ত বিয়ে করলেন পাঁচজনকেই।

এরপর তাঁকে যেতে হল ঋষভাচল পাহাড়ে, অভিষেকের জন্যে। বিদ্যাধরদের সম্রাট যাঁরা হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই যেতে হয়েছে সেই পাহাড়ে।

গেলেন নরবাহনদত্ত। যাবার পথে কৈলাসে গেলেন। মহাদেব তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, আজ থেকে, এই মুহূর্ত থেকে তোমার সমস্ত বিদ্যা স্থায়ী হলে গেল।

পরের দিন সাড়ম্বরে সম্রাট পদে অভিষিক্ত হলেন নরবাহনদত্ত।

মূল প্রশ্নটা উঠল তখনই।

প্রধানা মহিষীর পদে বরণ করা হবে কাকে? সম্রাটের মহিষী তালিকা যে সুদীর্ঘ!

নরবাহনদত্ত বললেন, মদনমঞ্জুষাকে।

সমর্থনে দৈববাণী শোনা গেল তৎক্ষণাৎ, সঠিক সিদ্ধান্ত। মদনমঞ্জুষা এই জন্মে মানবী বটে, আগের জন্মে ছিল রতি, কামদেবের স্ত্রী, কামদেবই তো এই জন্মে নরবাহনদত্ত। মদনমঞ্জুষা মদনবেগের ঔরসে আর কলিঙ্গসেনার গর্ভে তো জন্মায়নি। দেবতারা অন্য গর্ভ রেখে গেছিলেন মদনবেগের পাশে। মদনমঞ্জুষা ছিল সেই গর্ভে।

কারও মনে আর কোনও কালিমা রইল না। জন্মান্তরিত কাম আর রতি, নরবাহনদত্ত আর মদনমঞ্জুষা পাশাপাশি বসলেন একই সিংহাসনে। বিপুল উৎসবে মেতে উঠল সমস্ত বিদ্যাধরলোক। সেই অভিষেক উৎসবে শুধু সুন্দরীরাই নৃত্য করেনি, পরমানন্দে নৃত্য করেছিল পাহাড় আর বনস্পতিরাও।

অভিষেক অন্তে পিতৃদেব বৎসরাজ আর জননী বাসবদত্তাকেও আনিয়ে নিলেন নরবাহনদত্ত।

শুরু হল পান উৎসব। মেয়েরাও বাদ গেল না। রাত্রি নিশীথে আঁখি ঢুলু ঢুলু সব বউদের ঘরে একইসঙ্গে হাজির হলেন নরবাহনদত্ত, একই রূপে, একই চেহারা নিয়ে কায়বিদ্যা প্রয়োগ করে।

স্বশরীরে সম্ভোগ করলেন শুধু মদনমঞ্জুসাকে।

তারপর একদিন বাবা আর মা-কে ফিরিয়ে দিতে হল স্বারাজ্য কৌশাম্বীতে, বিমানযোগে।

মানুষ হয়ে জন্মে দেবতা হয়ে হিমালয় তথা বিদ্যাধরলোক শাসন করে গেলেন অমিতবিক্রম এবং বহু বিদ্যার অধিকারী নরবাহনদত্ত।

১১২. বৎসরাজের দেহাবসান

ঋষভ পর্বতেই বহু বউ নিয়ে বিদ্যাধর সম্রাট থেকে গেলেন বেশ কিছুদিন।

তারপর এল বসন্তকাল। ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল পাহাড়। অলিগুঞ্জনে শোনা গেল যেন গানের কলি।

পাহাড় আর বনের বসন্তসজ্জা দেখে মন নেচে উঠেছিল নরবাহনদত্তের। বউ-বাহিনী আর পারিষদের নিয়ে চলে গেলেন স্বর্গের গঙ্গা মন্দাকিনীর তীরে এক মনোরম কাননে।

এইখানে বন্ধু-মন্ত্রী গোমুখ বললে একটা গল্প। বসন্তকালে স্বামী-স্ত্রী চায় কাছাকাছি থাকতে। এই সময়ের বিরহ অসহ্য, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। যেমন হয়েছিল শ্রাবস্তীতে। রাজপুত শূরসেনের বউ ছিল মালব দেশের মেয়ে সুষেণা। রাজার কাজে গ্রাম ছেড়ে দূরে যেতে হয়েছিল শূরসেনকে। সুষেণা পই পই করে বলেছিল বসন্তকালের আগেই ফিরে আসতে। কিন্তু কথা দিয়েও কথা রাখতে পারেনি শূরসেন। এসে গেল বসন্ত ঋতু। সেজেগুজে পথ চেয়ে থাকতে থাকতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছিল সুষেণার প্রাণহীন দেহ, আতীব্র বিরহ যন্ত্রণা বিফল করে দিয়েছিল তার হৃদয়ের কল। কামের আগুন যে বড়ো সর্বনাশা।

দেরি হয়ে গেছে বলেই দ্রুতগামী হাতিতে চেপে বাড়ি ফিরেছিল শূরসেন। ঘরে ঢুকেই দেখেছিল বিগতপ্রাণ সুষেণাকে।

বিষম শোকে তারও হৃদযন্ত্র স্তব্ধ হয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ।

দেবী চণ্ডিকা ছিলেন শূরসেনের কুলদেবী। তিনি দুজনেরই ধড়ে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

সময় বুঝে গল্প উগড়ে দিতে গোমুখের জুড়ি নেই। এখন সে নিছক যুবমন্ত্রী নয়, খোদ সম্রাটের মন্ত্রী। কিন্তু মুখ চুলবুল করে ওঠে গল্প বিতরণের সুযোগ পেলেই। পরিশেষে অবশ্যই থাকবে একটা নীতিকথা।

এই গল্পের সারবাক্য এই : বসন্তের বিরহ কালান্তক হয়ে যেতে পারে।

শুনে আনমনা হয়ে গেছিলেন নরবাহনদত্ত। এই রকমই হয়। অদূর ভবিষ্যতে শুভ বা অশুভ যদি কিছু প্রতীক্ষমান থাকে, মনতরঙ্গে তা ধাক্কা মেরে যায়। এরই নাম অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বোধ।

নরবাহনদত্তও স্বপ্ন দেখলেন সেই রাতে, ভোরের দিকে।

দেখলেন, একটা কালো মেয়েছেলে তাঁর বাবাকে ডান দিকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ঘুম ভেঙে গেল অশুভ আশঙ্কায়। আহ্বান করলেন প্রজ্ঞপ্তি বিদ্যাকে। অর্থাৎ, বিজ্ঞাপন বিদ্যাকে। যে বিদ্যার অজ্ঞান কিছুই থাকে না। মূর্তিময়ী বিজ্ঞাপন।

প্রজ্ঞপ্তি বললে, তোমার বাবা কোশাম্বীতে বসে উজ্জয়িনী থেকে আসা দূতের মুখে শুনেছেন, চণ্ডমহাসেন মারা গেছেন, তাঁর ধর্মপত্নী অঙ্গারবতীও দেহত্যাগ করেছেন। শ্বশুর আর শাশুড়ির মৃত্যুসংবাদ শুনেই অচেতন হয়ে পড়েন তোমার বাবা। কেঁদে ফেলেন তোমার মা, বাসবদত্তা। মন্ত্রীরা শোকের অপনোদন ঘটায় জ্ঞানবাক্য শুনিয়ে। সংসারে অমর তো কেউ নয়। একদিন যেতে হবে সবাইকেই। কিন্তু রয়েছে শ্যালক গোপাল, আর পুত্র নরবাহনদত্ত। সুতরাং, শোক কেন? রাজ্য-বিষয় তারা দেখবে। সেই ব্যবস্থা হোক। শুনে, তোমার বাবা বড়ো শ্যালক গোপালকে বললেন, উজ্জয়িনীতে গিয়ে রাজা হয়ে বসতে। গোপাল রাজি হল না। বললে, আমার ছোটো ভাই পালক রাজা হোক। সেনাপতিকে পাঠিয়ে পালককে রাজা করে দিলেন তোমার বাবা। নিজে কিন্তু সংসার ত্যাগ করবেন স্থির করলেন। তোমার মা বাসবদত্তা আর বিমাতা পদ্মাবতীও সঙ্গে যাবেন মনস্থ করলেন। তোমার মামা গোপালও সিংহাসন ছেড়ে তাই করতে চেয়েছিল। তোমার বাবার ধমকে বসল সিংহাসনে। তোমার বাবা তোমার দুই মা-কে নিয়ে উঁচু পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়ে মারা গেলেন। স্বর্গের বিমান এসে তাঁকে নিয়ে গেল এখুনি।

শুনে, জ্ঞান হারালেন নরবাহনদত্ত। জ্ঞান ফিরে পেয়ে বিদ্যাকে ফের শুধালেন, মামা গোপাল এখন কি করছে?

বিদ্যা বললে, উজ্জয়িনী থেকে তোমার ছোটমামা পালককে আনিয়ে কৌশাম্বী রাজ্যেরও রাজা করে দিয়ে বিবাগী হয়ে চলে গেছে অসিত পাহাড়ের কশ্যপ আশ্রমে।

শুনেই, বিমানে চেপে নরবাহনদত্ত গেলেন অসিত পাহাড়ে, বড়ো মামাকে দেখতে, বিদ্যাধর রাজাদের সঙ্গে নিয়ে।

মামার অনুরোধে রইলেন আশ্রমেই, কারণ তখন বর্ষা এসে গেছে।

১১৩ অঙ্গারবতী কাহিনি

অসিত পাহাড়ে একদিন বসে রয়েছেন নরবাহনদত্ত, সেনাপতি এসে বললে, আজ সন্ধ্যায় একজন দিব্যপুরুষ একজন মেয়েছেলেকে জোর করে টেনে উড়ে যাচ্ছিল আকাশ দিয়ে। তাকে ধরে বেঁধে ভালো করে তাকিয়ে দেখি, সে আপনারই শ্যালক, ইত্যক। যার মা কলিঙ্গসেনা, বাবা মদনবেগ। বিদ্যাধর যুবক মেয়েটির নাম সুরতমঞ্জরী, বিদ্যাধর অধিপতি মতঙ্গদেবের মেয়ে। মা অশোকমঞ্জরী নাকি কথা দিয়েছিলেন, ইত্যকের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন। কিন্তু বাবা মতঙ্গদেব মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন একজন মানুষের সঙ্গে। তাই বাগদত্তাকে নিজের ধর্মপত্নী হিসেবেই নিয়ে যাচ্ছে ইত্যক। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, আপনার ছোটোমামা পালকের ছেলে অবন্তীবর্ধনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। দুজনেই এখন কারাগারে।

... একজন দিব্যপুরুষ একজন মেয়েছেলেকে জোর করে টেনে উড়ে যাচ্ছিল আকাশ দিয়ে।

নরবাহনদত্ত গোপাল মামাকে জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু জানা আছে কিনা।

কিন্তু না, গোপাল মামার কিছু জানা নেই।

তখন উজ্জয়িনী থেকে আনা হল পালক মামাকে। আনা হল সুরুতমঞ্জরী, ইত্যক, মতঙ্গদেব, গোপালকে। পালকের সঙ্গে এল মন্ত্রী ভরতরোহ।

এই ভরতরোহই সবার আগে শুনিয়ে দিল উদকদান উৎসব কাহিনি।

রাজা পালকের বাবা রাজা চণ্ডমহাসেন একসময়ে দেবী চণ্ডীর আরাধনা করেছিলেন একটা খাসা খড়্গ আর একজন খাসা বউ পাওয়ার অভিপ্রায়ে।

দেবী তাকে খড়্গ দিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন, অঙ্গারক অসুরকে সংহার করে তার মেয়ে অঙ্গারবতীকে বিয়ে করে নিতে।

এই সময়ে উজ্জয়িনীর নগরপালেরা লোপাট হয়ে যাচ্ছিল রাতারাতি। অদৃশ্য একটা জীব এসে খেয়ে ফেলছিল।

চণ্ডমহাসেন নিজেই রাতের রক্ষী হয়ে নগর পর্যটন শুরু করলেন। এক রাতে দেখলেন, পরের বউকে নিয়ে পালাচ্ছে একটা ব্যভিচারী পুরুষ। খচাং করে তার মুণ্ড কেটে ফেলতেই হুলুম করে একটা রাক্ষস এসে মড়া নিয়ে পালাতে যেতেই চণ্ডমহাসেন তাকে পাকড়াও করলেন। উনি ভেবেছিলেন, এই রাক্ষসটাই রোজ রাতে আহার করে নগরপালদের। তাই তারও মাথা কাটতে গেলেন দেবী চণ্ডীর দেওয়া অমোঘ খড়্গ দিয়ে।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাক্ষস বলেছিল, মহারাজ, আমি না, আমি না। নগরপালদের খায় অঙ্গারক অসুর। সে থাকে পাতালে। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই ধরে নিয়ে গিয়ে তার মেয়ে অঙ্গারবতীর দাসী বানিয়ে রাখে।

অঙ্গারবতী! দেবী চণ্ডী তো এই নামের মেয়েকেই বিয়ে করতে বলেছেন! খাসা বউ শুধু সে!

সুতরাং সেই থেকে অঙ্গারক অসুরের অন্বেষণে রইলেন রাজা চণ্ডমহাসেন।

একদিন বনের মধ্যে দেখলেন অদ্ভূত ভীষণ একটা বুনো শুয়োর।

কাজল কালো পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড আকৃতি। নিশ্চয় মায়াবী অঙ্গারক। তিরবিদ্ধ করলেন তৎক্ষণাৎ।

চোঁ-চোঁ দৌড় দিল তীরবিদ্ধ শুয়োর। ঢুকে গেল একটা সুড়ঙ্গে। রাজাও ঠুকলেন। পাতাল প্রদেশে পৌঁছে দেখলেন একটা ভারি সুন্দর অট্টালিকা। সামনে মস্ত সরোবর।

কিন্তু বিরাটাকায় সেই শুয়োরটা গেল কোথায়?

দীঘির দিকে শ'খানেক দাসী নিয়ে এক পরমাসুন্দরীকে আসতে দেখে তাকেই জিজ্ঞেস করলেন, গেল কোথায় বিকটদর্শন বিরাটকায় কালো বরাহ?

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল পরমাসুন্দরী। বললে, যার কথা বলেছেন, সে যে আমারই বাবা, অসুর অঙ্গারক। এখন সে শুয়োর মূর্তি ছেড়ে ঘুমোচ্ছে। ঘুম ভাঙলেই খাবে আপনাকে।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, সুন্দরী, তোমার নাম কি অঙ্গারবতী?

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

আমাকে পছন্দ?''

খু-উ-উ-ব।

তাহলে একটা কাজ করো। তোমার বাবার ঘুম ভাঙলেই তার পাশে বসে চোখের জলে গা ভাসিয়ে দাও। বাবা বিচলিত হয়ে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করবে। তুমি তখন বলবে, তোমাকে বেকাদায় পেয়ে কেউ যদি খতম করে দেয়, তাহলে আমার কী হবে? বাবা কী বলে, সেই কথাটা আমাকে বলবে। সুন্দরী অঙ্গারবতী, তাতে তোমার মঙ্গল, আমারও মঙ্গল।

রাজাকে দেখেই মজেছিল অঙ্গারবতী। ভালোবাসার পুরুষকে পাওয়ার জন্যে কামতপ্তা রমণীরা সব করতে পারে।

সুতরাং, তৎক্ষণাৎ গিয়ে বসে রইল ঘুমন্ত বাবার পাশে। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দিয়েছিল অঝোরধারে কান্না।

ব্যস্ত হয়ে শুধিয়েছিল অঙ্গারক, হল কী? হল কী? এত কান্না কীসের?

ফোঁপাতে ফোঁপাতে কন্যা বলেছিল, যদি কেউ তোমাকে মেরে ফেলে, আমার কী হবে?

হেসেই খুন অঙ্গারক। একেই বলে আসুরিক অট্টহাসি। পাতাল কাঁপিয়ে একচোট হেসে নিয়ে বলেছিল, আরে পাগলি, আমাকে মারা এত সোজা নয়। আমার গোটা শরীরটা আকাশের বাজের মতো শক্ত। অস্ত্র যতই ধারাল হোক, শুধু একটু খুঁচিয়ে যাবে শরীরে ঢুকবে না। তারপরেই গাল নামিয়ে ঢোক গিলে বলেছিল, শুধু একটা জায়গা ছাড়া।

কোন জায়গাটা বাবা? বড়ো বড়ো চোখে জিজ্ঞেস করেছিল আদরিনী কন্যা।

মেয়ের কাছে কিছুই তো গোপন রাখা যায় না। অঙ্গারক বিশ্বাস করেছিল মেয়েকে। বলেছিল, আমার বাঁ বগল খুবই নরম। কিন্তু ঢেকে রাখি ধনুক-বর্ম দিয়ে।

হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল অঙ্গারবতী। বাপ স্নান করতে যেতেই সব বলেছিল রাজা চণ্ডমহাসেনকে। তক্কে তক্কে রইলেন রাজা। অঙ্গারক স্নান সেরে পুজোর আসনে খালি গায়ে বসতেই তেড়ে এলেন অস্ত্র বাগিয়ে। রাজার যুদ্ধং দেহি অবস্থান দেখে বাঁ হাত তুলে ইঙ্গিতে সবুর করতে বলেছিল অঙ্গারক।

অনাবৃত করে ফেলেছিল বাম বগল।

এই সুযোগের প্রতীক্ষাতেই ছিলেন রাজা। তৎক্ষণাৎ তির নিক্ষেপ করলেন বাম বগলে।

তির ঢুকে গেল সটান হৃৎপিণ্ডে। পড়ে গিয়ে বিষম যন্ত্রণায় শুধু একটা অভিশাপ দিতে পেরেছিল অঙ্গারক, আমি তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মারা যাচ্ছি। প্রতিবছর আমার এই মৃত্যু দিবসে আমাকে তৃষ্ণার জল না দিলে পাঁচজন মন্ত্রী মারা যাবে।

অক্কা পেল অঙ্গারক। অঙ্গারবতী হল চণ্ডিমহাসেনের বধূ। প্রতিবছর শ্বশুরের অক্কা দিবসে জলদানের আয়োজন করলেন তাঁর ঘাতক জামাই। সেই জলদান উৎসবই উদক-উৎসব নামে ছড়িয়ে পড়েছে।

এক কাহিনি থেকে আর এক কাহিনিতে চলে এল পালকমন্ত্রী ভরতরোহ। এই কাহিনি সুরতমঞ্জরীকে নিয়ে, যাকে বিয়ে করেছে অবন্তীবর্ধন বাবা পালকের কথায়, কিন্তু যার সঙ্গে ইত্যকের বিয়ে ঠিক হয়েছিল কন্যার মায়ের মুখের কথায়।

উদক উৎসব চলছিল শহরময়। আনন্দে দিশেহারা নাগরিকদের প্রাণ উড়ে গেছিল একটা হাতি খেপে উঠে তেড়ে আসায়। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে পায়ে পিষে মেরে ফেলেছিল অনেককে। ঝড়ের বেগে ধেয়ে গিয়ে ঢুকে পড়েছিল চণ্ডাল পাড়ায়।

হট্টগোল শুনে ঠিক সেই সময়ে বাইরে এসেছিল চণ্ডালদের একটি মেয়ে। অত্যন্ত রূপসী মেয়ে।

পাগলা হাতি তার দিকেই ধেয়ে এসেছিল শুঁড় নামিয়ে। তিলমাত্র ভয় না পেয়ে শুঁড়ে এক চড় মেরেছিল রূপসী, চোখ পাকিয়ে তাকিয়েছিল হাতির দিকে।

নরম হাতের ছোঁয়ায় আর গরম চোখের কটাক্ষ বাণে নিমেষে মোহিত হয়েছিল হাতি। এক পা-ও আর এগোতে পারেনি। বশ মেনেছিল।

রূপসী চণ্ডালিনী তখন কাঁধের ওড়নার দুইপ্রান্ত হাতির দুই দাঁতে বেঁধে দোলনা বানিয়েছিল, সেই দোলনায় চেপে দোল খেয়ে গেছিল খিলখিল করে হাসতে হাসতে।

ঘেমে গেছিল এত কাণ্ড করে। দাঁতালো পাগলা হাতিকে কামশরে মজিয়ে দেওয়া কী চাট্টিখানি কথা?

স্বেদনিষিক্ত রূপসীর রূপ আরও মোহিত করেছিল একটু আগেকার মত্ত মাতঙ্গকে। শুঁড়ে জড়িয়ে আলতো করে কন্যাকে তুলে নিয়ে গেছিল মস্ত একটা গাছের তলায়। কুলো-কান নেড়ে বাতাস দিয়ে গেছিল চণ্ডালিনীকে।

দেখেশুনে হতবাক হয়ে গেছিল নাগরিকরা। দেবকন্যা নিশ্চয়। নইলে নরম হাতের ছোঁয়া, কৃত্রিম কোপ আর নয়ন বাণ দিয়ে কি পশুজয় করা যায়?

ঠিক এই সময়ে মজা দেখতে এসেছিল রাজকুমার অবন্তীবর্ধন। দেখেছিল রূপসী ললনাকে। প্রেমে পড়েছিল তৎক্ষণাৎ। চণ্ডালকন্যার অবস্থাও দাঁড়িয়েছিল তথৈবচ।

ওড়নার দোলনা থেকে নেমে কন্যা যখন নতমুখে আড়ে আড়ে দেখছে রাজপুত্রকে, মাহুত এসে বশে আনল হাতিকে। মদনাহত রাজপুত্রও বারে বারে মনের মতো মেয়েকে দেখতে দেখতে ফিরে গেল রাজবাড়িতে।

বন্ধুদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানল কন্যার পরিচয়। উৎপলহস্ত নামক চণ্ডালের মেয়ে, সুরতমঞ্জুরী। যেন পটে আঁকা রূপবতী। কিন্তু পটের রূপসী যেমন শুধু ছবি, পুরুষের ভোগে লাগে না, স্রেফ কামনা জাগিয়ে যায়, এই কন্যাও তেমনি পুরুষদের কামোদ্রেক ঘটায়, নিবৃত্তি ঘটায় না।

অবন্তীবর্ধন তখন মরেছে, বলেছিল, আমার তো মনে হল, এ মেয়ে চণ্ডালদের মেয়ে নয়, নিশ্চয় দেবগণের দেবকন্যা। চণ্ডালদের মেয়ে কি এত রূপবতী, এমন গুণবতী হয়? এ যে অলৌকিক ক্ষমতা! পাগলা খুনে হাতিকে কি মানুষ শুধু চেয়ে আর ছুঁয়ে বশ করতে পারে? একেই বিয়ে করবো, নইলে প্রেমানলে জলে মরব।

রাজা পালক আর তাঁর রানি অবন্তীবতী ছেলের কাহিল অবস্থা দেখে চিন্তায় পড়লেন। চণ্ডালের মেয়েকে বিয়ে করতে চায় রাজার ছেলে? তাহলে নিশ্চয় চণ্ডাল-কন্যা হয়ে জন্মালেও মেয়েটার ভেতরে দৈবি সত্তা আছে।

রানিকে একটা গল্প শুনিয়েছিলেন রাজা।

কুরঙ্গী কাহিনি

এ গল্প অগ্নিদেবের ঔরসজাত একটি ছেলের গল্প। সে মানুষ হয়েছিল চণ্ডালের ঘরে; ভালোবেসেছিল রাজার মেয়েকে।

এইভাবে :

প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা প্রসেনজিতের একটি মেয়ে 'অপরূপা'। নাম কুরঙ্গী।

যৌবনবতী কুরঙ্গী একদিন যখন বাগানে টহল দিচ্ছে, একটা দাঁতালো বুনো হাতি এসে তাকে দাঁতের ওপর তুলে নিয়ে যখন চম্পট দিচ্ছিল; দৌড়ে আসে এক চণ্ডাল তনয়। অস্ত্রাঘাতে হাতির শুঁড় কেটে দিয়ে রক্ষে করে মেয়েটিকে। সেই মেয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে পণ করে, বিয়ে করবে জীবনরক্ষক এই চণ্ডাল তনয়কেই। নইলে, আত্মহত্যা করবে।

একই অবস্থা দাঁড়িয়ে ছিল চণ্ডালের ছেলেটারও। বিয়ে করতে চায় রাজার মেয়েকে। কিন্তু তা কী করে সম্ভব? তাহলে আত্মহত্যাই করা যাক।

রাতে আগুন জ্বেলে যেই পুড়ে মরতে যাবে, আগুনের দেবতা দেখা দিলেন। বললেন, ও ছেলে, তুমি চণ্ডালের ছেলে নও, আমার ছেলে। এই শহরের কপিত্থশর্মা ব্রাহ্মণকে তো চেনো? সে আমার উপাসক। আমি তার ঘরে থাকি। অদৃশ্যভাবে তার সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করি শরীর গ্রহণ করে। আমার ঔরসে তোমার জন্ম হয়। জারজ ছেলে ভেবে কপিত্থশর্মা তেমাকে রাস্তায় ফেলে দিলে এক চণ্ডাল তোমাকে মানুষ করে। সুতরাং, ওই রাজকন্যাই তোমার বউ হবে।"

তাই হয়েছিল। সব ঘটনা শুনে রাজা জামাই করে নিয়েছিলেন ছেলেটাকে।

চমকপ্রদ চণ্ডালপুত্র কাহিনি শুনে রানি শুনিয়ে দিল এক জেলের ছেলের কাহিনি।

জেলের ছেলের কাহিনি

রাজগৃহের মলয়সিংহ রাজার পরমাসুন্দরী মেয়ে মায়াবতী একদিন কাননবিহার করছিল। তখন তাকে দেখেছিল এক জেলের ছেলে। তার নাম সুপ্রহার। রূপের আগুন কামের আগুন জ্বেলে দিয়েছিল তার অণুপরমাণুতে। বাড়ি গিয়ে শয্যাগ্রহণ করেছিল। খাওয়াদাওয়া বন্ধ, এমনকি মাছধরাও, জেলেদের যা কাজ।

মলয়সিংহের মা জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে ছেলের পেট থেকে বের করেছিল আসল ব্যাপারটা।

বলেছিল, দাঁড়া, বিহিত করছি।

বলে পরের দিন একধামা ভালো ভালো মাছ উপহার দিয়েছিল রাজকন্যা মায়াবতীকে। তারপর থেকে রোজই এক ধামা মাছ উপহার দিয়ে আসত ছেলের মনের মানুষকে।

একদিন রাজকন্যা জিজ্ঞেস করেছিল, রোজ এত মাছ দিচ্ছ কেন?

জেলেনি খুলে বলেছিল মূল উদ্দেশ্য। রূপ দেখে ছেলে মরেছে। শয্যা নিয়েছে। না খেয়েই মরবে। এখন যদি রাজকন্যা সুখস্পর্শ দেয়, ছেলে প্রাণে বাঁচবে।

রাজকন্যা বললে, নিশ্চয় দেব। নিশুতি রাতে তাকে আনো আমার কাছে।

গভীর রাতে রাজঅন্তঃপুরে ছেলেকে পৌঁছে দিল জেলেনি। রাজকন্যা তাকে খাটে বসিয়ে আদর সোহাগ করতেই কামতাপ ছেলের জুড়িয়ে গেল। ছেলে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাজকন্যা গেল অন্য ঘরে, নিজে ঘুমোতে।

ঠিক এই সময়ে ঘুম ভেঙে গেল জেলের ছেলের। একা খাটে শুয়ে, রাজকন্যা নেই পাশে। ভাবল, জেলের ছেলে বলেই রাজকন্যা চলে গেছে ঘেন্নায়। যা গন্ধ গায়ে।

মনের দুঃখে মারা গেল তৎক্ষণাৎ।

ভোর হল রাজকন্যা এসে দেখল, মরে কাঠ হয়ে পড়ে রয়েছে ধীবরপুত্র।

নিদারুণ কষ্টে সহমরণের জন্যে প্রস্তুত হল রাজকন্যা। খবর গেল রাজার কানে। রাজা বসলেন শিবের ধ্যানে। শিবঠাকুর দেখা দিলেন। বললেন, তোমার মেয়ে আগের জন্মে ছিল এই জন্মের এই জেলের ছেলের বউ। বাবা মারা গেলে জ্ঞাতিরা সব কেড়ে নিয়েছিল। তখন সে ছিল ব্রাহ্মণপুত্র। গঙ্গার তীরে গিয়ে দেখেছিল

জেলেরা মাছ খাচ্ছে মনের আনন্দে। ওই মাছ খাওয়া দেখতে দেখতেই পেটের খিদে নিয়ে মারা গেছিল বলে এ জন্মে জেলের ছেলে হয়ে জন্মেছে। না খেয়েই মরেছিল তার বউ। সেই পুণ্যে এ জন্মে সে রাজকন্যা, আর মৎস্যক্ষুধা নিয়ে মৃত্যু বলে এ জন্মে তার স্বামী জেলের ছেলে। যাই হোক, তোমার মেয়ে নিজের পরমায়ুর অর্ধেক দান করলেই জেলের ছেলে বেঁচে উঠবে। তখন তাকে জামাই করে নিও।

তাই হয়েছিল। জেলের ছেলে মরে গিয়েও বেঁচে উঠে হয়েছিল রাজার জামাই।

পূর্বজন্ম নিয়ে আর একটা চমকপ্রদ কাহিনি বলে গেছিল রানি, এক চোরকে নিয়ে।

চোরের কাহিনি

অযোধ্যার রাজা বীরবাহুর আমলে চোরের উপদ্রব বেড়েছিল। চুরি হচ্ছিল রোজ রাতে।

রাজা নিজেই বোরোলেন চোর ধরতে। দেখলেন, একটা বাড়ির উঁচু পাঁচিলে বসে পা দোলাচ্ছে একটা লোক। নিশ্চয় চোর। নইলে নিশুতি রাতে পাঁচিলে উঠে বসে থাকবে কেন? রাজাকে দেখেই ভালোমানুষ সেজে পা দোলাচ্ছে।

কাছে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কে হে তুমি?

রাজার কোমরে কোষবদ্ধ তরবারি দেখেই সতর্ক হয়েছিল চোর। কাঁচুমাচু মুখে বললে, আমি এক চোর। অনেক ধনদৌলত আছে আমার বাড়িতে। চলো, তোমাকে দেব।

অর্থাৎ, ঘুষ দেবে চোর। রাজাকে ভেবেছে নৈশপ্রহরী।

আত্মপরিচয় না দিয়ে রাজা গেলেন চোরের সঙ্গে। ঢুকলেন গভীর জঙ্গলে। গুপ্ত সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে পৌঁছোলেন এক পাতাল পুরীতে। সেখানে ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে, দাসীরা এদিক ওদিক যাচ্ছে, মণিমাণিক্যে চারদিক ঝলমল করছে।

রাজার চোখ ঝলসে গেল চোরাই সম্পত্তি দেখে।

চোর গেল ভেতর বাড়িতে, রাজাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে।

পা টিপে টিপে কাছে এল এক পরিচারিকা। বললে চাপা গলায়, এখুনি পালান। অস্ত্র আনতে গেছেচোর।

রাজা সরে পড়লেন। সৈন্যসামন্ত নিয়ে ফিরলেন। পাতালপুরী ঘেরাও করলেন। চোরকে বেঁধে আনলেন।

সক্কালবেলা ডঙ্কা বাজিয়ে চোরকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বধ্যভূমিতে, এক সওদাগর কন্যা তাকে দেখে প্রেম কন্টকিত হয়ে বাবাকে বললে, চোরকে বিয়ে করব, নইলে মরব।

সওদাগর রাজাকে কোটি টাকা দিয়ে চোরকে ছাড়িয়ে আনতে গেল। রাজা গেলেন চটে। সওদাগরকে হাঁকিয়ে দিয়ে চোরকে শূলে চাপিয়ে দিলেন।

সওদাগরের মেয়ে এসে নিস্প্রাণ চোরকে জড়িয়ে ধরে, জ্বলন্ত চিতায় প্রাণবিসর্জন দিল।

কাহিনি শেষ করে রানি অবন্তীদেবী বললে রাজা পালককে, পূর্বজন্মের কর্ম ফলেই সওদাগরের মেয়ে সামান্য চোরকে ঝলকদর্শনেই ভালোবেসে প্রাণ দিল আগুনে। এ থেকেই মনে হয়, সুরতমঞ্জরী নিশ্চয় আগের জন্মে আমাদের ছেলে অবন্তীবর্ধনের বউ ছিল। নইলে, চণ্ডালের মেয়েকে একবার দেখেই এত মজে যাবে কেন রাজার ছেলে।

মতঙ্গদেবের কাহিনি

চণ্ডালের মেয়ে সুরতমঞ্জরীর বাবা উৎপল হস্তের কাছে পরের দিন ঘটক পাঠালেন রাজা পালক।

বিয়ের প্রস্তাবে মত দিল উৎপল হস্ত। একটা শর্তে, তার বাড়িতেই আঠারো হাজার ব্রাহ্মণকে খাওয়াতে হবে। কন্যাদান করবে তার পরে।

এরকম অদ্ভুত শর্ত কেন? নিশ্চয় কোনও কারণ আছে। ভেবেচিন্তে উজ্জয়িনীর ব্রাহ্মণদের ডেকে রাজা পালক বললেন ব্যাপারটা।

রাজি হল না ব্রাহ্মণেরা। চণ্ডালের খাবার কি খাওয়া যায়? ভয়ের চোটে সব্বাই একযোগে বসে গেল মহাদেবের পুজোয়।

ভগবান মহাদেব এলেন তাদের স্বপ্নে। বললেন, চণ্ডালের বাড়িতে স্বচ্ছন্দে খেতে পারো, কারণ, আগের জন্মে ওই চণ্ডাল ছিল বিদ্যাধর।

পরের দিন ব্রাহ্মণেরা বললেন রাজাকে, চণ্ডাল উৎপল হস্ত চণ্ডাল পাড়ায় রান্নাবান্না না করে অন্য জায়গায় গিয়ে রাঁধুক, তাহলেই আমরা খাবো। সেই রান্না যেন চণ্ডালেরা না রাঁধে, বামুন পাচকরা রাঁধুক।

রাজা পালক অকাতরে অর্থব্যয় করে বিরাট একটা পাকশালা বানিয়ে ব্রাহ্মণ পাচকদের দিয়ে এলাহি খাবার রান্না করালেন, তৃপ্তি করে খেয়ে গেল আঠারো হাজার ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণভোজন শেষ হওয়ার পর চণ্ডাল অধিপতি উৎপল হস্ত বললে রাজা পালককে, শুনুন তাহলে, আমি আসলে বিদ্যাধর। আমার অধিপতি হলেন বিদ্যাধর রাজ গৌরীমুণ্ড। আমার নাম মতঙ্গদেব। আমার এই মেয়ে সুরতমঞ্জীরীর জন্মের পর নরবাহনদত্তের সঙ্গে লড়তে আসছিলাম, যাতে তিনি বিদ্যাধর সম্রাট না হতে পারেন। আসছিলাম বিমানে চেপে। পথে দেখলাম মহাদেবকে। রেগে শাপ দিলেন, উজ্জয়িনীতে গিয়ে সপরিবারে চণ্ডাল হয়ে জন্মা। মহানুভব নরবাহনদত্তের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছিস? এই তোর সাজা। আমার কাকুতি মিনতি শুনে রাগ পড়ে গেল মহেশ্বরের। বললেন, ঠিক আছে, আঠারো হাজার ব্রাহ্মণকে যেদিন খাইয়ে খুশি করবি, সেইদিন এই শাপের প্রভাব কেটে যাবে। যিনি আয়োজন করবেন আঠারো হাজার ব্রাহ্মণ ভোজনের, তার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিবি। মহাদেব চলে গেলেন। আমিও মেয়ে আর বউকে নিয়ে চণ্ডাল পাড়ায় নামতে বাধ্য হলাম, কিন্তু চণ্ডালদের মধ্যে মিশে রইলাম না। নীচু জাতের ছোঁয়ায় অস্পৃশ্য হইনি। আজ আমার শাপ কেটে গেল, মেয়ে দিলাম আপনাকে। আমি চললাম নরবাহনদত্তের সেবায়, সস্ত্রীক।

বিয়ে হয়ে গেল সুরতমঞ্জরীর সঙ্গে অবন্তীবর্ধনের।

এরপর পালকের বউমা গায়েব হয়ে গেল এক রাতে ছাদ থেকে। ছেলে তাকে নিয়ে শুয়েছিল ছাদে। খোঁজ খাঁজ হচ্ছে যখন, নরবাহনদত্তের নগরপাল গিয়ে ধরে নিয়ে এল সবাইকে। সুরতমঞ্জরীর বাবাও এল। এখন হোক বিচার পর্ব। সুরতমঞ্জরী কার যথার্থ বউ? অবন্তীবর্ধনের না, ইত্যকের?

সব শুনে নরবাহনদত্ত শুধোলেন মতঙ্গদেবকে, আপনি কাকে কন্যাদান করেছেন? মতঙ্গদেবের জবাব, অবন্তীবর্ধনকে।

ইত্যক, তুমি আমার সম্বন্ধী। সুরতমঞ্জরীকে তুলে নিয়ে গেলে কেন?

ইত্যক বললে, অনেক আগে সুরতমঞ্জরীর মা কথা দিয়েছিল, ওর বিয়ে দেবে আমার সঙ্গে।

নরবাহনদত্ত বললেন, বাবা থাকতে মায়ের কন্যাদানের অধিকার থাকে না। বিশেষ করে, মা যখন কথা দিয়েছিল, সেখানে কোনও সাক্ষী ছিল না। ইত্যক, সুরতমঞ্জরী তোমার কাছে পরের বউ। পরস্ত্রী অপহরণের শাস্তি তোমাকে দেব।

হইহই পড়ে গেল। সম্রাট নরবাহনদত্ত সুবিচার করেছেন ঠিকই কিন্তু...

নামী নামী মুনিরা জড়ো হয়ে বললেন, ইত্যক তো আপনার শালা, তার ওপর এই তার প্রথম অপরাধ। সুতরাং ক্ষমা করে দিন।

সুবাক্য শুনলেন সুস্থির নরবাহনদত্ত। ইত্যককে বকে দিয়ে মামাতো ভাই অবন্তীবর্ধনের সঙ্গে সুরতমঞ্জরীকে পাঠিয়ে দিলেন মামার বাড়িতে, আকাশপথে।

একেই বলে সুবিচার। ন্যায়দণ্ডের একদিকে শ্যালক, আর একদিকে মামাতো ভাই। গণ্ডগোল এক সুন্দরীকে নিয়ে।

সব শুনে ন্যায়নীতি বজায় রেখে গেলেন সুবিচারক নরবাহনদত্ত। শালা বলে আস্কারা দিলেন না।

১১৪. তারাবলোক কাহিনি

মুনিদের মধ্যে ছিলেন কশ্যপ। বিচারপর্ব শেষ হওয়ার পর বললেন নরবাহনদত্তকে, আপনি বিদ্যাধর সম্রাট হিসেবে যে রকম সুবিচার দেখালেন, এর আগে একমাত্র তারাবলোক সম্রাট এরকম নজিরবিহীন বিচারবুদ্ধি দেখিয়ে গেছেন। তিনিও মানুষ থেকে বিদ্যাধর হয়েছিলেন, তার আগের পাঁচ সম্রাট ছিলেন ঋষভ, সর্বদমন,

বন্ধুজীবক, জীমূতবাহন আর বিশ্বান্তর এক-এককম দোষে দুষ্ট ছিলেন। শোনাই তাহলে তারাবলোক উপাখ্যান।

শিবিদেশের রাজা চন্দ্রাবলোক-এর পাটরানি ছিলেন চন্দ্রলেখা। রাজার ছিল একটা মহাপরাক্রম প্রকাণ্ড হাতি। তার নাম কুবলয়াপীড়। এই হাতির ভয়ে কোনও শত্রু রাজাকে ঘাঁটাতে চাইত না।

বেশি বয়েসে রাজার এক ছেলে হয়। তার নাম রাখা হয় তারাবলোক।

অতিশয় বুদ্ধিমান সেই ছেলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলার সব শাস্ত্র শিখে নিলেন বটে, কিন্তু শিখলে না শুধু 'ন' বর্ণ। কেউ কিছু চাইলে, 'না' বলতে পারতেন না।

যথাসময়ে তারাবলোকের বিয়ে দেওয়া হল মদ্ররাজকন্যা মাদ্রীর সঙ্গে। যুবরাজ করে দেওয়া হলো।

দানধ্যান ভালো করেই শুরু করে দিলেন তারাবলোক। ঢালাও ভাত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করলেন সব জায়গায়। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই কুবলয়াপীড় হাতির পিঠে চেপে দেখতে যেতেন ভাত খাওয়ানো ঠিকমতো হচ্ছে কিনা।

যমজ ছেলে হল তারাবলোকের। তাদের নাম রাখা হল রাম আর লক্ষণ।

তারাবলোকের নামযশ ছড়িয়ে পড়তেই ঈর্ষায় বুক টনটনিয়ে উঠেছিল জ্ঞাতিশত্রুদের। তারা তাদের খোশামুদে ব্রাহ্মণদের ডেকে বললে, যাও, যাও, তারাবলোক তো মস্ত দানবীর, তার কাছে গিয়ে কুবলয়াপীড় হাতিটাকে চাও। দিয়ে দেবে। সে কাউকে ফেরায় না। 'না' বলতে পারে না। কুবলয়াপীড় যদি বাছাধনের হাতছাড়া হয়, যুদ্ধ লাগিয়ে হারিয়ে দেব।

ব্রাহ্মণেরা দল বেঁধে গিয়ে বললে দানবীর তারাবলোককে, কুরাবলোককে দান করুন।

তারাবলোক নির্বোধ ছিলেন না। চকিতে বুঝে নিলেন, এত জিনিস থাকতে কেন একটা বিশেষ হাতিকে চাওয়া হচ্ছে। যুদ্ধে হারাতে চায় শত্রুরা। কিন্তু না দিয়ে তো তিনি পারবেন না! 'না' বলতে যে পারেন না!

হাতি দান করেছিলেন তারাবলোক।

প্রজারা গেল খেপে। তারা দল বেঁধে তারাবলোকের বাবা রাজা চন্দ্রাবলোকের সামনে গিয়ে বললে, আপনার ছেলে সমস্ত দান করে যখন সন্ন্যাসীই হতে চায়, তখন তাকে বনে পাঠিয়ে দিন। রাজ্যের লক্ষ্মী কুবলয়াপীড় হাতিকে ফিরিয়ে আনুন। নইলে আমরা অন্য রাজাকে সিংহাসনে বসাব।

এ যে প্রজাবিদ্রোহ!

ছেলের কাছে লোক পাঠালেন রাজা, হাতি ফিরিয়ে আনা হোক।

ছেলে বলে পাঠাল, যা দিয়েছি, তা আর ফিরিয়ে নেব না। চললাম বনে।

দুই ছেলে আর বউকে নিয়ে একবস্ত্রে বনে চলে গেলেন তারাবলোক। যাচ্ছিলেন রথে চেপে, শত্রুরা তাও কেড়ে নিল। হেঁটে বনগমন করলেন দানবীর যুবরাজ। গাছতলায় শুয়ে, গাছের ফল খেয়ে দিব্বি রইলেন। নির্বিকার।

একদিন ফলমূল খুঁজতে বনের ভেতরে গেছিল মাদ্রী। যমজ দুই ছেলে মাটির খেলনা নিয়ে খেলছিল বাবার সামনে। একজন বুড়ো বামুন এসে ভিক্ষে চাইল ছেলে দুটোকেই। দিয়ে দিলেন তারাবলোক। অনিচ্ছুক দুই পুত্রকে লতা দিয়ে বেঁধে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল ব্রাহ্মণ।

নির্বিকার হয়ে বসে রইলেন তারাবলোক।

নির্বিকার হয়ে রইল মাদ্রীও ফিরে এসে যখন শুনল, দান করা হয়ে গেছে দুই ছেলেকে।

টলে গেল দেবরাজ ইন্দ্রের আসন। দানের ধাক্কায় জগৎ যে কাঁপছে!

বুড়ো বামুনের ছদ্মবেশে নেমে এলেন তারাবলোকের সামনে। ভিক্ষে চাইলেন স্বয়ং মাদ্রীকে।

নির্দ্বিধায় দিতে যখন যাচ্ছেন তারাবলোক হাতে জল নিয়ে, স্বরূপ ধারণ করলেন ইন্দ্র।

বললেন, তোমার শেষ পরীক্ষা নিলাম। মাদ্রীকে চাই না। শিগগিরই সম্রাট হয়ে যাবে বিদ্যাধরদের, দান করার পুণ্যে।

অন্তর্হিত হলেন ইন্দ্র।

ছেলে দুটোকে নিয়ে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পথ হারিয়ে পৌঁছেছিল চন্দ্রাবলোকের রাজ্যে। বিক্রি করতে গেছিল দুই ছেলেকে। চিনে ফেলেছিল নাগরিকরা। তিনজনকেই নিয়ে গেছিল রাজার সামনে।

দুই নাতিকে দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন চন্দ্রাবলোক।

নাতিদের কিনে নিয়েছিলেন ব্রাহ্মণের কাছ থেকে।

তারপর, সস্ত্রীক গেছিলেন বনে, তারাবলোক যেখানে আছেন, সেখানে।

গিয়ে দেখেছিলেন, গাছের ছাল পরে, একমাথা জটা নিয়ে শুয়ে আছেন তারাবলোক।

চোখের জলে ছেলেকে ধুইয়ে দিয়েছিলেন বাবা। বিদ্যাধর রাজ্যের সম্রাট পদে অভিষেকের সেই হল শুরু।

দুই নাতিকে ছেলের হাতে ফিরিয়ে দিলেন চন্দ্রাবলোক, কিনে তো নিয়েছেন, এখন ছেলেরা যার, থাক তার কাছে।

অমনি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হল চার দাঁতওয়ালা একটা হাতি আর স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী। ভিড় করে এল তাবড় বিদ্যাধররা।

লক্ষ্মী বললেন, শুধু দান করার পুণ্যে আজ থেকে তুমি বিদ্যাধরদের একছত্র সম্রাট। ওঠো হাতির পিঠে।

বিদ্যাধর সম্রাট হয়েও স্রেফ দান করে গেছিলেন তারাবলোক। বৈরাগ্য আসার পর ফের বনবাসী হয়েছিলেন।

১১৫. রাজা ব্রহ্মদত্ত কাহিনি

অসিত পাহাড়েই একদিন ঘনঘোর বর্ষার সময়ে কশ্যপ মুনির আশ্রমের সবাই নরবাহনদত্তকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করেছিল, মানসবেগ যখন মদনমঞ্জুষাকে নিয়ে পালায়, তখন আপনার মনের অবস্থা ছিল কী রকম?"

প্রায় পাগলের মতো বলেছিলেন নরবাহন দত্ত, আমার প্রিয়বন্ধু এই গোমুখ আমাকে বুঝিয়ে বলেছিল, বিপদে যারা স্থির থাকে, তাদের বিপদ কেটে যায়। শুনিয়েছিল মুক্তাফলকেতুর কাহিনি।

বারানসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত একরাতে বিছানায় শুয়ে থেকে দেখেছিলেন আকাশে উড়ে যাচ্ছে একজোড়া মণিময় সোনার হাঁস, হাল্কা সোলার মতো।

সারারাত জেগে থেকে চেয়ে রইলেন আকাশের দিকে, সোনার হাঁস আর দেখতে পেলেন না।

সকালবেলা বললেন মন্ত্রীকে, যেভাবেই হোক এই হংশযুগলকে এনে দিতে হবে।

মন্ত্রী বললে, এই সংসারে যে যেমন কর্ম করে, সে সেইরকম যোনিতে জন্মায়। এত রকমের জীবজন্তু তো এই জন্যেই, সব জীবের সংবাদ কে রাখে? যাকগে, আপনি একটা পদ্মদীঘি বানান, তীরে ভাত ছড়িয়ে রাখুন। বহু পাখি আসবে। সোনার মণিময় হাঁসদুটোও এসে যেতে পারে।

রাজা বললেন সেই রকম একটা দীঘি। এমন দীঘির জলেই খেলা করতে আসে জলচর পাখিরা। একদিন এল সেই অত্যাশ্চর্য হংসযুগল। তাদের ডানা গরুড় মণি দিয়ে গড়া, পা প্রবাল দিয়ে তৈরি, দুই চোখে বসানো মণিমুক্তা।

রোজ ঘাটে বসে অপরূপ হাঁসদের খেলা দেখতেন রাজা।

একদিন দেখলেন, এক জায়গায় কতকগুলো ফুল ছড়িয়ে রয়েছে। লুকিয়ে লুকিয়ে কেউ কি এসেছিল রাজার নিজস্ব এই হংস সরোবরে।

দ্বারপাল বললে, কেউ আসেনি। ফুল ছড়িয়েছে ওই দুটো সোনার হাঁস। রোজ স্নান সেরে পুজো করে, ধ্যান করে।

রাজা তো অবাক! এ কীরকম হাঁস? পুজো করে, আবার ধ্যানও করে! দেখতে হবে তো!

কিন্তু শুধু চোখে দেখলে তো হবে না, ধ্যানের চোখে জানতে হবে ব্যাপারটা।

জবর প্রহেলিকার সমাধান ঘটল বারো দিন তপস্যার পর। কে যেন বলে গেল, ওঠো রাজা, ওঠো। যা জানতে চাও, এবার তা জানবে।

সকালবেলা সরোবরের জলে আমন ইত্যাদি করে শুদ্ধ হয়ে আসনে বসলেন রাজা। উড়ে এল সোনার হাঁসদুটো। মানুষের গলায় শুনিয়ে দিল নিজেদের কাহিনি।

সে বড় আশ্চর্য কাহিনি।

মন্দর পাহাড়ে অসুখ-বিসুখ জরামৃত্যু কিসসু নেই। কেননা, সাগর ঘেঁটে অমৃত তোলবার সময়ে কয়েকফোঁটা অমৃত ঠিকরে পড়েছিল সেই পাহাড়ে। ওখানকার ফুল, গাছপালা, জল আর ধুলোর মধ্যে আছে অমৃত-প্রসাদ।

মহাদেব একদিন পার্বতীর সঙ্গে বিহার করছিলেন এই পাহাড়ে। এমন সময়ে দেবলোকের একটা জরুরি কাজে তাঁকে যেতেই হল। একা রইলেন পার্বতী। তখন বসন্তকাল। মন খারাপ করে বসে রইলেন একটা গাছের তলায়।

চামর দুলিয়ে কুমারী চন্দ্রলেখা বাতাস করে যাচ্ছে তাঁকে, এমন সময়ে এল একটা আপদ।

শিবের এক যুবক অনুচর। তার নাম মণিপুষ্পের। স্পর্ধা তার কম নয়। বৌদি শিবের পত্নীর সহচরীর দিকেই কামকটাক্ষ নিক্ষেপ করে বসল যৌনতাড়নায়!

তাই দেখে হি-হি করে হেসে উঠল, শিবের আরও দুই অনুচর। তাদের নাম পিঙ্গেশ্বর আর গুহেশ্বর। চন্দ্রলেখাকে চোখের ইশারা করছে মণিপুষ্পেশ্বর, দেখে কৌতুক হাসিতে উচ্ছল দুজনেই। কামনা জেগেছে তাদের মনেও। তিন পুরুষ চায় এক নারীকে। এইবার চটলেন পার্বতী। তারপর যখন দেখলেন, চন্দ্রলেখাও কামনা নিবৃত্তির চাহনি নিক্ষেপ করে চলেছে মণিপুষ্পেশ্বরের দিকে। তখন দিলেন অভিশাপ :

সম্ভোগ চাহনি বিনিময় করেছে চন্দ্রলেখা আর মণিপুষ্পেশ্বর শিবের অনুপস্থিতিতে, সুতরাং জন্মগ্রহণ করুক মর্ত্যের মাটিতে, মেটাক সম্ভোগ স্পৃহা।

মজার হাসি হেসেছিল যে দুজন শিব-অনুচর, তারাও মর্ত্যে গিয়ে কষ্টভোগ করুক।

এরা প্রথমে হবে ব্রাহ্মণ, তারপর ব্রহ্মরাক্ষস, তারপর পিশাচ, চণ্ডাল, চোর, নোংরা কুকুর, পরে পাখি।

ভয়াবহ এই অভিশাপ শুনে ধূর্জট নামে শিবের আর এক অনুচর উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, এইটুকু অন্যায় করেছে বলে এত বড়ো সাজা দেওয়া কি সমীচীন?

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে পার্বতী শাপ দিলেন তাকেও, যা, যা, যা। তুইও মর্ত্যযোনিতে জন্মা!

বেগতিক বুঝে দৌড়ে এল চন্দ্রলেখার মা। পার্বতীর পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইল চন্দ্রলেখা আর অন্যদের হয়ে। না বুঝে অপরাধ করে ফেলেছে, হে দেবী, প্রসন্ন হোন!

নিভে এল পার্বতীর চোখের আগুন। প্রশমিত হল ক্রোধ। বললেন, এদের চৈতন্য যখন ফিরবে, তখন জড়ো হবে সিদ্ধীশ্বরে, যেখানে ব্রহ্মা প্রমুখ দেবতারা গিয়ে তপস্যা করেন। শাপ কেটে গেলে আসবে আমার কাছে। বলে, গুম হয়ে বসে রইলেন।

কিন্তু উঁকি ঝুঁকি মারতে এল আর একটা উৎপাত। তার নাম অন্ধক। এক অসুর। পার্বতী সম্ভোগের বাসনা জেগেছে তার মনে। শিব যখন তল্লাটে নেই, তখন শিবের বউকে ধরা যাক।

রেগে টং হয়ে শিবের অনুচররা তেড়ে যেতেই চম্পট দিয়েছিলেন অন্ধক।

কিন্তু মহাদেবের অজানা কিছুই থাকে না। অন্ধক অসুরের স্পর্ধা অসহ্য। তিনি তাকে প্রাণেই মেরে ফেললেন।

এলেন পার্বতীর কাছে। বললেন, অন্ধক অসুর তো তোমারই এক সময়ের মানস-পুত্র। মনের ইচ্ছা থেকে সঞ্জাত ছেলে। সে আর আসবে না। তাকে শেষ করে এলাম।

বলে, পার্বতীকে নিয়ে মিলন-মেলায় মেতে রইলেন।

মণিপুষ্পেশ্বর, চন্দ্রলেখা, পিঙ্গেশ্বর, গুহেশ্বর, ধূর্জট, এদের সকলেরই পতন ঘটল স্বর্গ থেকে মর্ত্যে।

যজ্ঞস্থল নামে একটা শহর ছিল মর্ত্যে। ব্রাহ্মণ যজ্ঞসোম থাকতেন সেখানে। তাঁর ছিল জ্ঞান, বুদ্ধি আর বিপুল অর্থ। দুই ছেলে, হরিসোম আর দেবসোম। কিন্তু টাকাপয়সা আর পরমায়ু চিরস্থায়ী নয়। যজ্ঞসোম,

তাঁর গৃহিণী যখন পরকালে গেলেন, দেখা গেল, দুই ছেলেকে নিঃস্ব রেখে গেছেন। তারা গেল মামার বাড়িতে, গিয়ে দেখল, দাদু আর দিদিমা মারা গেছে। মামারা দুই ভাগ্নেকে ঠাঁই দিল বটে, দুদিন পরে গোরু ছাগল দেখবার ভারও দিল, লোক রাখবার পয়সা তাদের নেই।

দিনকয়েক পরে একটা ছাগল চুরি যেতেই ভয়ে পালিয়ে গেল দুই ভাগ্নে। মামারা যদি মারে!

গেল দূরের জঙ্গলে। দেখল, ছাগলটা মরে পড়ে আছে। খিদে পেয়েছিল। আগুন জ্বালিয়ে মাংস রেঁধে যেই খেতে যাবে, দেখল মামারা আসছে।

রইল পড়ে রান্না করা মাংস চম্পট দিল দুভাই।

মামারা তাদের তাড়া করেও ধরতে না পেরে শাপ দিল দূর থেকে, চোর কোথাকার! চুরি করেছিস, আবার মেরে খাচ্ছিস। এতো রাক্ষসের কাজ। যা, ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে থাক।

অমনি ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে গেল। জঙ্গলের প্রাণীদের মেরে কচমচ করে কাঁচা মাংস খেতে লাগল।

একদিন জঙ্গলের এক সন্ন্যাসীকে প্রাণে মারতে গেছিল। শাপ দিয়েছিলেন তেজস্বী সাধু। সঙ্গে সঙ্গে তারা পিশাচ হয়ে গেছিল।

পিশাচ হওয়ার পর এক ব্রাহ্মণের গোরু বধ করতে গেছিল। মন্ত্রশক্তি দিয়ে ব্রাহ্মণ তাদের চণ্ডাল বানিয়ে দিয়েছিল।

চণ্ডাল হয়ে দুজনে গেছিল চোরেদের পাড়ায়। ধরা পড়েছিল। তাদের নাক কান কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল চোর-রাজার কাছে। চোর-রাজা তাদের দুঃখের কাহিনি শুনে ঠাঁই দিল নিজের দলে। কাজ দেখিয়ে দুজনে একসময়ে চোরেদের সেনাপতিও হয়ে গেল। চোর রাজার হুকুমে একদিন একটা শৈব আশ্রম লুঠ করতে গিয়ে শিবের মন্দির পর্যন্ত লুঠ করে নিল।

শৈবদের প্রার্থনা শুনলেন স্বয়ং শিব। দুই চোর সেনাপতিকে অন্ধ, ঠুঁটো আর খোঁড়া করে দিলেন।

এইবার শৈব-সাধুরা দুজনকে খতম করবার জন্যে ধেয়ে আসতেই দুজনেই দুটো কুকুর হয়ে গেল।

তখন তাদের স্মৃতিতে ভেসে এল আগের সব কথা। অনুতাপে খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিল।

এইভাবে বহু দিবস অতীত হওয়ার পর শিবের অনুচরেরা বললে শিবকে, পিঙ্গেশ্বর আর গুহেশ্বরের শাপমোচন করার সময় হয়েছে। অনেক কষ্ট তো পেল।

শিব বললেন, উঁহু। এবার কাক হোক দুজনে।

কাক হয়ে গেল দুজনে। কিন্তু আগের স্মৃতি বজায় থাকায় দিবানিশি শিবচিন্তা করে গেল।

তারপর হল ময়ূর।

এখন তারাই হয়েছে মণিময় সোনার হাঁস।

শিবের অনুচর পিঙ্গেশ্বর আর গুহেশ্বর।

দুই হাঁস তাদের কাহিনি শেষ করে বললে, মণিপুষ্পেশ্বর এখন কে জানেন? রাজা, আপনি নিজে! শিবের অনুচর ছিলেন। এখন রাজা ব্রহ্মদত্ত। চন্দ্রলেখা হয়েছে আপনার রানি, সোমপ্রভা। ধূর্জট হয়েছে আপনার মন্ত্রী, শিবভূতি। পার্বতীর নির্দেশেই রাতে দেখা দিয়েছিলাম আপনাকে। এখন চলুন যাই সিদ্ধিক্ষেত্রে, সব্বাই। তবেই তো ফিরে যাব শিবের আলয়ে। সিদ্ধিক্ষেত্রে না গেলে তা হবে না, এই সেই সিদ্ধিক্ষেত্র, যেখানে দেবতারা শিবের তপস্যা করেছিলেন বিদ্যাধর অধিপতি মুক্তাফলকেতুকে দিয়ে বিদ্যুৎধ্বজ দৈত্যকে বিনাশ করার জন্যে। ফলে, মুক্তাফলকেতু মর্ত্য থেকে পরিত্রাণ পেয়ে পদ্মাবতীকে পেয়েছিলেন।

দিব্য হাঁসদের কাহিনি শুনে রাজা ব্রহ্মদত্ত মুক্তাফলকেতু প্রসঙ্গ জানতে চেয়েছিলেন।

১১৬. মুক্তাফলকেতু কাহিনি

দুই মণিময় সোনার হাঁস শুরু করল মুক্তাফলকেতুর সুদীর্ঘ উপাখ্যান।

বিদ্যুৎপ্রভ নামে এক দুর্দান্ত অসুর ছিল সেকালে। গঙ্গার তীরে বসে টানা একশো বছর ব্রহ্মার আরাধনা করে গেছিল মনের মতো ছেলে পাওয়ার মনোবাসনা নিয়ে।

প্রীত হয়ে বর দিয়েছিলেন ব্রহ্মা। এমন এক ছেলে হবে যাকে দেবতারাও মারতে পারবে না। সেই ছেলের নাম হবে বিদ্যুৎধ্বজ।

যথাসময়ে সেই ছেলে এল অসুর বিদ্যুৎপ্রভর কোল আলো করে। তার নাম রাখা হল বিদ্যুৎধ্বজ।

বড়ো হয়ে বিদ্যুৎধ্বজ জিজ্ঞেস করেছিল বন্ধুদের, নগর রক্ষার জন্যে এত আয়োজন কেন?

বন্ধুরা বলেছিল, ইন্দ্র যে আমাদের শত্রু। তাই সবসময়ে মোতায়েন রাখা হয় দশ লক্ষ হাতি, চোদ্দ লক্ষ রথ আর তিরিশ লক্ষ ঘোড়া।

রেগে গিয়ে বলেছিল বিদ্যুৎধ্বজ, ছিঃ ছিঃ ছিঃ। নিজের জোরে না লড়ে এত হাতি-ঘোড়া-রথ দরকার হয় রাজ্যরক্ষায়? আমি চাই নিজস্ব শক্তি। তপস্যা করব। শক্তি অর্জন করবো। বলে, সটান চলে গেল বনে, বাপ-মাকে না জানিয়ে।

খবর পেয়ে বিদ্যুৎপ্রভ অসুর সস্ত্রীক গেল বনে। বোঝাল ছেলেকে।

ছেলে অনড়। তার এক কথা। রাজ্য রক্ষা করব দিব্য অস্ত্র দিয়ে, একা। এত আয়োজনের দরকার নেই। তপস্যায় পাবো সেই অস্ত্র।

তিনশো বছর একটানা তপস্যা করে নড়িয়ে দিল ব্রহ্মার আসন। তিনি এসে ব্রহ্মাস্ত্র দান করলেন বিদ্যুৎধ্বজকে।

বললেন, পাশুপত অস্ত্র তো আমার নেই, তাই দিতে পারলাম না। একমাত্র পাশুপত অস্ত্রের সামনেই ব্রহ্মাস্ত্র অকেজো, এটা মনে রেখো। সুতরাং, অসময়ে ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার করতে নেই। করলে, ফল ভালো হবে না।

ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে বাড়ি ফিরল বিদ্যুৎধ্বজ। বাবা বিদ্যুৎপ্রভকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গ আক্রমণ করতেই দলবল নিয়ে এলেন ইন্দ্র।

বজ্র ছুঁড়ে বিদ্যুৎপ্রভকেই মেরে দিলেন ইন্দ্র।

রেগে টং হয়ে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে বসল বিদ্যুৎধ্বজ।

অসময়ে অবশ্যই, কেননা, ব্রহ্মাস্ত্র ছুঁড়তে হয় যখন নিজের প্রাণ যেতে বসেছে, শুধু তখন, তার আগে নয়। রাগের চোটে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপের যে নিয়ম বলেছিলেন ব্রহ্মা, তা ভুলে গেছিল বিদ্যুৎধ্বজ। ইন্দ্র সুযোগ বুঝে নিক্ষেপ করলেন তাঁর পাশুপত অস্ত্র। যেন প্রলয় অগ্নি ধেয়ে এল অসুর সৈন্যবাহিনীর দিকে। খতম হয়ে গেল সমস্ত অসুর।

একা বিদ্যুৎধ্বজ জীবিত রইল ছেলেমানুষ বলে, তাই সে অবধ্য, কিন্তু লেলিহান অস্ত্রের ঝলক আর সংহাররূপ দেখে জ্ঞান হারাল তৎক্ষণাৎ।

পাশুপত অস্ত্র তিন শ্রেণির ব্যক্তিদের সংহার করে না। যাদের বয়স কম, যাদের বয়স হয়েছে, আর যারা লড়তে ইচ্ছুক নয়।

যুদ্ধে জিতে বিজয়োল্লাসে দেবতারা, স্বস্থানে চলে যাওয়ার পর জ্ঞান ফিরল বিদ্যুৎধ্বজের।

পাশুপত অস্ত্র তেড়ে আসছে দেখে যারা পিঠটান দিচ্ছিল, বেঁচে থাকা সেইসব অসুর সৈন্যদের জড়ো করে বিদ্যুৎধ্বজ বলেছিল প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরব না। চলো যাই লড়ে মরি।"

একজন বৃদ্ধ মন্ত্রী বুঝিয়ে বলেছিল, মন্ত্রী ফের ভুল করবে। একবার ভুল করে সময় না হতেই ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়ে সব পণ্ড করলে। ব্রহ্মাস্ত্রকে আটকে তো দিল পাশুপত অস্ত্র। এখন ইন্দ্র জিতেছেন, তুমি সুবিধে করতে পারবে না। ধৈর্য ধরো সময় বুঝে শত্রুনাশ করবে।

বিদ্যুৎধ্বজ বললেন, তাহলে আপনারা রাজ্যে ফিরুন। আমি চললাম শিবের তপস্যায়।

পাঁচজন বন্ধুকে নিয়ে বিদ্যুৎধ্বজ চলে গেল কৈলাসের সানুদেশে। শুরু হল যোগসাধনা।

মোট পাঁচ হাজার বছর একটানা কঠোর সাধনা করে গেল বালক বিদ্যুৎধ্বজ। প্রথম হাজার বছর শুধু ফল খেয়ে গরমকালে পাঁচ কোণে পাঁচ আগুন জ্বালিয়ে, শীতের সময়ে জলে ডুবে, দ্বিতীয় হাজার বছর শুধু

শেকড় খেয়ে, তৃতীয় হাজার বছর শুধু জল খেয়ে, চতুর্থ হাজার বছর স্রেফ বাতাস খেয়ে, পঞ্চম হাজার বছর কিছু না খেয়ে।

তপস্যার জোরে আসন টলে গেল ব্রহ্মার। তিনি এলেন। বর দিতে চাইলেন।

বিদ্যুৎধ্বজ বললে, আপনার বরের কেরামতি তো দেখলাম আপনাকে আর কিছু দিতে হবে না।

অগত্যা এলেন মহাদেব। বললেন, ও ছেলে, কী চাও?

বিদ্যুৎধ্বজ বললেন, শত্রুজয়ী হতে চাই।

মহাদেব বললেন, হবে, হবে। ইন্দ্রকে হারাবে, ইন্দ্রের আসন দখলে আনবে।

মহাদেবের মহাবরে বলবান হয়ে দেশে ফিরল বিদ্যুৎধ্বজ। অসুরসৈন্য নিয়ে লড়তে গেল ইন্দ্রের সঙ্গে। যুদ্ধ চলল কুড়ি দিন। একুশ দিনের দিন দেবসৈন্য পালিয়ে যেতেই ইন্দ্র নিজে এলেন। বিদ্যুৎধ্বজ শিবের বরে জ্বলন্ত হাতুড়ি মেরে ইন্দ্রবাহন ঐরাবত হাতির মোটা মোটা দাঁত ভেঙে উড়িয়ে দিল। সে তখন রাগে কাঁপছে। বাপকে যে মেরেছে, সেই ইন্দ্রকে এতদিনে সামনে পাওয়া গেছে।

শিবশক্তির প্রলংকর তেজ সইতে পারলেন না ইন্দ্র। জ্ঞান হারালেন।

বিদ্যুৎধবজ শিবের বরে জ্বলন্ত হাতুড়ি মেরে ইন্দ্রবাহন ঐরাবত হাতির মোটা মোটা দাঁত ভেঙে উড়িয়ে দিল।

বেগতিক বুঝে বায়ুদেব পবন নিমেষে ইন্দ্রকে উড়িয়ে নিয়ে গেল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে।

পিছু নিল বিদ্যুৎধ্বজ। রাগে কাঁপতে কাঁপতে।

ঠিক সেই সময়ে শোনা গেল দৈববাণী, যুদ্ধের সময় এখন নয়।

বিদ্যুৎধ্বজ আর এগোল না। ইন্দ্রসেনারা চম্পট দিল রণক্ষেত্র থেকে।

বেগতিক বুঝে বৃহস্পতি ইন্দ্র-মহিষী শচিদেবীকে রেখে দিলেন ব্রহ্মলোকে। ইন্দ্রও গেলেন সঙ্গে, দেবতাদের নিয়ে। ব্রহ্মা বুঝিয়ে বললেন ইন্দ্রকে, এখন লড়তে যেও না। বিদ্যুৎধ্বজ শিবের অস্ত্রবল পেয়েছে। সবুর করো ইন্দ্রলোক ফিরে পাবে। এখন থাকো এই সমাধি অঞ্চলে।

সমাধি অঞ্চলটা ব্রহ্মলোকের শেষ সীমানায়। মনের দুঃখে শনি আর পলাতক দেবতাদের নিয়ে ইন্দ্র রইলেন সেখানে।

শূন্য অমরাবতী দখলে আনল বিদ্যুৎধ্বজ। বসল ইন্দ্রের সিংহাসনে।

ইন্দ্র-বাহিনী কিন্তু ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এই সংবাদ শুনে। দাঁতভাঙা ঐরাবত আর দর্পচ্যুত শচীদেবীকে নিয়ে মনমরা ইন্দ্র রইলেন বটে ব্রহ্মলোকের শেষ সীমানায়, তাঁর দলীয় দেবতারা পালিয়ে গেল অন্য অন্য লোকে, কেউ বায়ুলোকে কেউ চন্দ্রলোকে।

বায়ুলোকে চম্পট দিয়েছিলেন বিদ্যাধরদের অধিপতি চন্দ্রকেতু। নিস্তেজ মনে একদিন বসেছিলেন। এমন সময়ে সেখানে এলেন তাঁর বন্ধু পদ্মশেখর, গন্ধর্বদের রাজা।

ইনি চন্দ্রলোকে ছিলেন। কিন্তু মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করার জন্যে কৈলাসে গেছিলেন।

এই পদ্মশেখরই মনমরা চন্দ্রকেতুকে বললেন, মন খারাপ করো না। মহাদেব বলেছেন, শিগগিরই তোমার এক ছেলে হবে। অপরূপা এক মেয়েও আসবে কোল জুড়ে। তার স্বামী সংহার করবে বিদ্যুৎধ্বজকে। ফিরে পাবে রাজ্য।

চন্দ্রকেতু বললেন, তাহলে আমিও যাই শিবক্ষেত্রে। তপস্যা করা যাক।

বলে, বউ মুক্তাবলিকে নিয়ে চলে গেলেন শিব আরাধনায়।

পদ্মশেখর সব কথা ইন্দ্রকে জানিয়ে পিঠটান দিলেন চন্দ্রলোকে। ইন্দ্রের কানে গেল সমস্ত বত্তান্ত। মনে আশা পেলেন। বৃহস্পতিকে আসতে মিনতি জানালেন।

বৃহস্পতি এলেন। ইন্দ্র সবিনয়ে বললেন, পদ্মশেখর তো জামাইকে দিয়ে বিদ্যুৎধ্বজ সংহার করবে, বর দিয়েছেন মহাদেব। আমার কী হবে?

বৃহস্পতি ইন্দ্রকে নিয়ে গেলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা নিজেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন স্বর্গদখলের ব্যাপারে। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটিয়েছেন খোদ মহাদেব। সুরাহা তো তিনিই করবেন। মহাদেবের দর্শন পাওয়া যে কঠিন। অতএব ইন্দ্রকে নিয়ে বৃহস্পতি চলে গেলেন শ্বেতদ্বীপে বিষ্ণুর কাছে।

অনন্তশয্যায় বেশ শুয়েছিলেন বিষ্ণু, পাশে লক্ষ্মী। সমাগতদের দেখে উঠে বসলেন। বললেন, সব শুভ?

বৃহস্পতি বললেন, সবই তো জানেন।

বিষ্ণু বললেন, মহাদেব যা করেছেন, তার প্রতিকার শুধু মহাদেবই করতে পারেন। সিদ্বীশ্বর শিবক্ষেত্রে চলে যাও। মহাদেব সেখানে সদা বিরাজমান লিঙ্গরূপে। খুবই গুপ্ত তথ্য। নিজে বলেছেন আমাকে আর ব্রহ্মাকে, চল, আমিও যাই তোমাদের সঙ্গে।

গরুড়-এর পিঠে চেপে বিষ্ণু সদলবলে গেলেন সিদ্ধক্ষেত্রে। সেখানে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, জরা নেই, দুঃখ নেই। সেখানকার হরিণ আর বিহঙ্গরাও কাঞ্চনময় আর মণিময়। লিঙ্গরূপী মহাদেব সেখানে মুহূর্তে মুহূর্তে মণিময় হয়ে উঠছেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, চার দেবতা তাঁর ধ্যান শুরু করলেন।

ইতিমধ্যে চন্দ্রকেতুর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব এসে বললেন, উঠে পড়ো। তোমার এক ছেলে হবে। তার সঙ্গে বিয়ে হবে তোমার বন্ধু পদ্মশেখরের মেয়ে পদ্মাবতীর। এই ছেলেই বিদ্যুৎধ্বজকে খতম করে বিদ্যাধর অধিপতি হয়ে থাকবে।

এই বর দিয়ে মহাদেব চলে এলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বৃহস্পতি আর ইন্দ্রের সামনে।

বললেন, ঢের হয়েছে। আর তপস্যায় দরকার নেই। চন্দ্রকেতুকে তো বলে এলাম তার ছেলে বিদ্যুৎধ্বজকে মারবে। সেই ছেলের মধ্যে যে থাকবে আমারই সত্তা। তারপর অবশ্য সে মানুষ হয়ে যাবে।

তখন পার্বতীর সত্তা নিয়ে পদ্মাবতী তাকে বিয়ে করবে।

ফলে, চন্দ্রকেতুর যে ছেলে জন্ম নিল, তারই নাম হল মুক্তাফলকেতু। তারপর পদ্মশেখরের হল এক মেয়ে, পদ্মাবতী।

মুক্তাফলকেতু ছোটোবেলা থেকেই শিবভক্ত। কিশোর বয়সে একটানা বারোদিন উপোস করে শিবের পুজো করায় শিব এসে অপরাজেয় নামে একটা খাঁড়া দিয়ে গেলেন তাকে।

বলে গেলেন, এই হাতিয়ার তোমাকে অপরাজেয় রাখবে। তুমি সম্রাট হবে।

তারপর একদিন একটা কাণ্ড ঘটল।

বিদ্যুৎধ্বজ স্বর্গের মন্দাকিনীর জলে স্নান করতে নেমে দেখল, মন্দাকিনীর জলের রং পালটে যাচ্ছে। পরিষ্কার জলের বদলে আসছে পিঙ্গলবর্ণ জল, জলে বেশ সুগন্ধও রয়েছে, সেইসঙ্গে আসছে বড়ো বড়ো ঢেউ।

সাঙ্গপাঙ্গদের পাঠিয়ে জানতে পারল, দুটো জানোয়ার মন্দাকিনীতে নেমে খেলা করছে পরস্পরের সঙ্গে।

শিবের ষাঁড় আর ইন্দ্রের ঐরাবত।

ক্ষমতায় এলে দম্ভ বাড়ে। বিদ্যুৎধ্বজও বড়ো দাম্ভিক হয়ে গেছিল। অনুচরদের বললে, যা, ধরে আন হাতি আর ষাঁড় দুটোকে।"

ফলে, তারা অক্কা পেল ক্ষিপ্ত হাতি আর ষাঁড়ের প্রহারে। এইবার অসুর সৈন্যরা ধেয়ে গেল বিদ্যুৎধ্বজের হুকুমে।

তারাও নিকেশ হয়ে গেল নিমেষে।

হাতি আর ষাঁড় ফিরে গেল নিজের নিজের জায়গায় খবরটা ইন্দ্রের কানে গেল। বুঝলেন, বিদ্যুৎধ্বজের পতন আসন্ন।

ব্রহ্মার কানে সংবাদটা তুলে দিয়েই দেবসৈন্য জড় করে বেরিয়ে পড়লেন বিদ্যুৎধ্বজ বিনাশের সংকল্প নিয়ে।

১১৭. বিদ্যুৎধ্বজ খতম হল

বিপুল উৎসাহে স্বর্গ অবরোধ করলেন ইন্দ্র।

খবর পেয়ে বিদ্যুৎধ্বজ যখন সসৈন্যে বেরিয়ে আসছে, তখন দেখা গেল একটার পর একটা কুলক্ষণ। রথের নিশানে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎরশ্মি, পালে পালে শকুনি ছেয়ে দিল আকাশ, পটাপট ভাঙতে লাগল একটার পড় একটা ছত্র। শেয়ালের ডাকে মুখরিত হল চতুর্দিক।

আরম্ভ হল দেবাসুর যুদ্ধ।

মুক্তাফলকেতু শিবের দেওয়া অপরাজিত খাঁড়া নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসবার পথে মেঘবর্ণ দুর্গার মন্দিরে ঢুকে যখন পুজো দিচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে তাঁর ভাবী বউ পদ্মাবতীও মন্দিরে এসেছিল পুজো দিতে। দুজনে দুজনকে দেখে যখন বিমুগ্ধ, ঠিক তখন একটা অনর্থ ঘটালো দুটো রাক্ষসী। তারা লুকিয়ে ছিল গাছের আড়ালে। খপ করে পদ্মাবতীকে ধরেই সাঁ করে উঠে গেল আকাশে।

মুক্তাফলকেতুর খাঁড়া চলল তৎক্ষণাৎ। দুই রাক্ষসীর খণ্ড খণ্ড দেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল চারদিকে।

সপ্রেম চাহনি পদ্মাবতীর ওপর নিবদ্ধ রেখে মুক্তাফলকেতু গেল যুদ্ধ করতে। বিমুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল পদ্মাবতী।

শুরু হল মহাযুদ্ধ। চলল চব্বিশ দিন। পঁচিশ দিনের দিন দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামল মুক্তাফলকেতু আর বিদ্যুৎধ্বজ। বিদ্যুৎধ্বজ প্রয়োগ করল তমোহ অস্ত্র, গ্রীষ্ম অস্ত্র, নাগ অস্ত্র। তিনটে ভয়ানক অস্ত্রকেই কাটিয়ে দিল মুক্তাফলকেতু যথাক্রমে ভাস্কর অস্ত্র, সৌসির অস্ত্র আর গুরুড় অস্ত্র দিয়ে।

অর্থাৎ, অন্ধকার দূর হল রোদ্দুরে, গরম বিদায় নিল শীতে, সাপ খতম হল গুরুড়ের খাদ্য হয়ে।

মায়া-অস্ত্র ত্যাগ করার জন্যে আকাশে উঠে গেল বিদ্যুৎধ্বজ। শুরু হল প্রস্তর বৃষ্টি আর অস্ত্রক্ষেপণ। বিদ্যুৎধ্বজ কিন্তু অদৃশ্য।

এইবার ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করল মুক্তাফলকেতু।

নিহত হল "সৌসির" শব্দ অভিধানে নেই। আন্দাজে অর্থ ঠিক করা হলো। পন্ডিত মন্তব্য পেলে উপকৃত হবো।" বিদ্যুৎধ্বজ। লাশ এসে পড়ল মাটিতে।

শেষ হয়ে গেল মহাসমর। হাহা-হুহু প্রমুখ গন্ধর্বরা গানে গানে ভরিয়ে দিল দেবসভা, রম্ভা প্রমুখ অপ্সরারা নেচে গেল মনের আনন্দে...

বিয়ের প্রতীক্ষায় রইল মুক্তাফলকেতু।

১১৮. পদ্মাবতীর ভালোবাসা

বিয়ের প্রতীক্ষায় রইল পদ্মাবতী। প্রথম দর্শনেই প্রেমের যে ফুল ফুটেছিল মনের বাগানে, তা অযুত পুষ্প হয়ে ভরিয়ে দিল মন-কানন।

কিন্তু কৈশোরের প্রেমে অভিশাপ থাকে।

দিবানিশি মুক্তাফলকেতু ধ্যানে বিভোর থাকতে থাকতে একদিন তার একটা ছবিও এঁকেছিল পদ্মাবতী, একবার দেখেই মনের পটে যে ছবি আঁকা হয়ে গেছিল, সেই ছবিকেই রঙে রেখায় ফুটিয়ে তুলেছিল।

এবং, তা দেখে ফেলেছিল প্রিয় সখী মনোহারিকা। ঠাট্টা তামাসার পর বলেছিল, ঠিক আছে, ঠিক আছে, বিয়ের আগেই সাধুমিলনের একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বলে, পাখি-বিমানে চেপে সখী চলে গেল মুক্তাফলকেতুর অন্তঃপুরে। সেখানে তাকে না পেয়ে গেল নগর-কাননে। খুঁজতে খুঁজতে দেখল একটা গাছের তলায় এক বন্ধুর কাছে পদ্মাবতীর কথা বলছে মুক্তাফলকেতু। পদ্মাবতীকে একবার দেখেই সে মরেছে, আর একবার যদি দেখতে পেত...

সখী মনোহারিকা সামনে এসে বললে, একই অবস্থা করেছেন তো পদ্মাবতীরও। আপনাকে আর একবার দেখতে না পেলে সে তো আর বাঁচবে না।

লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল মুক্তাফলকেতু, তাহলেই ফের দেখা হোক মেঘবর্ণ দুর্গার মন্দিরেই, যেখানে তাকে দেখেছিলাম প্রথমবার। নিয়ে এস তোমার সখীকে।

বলতে বলতে মাথা থেকে চূড়ামণি খুলে তুলে দিয়েছিল মনোহারিকার হাতে। বলেছিল, মহাদেব খুশি হয়ে এই চূড়ামণি দিয়েছিলেন আমাকে। মাথায় পরে থাকলে সব দুঃখ চলে যায়। তোমাকে দিলাম, পরিয়ে দেবে পদ্মাবতীর মাথায়। আর তোমাকে দিলাম এই মণিহার, ইন্দ্র খুশি হয়ে দিয়েছিলেন আমাকে। আজ থেকে এই মণিহার তোমার গলায় শোভা পাক। ঘুরিয়ে, প্রিয়ার সখীর গলাতেও মাল্যদান হয়ে গেল।

পাখির বিমানে চেপে মনোহারিত চলে গেল পদ্মাবতীর কাছে। খুশিতে ডগমগ হয়ে।

বন্ধুকে নিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করল মুক্তাফলকেতু।

পদ্মাবতীর প্রেমজ্বর একটু কমল চূড়ামণি মাথায় দেওয়ার পর। যা ছিল প্রিয়তমর মাথায়, এখন তা নিজের মাথায়। এর চেয়ে বড়ো প্রেম নিদর্শন আর কী হতে পারে।

সেজেগুজে, চূড়ামণি মাথায় দিয়ে, পদ্মাবতী যখন তৈরি হচ্ছে মেঘবর্ণ দুর্গার মন্দিরে যাওয়ার জন্যে, এই সময়ে ভাগ্যচক্র ঘটিয়ে দিল একটা অবাঞ্চিত ঘটনা।

ঠিক সেই সময়ে মন্দির সংলগ্ন বাগানে ঢুকলেন এক সাধু। সঙ্গে ছিল দৃঢ়ব্রত নামে শিষ্য। শিষ্যকে বললেন, বাগানের দরজা পাহারা দাও। কাউকে ঢুকতে দেবে না সমাধিতে বসছি। তারপর যাবো মন্দিরে।

শিষ্য রইল পাহারায়। সাধু কিছুক্ষণ সমাধিমগ্ন থেকে উঠে চলে গেলেন মন্দিরে।

শিষ্যকে তা না বলায় সে বেচারা জানতেও পারল না গুরুদেব আর নন্দনকাননে নেই, রয়েছেন মন্দিরে।

আর ঠিক এই সময়ে মুক্তাফলকেতু সেজেগুজে বন্ধুবর সংযতককে নিয়ে এল বাগানে। বাধা পেল প্রবেশ পথে। গুরুর হুকুমমতো পথ আটকে দিল চেলা।

সে তো জানে না, গুরু এখন বাগানে নেই, রয়েছেন মন্দিরে!

মুক্তাফলকেতু ভেবে নিল, পদ্মাবতী আগেই এসে গেছে।

মুনিমহাশয় তো ধ্যান করছেন কাননের এক কোণে। সুতরাং এতবড়ো বাগানে প্রিয়া মিলনে আপত্তি কোথায়? মুনির মনে বা ধ্যানে কোনও বিঘ্ন ঘটবে না।

এই ভেবে, আকাশপথে উদ্যানে প্রবেশ করল মুক্তাফলকেতু, সহচর সংযতককে নিয়ে। শিষ্য জানতেও পারল না।

কিছুক্ষণ পরে অবশ্য ঢুকেছিল বাগানে, গুরুর সমাধি দেখবার জন্যে।

গুরুকে দেখতে পায়নি। দেখেছিল মুক্তাফলকেতুকে!

ভেবেছিল, উটকো লোকটা নিশ্চয় গুরুকে হটিয়েছে।

ভীষণ রেগে শাপ দিয়েছিল মুক্তাফলকেতুকে, স্পর্ধা তো তোমার কম নয়! গুরুকে তাড়িয়ে মজা করছো। অভিশাপ দিচ্ছি, মানুষ হয়ে জন্মাও!

শাপ দিয়ে সে গেল গুরুর খোঁজে।

আর ঠিক সেই সময়ে পাখিবিমানে চেপে সখীসহ পদ্মাবতী এসে গেল বাগানে।

উল্লাসে ফেটে পড়তে পারেনি মুক্তাফলকেতু। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল, ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় আমাদের বিয়ে হয়ে যাক আর দেরি না করে।

হয়েছে কী? পদ্মাবতী সলাজ চোখে জিজ্ঞেস করেছিল।

অভিশাপের কথা বলেছিল মুক্তাফলকেতু। তারপর গেছিল মন্দিরের ভেতরে সাধুকে খুঁজতে।

মুনি সব শুনলেন। সহৃদয় কণ্ঠে বললেন, আমার এই চেলা একটা মূর্খ। অভিশাপ দিয়ে ফেলেছে বিবেকবুদ্ধি নেই বলে। নিরপরাধ তুমি। সবই ভবিতব্য। শিষ্য নিছক নিমিত্ত। মর্ত্যে নিশ্চয় তোমার করণীয় কিছু আছে, তাই সেখানে যেতে হবে। পদ্মাবতীকে পাবে এই লোকেই, শাপের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে। বৎস মুক্তাফলকেতু, তোমার অকস্মাৎ অভিশাপের পেছনে একটা কারণ আছে। যা তোমার অজ্ঞাত। আমি জানিয়ে দিচ্ছি। ব্রহ্মাস্ত্র ছুঁড়েছিলে চুলচেরা হিসেব না করে, আচমকা, হিসেবে ভুল থাকায় অসুরদের বাচ্ছাকাচ্ছা আর মেয়েরাও মরেছিল। পাপ করেছিলে। অভিশাপ পেলে।

পদ্মাবতী কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, তাহলে আমাকেও মর্ত্যে পাঠান।

মুনি বলেছিলেন, তা হয় না, মা। তবে তোমার মাথার এই চূড়ামণি তোমাকে আগলে রাখবে। ব্রহ্মার কমণ্ডলু থেকে তৈরি হয়েছে এই শিরোভূষণ। মুক্তাফলকেতুকে পাবে এই শরীরে, এই লোকে।

ভীষণ রেগে এইবার শিষ্যকেই শাপ দিয়ে বসল পদ্মাবতী, কামরূপী কামচর হয়ে জন্মে মানুষের বাহন হয়ে থাক।

মুক্তাফলকেতু বলেছিল সাধুকে, এই আশীর্বাদ করুন যেন মানুষ হয়ে জন্মে অন্য কোনও মেয়েকে ভালোবেসে না ফেলি। সেই আশীর্বাদ করে গেলেন সন্ন্যাসী।

বিদায় নিল মুক্তাফলকেতু বিষণ্ণ মনে।

পদ্মাবতী থেকে গেল মন্দির সংলগ্ন আশ্রমে। মুক্তাফলকেতুকে মহাদেব দিয়েছিলেন যে চূড়ামণি, সেই চূড়ামণি নিজের মাথায় পরে ধ্যান করে গেল মহাদেবের। সামনে রেখে দিল মুক্তাফলকেতুর ছবি, যা সে এঁকেছিল স্মৃতির পট থেকে। পুজো করে গেল সেই ছবির ঠাকুরকেও।

বাবা-মা এসেছিল পদ্মাবতীকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

পদ্মাবতী যায়নি। বলেছিল, মনে মনে আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী কষ্টে থাকবে, আর কুলস্ত্রী সুখে থাকবে, তা হয় না। আমাকে তপস্যা করতে দাও।

বিষণ্ণ মনে পদ্মাবতীর বাবা পদ্মশেখর প্রাসাদে ফিরেছিল। কুবলাবতী বুঝিয়ে দিয়েছিল স্বামীকে পদ্মাবতীর কষ্টভোগের কারণ।

শিবপুরে তপস্যা করছিল এক বিদ্যাধর কুমারী, তার নাম দেবপ্রভা, মনের মতো স্বামী পাওয়ার জন্যে। পদ্মাবতী টিটকিরি দিয়েছিল তাকে। তপস্যার জোরে শাপ দেওয়ার মনঃশক্তি অর্জন করেছিল মেয়েটি। বলেছিল, তোকেও তপস্যা করতে হবে স্বামী পাওয়ার জন্যে।

১১৯. মুক্তাফলধ্বজ কাহিনি

মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে? ভয়ের চোটে মুক্তাফলকেতু চলে গেল মহাদেবের কাছে।

মহাদেব বললেন, নির্ভয়ে থাক গর্ভবাসের কষ্ট তোমাকে সইতে হবে না। মানুষ হয়েও বেশিদিন থাকতে হবে না। আমার অনুচর তোমার ছোটো ভাই হয়ে জন্মাবে। তার এখনকার নাম কিঙ্কর।

দেবসভ নগরের রাজা মেরুৰ্দ্ধজ ধার্মিক পুরুষ। নিঃসন্তান। ইন্দ্রপ্রিয়। দেবাসুরের যুদ্ধে ইন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন।

ইন্দ্রের আমন্ত্রণে একদিন দেবসভায় গিয়ে গন্ধর্বদের গান শুনলেন, অপ্সরাদের নাচ দেখলেন, মন কিন্তু মুষড়ে রইল।

ইন্দ্র বললেন, তেমার মনে কেন এত দুঃখ, আমি তো জানি। ছেলে নেই তো? ছেলে হবে। একজন নয়, দুজন। বড়ো ছেলে মুক্তাফলধ্বজ শিবের অংশে জন্মাবে। ছোটো ছেলে মলয়ধ্বজ শিবের অনুচরের অংশে জন্মাবে। তারা মহাপাশুপত অস্ত্র পাবে। পাতাল আর পৃথিবী জয় করবে। তপোধন মুনি তাদের দেবে কামরূপী বাহন আর অনেক অস্ত্র। আমি তোমাকে এখন দিচ্ছি আকাশে ধেয়ে যাওয়ার দুটো অস্ত্র। আর দিচ্ছি এই হাতি, কাঞ্চনগিরি।

কাঞ্চনগিরি হাতির পিঠে চেপে আকাশ পথে ফিরে এলেন রাজা মেরুধ্বজ।

এরপর একসময়ে মেরুধ্বজ মহিষীর গর্ভে এল মুক্তাফলকেতু, বিদ্যাধর দেহ ছেড়ে। অল্প সময়ে ভূমিষ্ঠও হল সূর্যের সমান তেজ নিয়ে তার নাম রাখা হল মুক্তাফলধ্বজ। একবছর পরে হল দ্বিতীয় ছেলে। তার নাম রাখা হল মলয়ধ্বজ রাজার মন্ত্রীর ছেলে হয়ে এল সংযতক, শাপের পরিণামে। তার নাম রাখা হল মহারদ্ধি।

মুক্তাফলকেতু হল মুক্তাফলধ্বজ, শিবের অনুচর কিঙ্কর এল মলয়ধ্বজ নাম নিয়ে, সহচর সংযতক এল মহাবুদ্ধি নাম নিয়ে।

পদ্মাবতীর শাপে অপরাধী শিষ্য মর্ত্যে এল পাখি হয়ে। মুক্তাফলধ্বজের বাহন হয়ে। এই বাহনকে দান করলেন তপোধন ঋষি, যজ্ঞের সময়ে এই পাখিতে চরে মুক্তাফলধ্বজ, মলয়ধ্বজ আর মহাবুদ্ধি যেন অসুরদের আটকায়, এই শর্তে।

যজ্ঞ আরম্ভ হতেই এল অসুরের দল। তারা চম্পট দিল মুক্তাফলধ্বজকে দেখে। পাখির পিঠে চেপে যখন এসেছে, তখন নিশ্চয় বিষ্ণু।

পাতালে পালিয়ে গিয়ে খবরটা দিল অসুরদের রাজা ত্রৈলোক্যমালীকে।

এল ত্রৈলোক্যমালী। যখন ভীষণ লড়াই লড়ে যাচ্ছে মুক্তাফলধ্বজের সঙ্গে, মহাদেবের হুকুমে পাশুপত অস্ত্র চলে এল মুক্তাফলধ্বজের সামনে। এসেছে রাজপুত্রকে জিতিয়ে দিতে।

জ্বলে উঠল পাশুপত অস্ত্র। মহাভয়ংকর জ্বলন্ত সেই রূপ দেখে রণে ভঙ্গ দিয়ে অসুর সৈন্যরা চম্পট দিল পাতালে। রাজপুত্র তাদের পেছন পেছন ধাওয়া করে অসুররাজ ত্রৈলোক্যমালীকে আর তার ছেলেকে কষে বেঁধে রেখে দিল শ্বেতপাথরের গুহায়।

সুদর্শন দুই রাজপুত্রকে দেখে কিন্তু প্রেমে পড়ে গেল ত্রৈলোক্যমালী অসুররাজার দুই মেয়ে।

রাজা মেরুধ্বজ এরপর একদিন ছেলেদের বললেন, এবার তোমরা বিয়ে করো।

বড়ো ছেলে মুক্তাফলধ্বজ বললে, বিয়েতে আমার মন নেই। ছোটো ছেলে মলয়ধ্বজের মন বুঝতে সময় লাগল না রাজা মেরুধ্বজর। তার ইচ্ছে আছে।

কিন্তু সে তো চায় অসুররাজার ছোটো মেয়েকে। যথাসময়ে জানা গেল, অসুররাজা শত্রুদের জামাই করবে না।

চিন্তায় পড়লেন রাজা মেরুধ্বজ।

অসুররাজা ত্রৈলোক্যমালীর মেয়েদের সঙ্গে মা স্বয়ংপ্রভার কথাবার্তা চলছিল এই রকম :

মেয়েরা : বাবাকে বেঁধে রাখা হয়েছে আটবছর ধরে। তাই ঠিক করেছি আগুনে পুড়ে মরব।

মা : একটু ধৈর্য ধরো।

মহাদেবের ধ্যানে বসল স্বয়ংপ্রভা। স্বপ্নে দেখা দিলেন মহাদেব। বললেন, রাজ্য ফিরে পাবে তোমার স্বামী। তোমার জামাই হবে মুক্তাফলধ্বজ আর মলয়ধ্বজ।

স্বয়ংপ্রভা মেয়েদেরকে সেই খবর দিয়ে, তাদের আত্মাহুতি ঠেকিয়ে, খবরটা পাঠাল স্বামী ত্রৈলোক্যমালীকে এক বুড়ি দাসীর মারফত।

ত্রৈলোক্যমালী বলে পাঠালো, মহাদেব বলেছেন, রাজ্য ফিরে পাবো। সুসংবাদ। কিন্তু মানুষ-শত্রুদের জামাই করবো না।

মায়ের মুখে বাপের গোঁ শুনে মেয়েরা বললে, তাহলে আমরা পুড়েই মরবো।

বলে, চতুর্দশী তিথিতে পাপরিপু তীর্থে গিয়ে চিতা জ্বালাল পুড়ে মরবার জন্যে।

ঠিক সেই সময়ে সেই তীর্থে হাটকেশ্বরকে পুজো দিতে গেছিলেন রাজা মেরুধ্বজ। জ্বলন্ত চিতা দেখলেন। মেয়ে দুটিকে দেখলেন। চোখ জুড়িয়ে গেল।

এমন রূপ তো অপ্সরাদের অঙ্গেও নেই!

শুনলেন বড়ো মেয়েটি বলছে আগুনের দেবতাকে, ভালোবেসেছি রাজপুত্র মুক্তাফলধ্বজকে। মা চায় বিয়ে হোক। চায়না বাবা। এ জন্মে পেলাম না তার মতো স্বামী। পাই যেন সামনের জন্মে।

ছোটো মেয়েও একই প্রার্থনা জানল আগুনের দেবতাকে। সামনের জন্মে যেন স্বামীরূপে পায় রাজপুত্র মলয়ধ্বজকে।

রাজা মেরুধ্বজ বললেন তাদের, অগ্নিপ্রবেশের দরকার নেই। মেয়েরা, আমি দেখছি যাতে তোমাদের ইচ্ছাপূরণ হয়।

মেয়েদের মা দৈত্যরানি স্বয়ংপ্রভা কাঁদছিল আড়ালে দাঁড়িয়ে। এখন চোখের জল মুছে সামনে এসে বললে, ভাবী বেয়াইকে, আমার স্বামীকে বেঁধে রেখেছেন, আর আমার মেয়েদের বউমা করবেন বলছেন, তা কি হয়? আগে তাকে মুক্তি দিন। নইলে কন্যাদানই যে করবে না ওদের বাবা।

কথা দিলেন রাজা মেরুধ্বজ।

১২০. মুক্তাফলকেতু আর পদ্মাবতী

রানিকে বললেন প্রসাদে ফিরে, কী করা যায় বলেতো? ত্রৈলোক্যমালী খেপেছে। মুক্তি পেলেও মেয়ে দেবে না। দেখি মিষ্টি কথায় কাজ হাসিল করা যায় কিনা।

দ্বারপালকে শ্বেতপাথরের গুহায় পাঠালেন রাজা মেরুধ্বজ। কী বলতে হবে ত্রৈলোক্য-মালীকে, তা শিখিয়ে দিলেন।

সেইভাবেই বললে দ্বারপাল, অদৃষ্টে কষ্টভোগ ছিল, তাই বন্দিদশায় কাটাতে হল। এবার মুক্তি পাবেন, নিজের রাজ্য ফিরে পাবেন। আপনার মেয়েদুটির সঙ্গে রাজার দুই ছেলের বিয়ে দিয়ে দিন।

রেগে টং ত্রৈলোক্যমালী বললেন, কক্ষনো না। মানুষের সঙ্গে অসুরের মেয়েদের বিয়ে? অসম্ভব!

আচ্ছা গোঁয়ার তো ভাবী বেয়াই! গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন রাজা মেরুধ্বজ।

ত্রৈলোক্যমালীর গিন্নি স্বয়ংপ্রভা সবশুনে বুড়ি দাসী ইন্দুমতীকে পাঠাল মেরুধ্বজের রানির কাছে। উপহার পাঠাল একটা রত্নহার।

ইন্দুমতী বললে, সমস্যাটা মিটে যাবে অসুররাজাকে বাঁধন খুলে মুক্তি দিলেই। রাগ জল হয়ে যাবে। বাঁধা অবস্থায় কন্যাদানের কথাও ভাবতে পারছেন না, তখন রাগ চলে যাবে।

মেরুধ্বজ মহিষী বললে, তা বটে! তা বটে!

ইন্দুমতী তখন রত্নহারটা তাকে দিল। বললে, পাতালের বিশেষ রত্ন দিয়ে তৈরি এই হার আপনাকে উপহার পাঠিয়েছেন আপনার ভাবী বেয়ান। এই হারের গুণ অনেক। এর যে-কোনও একটা রত্নের শক্তি আপনাকে আকাশে ওড়ার ক্ষমতা দেবে।

ঠিক এই সময়ে উপস্থিত হয়েছিলেন চিন্তাচ্ছন্ন রাজা মেরুধ্বজ। সব শুনলেন। বললেন, আগে আমার ছেলেদের জামাই করা হোক, তারপর নেব উপহার।

চতুরা ইন্দুমতী মুচকি হেসে রাজার মাথাতেই রত্নহার রেখে বললে, এই হোক শুভকাজের সূচনা।

এরপর আর উপহার প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

ইন্দুমতীকে সেদিন আর পাতালে ফিরতে দিলেন না রাজা।

পরের দিন সকালে রাজসভায় মন্ত্রীদের ডেকে সব কথা বললেন। মন্ত্রণা চাইলেন।

তারপর বললেন ইন্দুমতীকে, শর্ত এই: ত্রৈলোক্যমালীর বাঁধন খোলার আগে পাতালের প্রধান প্রধান নাগরিক আর মহিলাদের হাটকেশ্বরের সামনে এসে শপথ নিয়ে একটা চুক্তিপত্রে সই দিয়ে যেতে হবে, পাতালের সব রাজারাও তাতে সই করবে। সেই চুক্তিপত্র অনুসারে ত্রৈলোক্যমালীকে আমার বশ্যতা স্বীকার করে নিতে হবে। তাহলেই তার বাঁধন খুলে দেওয়া হবে।

উত্তম প্রস্তাব। ইন্দুমতী আগে গেল ত্রৈলোক্যমালীর কাছে। তার সুমতি নিয়ে গেল পাতালে। স্বয়ংপ্রভা আর প্রধান প্রধান পাতাল বাসিন্দাদের নিয়ে চলে এল হাটকেশ্বরে। স্বাক্ষর প্রদাণ আর শপথ গ্রহণের পর বন্ধনমুক্ত ত্রৈলোক্যমালীকে সসম্মানে পাতালে পাঠিয়ে দিলেন রাজা মণিধ্বজ। ত্রৈলোক্যমালী এত সমাদর পেয়ে খুশি হয়ে পাতালের বহু মণিরত্ন উপহার দিলেন রাজা মণিধ্বজকে।

সদ্ভাব এসে গেল দুই রাজার মধ্যে।

তারপর পাতাল থেকে এল ত্রৈলোক্যমালী রাজা মণিধ্বজকে নেমন্তন্ন করতে, আসুন পাতালে, ভালো করে দেখুন পাতাল ঐশ্বর্য, নিয়ে যান আমার দুই মেয়েকে।

কিন্তু ঝামেলা পাকাল বড়ো ছেলে। সে তো বিয়ে করবে না শিব-তপস্যা শেষ না করে। করুক ছোটো ভাই।

ছোটো ভাই বললে, দাদা না বিয়ে করলে আমিও করব না। ক্ষুণ্ণ মনে পাতালে ফিরে গেল ত্রিলোক্যমালী।

তার দুই মেয়ে, ত্রৈলোক্যপ্রভা আর ভুবনপ্রভা, পাত্র বিগড়েছে শুনে শুরু করল বারোদিনের উপোস, হত্যে দিল শিবক্ষেত্রে। শিবের কৃপায় যদি এ বিয়ে হয় ভাল, না হলে আগুনে পুড়ে মরবে।

বাবা ত্রৈলোক্যমালী আর মা স্বয়ংপ্রভাও অনাহারে রইল ওই কদিন।

দাসী ইন্দুমতীর মুখে গোটা পরিবারের দুর্বিপাক বৃত্তান্ত শুনে শিব আরাধনায় উপবাসে রইলেন রাজামেরুধ্বজ আর তাঁর মহিষী স্বয়ংপ্রভা।

যত নষ্টের গোড়া মুক্তাফলধ্বজ স্বপ্ন দেখল ছদিন ছরাত ধ্যানস্থ থাকবার পর সপ্তম দিবসের ভোরে। তপোবন মুনির দেওয়া কামরূপী বাহনে চেপে গেছে অনেক দূরের সুমেরুর পাশের এক গৌরী দেবীর সিদ্ধক্ষেত্রে। সেখানে তপস্যা করছে এক অপরূপা কন্যা। তাকে মুগ্ধ চোখে যখন দেখছে মুক্তাফলধ্বজ, তখন এক জটাধারী সন্ন্যাসী হাসি মুখে তাকে বলছে, একটা মেয়েকে বিয়ে করার ভয়ে তো পালিয়ে এলে। ওই দেখো, আর একটা মেয়ে তোমাকে পাওয়ার জন্যে ধ্যান করে যাচ্ছে।

ঘুম ভেঙে গেল মুক্তাফলধ্বজের। বন্ধুবর মহাবুদ্ধিকে বললে স্বপ্নকথা। তারপর বললে, অসুরের মেয়েকে বিয়ে করার কোনও ইচ্ছে আমার নেই। আমি চাই স্বপ্নে দেখা ওই মেয়েকে।

বলেই, স্মরণ করল তপোধন ঋষির দেওয়া পক্ষিবাহনকে। বাহন এল তৎক্ষণাৎ। দুই বন্ধু তার পিঠে চেপে চলে গেল গৌরীদেবীর সিদ্ধক্ষেত্রে।

এদিকে ছেলে মুক্তাফলধ্বজ ভোর থেকেই উধাও হয়েছে শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন পিতৃদেব মেরুধ্বজ। খবর চলে গেল পাতালেও।

দুই মেয়ে আর বউকে নিয়ে ত্রৈলোক্যমালী তৎক্ষণাৎ চলে এল মেরুধ্বজের কাছে।

আগেই বলা হয়েছে, মেঘবর্ণ গৌরীদেবীর আশ্রমে থেকে ধ্যান করে যাচ্ছিল পদ্মাবতী ভোররাতে সে স্বপ্নে দেখল এক সন্ন্যাসী তাকে হেসে হেসে বলছে, তোমার প্রতীক্ষা এইবার শেষ। পাবে স্বামীকে।

তৎক্ষণাৎ সখীকে নিয়ে চলে গেল গৌরীদেবীর সিদ্ধক্ষেত্রে। স্নানঘাটে।

দেখল মুক্তাফলধ্বজকে। দেখতে অবিকল মুক্তাফলকেতুর মতো। ইনিই কি তিনি?

সখী বললে, শুধু ইনিই নন, ওঁর বন্ধুকেও তো দেখতে অবিকল বন্ধু সংযতকের মতো। তাহলে নিশ্চয় এঁরাই তাঁরা, শাপগ্রস্ত হয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছেন।

পদ্মাবতী লুকিয়ে পড়ল দেবীর প্রতিমার আড়ালে।

স্নান সেরে বন্ধুকে নিয়ে মন্দিরে এল মুক্তাফলধ্বজ।

বললে বন্ধুকে, কী আশ্চর্য! স্বপ্নে তো এই প্রতিমাই দেখেছিলাম। দেখছি না শুধু সেই অপরূপাকে। তাকে যদি না পাই, নিশ্চয় মরবো।

প্রতিমার আড়ালে থেকে সখী বললে পদ্মাবতীকে, শুনলে তো? তোমাকেই চাই। নইলে মরবেন।"

পুজো সেরে বাইরে এসে বন্ধুকে নিয়ে যখন মন্দির প্রদক্ষিণ করছে মুক্তাফলধ্বজ, আচমকা বন্ধুবর মহাবুদ্ধির মনে পড়ে গেল পূর্বজন্মের কথা। জাতিস্মর হয়ে গেল সেই মুহূর্তে।

বললে সচমকে, আরে! ওই কন্যাই তো পদ্মাবতী! তুমি ছিলে মুক্তাফলকেতু, আমি ছিলাম সংযতক!

ঠিক এই সময়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসেছিল পদ্মাবতী, প্রিয়তমকে ফের দেখবে বলে।

মুক্তাফলকেতু তার সামনে ছুটে গিয়ে সজল চোখে বললে, সব মনে পড়ে গেল। হে প্রিয়া, আমিই মুক্তফলধ্বজ। অভিশাপের ফলে এখন মানুষ।

আতীব্র অভিমানে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল পদ্মাবতী, কিন্তু রইল সেইখানেই।

এই ছিল, এই নেই! তবে কি তাকে পেয়েও হারালাম?

নিদারুণ মানসিক আঘাতে চেতনা লোপ পেল মুক্তাফলকেতুর। আছড়ে পড়ল মাটিতে।

শূন্যপানে চেয়ে বলেছিল বন্ধু, এই কি ছলনার সময় পদ্মাবতী? এত প্রতীক্ষার পর এই যে মিলন, এত দুঃখভোগের পর সুখময়ীর মুখদর্শ... পরক্ষণে, বাতাসে বিলীন হওয়া কি সমীচীন?

মুক্তাফলকেতু জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল এর মধ্যেই। বয়স্য তাকে বললে, অসুরকন্যাকে প্রত্যাখ্যান করার পাপের ফল শুরু হল। মনের মানুষ সামনে এসেও ধরা দিচ্ছে না।

অদৃশ্য অবস্থায় পদ্মাবতী তখন বলেছিল সখীদের, শুনলে তো? অসুরকন্যা দেখে মজেননি মুক্তাফলকেতু।

সখীরা বললে, কেন এসব হচ্ছে, তা কিন্তু ভুলে গেছ, পদ্মাবতী।

মুনি বর দিয়েছিলেন মুক্তাফলধ্বজকে, মানুষ হয়ে জন্মে অন্য কোনও নারীর প্রতি অনুরক্ত হবে না। তাই অসুরকন্যা তাঁকে বিয়ে করতে চাইলেও তিনি অনুরাগ দেখাতে পারেননি। আরও মনে করে দেখ, দেবপ্রভা নামে এক বিদ্যাধর কন্যাকে তুমি উপহাস করেছিলে মনের মতো স্বামী পাওয়ার জন্যে তপস্যা করছিল বলে। সেই মেয়েই তপস্যার জোরে মুক্তাফলকেতুকে স্বামীরূপে পেতে চেয়েছে, পাবেও, তোমার অমত এবার নিশ্চয় থাকবে না। না থাকলেই মুক্তাফলকেতুও তাকে ভালোবাসবে।

কেঁদে ফেলেছিল পদ্মাবতী, মিলনানন্দে। চলে গেছিল মেঘবর্ণ গৌরীদেবীর আশ্রমে, পূজো শেষ করার জন্যে।

মুক্তাফলধ্বজ বললে বন্ধুবর মহারুদ্ধিকে, চলো যাই আমরাও।

আশ্রমে যখন পক্ষিবিমান থেকে নামছে দুই বন্ধু, দেখে ফেলেছিল পদ্মাবতী আর সহচরীরা।

মনে পড়ে গেছিল পদ্মাবতীর। মুনির সেই শিষ্যকে শাপ দিয়েছিল, কামচারী বিমান হয়ে জন্মা মর্ত্যে।

তাই হয়েছে। সেই পক্ষিবিমান এখন মুক্তাফলধ্বজের বাহন! মুক্তাফলধ্বজ ইচ্ছে করলেই জন্মান্তরিত হঠকারী শিষ্য পাখিবিমান হয়ে এসে তার সেবা করে যাচ্ছে!

মুক্তাফলধ্বজ আর তার বন্ধু মহাবুদ্ধি কিন্তু দেখতেই পেল না পদ্মাবতী আর তার সখীদের। বিষণ্ণ মনে পাখিবিমানে চেপে গেল সিদ্ধীশ্বর ক্ষেত্রে, তাদের দর্শন পাওয়ার ইচ্ছায়। দেখতে পেল না সেখানেও।

তখন জ্যোৎস্নার আলোয় চারদিক ভেসে যাচ্ছে। নিজেকে অদৃশ্য রেখে পদ্মাবতী বললে মুক্তাফলধ্বজকে, যদিও তুমি আমার, কিন্তু অন্য দেহে রয়েছ বলে তুমি আমার কাছে পরপুরুষ, আমিও তোমার কাছে পরনারী।

সেই রাতেই আগুনে আত্মাহুতি দিল মুক্তাফলধ্বজ আর মহাবুদ্ধি, দেহ যখন অন্তরায় মিলন পথে, তখন যাক সেই দেহ।

পদ্মাবতীও গলায় দড়ি দিতে যখন যাচ্ছে, তখন সেই মহামুনি এসে তা আটকে দিলেন। বললেন, তোমাদের বিয়ে আসন্ন। এখন এ কাজ করো না।

মুনি প্রণাম শেষ করে চোখ তুলেই পদ্মাবতী দেখেছিল, আগের দেহ নিয়ে মুক্তাফলকেতু আর বয়স্য সংযতক দাঁড়িয়ে সামনে।

শাপমুক্ত এখন সকলেই।

শোকাচ্ছন্ন হলেন কিন্তু রাজা মেরুধ্বজ। ত্রৈলোক্যমালীর বড়ো মেয়ের সহসা মনে পড়ে গেল, আমিই তো সেই দেবপ্রভা, তপস্যা করছিলাম বলে পদ্মাবতী টিটকিরি দিয়েছিল। যার জন্যে তপস্যা, মনের মতো স্বামী সেই মুক্তাফলকেতু যখন পুড়ে মরলেন, তখন আমিও মরি পুড়ে।

অনলে আত্মাহুতি দিল তৎক্ষণাৎ। আগুনের দেবতা তাকে আগের দেহ ফিরিয়ে দিয়ে নিয়ে এলেন মুক্তাফলকেতুর সামনে।

বললেন, তপস্যার জোরে এই দেবপ্রভা তোমাকে পেয়েছে। আমি সাক্ষী, বিয়ে করো একে।

বিয়ে হয়ে গেল মুক্তাফলকেতুর সঙ্গে পদ্মাবতী আর দেবপ্রভার। ত্রৈলোক্যমালী ছোটো মেয়ের বিয়ে দিল মলয়ধ্বজের সঙ্গে। দুই বউ নিয়ে মুক্তাফলকেতু চলে গেল বিদ্যাধরলোকে।

দুই হাঁসের মখে সুদীর্ঘ এই কাহিনি শুনলেন রাজা ব্রহ্মদত্ত। স্মৃতি ফিরে এল। হঁস হয়ে যাওয়া শিবের দুই অনুচর বউ আর মন্ত্রীর সঙ্গে সিদ্ধীশ্বরে গিয়ে দেহত্যাগ করে আগের জন্মের মতো শিবের অনুচর হয়ে রইলেন।

গোমুখ বর্ণিত এই মহা-কাহিনি শুনিয়ে দিলেন নরবাহন দত্ত মামা গোপাল আর মুনিদের।

১২১. মদনলেখা কাহিনি

আর একদিন অসিত পাহাড়ের কশ্যপ আশ্রমে তাপস সভায় বসে নরবাহনদত্ত বললেন, দৈব সহায় হলে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে থাকে, এই বিষয়ে একটা কাহিনি মনে পড়ে গেল।"

একসময়ে মহেন্দ্রাদিত্য ছিলেন উজ্জয়িনীর রাজা। তাঁর রানির নাম ছিল সৌম্যদর্শনা। মন্ত্রী ছিলেন সুমতি, সেনাপতির নাম বজ্রায়ুধ।

কিন্তু ছিলেন নিঃসন্তান। ফলে, কাজকর্ম ছেড়ে সবসময়ে শিবের পুজো করে যেতেন।

আর ঠিক এই সময়ে দেবতারা দল বেঁধে কৈলাসে গিয়ে আবেদন জানিয়েছিল মহাদেবকে, আপনি যেসব অসুরকে সংহার করেছেন, তারা এখন মর্ত্যে গিয়ে ম্লেচ্ছ হয়ে বড়ো উৎপাত করছে। যজ্ঞ করা যাচ্ছে না। ম্লেচ্ছ নিধনের একটা ব্যবস্থা করুন।

শিবঠাকুর কথা দিলেন, কিছু একটা করবেন।

দেবতারা চলে যেতেই মাল্যবান অনুচরকে তলব করলেন মহাদেব।

বললেন, যাও পৃথিবীতে। উজ্জয়িনীর রাজা মহেন্দ্র দাদিত্যের ছেলে হয়ে জন্মাও। ওই রাজার মধ্যে আছে আমার অংশ, ওর বউ সৌম্যদর্শনার মধ্যে আছে আমার বউ পার্বতীর অংশ। তাই তুমি ওদের ছেলে হয়ে দেবতাদের কাজই করে যাবে। যেসব পাপিষ্ঠ ম্লেচ্ছরা বেদের ধর্ম নষ্ট করছে, ধার্মিক মানুষদের ওপর অত্যাচার করছে, তুমি তাদের নিকেশ করবে। আমার ইচ্ছায় তুমি হবে পৃথিবীর অধীশ্বর, একচ্ছত্র সম্রাট।

যক্ষ, রাক্ষস আর বেতালেরা তোমার হুকুম শুনে চলবে। কাজ শেষ করে, মনুষ্যলোকের সমস্ত সুখ ভোগ করে, ফিরে আসবে আমার কাছে।

মাল্যবান অনুচর বললে, আপনার আদেশ মাথা পেতে নিলাম। প্রার্থনা এখন একটাই : মানুষভাবে থাকলে বন্ধু থাকে না, ধন সম্পদও থাকে না, দুটোই চঞ্চল, কিন্তু সদাসঙ্গী তো রোগভোগ, দারিদ্র্য আর গরিব থাকার যন্ত্রণা। আপনি এমন ব্যবস্থা করুন, যাতে এই সব কষ্ট আমার না থাকে। কৈলাসের এত সুখ থেকে গিয়ে মর্ত্যের এত দুঃখ যে প্রাণান্তকর হবে।

প্রসন্নস্বরে মহাদেব বললেন, এ রকম কোনও দুঃখকষ্ট তুমি পাবে না।

সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল মাল্যবান।

এসে গেল রানি মৌমদর্শনার গর্ভে।

স্বপ্নে রাজাকে দর্শন দিয়ে শিবঠাকুর বলে দিলেন, তোমার ছেলে হবে। সেই ছেলে সপ্তদ্বীপেরজ্ঞ সম্রাট হবে। যক্ষরক্ষ তার পদতলে থাকবে, হুকুমের দাস হবে। পৃথিবীর উৎপাত ম্লেচ্ছবিনাশ সে করবে। তার নাম রাখবে বিক্রমাদিত্য। সে আর একটা নামে সুপ্রসিদ্ধ হবে সেই নাম বিক্রমশীল, কারণ, তার বিক্রমে দিশেহারা হয়ে যাবে শত্রুরা।

স্বপ্নের কথা মন্ত্রীদের গোচরে আনলেন রাজা।

এমন সময়ে অন্তঃপুর থেকে দাসী এসে একটা ফল দিল রাজাকে। গতরাতে স্বয়ং মহাদেব স্বপ্নে এসে এই ফল দিয়ে গেছেন রানিকে।

খুশি সবাই। যাক, এবার তাহলে ছেলে হবে রাজার!

হল ছেলে যথাসময়ে। তার নাম রাখা হল বিক্রমাদিত্য।

কিছুদিন পরে রাজার পুরোহিত, মন্ত্রী আর সেনাপতিরও হল একটি করে ছেলে। তাদের নাম রাখা হল যথাক্রমে মহামান, শ্রীধর আর ভদ্রায়ুধ। রাজপুত্রের সঙ্গীরূপেই তারা বড়ো হল। শিক্ষা পেল। যথাসময়ে রাজকন্যাদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হল রাজপুত্র বিক্রমাদিত্যের।

'সপ্তদ্বীপের মেদিনী' বহু জায়গায় বলা হয়েছে। কিন্তু 'জম্বুদ্বীপ' ছাড়া বাকি দশটি দ্বীপের নাম পাওয়া গেছে এই : নারিকেল দ্বীপ, কটাহ দ্বীপ, কর্পূর দ্বীপ, সুবর্ণ দ্বীপ, সিংহল দ্বীপ, উৎস্থল দ্বীপ (ধীবরদের স্বর্ণ দ্বীপ?), রত্নকূট দ্বীপ, চিত্রকূট (দেশ) দ্বীপ, শ্বেত দ্বীপ, হংস দ্বীপ। জম্বুদ্বীপকে ধরলে মোট 11টা দ্বীপ! দ্বীপময় ভারতের দ্বীপের সংখ্যা সেকালে কি সঠিক হিসেবে ছিল না?

বৃদ্ধ বয়েসে রাজা মহেন্দ্রাদিত্য রানিকে নিয়ে বনবাসে চলে গেলেন, রাজ্যভার দিয়ে গেলেন বিক্রমাদিত্যকে।

রাজসভায় একদিন বসে আছেন রাজা বিক্রমাদিত্য, দৌবারিক ভদ্রায়ুধ এসে বললে, সেনাপতি বিক্রমশক্তিকে পাঠিয়েছিলেন দক্ষিণ দেশ জয় করতে। তার দূত অনঙ্গদেব এসেছে।

তাকে আসতে আজ্ঞা করলেন বিক্রমাদিত্য।

দূত অনঙ্গদেব এসে বললে, পশ্চিম দক্ষিণ মধ্যদেশ সুরাট বঙ্গ অঙ্গ কলিঙ্গ আর কাশ্মীরের সঙ্গে উত্তর দিকের ভূটান, নেপাল, তিব্বতও কী জয় করেছিলেন বিক্রমাদিত্য? ভারতের উত্তরে তো এই এই সব দেশ। আপনার অধীনে এনেছেন সেনাপতি বিক্রমশক্তি। অধীনস্থ রাজাদের নিয়ে আপনার কাছেই আসছেন, দুই থেকে তিনদিনের মধ্যে এসে যাবেন।

খুশি হলেন বিক্রমাদিত্য। শুধোলেন, অনঙ্গাদেব, অনেক দেশ তো দেখলে। আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছু দেখেছ?

অনঙ্গদেব বললে, তা দেখেছি বইকি"

উৎসুক হলেন রাজা বিক্রমাদিত্য।

আশ্চর্য কাহিনি আরম্ভ করল অনঙ্গদেব।

সিংহলের রাজার এক দূত এল একদিন সেনাপতি বিক্রমশক্তির কাছে। বললে, দূত অনঙ্গদেবকে আমাদের রাজার কাছে পাঠানো হোক। তাকে জানানো হবে এমন একটা বিষয় যা আখেরে রাজা বিক্রমাদিত্যর ভালো করবে।

গেলাম সিংহলের দূতের সঙ্গে। ঢুকলাম সোনা দিয়ে গড়া সিংহল পুরীতে। এলাম সিংহলের রাজা বীরসেন-এর সামনে।

মন্ত্রীদের সামনেই তিনি বললেন, আমার মেয়ের মতো রূপসী মেয়ে স্বর্গ মর্ত্য পাতালে নেই। আমি চাই তার যোগ্য স্বামী হোন রাজা বিক্রমাদিত্য।"

উপযুক্ত প্রস্তাব। উদ্দেশ্য অতীব পরিষ্কার। শ্বশুরের দেশে তাহলে আর সৈন্য পরিচালনা করবেন না রাজা বিক্রমাদিত্য। মেয়ের বিয়েও হল, জামাইকে দোসর পাওয়া গেল।

সিংহল রাজ মেয়েকে পরিজনসহ আমার পেছনেই রওনা করিয়ে দিলেন। সঙ্গে এল তাঁর রাজদূত ধবলসেন।

জাহাজে চেপে সমুদ্রের ওপর দিয়ে আসবার সময়ে অদ্ভুত সুন্দর একটা দ্বীপ দেখতে পেলাম। দ্বীপে রয়েছে অপরূপা দুটি মেয়ে। একজন কালো, আর একজন ফর্সা। একটা মণিময় সেনার হরিণকে তারা হাততালি দিয়ে দিয়ে নাচাচ্ছে।

অবাক হলাম। চক্ষুভ্রম নাকি? নাকি, মায়ার খেলা? দিকহীন এই সমুদ্রে দ্বীপ এল কোত্থেকে? সেই দ্বীপে এমন দুই সুন্দরী, আর সোনার জ্যান্ত হরিণ, একী সত্য? না, মরীচিকা?

হঠাৎ ধেয়ে এল পাগলা ঝড়। খান খান করে দিল আমাদের জাহাজ, আমরা দুই দূত কোনোরকমে গিয়ে উঠলাম দ্বীপে। আর সবাই গেল ভেসে।

সেই সাদা সুন্দরী আর কালো সুন্দরী আমাদের জল থেকে টেনে তুলে নিয়ে গেল একটা গুহায়। গোটা দ্বীপ তখন জলমগ্ন। নাচিয়ে স্বর্ণহরিণকেও আর দেখতে পেলাম না।

গুহার মধ্যে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম প্রকাণ্ড একটা বাগান দেখে।

বাগান দেখে যখন চক্ষু চড়কগাছ, সেইটুকু সময়ের মধ্যে সেই রহস্যময়ী মেয়েদুটি অদৃশ্য হয়ে গেল। দ্বীপ আর সাগরের চিহ্নমাত্রও, কোত্থাও দেখলাম না।

যেন মায়ামুগ্ধ হয়ে এদিকে সেদিকে ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পেলাম একটা প্রকাণ্ড দীঘি। সুন্দর দীঘি সুন্দরতর হয়েছে স্নানরতা এক সুন্দরীর স্নানদৃশ্যে। মোহন-স্নান সমাপনান্তে তিনি পদ্মফুল দিয়ে শিবপুজো করতে বসলেন। পুজোর পর বীণা বাজিয়ে শিবের স্তবগান গাইলেন। সেই বীণাবাদন আর মধুর গান শুনে আকাশ থেকে নেমে এলেন আকাশিক সিদ্ধসত্তারা। সবই যেন পটে আঁকা ছবির মতো মনে হয়েছিল।

গান শেষ হল। শিবঠাকুরকে বিসর্জন ছিলেন শ্রীমতি সঙ্গে সঙ্গে আসন ত্যাগ করে রওনা হলেন সস্থান অভিমুখে, পরিচারিকাদের সঙ্গে নিয়ে। বারে বারে জিজ্ঞেস করলাম তাঁদের পরিচয়, কিন্তু জবাব দিল না কেউই—মুখে চাবি দিয়ে রইল পরিচারিকারও।

তখন মাথায় এল একটা বুদ্ধি। এক ঢিলে দুপাখি মারা যাক। রাজা বিক্রমদিত্যর নাম শুনলে পাথরও নড়ে বসে। এহেন নামের চমক দেখিয়ে চমকে দেওয়া যাক সিংহলের দূতকে, আর ওই ইচ্ছে বোবা রমণীদের পিলে চমকে দিয়ে মুখে বোল ফোটানো যাক!

শ্রীমতীকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, রাজা বিক্রমাদিত্যর আজ্ঞা, আত্মপরিচয় না দিয়ে যাবেন না।

অমনি সেই গর্বিনী রমণী ঘুরে চলে এলেন আমার সামনে। হাসিমুখে বললেন, আরে, অনঙ্গদেব যে! ভালো আছেন রাজা বিক্রমাদিত্য?"

আমি দূতিয়ালি চালে বললাম—আপনার তো অজানা নয়। আপনি তো সর্বজ্ঞ, মায়াময়ী।

কুন্তদন্ডে ঝিলিক তুলে বললে অপরূপা, তাতো বটেই। মায়াবিদ্যার জোরেই তোমাদের এনে ফেলেছি এই মায়াপুরে। রাজা বিক্রমাদিত্য আমার পরম মাননীয়, আমি তার রক্ষাকর্ত্রীও বটে। এস আমার আলয়ে। আমি কে, কেন রাজা আমার মাননীয়, আর এখন কী করা উচিত, সব তোমাকে বলবো।

গেলাম সেই আশ্চর্য মায়াবিনীর মায়াপুরে। শয়ে শয়ে দেহরক্ষীরা মোতায়েন সেখানকার অলিন্দ, বাতায়ন, দ্বারপথে। পৌঁছোলাম ভেতরে। রূপসী রমণীরা হাসিমুখে আমাদের দুজনকে স্নান করিয়ে, বিবিধ অনুলেপনে শরীর শীতল স্নিগ্ধ করে দিয়ে, বিশ্রামের আয়োজন করে দিল।

১২২. মদনমঞ্জরী কাহিনি

খাওয়াদাওয়া শেষ হতেই সেই আশ্চর্য সুন্দরী এল আমাদের কাছে, সখীদের নিয়ে। রূপসী রঙ্গিনীদের সে এক বিচিত্র সমাবেশ।

সেরা সুন্দরী চোখে মুখে ঠোঁটে বুকে রূপের জলুস ছড়িয়ে ছড়িয়ে বলে গেল, অনঙ্গদেব, আমি কুবেরের ভাই মণিভদ্রের বউ, যক্ষপতি দুন্দুভির মেয়ে, আমার নাম মদনমঞ্জরী।

এইভাবেই শুরু হল মদনমঞ্জুরীর বিচিত্র উপাখ্যান।

মদনমঞ্জুরী স্বামী মণিভদ্রের সঙ্গে নানা জায়গায় টহল দিয়ে বেড়াত। যত্রতত্র ভ্রমণের ক্ষমতা যার কাছে, সে তো স্বামীকে নিয়ে বেড়াবেই।

একদিন গেছিল উজ্জয়িনীর প্রখ্যাত মকরন্দ বাগিচায়। স্বামীর সঙ্গে অনেক ছুটোছুটির পর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল এক জায়গায়।

ঘুমন্ত রূপসীর রূপ আতীব্র কামনা জাগিয়ে দিয়ে গেছিল এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর অণুপরমাণুতে।

শ্মশান হোম শুরু করেছিল মদনমঞ্জুষাকে বধূরূপে পাওয়ার যাচ্ঞা নিয়ে।

মদনমঞ্জরী তা টের পেয়েছিল। অপরের মনের কথা জানবার বিদ্যা তার আছে। একেই বলে মনপঠন বিদ্যা।

বলেছিল স্বামী মণিভদ্রকে। মণিভদ্র ব্যাপারটা খোদ কুবেরের কানে তুলে দিয়েছিল। কুবের গিয়ে ব্রহ্মার কান ভাঙিয়েছিল।

ব্রহ্মা বলেছিলেন, মদনমঞ্জুষাকে হরণ করার ক্ষমতা আছে ওই তান্ত্রিকের। মন্ত্রশক্তিতে বলবান। মন্ত্র পড়ে মদনমঞ্জুষাকে যখন ডাকবে, সে যেন চেঁচিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যকে ডাকতে থাকে। তাহলেই মন্ত্রশক্তি ব্যর্থ হবে।

নিশুতি রাতে মন্ত্রপাঠ শুরু করেছিল তান্ত্রিক। প্রচণ্ড আকর্ষণে ছটফটিয়ে শ্মশানে ঠিকরে গেছিল মদনঞ্জুরী।

তান্ত্রিক তখন স্নান করতে গেছিল নদীতে। শিকার তো মুঠোয়।

আর ঠিক তখনই ব্রহ্মার উপদেশ মনে পড়েছিল মদনমঞ্জুরীর। এতক্ষণ অবশ হয়েছিল মন।

এবার কাঁদতে কাঁদতে ডেকেছিল রাজা বিক্রমাদিত্যকে, বাঁচান, আমাকে বাঁচান! বদমাস সন্ন্যাসী আমার ধর্ম নষ্ট করতে চাইছে!

সঙ্গে সঙ্গে দেখেছিল রাজা বিক্রমাদিত্যকে। মদনমঞ্জুষাকে অভয় দিয়েছিলেন অগ্নিশিখা নামে এক বেতালকে ডেকেছিলেন। এসেছিল বিকটাকার বেতাল। রাজা তাকে হুকুম দিয়েছিলেন, বদমাস তান্ত্রিকটাকে আগে মারো, তারপর খাও।

তান্ত্রিক যে মড়ার ওপর বসে তন্ত্রক্রিয়া করেছিল, বেতাল সাঁ করে ঢুকে গেল তার মধ্যে। স্নান সেরে তান্ত্রিক ফিরে আসতেই তার দুই উরু দুহাতে ধরে, শূন্যে তুলে কয়েক পাক মাথার ওপর ঘুরিয়ে নিয়ে দুমাস করে এক আছাড়েই প্রাণবায়ু শূন্যে মিলিয়ে ছিল।

খেতে যাচ্ছে, এমন সময়ে চলে এল আর এক বেতাল। তার নাম যমশিখ। তান্ত্রিকের মড়া ধরে সে টান মারতেই আগের বেতাল অগ্নিশিখা বললে, কোথাকার আপদ রে! আমি মারলাম তান্ত্রিককে রাজা বিক্রমাদিত্যর হুকুমে, খাবো তো আমি, তুই কে?

... এক আছাড়েই প্রাণবায়ু শূন্যে মিলিয়ে ছিল।

সগর্জনে উটকো বেতাল যমশিখ বললে, কে বিক্রমাদিত্য? তার শক্তির পরিচয়টা আগে শুনি। তারপর বোঝা যাবে কে খাবে তান্ত্রিকের মড়া।

হুঙ্কার ছেড়ে বললে অগ্নিশিখা, তবে শোনো জুয়াড়ির গল্পটা।

সেই জুয়ো খেলোয়াড়ের নাম ছিল ডাকিনেয়। অনেক আগে থাকত ওই শহরে। জুয়ো খেলেই হারাল সর্বস্ব। অথচ বিস্তর দেনা মেটাতে হবে। পয়সা কোথায়? কানাকড়িও তো নেই!

দলে ভারি অন্য জুয়ো খেলোয়াড়রা তখন তাকে মারতে মারতে ফেলে দিল একটা গভীর ভীষণ কুয়োর মধ্যে।

ভেবেছিল, মারের চোটে পটল তুলেছে ডাকিনেয়।

কিন্তু সে মরেনি। জ্ঞান হারিয়েছিল। মনে হচ্ছিল মড়া।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখল, কুয়োর মধ্যে বসে রয়েছে দুটো লোক। মধুর বচনে তারা শুধাল ডাকিনেয়কে, কে গা তুমি? শুকনো কুয়োয় ঝাঁপ দিলে কেন?

ডাকিনেয় তখন খুলে বলল সব কথা। ঝাঁপ সে দেয়নি। মারতে মারতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তারপর জিজ্ঞেস করেছিল, তোমরা কে? কী করছ এখানে?"

লোকদুটো তখন বললে তাদের কাহিনি।

আমরা শ্মশানে থাকি। আমরা ব্রহ্মরাক্ষস। এই রাজ্যের দুই মন্ত্রীর মেয়ে দুটো ভারি সুন্দরী। দেখে লোভ হয়েছিল। ধরে নিয়ে এসেছিলাম। রাজা খবর পেলেন। রেগে টং হয়ে এখানে এলেন। আমরা মেয়েদের

ফেলেই চম্পট দিতে গেছিলাম। কিন্তু পারিনি। রাজা আমাদের চেয়ে বেশি শক্তিমান। আমাদের ধরলে, বেঁধে ফেললেন।

কিন্তু আমাদের কান্নাকাটি শুনে দয়া করলেন। প্রাণে মারলেন না। এক বছর এই কুয়োয় থাকতে বলে গেলেন।

এই রাজা সাধারণ মানুষ নন। দিব্যশক্তির অধিকারী। সেই শক্তির জোরে কুয়ো ছেড়ে বেরোতেই পারি না।

এক বছর হতে বাকি আর মোটে আটটা দিন। তাহলেই ফুরোবে শাস্তির মেয়াদ। এই আটটা দিনের খাবার যদি জুগিয়ে যাও, তাহলে তোমাকে বের করে নিয়ে যাব কুয়ো থেকে আটদিন পর। আর যদি খাবার না দাও, তোমাকেই খাবার করে খেয়ে নেব।

ডাকিনেয় রাজি হয়ে গেল এই প্রস্তাবে। কিন্তু খাবার খুঁজতে গেলে কুয়োর বাইরে যেতে হবে তো?

ব্রহ্মরাক্ষসেরা নিজেদের অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করে তাকে বের করে দিল গভীর কুয়োর বাইরে, রীতিমতো ভয় দেখিয়ে। খাবার আনবার নাম করে ডাকিনেয় যদি পালায়, তাহলে আটদিন পরে নির্ঘাৎ মরবে। ব্রহ্মরাক্ষস দুজন কুয়ো থেকে মুক্তি পেয়েই ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাবে।

ওরে বাবা! পালাবার কথা মাথায় না রেখে নরমাংসের খোঁজে শ্মশানে গেল ডাকিনেয়, কুয়ো থেকে সাঁ করে বেরিয়ে এসেই।

গিয়ে দেখল তার পুরোনো শত্রু দাঁড়িয়ে শ্মশানে। সেই জুয়ো খেলোয়াড়। মহামাংস বেচছে হেঁকে হেঁকে।

ডাকিনের বলল তাকে, অত চেঁচিও না। আমি কিনব নরমাংস। দাম কী দেব?

টাকাকড়ি চাই না, চাই তোমার চোখ ঝলসানো রূপ আর মানুষের মন জয় করার ক্ষমতা, তোমার প্রভাব। এই পেলেই পাবে মহামাংস।

ডাকিনেয় বললে, আমার রূপ আর মানুষের মন জয় করার ক্ষমতা নিয়ে করবে কি?

তারা বললে, তোমার উপকার করব।

কীভাবে?

তোমার পুরোনো শত্রুদের বশ করব। টেনে আনব। তোমাকে দেব। তুমি ব্রহ্মরাক্ষসকে দিয়ে তাদের খাওয়াবে।

ডাকিনেয় রাজি হয়ে গেল এহেন উত্তম প্রস্তাবে।

এই ব্যবস্থাই চলল পর পর সাতদিন। ডাকিনেয়র রূপ আর প্রভাব নিজের মধ্যে গ্রহণ করে সেই ওস্তাদ জুয়াড়ি পর পর সাতদিন সাত শত্রু জুয়াড়িকে ধরে এনে ডাকিনেয়কে দিয়ে খাইয়ে দিন ব্রহ্মরাক্ষস দুজনকে।

আর বাকি একটা দিন। ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে দুই ব্রহ্মরাক্ষসের। এদিকে শত্রু জুয়াড়িও সব নিকেশ। আর একদিনের আহার যে বাকি!

ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ডাকিনেয় বললে ওস্তাদ জুয়াড়িকে, কি করি বলোতো? আর খাবার কোথায়?

ধড়িবাজ জুয়াড়ি বললে, ভাবনা কী? আমি যাচ্ছি। চলো, চলো। আজ আমিই খাবো দুই ব্রহ্মরাক্ষসকে, তোমার জন্যে।

গেল সে ডাকিনেয়র সঙ্গে কুয়োর পাড়ে। দুজনে হেঁট হয়ে যখন তাকিয়ে কুয়োর গভীরে, তখন আচমকা ডাকিনেয়কে ধাক্কা দিয়ে কুয়োর ভেতরে ফেলে দিল ধূর্ত জুয়াড়ি।

আচমকা ঘাড়ের ওপর একটা লোক আছাড় খেয়ে পড়তেই ব্রহ্মরাক্ষস ভেবেছিল, নতুন খাবার এসেছে। খাওয়া যাক। অন্ধকারে চিনতে পারেনি ডাকিনেয়কে।

ডাকিনেয় প্রাণের ভয়ে, নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে, মরিয়া হয়ে লড়ে গেছিল দুই ব্রহ্মরাক্ষসের সঙ্গে। কুয়োর সংকীর্ণ পরিসরে ডাকিনেয় সর্বশক্তি প্রয়োগ করে মেরে পাট করে দিয়েছিল তাদের। তারা হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল, আর না। আর না। লড়াই বন্ধ! কিন্তু তুমি কে হে? মস্ত লড়াকু তো!

ডাকিনেয় দিল আত্মপরিচয়। বলল ওস্তাদ জুয়াড়ির শঠতার কথা।

ভাব হয়ে গেল ডাকিনেয়র সঙ্গে দুই, ব্রহ্মরাক্ষসের। তারা বুঝিয়ে বললে ডাকিনেয়কে, বন্ধু হে, ধূর্তরা এই রকমই হয়। তাদের সঙ্গে মিত্রভাব রাখতে নেই। তারা ঠকাবেই। এরা উপকার মনে রাখে না। নিষ্ঠুরতা এদের স্বভাব। এদের বিশ্বাস করতে নেই। এই বিষয়ে একটা গল্প শোনাই শোনো।

অনেক আগে এক কুখ্যাত জুয়ো খেলোয়াড় থাকত এই উজ্জয়িনী নগরে। তার নাম ঢিণ্ডাকরাল। রোজই সে জুয়োয় হেরে যেত, পকেটে কানাকড়িও থাকতো না। মুখ চুন করে যখন বসে থাকত, তখন অন্য জুয়ো খেলোয়াড়রা, যারা তাকে হারিয়ে ট্যাঁক খালি করে দিয়েছে, দয়া করে সন্ধ্যে নাগাদ তাকে দিত মাত্র একশো কড়ি। সেই কড়ি দিয়ে কিনত একটু গম। ভাঙা মাটির পাত্রে জল দিয়ে মেখে ঠেসে নিত। শ্মশানে গিয়ে চিতার আগুনে সেঁকে রুটি বানাত। মহাকালের মন্দিরে গিয়ে ঘি চুরি করত পিদিম থেকে। রুটিতে মাখিয়ে নিয়ে খেত। তারপর মন্দিরের পাশে হাতে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

একদিন ঘুমের আগে একদৃষ্টে চেয়েছিল মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ পাথরের মূর্তিগুলোর দিকে। সবই তো নাচিয়ে গাইয়ে মেয়েদের মূর্তি। এছাড়াও, যক্ষ আর দেবগণের মূর্তি। সেই রাতে অপলকে নারীমূর্তিদের দেখতে দেখতে হঠাৎ মাথায় এল একটা কুবুদ্ধি।

প্রস্তর নর্তকীদের ডাকতে লাগল, এস, এস, এক হাত পাশা খেলে যাও। শর্ত একটাই : হেরে গেলেই পণ দিতে হবে তৎক্ষণাৎ। ধারবাকি ফেলা যাবে না।

হেঁকে হেঁকে পাথরের পুতুলদের জুয়ো-দ্বন্দ্বে আহ্বান জানিয়ে নিজেই কড়ি চেলে দিত প্রতিপক্ষের অপেক্ষায় না থেকে। জুয়াড়ি তো! নেশা বড়ো সর্বনাশা!

পাকা জুয়াড়ি বলেই সে জানত, জুয়ো শাস্ত্রের নিয়ম কানুন। জুয়ো যুদ্ধে আহ্বান জানানোর পর যদি আহূত প্রতিপক্ষ চুপ করে থাকে, তাহলে জুয়োয় যে বাজি ধরা হয়, সেই বাজি অর্থাৎ পণ প্রতিপক্ষের বাজি অথবা পণ বলেই গণ্য করে নেওয়া হয়।

এখন, কপালক্রমে, কড়ি পড়ল এমনভাবে যে বাজিমাত এক চালেই। জিত হল ঢিণ্ডাকরালেরই। বাজি ধরেছিল বিস্তর সোনার টাকা। সেইসব স্বর্ণমুদ্রা এখন তারই প্রাপ্য। যদিও খেলাটা হয়েছে পাথরের নিঃসাড় নির্বাক যক্ষ-যক্ষিণী নর্তক-নর্তকীদের সঙ্গে।

হোক পাথরের মূর্তি, হেরেছে তো। সুতরাং দ্যূতশাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী পণের সুবর্ণমুদ্রা এখন ঢিণ্ডাকরালের প্রাপ্য।

বিষম উল্লাসে হেঁকে হেঁকে বলেছিল পাথরের পুতুলদের, দাও হে, সোনার টাকা চালো এবার। হেরে তো গেলে। পাথর কি কথা কয়? সুতরাং জবাব এল না।

এইবার ঢিণ্ডাকরাল গেল ক্ষেপে, হেরে ভূত হয়েও এখন বোবা হয়ে থেকে ফাঁকি দিতে চাও? পাথর হয়ে থেকে পার পেয়ে যাবে ভেবেছো? করাত-ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে ভাঙব তোমাদের।

বলেই, ইস্পাতের ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে প্রস্তরমূর্তিদের দিকে ধেয়ে গেছিল জুয়োপাগল ঢিণ্ডাকরাল।

এইবার চৈতন্য হয়েছিল দেবমন্দিরের দেব পুতুলদের। পাথরের পুতুল হতে পারে তা, কিন্তু দৈবপ্রভাবে সব্বাই তো প্রাণময়। মন্দিরের পুতুল যে। প্রাণ বিরাজমান সেখানকার প্রতিটি ধূলিকণায়।

সুতরাং, দূতশাস্ত্রের বিধান তারা মেনে নিয়েছিল দৈবী কৃপায়। নিমেষে শূন্য হতে এনে ফেলেছিল অজস্র কাঞ্চন মুদ্রা!

উল্লসিত ঢিণ্ডাকরাল তখন সুখনিদ্রায় কাটিয়েছিল সমস্ত রাত। সকাল হতেই রাশি রাশি সোনার টাকা নিয়ে গেল জুয়োর আড্ডায়। মোটা মোটা বাজি ধরে গেল পাকা পাকা জুয়াড়িদের পথে বসাবে বলে।

কিন্তু ফের পথে বসল নিজেই। হারল সর্বস্ব। একখানা কাঞ্চনমুদ্রাও আর রইল না কাছে।

ফের রাতে এল সেই মন্দিরে। আবার হেঁকে হেঁকে জুয়ো খেলায় ডাক দিয়ে গেল ঢিন্ডাকরাল। দ্বন্দ্বযুদ্ধ তো! না খেললে হার স্বীকার করতে হবে। হেরে গেলে পণ দিতেই হবে। সুতরাং প্রস্তর মূর্তিরা রাশি রাশি

সোনার টাকা স্তূপাকারে রেখে দিয়ে নিজেরা রইল পাথর হয়ে। সেই সুবর্ণ স্তূপ জুয়োর আড্ডায় নিয়ে গিয়ে যথারীতি উড়িয়ে এল চিন্তাকরাল।

এইভাবেই চলল রাতের পর রাত, দিনের পর দিন। ঢিণ্ডাকরালের সোনা এখন অফুরন্ত, আর দেদার সোনা জমিয়ে গেল ওস্তাদ জুয়াড়িরা।

পাথরের মেয়েরা কত আর সইবে? চামুণ্ডা দেব তাদের প্রার্থনা শুনলেন। বুদ্ধি দিলেন।

আর একটা জুয়োর নিয়ম শিখিয়ে দিলেন পাথরের পুতুলদের! বললেন, জুয়োয় যদি কেউ খেলতে ডাকে, তখন যদি বলা হয়, আমি নেই এই জুয়োয়, তাহলে যে ডাক দেয় জুয়ো খেলতে, তাকে তা মেনে নিতে হয়। তোমরা তাই বলবে। এতদিন বোবা হয়ে থেকেছ। চুপ করে থাকা তো মেনে নেওয়া। এখন আর তা করবে না। বলবে, খেলব না।

সেইমতো সেইরাতে পাথরের পুতুলরা সাফ বলে দিল ঢিন্ডাকরালকে, আমরা নেই এই জুয়োয়।

ক্ষিপ্ত ঢিণ্ডাকরাল তখন দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাল স্বয়ং মহাকালকে।

মহাকালও সটান জবাব দিলেন একই কথায়।

এই ঘটনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল একটা ব্যাপার। দুর্জনদের ভয় পান দেবতারাও।

কিন্তু ঢিণ্ডাকরাল যে আরও সোনার টাকা চায়। জুয়োর ফাঁদে আর যখন পা দিচ্ছে না পাথরের দেবদেবী নর্তক-নর্তকীরা, তখন খোদ শিবের পায়ে পড়া যাক।

তৎক্ষণাৎ সাষ্টাঙ্গে শিবপ্রণাম স্তব শুরু করে দিয়েছিল স্বর্ণলোভী ঢিণ্ডাকরাল।

স্তোত্রের অর্থ এই : হে দেবাদিদেব মহেশ্বর, দেবী পার্বতী আপনাকেও জুয়োয় হারিয়ে আপনার ষাঁড়, বাঘের ছাল আর চাঁদের কলা কেড়ে নিয়েছিলেন। আপনি তখন কী করেছিলেন? দিগম্বর হয়ে বসেছিলেন হাঁটুতে মাথা রেখে। আমি প্রণাম করছি আপনার সেই দিগম্বর মূর্তিকে। আপনি মহেশ্বর, মহা ঈশ্বর, আপনার ইচ্ছাতেই সব দেবতারা ঐশ্বর্য পেয়ে থাকেন, আপনি নিজে কিন্তু সমস্ত কামনা-বাসনা মুক্ত হয়ে সারা গায়ে ছাই মেখে বসে থাকেন। তাহলে এই অধমকে স্বর্ণ দিতে বাধা সৃষ্টি করছেন কেন? আপনার সঙ্গে আমার মিল আছে বিস্তর। আমিও শ্মশান ভস্ম মেখে থাকি, শ্মশান-আগুনে রুটি সেঁকে খাই, মড়ার খুলিতে জলপান করি। সুতরাং আমাকে দয়া করুন। ধূর্ত জুয়াড়িদের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মতো স্বর্ণবল আমাকে দিন।

তুষ্ট হলেন আশুতোষ অর্থাৎ মহাদেব। বর দিলেন পাপিষ্ঠ, ঢিণ্ডাকরালকে, ভোগে থাক।

সেই থেকে বিবিধ ভোগ আর ঐশ্বর্য গড়িয়ে গেল ঢিণ্ডাকরালের পায়ের তলায়। গড়াগড়ি দিয়ে গেল ঢিণ্ডাকরাল নিজেও। এত ভোগ কি ছাড়া যায়?

এক রাতে কয়েকজন অপ্সরা এল মহাকাল তীর্থে স্নান করতে।

মহাদেব তাকে একটা মজার খেলা শিখিয়ে দিলেন। রমণী ভোগের মহাখেলা।

বললেন, ওহে সম্ভোগপ্রিয় ঢিণ্ডাকরাল, যাও, ওই দিগম্বরীদের বস্ত্র অপহরণ করো। তীরে রেখেছে পরিধেয়, জলে নেমেছে দিগবসনা হয়ে। এই তো সুযোগ। মেতে যাও ভোগের খেলায়। লোপাট করো সব শুকনো কাপড়। মেয়েরা কাকুতিমিনতি যখন করবে, তুমি কাপড় দিতে চাইবে একটি মাত্র শর্তে : কলাবতী মেয়েটাকে দিতে হবে তোমাকে সম্ভোগ সুখ দেওয়ার জন্যে।

মহাদেবের কূটবুদ্ধি তো মন্দ নয়!

আসলে, মহাদেব যে জানতেন, দেবরাজ ইন্দ্র একদা রেগে টং হয়ে অপ্সরা অলম্বুষের মেয়ে রূপসী কলাবতীকে শাপ ঝেড়েছিলেন, মর্ত্যের মানুষ তোকে রমণে আনন্দ দেবে, যা তুই চাস। আমার ওপর মেজাজ দেখানোর এই তোর শাস্তি।

সুতরাং এক ঢিলে দুপাখ মারলেন সর্বজ্ঞ দেবাদিদেব। নগ্নাদের চাপ দিয়ে কলাবতীকে আদায় করল ঢিণ্ডাকরাল।

মহাদেব তাকে প্রাসাদ আর ভোগবাসনার সমস্ত জিনিস বানিয়ে দিলেন।

ঢিণ্ডাকরাল কলাবতীকে সারা রাত ভোগ করত। দিনে ছেড়ে দিত। কলাবতী তখন যেত স্বর্গে, ইন্দ্রকে সুখ দিতে।

একদিন বলেছিল ঢিণ্ডাকরালকে, ভাগ্যিস ইন্দ্র রেগেছিলেন আমার ওপর, তাই তো আপনাকে পেলাম।

ঢিণ্ডাকরাল জানতে চেয়েছিল ইন্দ্রের রাগের কারণ।

কলাবতী বলেছিল, নন্দনের বাগানে একদিন আমি বলে ফেলেছিলাম, দেবতারা মেয়েদের উপভোগ করে শুধু দেখে, আর মানুষ উপভোগ করে চেখে। তাইতেই রেগে গিয়ে দেবরাজ বলেছিলেন, তবে যা, মর্ত্যের মানুষদের দিয়ে তোর শরীরের সুখ নে।

ঢিণ্ডাকরাল চোখ কপালে তুলে বললে, ভাগ্যিস ইন্দ্র রেগেছিলেন।

চোখ নাচিয়ে কলাবতী স্বামী সোহাগ দেখিয়ে বলেছিল, কাল কিন্তু স্বর্গ থেকে ফিরতে একটু দেরি হবে গো। ছটফট করবে না।

কেন দেরি হবে?

রম্ভা একটা নতুন কৌশলের নাচ নাচবে। দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত। শিখে নিয়ে সেই নাচ নাচব তোমার সামনে। নাচ দেখলেই তোমার...
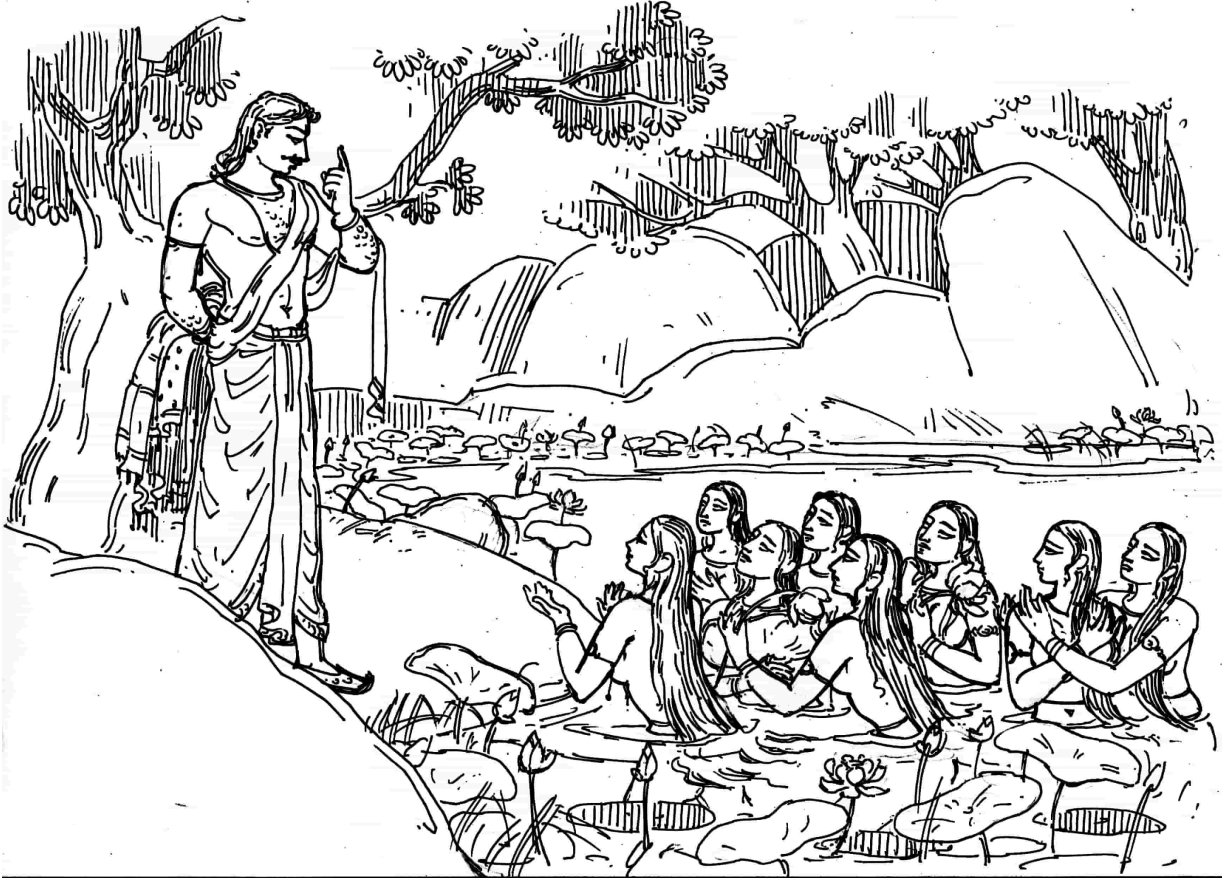
নগ্নাদের চাপ দিয়ে কলাবতীকে আদায় করল ঢিণ্ডাকরাল।

বাকি কথাটা চোখের ইঙ্গিতে শেষ করেছিল কলাবতী।

ঢিণ্ডাকরাল উত্তপ্ত হয়ে গিয়ে বলেছিল, আমিও যাব দেব সভায়। দেখব রম্ভার নতুন নাচ। যে নাচে নেচে ওঠে পুরুষের সর্ব অঙ্গ।

অসম্ভব।

অবশেষে অবশ্য নাছোড়বান্দা চিন্তাকরালকে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছিল কলাবতী।

কিন্তু কীভাবে?

রাত ভোর হতেই কলাবতী প্রয়োগ করেছিল ক্ষুদ্রকরণী বিদ্যা, অকাল কুষ্মাণ্ড ঢিণ্ডাকরালের ওপর। ছোটো হতে হতে এত ছোট্ট হয়ে গেছিল স্বামী যে অন্যের চোখে অদৃশ্য হয়ে গেছিল। পোস্তদানার মতো পুঁচকে হয়ে গেলে আর কি কাউকে দেখা যায়?

অতিশয় খুদে স্বামীকে বসিয়ে দিয়েছিল নিজের কানের গয়নার ওপর। চলে গেছিল স্বর্গে।

নৃত্যসভায় বসে রম্ভার সাংঘাতিক যৌনতা উদ্দীপক নাচ দেখতে দেখতে মোহিত ঢিণ্ডাকরাল ভুলে গেছিল সে আসলে মানুষ, দেবসভায় তার স্থান হওয়াটা গর্হিত অপরাধ।

উলটো, নিজেকে মনে করেছিল স্বর্গের আর এক দেবতা। তাই, রম্ভা তাকে নাচাচ্ছে। নারদ আর অন্যান্য দেব-ঋষিরা বাজনা বাজাচ্ছে। তাই, কলাবতীর কানের ওপর বসে নেচে নেচে উঠেছে বাজনা আর নূপুরের তালে তালে। শেষ হল রম্ভা-নৃত্য। এবার উল্লসিত এক ভাঁড় ছিটকে এসে শুরু করল তার বিদূষক-নৃত্য। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল দেবসভার সব্বাই।

এইসব দেখতে দেখতে ঘোর লেগে গেছিল মানুষ ঢিণ্ডাকরালের মগজের মধ্যে। মনে হয়েছিল, উজ্জয়িনীতে প্রতিদিন মহাকাল মন্দিরে যে লোকটা উদ্দাম নাচ নেচে যায়, এই বিদূষকটা সেই লোক। একই ঢঙে নাচছে দেবতাদের সভায়। দেবতারা অনেক মায়াবিদ্যা জানে। নিশ্চয় সেই ভণ্ড নাচিয়েকে আনিয়েছে ঢং দেখাতে।

শেষ হল নাচের আসর। কানের গয়নায় স্বামীরত্নকে বসিয়ে সাঁ করে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে এল কলাবতী। সে রাতে যথার্থই মজিয়ে রাখল নৃত্য-মশগুল ঢিণ্ডাকরালকে।

পরের দিন ফিরে গেল দেবসভায়। তার কি কাজের শেষ আছে! সহস্রচক্ষু ইন্দ্রকেও যে হাতে রাখতে হবে! একা ঢিণ্ডাকরাল রাস্তায় বেরোল হাওয়া খেতে। উজ্জয়িনীর সেই ভাঁড় মহাশয়ও বেরিয়েছিল পথে। তার মুখখানা দেখতে অবিকল ছাগলের মুখের মতো।

দেখেই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছিল ঢিণ্ডাকরাল। সেই সঙ্গে বিবিধ বচন উগড়ে দিয়েছিল মুখ দিয়ে। যেমন, ওরে নাচ, নাচ ইন্দ্রসভায় যে রঙ্গনাচ নেচে পেটের খিল খুলে দিয়েছিলি রঙ্গিনী নটিনীদের, সেই নাচ আর একবার নেচে দেখা না, ভাই!

চমকে উঠেছিল ছাগমুখ বিদূষক। সত্যিই তো, তার খ্যাতি শুনে দেবরাজ তাকে নিত্য নিয়ে যায় দেবসভায় নাচানোর জন্যে, কিন্তু মর্ত্যের কেউ তা জানে না।

ঢিণ্ডাকরাল জানল কী করে?

বিদূষক যখন এই হেঁয়ালির সমাধানে চিন্তা মশগুল, তখন এত অনুরোধের যথাজবাব না পেয়ে জুয়াড়ি তার হাতের লাঠি দিয়ে দমাস করে মেরেছিল ভাঁড়ের মাথায়।

রক্তাক্ত মাথা নিয়ে বিদূষক তৎক্ষণাৎ হাজির হয়েছিল ইন্দ্রসভায়। বিদূষককে এ বিদ্যা দিয়েছিলেন দেবরাজ। বিদূষক বলে কথা! যত্রতত্র যখন তখন গমনের ক্ষমতা তাদের থাকে!

ইন্দ্র কিন্তু চমকে উঠেছিলেন আচমকা রক্তাক্ত মস্তকে বিদূষককে উপস্থিত হতে দেখে, হল কী? ব্যাপারটা কী?

সব খুলে বলেছিল বিদূষক। স্বর্গের নাচ মর্ত্যের মানুষ দেখে গেল কী করে?

চমকে উঠে ধ্যানে বসে গেলেন ইন্দ্র। জেনে গেলেন কলাবতীর কৌশল।

বিষম রেগে তৎক্ষণাৎ অভিশাপ দিলেন কলাবতীকে, এত বড়ো স্পর্ধা! লুকিয়ে এনেছিস মনের মানুষকে! ফলে, মাথা ফেটেছে দেবসভার দিব্য-বিদূষকের! যা, নাগপুরের নতুন মন্দিরেরর পাথরে পুতুল হয়ে থাক!

শাপ শুনে কলাবতীর মা অপ্সরা অলম্বুষ কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেছিল ইন্দ্রর সামনে। নাচনি অপ্সরার কান্না দেখে রাগ জল হয়ে গেছিল দেবরাজের। মেয়েদের কান্নায় ম্যাজিক থাকে!

বলেছিলেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, এখন তো পাথরের পুতুল হয়ে থাকুক। মন্দির ভেঙে যেদিন মাঠ হবে, সেদিন পাথরের কলাবতী প্রাণ ফিরে পাবে।

কলাবতী তৎক্ষণাৎ চলে এল উজ্জয়িনীতে জুয়াড়ি স্বামীর কাছে। গায়ের সব গয়না তাকে দিয়ে সাঁ করে চলে গেল নাগপুরের নির্মীয়মান মন্দিরে, প্রস্তরমূর্তি হয়ে মন্দিরের শোভা বাড়াতে।

মূর্চ্ছা গেল ঢিণ্ডাকরাল। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর চোখ আর কান, দুটোই গেল বিগড়ে। বিষম শোকে। মনের মধ্যে কেবল একটাই আপশোশ তুমুল ঘূর্ণাবর্ত রচনা করে গেল। ঝোঁকের মাথায় মুখ ফস্কে ভাঁড়ের সঙ্গে ফচকেমি করতে গিয়ে অমন রূপসী নাচনি বউকে তো হারাল! যে সে মেয়ে নয়, স্বর্গের মেয়ে!

বেশ কিছুকাল এইভাবে পাগল-পাগল অবস্থায় কাটানোর পর সন্ন্যাসী সেজে চলে গেল নাগপুরে। গ্যাঁট হয়ে বসল শহরের বাইরে একটা বাগানে। সঙ্গে নিয়ে গেছিল পাঁচ ঘড়া গয়না, কলাবতীর গয়না। বাগানের চার কোণে চারটে ঘড়া পুতে রাখল মাটির মধ্যে। এই চার ঘড়ায় ছিল শুধু সোনার গয়না। পঞ্চম ঘড়াটায় ছিল দামি দামি পাথরের গয়না, চোখ ঠিকরে, দেওয়ার মতো গয়না। এই ঘড়াটাকে পুঁতে রাখল নতুন মন্দিরের চত্বরে, এক গভীর রাতে, একখানা পাথর তুলে, তার তলায় রেখে, আবার চাপা দিয়ে দিল পাথর।

তারপর গেল নদীর ধারে। গাছের পাতা কুড়িয়ে এনে বানিয়ে নিল একটা কুঁড়েঘর। ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইল সেখানে, পদ্মাসনে।

আসল ধ্যান নয়, ধ্যানের অছিলা।

লোককে দেখিয়ে দেখিয়ে স্নান করত দিনে তিনবার। যে যা ভিক্ষে দিয়ে যেত, তাই খেত একটা পাথরের ওপর রেখে। পাথরটাই যেন তার থালা।

দেখতে দেখতে তার নাম ছড়িয়ে গেল ভক্তদের মুখে মুখে।

শুনতে পেলেন নাগপুরের রাজা।

নিজেই চলে এলেন ছদ্মবেশী জুয়াড়ির সামনে। সারাদিন বসে রইলেন তার সামনে। তার স্নান করা দেখলেন, পাথরে ভিক্ষার খাবার রেখে খাওয়া দেখলেন। মুগ্ধ হলেন সর্বত্যাগীর সাধনা দেখে।

সন্ধ্যের আঁধার যখন ঘনাচ্ছে, উঠে পড়লেন রাজা, এবার ফিরবেন রাজবাড়ি।

ঠিক এই সময়ে একটা শেয়াল ডেকে উঠল হুক্কা-হুয়া করে।

নকল সাধু সেই ডাক শুনে মুচকি হাসল।

খটকা লাগল রাজার। শেয়ালের ভাষা নিশ্চয় জানে এই সন্ন্যাসী। নইলে হাসবে কেন?

জিজ্ঞেস করলেন, হাসলেন কেন বলবেন?

নকল সন্ন্যাসী বললে, শেয়াল বলছে, নগাপুর নগরের পুবদিকের বেতবন বাগানে পোঁতা আছে সোনার গয়নাভর্তি ঘড়া। আমি যেন গিয়ে নিয়ে আসি।

রাজা তো অবাক। শেয়ালের ভাষা বোঝে এই সন্ন্যাসী! অনেক তোয়াজ করে নিয়ে গেল নকল সাধুকে সেই বাগানে। ঘড়াভর্তি গয়না উঠে এল মাটির তলা থেকে! একটা ঘড়া।

রাজা বুজলেন, এই সাধু ভণ্ড নয়, সত্যবাদী, নির্লোভ।

রাজসভায় গিয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। সবাইকে নিয়ে এলেন সন্ন্যাসীর সামনে। সুযোগ বুঝে ভণ্ড তপস্বী হরিণ, শকুনি, গোরুর ডাক শুনে শুনে বলে দিল বেতবনের তিনকোণে রয়েছে আরও তিন ঘড়া গয়না।

সিত্যই তিনঘড়া স্বর্ণঅলঙ্কার বেরিয়ে এল মাটির ভেতর থেকে!

এমন সন্ন্যাসীকে তো নতুন মন্দিরে নিয়ে যাওয়া দরকার। মন্দিরের সুনাম বাড়বে। ভক্ত সমাগম বৃদ্ধি পাবে।

সন্ন্যাসীকে পায়ে ধরে রাজি করালেন রাজা। ভণ্ড যেই উঠতে যাচ্ছে, মাথার ওপর কাকের কর্কশ হাঁক শোনা গেল।

রাজা বললেন, কী বলছে কাক?

ভণ্ড বললে, মন্দরের চত্বরে পাথরের নীচে রয়েছে এমন সব জহরতের অলঙ্কার যা মর্ত্যের মানুষ কক্ষনো দেখেনি। সবই স্বর্গের জহুরিদের হাতে গড়া।

রাজার চোখ কপালে উঠে গেল। বললেন, 'আপনি দেখতে পাচ্ছেন কোন পাথরটার তলায় আছে?

কিছুক্ষণ চোখ মুদে থেকে, মনে মনে একচোট হেসে নিয়ে, ভণ্ড বললে, হ্যাঁ, দিব্য চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কোন গয়নাটা কী রকম, তাও দেখতে পাচ্ছি।

বলে, এক-একটা গয়নার বিবরণ দিয়ে গেল গড়গড় করে।

রাজা তাকে প্রায় মাথায় তুলে নিয়ে গেলেন মন্দির চত্বরে। বিশেষ সেই পাথরটার সামনে হনহন করে হেঁটে গিয়ে পাথরে পা ঠুকে ভণ্ড বললে, 'তুলুন এই পাথর।

উঠল সেই পাথর। তলায় পাওয়া গেল ঘড়াভর্তি এমন সব জহর-গয়না যা রাতের আঁধারকে ফর্সা করে দিতে পারে।

পুলকিত রাজা ভণ্ডকে নিয়ে ঢুকলেন মন্দিরের মধ্যে।

এইবার কিন্তু সন্ন্যাসীকে আর দাঁড় করিয়ে রাখা গেল না, অথবা তার হাত ধরে এদিকে সেদিকে নিয়ে যাওয়ার দরকারও হল না।

কেননা, মন্দিরের গায়ে খোদাই করা অপরূপা প্রস্তর-নর্তকীদের একটাকে সে চিনে ফেলেছে।

কলাবতী! সেই ভ্রূভঙ্গী! সেই সুঠাম দেহবল্লরী! প্রস্তর নয়নে নীরব আকুতি!

সেই মূর্তির সামনেই হনহন করে হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল ভণ্ড সাধু।

কী আশ্চর্য! একী অলৌকিক ব্যাপার!

পাথরের মেয়ের দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে এল অশ্রু!

সন্ন্যাসীকে দেখে কাঁদছে!

বিষম বিস্মিত রাজা শুধালেন, কাঁদছে কেন?

বিষণ্ণ সন্ন্যাসী বললে, প্রাসাদে গিয়ে বলব।

প্রাসাদে ফিরে সে বললে, এই মন্দিরের ভিত গাঁথা হয়েছে অশুভ লগ্নে, অশুভ জায়গায়। ফলে, আজ থেকে ঠিক তিনদিন পরে আপনার কপাল পুড়বে। পাথরের মূর্তি কাঁদছে সেই কারণে।

ভড়কে গেলেন রাজা, তাহলে একটা বিহিত ব্যবস্থা করুন।

সন্ন্যাসী বললে, আজকেই এই মন্দির ভেঙে মাঠ করে দিন। শুভ জায়গায় শুভ সময়ে আবার একটা মন্দির বানান।

তাই হল। একদিনেই মন্দির হয়ে গেল মাঠ। অন্য মাঠে উঠতে লাগল নতুন মন্দির, অবশ্যই সন্ন্যাসীর কথামতো।

তারপরেই চম্পট দিল ঢিণ্ডাকরাল, সোজা উজ্জয়িনীতে, যাওয়ার পথে নেচে নেচে কলাবতী ভিড়ে গেল তার সঙ্গে। শাপ কেটে যাওয়ার গেল ইন্দ্রকে প্রণাম করতে।

ইন্দ্র সব শুনে হেসে গড়িয়ে পড়লেন, জোচ্চোর যদি আসরে নামে বউ উদ্ধারে, তার অসাধ্য কিছু নেই।

পাশে বসেছিলেন দেবগুরু বৃহস্পতি। তিনি বললেন, জুয়াড়িরা সব পারে। তারা মায়াবী। এই রকম একটা গল্প শোনাই।

অনেক অনেক আগে অতিশয় ধুরন্দর, আপাদমস্তক জোচ্চোর, জুয়োশাস্ত্রে নিরতিশয় নিপুণ এক জুয়াড়ি শুধু জুয়ো নয়, বারনারী ভোগেও ছিল আসক্ত। নিত্যনতুন নগরবধূর নূপুর নিক্কন না শুনলে তার মেজাজ আসত না। জুয়োয় হারাত নগরের মহামহা জুয়াড়িদের, সেই অর্থ ঢেলে দিয়ে যেত নগরবধূদের পদতলে। আকণ্ঠ বদনেশায় আসক্ত ছিল সেই পাপিষ্ঠ।

যতই ধুরন্ধর হোক, নশ্বর তো বটে। সুতরাং তার মরণ হল একদিন।

যমরাজ চোখ পাকিয়ে যমালু গলায় জখমের বিশেষ রকমের অতি-লোমহর্ষক কণ্ঠস্বর) বললেন, রে, রে পাপিষ্ঠ, অনেক পাপ করেছিস। যা, এক কল্প নরকে থাক।

মিন মিন করে বললে ফিচেল জুয়াড়ি, সেকি হুজুর, পুণ্যও তো করেছি একদিন। জিজ্ঞেস করুন চিত্রগুপ্তকে।

চিত্রগুপ্ত জাবদা খাতা খুঁজে খুঁজে বললে, আজ্ঞে আজ্ঞে হ্যাঁ, এই পাপিষ্ঠ একদিন একটু পুণ্য করেছিল। এক ব্রাহ্মণকে সামান্য সুবর্ণ দান করেছিল।

তাই নাকি! তাই নাকি! চোখ নাচিয়ে বলেছিলেন যমরাজ, তাহলে তো স্বর্গবাস ওর অবশ্যই প্রাপ্য। শুধু স্বর্গ নয়, একদিনের জন্যে দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনেও বসতে পারে।''

জুয়াড়ি শুধু একটু হাসল। নিগূঢ় হাসি। সবই তো পরিকল্পনা মাফিক চলছে।

চিন্তাচ্ছন্ন যমরাজ ফাঁপড়ে পড়লেন, সেই কূটহাসি দেখে। শুধোলেন, আগে কী চাও? নরক, না, ইন্দ্রত্ব?

চতুর শিরোমণি জবাব দিল সপেটা, ইন্দ্রত্ব।

যমরাজ তাকে স্বর্গে পাঠালেন। ইন্দ্রকে একদিনের জন্যে ইন্দ্রত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে ধুরন্ধরকে ইন্দ্রের সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন।

হাতে একদিন মাত্র সময়, কিন্তু বাটিতে কাজ সারতে লাগল ধুরন্ধর। এক হুকুমেই মর্ত্য থেকে স্বর্গে নিয়ে এল নিজের সমস্ত বন্ধু আর বারবধূদের। বলা বাহুল্য, পাপাচারের ফর্দে কেউই কম যায় না।

তারপরেই অধীনস্থ দেবতাদের ডেকে দিল কড়া হুকুম। স্বর্গ আর মর্ত্যের যত তীর্থ আছে, সব জায়গায় ঘুরিয়ে আন এইসব পাপিষ্ঠদের, বারনারী, বন্ধুসহ নিজেও দেবতাদের ঘাড়ে মুহূর্তে মুহূর্তে বিপুল পুণ্যসঞ্চয় করে তো নিলই, যত পাপ জমেছিল, সব গেল ধুয়ে!

তারপরেও নিস্তার দিল না দেবগণকে। ছাড়ল আর এক হকুম, এখুনি মর্ত্যের সমস্ত রাজাদের দিয়ে আমার স্বর্গবাস কামনা করে অনবরত দান করিয়ে যাও। মহাদান মহাদান করুক সমস্ত রাজা, তোমরা তাদের মগজে বসে সেই ইচ্ছা তুঙ্গে তুলে রাখো। মহাদান করিয়ে যাও।

বেচারা দেবতারা! নিমেষে নিমেষে মর্ত্যের সমস্ত রাজাদের মগজে ঢুকে বসে থেকে এই মহৎ কর্ম করিয়ে দিল সাড়ম্বরে। দানসমুদ্র বয়ে গেল ধরার ওপর দিয়ে। ফলে, ধুরন্ধর জুয়াড়ি আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা নিষ্পাপ তো হলই, পাকাপাকি ইন্দ্রত্বও পেয়ে গেল জুয়াড়ি নিজেও। পাপাচরের স্যাঙাৎরাও স্থায়ী নিবাস পেল স্বর্গে, নতুন ইন্দ্রের আদেশে। দেবত্ব লাভ করেছে যে সক্কলে। মর্ত্যের বারবধূরা এখন স্বর্গবধূ!

ফাঁপড়ে পড়ল চিত্রগুপ্ত পরের দিন। স্বর্গবাসের মেয়াদ তো ফুরিয়েছে, কিন্তু স্বর্গ থেকে আর তো নাম শোনো যাচ্ছে ধুরন্ধরকে। যমের কাছে নিবেদন করল সমস্যা।

সমস্যা বলে সমস্যা। মাথা চুলকোতে চুলকোতে যম বললেন, তাইতো! তাইতো! বেটা তো আমাকেও ঠকাল!

বৃহস্পতির মুখে চমকপ্রদ এই উপাখ্যান শুনে চমকিত ইন্দ্র তক্ষুনি ঢিণ্ডাকরাল আর কলাবতীকে সামনে নিয়ে এলেন। স্থায়ীভাবে কলাবতীকে দিলেন ঢিণ্ডাকরালকে, আর ঢিণ্ডাকরালকে করে নিলেন নিজের অনুচর। এ রকম বুদ্ধি যার, সে থাক কাছে।

ধূর্ত জুয়াড়িদের লম্বা লম্বা গল্প শুনিয়ে দেওয়ার পর অগ্নিশিখা বেতাল বললে, যমশিখ বেতালকে, ছিলাম জুয়াড়ি ডাফিনেয় ব্রহ্মরাক্ষসরা আমাকে বেতাল বানিয়ে তুলে দিল জুয়োর বাইরে। তখন নিশুতি রাত। খিদের জ্বালায় টহল দিচ্ছিলাম উজ্জয়িনীর রাস্তায়, এক ব্রাহ্মণকে দেখে যেই হাঁ করে খেতে গেছি, সে বিকট চেঁচিয়ে ডাকল রাজা বিক্রমাদিত্যকে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এসে গেলেন। যেন জীবন্ত আগুন। আমাকে লক্ষ্য করে কৃপাণ চালাতেই আমার গলা দুফাঁক হয়ে গেল। সেই রাজার হুকুমেই ধড়িবাজ কাপালিককে মেরেছি। সুতরাং একে আমিই খাবো।

কিন্তু যমশিখ ছাড়বে না মড়া।

তখন আবির্ভূত হলেন রাজা বিক্রমাদিত্য, সহসা মাটিতে আঁকলেন একটা পুরুষ মূর্তি। কৃপাণ চালিয়ে কাটলেন তার দুই হাত।

খসে খেল যমশিখের দুহাত! চম্পট দিল মড়া ছেড়ে।

অগ্নিশিখা মনের সুখে খেয়ে নিল কাপালিককে।

যক্ষিণী মদনমঞ্জরী বললে, এই সবই দেখলাম শ্মশানে দাঁড়িয়ে। তারপর রাজা বিক্রমাদিত্য আমাকে স্বামীর বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিলেন। আমি তাঁকে প্রণাম সেরে চলে এলাম বটে, কিন্তু উপকার ফিরিয়ে দেওয়ার বাসনা মনের মধ্যে রাখলাম। আজ যখন জানলাম, সিংহলরাজ তাঁর যে মেয়েকে রাজা বিক্রমাদিত্যের জন্যে পাঠাচ্ছেন, তাকে অন্য রাজারা ভোগ করার বাসনায় লুঠ করার চক্রান্ত শুরু করেছে, স্থির থাকতে পারলাম না। তুমি সব কথা জানিয়ে রাখবে সেনাপতি বিক্রমশক্তিকে। আমিও হুঁশিয়ার রইলাম যাতে রাজা বিক্রমাদিত্য বদমাস শত্রুদের নিধন করতে পারেন। তোমাকে আমার মায়ার জোরে এখানে এনেছি এই কারণেই। রাজার জন্যে কিছু উপহার আনাচ্ছি, তাঁকে দেবে।''

কথা শেষ হতেই সেই সাদা আর কালো সুন্দরী আর সোনার হরিণটা চলে এল সামনে।

জিজ্ঞেস করলাম যক্ষিণীকে। এরা কারা?

তিনি বললেন, পুরাকালে জগৎ সৃষ্টি ব্যাহত করার জন্যে ঘন্ট আর নির্ঘন্ট নামে দুটো অসুর এসেছিল। তাদের সংহার করার জন্যে ব্রহ্মা অপরূপা এই মেয়ে দুটিকে সৃষ্টি করেন। এদের দেখেই কামে উন্মত্ত অসুর দুটো নিজেদের মধ্যে লড়ে গেছিল মেয়েদের লোভে, মরেছিল দুজনেই।

ব্রহ্মা মেয়েদের দিলেন কুবেরকে, সুপাত্রে দেওয়ার জন্যে। কুবের দিলেন আমার ভাই আর আমার স্বামীকে, সুপাত্রে বিয়ে দেওয়ার জন্যে। আমার স্বামী দুজনকেই দিলেন আমাকে, পাত্র খুঁজে বিয়ে দেওয়ার জন্যে। আমি ঠিক করেছি, দুজনেরই বিয়ে দেব রাজা বিক্রমাদিত্যর সঙ্গে। এবার শোনো সোনার হরিণের কাহিনি।

দেবরাজ ইন্দ্রের ছেলে জয়ন্ত যখন খুব চোট্ট, তখন তাকে নিয়ে আকাশে বেড়াতে বেরিয়েছিল স্বর্গলোকের সুন্দরীরা। সেই সময়ে মর্ত্যলোকে ঠিক এইরকম সোনা আর মাণিক দিয়ে তৈরি একটা বাচ্ছা হরিণকে নিয়ে খেলা করছিল জনাকয়েক রাজপুত্র। বায়না ধরেছিল জয়ন্ত, চাই এই সোনার হরিণ।

ইন্দ্র তখন বিশ্বকর্মাকে হুকুম দিয়ে অবিকল সেই রকম একটা সোনা-মাণিকের হরিণ বানিয়ে দিয়েছিলেন। অমৃত খাইয়ে প্রাণময় করে দিয়েছিলেন।

জয়ন্ত মেতে রইল সেই বাচ্ছা হরিণ নিয়ে।

এরপর রাবণ রাজার ছেলে ইন্দ্রজিৎ স্বর্গলোক জিতে নিয়ে হরিণ বাচ্ছাকে নিয়ে এল মর্ত্যলোকে।

শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধ করে বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করে দিলেন। সোনা-মাণিকের হরিণ রইল বিভীষণের কাছে।

আমার স্বামীর সঙ্গে বিভীষণের বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকায় আমার যাতায়াত ছিল বিভীষণের প্রাসাদে। বিভীষণই আমাকে উপহার দিয়েছিলেন সোনা-মাণিকের হরিণ।

আমি দিচ্ছি রাজা বিক্রমাদিত্যকে, কৃতজ্ঞতার নিদর্শনে।

যক্ষিণী মদনমঞ্জরীর আত্মকথা যখন সমাপ্ত হল, সূর্য তখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। সন্ধ্যা আসছে।

আমি আর সিংহলরাজার দূত সন্ধ্যা-আহ্নিক ইত্যাদি সাঙ্গ করে শুয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি, আশ্চর্য ব্যাপার! ঘুমন্ত অবস্থাতেই চলে এসেছি সেনাপতি বিক্রমশক্তির শিবিরে!

তাঁর সমীপে যখন আশ্চর্য এই কাহিনি নিবেদন করছি, অমনি ঘটে গেল আর এক আশ্চর্য ব্যাপার।

যক্ষসৈন্যদের বিশাল এক বাহিনী আচমকা দৃশ্যমান হল শিবিরের সামনে, আগে রয়েছে হাস্যমুখরা সেই সাদা আর কালো সুন্দরী, আর সেই সোনা-মাণিকের হরিণ!

বুঝলাম, সবই যক্ষিণী মদনমঞ্জরীর অসাধারণ দিব্যবিদ্যার শক্তি।

বিক্রমশক্তি কিন্তু ভয় পেয়েছিলেন। ভুতুড়ে ব্যাপার নাকি!

যে কাহিনি সবে শুরু করেছিলাম, তার শেষ পর্যন্ত বললাম। ওঁর ভয় কেটে গেল।

উনি যখন সৈন্য সাজাচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ে তেড়ে এল বিপক্ষ সৈন্যবাহিনী, ম্লেচ্ছ সৈন্য নিয়ে। শুরু হয়ে গেল লড়াই।

জয় হল আমাদের। বিজিত শত্রুরাজারা এখন আপনার সম্রাটত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। পৃথিবী আপনার বশে এসেছে।

তখন এলেন, রাজা যক্ষিণী মদনমঞ্জরী স্বামীকে নিয়ে।

বলে গেলেন, রাজা বিক্রমাদিত্য যেন অনুগ্রহ করে এই শ্বেতসুন্দরী আর কৃষ্ণসুন্দরীকে রানি করে নেন। আর এই হরিণ শিশুকে আদরে রেখে দেন।''

যাবার সময়ে বিস্তর মণিমাণিক্য দিয়ে গেলেন। সব এনেছি আপনাকে দেওয়ার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন মদনলেখা, সিংহল রাজার মেয়ে।

পরের দিন রাজা বিক্রমাদিত্য রওনা হলেন বিক্রমশক্তির শিবির অভিমুখে।

পুরুষ বিদ্বেষিণীর কাহিনি

সেনাপতি বিক্রমশক্তি যথা সমাদর করলেন সম্রাট বিক্রমাদিত্যকে। আলাপ করিয়ে দিলেন কাশ্মীর, সিন্ধু, পারস্য, ভিল্লদেশ, লাটদেশ এবং অন্যান্য দেশের সামন্তরাজাদের সঙ্গে। এঁরা সব্বাই যখন বিক্রমাদিত্যের আধিপত্য মেনে নিয়েছেন, তখন তো উনি একচ্ছত্র সম্রাট!

কালোসুন্দরী, সাদাসুন্দরী, সোনামাণিকের হরিণ আর যক্ষিণীর দেওয়া রাশি রাশি দুষ্প্রাপ্য মণিরত্ন নিয়ে ফিরলেন উজ্জয়িনীতে। সিংহল রাজকন্যা তো সঙ্গেই রইল।

যথাসময়ে শুভলগ্নে বিয়ে করলেন তিন কন্যাকে। বিয়ের আসরে আচমকা এল যক্ষিণী মদনমঞ্জরী, কুবেরের ভাণ্ডারসম মণিমাণিক্য নিয়ে, বিয়ের উপহার হিসেবে।

যাবার সময়ে বলে গেল, ঋণ শোধের জন্যে নয়, যাতে আমাকে স্মরণে রাখেন তাই এনেছি এত দুর্লভ জহর।

সুখে রইলেন সম্রাট নতুন রানিদের নিয়ে।

এরপরেই উনি অন্তঃপুরে রানি, নিয়ে এলেন আর এক পরমাসুন্দরীকে, যে কন্যা একেবারেই সহ্য করতে পারত না পুরুষ জাতটাকে।

তার নাম মলয়াবতী।

ঘটনাটা ঘটল এইভাবে।

একদিন ছবি আঁকতেই,

সম্রাট বিক্রমাদিত্যর প্রিয় চিত্রশিল্পী নগরস্বামী তিনদিন অন্তর একটা করে ছবি এঁকে উপহার দিয়ে যেত সম্রাটকে। ভুলে গেছিল খেয়ালী শিল্পী।

মনে যখন পড়ল, তখন নতুন ছবির বিষয়-বৈচিত্র্য। মাথায় আনতে পারছিল না। প্রকৃত শিল্পী হলে যা হয়! মন আর মেজাজ না থাকলে কি ছবি আঁকা যায়?

গালে হাত দিয়ে যখন আকাশপাতাল ভাবছে নগরস্বামী, হঠাৎ দেখেছিল এক পথচারীকে। আগে তো কখনও এই মানুষটাকে দেখেনি সে!

পথিক কিন্তু চিনত নগরস্বামীকে, এসেওছিল তার কাছে, হাতে একটা গুটোনো ছবির পট।

নগরস্বামীর হাতে সেই পট ধরিয়ে দিয়েই উধাও হয়ে গেছিল পথিকবর। আর তাকে দেখা যায়নি।

আশ্চর্য এই উপখ্যানের সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এইটাই।

নগরস্বামী গুটোনো পট চোখের সামনে খেলে চোখের পাতা আর ফেলতে পারেনি।

পটে আঁকা রয়েছে এক ধরণী সুন্দরীর অত্যাশ্চর্য কায়াচিত্র। ছবি নিয়ে পুলকিত মনে তখুনি দৌড়েছিল সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সমীপে।

সম্রাট স্তম্ভিত হয়ে গেছিলেন পটে আঁকা ছবি দেখে। যেন মানুষ শিল্পীর আঁকা নয়, এঁকেছেন স্বয়ং দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। মর্ত্যের মানবী বলে মনেই হয় না, যেন অমর্ত্য সুন্দরী।

মোহিত সম্রাট সেই রাতেই স্বপ্নে দেখলেন সেই সুন্দরীকে। সে যেন এক দ্বীপবাসিনী। তার সঙ্গে তিনি নিবিড় সহবাস করতে যাচ্ছেন...
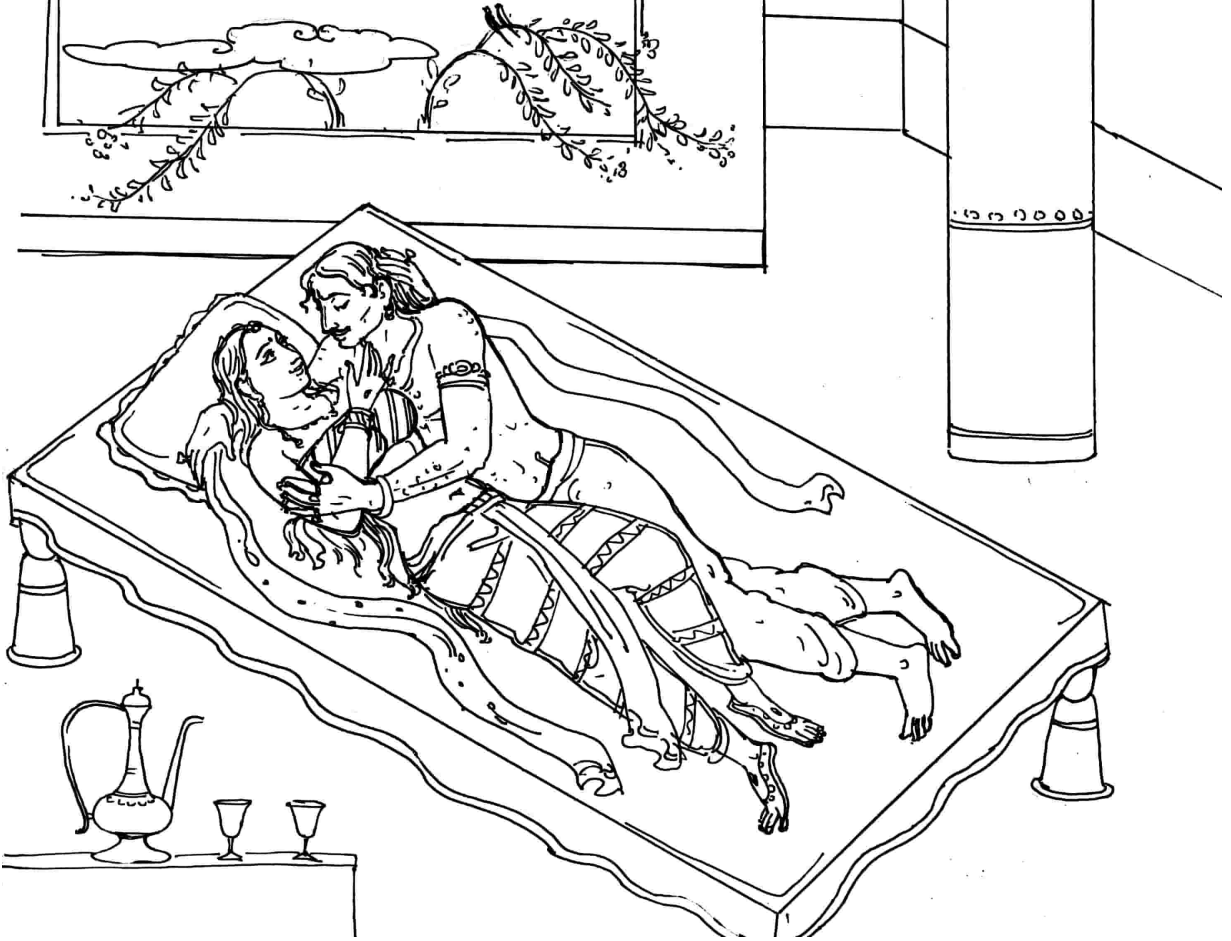
সেই সুন্দরীর সঙ্গে তিনি নিবিড় সহবাস করতে যাচ্ছেন...

ঠিক এই মুহূর্তে কিঙ্করের হাঁকে ঘুম ভেঙে গেল সম্রাটের। ভোর হয়েছে। হেঁকে হেঁকে ঘুম ভাঙাচ্ছে বেতনভোগী ভৃত্য।

কিন্তু মহাখাপ্পা সম্রাট সেই মুহূর্তে তাকে তাড়িয়ে দিলেন রাজ্য থেকে। এত বড়ো স্পর্ধা! এমন সুখস্বপ্নে বিঘ্ন ঘটায়! স্বপ্ন-সঙ্গমটাও দেখতে দিল না ! স্বপ্নেও চরমানন্দ পেতে দিল না !

কাম-জ্বরের সেই হল শুরু।

বালক বয়স থেকেই বিক্রমাদিত্যর যে তিন বন্ধু ছিল, তাদের একজনের নাম ভদ্রায়ুধ। রাজ্যরক্ষক বজ্রায়ুধের ছেলে।

অপর দুই প্রাণপ্রিয় বন্ধুর নাম মহামতী আর শ্রীধর যথাক্রমে মন্ত্রী আর রাজপুরোহিতের ছেলে।

এহেন বন্ধুদের অগোচর কিছুই থাকে না। বাল্যবন্ধু বিক্রমাদিত্যের বিমনা অবস্থা দেখে গোপনে খোঁজখবর নিয়েছিল ভদ্রায়ুধ। সটান জিজ্ঞেস করেছিল বিক্রমাদিত্যকেই।

প্রিয় সখার কাছেই তো মনের দরজা খোলা যায়, অকপটে সব বলেছিলেন বিক্রমাদিত্য। পটে আঁকা রমণীর মনোলোভা আকৃতি দেখে ইস্তক তাঁর মন হয়েছে চঞ্চল। সেই সুন্দরীর কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তাকেই স্বপ্নে দেখেন। দেখেন, সমুদ্র পেরিয়ে ঢুকছেন এক সুরম্য শহরে। ঢুকতে না ঢুকতেই জনাকয়েক সশস্ত্র সুন্দরী ধেয়ে আসছে তাঁকে মারতে। উনি পালাচ্ছেন। কোত্থেকে দৌড়ে আসছে একজন বুড়ি তপস্বিনী। তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে নিজের বাড়িতে, বলছে, বাছা! এই দেশের রাজকন্যা মলয়বতী পুরুষ জাতটাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। পুরুষ দেখলেই সখীদের লেলিয়ে দিয়ে মেরে ফেলে। তোমাকেও নিকেশ করত। তাই নিয়ে এলাম আমার বাড়িতে।

তারপর, সেই বৃদ্ধা তপস্বিনী আমাকে খেয়ে সাজিয়ে নিল মেয়েদের পোশাক পরিয়ে, মেয়েদের প্রসাধিনী লেপন করে। মুকুরে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে চিনতে পারলাম না নিজেকেই। তাপসী যেন জাদু জানে। পেশিময় পুরুষকে মাখননরম নারীতে রূপান্তরকরণের মহাবিদ্যায় প্রকৃতই পারদর্শিনী।

আর পর আমার হাত ধরে নিয়ে গেল রাজার বাগানে। সেখানে গিজগিজ করছে অগণিত রূপসী, ঘিরে রয়েছে এক অনিন্দ্যসুন্দরী রাজতনয়াকে।

পলকচাহনি নিক্ষেপ করেই চিনলাম তাকে। সেই চিত্রসুন্দরী।

ভ্রূকুঞ্চন করে দামিনীপ্রতিম সেই কন্যা শুধিয়েছিল তাপসীকে, মনে হল এইমাত্র যেন এক পুরুষকে দেখলাম।

আমার চঞ্চল চরণে নিশ্চয় পৌরুষ বিচ্ছুরিত হয়েছিল। আতীব্র পুরুষ বিদ্বেষিণীর নয়ন কোণ দিয়ে তা নিরীক্ষণ করেছে এবং শক্ত হয়ে গেছে।

চকিত জবাব দিয়ে গেল কিন্তু বুড়ি তাপসী, ধুস! পুরুষ এই বাগানে আসবে কোন সাহসে? মরতে? যাকে দেখে সিঁটিয়ে গেলে, সে যে আমার বোনের মেয়ে।

তোমার ভাগ্নি! আমার আপাদমস্তকে চোখ বুলোতে বুলোতে কথাটা শুরু করেছিল বটে পুরুষবিদ্বেষিনী রাজকন্যা, কিন্তু সুখের কথা মুখেই আটকে গেছিল আমার পুরুষপ্রতিম কিরণপ্রভায়। অদৃশ্য রশ্মি তার অণুপরমাণুতে যে রোমাঞ্চ জাগ্রত করেছিল, তা দেখা দেয় শুধু পুরুষ সান্নিধ্যে। বিধাতা নারী আর পুরুষ সৃষ্টি করেছেন উভয় অঙ্গেই সেই অদৃশ্য আকর্ষণী শক্তি দিয়ে। নারী টানবে পুরুষকে, পুরুষ টানবে নারীকে। তারই নাম যৌনতা। শরীরের ধর্ম। নারী রূপেও পৌরুষময় আমি সেই কারণেই সেই পুরুষবিদ্বেষিণীর মনে তীব্র কামনার লেলিহ শিখা ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলাম। রমণীর কাম তনুবরের আট স্থানে সংকেত দিয়ে যায়। যে কটি স্থান দৃষ্টিগোচর হয়, সেই-সেই স্থানে দেখেছিলাম সেই সংকেত।

পুরুষবিদ্বেষিণীর বুভুক্ষু দেহ লালায়িত হয়েছে পুরুষ হস্তে নিষ্পিষ্ট হতে! তার স্ফূরিত নামারন্ধ্রষ তার কামনামদির অক্ষিতারকা, তার থরথর কম্পিত অধরো, তার পীনপয়োধর যুগলের অকস্মাৎ নৃত্য, তার সঘন শ্বাসপ্রশ্বাস এই কামপিপাসার কয়েকটি মাত্র ইঙ্গিত।

বুঝলাম, ওষুধ ধরেছে। সে মরেছে।

বললে কামক্ষরিত কণ্ঠস্বরে, তোমার ভাগ্নি তো আমার আত্মীয়া। থাকুক আমার কাছে, আমার প্রাসাদে।

এই বলে, আমার হাত ধরে নিয়ে গেল অন্দরমহলে।

সেই সুন্দরীমহলে রইলাম পরম সুখে। হরেক সুন্দরীর সঙ্গ পেলাম, সঙ্গসুখের বিনিময় ঘটিয়ে প্রত্যেকের মনে আনন্দ এনে দিলাম, রাজকন্যার অগোচরে অবশ্যই। যখনই সুযোগ পেয়েছি, তখনই সুন্দরী সখীরা আমাকে দিয়ে সুখ আদায় করেছে।

একদিন এই কন্যারাই বর-কনে খেলা খেলল কন্যারূপী আমাকে আর পুরুষবিদ্বেষিণী কন্যাকে নিয়ে।

মজার খেলা এই বিয়ে-বিয়ে খেলায় বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর দুজনকে বাসর ঘরে ঢুকিয়ে দিল সখীরা। পুরুষবিদ্বেষিণী রাজকন্যাও আমার গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল আমাকে এক আশ্চর্য নারী মনে করে নিয়ে, এমনই এক নারী যার অঙ্গ স্পর্শ করলেই প্রকৃত নারী সঙ্গসুখের চরমে পৌঁছে যায়।

সেই অবস্থায় সে যখন উপনীত হয়েছে, আমিও তাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধলাম। খুলে গেল পুরুষবিদ্বেষিণীর চিত্তের আগল। হাজার হোক মেয়েছেলে তো! পুরুষ প্রকৃতি আর নারী প্রকৃতি নিকটস্থ হলেই তো আগুনে ঘি গলবে!

সেই নারীও যখন গলছে, আমি আমার পুরুষরূপ তাকে দেখালাম, তার পুরুষবিদ্বেষ তখন সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছে, মেলে ধরেছে নিজেকে আমার সামনে, আমি যেই উপগত হতে যাচ্ছি.....

সেই বেল্লিক কিঙ্কর এসে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল, স্বপ্ন চম্পট দিল, সুন্দরীসঙ্গম সুখ স্বপ্নমধ্যেও পেলাম না।

কিন্তু বন্ধু হে, জ্বলে যাচ্ছি সেই থেকে। ছবির আর সপ্নের সেই পুরুষবিদ্বেষিণীকে আমার চাই-ই চাই।

ভদ্রায়ুধ অতিশয় বিচক্ষণ পুরুষ এবং প্রকৃত বন্দুহিতৈষী। সে কালবিলম্ব না করে বিক্রমাদিত্যকে দিয়ে আঁকিয়ে নিল স্বপ্নের সেই সুন্দরীর একটা ছবি। দিনকয়েকের মধ্যেই বিস্তর অর্থব্যয়ে নির্মান করাল একটা ধর্মাশালা, দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখল পটের সুন্দরীকে, ধর্মশালার কর্মচারীদের বলে রাখল, এই ছবির মেয়েকে দেখেই যে লোকটা চিনে ফেলবে, তাকে যেন তৎক্ষণাৎ আনা হয় তার সামনে।

একদিন পাওয়া গেল এমন এক পুরুষকে। সে চেনে এই রমণীকে। মেয়েটির নিবাস মলয়পুরে। মলয়পুর সমুদ্রমধ্যস্থ একটা দ্বীপ। সেখানকার রাজা মলয়সিংহর মেয়ে এই মলয় বতী বড়ো ভয়ানক পুরুষবিদ্বেষিণী। কিন্তু এমনই কপাল তার স্বপ্নের মধ্যে বাগানে এক আশ্চর্য মানুষকে দেখে ইস্তক তার পুরুষবিদ্বেষ উধাও হয়েছে। সেই পুরুষকে প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে বিয়েও করেছে। কিন্তু সঙ্গমে প্রবৃত্ত হওয়ার মুহূর্তেই দাসীর ডাকে তার ঘুম ভেঙে যায়। সহবাসে অতৃপ্ত সেই মেয়ে এখন উন্মাদিনী প্রায়। প্রতিজ্ঞা করেছে, ছমাসের মধ্যে স্বপ্নের পুরুষকে না পেলে আত্মহত্যা করবে, পাঁচমাস তো গেল, বাকি আর এক মাস।

এই সংবাদ দিল যে বিদেশি, তার নাম শম্বরসিদ্ধি। ভদ্রায়ুধ বললে বিক্রমাদিত্যর—মনোরথ এইবার পূর্ণ হবে।

মলয়পুর এই সাম্রাজ্যের অধীন রাজ্য। মলয়সিংহ আমাদের সামন্ত রাজা। সুতরাং পুরুষবিদ্বেষিণী মলয়বতী অচিরেই এসে বসবে সম্রাটের অঙ্কে, সাঙ্গ হবে অসম্পূর্ণ সুরত ক্রিয়া।

তাই হয়েছিল। ষষ্ঠ মাসের শেষ দিবসে রাজকন্যা মলয়বতী যখন জ্বলন্ত চিতায় উঠে মরতে যাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে তার সামনে হাজির হয়েছিলেন সম্রাট বিক্রমাদিত্য অতঃপর মিলন, বিবাহ এবং ফুলশয্যা!

১২৩. মদনসুন্দরী কাহিনি

এত বউ থাকলে তাদের জটলা তো হবেই। মহিলা-মহল সদা সরগরম থাকবে, তবেই না রানি-মহল!

সম্রাট বিক্রমাদিত্যের মহিষী কলিঙ্গসেনা এইভাবেই একদিন আসর জমিয়ে বসল চমকপ্রদ আত্মকাহিনি শুনিয়ে।

বিষয় : পুরুষবিদ্বেষিনী মলয়বতী। এখন তার পুরুষবিদ্বেষ সম্পূর্ণ তিরোহিত বিক্রমাদিত্যের পৌরুষ প্রভাবে। এই কারণেই এক দফা স্বামী প্রশস্তি গেয়ে নিয়ে এবং পানের খিলি মুখে দিয়ে বললে কলিঙ্গসেনা, মানছি মলয়বতীর জন্যে যথেষ্ট করেছেন আমাদের সম্রাট। ওকে না হয় খুঁজে খুঁজে তুলে এনেছিলেন মনে ধরেছিল বলে, কিন্তু আমাকে তো জোর করে বিয়ে করেছেন।

শুনেই নড়েচড়ে বসল সব রানিরা। বলপূর্বক বিবাহ? হরণ না কী?

চিত্তাকর্ষক সেই কাহিনি শুরু করল কলিঙ্গসেনা।

লোকে বলে, সম্রাট বিক্রমাদিত্য বিপরীত স্বভাবের ব্যক্তি। কথাটা সত্য। নারী সেজেও পৌরুষপ্রভাব বিকিরণ করে জয় করলেন মলয়বতীর মতো রগচটা মেয়েকে, যে নাকি ব্যাটাছেলে দেখলেই তেড়ে যেত। মেরে ফেলত।

আমার ক্ষেত্রে দেখা গেল এই বিপরীত স্বভাবের আর এক দিক। নারী চিরকাল শরীরে কম শক্তি রাখে। পুরুষ তাকে রক্ষা করে। হ্যাঁ, নারী কামনা জাগায় পুরুষের শরীরে মনে। অজান্তে আমিও জাগিয়েছিলাম

সম্রাটের মনে। উনি কামদমন করেননি। কী করেছিলেন?

জোর করে আমাকে বিয়ে করেছিলেন। অথচ যখন উনি প্রথম আমাকে দেখেছিলেন, আমার রক্তমাংসের কামনা জাগানো কায়া তো দেখেননি।

দেখেছিলেন আমার পাথরের মূর্তি।

ব্যাপারটা শুনেছিলেন দেবসেনের মুখে। রাজা বিক্রমাদিত্য আমাকে জোর করে বিয়ে করতে চান শুনে মনটা খারাপ হয়েছিল। রাগও হয়েছিল। দেবসেন তখন আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, খামোকা রাগ করছ রাজার ওপর। উনি কিন্তু তোমার প্রতি অনুরাগ নিয়েই বিয়ে করেছেন। প্রেমে পড়েছেন। বিয়ে করেছেন, এর মধ্যে অন্যায়টা কোথায়? যাকে মন থেকে ভালোবাসা যায়, মন যাকে আকাঙ্ক্ষা করে, বাহু কি তাকে জোর করে বুকে টেনে নেয় না? রাজা বিষমশীল পুরুষ; অর্থাৎ বিপরীত স্বভাবের মানুষ। যখন যেমন, তখন তেমন। তাই তো উনি রাজচক্রবর্তী। মন যা চায়, তা কেড়ে নিতেও দ্বিধা করেন না।

আমি তখন বলেছিলাম, বিপরীত স্বভাবের মানুষ বলেই কি আমার পাথরের মূর্তিকে দেখে এমনই প্রেমে পড়লেন যে রক্তমাংসের আমাকে পাওয়ার জন্যে বাহুবল দেখালেন?

রানি মহলের রানিরা হইহই করে উঠল এই কথা শুনে।

তাই নাকি? তাই নাকি? পাথরের মূর্তির প্রেমে পড়েছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য?

পান চিবোতে চিবোতে কলিঙ্গসেনা বললে, তবে আর বলছি কী! আমার প্রস্তরমূর্তি দেখেই কাম জ্বর জ্বর হয়েছিলেন। যাক, যাক, দেবসেনের জবানিতে শোনাই সেই কাহিনি।

দেবসেন বললে : অনুগত পরিচারক মনোভাব নিয়ে পরিচর্যা করে যেতাম মহাপুরুষ বিক্রমাদিত্যকে। একদিন একটা খবর কানে এল। একটা ভয়ংকর শুয়োর তছনছ করছে জঙ্গল।

খবরটা দিলাম রাজাকে। তিনি মৃগয়াপ্রিয় পুরুষ। তক্ষুনি রওনা হলেন বরাহ বধের অভিলাষ নিয়ে।

যে ঘোড়ায় চেপে গেলেন, সেই ঘোড়া এককথায় এক অসামান্য অশ্ব। রাজার এক মেয়ে ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গম করে গেছিল দেবলোকের উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বপ্রেমে অন্ধ হয়ে। ফলে, জন্ম নেয় অসাধারণ এই অশ্ব, গতিবেগে যে পবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

এহেন বায়ুবেগী অশ্বের পিঠে চেপে পলায়মান শুয়োরের পেছনে ধাওয়া করলেন রাজা বিক্রমাদিত্য, ঝোপঝাড় জলাগর্ত টপকে টপকে।

কিন্তু একটা সময়ে প্রাণের ভয়ে বরাহ মহাশয় কোথায় যে অন্তর্ধান করল, রাজা তা বুঝতে পারলেন না।

ঘোড়ার রশি টেনে ধরলেন। একটানা অনেকক্ষণ ঘোড়া ছুটিয়ে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময়ে আমি তাঁর সামনে হাজির হয়েছিলাম।

রাজা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, দেবসেন, এলাম কত পথ?

আমি বলেছিলাম, তিনশো যোজন।

উনি তো অবাক। বলেছিলেন, তুমি স্রেফ দৌড়ে চলে এলে তিনশো যোজন! এ কী করে হয়?''

আমি বলেছিলাম, একটা মলমের জোরে। পায়ে মাখাই। পা তখন পাখা হয়ে যায়।

অবাক মহারাজা পাদমলম কাহিনি শুনতে চাইলেন। আমি বললাম :

বউ মারা যেতেই বিবাগী হয়ে গেছিলাম। সংসারের বলগা মুক্ত হয়ে প্রব্রজ্যা নিয়েছিলাম। দেশান্তরী হয়েছিলাম। এক কাপড়ে।

একদিন ঠাঁই নিয়েছিলাম একটা দেবমন্দিরে। আমাকে অতিথি হিসেবে সেবাযত্ন করেছিল একটা স্ত্রীলোক।

সেই দিনই নিশুতি রাতে সেই স্ত্রীলোকটি এক আশ্চর্য কাণ্ড দেখাল আমাকে। শিহরণ জাগানো কাণ্ড।

বিকট হাঁ করে, একটা ঠোঁট আমার গায়ে ঠেকিয়ে, আর একটা ঠোঁট ঠেকাল মাটিতে। হাঁ বটে একখানা অনায়াসে আমাকে আস্ত গিলে খাওয়ার মতো।

ওই অবস্থাতেই বললে লোমহর্ষক স্বরে, এ রকম হাঁ দেখেছ কোথাও?

আমি প্রব্রজ্যা নিলেও সশস্ত্র ছিলাম। তরবারি কোষমুক্ত করেছিলাম তৎক্ষণাৎ।

বলেছিলাম কণ্ঠস্বরে ডঙ্কা বাজিয়ে, তুমিও কি ভয়হীন পুরুষ কখনও দেখেছ?

অমনি রাক্ষসী রূপ পাল্টে নিয়ে আগের মতো রমণী রূপ ধারণ করে বললে সেই কামিনী, আমি কে জানো?

আমি বললাম কৃপাণ উঁচিয়ে রেখে, মানবী অন্তত নও।

সে বললো, আমি যক্ষিণী। আমার নাম চণ্ডী। তোমার সাহস দেখে প্রীত হলাম, বলো, কী চাও।''

আমি বললাম, বিনা ক্লেশে যেন সবতীর্থ দেখে নিতে পারি।

তবে নাও এই পাদ-মলম। পায়ে মাখিয়ে হাঁটলে পবনবেগে উড়ে যাবে।

ফলে, বায়ুবেগে সবতীর্থ দেখেছি। এখন আপনার ঘোড়ার পেছনেও ছুটে এসেছি। শুধু তাই নয়। রোজ সকালে আপনার রাজধানী থেকে পবনবেগে ছুটে আসি এই জঙ্গলে ফল আহরণ করি জঙ্গলের সব জায়গা থেকে। নিয়ে গিয়ে আপনার সেবায় লাগাই। এখন যদি আদেশ করেন, ভালো ভালো ফল এখুনি এনে দেব আপনাকে, আপনার চোখের পাতা পড়তে না পড়তেই। সবই যক্ষিণী চণ্ডীর মহিমা।

বিক্রমাদিত্য বললেন, তুমি এনে খাও। আমাকে দিতে হবে না।

এই বলে, রাজা একবার চোখের পাতা ফেললেন। দেখলেন, হাতে একটা ফল নিয়ে আমি ফিরে এসেছি। সেই ফলের নাম, কর্কটিকা। রাজার আদেশে কর্কটিকা ভক্ষণ করলাম ওঁর সামনেই।

কী আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা বিরাটকায় অজগর সাপ হয়ে গেলাম।

মন খারাপ হয়ে গেল রাজার। স্মরণ করলেন তাঁর একান্ত অনুগত বেতালকে।

নিমেষে বেতাল এল সামনে। হাতজোড় করে বললে—কী হুকুম?

রাজা বললেন, বড়ো গরিব আমার এই সেবক আচমকা অজগর হয়ে গেছে। একে অবার মানুষ করে দাও।

বেতাল বললে সবিনয়ে. আজ্ঞে, আমার তো সে শক্তি নেই। আকাশের বাজ যে আগুন রাখে নিজের মধ্যে, জল কি তা নেভাতে পারে?

রাজা বললেন, তাহলে চলো, সামনের ওই পল্লীতে যাওয়া যাক, দেখি, ওরা কিছু একটা বিহিত করতে পারে কিনা।

পল্লীর দিকে যখন যাচ্ছেন রাজা, অজগর আর বেতালকে নিয়ে, আচমকা রে-রে করে তেড়ে এল দলে দলে ডাকাত।

রাজা রেগে গিয়ে হুকুম দিলেন বেতালকে, ধরো আর খাও।

টপাটপ পাঁচশো ডাকাত খাওয়া হতেই বাকিরা চোঁ-চোঁ দৌড় দিয়ে চম্পট দিল তৎক্ষণাৎ।

খবর দিল ডাকাত রাজাকে।

সে এসেই রাজা বিক্রমাদিত্যকে দেখে মাটিতে শুয়ে আগে সেরে নিল প্রণাম।

তারপর বললে, আমি আপনার পায়ের জুতো, এক সামন্ত। হুকুম করুন কী করতে হবে।

বিক্রমাদিত্য বললেন, এই যে অজগর, এ ছিল মানুষ, আমার সেবক। বনের বিষাক্ত ফল খেয়ে অজগর হয়ে গেছে। একে মানুষ করে দাও।

ডাকাত রাজা হুকুম দিল নিজের ছেলেকে।

সেই ছেলে বেতালকে নিয়ে, তার কাঁধে চেপে, গোটা জঙ্গল চষে ফেলে, খুঁজে খুঁজে বের করল একরকম গাছের পাতা। সেই পাতার রস অজগররূপী আমাকে গিলিয়ে দিতেই ফের মানুষ হয়ে গেলাম আমি।

মহানন্দে ডাকাত রাজা আমাদের নিয়ে গেল নিজের জঙ্গল-প্রাসাদে। প্রাসাদ বলে প্রাসাদ! চোখ ঠিকরে দেওয়ার মতো! আগাগোড়া হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি। জানলা দরজায় ঝুলছে বাঘের ছাল দিয়ে তৈরি পর্দা। ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে বাহারি করা প্রতিটা দেওয়াল।

ডাকাত রানি খুব সেবা করল আমাদের।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিক্রমাদিত্য প্রশ্ন করলেন ডাকাত রাজাকে, বিস্মিত হচ্ছি একটা ব্যাপার দেখে।

সবিনয়ে বললে ডাকাত রাজা, আমার এই প্রাসাদ দেখে?

আরে না, তোমার সব ছেলেই তো দেখছি বুড়ো। তুমি কিন্তু যুবক। তোমার স্ত্রীও যুবতী। এটা কী করে হয়? রহস্যটা প্রাঞ্জল করে দিয়েছিল ডাকাত রাজা অত্যাশ্চর্য এক কাহিনি শুনিয়ে। সেই কাহিনি নিবেদিত হোক তার জবানিতেই।

অনেক আগে আমি ছিলাম ব্রাহ্মণ। নিবাস ছিল মায়াপুরী নগরে।

বাবার হুকুমে কাঠ জোগাড় করতে গেছিলাম জঙ্গলে। পথ আটকায় একটা বাঁদর। ইশারায় যেতে বলে অন্যদিকে।

গেছিলাম তার পেছন পেছন। উঠেছিলাম একটা জাম গাছে। দেখেছিলাম, লতায় জড়িয়ে আটকে রয়েছে এক বাঁদরি, তার বউ।

বুঝেছিলাম তাদের ইশারার কাকুতি। লতার বাঁধন ছাড়িয়ে মুক্ত করেছিলাম বাঁদরিকে।

ওরা আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। তারপর জঙ্গল থেকে একটা অদ্ভুতদর্শন ফল এনেছিল কৃতজ্ঞ বাঁদর। ইশারায় আমাকে খেতে বলেছিল।

আমি সেই ফল বাড়িতে এনেছিলাম। বউকে অর্ধেক খাইয়ে বাকি অর্ধেক নিজে খেয়েছিলাম।

সেই থেকে আমাদের দুজনের অসুখবিসুখ হয় না, বয়স আর বাড়ে না। আমরা চিরযৌবন পেলাম।

এই সময়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল মায়াপুরীতে। অনাহারে মৃতদের ফেলে মানুষ পালাল যে যেদিকে পারে।

বউকে নিয়ে আমি এলাম এই দেশে।

কাঞ্চনদংষ্ট্র ছিল এখানকার শবররাজা। আমি তার চাকর হয়ে রইলাম। আমার সাহস আর শক্তি দেখে আমাকে একসময়ে উনি রাজ্য সেনাপতি করে দিলেন।

তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। মৃত্যুকালে এই রাজ্যের অধিপতি করে গেলেন।

এইখানেই আছি একশো সাতাশ বছর। দৈবফলের শক্তিবলে আমি আর আমার স্ত্রী অসুখে ভুগি না, বয়েসে বাড়ি না।

ডাকাত রাজার নাম কেশরী।

কাহিনি শেষ করে সে বললে, আমার আর এক বউ আছে। সে ক্ষত্রিয় কন্যা। তার যে মেয়ে, আমার ঔরসজাত, সে পরমাসুন্দরী। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সম্মেলন। আপনি তাকে বিয়ে করে আমাকে কৃতার্থ করুন। তার নাম মদনসুন্দরী।

হয়ে গেল বিয়ে। নতুন বউ নিয়ে স্বরাজ্যে ফেরবার পথে বুনো শুয়োরটাকে দেখতে পেলেন রাজা বিক্রমাদিত্য। তৎক্ষণাৎ তাকে বধ করলেন।

বেতাল ছুটে গিয়ে তার পেট চিরতেই পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক দিব্য পুরুষ।

রাজা তো অবাক। জিজ্ঞেস করেছিলেন তাকে, কে তুমি? শুয়োরের পেটে ঢুকে দিব্বি বেঁচে রয়েছে তো! ঢুকলে কী করে? নিবাস কোথায়?

প্রশ্নমালা সমাপ্ত হতে না হতেই বৃংহণ নিনাদ ছেড়ে তেড়ে এল এক বুনোহাতি।

রাজা তাকে তির মেরে শেষ করে দিলেন।

তৎক্ষণাৎ তারও পেট চিরে ফেলল বেতাল। উদরের কোটর থেকে বেরিয়ে এল এক দিব্য পুরুষ আর এক দিব্য নারী।

রাজা অবাক। সামনে দাঁড়িয়ে দুজন পুরুষ, একজন নারী। কী তাদের পরিচয়? হাতি আর শুয়োরের পেটে নিবাস রচনার কারণ?

কৌতূহলোদ্দীপক সেই কারণ বিবৃত হল উপর্যুপরি বিস্ময়কর কাহিনি নিবেদনের মাধ্যমে। একটার সঙ্গে আর একটা সেঁধিয়ে গিয়ে সে এক জটপাকানো কাহিনি। বলা যাক স্তরে স্তরে, জট খোলা যাক পাটে পাটে।

দিব্যপুরুষ দুজনের একজন, যে জন বেরিয়েছে শুয়োরের পেট থেকে, সে বললে, আমার নাম ভদ্র। আর এই যে দেবকুমার, হাতির পেট থেকে যে বেরোল, এর নাম শুভ। আমরা দুই বন্ধু একদিন টহল দিচ্ছিলাম জঙ্গলে। ধ্যানমগ্ন এক ঋষিকে দেখে মজা করতে চেয়েছিলাম। হাতি আর শুয়োরের চেহারা নিয়ে হাঁকডাক লাফঝাঁপ শুরু করেছিলাম। ঋষি ভয়ার্ত হন। উনি ছিলেন অতীন্দ্রিয় নয়নের অধিকারী। আমরা যে আদৌ হাতি আর শুয়োর নয়, মজা করার জন্যে হাতি আর শুয়োরের রূপ ধারণ করেছি, তা উনি অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন। রেগে গেছিলেন। অভিশাপ দিয়েছিলেন, থাক এই জঙ্গলে শুয়োর আর হাতি হয়ে। রাজা বিক্রমাদিত্য এসে তোদের আসল রূপ ফিরিয়ে দেবেন।

আজ আমরা শাপমুক্ত। চললাম স্বর্লোকে।

অন্তর্হিত হল দুই দিব্যপুরুষ।

এবার শুরু হল হাতির পেট থেকে বেরিয়ে আসা সেই সুন্দরীর কাহিনি।

সে বললে, আমি এক বণিকের বউ। আমার স্বামীর নাম ধনদত্ত। নিবাস উজ্জয়িনীতে। বাড়ির ছাদে শুয়েছিলাম। এই হাতিটা সেখানে গিয়ে আমাকে গিলে খেয়েছিল। তখন অবাক হয়েছিলাম, এখন আর হচ্ছি না। দুষ্টুমি করবে বলেই দেবকুমার হাতি সেজেছিল, তাই দিব্যক্ষমতা নিয়ে প্রাসাদের ছাদে উঠতে পেরেছিল। পেটের মধ্যে থেকে তার আসল রূপ কক্ষনো দেখিনি, আজ দেখলাম।

বড়ো করুণ কাহিনি। বিক্রমাদিত্য তাকে বললেন, আমার নতুন বউ মদনসুন্দরীর সঙ্গে এখন থাক। ফিরিয়ে দেব তোমার স্বামীর কাছে।

দেবসেন বলে যাচ্ছে তার চমকধামা কাহিনি পরম্পরা :

রাজা বিক্রমাদিত্য সদল বলে যখন পথ চলছেন, দেখা গেল দুজন রূপসী রাজকন্যাও চলেছে সেই অনেক লোকজন নিয়ে।

রাজা তাদের পরিচয় জানতে চাইলেন।

দুই কন্যার মাতব্বররা এসে বললে, কটাহ দ্বীপের গুণসাগর রাজার মেয়ে গুণবতীর কোষ্ঠী বিচার করে জ্যোতিষীরা বলেছিল, এই মেয়ে হবে রাজা বিক্রমাদিত্যের রানি। তাই তাকে জাহাজে চাপিয়ে পাঠানো হয়েছিল আপনার কাছে। একটা রাক্ষুসে মাছ জাহাজটাকে গিলে ফেলে। তীরে পৌঁছে মরে যায়। জেলেরা মাছের পেট কেটে আস্ত জাহাজটাকে বের করে। পাওয়া যায় জীবন্ত রাজকন্যাকে। সেই দ্বীপের রাজা ছিলেন রাজা গুণসাগরের শ্যালক। রাজকন্যা গুণবতীর মামা। এঁর নিজের মেয়ের নাম গুণধরা। উনি ঠিক করলেন তারও বিয়ে দেবেন বিক্রমাদিত্য রাজার সঙ্গে। সেই গুণবতী আর গুণধরা রয়েছে আমাদের সঙ্গে।

বিক্রমাদিত্য ভাবী দুই বধূকে রাখলেন নতুন বউ মদনসুন্দরীর কাছে, যার কাছে রয়েছে বণিক ধনদত্তের বউও।

দেবসেন বলে যাচ্ছে তার বিস্ময়কর কাহিনি :

রাজা বিক্রমাদিত্যর সঙ্গে চলেছি আমি আর বেতাল। এমন সময়ে মুরজ বাজনার আওয়াজ শোনা গেল। তখন সন্ধ্যা হচ্ছে।

বেতাল বললে, কাছেই আছে বিশ্বকর্মার মন্দির। বাজনা বাজছে সেখানে।

গেলাম সেখানে দেখলাম, নেচে নেচে সন্ধ্যারতি করছে দিব্য সুন্দরীরা। গান গাইছে দিব্য রমণীরা।

কিন্তু যেই শেষ হল সন্ধ্যারতি, অমনি নাচনি আর গাইয়ে মেয়েগুলো মন্দিরের দেওয়ালের পাথরের পুতুল হয়ে গেল।

আমরা তো অবাক।

বুঝিয়ে দিল বেতাল, এ সবই বিশ্বকর্মার মায়ার খেলা। রোজ সন্ধ্যায় নেচে গেয়ে যায় পাথরের মূর্তিরা রক্তমাংসের চেহারা নিয়ে।

অবাক রাজা প্রস্তরমূর্তিদের দিকে চেয়েছিলেন। একটা মূর্তিকে দেখে প্রেমে পড়ে গেলেন।

বললেন, এই মেয়েকেই বিয়ে করব। একে চাই।

বেতাল বললে, পাবেন। এর নাম কলিঙ্গসেনা, কলিঙ্গরাজার কন্যা। এক শিল্পী তাকে দেখে এই মূর্তি গড়েছে। আপনি কেড়ে নিয়ে বিয়ে করুন, যদি চেয়ে না পান।

পরের দিন সকালে পথ চলতে চলতে দেখা হল দুজন পুরুষের সঙ্গে।

তাদের একজন ধনদত্ত বণিক। উজ্জয়িনীতে নিবাস। যার বউ ঘুমোচ্ছিল ছাদে, আর তাকে দেখা যায়নি, উড়ে গেছে ছাদ থেকে। কিন্তু রেখে গেছে একটা ফুলের মালা, যা এখনও শুকোয়নি, অর্থাৎ, বউ এখনও সতী রয়েছে।

তাই সে বউকে খুঁজতে বেরিয়েছে। পথে একজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে আলাপ হয়েছে মনমরা ধনদত্তকে সে শুনিয়ে দিয়েছে এক গল্প, হতাশ না হওয়ার গল্প। কেননা, সে-ও তো তার মরা বউকে জীবিত অবস্থায় পেয়েছে। এই সেই গল্প।

ব্রাহ্মণ বলছে :

অনেক আগে পাটলীপুত্র নগরে ছিল এক ভারি সুন্দর ব্রাহ্মণ তনয়। তার নাম কেশট। তার বাবার নাম দেমট। মনের মতো বউয়ের খোঁজে একদিন সে বেরিয়ে পড়ল তীর্থভ্রমণে। পুণ্য সঞ্চয় আর পুণ্যবতী স্ত্রী লাভ, একই প্রয়াসে দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে।

নর্মদার তীরে পৌঁছে দেখল, বিরাট এক জনতা চলেছে পথজুড়ে। ভিড়ের মধ্যে থেকে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেরিয়ে এসে কেশটকে বললেন, আমার একটা উপকার করবে?

কেশট বললে, সাধ্যের মধ্যে হলে নিশ্চয় করব।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন, আমার একই ছেলে। আজ তার বিয়ে, বয়যাত্রীদের নিয়ে যাচ্ছি মেয়ের বাড়ি।

কেশট বলসে, বরযাত্রী যেতে হবে আমাকে?

বৃদ্ধ বললেন, বর হয়ে।

হতভম্ব কেশট বললে, সেটা কিরকম কথা হল?

বৃদ্ধ বললেন, আমার ছেলে অতিশয় কুরূপ। তাকে না দেখিয়ে বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি। কিন্তু বিয়ের আসরে তাকে দেখলেই বিয়ে ভেঙে যাবে। তুমি চল বর সেজে। বিয়েটা হয়ে গেলেই সুযোগ বুঝে মেয়েকে দেবে আমার ছেলেকে।

চাঁচাছোলা প্রস্তাব। বুড়োর গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি। কিন্তু কেশট রাজি হয়ে গেল। সে-ও তো বউ খুঁজতে বেরিয়েছে। নিজে না পেলেও আর একজনকে পাইয়ে দিতে ক্ষতি কী?

কেশট গেল বর সেজে। এমনিতে সে সুদর্শন, সাজগোজের ফলে হচ্ছিল স্বয়ং কন্দর্প। কনের বান্ধবীরাও তাকে দেখে প্রেমে পড়ে গেল। এদের নাম শৃঙ্গারবতী আর অঙ্গারবতী।

হয়ে গেল বিয়ে। হঠাৎ পাওয়া বধূর নাম রূপবতী। প্রকৃতই রূপবতী।

পরের দিন বর-কন্যা বিদায় হতেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কেশটকে তুলল একটা নৌকোয়, নববধূকে অন্য নৌকোয়। সঙ্গে দুই সখী শৃঙ্গারবতী আর অঙ্গারবতী।

নর্মদার মাঝে গিয়ে কেশটের নৌকোর মাঝিরা লাফিয়ে পড়ল নদীতে, সাঁতারে চলে গেল তীরে। তাদেরকে যে শিখিয়ে রেখেছিল মহাঘুঘু সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

ঝড়ের মতো বাতাস আর ক্ষুরের মতো স্রোত ডুবিয়ে দিল কেশট-এর নৌকো। ভেসে গিয়ে তীরে উঠল কেশট।

ঘুমোতে পারেনি সারারাত। শেষ রাতে অদ্ভুত একটা আওয়াজ শুনে চোখ তুলে দেখল, আকাশ থেকে নেমে আসছে এক সুদর্শন পুরুষ।

মাটিতে পা দিয়েই সে জিজ্ঞেস করেছিল কেশটকে, কে তুমি?

কেশট বলেছিল নিজের কথা।

আকাশ থেকে আসা সেই সুপুরুষ তখন আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, তুমি তো দেখছি আমার অবস্থায় পড়েছ।

বলে, শুনিয়ে দিল নিজের কথা।

আমি রত্নপুরে থাকি। ব্রাহ্মণ। আমার নাম কন্দর্প। ঘরে আমার বউ আছে। তার নাম অনঙ্গবতী। এক সন্ধ্যায় নদীতে স্নান করতে গিয়ে পা পিছলে স্রোতে ভেসে গেছিলাম। অনেক দূরে তীরে উঠেছিলাম। ঠাঁই নিয়েছিলাম একটা গাছের ওপরে। সেখান থেকেই দেখেছিলাম অনেক দূরের একটা মন্দির। গাছ থেকে নেমে, গেছিলাম সেই মন্দিরে। দেখেছিলাম সারবন্দি প্রতিমা। সবই নারীমূর্তি। মাতৃরূপ।

আমি ভক্তিভরে মন থেকে পুজো করেছিলাম। স্তব করেছিলাম। বলেছিলাম, আমি অসহায়। বিপদাপন্ন। আপনাদের আশ্রয় নিলাম।

গভীর রাতে প্রতিটি মূর্তি ভেদ করে বেরিয়ে এল একজন করে যোগিনী। তাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা আমার কানে ভেসে এল।

তারা বলছে, এই মানুষটা এসেছে আমাদের আশ্রয়ে। অথচ আজ আমরা চক্রপুরে যাচ্ছি, মিলনমেলায়। বিপজ্জনক এই জায়গায় একে নিরাপদে রেখে যাই, আমাদের কর্তব্য যে তাই। ফিরে এসে যা করবার করব। একে নিয়ে একটু মজাও করে নেওয়া যাক।

বলে, আমাকে নানারকম রত্নের আভরণ পড়িয়ে শূন্যে তুলে নিল। রেখে দিল এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে। মজা করার জন্যে।

সেখানে গিয়ে দেখি, মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সব আয়োজন করা রয়েছে। বর এসে তখনও পৌঁছয়নি।

আমার সাজগোজ আর সুন্দর কান্তি দেখে সবাই হইহই করে সমাদর জানিয়েছিল। ভেবেছিল, বর এসেছে। মাথায় তুলে নিয়ে বসিয়েছিল বরের বিয়ের আসনে। কন্যাকে সম্প্রদানও করা হয়ে গেল।

সবাই বললে, রাজযোটক মিল হয়েছে। যেন চাঁদ আর সূর্য।

সুন্দরী বধূসহ ঘুমিয়ে পড়লাম বাসর ঘরে। বড়ো ক্লান্ত ছিলাম। গভীর রাতে যোগিনীরা ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে নিয়ে গেল আকাশে, মাতৃমন্দিরে ফিরিয়ে দেবে বলে ফের মজা করার জন্যে।

এই সময়ে মেয়েলি ঝগড়া লাগল নিজেদের মধ্যে। তুচ্ছ কারণে। কে আমাকে বয়ে করে নিয়ে যাবে, এই কারণে। হাজার হোক সুপুরুষ তো।

টানাটানিতে আমি তাদের হাত ফসকে সোঁ-সোঁ করে নেমে এসে দেখলাম তোমাকে।

দুজনেই দেখছি একই দুরবস্থায়। হঠাৎ বিয়ে অজানা সুন্দরীদের সঙ্গে, তারপর বউ কোথায়, কেউ জানি না। পোড়া কপাল আর ফেরা কপাল একেই বলে।

কন্দর্প কাহিনি শেষ হল। কেশট এক চোট হেসে নিয়ে বললে, ভালোরে ভালো! একই জ্বালা দুজনের। চলো, একসঙ্গেই চম্পট দেওয়া যাক।

কেশট আর কন্দর্প অনেক দুঃসাহস দেখিয়ে, সমুদ্র পেরিয়ে, পৌঁছোল একটা নদীর তীরে। সেই নদীর নাম রত্ন নদী। নদীর তীরে যে নগর, তার নাম ভীমপুর।

এক জায়গায় জেলেরা কেন ভিড় করে হইচই করছে, তা দেখতে গেছিল দুজনে।

দেখেছিল বিরাট একটা মাছ মরে গিয়ে তীরে এসে ঠেকেছে। জেলেরা তার পেট চিরছে।

পেটকাটা শেষ হতে না হতেই ভেতর থেকে হেঁটে বেরিয়ে এল অপরূপা এক রমণী।

লাফিয়ে উঠে কন্দর্প বললে, আরে, আরে, এই তো সেই মেয়ে যাকে আমি হঠাৎ বিয়ে করে ফেলেছি। কিন্তু মাছের পেটে গেল কেন সে? আড়াল থেকে দেখা যাক ব্যাপারটা।

শুধু দেখা নয়, শুনেও নিল মাছের পেটে মেয়ে গেল কী করে।

জিজ্ঞেস করল জেলেরা, ও মেয়ে, মাছের পেটে গেলে কেন?

মেয়ে বললে, সাধ করে কী গেছি? আমি বামুনের মেয়ে। আমার বাবার নাম জয়দত্ত। বাড়ি রত্নাকর নগরে। আমার নাম সুমনা। আমার বিয়ের রাতে আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে আমার বর চলে যায়। আমি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ি মরবার জন্যে। কিন্তু এই মাছটা আমাকে জ্যান্ত গিলে ফেলেছিল। তাই এখনও জ্যান্ত রয়েছি।

শুনেই, ভিড়ের মধ্যে থেকে দৌড়ে এল এক ব্রাহ্মণ, সুমনা, আমি তোর মামা যজ্ঞস্বামী।

মামাকে চিনতে পেরে পতিহারা ভাগ্নি বললে, আমার চিতা বানাও। পুড়ে মরব।

তখন বীরদর্পে সামনে গেল কন্দর্প, চিনতে পারছ?

বরকে কোন বউ না চিনতে পারে? কন্দর্পের পায়ে লুটিয়ে পড়ল হঠাৎ-বিয়ে করা হঠাৎ-ফিরে-পাওয়া বধূ।

কেশটও গেল কন্দর্পের মামাশ্বশুরের বাড়িতে। খাতিরযত্নের পর বললে বন্ধুকে—তুমি থাকো বউ নিয়ে, আমি চললাম বউ খুঁজতে। তীর্থে তীর্থে। না পেলে, মরব।

কন্দর্পের মামাশ্বশুর যজ্ঞস্বামী তখন শুনিয়ে দিল এক আশ্চর্য কাহিনি, যে গল্পের মর্মার্থ এই : বেঁচে থাকলে বউ ফিরে আসে, যেমন ঘটেছিল কুসুমায়ুধের ক্ষেত্রে।

ব্রাহ্মণপুত্র কুসুমায়ুধ যে গুরুর বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করত, সেই গুরুর মেয়ে কমললোচনার সঙ্গে তার প্রণয় ছিল ছোটবেলা থেকে।

গুরু তা জানতেন না। তিনি মেয়ের জন্যে পাত্র ঠিক করলেন। কমললোচনা বললে কুসুমায়ুধকে, নিয়ে যাও আমাকে এখান থেকে তোমাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করব না।

কুসুমায়ুধ একটা ঘোড়ার পিঠে কমললোচনাকে চাপিয়ে, সঙ্গে একজন বিশ্বাসী চাকর দিয়ে, পাঠিয়ে দিল নির্দিষ্ট এক জায়গায়, যেখানে পরে গিয়ে পৌঁছোবে কুসুমায়ুধ।

বদমাস চাকর সেখানে না গিয়ে, কমললোচনাকে নিয়ে গেল অন্য একটা জায়গায়। এক বাগানে তাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে বললে, বিয়ে করো আমাকে।

বুদ্ধিমতী কমললোচনা বললে, খুব ভালো, খুবভালো, তোমাকে ভালোবেসেছি কতদিন থেকে। যাও, বিয়ের জিনিসপত্র আর বামুনঠাকুর আনো, বিয়ে হোক এইখানেই।

আনন্দে নাচতে নাচতে চাকর গেল বিয়ের সরঞ্জাম আর বামুন ঠাকুর আনতে।

সেই ফাঁকে ঘোড়ায় উঠে চম্পট দিল চতুরা কমললোচনা। উঠল এক বুড়ো মালাকারের বাড়ি।

বুড়ো সব শুনলেন। কমললোচনাকে বাড়িতে লুকিয়ে রাখলেন।

চাকর নেচে নেচে বিয়ের জিনিসপত্র এনে দেখল, কনে পালিয়েছে। কুসুমায়ুধকে ফিরে গিয়ে বললে সেই কথা, তোমার কনে আর কাউকে ভালোবাসে। সে পালিয়েছে।

মন খারাপ হয়ে গেল কুসুমায়ুধর। ফিরে গেল নিজের বাড়ি। তার বাবা তাকে বিদেশে পাঠালেন বিয়ে করার জন্যে, পাত্রী তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন।

ভাগ্যচক্রে কুসুমায়ুধ এল সেই নগরেই যেখানে রয়েছে কুসুমলোচনা।

একদিন বাগানে বেড়াতে বেড়াতে কুসুমলোচনা দেখতে পেল কুসুমায়ুধকে।

খবর দিল মালাকারকে।

মালাকার তৎক্ষণাৎ কুসুমায়ুধের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ালেন কুসুমলোচনার।

কিন্তু যে মেয়েকে বিয়ে করতে বাবা পাঠিয়েছেন এই নগরে, তাকেও তো বিয়ে করতে হবে! বাবার হুকুম!

কুসুমায়ুধ বিয়ে করল তাকেও।

দুই বউকে নিয়ে দেশে ফিরে বিশ্বাসঘাতক সেই চাকরকে পিটিয়ে আধমরা করে তাড়িয়ে দিল তল্লাট থেকে।

কাহিনি শেষ করে কন্দর্পের মামাশ্বশুর যজ্ঞস্বামী বললেন, বৎস কেশট, ধৈর্য হারিও না। তিতিক্ষা আর সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে থাকো। প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন ঘটবেই, প্রেমের আকর্ষণে।

কিছুদিন ব্রাহ্মণ যজ্ঞস্বামীর বাড়িতে পরমানন্দে রইল কেশট। যজ্ঞস্বামী অতিশয় অতিথি বৎসল। অতিথি পেলে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করেন।

তারপর একদিন কেশট, কন্দর্প আর সুমনা রওনা হল বাড়ির দিকে। জঙ্গল পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে তিনজনে ছিটকে গেল তিনদিকে, বুনো হাতির তাড়াখেয়ে। কেশট কোনোমতে অরণ্য অতিক্রম করে কাশীপুরে পৌঁছে দেখল কন্দর্প আগেই এসে গেছে সেখানে।

সেখান থেকে দুই বন্ধু গেল পাটলীপুত্রে।

সুমনা তখন কোথায়?

সুমনা জঙ্গল থেকে বেরোনোর পথ খুঁজে না পেয়ে আগুনে পুড়ে মরতে গেছিল।

ঠিক তখনই টনক নড়েছিল সেই যোগিনীদের, যারা কন্দর্পকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছিল শূন্যপথে, ফলে সোঁ-সোঁ করে কন্দর্প নেমে এসেছিল কেশট-এর সামনে।

মাতৃমন্দিরে যোগিনীরা ঢুকে গেছিল যে যার প্রতিমার মধ্যে। কন্দর্পের বউ যে জঙ্গলের পথ হারিয়ে পুড়ে মরতে যাচ্ছে, তা তারা জেনে গেছিল প্রতিমার মধ্যে ধ্যানস্থ অবস্থায়।

মজা করতে গিয়ে সুমনার প্রাণ যাক, এটা তো তারা চায়নি। তারা তো জানে, কন্দর্প বিবাহিত। বউ অনঙ্গবতী রয়েছে ঘরে। মজা করে তারা সাজিয়ে গুছিয়ে কন্দর্পর বিয়ে দিয়েছে সুমনার সঙ্গে।

সেই সুমনা পুড়ে মরতে যাচ্ছে!

নিমেষে তারা এসে গেল জঙ্গলে। সুমনাকে তুলে নিয়ে গিয়ে রেখে দিল কন্দর্পের বাড়িতে, যেখানে রয়েছে সতীন অনঙ্গবতী।

এটাও একটা মজা, যোগিনীদের কাছে!

সুমনা যাতে কিছু টের না পায়, তাই তাকে ঘুম পাড়িয়ে এত কাণ্ড করে গেল যোগিনীরা!

সক্কালবেলা হইচই শুনে ঘুম ভাঙল সুমনার। যোগিনীরা তাকে রেখে গেছিল ফাঁকা একটা ঘরে।

কান পেতে শুনল দাসদাসীদের কথা। এ বাড়ির বউ, অনঙ্গবতী, যার স্বামী কন্দর্প বহুদিন বাড়ি ছাড়া, সে আগুনে পুড়ে মরতে যাচ্ছে মনের দুঃখে।

শুনেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছিল সুমনা। বলেছিল অনঙ্গবতীকে, ওগো, আমি তোমার বরের দ্বিতীয় বউ। সে আছে জঙ্গলে। ফিরবে যথাসময়ে। কেন মরতে যাচ্ছ?

আশার কথা শুনে পুড়ে মরার ইচ্ছে ত্যাগ করেছিল অনঙ্গবতী।

কন্দর্পের বাবা আর পরমানন্দে বরণ করে নিয়েছিল দ্বিতীয় বউমা, সুমনাকে।

কেশট তখন কোথায়?

ঘটনাচক্র তাকে নিয়ে গেছে হঠাৎ-পাওয়া আর হঠাৎ-হারিয়ে যাওয়া বধূ রূপবতীর কাছে!

সেই রূপবতী, যার বিয়ে হতে যাচ্ছিল কুরূপ ব্রাহ্মণ-তনয়ের সঙ্গে! যাকে আলাদা নৌকোয় বসিয়ে, কেশট-এর নৌকো ডুবিয়ে দিয়ে, সরে পড়েছিল শঠ ব্রাহ্মণ! যার সঙ্গে ছিল দুই রূপসী সখী, শৃঙ্গারবতী আর অঙ্গারবতী যারা ভালোবেসে ফেলেছিল কেশটকে, পণ করেছিল কেশটের গলায় মালা দেবে সুযোগ পেলেই।

তারপর কী ঘটেছিল?

পাটলিপুত্রে কেশট-এর বাড়িতে ছিল কন্দর্প আর কেশট।

বউ সুমনার জন্যে মন হু-হু করছিল কন্দর্পর। জঙ্গলে তাকে ফেলে পালিয়ে এসেছে দুই বন্ধু হাতির তাড়া খেয়ে।

এখন কি বন্ধুর সঙ্গে মণ্ডামিঠাই সাঁটা যায়?

তাই একদিন কেশটকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে চলে গেল কন্দর্প। গেল পাটলিপুত্র ছেড়ে, বউয়ের খোঁজে।

কন্দর্প নেই? হু-হু করে উঠেছিল কেশট-এর মন। তারও তো বউ রূপবতীর জন্যে মন কেমন করছে।

তাই, বাবা আর মাকে কিছু না জানিয়ে গৃহত্যাগী হল সে নিজেও। দেশে দেশে খুঁজে বের করবে রূপবতীকে।

কন্দর্প টোঁ-টোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছোল সেই নগরে যেখানে একদা রূপবতীকে বিয়ে করেছিল কেশট।

হইচই শুনে খবর নিতে গেল। শুনল, রূপবতী নাম্নী স্বামী, বিরহিনী সংবাদ।

কিন্তু রূপবতীকে নিয়ে তো চম্পট দিয়েছিল ধুরন্ধর সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, কেশট-এর নৌকো ডুবিয়ে দিয়!

তারপর?

রূপবতী বেঁকে বসেছিল কদাকার ব্রাহ্মণপুত্রকে তার সামনে আনতেই। যার সঙ্গে বিয়েই হয়নি, তাকে স্বামী বলে মেনে নেবে কেন?

রাজার ভয়ে বুড়ো বামুন রূপবতীকে রেখে এসেছিল তার বাপের বাড়ি।

বাবাকে বলেছিল রূপবতী, যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে, তার নাম কেশট। তার বাবার নাম দেমট। নিবাস পাটলিপুত্রে।

রূপবতীর বাবা বললেন, এত প্রসঙ্গ জানলে কি বিয়ের রাতে? জেনেই যদি থাকিস, বলিসনি কেন?

মুখ ভার করে রূপবতী বলেছিল, জানলাম তো পরে। বদমাস বামুন বুড়োকে ভয় দেখাতেই সে বলে দিয়েছে। সে আগেই জেনে নিয়েছিল, নিজের কুৎসিত ছেলের বদলে কার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছে আমার। তোমরাই বা আগে পাত্র দেখে বিয়ে ঠিক করনি কেন?

ধমক খেয়ে রূপবতীর বাবা রূপবতীকে রেখে এসেছিল পাটলিপুত্রে, কেশট-এর বাড়ি।

অভাগী রূপবতী সেখানে পৌঁছে শুনল, স্বামী কেশট বাড়ি ফিরে ফের বেরিয়ে গেছে বধূ রূপবতীর খোঁজে।

ভেঙে পড়েছিল রূপবতী। আগুনে পুড়ে মরবে ঠিক করেছিল।

কেশটকে মনে মনে রূপবতীর যে দুই সখী স্বামী বলে মেনে নিয়েছিল, শৃঙ্গারবতী আর অঙ্গারবতী, যারা রূপবতীর সঙ্গে সঙ্গেই ছিল এতদিন, তারাও ঠিক করেছে, পুড়ে মরবে রূপবতীর সঙ্গে।

তিন-তিনটে মেয়ে জ্বলন্ত চিতায় উঠবে একসঙ্গে। হইচই হচ্ছে এই কারণেই।

বিধাতার কি লীলা! ঘটনাবর্ত কি বিস্ময়কর! নিয়তি কখনও নিষ্ঠুর, কখনও কৌতুকী!

চিতায় যখন আগুন দেওয়া হয়েছে, ভিড় ঠেলে সামনে গেল কন্দর্প।

বললে রূপবতীকে, খামোকা মরতে যেও না। তোমার স্বামী কেশট তো বেঁচে আছে। আমি তার বন্ধু, আমার নাম কন্দর্প। বলে, গুছিয়ে বলে গেল বুড়ো বামুনের শঠতা আর কেশট-এর ভাগ্য বিপর্যয় কাহিনি।

মহানন্দে নেচে নেচে ঘরে ফিরে গেল রূপবতী, শৃঙ্গারবতী আর অঙ্গারবতী।

কন্দর্প রইল সেই বাড়িতেই। জামাইয়ের বন্ধু যে! আদর পেল অনেক!

কেশট তখন কোথায়?

কন্দর্প বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে কেশট ও গৃহত্যাগী হয়েছিল, আগেই তা বলা হয়েছে।

ঘুরতে ঘুরতে এসেছিল কন্দর্পের বাড়ির কাছে। বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়েছিল সুমনা, কন্দর্পর বউ। কেশটকে দেখেই খবর দিয়েছিল শ্বশুরমশায়কে।

তিনি কেশটকে নিয়ে এলেন বাড়িতে। সব শুনলেন। কেশটকে বাড়িতেই রেখে দিলেন। আর ঠিক এই সময়েই চিঠি নিয়ে লোক এল কন্দর্পের কাছ থেকে। সে জানিয়েছে, কেশট যেখানে বিয়ে করেছিল

রূপবতীকে, সে রয়েছে সেইখানেই। রয়েছে কেশট বধূও!

পরের দিনই কেশট গেল নিজের বউ আর বন্ধু কন্দর্পকে আনতে। সেখানে গিয়ে পেল বন্ধু কন্দর্প, বউ রূপবতী আর তার দুই সখীকে, বিয়ে করে নিল দুজনকেই। তিন, বউকে নিয়ে চলে গেল স্বদেশে।

কন্দর্পও বাড়ি ফিরে গিয়ে পেল দুই বউ, সুমনা আর অনঙ্গবতীকে।

এইভাবেই ভাগ্য বিপর্যয়ের পর দুই বন্ধু বউ হারিয়েও ফিরে পেল বউদের।

আর এইভাবেই দুর্দৈব কাটিয়ে উঠে প্রিয়তম আর প্রিয়তমাদের মিলন হয়, ধৈর্য আছে যাদের।

ব্রাহ্মণের গল্প পরম্পরা বলে যাওয়ার পর বণিক ধনদত্ত বললে—তার কথায় উৎসাহ পেয়ে খুঁজে গেছিলাম বউকে। এসেছি এখানে। আমার বউকে আমি চিনেছি। কি গো, চিনতে পারছ? তুমি যে এখনও সতী, তা আমি জানি। তোমার দেওয়া ফুলের মালার সব ফুল এখনও টাটকা।

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে ফেলেছিল ধনদত্ত-বধূ। হাতির পেটে থেকেও তার হাসির জেল্লা একটুও কমেনি।

খুশি হলেন বিক্রমাদিত্য। গজ বধ করে সে কন্যাকে পেয়েছিলেন, তার স্বামীদেবতাকেও পেলেন। মিলিয়ে দিলেন দুজনকে।

১২৪. কাপালিকের দৃষ্টি

রাজা বিক্রমাদিত্য এবার শুধোলেন বণিক ধনদত্তের ব্রাহ্মণ বন্ধুকে, তুমি বলেছিলে ধনদত্তকে, তোমার মরা বউকেও জীবিত অবস্থায় পেয়েছ, ধনদত্তকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যেই বলেছিলে। তাই তো?

ব্রাহ্মণ বন্ধু বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, বলেছিলাম।'

রাজা বললেন, 'কীভাবে পেয়েছিলে, জানতে কৌতূহল হচ্ছে।'

ধনদত্তের ব্রাহ্মণ বন্ধু তখন শুনিয়ে দিল সেই অদ্ভুত কাহিনি।

আমার নাম চন্দ্রস্বামী। আমার নিবাস ব্রহ্মস্থল গ্রামে। আমার বউ অতীব সুন্দরী। একদিন অন্যগ্রামে গেছিলাম বাবার আদেশে। সেই সময়ে একজন কাপালিক এসেছিল ভিক্ষা চাইতে। দেখেছিল আমার রূপসী স্ত্রীকে।

কাপালিকের নজর খুব খারাপ। জ্বর এসে গেছিল আমার বউয়ের। মারণ জ্বর। মারা গেল সেই রাতেই।

দাহ করার জন্যে আত্মীয়স্বজনেরা তাকে চিতায় শুইয়ে দিয়েছিল। চিতা যখন জ্বলছে, তখন আমি বাড়ি ফিরেছিলাম।

জ্বলন্ত চিতার সামনে গিয়ে দেখলাম এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য।

কোত্থেকে সেই কাপালিক এসে দাঁড়িয়েছে চিতার সামনে। তার কাঁধে একটা খাটিয়া। ডুগডুগ করে ডমরু বাজাচ্ছে। চিতা থেকে নেমে এল আমার বউ, প্রাণময় শরীরে। কাপালিক মন্ত্র পড়ে তাকে টেনে নিয়ে গেল পেছন পেছন। স্বইচ্ছায় সে হেঁটে গেল আমাদের দিকে ফিরেও না তাকিয়ে। একেবারেই মন্ত্রমুগ্ধ।

আমি ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু তির ধনুক চালাই প্রয়োজন হলে। বউ আর কাপালিকের পেছন পেছন গেলাম ধনুকে তির লাগিয়ে।

গঙ্গার তীরে একটা গুহার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কাপালিক। কাঁধ থেকে নামাল খাটিয়া। হাঁক দিতেই গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মন্দ্রমুগ্ধ আরও দুই পরমাসুন্দরী কন্যা।

অট্টহেসে কাপালিক তাদের বললে, 'তোদের উপভোগ করিনি আজও। কেন জানিস? তোদের চেয়েও এই সুন্দরীকে পাইনি বলে। আজ তিনজনেই আমাকে দিবি আনন্দ।

শুনেই আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। খাটিয়াখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম গঙ্গার জলে।

এই খাটিয়াটাই ছিল কাপালিকের সব ক্ষমতার উৎস। শক্তিময় খট্টাঙ্গ। সিদ্ধিলাভ করেছিল এই খাটিয়াকে কেন্দ্র করেই। সেই খাটিয়া গঙ্গায় বিসর্জন দিতেই কাপালিকের সমস্ত মন্ত্রশক্তিও চলে গেল গঙ্গার জলে।

তখন সে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পেছন থেকে তির মেরে তাকে আমি যমালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

মন্ত্রের জোর মিলিয়ে গেছিল আমার বউ আর গুহার সেই পরমাসুন্দরী দুজনের শরীরমন থেকে।

মেয়েদুটির পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিলাম। জেনেছিলাম, তাদের একজন বারাণসীর রাজকন্যা, আর একজন বারাণসীরই এক সওদাগরের মেয়ে।

তাদেরকে পেঁছে দিয়েছিলাম যার যার বাড়িতে। বউকে নিয়ে চলে এসেছিলাম নিজের বাড়িতে।

এরপর একদিন পথে বেরিয়ে দেখলাম পত্নীহারা বণিকপুত্র ধনদত্তকে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি। কাপালিকের গুহার মধ্যে আমি একটা প্রসাধনী মলম পেয়েছিলাম। সুগন্ধী মলম। গায়ে মেখে নিয়েছিলাম। সেই সুগন্ধ আজও আমার গা থেকে যায়নি। হতে পারে সেই সুগন্ধি প্রসাদেই পরের পর এত অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। মরা বউকে ফিরে পেয়েছি জীবিত অবস্থায়। ধনদত্ত পেয়েছে হাতির পেটে চলে যাওয়া বউকে।

প্রীত বিক্রমাদিত্য সস্ত্রীক ধনদত্ত আর তার সুগন্ধী ব্রাহ্মনী বন্ধুকে পাঠিয়ে দিলেন নিজের নিজের বাড়িতে। গুণবতী, গুণধরা আর মদনসুন্দরীকে নিয়ে ফিরলেন উজ্জয়িনীতে। ফিরেই বিয়ে করে নিলেন গুণবতী আর গুণধরাকে।

এরপর উদ্যোগী হলেন বিশ্বকর্মা মন্দিরের সেই পাথরের পুতুল ব্যাপারে। মূর্তি নির্মিত হয়েছে যাকে দেখে, অপরূপা সেই কলিঙ্গবতীকে চাই। দূত পাঠালেন তার পিতৃদেব কলিঙ্গদেবের কাছে।

রেগে টং হলেন কলিঙ্গদেব। এতবড়ো অহংকার বিক্রমাদিত্যের!

সাফ বলে দিলেন দূতকে, 'দেব না মেয়ে। হোক যুদ্ধ। যুদ্ধেই শেষ করব বিক্রমাদিত্যকে!

বুদ্ধিমান বিক্রমাদিত্য অবিবেচক কলিঙ্গদেবকে জয় করলেন যুদ্ধ না করেই।

নিশুতি রাতে বেতালকে নিয়ে গেলেন কলিঙ্গদেবের শোবার ঘরে। কলিঙ্গদেবকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বেতাল তার বিকট মূর্তি দেখিয়ে বললে, 'তোমার কি ভীমরতি ধরেছে? বিক্রমাদিত্যর সঙ্গে লড়তে চাও? এই তো ইনি এসেছেন। লড়ে যাও!

কলিঙ্গদত্ত নির্বোধ নন। কন্যা কলিঙ্গসেনার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন বিক্রমাদিত্যের। এমন জামাই কে না চায়!

দেবসেন বললে, 'এইভাবেই হরেক পন্থায় মহিষী সংগ্রহ করে গেছেন সম্রাট বিক্রমাদিত্য। তিনি যে বিপরীত স্বভাবের মানুষ। গোঁয়ার নন। যখন যেমন তখন তেমন রণনীতি অনুসরণ করেন।'

মহিষী কলিঙ্গসেনার মুখে তাঁর সঙ্গে বিক্রমাদিত্যের বিবাহ কাহিনি শুনে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল অন্য মহিষীরা। সত্যিই, গুণের ঘাট নেই বিক্রমাদিত্যের। পুতুল দেখে প্রেম, বেতাল দেখিয়ে বিয়ে! কিন্তু সুখে আছেন সবাইকে নিয়ে। মজায় আছে মহিষীরা!

রাজসেবক দেবসেন রাজা বিক্রমাদিত্যের মহিমাকীর্তন করে গেল আর একটা আশ্চর্য ক্ষমতার কাহিনি শুনিয়ে।

কোনও এক রাজপুত্র একসময়ে এসেছিল রাজা বিক্রমাদিত্যের গুণগান শুনে তাঁর সেবক হতে। একা আসেনি, সঙ্গে এনেছিল আরও কয়েকজন রাজকুমারকে। পরনে ছিন্নবস্ত্র। কৃচ্ছসাধন ব্রত উদ্যাপনের জন্যে।

গ্যাঁট হয়ে সবাই বসে রইল ছেঁড়াবসন পরিহিত রাজপুত্র সিংহতোরণের সামনে। অন্য রাজপুত্ররা ঘিরে রইল তাকে। রাজার নিষেধ কানেই তুলল না। এইভাবেই সে বসে থাকবে একটানা বারো বছর।

পুণ্যবান রাজার সান্নিধ্যে থেকে পুণ্য অর্জনের অভিসারে। রোদ ঝড় জল উপেক্ষা করে কাটিয়ে দিল এগারোটা বছর।

তারপর রাজপুত্রের বিরহিনী বধূ একটা চিঠি পাঠাল স্বামীর কাছে। নিশুতি রাতে রাজার ছেলে যখন পত্নীর পত্রে মনোনিবেশ করেছে, আড়ালে থেকে তা পড়ে নিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য।

রাজপুত্র-বধূ লিখেছে : মরেও মরছি না, শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে যাচ্ছি। এত পাষাণ তুমি?

চিঠি পড়ে নিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করে বিক্রমাদিত্য ডেকে পাঠালেন রাজপুত্রকে।

বললেন, ব্রত উদ্যাপন সার্থক হয়েছে। দিচ্ছি তোমায় পুরস্কার। আমার এই আদেশপত্র নিয়ে চলে যাও ওঁকার পীঠের উত্তর দিকে। সেখানে আছে একটা গ্রাম। নাম, খণ্ডবটক। সেই গ্রামের অধিকারী হলে তুমি। ভোগ করে যাও।

রাজার ছেলেকে মাত্র একখানা গ্রাম পুরস্কার! এগারো বছর কৃচ্ছসাধনের পর!

রাজপুত্রের মন খারাপ হয়ে গেল। এত কাণ্ডের পর একখানা মাত্র গ্রাম! রাজার ছেলেকে!

কিন্তু বিক্রমাদিত্যের আদেশ মাথা পেতে নিয়ে বেরোল গ্রামের সন্ধানে। অনেক ঘোরবার পর এক রাক্ষস বলে দিল কোথায় সেই গ্রাম। আরও বলল, সে গ্রামে মানুষ থাকে না!

বুক দমে গেল রাজপুত্রের। সেখানে মানুষ থাকে না! পরিত্যক্ত অনেক দিন ধরে।

তবুও গেল খুঁজে খুঁজে। রাজা বিক্রমাদিত্য যখন গ্রাম দান করেছেন, তার দখল নিতে হবে বইকী!

গ্রামে ঢুকে চমকে উঠেছিল রাজপুত্র। খাঁ খাঁ করছে ঠিকই, একেবারেই জনমানবশূন্য পাণ্ডব বর্জিত।

অথচ, সেখানে রয়েছে একটা সাতমহলা প্রাসাদ! বিলকুল ফাঁকা!

এতো বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার! সম্রাটের আদেশনামা হাতে নিয়ে ভেতরে ঢুকে মহলে মহলে টহল দিতে দিতে এক জায়গায় দেখল একটা মণিমাণিক দিয়ে গড়া নয়ন সুন্দর সিংহাসন।

রাজপুত্র ছেঁড়া কাপড় পরে দীনহীন বেশে বসল সেই সিংহাসনে।

অমনি হুম করে সামনে এসে গেল সেই রাক্ষস, হাতে লিকলিকে বেত।

বললে হংকার ছেড়ে, স্পর্ধা তো কম নয়! এ সিংহাসনে বসলে কোন সাহসে?

বিক্রমাদিত্যের আদেশপত্র দেখিয়ে রাজপুত্র বললে, এই সাহসে।

সঙ্গে সঙ্গে আদেশপত্রকে প্রণাম ঠুকে বললে রাক্ষস, পেন্নাম হই। আমি আপনার হুকুমের চাকর। বলুন কী করতে হবে? আজ থেকে আমি আপনার রক্ষক।

বুদ্ধিমান রাজপুত্র বললে, আমার প্রজা কোথায়? সৈন্য কোথায়? রাজসিংহাসনে বসেছি, কিন্তু রাজত্ব কোথায়?

রাক্ষস শুধু তালি বাজিয়ে গেল। নিমেষে এসে গেল প্রজা, সৈন্য ইত্যাদি ইত্যাদি। গ্রাম হয়ে গেল নগর। গমগম করছে চারদিক।

এইবার অবাক হল ছিন্নবস্ত্র পরিহিতা রাজকুমার। কী আশ্চর্য ক্ষমতা সম্রাট বিক্রমাদিত্যের! দিলেন একটা জনশূন্য গ্রাম, নিমেষে তা পরিণত হল নাগরিক আর সেনানী ঠাসা নগরে!

কৃতজ্ঞতা জানাতে বিক্রমাদিত্য সমীপে এসেছিল রাজপুত্র। বিক্রমাদিত্য তাকে বিরহিনী বধূর কাছে যেতে আজ্ঞা করেছিলেন। সে যে বড়ো কষ্টে আছে।

হুকুম মেনে নিয়েছিল রাজপুত্র। স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে এসে রাজ্যে বসে রাজত্ব দেখে গেছিল।

এই কাহিনি শেষ করে সেবক দেবসেন শুনিয়ে গেল বিক্রমাদিত্যের মহিমাব্যঞ্জক আর এক কাহিনি।

রাজসভায় এসেছিল অদ্ভুতদেহী এক ব্রাহ্মণ। খাড়া তার গায়ের সমস্ত লোম আর মাথার চুল।

কারণটা জানতে চেয়েছিলেন বিক্রমাদিত্য।

লোম খাড়া করা এক কিম্ভূত কাহিনি শুনিয়ে দিল ব্রাহ্মণ।

বিয়ে করেছিল দূরের গ্রামের মেয়ে। তখন ছিল নেহাতই কমবয়সী, তাই বাড়িতে আনেনি। যুবতী হওয়ার পর ব্রাহ্মণ গেছিল তাকে আনতে। সে এসেছিল সঙ্গে একজন দাসী নিয়ে। ঘোড়ায় চেপে। কিছুদূর এসে জল খাওয়ার বায়না ধরেছিল বউ। ব্রাহ্মণের চাকরকে নিয়ে দূরের নদীতে জল খেতে গেছিল। ঘোড়ার কাছে রেখে গেছিল তার কাজের মেয়ে আর ব্রাহ্মণকে।

স্ত্রী-র ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে ব্রাহ্মণ নিজেই গেছিল নদীর দিকে। দূর থেকে দেখেছিল এক লোমহর্ষক দৃশ্য।

ব্রাহ্মণের চাকরটাকে কাঁচা চিবিয়ে খাচ্ছে তার বউ! মাথার চুল আর গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেছিল এই দেখেই। পালিয়ে এসেছিল দূর থেকেই।

এসে দেখেছিল আর এক ভয়ানক দৃশ্য।

বউয়ের কাজের মেয়ে কচমচ করে খাচ্ছে ব্রাহ্মণের চাকরকে!

চম্পট দিয়েছিল ব্রাহ্মণ, কিন্তু সেই যে চুল-টুল খাড়া হয়ে গেছিল, আর সেসব স্বাভাবিক হয়নি।

আজব এই কাহিনি শুনে মুখ চুলবুল করে উঠেছিল বিক্রমাদিত্যের এক মন্ত্রীর।

বলেছিল, মহারাজ, এরকম বদমাস মেয়েছেলে ঢের আছে এই সংসারে। একটা গল্প শোনাই।

এই উজ্জয়িনী নগরেই এক মাথামোটা ব্রাহ্মণ সন্তান আছে। তার নাম অগ্নিশর্মা।

তার বিয়ে হয়েছিল বর্ধমান নগরের এক বালিকা ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে। শ্বশুর মস্ত বড়োলোক। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠায়নি বয়স কম বলে।

মেয়ে যখন যুবতী, তখন অগ্নিশর্মা বাপের হুকুমে বাড়ি থেকে বেরোল তাকে আনবার জন্যে।

ঠিক এই সময়ে ডানদিকে উড়ে গেল চাতক পাখি, সেই সঙ্গে হক্কাহুয়া করে ডেকে উঠল শেয়াল।

খুবই অলক্ষণ, কিন্তু মাথামোটা অগ্নিশর্মা তা গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে 'জীব, জীব' করে উঠল যাতে অলক্ষণ কেটে যায়।

আড়ালে থেকে হেসে গড়িয়ে পড়লেন শকুন দেবতা।

যখন শ্বশুরবাড়ি ঢুকছে অগ্নিশর্মা, আবার ডানদিকে উড়ে গেল তিত্তির পাখি, ডেকে উঠল শেয়াল।

এহেন অশুভ লক্ষণকেও পাত্তা না দিয়ে 'জীব, জীব' করতে করতে শ্বশুরবাড়ি ঢুকল গর্দভবুদ্ধি অগ্নিশর্মা।

শকুন দেবতা দেখলেন, এর ঘটে তো বুদ্ধির ছিটেফোঁটাও নেই। এত হুঁশিয়ার করা সত্ত্বেও সাবধান হচ্ছে না যখন, তখন একে আগলাতে হবে।

রাত হল, অগ্নিশর্মার বউ সেজেগুজে স্বামীশয্যায় এল। পথশ্রমে ক্লান্ত অগ্নিশর্মা একটু তাদের খেয়েই নাক ডাকিয়ে ঘুম শুরু করতেই তার বউ শটান চলে গেল বধ্যভূমিতে।

ব্রাহ্মণের চাকরটাকে কাঁচা চিবিয়ে খাচ্ছে তার বউ!

সেখানে শূলে গাঁথা হয়ে ঝুলছিল এক চোর, যে কিনা অগ্নিশর্মার বউয়ের নাগর। তাকে চুমু খেতে যেতেই আধমরা চোর মরণকামড় দিয়ে মুখে পুরে নিল চরিত্রহীনার নাকের ডগা।

কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে একটা ছুরি নিয়ে, ছুরির ফলায় নাকের রক্ত লাগিয়ে চেঁচিয়ে উঠল নষ্ট মেয়ে।

ছুটে এল বাড়ির লোকজন। কী ব্যাপার? কী ব্যাপার?

চোখের জলে বুক ভাসাতে ভাসতে ভ্রষ্টা মেয়েটা বললে, আমার স্বামী নাক কেটে দিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে চলল লাঠিপেটা। উত্তমমধ্যম মারের চোটে অগ্নিশর্মার প্রাণটা যখন গলায় এসে ঠেকেছে, তখন।

শকুন দেবতা তক্কে তাক্কে রইলেন।

সকাল হতেই আধমরা অগ্নিশর্মাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হল রাজার সামনে। রাজা তাকে প্রাণদণ্ড দিলেন।

ঠিক তখনই আকাশ থেকে বলে উঠলেন শকুন-দেবতা, কী সর্বনাশ! বিনা দোষে ব্রাহ্মণ হত্যা হচ্ছে যে! ওর বউয়ের কাটা নাক রয়েছে শূলে চাপানো চোরের মুখের মধ্যে। চুমু খেতে গেছিল কিনা...!

রাজা লোক পাঠালেন বধ্যভূমিতে। মরা চোরের মুখের মধ্যে পাওয়া গেল কাটা নাক!

অগ্নিশর্মা মুক্তি পেল।

শাস্তি গেল তার নষ্ট বউ আর তার বাড়ির লোকজন।

কী জঘন্য নারী চরিত্র! গুম হয়ে গেলেন বিক্রমাদিত্য।

মন্ত্রী মূলদেব মওকা পেয়ে বললে, সব মেয়েই কি ব্যাভিচারিণী হয়? সতী মেয়েও আছে।

বলে, শুরু করল সতী মেয়ের আখ্যান।

মহারাজ, যে বাগানে শুধু বিষগাছ জন্মায়, সেই বাগানে আমগাছও বেড়ে ওঠে।

আমার এক বন্ধু আছে। তার নাম শশী। তাকে নিয়ে একদিন পাটলিপুত্রের গেছিলাম।

খুঁজছিলাম একটা পান্থশালা। শহরের বাইরে দীঘির পাড়ে কাপড় কাচছিল একটা মেয়েছেলে। তাকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম পান্থশালার ঠিকানা।

মেয়েটা বললে, এই দীঘির তীরে থাকে চকাচকী, জলে থাকে মাছ, আর পদ্মে থাকে ভোমরা। পথিক মশায়ের থাকবার জায়গা তো কোথাও দেখছি না।

মেয়েটার বেঁকা কথায় লজ্জা পেলাম। সোজা প্রশ্নের এই কি জবাব?

যাক গে, শশীকে নিয়ে ঢুকলাম শহরে। দেখলাম, একটা ছেলে বাড়ির দোরগোড়ায় বসে কাঁদছে, হাতে রয়েছে একবাটি গরম পায়েস।

শশী বললে, কী বোকা! কী বোকা! হাতে পায়েস, চোখে জল, খেয়ে নিলেই হয়!

অমনি হি-হি করে হেসে বললে বাচ্ছা ছেলেটা, বোকা তো তুমি। এই যে আমি কেঁদে বুক ভাসাছি, তার একটা কারণ আছে। পায়েস কি গরম খাওয়া যায়? ঠাণ্ডা করে খেলে খেতে মিষ্টি লাগে। আর কাঁদলে কি হয় জানা আছে? নাকের শ্লেষ্মা ঝরে যায়। গেঁইয়া বোকা এই জ্ঞানটাও নেই!

বাচ্ছা ছেলের এহেন জ্ঞানবচন শুনে লজ্জায় মরে গেলাম, চম্পট দিলাম সেখান থেকে।

একটু গিয়েই দেখলাম, আমগাছে উঠে আম পাড়ছে একটি মিষ্টি মেয়ে। আমরা হেঁকে বললাম, দুটো আম দাও, খাই।

সে বললে—গরম, না, ঠাণ্ডা?

অবাক হলাম। বললাম, প্রথমে গরম, তারপর ঠাণ্ডা।

আম ছুঁড়ে ফেলে দিল সে ধুলোর ওপর। আমরা কুড়িয়ে নিলাম, ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝাড়লাম, তারপর খেয়ে নিলাম।

হি-হি করে হেসে মিষ্টি মেয়েটা বললে, দেখলে তো? আম গরম ছিল বলেই তো ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে খেতে হল!

মেয়েটার বাকপটুতা আমাদের লজ্জায় ফেলে দিল।

আর একচোট হেসে নিয়ে সেই মেয়ে বললে, এবার দেব ঠাণ্ডা আম। ফুঁ দিয়ে খেতে হবে না। কাপড় পাতো, ফেলে দিচ্ছি।

আমরা সরে পড়লাম আমতলা থেকে। ঠিক করলাম, ফক্কর মেয়েটাকে শায়েস্তা করব সুযোগ পেলেই। চালাকিতে আমরাও কম যাই না।

পরের দিন সকালে ধড়াচূড়া পালটে, অন্য বেশে, খুঁজে খুঁজে গেলাম মেয়েটার বাপের বাড়ি।

তার বাবার নাম যজ্ঞস্বামী। আমাদের আগমনের হেতু জিজ্ঞেস করলেন।

আমরা বললাম, লেখাপড়া শিখতে এসেছি। আপনার ছাত্র হতে চাই।

যজ্ঞস্বামীর পয়সা আছে। ছাত্রদের বাড়িতে রেখে শিক্ষা দেন। আমাদেরও চারমাস থাকতে বললেন।

আমরা বললাম, থাকতে পারি। যদি আমাদের একটা ইচ্ছাপূরণ করেন চারমাস পরে।

বৃদ্ধ অধ্যাপক রাজি হয়ে গেলেন।

চারমাস পরে শশী বললে, এইবার আপনার কথা রাখুন। মূলদেব আমার চেয়ে বয়েসে বড়ো, সম্মানেও বড়ো। ওর সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিন। জামাই হিসেবে সে উত্তম।

বৃদ্ধ সেটা চারমাসেই বুঝে গেছিলেন। আমাকে তাঁর জামাই করে নিলেন।

বাসরঘরে ফিচেল বউকে বললাম, আম গরম, না, ঠাণ্ডা?

এইবার সেই মেয়ে চিনতে পারল আমাকে।

হেসে বললে, পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের শহরের মানুষরা এইভাবেই ঠকায়।

আমি বললাম, সরল গেঁইয়া বলেই আমি চললাম। তুমি চালিয়াত নগরবধূ, থাকো নগরে।

সপেটা জবাব দিল আমার বধূ, যাকে নগরবধূ বলে টিটকিরি দিয়েছিলাম, ওইভাবেই তোমাকে দিয়ে আমার পেটে যে ছেলেকে আনব, সেই ছেলেই তোমাকে নিয়ে আসবে আমার কাছে।

বলেই, পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল বউ। আমিও আমার আংটি তার আঙুলে পরিয়ে দিয়ে সরে পড়লাম শ্বশুরবাড়ি থেকে, ফিরে এলাম উজ্জয়িনীতে।

ভোরে ঘুম ভাঙবার পর বউ দেখেছিল হাতের সেই আংটি, যে আংটিতে খোদাই করা রয়েছে আমার নাম, মূলদেব।

কে এই মূলদেব, তা আঁচ করে নিয়েছিল আমার বুদ্ধিমতী বউ। নিশ্চয় সেই উজ্জয়িনীর ধড়িবাজ মূলদেব।

প্রতিজ্ঞা করেছিল আমার স্ত্রী, উজ্জয়িনীতে গিয়েই এই হেনস্থার জবাব সে দেবে।

বাবার অনুমতি নিয়ে গেল উজ্জয়িনীতে, টাকাপয়সা আর দাসীকে নিয়ে। সুমঙ্গলা, এই ছদ্মনামে ঠাঁই নিল উজ্জয়িনীর সেরা নগরবধূর প্রাসাদে। শহরময় রটিয়ে দিল বার্তা, কামরূপ থেকে এসেছে অলোকসুন্দরী এক কামিনী, জনপদবধূ হয়ে।

আমার বন্ধু শশী ছুটেছিল সবার আগে। থলিবোঝাই টাকা পাঠিয়ে নতুন নগরবধূর সঙ্গ কামনা করেছিল।

দাসী এসে বলেছিল, মুখে আগুন! টাকা দিয়ে যে বারবনিতা ভোগ করতে চায়, সে তো একটা জানোয়ার। তবে হ্যাঁ, ওঁর কথা যে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে, তাকে উনি দেহ দেবেন।

শশী বলেছিল, শুনব গো, শুনব, নিয়ে চলো আমাকে তার কাছে।

দাসী নিয়ে গেল তাকে প্রাসাদের প্রথম শান্ত্রীর কাছে। সে বললে, আমার ওপর হুকুম আছে আপনাকে ফের স্নান করতে হবে। আপনার গায়ে গন্ধ। আর উনি বড়ো সৌখীন।

শশী তাতেই রাজি। বড়ো বারবনিতার সব বায়না মেটাতে হয়।

বারবনিতার দাসীরা তার গায়ে কষে তেল মাখিয়ে, স্নান করিয়ে রাতের প্রথম প্রহর কাটিয়ে দিল।

শশী গেল প্রাসাদের দ্বিতীয় মহলে। দ্বাররক্ষক ঢুকতে দিল না। স্বামিনীর হুকুম মতো তার সারা গায়ে প্রসাধনী আর সুগন্ধী মাখানো হল, রাত্রের দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হল এইভাবে।

প্রাসাদের তৃতীয় মহলে দাসীরা তাকে পেট ঠেসে খাইয়ে কাটিয়ে দিল রজনীর তৃতীয় প্রহর।

চতুর্থ প্রহরে চতুর্থ মহলের দরজার সামনে যেতেই ধমকে উল দ্বাররক্ষক, কোথাকার গেঁইয়ারে শেষ প্রহরে কি কেউ বারবধূ সম্ভোগ করতে আসে? যাও, যাও, বাড়ি যাও!

লজ্জা পেয়ে ফিরে এল শশী। বারবধূ সেজে বামুনের সেই ফিচেল মেয়েটা তার ট্যাঁকের সব কেড়ে নিয়ে ঘাড়ধাক্কা দিল রীতিমত অপমান করে। এমনই অপমান, যা কাউকে বলা যায় না।

সব শুনে আমি ঠিক করলাম, এক হাত নেওয়া যাক গণিকাকে।

সন্ধ্যার সময়ে সেজেগুজে গেলাম বারবধূ প্রাসাদে। প্রতিটা মহলের দ্বাররক্ষকদের কাঁড়ি কাঁড়ি ঘুষ দিয়ে সটাসট দরজা পেরিয়ে প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই হাজির হলাম গণিকার সামনে।

মানে, আমার বিয়ে করা বউয়ের সামনে। কিন্তু বারবধূরূপে এমনি ঝলমলিয়ে বসেছিল যে চিনতেও পারলাম না।

সে কিন্তু চিনেছিল আমাকে, পরম সমাদরে আদর সোহাগে অস্থির করে দিয়ে হাত ধরে টেনে বসিয়েছিল বিছানায়।

এবং রতিসুখ দিয়েছিল নিবিড় নিষ্ঠায়। সকাল হয়ে গেল, ছাড়ল না। সেই একদিন নয়, বহুদিন, বহুমাস, সম্ভোগানন্দে বিভোর হয়ে রইলাম দুজনেই। আমি জানতাম ভোগ করছি কামরূপের কামলীলা পারঙ্গমার সঙ্গ। সে কিন্তু দেহ দিয়ে গেছে নিজের স্বামীকে। বেশ্যার অভিনয় করে!

যথাসময়ে দেখা গেল তার গর্ভধারণের লক্ষণ। আমার ঔরসে।

এই সময়ে একটা জাল চিঠি দেখাল আমাকে। কামরূপের রাজা তাকে চলে আসতে লিখেছেন, এক্ষুণি।

চিঠিটা বড়লাম, তাকে ছেড়ে দিলাম।

সে কিন্তু কামরূপে না গিয়ে সটান চলে গেল বাপেরবাড়ি পাটলিপুত্রে। যথাসময়ে প্রসব করল একটি ছেলে। সেই ছেলে যখন বারো বছরের, তখন মারপিট করেছিল এক সমবয়সী বন্ধুর সঙ্গে। সেই বন্ধু তাকে বলেছিল, যার বাপের ঠিক নেই সে এসেছে লড়তে!

ছেলে এসে মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার বাবা কে?

মা বলেছিল, তোর বাবার নাম মূলদেব। নিবাস উজ্জয়িনীতে।

তারপর শুনিয়ে দিয়েছিল সমস্ত ব্যাপার।

ছেলে বলেছিল, ঠিক আছে। তোমার শপথ রক্ষা করব আমি। বাবাকে এনে দেব তোমার সামনে।

সে গেল উজ্জয়িনীর জুয়োর আড্ডায়। জুয়োখেলে সব জুয়াড়িদের হারিয়ে দিয়ে, জেতা টাকাপয়সা বিলিয়ে দিল গরিবদুঃখীদের মধ্যে।

আমি, তার বাবা মূলদেব, আমিও হেরে ভূত হয়ে গেছিলাম তার কাছে। মড়ার মতো শুয়েছিলাম একটা খাটিয়ায়। সেই ছেলে চাকরদের দিয়ে আমাকে তুলোর বিছানায় শুইয়ে যখন খাটশুদ্ধ বেচে দিচ্ছে দোকানে, আমার হুশ হয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিলাম, দাম কত তোমার এই খাটিয়ার?

সে বলেছিল, টাকা দিয়ে এ খাটিয়া কেনা যায় না। অদ্ভুত কাহিনি শোনালে পাওয়া যায়।

আমি তখন একটা অদ্ভুত কাহিনি শুনিয়েছিলাম। একসময়ে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সারা দেশে। রাজা সেই দুর্ভিক্ষ দূর করেছিলেন কীভাবে? নিজে জমিতে জল দিয়ে। কীভাবে এক মেয়ে শুয়োরের পিঠে চেপে হাতির শুঁড় দিয়ে জল ছিটিয়ে!

হেসে গড়িয়ে পড়েছিল সেই ছেলে, মানে, আমার ছেলে।

বলেছিল, হাতির বাহন তো মেঘ, আর শুয়োরির প্রেমিক হল গিয়ে মাটি। তুমি তাহলে শুয়োররূপী বিষ্ণুর প্রিয়তমা। এর ফলে, মেঘজল সম্পর্কে যদি ধান হয়, তাতে অদ্ভুত বলে কিছু আছে নাকি?

আমি হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলাম ছেলেটার দিকে। সামান্য বালকের মুখে একি বৃত্তান্ত!

ছেলে তখন বললে, তাহলে আমি শোনাই এক অদ্ভুত ব্যাপার। যদি অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারো, এই খাটিয়া পাবে। না পারলে, আমার চাকর হয়ে থাকবে। .....অনেক আগে একটা ছেলে জন্মেছিল। জন্মেই সে লাথি মেরে মাটি কাঁপিয়ে দিয়েই বুড়ো হয়ে গিয়ে অন্য লোকে চলে যায়।....বলো তো, কী মানে?

আমি বললাম, গাঁজার দম। বিলকুল মিথ্যে। এরকম অদ্ভুত কাণ্ড কখনও সত্যি হতে পারে না।

অট্টহেসে ছেলে বললে, তুমি একটা মূর্খ। শ্রীবিষ্ণু বামনরূপে প্রকাশিত হয়েই পায়ের ভারে পৃথিবী কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন, হু হু করে বেড়ে গেছিলেন, একটা পা স্বর্গে রেখেছিলেন। তাই তো?

আমি ঢোক গিলে বলেছিলাম, তা বটে! তা বটে!

ছেলে বললে, তাহলে তুমি বাজি হারলে, আমার চাকর হলে। যেখানে যেতে বলব, সেখানে যেতে হবে।

যারা সাক্ষী হয়েছিল এই বাজি ধরার লড়াইয়ে, তারাও একবাক্যে বললে, তা বটে! তা বটে! এখন থেকে মূলদেব এই বালকের আজ্ঞাধীন।

ছেলে আমার হাত ধরে তার মায়ের সামনে নিয়ে গিয়ে বললে, মা, তোমার কথা রাখলাম। এই আমার বাবা।

আমি যখন হাঁ, বউ তখন বললে, তোমাকে তো বলেই ছিলাম, তোমারই ছেলে তোমাকে ফিরিয়ে আনবে।

বলে, বর্ণনা দিয়ে গেল কীভাবে কামরূপের বহুবল্লভা কামিনী সেজে আমার ঔরসে গর্ভ উৎপাদন করিয়েছে।

কাহিনি শেষ করে বললে মূলদেব মন্ত্রী, সব মেয়ে কি অসতী হয়? বাহ্যত যে অসতী, মূলে সে সতী। আমার স্ত্রী এই মহাসত্যের প্রমাণ। সে এখন এই উজ্জয়িনীতে, আমার বাড়িতে।

রাজা বিক্রমাদিত্য চমৎকৃত হলেন উপাদেয় এই কাহিনি শুনে। সত্যিই তো, সব নারী তো ব্যাভিচারিণী হয় না!

এইভাবেই বহু চমকপ্রদ কাহিনি শুনে, নিজে বহু বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি করে, ধরণী শাসন করে গেলেন সম্রাট বিক্রমাদিত্য।

কাহিনিমালায় ছেদ টেনে কন্বমনি বললেন নরবাহন দত্তকে, এইভাবেই তুমি পাবে মদনমঞ্জুসাকে।

ধৈর্য্য ধর বিদ্যাধর সম্রাট হয়ে থাকবে বহুকাল।

কশ্যপের আশ্রমে বসে সুদীর্ঘ এই কাহিনিমালা নিবেদন করে গেলেন নরবাহনদত্ত মামা গোপাল আর অন্যান্য ঋষিদের।

বর্ষাকাল কাটিয়ে বিমানে চেপে সবাইকে নিয়ে গেলেন ঋষভ পাহাড়ে। মিলন হল মদনমঞ্জুসা, রত্নপ্রভা প্রমুখ রানিদের সঙ্গে। তাদের নিয়ে এককল্প সময় সাম্রাজ্য শাসন করে গেলেন।

শিব শুনিয়েছিলেন পার্বতীকে কৈলাস পর্বতের বৃহৎকথা। তাঁর অনুচরেরা মর্ত্যে সেই কাহিনি প্রচার করেছেন। এই কাহিনিই কথাসরিৎসাগর নামে লেখা হল। যা শুনলে পাপীর পাপমুক্তি ঘটবে।

মর্ত্যের মানুষদের এই বর দিয়েছেন ঈশ্বর।